শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
সংকলন ও সম্পাদনা
চিদ্‌রূপানন্দ

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

২/৩

হে পার্থ, তুমি ক্লীব হয়ো না, তুমি দুর্বল,
কাপুরুষ, মেরুদণ্ডবিহীন হয়ো না।
এই ভয় তোমার ন্যায় বীরপুরুষের
শোভা পায় না। হে পরন্তপ, শত্রুতাপন,
হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে তুমি
যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥

১১/৫৫

হে অর্জুন, যিনি আমার উদ্দেশ্যে
যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন,
আমিই যাঁর একমাত্র আশ্রয়,
যিনি সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা
করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য,
যাঁর কারও প্রতি শত্রুভাব নেই অর্থাৎ
আত্মবুদ্ধিতে সকলের সঙ্গেই
মিত্রতা—সেই ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

সহজ সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

সংকলন ও সম্পাদনা

চিদ্‌রূপানন্দ

সহযোগিতায়

শ্রী সত্যব্রত মুখার্জী ও শ্রীমতী সুজাতা মুখার্জী

www.reneindia.com

দীপ

SRIMAD BHAGAVAT GITA

Simple Translation & Explanation
Swami Lokeswarananda

Compiled & Edited by
Chidrupananda

ISBN 978-93-91168-095-4

Phone 033-2241-2538 ◆ 98310 52249

website www.deepprakashan.com

email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০২১
পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০২১
পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০২১

প্রচ্ছদ সৌম্যদীপ প্রধান

প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

মূল্য ৭৯০ টাকা

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্ ।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ।।

কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশক, জননী দেবকীর পরম আনন্দদায়ক, বসুদেব-পুত্র জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব শ্রীহরি পরমাত্মাকে প্রণাম, ক্লেশনাশক জগদাত্মা গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ।।

হে কৃষ্ণ! তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপীদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ। তোমার পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে ।
চতুর্গকার সংযুক্তা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।।

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—এই চারটি গ-কার যাঁর হৃদয়ে অবস্থিত, তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ।।

যাঁর কৃপা মূককে বাগ্মী করে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

উৎসর্গ

রেশির কর্ণধারের স্বর্গীয় পিতামাতা
শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখার্জী ও শ্রীমতী বিভা মুখার্জীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

এই পৃথিবীতে সঠিক পথে জীবনযাপন করার জন্যই গীতা-দর্শন। গীতা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুশাসন নয়, মানবধর্মের অনুশাসন। যুদ্ধক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানবজীবনকে দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখা ও জীবনে পরমলক্ষ্যে পৌঁছাতে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করা। অর্জুন কর্মবীর এবং শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ শান্ত ব্যক্তিত্ব, করুণাময় এক মহান আচার্য—তাঁরা একত্রে যেখানে অবস্থান করেন, তা যে পরিবারই হোক, সমাজই হোক অথবা জাতির জীবনে হোক—সেখানেই শ্রী অর্থাৎ সমৃদ্ধি নেমে আসে। ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে এবং জাতির জীবনে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মিলিত শক্তি অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও কর্মের মিলন অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের মিলন ঘটে—তাহলে সমৃদ্ধি ও সাফল্য অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিয়মিত গীতা পাঠে মানুষের মন কর্মমুখী, অন্তর্মুখী, শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। একদিকে মন কর্মের কৌশল আয়ত্ব করে, সকাম-কর্মকে নিষ্কাম-কর্মে পরিবর্তিত করে কর্মযোগী হন, অপরদিকে মন শুদ্ধ ও দৃঢ় হয়ে আত্মাকে জানতে চেষ্টা করে। কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসম্পদ লাভ করে স্থিতপ্রজ্ঞ হন। বিশ্বের সকল মানুষ—নারী পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই গীতা পাঠ করতে পারে। গীতা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। গীতার বিশ্বজনীন বাণীর মর্মার্থ বুঝে দৈনন্দিন কর্মজীবনে প্রয়োগ করার জন্যই সহজ সরল বাংলা ভাষায় এই গীতা-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

গীতা পাঠে শ্রদ্ধা আনতে হলে, প্রথমে আমাদের ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাই শুরুতে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। আমরা হিন্দুরা 'আর্য' নামক একটি সভ্যতার পূর্ব-পুরুষ ঋষিদের সন্তান। আর্যজাতি যেখানেই গিয়েছে, সেই সমাজে তিনটি বৈশিষ্ট দেখতে পাব— গ্রামসমাজ, নারীর অধিকার এবং একটি আনন্দপূর্ণ ধর্ম। আজকের পৃথিবীতে আমরা যেসকল রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ দেখি, সে সবগুলিই ঐ গ্রামসমাজ থেকেই বিকাশ লাভ করেছে। আর্যরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে যেমন যেমন বসতি স্থাপন করেছে, সেখানে কতকগুলি সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। এই সমাজের মূলে চার বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণী; দুটি মার্গ—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ; চার যোগ—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ এবং চার আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। স্বধর্ম অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত কর্তব্যকর্ম নিষ্কামরূপে সম্পাদন করে ইন্দ্রিয়জ- জ্ঞান বা পরোক্ষজ্ঞান এবং অতিন্দ্রীয়

জ্ঞান বা অপরোক্ষজ্ঞান অথবা আত্মজ্ঞান অর্জন করাই জীবনের উদ্দেশ্য। পরা ও অপরা উভয় শিক্ষার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো।

আর্যদের অপর ধারণা হলো নারী-স্বাধীনতা। প্রাচীনকালে একমাত্র আর্য সাহিত্যেই দেখা যায় মহিলাগণ পুরুষের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সম-অংশ-ভাগিনী, অন্য কোন সাহিত্যে এরূপ দেখতে পাওয়া যায় না। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য হলো আমাদের এই বেদ গ্রন্থ, যা আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ মিলিতভাবে লিখেছেন। এখানে প্রাচীনতম রচনাগুলি হলো স্তুতিগাথা—আর্যরা যে দেবতাগণের পূজা করতেন তাঁদের স্তুতিগাথা। এই স্তোত্রগুলি নিবেদিত অগ্নি, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে। এই স্তুতিগুলির মধ্যে একটি অসামান্য স্তোত্র পাওয়া যায়, তার রচয়িতা হলেন একজন নারী—অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্ ঋষি স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে স্তোত্রের মাধ্যমে ঈশ্বর নিজেই নিজের কথা বলছেন, সেটি হলো—'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং'—আমি সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, সকল উপাসকগণের সব প্রার্থনা পূর্ণ করি। এই প্রথম বেদে নারীর রচনার দর্শন পাওয়া যায়। এরপর বেদের অন্তভাগে উপনীত হলে যা পাওয়া যায় তা হলো উপনিষদ্, ভারতের প্রকৃত ধর্ম, তাতে যে জ্ঞানরাশি রয়েছে তা বর্তমান শতাব্দীতেও অতিক্রম করা যায়নি। তারমধ্যেও আমরা নারীর প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করি। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সেই অনবদ্য কাহিনিটি রয়েছে, যিনি মহান রাজা জনকের রাজসভায় গিয়েছিলেন এবং যেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক সমাবেশে তাঁকে সকল ঋষি প্রশ্ন করতে এগিয়ে এলেন। সেখানে এগিয়ে এলেন এক নারী গার্গী । তিনি বললেন—এখানে সব বালসুলভ প্রশ্ন হচ্ছে। আমি এই দুটি তির হাতে নিলাম, আমার দুটি প্রশ্ন। যদি পারেন তো তার উত্তর দিন, তাহলে আমরা আপনাকে 'ঋষি' বলে মেনে নেব। প্রথম পশ্ন হলো—আত্মা কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ঈশ্বর কি? এইরূপে ভারতে আত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিরাট প্রশ্ন তা বেরিয়ে এল একজন নারীর মুখ থেকে। ঋষিকে একজন নারীর নিকট পরীক্ষা দিতে হলো এবং তিনি তাতে উত্তীর্ণ হলেন।

সুতরাং, এই বিশ্বে প্রত্যেক জাতিই কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতির অধীনে অবস্থিত এবং একটি বিশিষ্ট ছাঁচ তৈরি করতে রত। আজ বিশ্বে যতগুলি সভ্যতা আছে তার প্রায় সবগুলিই সেই অনন্য আর্য জাতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মানব সভ্যতা তিন ধরনের রূপ নিয়েছে। রোমক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠন-প্রতিভা, রাজ্যজয়-প্রবণতা ও দৃঢ়তা। কিন্তু তাদের প্রকৃতিতে আবেগের সৌন্দর্যপ্রিয়তার এবং উচ্চভাবের অভাব। গ্রীকরা মূলত সৌন্দর্যের ব্যাপারে উৎসাহী, কিন্তু চপলস্বভাব এবং নৈতিকতা-চ্যুতির প্রবণতাসম্পন্ন। হিন্দু ধরনটি হলো মূলত দার্শনিকতা এবং ধর্মপ্রবণতা। হিন্দুর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হলো ঈশ্বর। হিন্দুর মেরুদণ্ড হলো ধর্ম এবং ঈশ্বরকে ভালবাসার ক্ষমতা, কিন্তু হিন্দু প্রকৃতিতে সংগঠন-প্রতিভা এবং কর্ম-উদ্যমের অভাব। তাই আমাদের নিত্য গীতা পাঠের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মিলিত শক্তি ও আদর্শকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করতে হবে।

ভারতবর্ষ চিরপুণ্যভূমি। আমারা সেই করুণাময় পরমসত্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যিনি আমাদেরকে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে দিয়েছেন। একমাত্র আমরা ভারতবাসী মুনিঋষির বংশধর বলতে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করি। সেই আশ্চর্যরূপ তরণীটি যা যুগ যুগ ধরে নরনারীকে নিয়ে চলেছে জীবন-সমুদ্রের পরপারে, হয়তো তার মধ্যে কোথাও কোথাও ছিদ্র দেখা দিয়েছে এবং একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কারা দোষী—যারা এই মাতৃভূমির পূজায় আত্মবলিদান করেছে, না যারা এই দেশকে লুণ্ঠন করেছে। আমরা তাঁর দীনতম সন্তান, আমরা আমাদের যথাসাধ্য প্রাণশক্তি দিয়ে সেই ভারতবর্ষরূপ তরণীটিকে সেবা ও পূজা করবার চেষ্টা করব, তাহলেও ঈশ্বর সাক্ষী থাকবেন।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ বিদ্বৎ সমাজে বহুল পরিচিত। বিশেষ করে তাঁর অমর কীর্তি সহজ সরল বাংলায় 'উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী', 'বিবেকচূড়ামণি' কিংবা কথামৃতের ভাষ্য 'তবকথামৃতম্' গ্রন্থ। পূজনীয় মহারাজের ইচ্ছা ছিল সহজ ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশিত করা। তিনি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে 'বিবেকানন্দ সভাগৃহে' গীতার উপর বাংলায় সহজ ব্যাখ্যা করতেন। বেশ কিছু অধ্যায়ের ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাগুলি পুরানো যুগের ক্যাসেট থেকে ভক্তরা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। এক থেকে নয় অধ্যায় পর্যন্ত কিছু ব্যাখ্যা নিয়ে একটি অর্ধসমাপ্ত গীতা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কখনো অর্ধসমাপ্ত রাখা উচিত নয়। ভবিষ্যত প্রজন্মের দিকে লক্ষ্য রেখে পূজনীয় মহারাজ যেমন সহজ সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন সেইরূপ সহজ ভাষায় এই গীতা গ্রন্থের প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রকাশ করতে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পূজনীয় মহারাজ যখন কোন বক্তৃতা ও ক্লাস নিতেন তখন নিজের হাতে সুন্দর নোটস্ লিখে বলতেন। সেইসব বহু লেকচার নোটস্, মহারাজের সংকলিত নানা গ্রন্থে উল্লেখিত গীতার মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা এবং গীতার অপর ব্যাখ্যাকারদের বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সমগ্র গীতা গ্রন্থটি সংকলন করা হলো। ব্যাখ্যায় প্রয়োজন মতো সহজ সরল শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান যুগ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের যুগ। তাই তাঁদেরও সহজ সরল উপদেশগুলি যথাযথ ভাবে উপযুক্ত স্থানে যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি আধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিগণ বিশেষ করে যুবসমাজ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অমৃত জ্ঞানসুধা পান করে তাঁদের আধুনিক বিজ্ঞান দৃষ্টিতে—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমন্বয়ে জীবনে পূর্ণতা লাভের পথে এগিয়ে যাবে ইহা নিশ্চিত। বিশেষ কয়েক জন অনুরাগী বন্ধুদের শুভেচ্ছায় গ্রন্থটি সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশনের সঙ্গে যুক্ত সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে বিশেষ করে, প্রবীর রায়চৌধূরী, সঙ্ঘমিত্রা চৌধূরী, প্রজ্ঞা চৌধূরী, মধুপর্ণা পাল, শান্তিরঞ্জন মুখার্জী, শঙ্কর মণ্ডল এঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

চিদ্রূপানন্দ

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং

শ্রীশ্রী জগজ্জননী সীতাদেবী, শ্রীরাধিকা ও শ্রীসারদা দেবীর শ্রীচরণে
নিবেদিত

শুভাকাঙ্ক্ষী

গ্রন্থটি প্রকাশনা ও অধ্যাত্মপিপাসু যুব সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে যাঁরা সাহায্য করেছেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ

বিষয়-সূচী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রসঙ্গ ও ভারতের সনাতন ধর্মের রূপরেখা

জগতে যে–সকল বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় আছে তাদের সকলের মূলে আছে এক বা একাধিক ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'। হিন্দুদের কাছে 'বেদ' জ্ঞানের আধারস্বরূপ। পরা ও অপরা জ্ঞানের উৎসস্বরূপ—'বেদমাতা'। বেদ–এর অন্তর্গত উপনিষদ্ এবং বেদভিত্তিক আস্তিক বেদান্ত গ্রন্থসকল হিন্দুধর্মকে ধারণ ও রক্ষা করে রেখেছে। এই বেদান্ত–গ্রন্থগুলি বিশেষ করে প্রস্থানত্রয় (উপনিষদ্, ভগবদ্‌গীতা ও ব্রহ্মসূত্র)–এর মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নাম প্রায় সকল হিন্দুগণ জানেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর কারণ গীতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। গীতার উক্তি সাধারণের পক্ষে সহজ ও বোধগম্য এবং গীতার উপদেশ মানব–জীবনকে সঠিক পথে চালিত করে। মানুষকে জীবনমুখী অর্থাৎ কর্মমুখী করে। গীতায় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ—এই চারটি পথের সম্বন্ধেই উপদেশ ও নির্দেশ আছে। মানুষ নিজের–নিজের প্রকৃতি ও স্বধর্ম অনুসারে যে–কোনও একটি পথ অনুসরণ করতে পারে কিংবা সব পথ সমন্বয় করে পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। আঠারোটি অধ্যায়ে ভগবান বিষাদযোগ দিয়ে শুরু করে মানব জীবনকে ধীরে ধীরে মোক্ষযোগে উত্তীর্ণ করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না, পরন্তু সত্য থেকে সত্যে—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উপনীত হয়। পৃথিবীর সকল মানুষ গীতা উপদেশ অনুসরণ করে সাধারণ মানব থেকে দেবমানবে উত্তীর্ণ হতে পারে। তাই গীতা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'বেদ' কথার অর্থ জ্ঞান। এক জ্ঞান আমাদের কাছে দুভাবে প্রকাশিত। অপরা—জাগতিক বা ঐহিক জ্ঞান এবং পরা—পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। বেদের

ঋষি, দার্শনিক ও পুরাণকার সকলেই আমাদের বলছেন, এই দুই জ্ঞানই জীবনে অর্জন করতে হবে। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা। স্বামীজী এই কথাই বলছেন—মানবজীবনের উদ্দেশ্য তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করা।

উপনিষদের যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ ও বর্তমান যুগ পর্যন্ত পিতামাতা তাঁদের পুত্র-কন্যাকে, গুরু তাঁর শিষ্যকে কিংবা অবতার পুরুষ তাঁর পার্ষদকে লক্ষ করে ঐ কথাই বলছেন—জ্ঞানের বিকাশ, অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ বা ঈশ্বরকে জানাই হল জীবনের পরম লক্ষ্য। জ্ঞানলাভের জন্যই জীবনে কষ্ট সাধন এবং পরম সত্য লাভের পথে যাত্রা।

তাই ভারতবর্ষের প্রচীন এই নামগুলি আমাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়—বালক নচিকেতা, শ্বেতকেতু, বরুণপুত্র ভৃগু, শৌনক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, আদিরস, বরুণ, ব্যাসদেব, শুকদেব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং অবতারকল্প পুরুষ—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেক ঐতিহাসিক পুরুষ দেশে-বিদেশে পরিচিত। এঁরা সকলেই ঐ এক পরমজ্ঞান-লাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন।

উপনিষদে দেখা যায় পিতামাতা তাঁর পুত্রকে গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করার জন্য পাঠিয়েছেন। গুরু আচার্য ঋষি অঙ্গিরা এবং শিষ্য শৌনক। শিষ্য শৌনক গুরুকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করে ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্, কস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।' (মুণ্ডক উপনিষদ-১/১/৩) হে ভগবন্, কোন জ্ঞান অর্জন করলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল জ্ঞানবিষয়ে অবগত হওয়া যায়। শৌনক এক প্রশ্নে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইছেন। গুরু অঙ্গিরা শিষ্যের অপূর্ব প্রশের উত্তরে বললেন—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা চৈবাপরা চ'। (মুণ্ডক উপনিষদ্-১/১/৪) মানবজীবনে দুটি বিদ্যাই জানতে হবে—অপরাবিদ্যা এবং পরাবিদ্যা। জাগতিক ব্যাবহারিক জ্ঞান এবং পারমার্থিক জ্ঞান। শুধু অপরাবিদ্যা অর্জন করে মানুষ সুখী হতে পারে না। অপরাবিদ্যা মানুষকে জাগতিক ভোগসুখ, ব্যাবহারিক, সামাজিক, দৈনন্দিন জীবনে অর্থ, ঐশ্বর্য, নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা দিয়ে জাগতিক অভ্যুদয়ের পথ দেখায়। অপরদিকে পারমার্থিক জ্ঞান মানবকে যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানালোকের দ্বারা তাঁকে নিঃশ্রেয়সের পথে নিয়ে যায়। তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান দেয়। অবিনাশী পরমেশ্বরকে জেনে তিনি সমদর্শী হন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, অপর জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়। সবচেয়ে পবিত্র মন্দির মানুষের শরীর। মানুষ অর্থে দরিদ্র নয়, যার দেহমন্দিরে জ্ঞানের আলো জ্বলেনি, সেই প্রকৃত দরিদ্র। তাই হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হয়। উদ্দেশ্য জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন। দেহাভিমানী আমিই হল জীবাত্মা অর্থাৎ ছোট আমি, কাঁচা

আমি। পরমাত্মা হচ্ছে যে আমি দেহব্যতিরিক্ত, যে আমি সর্বভূতে বিরাজ করছে। সকলের মধ্যে যে আমি, সমষ্টিগত আমি—সেই হচ্ছে পরমাত্মা। সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন। দেহাভিমানী অহং বোধ থাকলে নিজেকে তখন মনে করছি ক্ষুদ্র, দুর্বল, ইন্দ্রিয়ের বশ, দেহের বশ। কিন্তু মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে আমি ক্ষুদ্র বা দুর্বল নই—দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বিশ্বসংসারে এমন শক্তি নেই যা আমার থেকে বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, ঈশ্বরলাভই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জ্ঞানলাভ বা নিজের স্বরূপ-উপলব্ধিই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। আর সকলেরই তাতে অধিকার আছে। ঈশ্বরলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান এ কারও একচেটিয়া নয়। অন্য সব জাগতিক বিষয়ে আমরা বৈষম্য দেখতে পারি—কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার। ঈশ্বরের উপর সবার সমান অধিকার। সবাই পারে তাঁকে দেখতে, যদি সে ঠিক ঠিক ভগবানকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবীকে বলছেন, 'চাঁদামামা সবার মামা। যে তাকে ডাকবে সেই পাবে—তুমি যদি ডাক তুমিও পাবে।'

ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হলে মানুষ অসীম হয়ে যায়। ঈশ্বর অসীম, তাঁর সাথে যখনই আমি কোনওভাবে নিজেকে সম্পর্কিত করতে পারি তখনই আমি অসীম হয়ে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। ভক্ত বলে, সব 'তুমি' অর্থাৎ ঈশ্বর সবই। জ্ঞানী বলে সবই 'আমি' অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। এই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। এই পরিচয়টি আমরা ভুলে আছি। তাই এত দুঃখ পাচ্ছি এবং নিজেকে ক্ষুদ্র ছোট মনে হচ্ছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, জীবনের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর সেই পরিচয়-লাভের যোগ্যতা বা অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সকলেই আমরা ঈশ্বরলাভ করতে পারি বা ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারি।

বাস্তবিক, সব জ্ঞানসম্পদ তো আমারই ভিতরে। এই দেহকে তাই মন্দির বলা হচ্ছে। কারণ, এই দেহের ভিতরেই তিনি, যিনি দেহাতীত, অসীম পরমাত্মা। অধ্যাপক জন হেনরী রাইটকে স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠি লিখছেন—আমি পাহাড়ে, পর্বত-উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছি, মন্দির-মসজিদে আর গির্জায় গেছি, বেদ বাইবেল কোরান সব শাস্ত্র পড়েছি, কত তীর্থস্থানে গেছি আমি—তোমাকে পাব বলে। বাইরে তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি। তোমার কণ্ঠস্বর আমি শুনেছি, কিন্তু কোথায় তুমি বুঝতে পারিনি। শেষে আমি একদিন আবিষ্কার করলাম : তুমি আমারই হৃদয়ে, আমার মধ্যে থেকেই আমাকে ডাকছ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলছেন, 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' (১৮/৬১) সবার অন্তরে তিনি রয়েছেন। চিরকাল রয়েছেন—রাজার গৌরবে তিনি সেখানে বিরাজ করছেন। কিন্তু আমি তা জানি না। বাইরে তাঁকে খুঁজছি। কেউ কেউ আবার মোটেই খুঁজছে না। আমাদের সকলের ভিতর ঈশ্বর রয়েছেন। অথচ আমরা তা জানি না। ভগবান মানবরূপ ধারণ করে আমাদের শিক্ষা দেন। আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা অথবা প্রকৃত গুরু আমাদের

ঋষি, দার্শনিক ও পুরাণকার সকলেই আমাদের বলছেন, এই দুই জ্ঞানই জীবনে অর্জন করতে হবে। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন করা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা। স্বামীজী এই কথাই বলছেন—মানবজীবনের উদ্দেশ্য তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করা।

উপনিষদের যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ ও বর্তমান যুগ পর্যন্ত পিতামাতা তাঁদের পুত্র-কন্যাকে, গুরু তাঁর শিষ্যকে কিংবা অবতার পুরুষ তাঁর পার্ষদকে লক্ষ করে ঐ কথাই বলছেন—জ্ঞানের বিকাশ, অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ বা ঈশ্বরকে জানাই হল জীবনের পরম লক্ষ্য। জ্ঞানলাভের জন্যই জীবনে কষ্ট সাধন এবং পরম সত্য লাভের পথে যাত্রা।

তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন এই নামগুলি আমাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়—বালক নচিকেতা, শ্বেতকেতু, বরুণপুত্র ভৃগু, শৌনক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, আদিরস, বরুণ, ব্যাসদেব, শুকদেব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং অবতারকল্প পুরুষ—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং আরও অনেক ঐতিহাসিক পুরুষ দেশে-বিদেশে পরিচিত। এঁরা সকলেই ঐ এক পরমজ্ঞান-লাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন।

উপনিষদে দেখা যায় পিতামাতা তাঁর পুত্রকে গুরুগৃহে বিদ্যালাভ করার জন্য পাঠিয়েছেন। গুরু আচার্য ঋষি অঙ্গিরা এবং শিষ্য শৌনক। শিষ্য শৌনক গুরুকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করে ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করলেন—'ভগবন্, কস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।' (মুণ্ডক উপনিষদ-১/১/৩) হে ভগবন্, কোন জ্ঞান অর্জন করলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল জ্ঞানবিষয়ে অবগত হওয়া যায়। শৌনক এক প্রশ্নে সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইছেন। গুরু অঙ্গিরা শিষ্যের অপূর্ব প্রশ্নের উত্তরে বললেন—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে—পরা চৈবাপরা চ'। (মুণ্ডক উপনিষদ্-১/১/৪) মানবজীবনে দুটি বিদ্যাই জানতে হবে—অপরাবিদ্যা এবং পরাবিদ্যা। জাগতিক ব্যাবহারিক জ্ঞান এবং পারমার্থিক জ্ঞান। শুধু অপরাবিদ্যা অর্জন করে মানুষ সুখী হতে পারে না। অপরাবিদ্যা মানুষকে জাগতিক ভোগসুখ, ব্যাবহারিক, সামাজিক, দৈনন্দিন জীবনে অর্থ, ঐশ্বর্য, নাম-যশ-প্রতিষ্ঠা দিয়ে জাগতিক অভ্যুদয়ের পথ দেখায়। অপরদিকে পারমার্থিক জ্ঞান মানবকে যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানালোকের দ্বারা তাঁকে নিঃশ্রেয়সের পথে নিয়ে যায়। তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্বের সন্ধান দেয়। অবিনাশী পরমেশ্বরকে জেনে তিনি সমদর্শী হন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, অপর জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। সেই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়। সবচেয়ে পবিত্র মন্দির মানুষের শরীর। মানুষ অর্থে দরিদ্র নয়, যার দেহমন্দিরে জ্ঞানের আলো জ্বলেনি, সেই প্রকৃত দরিদ্র। তাই হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হয়। উদ্দেশ্য জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন। দেহাভিমানী আমিই হল জীবাত্মা অর্থাৎ ছোট আমি, কাঁচা

আমি। পরমাত্মা হচ্ছে যে আমি দেহব্যতিরিক্ত, যে আমি সর্বভূতে বিরাজ করছে। সকলের মধ্যে যে আমি, সমষ্টিগত আমি—সেই হচ্ছে পরমাত্মা। সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন। দেহাভিমানী অহং বোধ থাকলে নিজেকে তখন মনে করছি ক্ষুদ্র, দুর্বল, ইন্দ্রিয়ের বশ, দেহের বশ। কিন্তু মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে আমি ক্ষুদ্র বা দুর্বল নই—দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বিশ্বসংসারে এমন শক্তি নেই যা আমার থেকে বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, ঈশ্বরলাভই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জ্ঞানলাভ বা নিজের স্বরূপ-উপলব্ধিই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। আর সকলেরই তাতে অধিকার আছে। ঈশ্বরলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান এ কারও একচেটিয়া নয়। অন্য সব জাগতিক বিষয়ে আমরা বৈষম্য দেখতে পারি—কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার। ঈশ্বরের উপর সবার সমান অধিকার। সবাই পারে তাঁকে দেখতে, যদি সে ঠিক ঠিক ভগবানকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবীকে বলছেন, 'চাঁদামামা সবার মামা। যে তাকে ডাকবে সেই পাবে—তুমি যদি ডাক তুমিও পাবে।'

ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হলে মানুষ অসীম হয়ে যায়। ঈশ্বর অসীম, তাঁর সাথে যখনই আমি কোনওভাবে নিজেকে সম্পর্কিত করতে পারি তখনই আমি অসীম হয়ে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। ভক্ত বলে, সব 'তুমি' অর্থাৎ ঈশ্বর সবই। জ্ঞানী বলে সবই 'আমি' অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। এই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। এই পরিচয়টি আমরা ভুলে আছি। তাই এত দুঃখ পাচ্ছি এবং নিজেকে ক্ষুদ্র ছোট মনে হচ্ছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, জীবনের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর সেই পরিচয়-লাভের যোগ্যতা বা অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সকলেই আমরা ঈশ্বরলাভ করতে পারি বা ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারি।

বাস্তবিক, সব জ্ঞানসম্পদ তো আমারই ভিতরে। এই দেহকে তাই মন্দির বলা হচ্ছে। কারণ, এই দেহের ভিতরেই তিনি, যিনি দেহাতীত, অসীম পরমাত্মা। অধ্যাপক জন হেনরী রাইটকে স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠি লিখছেন—আমি পাহাড়ে, পর্বত-উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছি, মন্দির-মসজিদে আর গির্জায় গেছি, বেদ বাইবেল কোরান সব শাস্ত্র পড়েছি, কত তীর্থস্থানে গেছি আমি—তোমাকে পাব বলে। বাইরে তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি। তোমার কণ্ঠস্বর আমি শুনেছি, কিন্তু কোথায় তুমি বুঝতে পারিনি। শেষে আমি একদিন আবিষ্কার করলাম : তুমি আমারই হৃদয়ে, আমার মধ্যে থেকেই আমাকে ডাকছ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় বলছেন, 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' (১৮/৬১) সবার অন্তরে তিনি রয়েছেন। চিরকাল রয়েছেন—রাজার গৌরবে তিনি সেখানে বিরাজ করছেন। কিন্তু আমি তা জানি না। বাইরে তাঁকে খুঁজছি। কেউ কেউ আবার মোটেই খুঁজছে না। আমাদের সকলের ভিতর ঈশ্বর রয়েছেন। অথচ আমরা তা জানি না। ভগবান মানবরূপ ধারণ করে আমাদের শিক্ষা দেন। আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা অথবা প্রকৃত গুরু আমাদের

চোখ খুলে দেন। দেখাতে শেখান যে, আমাদের হৃদয়মধ্যেই তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর বিরাজ করছেন। তাঁরা যে বাইরে থেকে একটা জিনিস এনে আমার হাতে তুলে দেন, তা নয়। যা সবার মধ্যে রয়েছে, সেই শক্তিই আমার মধ্যেও রয়েছে, তাকে তাঁরা জাগ্রত করে দেন।

এখানে আচার্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্য রাজপুত্র শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরাবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন। সেই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার নাম গীতা। সংক্ষেপে আমরা যাকে গীতা বলি, তার সম্পূর্ণ নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'—অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত বা গীত আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। মানুষকে ঈশ্বরমুখী ও কর্মমুখী করাই এই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। গীতার বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা। গীতায় ভগবান ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথের শিক্ষা দিয়েছেন। অর্জুনকে লক্ষ করে ভগবান সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঐ শিক্ষা দিচ্ছেন। জাগতিক বিষয় চিন্তা থেকে চৈতন্যের চিন্তায় মনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। চৈতন্যের উপলব্ধিই মানুষকে আত্যন্তিক সুখ ও শান্তি দিতে পারে। মানুষ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে থেকে স্বধর্ম পালন করেই ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করবে। তাই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান অর্জুনকে ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। ভগবান বলছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করেই অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ হবেন। এই উদাহরণই ভবিষ্যৎ সকল যুগে সকল মানুষের জীবন গঠনে একমাত্র সহায় হয়ে থাকবে। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব বা অনন্ত শক্তির আধার রয়েছে, মানুষ নিজের পুরুষকারের দ্বারা স্বধর্ম পালন করে বা সেই দেবত্ব এবং অনন্ত শক্তিকে নিজের মধ্যে প্রকাশিত করে অমৃতত্ব লাভ করবে।

ভগবানের মুখ থেকে গীতারূপ অমৃতধারা উৎসারিত হয়ে শুধু অর্জুনকেই মোহ থেকে মুক্ত করেনি, যুগ যুগ ধরে তাপদগ্ধ নরনারীর প্রাণকে শীতল করেছে। ভারতীয় দর্শনের মুকুটমণি হচ্ছে বেদান্তদর্শন এবং এই দর্শনের তিনটি মূল আকরগ্রন্থ হচ্ছে উপনিষদ্‌সমূহ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের সারভূতা এবং স্বয়ং একখানি উপনিষদ্। গীতা আমাদের সবার কাছে স্নেহময়ী জননীর মতো হিতকারিণী, গীতার বাণী নিখিল মানবের কর্ণে নিত্যকাল অমৃতবর্ষিণী। গীতার ধ্যানেও বলা হয়েছে, 'হে মাতঃ, আপনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃতা, প্রাচীন মুনি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে প্রথিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্তা, অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃত আপনি বর্ষণ করেন, আপনি মুক্তিদায়িনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি।'

ভগবদ্গীতার বাণী সনাতনী, সর্ব দেশের, সর্ব কালের মানুষের হৃদয়গ্রাহিণী, তাই এই গ্রন্থখানির গৌরব আজও অম্লান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আচার্যগণ এবং আধুনিক কালের ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ গীতার ওপর কত নব-নব চিন্তার আলোকপাত করেছেন, তবু গীতার ব্যাখ্যা আজও শেষ হয় নি, কোনও দিন শেষ হবে বলেও মনে হয় না।

ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গীতার স্থান করে

দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের সৈন্যদল মুখোমুখি ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময় অর্জুন তাঁর সখা ও সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন দুই দলের মাঝখানে রথ স্থাপন করতে। রথ স্থাপিত হলে অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের নিকট আত্মীয়। তাই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য পালনে প্রত্যাখ্যান করে বলে বসলেন, আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে স্বধর্ম পালন ও কর্তব্যে প্রণোদিত করতে উপদেশ ও নির্দেশ দিতে আরম্ভ করলেন। ভগবানের প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশাবলী নিয়েই গীতা। তাই গীতার ভূমিকা, পরিক্রমা ও দার্শনিক দিক চিন্তা করতে গেলে আমাদের সনাতন ধর্মের সামান্য পরিচয়ের প্রয়োজন।

সনাতন ধর্ম কি ও কেন?—মানুষের ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস। কোন ধর্ম? যে ধর্ম মানুষকে সত্যের পথে নিয়ে যায়, অনিত্য থেকে নিত্যে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে, 'অল্প' থেকে 'ভূমায়' নিয়ে যায়, যে ধর্ম তাকে 'নিঃশ্রেয়স' পাইয়ে দেয়, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পথে নিয়ে যায়। সে নিজেই ঈশ্বর হয়ে যায়। তখন সে নিজের মধ্যে এবং সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করে। বাস্তবিক জীবের মধ্যে সেই ঈশ্বরেরই প্রকাশ ঘটায় সনাতন ধর্ম।

এই জীব, জগৎ, পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)—সবকিছুরই এই ব্রহ্ম থেকে উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই লয়। উপনিষদ বলছেন—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,৩/৬) আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই এই সকল প্রাণীর আবির্ভাব। আনন্দের দ্বারা পালিত হয়, বর্ধিত হয় আবার ধ্বংসে আনন্দেই ফিরে যায় অর্থাৎ তাতেই লীন হয়। তাঁকে লাভ করলে মানুষ আনন্দময় হয়। এই আনন্দ ক্ষণিক আনন্দ নয়, যে আনন্দের ক্ষয় নেই এমন আনন্দ—ভূমানন্দ। ভূমাকে লাভ করলেই ভূমানন্দকে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, ঈশ্বর—পরম সত্যকে জানলেই ভূমানন্দকে পাওয়া যায়। তাই জীবের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম। সমস্ত শাস্ত্র সেই পরম সত্য লাভের উপদেশ দেয়।

প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে, ধর্ম কোনও জাদু নয়, কোনও ম্যাজিক নয়। ধর্ম মানুষের জীবনকে ধারণ করে রাখে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এক। ধর্ম মানে জীবনে কতগুলি সৎ গুণের প্রকাশ, কায়-মনো-বাক্যে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, ত্যাগ, সংযম তপস্যাই ধর্ম। ধর্ম মানে চরৈবেতি। ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি। পাপ নয়, ভুল করে মানুষ। আবার চেষ্টা করলে মানুষ সৎ হতে পারে, ক্ষুদ্রতর সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যের দিকে যেতে পারে। ঋষির যেমন একটি অতীত আছে, তেমন পাপীরও একটি ভবিষ্যৎ আছে।

প্রকৃত অর্থে ধর্মও একটা বিজ্ঞান। কোন অর্থে বিজ্ঞান? যেমন বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি সত্য, পরীক্ষিত সত্য, তেমনি ধর্মও পরীক্ষিত সত্য। বিজ্ঞানচর্চা করতে গেলে যেমন একটা সুনির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে হয় তেমনি ধর্মক্ষেত্রেও তাই। দুটোর মধ্যে তফাত এই

যে, আপনি বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে একটা সত্যকে জানলেন, কিন্তু তার দ্বারা আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের খুব একটা পরিবর্তন ঘটবে না। আপনি খুব বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, আপনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আপনি অনেক পুরস্কার পাবেন, সম্মান পাবেন। কিন্তু আপনি যদি ধর্মকে সহায় করে এই সত্যের দিকে এগিয়ে যান তাহলে আপনার চরিত্র পালটে যাবে। আপনার যে পরিবর্তন ঘটবে সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। দেখবেন আপনি অন্যরকমের মানুষ হয়ে গেছেন।

একটা কথা আছে, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুণ্ডকো উপনিষদ-৩/২/৯) ধর্ম মানে শুধু জানা নয়, হওয়া। 'To know is to be'–আমি অনেক কিছু জানলাম, কিন্তু আমার জীবনের কোনও পরিবর্তন ঘটল না। মানুষ হিসাবে আমার কোনও উন্নতি হল না। আমি সেই স্বার্থপর রইলাম, সেই হিংস্র, কুটিল রইলাম। তাহলে আমার কিছু লাভ হল না। শাস্ত্রে আছে—'ফলেন পরিচীয়তে বৃক্ষঃ'। আপনি ঈশ্বরলাভ করেছেন কী করেননি, আপনি সত্য জেনেছেন কী জানেননি, তা আমি বুঝতে পারব আপনাকে দেখে। আপনাকে দেখলে, আপনার কাছে গেলে, আপনার সাথে মিশলে আমি বুঝতে পারব, হ্যাঁ আমি একজন উন্নত ধরনের মানুষের কাছে এসেছি। যে অষ্টাঙ্গ-মার্গরূপ সাধন-বিজ্ঞানের দ্বারা ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন সেই বিজ্ঞানকে আমরা ধর্ম বলছি।

ধর্ম জিনিসটা যদি একটা পরীক্ষিত সত্য না হত তাহলে এর কোনও মূল্যই থাকত না। শুধু একটা মিথ্যা আশায় আমরা ঘুরে বেড়াব-এ কখনও হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন যে, তুমি যতই হিমালয়ের দিকে এগিয়ে যাবে ততই শীতলতা অনুভব করবে। তেমনি ধর্মজগতেও আমরা যতই অগ্রসর হব ততই বুঝতে পারব যে, এটা মিথ্যা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলতেন যে, তুমি কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছ, সেই মাটির তলায় মোহরের একটা কলসি আছে। কিন্তু তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না। খুঁড়তে খুঁড়তে কোদাল কলসির কানায় লেগে ঠং করে শব্দ হল, অমনি তুমি বুঝতে পারলে যে কলসি খুব কাছেই আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন: 'Religion is realization'। যদি এটা পরীক্ষিত সত্য না হত, যদি এটা আমি অনুভব না করতে পারতাম, তাহলে মানুষ তাতে তৃপ্ত হত না। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে-তুমি লোকের মুখে শুনলে যে আকাশে চাঁদ উঠেছে কিন্তু তাতে তোমার কী এসে যায়? তুমি যতক্ষণ না নিজের চোখে চাঁদকে দেখছ ততক্ষণ তুমি আনন্দ পাবে না। এই জন্যে আমাদের শাস্ত্রে অপরোক্ষ অনুভূতির উপর এত গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ আমি নিজে দেখব, নিজে জানব, তবে আমার তৃপ্তি হবে। এই অনুভূতি সম্ভব। এটা যদি সম্ভব না হত, কেবলমাত্র কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে লোকে তা বিশ্বাস করত না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—সত্যি বলছি, ঈশ্বর বলে একজন আছেন। তাঁকে অনুভব করা যায়, জানা যায়, কথা বলা যায়। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রথমে এসেই

শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলেন: 'দেখেছি বইকি, এই যেমন তোমাকে দেখছি তার চেয়েও স্পষ্ট করে দেখেছি। বাইরে এবং অন্তরে, সর্বভূতে এবং সমাধিতে, দ্বৈত এবং অদ্বৈত—সব অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়। আর তুমি যদি দেখতে চাও তোমাকেও দেখাতে পারি।' এ যদি তিনি নিজে অনুভব না করতেন, কেবল শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করতেন, তাহলে সে কথার মধ্যে এত জোর থাকত না।

ধর্ম হচ্ছে অনুভূতি, উপলব্ধি। ধর্মলাভ করা কথাটাও ঠিক নয়। ধর্ম মানে হওয়া। ধর্ম হচ্ছে নিজেকে নিজে গড়া। ধর্ম কোনও বাইরের জিনিস লাভ নয়। ধর্মের আর এক অর্থ অভ্যুদয়, উন্নতি, অগ্রগতি। স্বামীজী বলতেন: ধর্মের ফলে একজন উকিল ভাল উকিল হবে, একজন শিক্ষক ভাল শিক্ষক হবে, প্রত্যেকে তার নিজের অবস্থা থেকেই উন্নতি করবে। প্রথমে এই অগ্রগতি বৈষয়িক স্তর থেকে শুরু হলেও শেষে তা আধ্যাত্মিক স্তরে, নিঃশ্রেয়স অবস্থায় পৌঁছাবে। যেমন আপনি একখণ্ড পাথরকে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে প্রতিদিন তিলে তিলে আপনার মনের মতো রূপ দিচ্ছেন। আপনি হয়তো বুদ্ধের মূর্তি গড়ছেন। বুদ্ধের এক বিশেষ রূপ আপনার মনে ভাসছে। আপনি ধীরে ধীরে সেই রূপ তাতে ফোটানোর চেষ্টা করছেন। শেষে আপনি একদিন একটা সুন্দর মূর্তি তৈরি করলেন, আপনি সফল হলেন। তেমনি ধর্ম হচ্ছে এমন একটা আদর্শ বা ছাঁচ, যাকে সামনে রেখে আপনি নিজেকে মনের মতো গড়তে পারবেন। ধর্ম যেন একটা 'commitment', একটা আদর্শ, সেই আদর্শকে লক্ষ্য রেখে আমি ধীরে ধীরে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হব। আমি কায়মনোবাক্যে সেই আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকব। এক কথায় ধর্ম মানে 'হওয়া'।

জপ-তপ, পূজা-পার্বন, আচার-অনুষ্ঠান এগুলো ধর্মের বহিরঙ্গ দিক। কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তরণ। আমরা কেউ অল্পে সন্তুষ্ট হই না, আমরা ভূমাকে লাভ করতে চাই। কিসের যেন একটা অতৃপ্তি আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। খ্রীস্টান ধর্মে একে বলে—-'divine discontent'। আমি যেখানে আছি সেখানেই আমি থেমে থাকতে পারি না। সকলের মনেই কিসের যেন একটা অতৃপ্তি, অপূর্ণতা, অভাববোধ বিরাজ করছে। কেউ মনে করছে অর্থ পেলে তার সেই অভাববোধ কেটে যাবে, কেউ ভাবছে বিদ্যালাভ করলে তার অভাববোধ দূর হয়ে যাবে, কেউ ভাবছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করলে তার আর অভাববোধ থাকবে না, আবার কেউ বা ভাবছে—আমি যদি ঈশ্বরলাভ করতে পারি তাহলে আমার সব অভাব মিটে যাবে। ঈশ্বরলাভ করা মানে ঈশ্বর হওয়া। একমাত্র মানুষই এই ঈশ্বরলাভ করতে পারে। কারণ একমাত্র মানুষই মনন করতে পারে, ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'মান হুঁশ' অর্থাৎ যে তার নিজের চৈতন্য বা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন—সে-ই মানুষ। সেই জন্যে

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ। কিন্তু মানুষ যদি ধর্মহীন হয় তাহলে সে পশুর সমান। শাস্ত্র তাই বলেছেঃ 'ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ'। আজকাল পাশ্চাত্যদেশের মানুষেরাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে যে, কেবল ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল থাকাই জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না, এর চেয়েও মহৎ কিছু আছে। বাইরের প্রাচুর্যই সব নয়। ধর্মের ফলে মানুষ আরও ভাল মানুষ হয়। ধর্মের দ্বারা মানুষ শান্ত, সংযত, উদার, প্রেমিক, নিঃস্বার্থ, বিনয়ী হয়। এই জন্যেই ধর্মও একটা বিজ্ঞান।

ধর্মের দুটো অর্থ আছে। এক অর্থে, ধর্ম—যা আমাদের ধারণ করে রাখে, অন্য অর্থে, ধর্ম হচ্ছে গুণ বা প্রকৃতি। যেমন আগুনের ধর্ম উত্তাপ দেওয়া, জলের ধর্ম শৈত্য ইত্যাদি। তেমনি মানুষের ধর্ম হচ্ছে—সে চিন্তা করতে পারে, ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে, সে অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু একটা ইতর প্রাণী তা পারে না। সে অল্পেই খুশি। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা অতৃপ্তি রয়েছে, শুধু পার্থিব বস্তুতে সে সন্তুষ্ট হয় না। একটা শিশু চকলেট পেলেই খুশি। কিন্তু যখন সে স্কুলে পড়ে তখন পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেলে খুশি হয়। বয়স বাড়লে তখন তার গান ভাল লাগে, কবিতা ভাল লাগে, ছবি ভাল লাগে। আরও বড় হলে সূক্ষ্ম চিন্তা করতে ভাল লাগে, মহৎ আদর্শ ভাল লাগে। বড় হওয়ার সাথে সাথে তার কাছে আনন্দের সংজ্ঞাও বদলে যায়, দৃষ্টি পালটে যায়। আমরা ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই এগিয়ে যাওয়াটা দৈহিক নয়, অন্তর্মুখীন, মানসিক। সত্যি সত্যিই যে ধর্মের দিকে এগোয় তার বাইরের চালচলনেও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তার আচার-ব্যবহারে একটা আভিজাত্য দেখা যায়। সে আভিজাত্য অর্থের আভিজাত্য নয়, চারিত্রিক পবিত্রতার আভিজাত্য। সে যেখানে থাকে, সেখানে এক বিশেষ পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে ভালবাসে। সবাই দেখে যে, এ এক নতুন মানুষ। সকল মানুষের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ মানুষ। পৃথিবীতে সেই মানুষই পূজার আসনে বসে। সেই মানুষের অনুভূতি ও শাস্ত্রের কথা এক।

শাস্ত্র অর্থাৎ যা আমাদের শাসন করে, পরিচালিত করে, প্রেরণা দেয়। আমাদের বেদ, বেদান্ত এবং ধর্মপুস্তকসকল ঋষি ও অবতারপুরুষগণের উপলব্ধিপ্রসূত আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দেয় এবং আমাদের অজ্ঞানতা দূর করে বিবেকজ্ঞান জাগ্রত করে। সব ধর্মেরই এক বা একাধিক ধর্মগ্রন্থ আছে। প্রত্যেক ধর্মে বিভিন্ন পথের কথা বলা আছে এবং সকল ধর্মেই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যও আছে। মোটামুটি এই চার রকমের (জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ) বৈশিষ্ট্য আমরা প্রত্যেক ধর্মেই দেখতে পাই। তাছাড়া আমরা সব ধর্মেই প্রধানতঃ দুটো দিক দেখতে পাই। একটা ধর্মের মুখ্য দিক আর একটা হচ্ছে গৌণ। ধর্মের গৌণ দিকটা হল—যদিও সব ধর্মের মূল তত্ত্ব এক, তবু মানুষ ও পরিবেশভেদে ধর্মমত অনেক। একটা কথা আছে: 'Religion is one but religions are

many' পরিবেশের পার্থক্য ও মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ধর্মমতের বিভিন্নতা অপরিহার্য।

সব ধর্মেরই মুখ্য বক্তব্য এক। সত্যই ধর্ম। একজন পণ্ডিতের উক্তি: 'There is only one religion though there are a hundred versions.' ধর্মের আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে—'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণসব্রবীন্মনুঃ।। (মনুসংহিতা) মনু বলেছেন, ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে অহিংসা। অহিংসা মানে সর্বভূতে দয়া। তারপর সত্য। আমাদের শাস্ত্রে সর্বত্র সত্যের জয়গান করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সত্যই কলিযুগের তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা। শৌচ—শৌচ দু-রকমের—আন্তর শৌচ ও বাহ্য শৌচ। আর আছে—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। সংযম অভ্যাস করতে হয়, সাধনা করতে হয়, তপস্যা করতে হয়। সেইজন্যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বলে: 'তপঃ তপঃ তপঃ'। তপস্যা কর। নিঃশেষে নিজেকে পেষণ কর, মন্থন কর। শেষ পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে—'ন ধনেন ন প্রজয়া কর্মণা ত্যাগেনৈকে-অমৃতত্বমানশুঃ।' (কৈবল্যোপনিষদ্,১/২) একমাত্র ত্যাগের পথ দিয়েই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। ত্যাগ অর্থাৎ বৃহতের জন্যে ক্ষুদ্রের ত্যাগ। সব চেয়ে বৃহৎ হচ্ছে আত্মজ্ঞান, নিজেকে জানা। তার কাছে সব কিছু তুচ্ছ। জ্ঞানের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' (গীতা, ৪/৩৮) জ্ঞান পবিত্র, কারণ তা অজ্ঞান দূর করে দেয়। অজ্ঞানতা মানে মলিনতা, মনের মলিনতা। যে-কোনও জ্ঞান সম্পদ, তবে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের জন্যে সবকিছু ত্যাগ করা চলে। শুধু বেদ নয়, সকল শাস্ত্র এই ত্যাগের কথা বলে। উদ্দেশ্য - মানুষকে স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগের ক্ষণিক সুখ থেকে স্থায়ী অতীন্দ্রিয় আনন্দের স্বাদ দেওয়া, বিষয়ানন্দ থেকে ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পাইয়ে দেওয়া। এ আনন্দকে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকে, কিন্তু বস্তু এক। এই আনন্দ পাবার জন্যে ত্যাগ চাই, সংযম চাই, সাধন চাই, আত্মনিগ্রহ চাই। তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব। 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।' (তৈঃ উপঃ, ৩/৪) এই তপস্যাই ব্রহ্ম। তপস্যার দ্বারাই সত্যকে জানা যায়। শাস্ত্র-সাধনা এই তপস্যার অঙ্গ।

ধর্মের লক্ষ্য—ঐক্য অর্থাৎ সকলের সঙ্গে একাত্মতা। আমি বিশ্বের মধ্যে, বিশ্বও আমার মধ্যে। 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।' (ঈশঃ উপঃ, ৬) যিনি সকলকে নিজের মধ্যে দেখেন এবং সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না। কে কাকে ঘৃণা করবে? সবাই তো এক। আমরা শান্তির কথা শুনি, অহিংসার কথা শুনি। শান্তি, অহিংসা, প্রেম—এসবের পিছনে এই একাত্মতা, ঐক্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন - 'বিশ্ববোধ'। এই ঐক্য সম্ভব নিঃস্বার্থ প্রেমের দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা।

ধর্মের মুখ্য সাধন হল নিষ্কাম কর্ম, প্রেম, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি

করা। জীবনে কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণই হচ্ছে ধর্ম। শুধু বড় কাজে নয়, ছোট কাজেও। সত্যই তপস্যা, এই তপস্যা সমগ্র জীবন জুড়ে। আমাদের শাস্ত্রে সর্বত্র সত্যের জয়গান করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সত্যই কলিযুগের তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। সংক্ষেপে এই ধর্মের মূল তত্ত্ব ও সাধন হল—সত্য, প্রেম, ত্যাগ ও সেবা।

ধর্ম এই নিত্য সত্যের কথা বলে, এই নিত্য সত্যের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। ধর্ম দেখিয়ে দেয় এই নিত্যসত্যই আমাদের প্রকৃত সত্তা। তাই ধর্ম আমাদের ধারণ করে রাখে। শাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, সভ্যতা, ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবন—সব কিছুই ধর্মের উপর, অর্থাৎ সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছুই ওই সত্যের প্রকাশ। এই সত্যই শিব, এই সত্যই সুন্দর, এই সত্যই ধর্ম।

এই সত্যের তপস্যা দ্বারা আত্মাকে লাভ করতে পারা যায়। 'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।' (মুণ্ডকঃ উপঃ, ৩/১/৫) আত্মাকে লাভ করা মানে বাইরের কোনও বস্তুকে লাভ করা নয়। আত্মাকে জানা, অর্থাৎ নিজের পূর্ণস্বরূপকে চেনা, নিজের পূর্ণতাপ্রাপ্তি। যে সম্ভাবনা নিজের মধ্যে সুপ্ত আছে, তাকে বাস্তবায়িত করা। এই পূর্ণতালাভকেই বলা হয় 'বৃহত্তম' (ব্রহ্ম) লাভ, পরমলাভ। ব্রহ্মবিদ হওয়া মানে ব্রহ্ম হওয়া—'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।'(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২/১/৩) এই লাভকেই বলা হয় 'অমৃতত্ব'লাভ, 'নিঃশ্রেয়স' লাভ, শ্রেষ্ঠলাভ। সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য পূর্ণতালাভ। শাস্ত্রচর্চা, সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা, যে চর্চাই করি না কেন, উদ্দেশ্য হবে পূর্ণতালাভ—যে পূর্ণতা আমার মধ্যে সুপ্ত আছে। আমরা 'ক্ষুদ্র' আছি, 'মহৎ' হব—এই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। এই সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। 'ন হি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ।...' (মহানির্বাণতন্ত্র) এই সত্যের সাধনাই প্রকৃত ধর্ম। প্রতিদিনের জীবনচর্যা এই সত্যের সাধনা। যা ভাবি, যা বলি, যা করি—সবই সত্যের প্রকাশ। সত্য থেকে বিচ্যুতি মহতী বিনষ্টি, মৃত্যু। তাই উপনিষদে আচার্য শিষ্যকে শিক্ষা দিচ্ছেন—'সত্যং বদ। ধর্মং চর।...সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১/১১/১) সর্বদা সত্য কথা বল। শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে ধর্মের আচরণ কর। সত্য থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না। ধর্ম ও শাস্ত্র অনুসারে কর্তব্য সম্পাদন থেকে বিচ্যুত হবে না, আত্মরক্ষার্থে অবহেলা করো না এবং নিজের উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়ো।

Eckhart-এর একটা কথা 'God's being'—ঈশ্বরের চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই, ঈশ্বরের চেয়ে বড় সর্বগুণবান আর কেউ নেই। তাঁর ছাঁচে, তাঁর মতো করে আমি নিজেকে গড়বার চেষ্টা করছি। তাঁর কোনও একটা গুণ নিয়েছি তা নয়। আমি, তিনি যা তাই হবার চেষ্টা করছি।

Eckhart-এর আর একটা কথা আছে: 'Know your true self...reach

into your own treasure.' অর্থাৎ তোমার মধ্যেই রয়েছে অনন্ত ভাণ্ডার। তোমার মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন, সেই ঈশ্বরকে তুমি জান, তাঁকে তুমি উদ্ভাসিত কর। 'যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' বাইরের কোন বস্তু নয়, অন্তরের ঐশ্বর্যই মহত্ত্ব। নিজের মধ্যে যে রত্নভাণ্ডার তাকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই সংস্কৃতির সার্থকতা। আমাদের ভূষণ ধর্ম, আমাদের ভূষণ সত্য, বিনয়, প্রেম, সমদর্শিতা, পবিত্রতা। এই হচ্ছে ভারতের সংস্কৃতি, আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'Each soul is potentially divine and our goal is to manifest that divinity'.—তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কী প্রার্থনা করব জগন্মাতার কাছে। তিনি বলছেন, 'মা, আমায় মানুষ কর।' কী রকম মানুষ, তাও দেখিয়ে গেলেন—নর-ঋষি, নর-সিংহ, নরোত্তম—এই ধর্ম।

আর্যসভ্যতা—ভারতের প্রাচীন সভ্যতাই আর্যসভ্যতা। আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছে, ভারতীয়রা অনার্য ছিল। আর্যরা তাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে দাস বানিয়ে এদেশের অধিকার নিয়েছে—পাশ্চাত্য ইংরেজদের ভাবনায় এরূপ লেখা ইতিহাস সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—ওসব আহাম্মকদের কথা। আমাদের ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেমেয়েদের শেখানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়। কোন বেদে, কোন সূক্তে, কোথায় দেখছ যে আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এসেছে? ইংরেজদের লক্ষ্য ছিল ভুল ইতিহাস লিখে ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ ধ্বংস করা। সবাইকে ধ্বংস করে তারা বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু ভারতের ধর্ম হলো সবাইকে সমান করতে হবে। শুধু সমান নয় আমাদের চেয়েও বড় করব। এটাই আর্য সভ্যতা। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—সবাইকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করা, অতিথির মধ্যেও দেবতাকে দেখা। তাই আর্য সমাজে চার বর্ণের বিভাগ করে দুর্বলকে রক্ষা করা হয়েছে। তাই বিবেকানন্দ বলছেন—স্বদেশীরা আহাম্মক! যদি আর্যরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত তাহলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হতো? সেবা ও পূজায় আর্যসভ্যতা সমৃদ্ধ ছিল। এই উন্নত আর্যজাতি ভারতের আদি সভ্যতা এবং ভারতের আদি বাসিন্দা। এঁরা বাইরে থেকে আসেনি। এঁদের সৃষ্টি উন্নত দর্শন এবং জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করেছিলেন এই ভারতবর্ষকে। ভারতবর্ষ বারংবার লুণ্ঠিত হয়েছে এবং ইংরেজরা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আর্যগৌরবকেও কৌশলে লুঠ করতে চায়।

যাইহোক আর্য সভ্যতা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা। আর্য শব্দের অর্থ—সাধু, স্বামী, শ্রেষ্ঠ, মান্য, পূজ্য, সুসভ্য ইত্যাদি। আর্যজাতি ছিল সুসভ্য জাতি। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য আর্য জাতির সৃষ্টি এবং সেখানে কোথাও উল্লেখ নেই যে তারা বহিরাগত। পরন্তু সেখানে তারা উল্লেখ করেছে ভারতবর্ষের হিমালয়, সরস্বতী নদী, সিন্ধু, পঞ্চনদ, গঙ্গা ও ভারতের ভৌগলিক অবস্থার কথা ইত্যাদি। অতএব উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের

পাদদেশে সরস্বতী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সরস্বতী নদী বিস্তৃত ছিল। সরস্বতী তীরে ঋষিগণ অতি প্রাচীন ঋক্‌বেদ সৃষ্টি করেছিলেন। পরে এখান থেকেই আর্যরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু উত্তর পশ্চিমে, কিছু গাঙ্গেয় অঞ্চলে, কিছু দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতের দক্ষিণে দ্রাবিড় সভ্যতাও এই আর্য সভ্যতার অংশ। তাদের মধ্যে শুধু ভাষাগত পার্থক্য ছাড়া আর কিছু ভিন্নতা নেই। সমস্ত ভারতবর্ষ-ই আর্য, অন্য কিছু নয়। দ্রাবিড়রাও আর্য ও ভারতীয়। আর্য ও দ্রাবিড় এক সভ্যতার উত্তরসূরি।

সনাতন ধর্ম— সনাতন অর্থাৎ শাশ্বত, চিরন্তন সত্য। সনাতন শব্দের অর্থ—যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। সত্য চির নিত্য—অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। একমাত্র সত্যই চির নিত্য। যে ধর্ম সেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বা যে ধর্ম সেই সত্যকে অনুসন্ধান করে তাকেই সনাতন ধর্ম বলে। এক কথায় তাকে 'সত্য-ধর্ম' বলা চলে। এই ধর্ম বলে, এই পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে এক চরম সত্য বিরাজ করছে। এই পরিবর্তনশীল জগৎ সেই নিত্য-সত্যের উপর প্রকাশিত। এই দেশ, কাল ও নিমিত্তের গণ্ডীর বাইরে—অনন্তস্বরূপ এক চৈতন্য বিরাজ করছে। সেই সত্যকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। সেই সত্যই—সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। ভারতের বেদভিত্তিক ধর্মই সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ বেদ ও সনাতন ধর্ম এক।

ঋগ্বেদই সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রন্থ। সনাতন ধর্মই সকল ধর্মের মাতৃস্বরূপ। সনাতন ধর্মই বলে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। একই সত্য বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ঋগ্বেদ বলছে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

শাস্ত্র সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়—'শ্রুত্যুক্তঃ পরমো ধর্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতোঽপরঃ। শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রয়ো ধর্মাঃ সনাতনাঃ।।—**এই ধর্ম শ্রুতি** বা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্ম, স্মৃতিশাস্ত্রের নীতি যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ, এবং তত্ত্বজ্ঞানী অবতার পুরুষগণের শিষ্টাচার পরম্পরাক্রমে অনুসরণ—এই তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ধর্মই সনাতন ধর্ম নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

'সত্যং, দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জ্জবম্। জ্ঞানং শমো দয়া দানমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।'—**সত্য**, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপস্যা, পবিত্রতা, সন্তোষ, লজ্জা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, শান্তি, দয়া ও দান—এই সকল সনাতন ধর্মের দৈবী সম্পদ।

'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।'—**সত্য** বাক্য বলবে, প্রিয় বাক্য বলবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বাক্য বলবে না। আর প্রিয় অথচ মিথ্যা বাক্যও বলবে না—এই সনাতন ধর্ম।

'দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনম্। তৃষ্ণার্ত্তস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্।।

চক্ষুর্দ্দদ্যাৎ মনোদদ্যাৎ বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতম্। উত্থায় চাসনং দদ্যাৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।'—**পীড়িত** ব্যক্তিকে শয়নের শয্যা দান করবে, ক্লান্ত ব্যক্তিকে আসন দান করবে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে জল প্রদান করবে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দান করবে, গৃহে আগত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত, মন দিয়ে আপ্যায়ন করবে ও মিষ্ট বাক্য বলবে—এইরূপ সেবাকর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়ে থাকে।

'ধর্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানান্মোক্ষোঽধিগম্যতে। ইজ্যাধ্যয়নদানানি যথাশাস্ত্রং সনাতনঃ।।'—**ধর্ম অনুশীলন** হতে সুখ ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞান হতে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে এবং শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদ অধ্যয়ন এবং দানকেই সনাতন ধর্ম বলা হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক সাধনা ও ঈশ্বর সাধনার ভিতর দিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুবর্গ লাভই উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম—আমরা হিন্দুরা 'আর্য' নামক একটি সভ্যতার পূর্ব-পুরুষ ঋষিদের সন্তান। আর্যজাতি যেখানেই গিয়েছে, সেই সমাজে তিনটি বৈশিষ্ট দেখতে পাব—সমাজব্যবস্থা, নারীর অধিকার এবং একটি আনন্দপূর্ণ ধর্ম। সমাজব্যবস্থা বর্ণাশ্রম কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, নারী ও পুরুষ উভয়ের জ্ঞান লাভে সমান অধিকার, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ঈশ্বর এবং ধর্ম জাতির মেরুদণ্ড।

হিন্দুধর্মের যথার্থ নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম বলতে আমরা সেই ধর্মকেই বুঝব যে-ধর্মের মূল আশ্রয় বেদ। বেদ-শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানলাভই (ঐহিক ও আধ্যাত্মিক) এই ধর্মের উদ্দেশ্য। সনাতন অর্থাৎ সত্য যা নিত্য—এক অদ্বৈত তত্ত্বই প্রকাশ করে। বেদ হল হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। শুধু আধ্যাত্মিক ধর্মই নয়, হিন্দুর ধর্ম, দর্শন, পূজাপদ্ধতি, উপাসনা, ক্রিয়া-কর্ম, ব্যাবহারিক রীতি—এমন কী সামাজিক জীবনযাত্রা বেদের ভিত্তিতে স্থাপিত।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে-আর্য জনগোষ্ঠী বাস করত, পরবর্তী কালে ভারত-আক্রমণকারী আলেকজাণ্ডার প্রমুখ গ্রীকেরা তাদের 'হিন্দু' নামে অভিহিত করে। পাশ্চাত্যবাসীরা 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করত। সেই থেকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরা যে ধর্ম আচরণ করত তা-ই সনাতন ধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম বা বৈদিক ধর্মই ছিল। সাধারণভাবে সেই বৈদিক সনাতন ধর্মকেই হিন্দুধর্ম বলা হয়। কালক্রমে এই জনগোষ্ঠী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই হিন্দুধর্ম সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে।

বেদ—বেদ সনাতন ধর্মের আদি গ্রন্থ। বেদ মানে অনন্ত জ্ঞান। বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। কারণ এই বেদের জন্ম বা আরম্ভ নেই। আর কোনও ব্যক্তিবিশেষও এই বেদ রচনা করেননি। বেদ শব্দটি এসেছে 'বিদ্-' ধাতু থেকে অর্থাৎ জ্ঞান যা সত্য—যে-সত্য নিত্য

এবং যে সত্যের উপরে এই আপাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষণভঙ্গুর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সে সত্যকেই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলে। অনন্ত সত্য অনন্তকাল ধরে ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও অনন্তই অবশিষ্ট থেকে যাবে। ভারত সর্বদা সেই সত্যের সন্ধান করে। সত্য কী তা জানতে চেষ্টা করে। তাই বলা হয় সনাতন ধর্ম। স্বামীজী বলছেন, শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দ বাচ্য এবং তাদের প্রামাণ্য, যে পর্যন্ত তারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত, (২) যা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির দ্বারা গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সংকলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এর সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁর নাম ঋষি ও সেই শক্তি দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তার নাম বেদ।'

বেদের অপর নাম শ্রুতি, কারণ বেদ প্রথমে গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে শুনে শুনেই প্রচারিত হত। পরে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলা হয় বেদ থেকেই এই সৃষ্টি এবং এই বেদে স্থিতি এবং এই বেদে লয়। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বেদরূপে প্রকাশিত হয়ে সৃষ্টির রহস্যসমূহ প্রকাশ করান। এই সৃষ্টির রক্ষার জন্যই বেদ প্রকাশিত হয়েছেন। তাই বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। বেদের উপর সমস্ত ভারতীয় আস্তিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত এবং বেদের মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় উভয় বিষয়ের জ্ঞানই নিহিত রয়েছে। যেমন বেদে—সংসার, ধর্ম, রাজধর্ম, বেদবিহিত যাগাদি কর্মের ব্যাখ্যা রয়েছে, তেমন উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বও রয়েছে।

বেদের বিভাগ— মহর্ষি ব্যাসদেব বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেন: ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। মহর্ষি বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করে তাঁর চার শিষ্যকে রক্ষার দায়িত্ব দেন। মহর্ষি পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দেন।

প্রত্যেক বেদে আবার কয়েকটি বিভাগ—মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতা এবং সেখানে মন্ত্রসকল একত্র গ্রথিত আছে। ব্রাহ্মণ অংশে বিধি, নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিহিত আছে। এই অংশ গদ্যময় এবং ব্রাহ্মণেরই কিছু অংশ আরণ্যক। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ—এই দুই অংশেই উপনিষদের বর্ণনা আছে। বেদের উপনিষদগুলিই বেদান্ত নামে খ্যাত।

সমগ্র বেদকে আবার তিন কাণ্ডে ভাগ করা হয়, যথাক্রমে কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু সরাসরি প্রধানত দুই কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের

জ্ঞানকাণ্ডকে উপনিষদ্ বলা হয়। এই দুটি ভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে পূর্বমীমাংসা বা কর্মমীমাংসা-দর্শনের সৃষ্টি এবং জ্ঞানকাণ্ডের উপর নির্ভর করে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি। বেদান্তদর্শন হিসাবে শঙ্করকৃত অদ্বৈতবেদান্ত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ হলো প্রথম প্রস্থান—শ্রুতিপ্রস্থান। (রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার থেকে প্রকাশিত ৫৪ খণ্ডে সমগ্র বেদ পাওয়া যায়)

বেদনির্ভর ষড়্দর্শন—ভারতীয় দর্শনে ছয়টি আস্তিক দর্শন। যেহেতু এই দর্শনগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে। এই ছয়টি দর্শন সম্পর্কে আমাদের সামান্য পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

১) মহর্ষি কপিলের **সাংখ্যদর্শন**। এই সাংখ্যদর্শনকে বলা হয় সৎকার্যবাদ বা পরিণামবাদ। এই মতে কার্য একান্তভাবেই উপাদান কারণের পরিণাম। এই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণ। গুনত্রয়ের সাম্যাবস্থাই পরমা প্রকৃতি। তিন গুণের বৈষম্য হলেই প্রকৃতির প্রকাশ বা সৃষ্টি শুরু হয়। সাংখ্যদর্শন মতে, প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুইটিকে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে দেখানো হয়েছে। পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি ক্রিয়মাণ। এই সাংখ্যদর্শন চব্বিশটি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত —প্রকৃতি, মহৎ (cosmic intelligence), অহংকার (cosmic ego) , পাঁচটি তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পাঁচটি মহাভূত (আকাশ, বাতাস, আগুন, জল ও পৃথিবী), পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং মন (individual mind)। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ স্বতন্ত্র, নির্বিকার, বহু এবং চৈতন্যস্বরূপ। এই চব্বিশটি তত্ত্ব জানলে প্রকৃতিকে জানা হবে এবং বন্ধনও মুক্ত হয়ে যাবে। তখন পুরুষের জ্ঞান হবে। তাকে বিবেকখ্যাতি বলে। এই বিবেকখ্যাতির ফলে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হবে।

২) মহর্ষি পতঞ্জলির **যোগদর্শন**—যোগ দ্বারা মনের অস্থিরতা শান্ত হয়। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। সকল চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে সাধকের সমাধি হয়। মনের মধ্যে বৃত্তি অর্থাৎ মন নানা বিষয়ের সংস্পর্শে এসে বাসনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে। যোগের দ্বারা মনকে বৃত্তিশূন্য করে এক ব্রহ্ম-চিন্তায় সমাহিত করা। যোগের দ্বারা সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে এবং সমাধিতে অবস্থান করে। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হলে পুরুষখ্যাতি বা বিবেকখ্যাতি লাভ হয়।

৩) মহর্ষি গৌতমের **ন্যায়দর্শন**—ন্যায়শাস্ত্র যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দর্শনের প্রমাণ চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমেয় যা প্রমাণযোগ্য তা দ্বাদশ প্রকার। তিনটি বিশেষ প্রমেয়—মন, আত্মা ও ঈশ্বর। যুক্তি-তর্কের সাহায্যে এদের প্রতিষ্ঠা করাই ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য। ন্যায়ের মতানুসারে

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি বা অপবর্গলাভ।

৪) মহর্ষি কণাদের **বৈশেষিকদর্শন**—এই দর্শনের মূল বিষয় সাত রকম পদার্থ। বিশ্বে সমস্ত কিছুকেই এই সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। পদার্থগুলি হল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। দ্রব্যপদার্থ নয় রকম—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। দ্রব্যের গুণ—চব্বিশটি। কর্ম পাঁচটি। দ্রব্যের প্রথম পাঁচটি পঞ্চভূত। দ্রব্যের প্রথম চারটির মূলে রয়েছে পরমাণু। পৃথিবী আদি পরমাণুপুঞ্জ। পরমাণু নিত্য, তার উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই। তাই বৈশেষিক দর্শনকে পরমাণুবাদ আখ্যাও দেওয়া হয়। পদার্থের বিশেষ ধর্ম অর্থাৎ সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যজ্ঞানের উপর এই দর্শন জোর দেয়।

৫) মহর্ষি জৈমিনীর **পূর্বমীমাংসা দর্শন**—এই দর্শনে প্রথমেই ধর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই মতে বেদের সেই বাণীই ধর্ম যা থেকে কর্মে প্রেরণা পাওয়া যায়। শব্দ ও ধর্ম নিত্য এবং অবিকৃত পদার্থ, কিন্তু সময়ানুযায়ী যদি তা অভিব্যক্ত না হয় তবে সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে পারে না। এই দর্শন বলে বেদ স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদবাক্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য অন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যক নেই। বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ। মীমাংসা কথার অর্থ হল আলোচনা, যুক্তি-তর্ক, অনুভবাদির দ্বারা কোনও কিছুকে প্রমাণ করা। পূর্বমীমাংসা অর্থাৎ যা বেদের পূর্ব বা প্রথম দিকের কর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। বেদ-বিহিত কর্ম এবং তার ফলপ্রাপ্তিই মনুষ্য-জীবনের পরম পুরুষার্থ। কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মানুষের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি হয়। যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা মানুষের পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গাদি সুখলাভ হয়।

৬) মহর্ষি ব্যাসদেবের (বাদরায়ন) **উত্তরমীমাংসাদর্শন**—এই দর্শন বলে কর্ম এবং তার ফল পরম পুরুষার্থ হতে পারে না। কর্ম অনিত্য এবং তার ফল অনিত্য। পরম পুরুষার্থ হল ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও স্ব-স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি। সেটা একমাত্র ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। এর সাধন কর্ম নয়, ত্যাগ। বৈরাগ্যই এই প্রাপ্তির মূল কথা। এই দর্শন বলে, এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মাই এই জগৎ-রূপে প্রতীত হয়েছেন। সেই চিৎস্বরূপের উপর জগতের অধ্যাসটি হচ্ছে অবিদ্যা। এই অবিদ্যার পরিণাম ভ্রম দূর হলে এই অধ্যাসটিও চলে যাবে। তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এই ভ্রম অবিদ্যা থেকে হয়। আমাদের মধ্যে অনাদি অবিদ্যা হেতু, চিদ্রূপ ব্রহ্মে জগৎ দর্শনের ভ্রম হয়। এই ভ্রমের ফলে জগতের নাম ও রূপের অভিব্যক্তি। এই ভ্রমের পিছনে যে অবিদ্যাশক্তি কাজ করে তাকে 'মায়া' বলে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই মায়া বা অবিদ্যাভ্রম নাশ হয়। অবিদ্যা নাশ হলে মানবের মধ্যে আত্মস্বরূপের স্ফুরণ হয় এবং তখন জীব ব্রহ্মের সঙ্গে সনাতন ঐক্য বোধ করে। তাকে মুক্তি বলে। এই মুক্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স। আত্মতত্ত্বকে যুক্তি ও বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ব্রহ্মসূত্র

গ্রন্থে—দ্বিতীয় প্রস্থান অর্থাৎ **ন্যায়প্রস্থান**। মহর্ষি ব্যাসদেবেরই প্রণীত ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায়প্রস্থান।

ভারতীয় পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য—পুরাণ পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত—১) সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তত্ত্ব, ২) প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয় বর্ণনা, ৩) বংশ অর্থাৎ রাজা ও ঋষিগণের বংশানুক্রম বর্ণনা, ৪) মন্বন্তর অর্থাৎ কালনির্দেশ বা এক এক মনুর আবির্ভাবকাল বর্ণনা, ৫) বংশানুচরিত অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণনা। পুরাণই ভারতবর্ষের ইতিহাস। কারণ পুরাণে আমরা দেখতে পাই আখ্যান, উপাখ্যান, পিতৃগণের কীর্তি গাথা, কল্পাদির বর্ণনা, ভৌগলিক বিবরণ, আচার ব্যবহার, ধর্মাদির বিষয় ইত্যাদি বর্ণনা। মহাপুরাণ ও কিছু উপপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার পুরাণবিৎদের মতে আদি পুরাণ হতে অন্যান্য পুরাণের উৎপত্তি। কথিত আছে ব্রাহ্মপুরাণ সমুদায় পুরাণের আদি।

পুরাণ বিশারদ ভগবান বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সঙ্গে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য রোমহর্ষণকে পুরাণ সংকলন করে অধ্যয়ন করালেন। রোমহর্ষ তাঁর ছয় শিষ্যকে (সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রযু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সার্বাণ) শেখালেন। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন মহামুনি বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের সংকলন করেন। প্রথম—ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয়—পাদ্মপুরাণ, তৃতীয়—বৈষ্ণবপুরাণ, চতুর্থ—শৈবপুরাণ, পঞ্চম—ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ—নারদীয়পুরাণ, সপ্তম—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অষ্টম—আগ্নেয়পুরাণ, নবম—ভবিষ্যপুরাণ, দশম—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, একাদশ—লৈঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ—বারাহপুরাণ, ত্রয়োদশ—স্কান্দপুরাণ, চতুর্দশ—বামনপুরাণ, পঞ্চদশ—কৌর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ—মাৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ—গারুড়পুরাণ, অষ্টাদশ—ব্রহ্মাণ্ড **পুরাণ**।

মহামুনি বেদব্যাস পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করে তা রোমহর্ষণ সূতকে প্রদান করেন। একাধিক পুরাণ সংকলন করে রচিত হয় পুরাণসংহিতা। যিনি পুরাণ রক্ষা ও পুরাণ পরিবর্ধিত করেন তিনি পুরাণকার বা পুরাণবক্তা। মহর্ষি ব্যাসদেব পুরাণকার।

পুরাণ চতুর্দশ বিদ্যার অন্তর্গত। চার বেদ (ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব), ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত ও ব্যাকরণ), মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র—এই চর্তুদশ বিদ্যা বহু প্রচীন বৈদিক কাল হতে ভারতে প্রচলিত আছে। পরবর্তী কালে আরো চারটি বিদ্যা—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র যুক্ত হয়ে সংখ্যা অষ্টাদশবিদ্যা হয়েছে।

ইতিহাস বলতে ইংরেজী হিস্টরি (History) শব্দের অর্থ নয়। যে সময় থেকে লেখা শুরু হয় তা হিস্টরি এবং তার পূর্বের ঘটনা প্রিহিস্টরি (Pre-history)। কিন্তু ভারতে পুরাকালে ঘটনা এই প্রকারে ঘটেছিল তাই পুরাণ। অতীত কালের ঘটনাবলীর বিবরণকেই পুরাণ বলা হয়ে থাকে। পুরাণই ভারতের ইতিহাস।

অতএব ঋষি ও দেবর্ষিদের বিচিত্র ও ভবিষ্যৎ ধর্ম নির্দেশক বহুবিধ আখ্যানের নাম ইতিহাস। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—সম্বন্ধীয় উপদেশ বিশিষ্ট পুরাতন ঘটনার বিবরণযুক্ত কাহিনীর নাম ইতিহাস। পরম্পরাপ্রাপ্ত কাহিনীর (Tradition) বর্ণনা হলো ইতিহাস, অর্থাৎ পরম্পরাপ্রাপ্ত যে কোন কাহিনী ইতিহাস।

মহাভারত ও রামায়ণ হলো ভারতের ইতিহাস। কিন্তু ব্যাসদেব নিজেই নিজ গ্রন্থ মহাভারতকে কাব্য বলেছেন। মহাভারত ও রামায়ণ হলো মহাকাব্য। পুরাণে বর্ণিত বংশ ও চরিত্রের সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধীয় উপদেশ যুগোপযোগী প্রমাণরূপে ও বিশদরূপে কাব্যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মহাভারতকে আবার পুরাণ ও পঞ্চম বেদও বলা হয়ে থাকে। অতএব মহাভারত হলো পুরাণ, ইতিহাস ও মহাকাব্য। পুরাণে উক্ত ঘটনার বহিঃপ্রমাণ ও ইতিবৃত্তিক বিবরণ হলো কাব্য। মহাভারত ও রামায়ণে পুরাণের অনেক কথা সমর্থিত হয়ে থাকে। অতএব ইতিহাস ও কাব্য থেকে পুরাণকে অধিক প্রামাণিক মনে করতে হবে। পুরাণ থেকে বেদ-কে প্রধান প্রামান্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বেদের কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। মহর্ষি ব্যাসদেবের রচিত মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে তৃতীয় প্রস্থান—স্মৃতিপ্রস্থানরূপে গণ্য করা হয়। এখন শ্রুতি, ন্যায়প্রস্থান ও স্মৃতি প্রস্থানে অর্থাৎ বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের পরিচয় হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

ব্রহ্ম—পরম সত্য, অদ্বয়, সৎ-চিৎ-আনন্দ, নামরূপহীন, নির্গুণ, অনাদি, অনন্ত, অব্যয়, এবং দেশ-কাল-কারণাতীত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের উপর কল্পিত। বিবর্তনশীল জগতের পিছনে একটি নিত্য, চিৎস্বরূপ ও অপরিণামী সত্তা ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। ব্রহ্মের উপর এই জগৎ আরোপিত। এই ব্রহ্ম সৎস্বরূপ-চিৎস্বরূপ-আনন্দস্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম নির্গুণ—গুণাতীত, এক এবং অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্মে কোনও বিশেষত্ব নেই, তাই ব্রহ্ম নির্বিশেষ। তাঁর জন্ম নেই, তাঁর আদি নেই, তিনি তাই অজ, অনাদি ও নিরাকার। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বানুস্যূত। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। জগতে যা কিছু চেতন বলে প্রতীয়মান, সে সবই এই ব্রহ্মের চেতনায় চেতনায়িত। ব্রহ্মই একমাত্র চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। ব্রহ্ম অখণ্ড, পূর্ণস্বরূপ। তিনি সর্ববস্তুর সত্তা। তাঁর সত্তাতে জগৎপ্রপঞ্চ সত্তাবান। সকলের দ্রষ্টা, বিজ্ঞাতা ও সাক্ষী তিনি—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর। ব্রহ্ম অবর্ণনীয়, তাঁকে কোন কিছুর দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। তিনি বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত—এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য। তিনি দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন বলে তিনি মুক্তস্বভাব। তিনি অপরিণামী বলে নিত্যস্বরূপ, এবং বোধ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—সকল বস্তু উচ্ছিষ্ট হয়েছে অর্থাৎ মুখে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।

ঈশ্বর—ব্রহ্ম যখন মায়াশক্তিবিশিষ্ট হন তখন তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। (বেদান্তসার গ্রন্থ ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, অব্যক্ত (সর্বকার্যের বীজ), অন্তর্যামী, জগৎকারণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। (সর্বজ্ঞত্ব-সর্বেশ্বরত্ব-সর্বনিয়ন্তৃত্বগুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি)।) মুণ্ডক উপনিষদ্ বলছেন, 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।'(মুণ্ডকঃ, ৭/১/১)—যিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছু জানেন এবং জ্ঞানই তাঁর একমাত্র তপস্যা। তিনিই আবার এই বিশ্বচরাচরের সব কিছু হয়েছেন। গীতা বলছেন—'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'(১৮/৯)—ঈশ্বরই সকল প্রাণীর একমাত্র গতি ও পরিপালক। সকলের প্রভু ও সকল প্রাণীর বাসস্থান ও তাদের কৃতাকৃতের সাক্ষী। তিনিই হিতকারী, রক্ষক, স্রষ্টা ও সংহর্তা।

ঈশ্বর রূপে, আবার অরূপে—সীমায়, আবার অসীমে প্রকাশ পান। ঈশ্বর 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা'—এক হয়েও বহু রূপে প্রকাশ পান এবং সর্ব জীবে আত্মানুভূতির নাম ঈশ্বর বা আত্মাকে জানা। সৎ-চিৎ-আনন্দ (সচ্চিদানন্দ) কখনও গুণরূপে, কখনও সৎ বা অখণ্ড সত্তারূপে প্রকাশ পান। তবে সৎ যিনি, তাঁরই চিৎ বা প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান, আর সেই প্রকাশই আনন্দ। এক অখণ্ড সত্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যে দেখেছে বা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছে, সেই জানে ও বলতে পারে—ঈশ্বর স্বরূপে এক হলেও প্রকাশ তাঁর নানারূপে ও নানাভাবে হতে পারে। ঈশ্বর যখন তাঁর সৃষ্টিতে নানা রূপ ধারণ করেন তখন তিনি বহুরূপী। ঈশ্বর লীলাময়। এই জগৎ তাঁর লীলা। স্বরূপে বা নিজের রূপে তিনি এক, কিন্তু প্রকাশে তিনি বহু। জ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর স্বরূপে গুণাতীত ও সর্ব আকারের অতীত, কিন্তু সৃষ্টির বা বিকাশের বেলায় তিনি কখনও সাকারভাবে, কখনও নিরাকারভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশ করাটা ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্মের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাই ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্মকে যিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন, তিনিই জানেন যে, ঈশ্বর, আত্মা বা ব্রহ্ম এক, আবার নাম-রূপে বহু। সাকার, আবার নিরাকার। সগুণ আবার নির্গুণ। মোট কথা স্বরূপে অর্থাৎ নিত্যে ও বিকাশে অর্থাৎ লীলায় দুটি অবস্থাতেই থাকেন এক ও অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—যিনি ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন, তিনি আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকেন। ব্রহ্মকে তিনি 'বোধে বোধ' করেন। ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলতে পারেন না। যেহেতু ব্রহ্ম 'বাক্যমনাতীত'। কালীই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই কালী —একই বস্তু। যখন নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—কোনও কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি—শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম ও রূপের ভেদ।

প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়, ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরও বলেন, দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রতিবিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। এই দেহাত্মবুদ্ধি চলে গেলে সোংহং—আমি ব্রহ্ম এই অনুভূতি হয়। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথমে দুটো বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না—অভেদ, এক, যে একের দুই নাই, অদ্বৈতম্। আর আমি দেখছি, বাজিকর আর বাজিকরের খেলা। বাজিকরই সত্য, খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মতো।

নিত্য ও লীলা—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছাদ ও সিঁড়ির উদাহরণ দিচ্ছেন। নেতি নেতি করে জ্ঞানী যখন ছাদে পৌছান তখন দেখেন—ছাদ ও সিঁড়ির উপাদান সেই এক—ইট-চুন-সুরকি। তখন জ্ঞানী বোঝেন যে, এক পরমাত্মা ব্রহ্মই স্বরূপে, আবার বিরূপে, নিত্যে আবার লীলায়, কেবল নাম-রূপের ভেদ। জলের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। হেলা-দোলা থেমে গেলেও সেই জল।...ওসব লীলা। সবই মায়া, তাঁর সৃষ্টিও মায়া। ব্রহ্ম ও মায়া একই টাকার এপিঠ এবং ওপিঠ। স্বরূপতঃ জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্য তার মূলীভূতা শক্তি বা মায়া থেকে অভিন্ন, এবং শক্তি বা মায়াও ব্রহ্ম বা ব্রহ্মসত্তা থেকে অভিন্ন। মায়া 'সং'কে জানতে দেয় না—'মিথ্যা'কে সৎ বোধ হয়। সৎ অর্থাৎ নিত্য পরব্রহ্ম। অসৎ অর্থাৎ সংসার যা অনিত্য। জীবের অহংকারই মায়ার প্রকাশ।

সগুণ ও নির্গুণ—ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কী হবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহধারণ করে আসেন—এও সত্য, আবার নামরূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন—এও সত্য। তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে। সগুণ বলেছে, নির্গুণও বলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বরফের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ সাগরে সাকার-মূর্তি দর্শন হয়। আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গলে জল হয়। আবার বলছেন, ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

জগৎ— ব্রহ্ম তাঁর অনির্বচনীয় মায়া-শক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম এক হয়েও বহু। নাম-রূপ-উপাধির মধ্য দিয়ে জগৎরূপে প্রতীত হচ্ছেন। অতএব জগৎ পরিবর্তনশীল, মরীচিকাবৎ, নাম-রূপ উপাধির জন্য বহু দেখায়। ব্রহ্মের কোনও পরিবর্তন হয় না। যেমন একটি বস্তুর প্রতিবিম্ব বিভিন্ন প্রকৃতির আয়নার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারে দৃষ্ট হয়, তাতে বস্তুর কোনও পরিবর্তন হয় না। এখানে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং ত্রিকালে তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই। 'ত্রিকালাবাধিতত্বং সত্ত্বম্'—যা তিনকালে অবাধিত অর্থাৎ অপরিণামী সৎ বস্তু। আবার এই সৎ বস্তুই অবস্তুরূপ মায়ার সংস্পর্শে এসে জগৎরূপে পরিদৃষ্ট হচ্ছেন। মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ-শক্তি (concealing power) যার দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ আবৃত হয় আর বিক্ষেপ শক্তি (projecting power) যার দ্বারা

তার উপরে নাম-রূপের অভিক্ষেপ (projection) হয়। তখন আমরা সেই ব্রহ্মকেই এই নামরূপাত্মক জগৎরূপে দেখি। এখানে প্রশ্ন হবে—অনন্ত ব্রহ্মকে মায়া কী করে আবৃত করে? উত্তর হল একটুকরো মেঘ যেমন-করে এত বড় সূর্যকে আবৃত করে, যেমন হাতের তালু দিয়ে চোখ আবৃত করলে সব কিছুই আবৃত হয়, তেমন জীবের প্রজ্ঞাদৃষ্টি এই মায়ার আবরণী শক্তি দ্বারা আবৃত হয়। ব্রহ্ম থেকে মায়ার প্রকাশ হয়ে ব্রহ্মকেই যেন আবৃত করে। তারপর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সমন্বয়ে বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা এই নামরূপ জগতের সৃষ্টি হয়—প্রথমে কারণ অবস্থা, তারপর সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা এবং সমষ্টি স্থূল শরীর অর্থাৎ বিরাটরূপ।

জীব— সমষ্টি অর্থে জগৎ এবং ব্যষ্টি অর্থে জীব বলা হয়। জীবেরও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা আছে। জীবের স্থূল অবস্থার নাম বিশ্ব, সূক্ষ্ম অবস্থার নাম তৈজস এবং কারণ অবস্থার নাম প্রজ্ঞা। আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের পরের অবস্থাও আছে—সেইটি জীবের চৈতন্য অবস্থা। এই চৈতন্য এবং সমষ্টি চৈতন্য সত্তা একই। তাই জীব মূলত ব্রহ্মস্বরূপ। জীবই ব্রহ্ম, দেবস্বরূপ, অনন্ত শক্তি তাঁর মধ্যে। তাঁর স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ। তাই স্বামীজী বলছেন: 'Man is to become divine, realizing the divine more and more, from day to day in an endless progress.' আচার্য শঙ্কর বলছেন: 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—অর্থাৎ মানুষই ঈশ্বর। ঈশ্বর আবার কোথায়? প্রতি মুহূর্তে, দিনের পর দিন অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকেই ঈশ্বর বলে অনুভব করে।

জীব, জগৎ, ব্রহ্ম—এই তিনের পারস্পরিক সম্বন্ধ কী, এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মত প্রচলিত আছে। যথা —অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি।

অবতার তত্ত্ব—ধর্মতত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরের অবতারলীলা বোঝা বেশ কঠিন ব্যাপার। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান আমাদের মতো রক্ত-মাংসের দেহধারণ করে মানুষ হয়ে জগতে এসে জীব উদ্ধার করেন—এ জ্ঞান ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ছাড়া হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থেকেও অর্জুন তাঁকে অবতার বা ভগবান বলে বুঝতে পারছেন না। অর্জুন ভাবছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ তো আমার সখা'। ঈশ্বরের লীলা—শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে কৃপা করে 'দিব্যচক্ষু' দিলেন তখনই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখতে পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহ ধারণ করলে রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে। মনে হয়, আমাদেরই মতো। কিন্তু ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষের মধ্যে তিনি অবতীর্ণ হন—যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ইত্যাদি। ঈশ্বরকে জানতে হলে, তাঁর অবতারলীলা বুঝতে গেলে সাধনের প্রয়োজন এবং ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া তাঁকে জানা যায় না। তিনি কৃপা করে ধরা দিলে তবেই তাঁকে লোকে চিনতে পারে।

গীতাতে শ্রীভগবান বলছেন, 'অজ' অর্থাৎ জন্মরহিত এবং 'অব্যয়াত্মা' জ্ঞানশক্তিস্বভাব

ব্রহ্ম হলেন সকল ভূতের অন্তরাত্মা। ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়মকারী হয়েও তিনি তাঁর বৈষ্ণবী-শক্তিকে বশীভূত করে আত্ম-মায়াবশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। তিনি দেহাভিমানী জীবের ন্যায় ব্যবহার করে থাকেন। কেন বা কী কার্যের জন্য ঈশ্বরের এই জন্ম? যে-যে সময়ে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও মোক্ষের সাধন বর্ণ ও আশ্রমরূপ ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ হানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান অর্থাৎ উদ্ভব হয়, তখনই ঈশ্বর নিজ মায়াবশে দেহ-ধারণ করে থাকেন। আবার সাধু, সৎপথাবলম্বিগণের পরিত্রাণ অর্থাৎ পরিরক্ষণ এবং দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের নিমিত্ত ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন।

'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।(গীতা-৪/৬)'—ভগবান বলছেন, আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজ-মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি। আমার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। আমি অব্যয়। সকলের ঈশ্বর। সবকিছু আমার থেকে এসেছে। আমার মায়া দ্বারা আমি স্বেচ্ছায় বারবার জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ যেন দেহধারণ করি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে অবতাররূপে প্রকাশ করেন। 'মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।' নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় নিয়ে সগুণ হয়েছেন। নিজের মায়াকে অবলম্বন করে অবতার হয়েছেন। অবতারকে দেখা অর্থাৎ ঈশ্বরকে দর্শন করা।

ভগবানের এই দেহধারণের কারণ কী? এর উত্তরে আচার্য শঙ্কর গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বলছেন, 'স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া'—অর্থাৎ অবতারপুরুষের নিজের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন না থাকলেও ভক্তকে কৃপা করার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লোককল্যাণের জন্যই তাঁদের আবির্ভাব—'লোকসংগ্রহার্থম্'। করুণায় বিগলিত হয়েই তাঁর দেহধারণ। 'অহেতুকী করুণা'—এ করুণার কোনও কারণ নেই। ভক্তের ভালবাসার জন্য ঈশ্বর এই দেহধারণ করেন। ভক্তের সঙ্গে লীলা করার জন্য ভগবানের আবির্ভাব।

ভগবান বলছেন, 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।'—আমি কৃষ্ণরূপে ছোট হয়ে এসেছি। আর সকলের মতো আমারও অসুখ করে, খিদে পায়। মা আমাকে শাসন করে। মাঝে মাঝে মারে, আদর করে। নইলে তো তোমরা আমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারবে না। আমার লীলায় সাহায্য করতে পারবে না। এ সবই আমি করি লোককল্যাণের জন্য। যা দেখে, যা শুনে, যা অনুসরণ করে মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়ে ওঠে। আমিই এই বিশ্বে আছি, আমি সর্বভূতে বিরাজ করছি।

এই ঈশ্বরের লীলা, অবতারলীলা—অপূর্ব লীলা 'মত্যলীলা মনোহরা'। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা তাঁকে ঠিক চিনে নেন। তাঁর আদর্শে জীবন গঠন করেন। তাঁর শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করেন। ভক্তের ভালবাসার জালে ভগবান বাঁধা—কারণ তিনি অবতার। শ্রীরামচন্দ্ররূপে এসেছেন সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জীবনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শত কষ্ট স্বীকার—

বনবাস, রাবণবধ, সীতা-বিসর্জন অথবা লক্ষ্মণ-বর্জন ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণরূপে অনাসক্তি কর্ম—নিষ্কাম প্রেম ও চার যোগের সমন্বয়। বুদ্ধ-অবতারে—অহিংসা ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্য-অবতারে—ঈশ্বরমত্ততা—সর্বপ্রাণীতে প্রেম বিতরণ। আচার্য শঙ্কররূপে—অদ্বৈত বেদান্ত প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামকৃষ্ণরূপে—ধর্মের সমগ্র রূপ—সর্বধর্মসমন্বয় এবং ত্যাগ ও সেবার দ্বারা বেদান্তের ব্যাবহারিক প্রয়োগ।

অবতার যখন আসেন, একা আসেন না। রাজা যেমন একা চলেন না, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সভাসদ চাই, ভগবানেরও তাই ঘটে। তিনি যখন অবতীর্ণ হন, সঙ্গে কয়েকজন লীলাসহচর নিয়ে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশুখ্রীস্ট, শ্রীচৈতন্য—সব অবতারের বেলাতেই এটা দেখা যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় আমরা দেখি, তিনি তাঁর লীলাসহচরদের বা চিহ্নিত ব্যক্তিদের ঠিক চিনে নিচ্ছেন। তিনি বলছেন, এঁরা ঠিক কলমীর দলের মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সহচরদের দেখবার জন্য পাগল এবং এঁরাও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য পাগল। যখন প্রথম দেখা হচ্ছে তখন থেকেই প্রত্যেকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহী-পার্ষদ কথামৃতকার মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে দেখে বলেছিলেন—'তোমায় চিনেছি—তোমার চৈতন্যভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আসছে—যেন কলমীর দল—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর লীলাসহচরদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ও পরিচয়গুলি ঠিক নাটকের মতো। যেন স্থান, কাল, পাত্র সব নির্দিষ্ট করা আছে। যতই তাঁরা ছদ্মবেশে থাকুক না কেন ভগবান তাঁর সহচরদের ঠিক চিনে নিচ্ছেন। মহাভারতে দেখা যায়—জতুগৃহ ধ্বংসের পর পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে থাকতে শুরু করেন। সেই সময় দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের বেশে সেই স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হলেন। কেউ তাঁদের চিনতে না পারলেও শ্রীকৃষ্ণ সেখানে ছিলেন, তিনি তাঁদের দেখেই চিনতে পারলেন। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় প্রধান লীলাসহচর—অর্জুন—'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'। ব্যাসদেব বর্ণনা দিচ্ছেন—'দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্ পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্। ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণঃ প্রদধ্যৌ যদুবীরমুখ্যঃ।।—মত্ত হস্তীর ন্যায় সবল দেহ, ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় নিগূঢ়মূর্তি এবং একটি পদ্মকে লক্ষ করে অবস্থিত পাঁচটি হস্তীর ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবকে দেখেই কৃষ্ণ চিনতে পারলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, অর্জুন এই পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম।

কলকাতায় সিমুলিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চিহ্নিত প্রধান, সহস্রদল পদ্মটিকে, 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি' নরেন্দ্রনাথকে দেখে চিনতে পারলেন—এই সেই নরঋষি, সপ্তর্ষির প্রধান ঋষি, বহুযুগের লীলাসহচর—তাঁর কাজের জন্য এবারে এসেছেন।

ভক্তের ভালবাসার জন্য ঈশ্বর এইরূপ মানবদেহ ধারণ করেন। ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন কিন্তু সবকিছুর মূলে ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যান। অন্ধকার অজ্ঞানের পথ থেকে আলো জ্ঞানের পথে নিয়ে জান। তিনি নিজের জীবনে সাধন করে দেখান ঈশ্বরলাভের সহজ পথগুলি।

বেদান্ত দর্শন—বেদান্ত দর্শন প্রধানত তিনটি মূল শাস্ত্র বা প্রস্থানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র—এই তিনটি যথাক্রমে শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। এই তিনটি প্রস্থান জীবনদর্শনের একমাত্র পথ এবং আত্মজ্ঞান লাভের পথ। বেদান্তদর্শন-অবলম্বী যে কোনও সম্প্রদায়ই এই তিনটি প্রস্থানকে সমধিক মান্য এবং গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আচার্যেরা এই তিন প্রস্থানের স্বমতানুসারী ব্যাখ্যা দ্বারা নিজ নিজ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে সম্প্রদায় হলেও তাঁরা যে সকলে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেছেন তা মোটেই নয়। আচার্যগণ নিজ নিজ মতাদর্শকে এক-একটি নামে আখ্যায়িত করেছেন। সেই সব মতাদর্শকে আমরা প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি-—অদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্ত। কিন্তু এই দ্বৈত বেদান্ত আবার বহু ভাগে বিভক্ত। অনেক আচার্য 'অদ্বৈত' এই পদটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তার পূর্বে একটি বিশেষণও ব্যবহার করেছেন-—যেমন শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শৈবাদ্বৈত, শাক্তাদ্বৈত ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুত এসব দর্শনগুলি দ্বৈত দর্শন।

বেদান্তের প্রধান শিক্ষা—আত্মাকে জানা, অবিদ্যা ও মোহ নাশ, একের অনুভব, বিশ্বজনীনতার অনুভব, ধর্মের সমন্বয়, বহুর মধ্যে ঐক্য। বেদান্তের মূল তত্ত্ব হচ্ছে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা। আত্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ আত্মাকে জানার ইচ্ছা। 'অহম কঃ?'—আমি কে? এই হচ্ছে আত্মজিজ্ঞাসা।

সংক্ষেপে বেদান্তের প্রধান শিক্ষাগুলি হলো—(১) 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই ব্রহ্ম। জীবই ব্রহ্ম, শুদ্ধস্বভাব ও সর্বজ্ঞ। (২) এক আত্মা বা অনন্তভাব। সবই এক আত্মা—চিন্ময়রূপে, জীবনরূপে, আত্মারূপে সব এক। (৩) জীবনের প্রতি মুহূর্তে সৎ-অসৎ বিচার করতে বেদান্ত শিক্ষা দেয়। (৪) দিন-রাত্রি শ্রবণ, মনন করা যে আমি আত্মা—জন্মহীন, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতির্ময় এবং এই চিন্তা নিয়েই সকল কর্ম করা। (৫) বেদান্ত অপরোক্ষ অনুভূতি, আত্ম-সাক্ষাৎকারের শিক্ষা দেয়।

বেদান্ত সাধন পথ—পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষলাভের জন্য ভারতীয় দর্শনে মুখ্যত চারটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি ও যোগ—এই চারটি উপায়। এদের যোগও বলা হয়। ফলে, আমরা ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ—এই চারটি যোগের কথা পাই। রাজযোগ অর্থাৎ পাতঞ্জল যোগ। রাজযোগ

বা পাতঞ্জল যোগ সাধনায় প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও মুক্তি লাভ হয়।

ক) জ্ঞান যোগ—জ্ঞানের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি। জ্ঞান যোগের দ্বারা অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয়। বেদান্তে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর বা পরমতত্ত্বকে সহজভাবে অল্পকথায় বোঝায়—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—ব্রহ্মই সত্যবস্তু, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। বৈরাগ্য এবং জ্ঞান আধ্যাত্মিক ঊর্ধ্বগতির সহায়ক। জ্ঞান যোগের সাধন—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক বিচার (কোন্‌টা নিত্য আর কোন্‌টা অনিত্য তার বোধ), ইহামূত্রার্থফলভোগবিরাগ (এই জগৎ ও পরজগতের সর্বকর্মফল ভোগ ত্যাগ), শমদমাদি-সাধন-সম্পদ (শম—অন্তর-ইন্দ্রিয়ের সংযম, দম—বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সংযম, উপরতি—বিষয়ভোগ থেকে ইন্দ্রিয় পরিহার, তিতিক্ষা—সর্বাবস্থায় সহ্য ও সংযম অভ্যাস, শ্রদ্ধা—শাস্ত্র ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা ও সমাধান—মনের একাগ্রতা সাধন)—এই সকল ষট্‌সম্পত্তির সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম এবং সন্তোষ প্রভৃতি সদগুণের অধিকার লাভ) এবং সর্বশেষে মুমুক্ষুত্ব (মুক্তির জন্য ঐকান্তিকতা) আত্যন্তিক জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য। বেদান্তের অধিকারীর পক্ষে এই সাধন চতুষ্টয়কে বিবেক বৈরাগ্যের সাধনরূপে অঙ্গীভূত করতে হয়। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন, অন্তকরণ শুদ্ধ ব্যক্তিই বেদান্তের একমাত্র ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারী। যাঁর নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক জন্মেছে, যিনি সর্বকর্মফল পরিত্যাগ করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয় সংযত করে সন্তোষ প্রভৃতি গুণ অর্জন করেছেন এবং যিনি মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছেন, তিনি যে বিবেকী ও বেদান্তের অধিকারী এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ঐরূপ অধিকারী তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর নিকট বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ করেন। (মহাবাক্য—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি) জ্ঞান বলতে অপরোক্ষ জ্ঞানের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং সর্বশেষে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করেন। এই অপরোক্ষ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ হলে সাধক আত্মস্থ হন। এই অবস্থায় নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয়। এই আত্মজ্ঞানে সমাহিত সাধক ব্রহ্মজ্ঞ বা জীবনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

খ) ভক্তি যোগ—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা ও প্রেম এবং তার দ্বারা নিজের দেবত্বের উপলব্ধি। অনেকের মতে ভক্তিই মোক্ষলাভের সহজতম উপায়। 'ভক্তি' শব্দের ধাতুগত অর্থ সেবা। ভক্ত বলতে সেবক বোঝায়। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, ভক্তি শব্দে প্রচলিত অর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, এই যুগে সাধারণের পক্ষে ভক্তিপথই ভাল। তাদের জন্য নারদীয় ভক্তি—অর্থাৎ নারদের যেমন ভক্তি। নারদ ঋষি বলছেন—সেই পরম প্রেমই ঈশ্বর। ঈশ্বরের প্রেমে অহরহ তিনি ঈশ্বরের নাম গুণগান করে বেড়াচ্ছেন।

তাতেই তাঁর আনন্দ, তাতেই তাঁর তৃপ্তি। ঈশ্বরের শরণাগত। ভক্তিপথে একটা ভাব নিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়। তিনি ভাবের বিষয়। ভক্তিপথ ভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান ভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভাগবতে নবধা ভক্তির কথা বলা হয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্যসাধন, সখ্যসাধন ও আত্মনিবেদন। চারপ্রকার ভক্ত—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও ত্রিগুণাতীত ভক্ত। ভক্তি চার ধরণের--বৈধীভক্তি—নানা ধরণের উপোস, উপাচার, পূজা ইত্যাদি। প্রেমাভক্তি—রাগাত্মিকা ভক্তি বা অব্যভিচারিণী ভক্তি—যা গোপীদের ছিল, শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি--ভক্তির সাথে বিচার যা সর্বসাধারণের পক্ষে উপযোগী। সবথেকে শ্রেষ্ঠ—অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। ভক্তিতে ভক্ত অনুরাগের ঐশ্বর্য লাভ করেন এবং ভক্তির তারতম্য হেতু ভক্তের প্রার্থনা সম্পদ—সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য ইত্যাদি হয়ে থাকে।

গ) রাজ যোগ—মনসংযমের দ্বারা দেবত্বের উপলব্ধি। 'যোগ' বলতে বোঝায় আত্মা যে পরমাত্মা, জীব যে শিব বা ব্রহ্ম—এই নিশ্চিত বুদ্ধি নিয়ে ভেদভাব দূর করা ও একজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগই যোগ। যোগ সাধনের এটিই উদ্দেশ্য। দুই জ্ঞানকে একজ্ঞানে রূপান্তরিত করার নাম যোগ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলছেন, চিত্তবৃত্তিকে স্থির করার নাম যোগ। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'—চিত্তের বৃত্তির যে নিরোধ তার নাম যোগ। মনকে স্থির করা অর্থাৎ কিনা সমাহিত করা। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার উপায় বলছেন—অভ্যাস, বৈরাগ্য, একাগ্রতা এবং সমাধি। অভ্যাস সম্ভব বিশুদ্ধিকরণ এবং ক্রিয়াযোগ দ্বারা। বিশুদ্ধিকরণ—(১) যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ), (২) নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান), ক্রিয়াযোগ—'ক্লেশতনূকরণম্' চিত্তের অবিদ্যা ক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ) সকলকে ক্ষীণ করা। (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও শেষে (৮) সমাধি। যোগের মাধ্যমে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত অবস্থা ধীরে ধীরে একাগ্র এবং শেষে নিরুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছায়। যোগের উদ্দেশ্য মনের একাগ্রতা। মনকে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর সীমানার মধ্যে নিরুদ্ধ করাই একাগ্রতা। যোগসাধনার উদ্দেশ্য চিত্ত বা মনকে সংযত করা ও পরে মনকে একেবারে স্থির, সমাহিত ও শান্ত করা। চিত্ত বা মন স্থির হলে, ধ্যান গভীর হলে সমাধি হয়। ধ্যানে সমস্ত চিত্ত বিলয় করে দৃঢ়তার সহিত আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিনিবিষ্ট হতে হয়—সৎ, চিৎ, আনন্দ—অস্তি ভাব, জ্ঞান স্বভাব এবং প্রেমস্বরূপ। অবশেষে সমাধি।

ঘ) কর্মযোগ—যে পদ্ধতিতে মানুষ স্বধর্ম কর্ম এবং কতর্ব্য কর্ম পালনের মাধ্যমে নিজের দেবত্বকে উপলব্ধি করে—তাকেই কর্মযোগ বলেন। এই যুগে কর্মযোগের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে কর্মযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কর্মযোগে মুক্তি হয়। গীতার অনেক পূর্বে ঈশোপনিষদে কর্মযোগের উল্লেখ আছে। ঈশোপনিষদে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কর্মফল বাসনা থেকে নিবৃত্তি থাকার কথা বলা হয়েছে। গীতায় আত্মশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে।

গীতার দৃষ্টিতে কর্মকে গ্রহণ করলে এর সঙ্গে জ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা শ্রমিক এই চতুবর্ণের ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম বা বর্ণ-আশ্রম-কর্ম নামে পরিচিত রয়েছে। আশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। কর্মযোগে কর্মের জন্যই কর্ম করার নির্দেশ রয়েছে। গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন', কর্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে কোন অধিকার নাই। 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে'--যোগস্থ হয়ে কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করে, কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব নিয়ে কর্ম কর। কর্মের সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান বা সমত্বই কর্মযোগ। কর্মযোগের নিহিত অর্থ—১) নিত্য স্বধর্মোচিত কর্তব্য কর্ম করা, ২) কর্মফলের আসক্তি বর্জন, ৩) আমিই কর্মকর্তা এই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, ৪) সর্বকর্ম ঈশ্বরের কর্ম মনে করে সর্বকর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ এবং ৫) কর্ম না করার প্রবণতা অর্থাৎ অকর্ম ত্যাগ।

প্রস্থানত্রয় (শাস্ত্র)—সনাতন ধর্মে প্রধানত তিনটি মূল শাস্ত্রকে প্রমাণ শাস্ত্র হিসাবে ধরা হয়। এই তিনটি শাস্ত্রকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। এই তিনটি শাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেয়। এই প্রস্থানত্রয় আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ। বেদান্তের কোনও আচার্য যদি তাঁর মতবাদ জগতে স্থাপন করতে চান তাহলে এই প্রধান তিনটি শাস্ত্রের উপর ভাষ্য রচনা করতে হয়। 'প্রস্থান' কথাটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপনই বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। জীবের (ত্বং পদার্থ) স্বরূপ, ব্রহ্মের (তৎ পদার্থ) স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য—এই বিষয়ে উপনিষদই হচ্ছে একমাত্র প্রমাণ। তাই উপনিষদ হলো প্রথম প্রস্থান--শ্রুতিপ্রস্থান। উপনিষদের সত্যগুলিকে একত্র করে স্মৃতিশাস্ত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাকে—স্মৃতিপ্রস্থানরূপে গণ্য করা হয়। আর ঐ একই আত্মতত্ত্বকে যুক্তি ও বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে—ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ ন্যায়প্রস্থান। মহর্ষি ব্যাসদেবেরই প্রণীত ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায়প্রস্থান। বেদান্তে মোট এই তিনটি প্রস্থান—শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষদ), স্মৃতিপ্রস্থান (গীতা) এবং ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র)।

উপনিষদ্ (শ্রুতিপ্রস্থান)—'উপনিষদ্' শব্দটি বলতে কোনও গ্রন্থ বোঝায় না। বোঝায় জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নাশ ও ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন হয়। এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়, অতি উচ্চকোটির জ্ঞান, যে জ্ঞান শান্তি ও আনন্দ এনে দেয়, মানুষ কৃতার্থ বোধ করে। এই জ্ঞান অর্জন করতে হলে গুরুপরম্পরায় আচার্যের কাছে যেতে হবে—যে আচার্য স্বয়ং জ্ঞানের অধিকারী। যে নিজে অন্ধ সে পথ চেনবার জন্য নিশ্চয়ই আর এক অন্ধের কাছে যাবে না। সেইভাবেই যে-আচার্য নিজে এই আত্মজ্ঞান অর্জন করেননি তাঁর কাছে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষার্থী অতি বিনীতভাবে এই জ্ঞানী আচার্যের কাছে উপস্থিত হবেন। আচার্য শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অর্থ প্রত্যাশা করেন না কিন্তু শিষ্য বিনয়ী এবং ধৈর্যশীল শ্রোতা হবেন, এই প্রত্যাশা তাঁর থাকে। তিনি আরও আশা করেন যে, শিষ্য

বিষয়টি সম্পর্কে অনুরাগী এবং শ্রদ্ধাশীল হবেন। সত্যের জন্য শিষ্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে এবং যথাসাধ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পরই তিনি আচার্যের কাছে যাবেন।

'উপনিষদ্'—কথার অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। 'উপ' ও 'নি' পূর্বক 'সদ্' ধাতুর পরে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যোগে 'উপনিষদ্' শব্দটি গঠিত হয়। 'উপ' শব্দে শীঘ্র বা সামীপ্য বোঝায়। 'নি' শব্দে নিশ্চয় বা নিঃশেষ অর্থ বোঝায়। 'সদ্' ধাতু অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অবসান, বিনাশ অথবা প্রাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত। অতএব উপনিষদ্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, যে-বিদ্যা অধিগত হলে, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, সংসারদুঃখ নিঃশেষে বিনষ্ট হয়। অথবা যে-বিদ্যা নিশ্চিতরূপেই আত্মপ্রাপ্তি ঘটায়। 'উপনিষদ্ বিদ্যা' অর্থে উপনিষদ্ গ্রন্থকেও বুঝায়। এই উপনিষদ্ই বেদান্ত। বেদের শেষে বা অন্তে থাকে বলে বেদান্ত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডই বেদান্ত বা উপনিষদ্। বেদান্ত হলো বেদের চরম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তবাক্যগুলিই উপনিষদে পাওয়া যায়। বেদের এই সিদ্ধান্ত হলো জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। 'জীবব্রহ্মৈক্যমখিলবেদান্তানাং তাৎপর্যম্'—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই নিখিল বেদান্তসমূহের একমাত্র তাৎপর্য বিষয়। এই সিদ্ধান্তবাক্যগুলিকে মহাবাক্য বলা হয়। মহাবাক্যগুলি বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। চার বেদে চারটি মহাবাক্য আছে—ঋগ্বেদ—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঐতরেয় উপনিষদ), সামবেদ—তত্ত্বমসি (ছান্দোগ্যোপনিষদ), যজুর্বেদ—অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) ও অথর্ব বেদ—অয়মাত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্যোপনিষদ)। আরও কয়েকটি উপনিষদ্ বিখ্যাত, যেমন—ঈশ উপনিষদ্, কেন উপনিষদ্, কঠ উপনিষদ্, প্রশ্ন উপনিষদ্, মুণ্ডক উপনিষদ্, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ইত্যাদি। ছোট বড় প্রায় ১০৮টি উপনিষদ্ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রধানত ১১টি উপনিষদ্ প্রচলিত এবং সকলের পাঠ্য।

'বেদান্তসার' গ্রন্থে সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তের সংজ্ঞা দিয়েছেন—'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ'—অর্থাৎ বেদান্ত হলো উপনিষদ্ প্রমাণিত ব্রহ্মবিদ্যা এবং তার সহযোগী শারীরক সূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রাদি। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতেও—বেদের অন্ত বেদান্ত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষদ্ বেদান্তের মুখ্য অর্থ।

ব্রহ্মসূত্র (ন্যায়প্রস্থান)— তৃতীয় প্রস্থান হল ন্যায়প্রস্থান। একে ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, শারীরকসূত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। মহর্ষি ব্যাসদেব সূত্রাকারে শ্রুতির উদাহরণ, যুক্তি ও ন্যায়াদির সাহায্যে মোট ৫৫৫টি সূত্রে এই প্রস্থানটি রচনা করেন। তাই একে ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করে তিনি এই বেদান্ত সূত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের সার সঙ্কলন করে বেদব্যাস মানবজাতির মঙ্গলের জন্য অমৃতত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করলেন। 'ব্রহ্মণঃ সূত্রম্'—ব্রহ্মসূত্রম্ । শ্রীধর স্বামী বলছেন, যে গ্রন্থে ব্রহ্ম স্বল্পাক্ষরে সূত্রিত, সূচিত, কথিত, প্রকাশিত, তাই ব্রহ্মসূত্র।

আত্মজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উপায় এই বেদান্তদর্শনে নির্দেশিত হয়েছে। আত্মজ্ঞানের অনুভূতি না হলে মানুষের মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন(ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই কথা গুরুর কাছে শ্রবণ করা। তারপর মনন—বিচার করে মনে গভীর ধারণা করা। তারপর নিদিধ্যাসন—মিথ্যা জগৎকে মনে ত্যাগ করে, সৎ বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মনকে নিমগ্ন করা)। তারপর বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা—আত্মজ্ঞানলাভের শাস্ত্রীয় উপায়। বেদান্তদর্শনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান উপলব্ধি—সৎ-চিৎ-আনন্দ-এর অনুভূতি।

অন্যান্য দর্শনে যে-জ্ঞান বিন্যস্ত—বিচারিত—বেদান্তদর্শনের সুমীমাংসায় সেই প্রজ্ঞান পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। সেইজন্যই বেদান্তদর্শন—দর্শনরাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট। বেদান্তশাস্ত্রের মূল বিষয় পাঁচটি—অধ্যাস, ব্রহ্মবিচার, ব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণ এবং বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়। ব্রহ্মসূত্রে এই পাঁচটি বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই শাস্ত্রের প্রধান লক্ষ্য সকলপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থ।

ব্রহ্মসূত্রে চারটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় চারটি পাদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফলনির্ণয়। প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্য ও পদসমন্বয় সুব্যাখ্যাত—বেদান্তবাক্য যে ব্রহ্মে পর্যবসিত, তা প্রমাণিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত—বেদান্তসমন্বয়ের অবিরোধ প্রমাণ স্থাপন—শ্রুতিবাক্য-পরস্পরা সম্ভাবিত বিরোধ নিরসন। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল-বিচার।

ব্রহ্মসূত্রসমূহের প্রথম সূত্র—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। এই বাক্যে 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য বা অনন্তরতা—মানে 'এর পর' আচার্য শঙ্কর এই অর্থ করেছেন। 'এর পর' মানে কার পর? তার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেন, (১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (২) ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ, (৩) শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব—এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়ার পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মবিচারের অধিকার জন্মায়। অতএব 'অথ' মানে হলো এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয়ে অধিকারী হবার পরে ব্রহ্মবিচার। আচার্য রামানুজও 'অথ' শব্দের অর্থ আনন্তর্য করেছেন বটে , তবে এই সাধনচতুষ্টয়ের আনন্তর্য নয়। পরন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে তবে ব্রহ্মবিচার। আগে কর্ম করে কর্মের অনিত্যতা বুঝতে হবে, তারপর ব্রহ্মবিচার। তা না হলে ব্রহ্মবিচার একটি কথার কথা মাত্র। কর্মের প্রতি ঠিক ঠিক অনিত্যতা বোধ হলেই ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তি জন্মায়। এ বিষয়ে মুণ্ডক উপনিষদ বলেন—'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ...' —কর্ম-অর্জিত ফলস্বরূপ সমস্ত লোকে ভোগসুখাদি পরীক্ষা করে ব্রাহ্মণ নির্বেদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ এই কর্মফলার্জিত লোকসমূহ অসার, অনিত্য,

অতএব এতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই—এই বোধ জন্মায়। এর দ্বারা তার বিবেকজ্ঞান জন্মায়— এই অনিত্য বস্তু দ্বারা নিত্য বস্তুকে পাওয়া যায় না। তখন সেই নিত্য ব্রহ্ম-বস্তুকে লাভ করার জন্য তিনি গুরুর নিকট গমন করেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (স্মৃতিপ্রস্থান)—গীতা একটি সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের নির্যাস রয়েছে গীতায়। গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। বলা হয়, ভগবানের গান। তাই গীতাকে উপনিষদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। গীতাকে বেদান্তশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। সনাতন ধর্মের প্রধান তিন বেদান্তশাস্ত্রের (উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা) মধ্যে গীতা সকলের কাছে খুব প্রিয়। কারণ গীতা চারটি যোগের সুন্দর সমন্বয় করেছে---জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ অথবা আত্মার সঙ্গে যোগ। ভগবান এই চারটি যোগ অভ্যাসের পথ গীতায় বলেছেন। যে-কোনও একটি যোগকে অবলম্বন করে অথবা চারটি যোগের সমন্বয়ে মানুষ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে। তাছাড়া গীতা জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয় করেছে। বেদের তিন কাণ্ড—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়-সমন্বিত প্রথম ছয়টি অধ্যায় কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয়টি অধ্যায় উপাসনাকাণ্ড এবং শেষ ছয়টি অধ্যায় জ্ঞানকাণ্ড। তাই গীতা ভাল করে বুঝলে সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের একটা সুন্দর ধারণা হয়ে যায়। তবে গীতার মধ্যে গূঢ় তত্ত্বকথা বোঝা খুব সহজ নয় তাই ভাষ্যের ও টীকার সাহায্য নিতে হয়। ভাষ্যসমূহের মধ্যে শঙ্করভাষ্য বেশ যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়।

গীতার উপদেশ অমৃতপানতুল্য। এই অমৃত সুধা সকল দেশের, সর্বস্তরের মানুষের, সর্বকালের জন্য। উদ্দেশ্য মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—from lower truth to higher truth. তাই গীতা শুরু হয়েছে এক উত্তাল রণভূমিতে। যেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতার চরম প্রকাশ। সংসারে ঐ অবস্থায় গীতাই একমাত্র আলোর দিশারি। গীতা এখন থেকেই বলছে এগিয়ে চলো, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে থেমে গেলে বা পিছিয়ে পড়লে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। ফলে গীতা সন্ন্যাসী, সংসারী সকলের জন্য।

মহাভারতের সময় বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের আগে, খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে, মহাভারতের যুগ বা দ্বাপর যুগ। রামায়ণ ত্রেতাযুগে---আরও প্রাচীন। গীতার সৃষ্টি ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে, যাকে বলা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র। একদিকে অধর্ম, অন্যদিকে ধর্ম। এই দুই পক্ষের মাঝখানে গীতার বাণী বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রশ্ন করছেন শিষ্য অর্জুন। অর্জুন সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধি হয়ে ভগবানকে প্রশ্ন করছেন। সমগ্র মানুষের মনের প্রশ্ন—ঐহিক বা লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক। সংসারে জীব মায়ায় আবদ্ধ, কিভাবে দুঃখ, সংশয়, অহংকার, কর্তৃত্ব, কামনা, ক্রোধ, মোহ, আসক্তি ইত্যাদি তমঃ ও রজঃ গুণের অন্ধকারময়

অবিদ্যার প্রভাব ত্যাগ করে ঐ বিষাদযুক্ত মনে ঈশ্বর চিন্তার আনন্দ লাভ করবে, সত্ত্বগুণের প্রভাবে দৈবী সম্পদ লাভ করে মানুষ দেব মানবে রূপান্তরিত হবে এবং পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে, সেই আত্মতত্ত্বের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

গীতা শুরু হচ্ছে অর্জুনবিষাদ যোগ দিয়ে। যেখানে অর্জুন বিষাদগ্রস্থ মনে অপর পক্ষের সৈন্যদল দেখেই বলছেন, এ তো দেখছি সব আমার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন, রক্তের সম্পর্ক এদের সঙ্গে। সিংহাসনের লোভে আমি এদের হত্যা করব? এ অসম্ভব, এ মহাপাপ। আমি কখনও করতে পারব না। আমার হাত-পা কাঁপছে, ঘাম হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে। বংশনাশ-জনিত মহাপাপ আমি করতে পারব না।---এই বলে অর্জুন রথের উপর বসে পড়লেন।

অর্জুনের এই অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই বিপদের সময়ে তোমার এই মোহ, এই নির্বুদ্ধিতা কোথা থেকে এল? যারা হীনবুদ্ধি অনার্য তাদের মতো তুমি কথা বলছ। এ তোমাকে মানায় না। তুমি আর্য —সৎ, বুদ্ধিমান, বিচারশীল। তোমার যদি হীনবুদ্ধি হয় তবে তুমি কখনও দেবত্বে উন্নীত হতে পারবে না। তুমি ধর্মযুদ্ধ না করলে তোমার দুর্নাম হবে। লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলবে। তুমি ক্ষত্রিয়।

ভগবান বলছেন, *'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।'* (গীতা-২/৩)হে অর্জুন, তুমি ক্লীবভাব আশ্রয় করো না। অর্থাৎ তুমি দুর্বল, কাপুরুষ, মেরুদণ্ডবিহীন হয়ো না। এই ভীরুতা তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। ভীরুতা ও দুর্বলতার জন্য তুমি যুদ্ধ করবে না অথচ মুখে অহিংসার কথা বলছ —এ ঠিক নয়। যে দুর্বল ও কাপুরুষ তার মুখে অহিংসার কথা সাজে না। যদি তোমার শত্রুকে আঘাত করার ক্ষমতা থাকে তখন তোমার ক্ষমা, দয়া বা উদারতা দেখানো সাজে। এখন তুমি দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তাড়াতাড়ি ঈশ্বরলাভ হয়।' এই অর্থে বলছেন যে, যদি তুমি দুর্বল হও তাহলে শাস্ত্রের সহজ অর্থ করতে গিয়ে ভুল অর্থ করবে। গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবে না। তোমাকে বীর হতে হবে। কারণ সত্যকে জানতে পথ যতই দুর্গম, কঠিন হোক তবু সত্যকে জানব।

অর্জুন তার ভয় ও দুর্বলতাকে ঢাকতে অনেক যুক্তি দিয়ে বলছেন, আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে আমি এ রাজ্যসুখ, ধনসম্পদ ভোগ করতে চাই না। এই কাজে আমার মহাপাপ হবে। তার চেয়ে বরং আমি ভিক্ষা করে খাব। তাছাড়া আমি বুঝতে পারছি না কোনটা শ্রেয় কাজ। স্বজনবধের ভয়ে আমি দুর্বল। আমার চিত্ত অভিভূত। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাই হে সখা, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা

মঙ্গল তা নিশ্চিত করে বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত। আমাকে উপদেশ দিন।

অর্জুনের বিষাদ বা অজ্ঞান দূর করার জন্য ভগবান আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ আত্মতত্ত্ব শ্রবণে মানুষের অজ্ঞান নাশ হয়। **আত্মা কী ও তার স্বরূপ কী?** শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, অর্জুন, তুমি জ্ঞানীদের মতো যুক্তি দিয়ে কথা বলছ অথচ যাঁদের জন্য শোক করার কোনও প্রয়োজন নেই, তুমি তাঁদের জন্য শোক করছ। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী ও পণ্ডিত তাঁরা মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না। কারণ জ্ঞানীরা বলেন—এই দেহ পরিবর্তনশীল। তাই এই অনিত্য দেহের জন্য কখনোই শোক করা উচিত নয়। দেহের তো একদিন নাশ হবেই। কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য। যিনি জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনি অনর্থক জন্ম বা মৃত্যুতে শোক করেন না।

এই যে জন্মমৃত্যু—এ কার জন্ম, কার মৃত্যু? *'ন জায়তে, ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'*—আত্মার কোনও জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। হিন্দুরা এই তত্ত্বকে বিশ্বাস করে ধরে আছে যে, দেহটা আমি নই। জন্ম আছে যার, তার মৃত্যুও আছে। আরম্ভ আছে যার, তার শেষও আছে। কিন্তু যার আরম্ভ নেই, তার শেষও নেই। আত্মা হচ্ছে এমন তত্ত্ব যা নিত্য। তাই আত্মাকে বলা হচ্ছে সনাতন। ঋষিরা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন *'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'*—তুমি আমাকে মারতে পার, আমার শরীরটাকে মারতে পার, ভাঙতে পার, কিন্তু আমার মৃত্যু হবে না। 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি'—কোনও অস্ত্র দিয়ে তুমি একে ছেদ করতে পার না, মারতে পার না। 'নৈনং দহতি পাবকঃ'—আগুনে পোড়াতে পার না। 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্তি আপঃ'—জলেও ভেজাতে পার না। 'ন শোষয়তি মারুতঃ'—বাতাসও একে শুকোতে পারে না। এই আত্মা কীরকম? 'নিত্যঃ সর্বগতঃ'—সর্বভূতে বিরাজ করছেন তিনি । আত্মা স্থির, অচল এবং সনাতন। 'অব্যক্তঃ'-—একে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 'অচিন্ত্যঃ—বাক্যমনাতীত, তার সম্বন্ধে চিন্তা বা কল্পনা করতে পারি না। 'অবিকার্যঃ'—তার কোনও পরিবর্তন নেই। এই আত্মাকে যদি তুমি জানতে পার, তাহলে তোমার আর শোকের কোনও কারণ থাকে না।

তাই শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, 'সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই যুদ্ধ তোমাকে করতে হবে। এই যুদ্ধ অপরিহার্য, অনিবার্য। এরই নাম প্রকৃতি। একে রোধ করা যায় না। অর্জুন এই যে তুমি বলছ, ''আমি যুদ্ধ করব না''—এসব তোমার অহঙ্কার। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তুমি এই কথা বলছ। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়ের সন্তান। তোমার ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। তোমার যুদ্ধ করাই সহজাত। যুদ্ধই তোমার কর্তব্যকর্ম। তুমি আসক্তিশূন্য হয়ে তোমার কর্তব্য পালন করে যাও। এই যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যু হয় তাতে তুমি স্বর্গে যাবে।'

তুমি পরের ধর্ম অনুকরণ করো না। এই যে তুমি বলছ 'আমি ভিক্ষে করব'— এটা তোমার ধর্ম নয়। ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী তাদের ভিক্ষা করা ধর্ম। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, রাজা, ভিক্ষা করা তোমার স্বধর্ম নয়। তোমার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, তোমার ধর্ম যুদ্ধ করা। তাতে যদি তুমি সফল না হও, তবুও ভাল। নিজের স্বধর্ম পালন কর। *'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'*—নিজের ধর্ম পালন করতে গিয়ে তোমার মৃত্যু হলেও সেই মৃত্যু শ্রেষ্ঠ। *'তস্মাদ্ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ'*-—অতএব অর্জুন, তুমি সাহস অবলম্বন কর। যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প কর। তাছাড়া সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এই দুটোই আমাদের কাছে সমান। এটাই আমাদের আদর্শ। কখনও বিচলিত হব না।

অতএব অর্জুন তোমার একমাত্র কর্তব্যকর্ম , যুদ্ধ করা। তাতে তোমার কোনও পাপ হবে না। তাছাড়া কর্মেই তোমার অধিকার। *'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'*—কর্মে তোমার অধিকার কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা করো না। কর্ম ও কর্মের ফল দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখতে হবে। তবে কর্মের একটা ফল অবশ্যই থাকবে। আমার কর্মে অধিকার কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই কর্মফল-দাতা। সেই ফল আমি ভোগ করব না। কর্ম করব সকলের কল্যাণের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য। আমাদের কর্ম ও উপাসনা আলাদা নয়। কর্মই উপাসনা। আমাদের জীবনটা একটা উপাসনা। ফলে আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম সবই উপাসনা এবং আধ্যাত্মিক। বৈষয়িক কিছু নয়। সবই পূজা।

গীতার শিক্ষা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম করা। কর্মে ফাঁকি দেওয়া বা পালিয়ে যাওয়া নয়। কর্মই উপায় এবং যথাসাধ্য সাবধানে, যত্ন নিয়ে কাজ করতে হবে। কর্মে যেন কোনও ত্রুটি, অলসতা না আসে। ফল আপনা-আপনিই ভাল হবে। নিজের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম করো না। নিজের আমিত্বকে মুছে ফেলা অর্থাৎ আমার আমিত্বটাকে জয় করা-—এটাই ধর্মের উদ্দেশ্য। এই নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হলেই জ্ঞান আপনা-আপনি প্রকাশ পায়। তুমি সন্ন্যাসী, সংসারী, ছাত্র কিংবা ব্যবসায়ী যাই হও না কেন, এই নিষ্কামকর্মে তোমার আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব।

সাধারণ মানুষ কর্মের দাস। কাজ না করে আমরা কখনোই থাকতে পারি না। শরীর, মন বাক্য দ্বারা কোনও না কোনওভাবে আমরা সকলেই কাজ করছি। প্রকৃতিই আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে। আর যখন কাজ করতেই হবে তখন কৌশলে করতে হবে। কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। গীতা এই কর্মের কৌশলের পথ বলে দেয়, যাতে কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির সহায়ক হয়।

গীতার উচ্চ শিক্ষা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া। আমাদের জীবনের আদর্শ স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না দুই-ই আমাদের জীবনে আসবে। কিন্তু যে সুখ-দুঃখ দুটোকেই সমান চোখে দেখতে পারে, দুটোকেই সমান ঔদাসীন্যের সাথে গ্রহণ করতে পারে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। সুখে অভিভূত হচ্ছে না আবার দুঃখে বিচলিত হচ্ছে না। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে

জিজ্ঞাসা করছেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা, কিং প্রভাষেত, কিম আসীত, ব্রজেত কিম্'—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন, কীভাবে থাকেন এবং কীভাবেই বা চলাফেরা করেন?

এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ কথাটার অর্থ যার প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে স্থিত। প্রজ্ঞা মানে জ্ঞান। অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম'—এই বুদ্ধিতে যিনি স্থির, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তার মন সর্বদা ঈশ্বরমুখী। ভগবান ছাড়া তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোনও বস্তু নেই। পরমাত্মাই তাঁর আশ্রয়। পরমাত্মাতেই তিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ সম্পর্কে বলছেন, যিনি মনের বাসনা-কামনা সম্পূর্ণভাবে নাশ করেন এবং একমাত্র আত্মচিন্তায়, পরমানন্দস্বরূপেই ডুবে থাকেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁর আনন্দ বাইরের আর কোনও বস্তুর উপর নির্ভর করে না। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া। একেই বলে ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রহ্মবুদ্ধিতে, 'আমি ব্রহ্ম'—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অবস্থাকে বলে জীবন্মুক্ত অবস্থা। একেবারেই নির্লিপ্ত—ভয় নেই, ক্রোধও নেই। অনুরাগ নেই আবার বিরাগ নেই। প্রিয় বা অপ্রিয় দুই অবস্থাকে সমানভাবে গ্রহণ করেন। সকল ইন্দ্রিয় সংযত। মন একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন, পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত।

বেদান্তধর্মের মূল কথাই হল আত্মজ্ঞান লাভ। সেই জ্ঞানলাভের সাধন হল জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের সমন্বয়। গীতার পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে এই কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তির আলোচনা হয়েছে। কর্ম বলতে বোঝায় নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির ফল আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনিষ্ঠা। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বারবার বলছেন, আমরা এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারব না। কিন্তু কীভাবে কর্ম করব? 'তস্মাৎ অসক্তঃ'—আসক্তিশূন্য হয়ে কর্ম করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা।' তেল মানে অনাসক্তি। আমরা সংসারে থাকব কিন্তু সংসার আমাদের স্পর্শ করবে না, নির্লিপ্তভাবে থাকব। I will be in the world but not of the world —এই হচ্ছে আমাদের আদর্শ। যিনি এইভাবে অনাসক্ত হয়ে, আসক্তিশূন্য হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছেন তিনি পরমকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেন। কর্মই আমার কাছে ঈশ্বরলাভের জন্য উপাসনা, পূজা। ফলে নিষ্কাম কর্ম আত্মজ্ঞান লাভের সহায় বলে একে বলা হয় কর্মযোগ।

শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলে অর্জুনকে বলছেন, যাঁরা গুরুজন, মহৎ ব্যক্তি তাঁরা যা করেন, সাধারণ মানুষ তাই করে। তাঁদের অনুকরণ করে। ফলে অর্জুন তুমি রাজা ও বিদ্বান। তুমি যদি সৎ-কর্ম না কর তাহলে সাধারণ মানুষ তাই করবে। তুমি কীভাবে কাজ করবে? 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য-অধ্যাত্ম-চেতসা'(৩/৩০)—সমস্ত কর্ম ও তার ফল তুমি আমাকে অর্পণ করে দাও। সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ কর। কোনও আশা রেখো না। মমত্ববুদ্ধি রেখো না। এ সংসারযুদ্ধ তোমার কর্তব্য- কর্ম। তুমি কর্তব্য পালন করে যাও। কোনও দুর্বলতা মনে স্থান দিও না। আমার উপর মন রেখে অর্থাৎ

ঈশ্বরে মন রেখে যন্ত্রবৎ কর্ম করে যাও।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানযোগের কথা বলছেন। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয় অর্থাৎ নিজের অবতারত্বের কথা বলছেন। তুমি যে বলছ, তোমার আত্মীয়স্বজনদের মৃত্যু হবে কিন্তু তুমি জান না কতবার তোমার জন্ম হয়েছে, আর কতবার মৃত্যু হয়েছে। আমি জানি আমার কতবার জন্ম হয়েছে। আমি অবতার। আমি তো স্বেচ্ছায় যেন একটা দেহ ধারণ করেছি। কিন্তু আমার 'অজোঽপি সন্'—আমার জন্ম হয়নি কখনও। 'অব্যয় আত্মা'—আমি অপরিবর্তনশীল আত্মা। আমার কখনো জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। 'ভূতানাম্ ঈশ্বরেবঽপি সন্'—আমি সকলের ঈশ্বর, সকলকে চালাচ্ছি। 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়'—নিজের মায়াশক্তির সাহায্য নিয়ে আমি বারবার দেহধারণ করি। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ঈশ্বর যেন দেহধারণ করেন।

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত'—হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি ঘটে, যখন অধর্মের প্রভাব বাড়ে, 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'—তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। কেন? 'পরিত্রাণায় সাধূনাং'—সাধুদের রক্ষা করার জন্য। 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—পাপীদের দমন করার জন্য, পাপ দূর করার জন্য। 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—ধর্ম স্থাপন ও রক্ষার জন্য আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি।

তাছাড়া 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'—যে যেখানে, যেভাবে পূজা করছে, যার যেমন ইচ্ছা ও রুচি—আমি তাদের সবার পূজা গ্রহণ করি। সবাই আমার পথেই চলছে, আমাকে অনুসরণ করছে। নানা পথে তারা আমাকেই অনুসরণ করছে।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ' (গীতা-৫/৭)—সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা। তিনি আমার ভিতরে, তিনিই আমার বাইরে—এভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে আছি। নিষ্কাম কর্মযোগের সাহায্যে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, যিনি নিজের দেহকে বশে এনেছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি সর্বভূতের আত্মার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন দেখেন, তিনিই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত। তিনি কর্ম করেও কর্মে লিপ্ত হন না।

যিনি জ্ঞানী তিনি সবসময় কাজ করছেন কিন্তু মনে করছেন, তিনি কিছুই করছেন না। একমাত্র ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই করাচ্ছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সর্বদা এমনভাবে যুক্ত আছেন, যেন মনে হচ্ছে ঈশ্বরই সবকিছু করছেন। ভাবটা হচ্ছে 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'। দেখলে মনে হবে জ্ঞানী জাগতিক সমস্ত কর্ম করছেন—দেখছেন, শুনছেন, স্পর্শ করছেন, ঘ্রাণ নিচ্ছেন, খাচ্ছেন, যাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন, নিঃশ্বাস নিচ্ছেন—তথাপি মনে করছেন আমি কিছুই করছি না। ইন্দ্রিয়েরা যে যার কাজ করছে কিন্তু আমি কিছু করছি না। আমি যা-কিছু করছি ঈশ্বরকে আশ্রয় করে করছি। তিনিই আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন।

এই ভাব নিয়ে কর্ম করলে কী ফল? 'লিপ্যতে ন স পাপেন'— পাপ আমাকে স্পর্শ করবে না। 'পদ্মপত্রমিবা-অম্ভসা'— ঠিক যেন পদ্মপত্রের মতো। জলের উপর পদ্মপত্র

ভাসছে, কিন্তু পাতাটা কখনও ভিজছে না। সেইরূপ আমি সংসারে সব করব অথচ, আমি কিছুই করছি না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সংসারে কেউ কি আমাকে সাহায্য করবে, আমার জীবনের উন্নতির পথে? গীতায় শ্রীভগবান ধ্যানযোগের উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন, যোগ অভ্যাসের দ্বারা মনকে বাসনামুক্ত করা, শান্ত করা সম্ভব। সমস্ত মনটা ঈশ্বরমুখী করে, যোগযুক্ত হয়ে সমাধি লাভ করার জন্য,অভ্যাস করতে হবে। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'— মানুষ বিচার-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে। নিজেকে কখনও অধোগামী করবে না। কেননা আমিই আমার কাছে বন্ধু, আমি আবার আমার কাছে শত্রু। আমি আমার ভাগ্যের নিয়ন্তা। আমি নিজেকে জ্ঞানী করতে পারি আবার আমি নিজেকে পাপী করতে পারি। সেইজন্য নিজেকে কখনও ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অক্ষম ভাবতে নেই। স্বামীজী বলছেন, যারা কাপুরুষ, বোকা, তারাই ভাগ্যের কথা বলে। কিন্তু যারা বলবান, সাহসী, তারা বলে 'আমার ভাগ্য আমি নিজেই গড়ে তুলব'।

এই যোগ একদিনে সম্ভব নয়। 'অভ্যাসযোগযুক্তেন'—অভ্যাসের দ্বারা যোগযুক্ত, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়া সম্ভব। ভগবান বলছেন, 'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ'(গীতা-৬/১৫)—যিনি সবসময় আমার সাথে যুক্ত হয়ে আছেন, মন আমাতে সমাহিত, সবসময় মনটাকে তিনি সংযত করে রেখেছেন—তিনিই যোগী। 'শান্তিং নির্বাণপরমাং' তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। 'নির্বাণ'-ই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ মোক্ষ। সেই অবস্থা লাভ হলে সব বাসনার লয় হয়। মানুষ পরম শান্তি লাভ করেন। তিনি সর্বদা আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ পরমাত্মাকে জেনেছেন। সেই যোগী আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে ডুবে থাকেন। 'যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা' (গীতা-৬/১৯)—বাতাসহীন স্থানে প্রদীপ রাখলে যেমন প্রদীপের শিখা কাঁপে না, যোগ-অভ্যাসকারী যোগীর সংযত চিত্তও ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের চিন্তায় শান্ত এবং নিশ্চল থাকে।

এই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানলে যোগীর সব জানা হয় ও পরম আনন্দ লাভ হয়। আর কোনও বিষয় জানা বা আনন্দের অপেক্ষা থাকে না। আত্মজ্ঞানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। গীতা বলছেন, ব্রহ্মকে জানা মানেই ব্রহ্মই হয়ে যাওয়া। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে তিনি মুক্তপুরুষ।

এই অবস্থায় তিনি ঈশ্বরকে যেমন তাঁর ভিতরে দেখেন তেমনি ঈশ্বরকে বাইরে দেখেন। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'(গীতা-৬/৩০)— যে আমাকে সকলের মধ্যে দেখছে, আবার সকলকে আমার মধ্যে দেখছে। 'তস্যাহং ন প্রণশ্যামি' এক মুহূর্ত তার মন থেকে আমি সরে যাই না এবং 'স চ মে ন প্রণশ্যতি'— আবার আমিও কখনও তাকে ভুলে যাই না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, চোখ বন্ধ করলে

ঈশ্বরকে দেখা যায় আর চোখ খুললে ভগবানকে দেখা যায় না? অর্থাৎ সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন।

ঈশ্বর এক। সেই একই বহু হয়েছেন। প্রত্যেক রূপই আসলে তাঁর রূপ। বস্তুত জগৎরূপে তিনিই প্রকাশিত হয়েছেন। ভগবান বলছেন, ফলে যে আমার সাধনা করে, সকল অবস্থায় সে সর্বদা আমাকেই দেখে, 'স যোগী ময়ি বর্ততে'— আমাতেই ডুবে থাকে, আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এমনকী, মৃত্যুকালে যে ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে, সে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়।

ভগবান বলছেন, 'অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্তা কলেবরম্ যঃ প্রয়াতি'...(গীতা-৮/৫)—অন্তকালে যে আমার নাম করতে করতে যায়, সে আমার কাছেই আসে, আমাতেই লিপ্ত হয়ে যায়। তবে এটা অভ্যাসের ফলে সম্ভব। যদি সর্বদা ঈশ্বরের নাম করি তবে মৃত্যুকালে তাঁর নাম আপনিই আসবে। যদি সারাজীবন ধরে আমি বিষয়ের চিন্তা করি তবে মৃত্যুকালেও সেই ভাবনাই হবে। যে যে-ভাব নিয়ে দেহটাকে ত্যাগ করে, সে সেই ভাবই লাভ করে।

তাই ভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর'(গীতা-৭/৮)— অতএব সব সময়ের জন্যে আমাকে স্মরণ কর। আমাকেই মন, বুদ্ধি সবকিছু অর্পণ কর। সর্বদা আমার নাম স্মরণ-মনন কর। তাহলে তুমি আমাতেই পৌঁছাবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আসলে মনটাকে ঐ রঙে অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তায় রাঙিয়ে ফেলতে হবে। মন আর কোথাও যেন না যায়। ভগবান আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি, তুমি ভালবাস আর না বাস। তাছাড়া ভগবান আমাদের কাছে কিছুই চান না, শুধু ভালবাসা চান। ভগবান বলছেন, 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'—পত্র, পুষ্প, ফল ও জল দিয়ে আমাকে আরাধনা কর। ভগবান সোনা কিংবা অর্থ চান না। ভগবান শুধু আমাদের মনটা চান। শুধু তাঁর প্রতি ভালবাসা।

ভগবান বলছেন, 'ভক্তি-উপহৃতম্'—ভক্তির সাথে, ভালবেসে যে-যা উপহার আমাকে দেয়, 'তদহং অশ্নামি'—আমি তা গ্রহণ করি। আমি যা করছি সব ঈশ্বরের পূজা। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ'(গীতা-৯/২৭)—তুমি যা করছ, যা খাচ্ছ, যা তুমি দিচ্ছ— 'যৎ তপস্যসি'—তুমি যে সব তপস্যা করছ—হে অর্জুন, 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্'—তা আমাকে দিয়ে দাও। দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে যা কিছু আমি করছি এবং যা কিছু আমার আছে সব ঈশ্বরকে দিয়ে দেওয়া।

ভগবান বলছেন, 'মন্মনা ভব' মনটা আমাকে দিয়ে দাও, সর্বদা আমার কথা ও লীলা চিন্তা কর। 'মদ্ভক্তো'—আমাকে ভালবাস। 'মদযাজী'—আমাকে চাও। জগতে অন্য কিছু চেয়ো না। 'মাং নমস্কুরু'—আমাকেই প্রার্থনা কর ও প্রণাম কর। 'মামেব

এষ্যসি'—তাহলে তুমি আমাকেই পাবে। জীবনের শেষে আমাতেই মিলিত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনের মনে তাঁর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে দিতে চান। সহজে বিশ্বাস তো হয় না। আমাদের সন্দিগ্ধ মন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন অর্জুনকে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ'—আমি তোমাকে দিব্য চোখ দিচ্ছি, যা দিয়ে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আমার পরম দিব্যরূপ তুমি দর্শন কর।

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন একেবারে হতবাক। বলছেন, 'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে'(গীতা-১১/১৫)—তোমার দেহের মধ্যে সব দেবদেবীকে দেখছি, যত জীবজন্তু, যা কিছু জগতে আছে সব তোমার মধ্যে প্রবেশ করছে। যত হাত সব তোমার হাত, যত চোখ সব তোমার চোখ, যত মুখ সব তোমার মুখ, সবকিছু তুমিই। অনন্ত রূপ তোমার। 'নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং'(গীতা-১১/১৬)— তোমার আদি নেই, তোমার মধ্য নেই, তোমার অন্তও নেই। তোমার এই উগ্ররূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত।

শেষে অর্জুন বলছেন, আমি কত ভুল করেছি। তোমাকে বন্ধু মনে করে সখা বলেছি, নাম ধরে ডেকেছি। জানতাম না তুমি কে। তুমি ক্ষমা কর। আমি অজ্ঞান, তোমার মহিমা যে কী তা জানতাম না। তোমার এই রূপ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত। 'তদেব মে দর্শয় দেব রূপং'(গীতা-১১/৪৫)—তুমি দয়া করে তোমার পূর্বরূপে আবার ফিরে এসো। এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্যরূপ থেকে পূর্বের মানুষ-রূপে ফিরে আসলেন। অর্জুন ভগবানের মানুষ-রূপ দেখে খুশি। তিনি বলছেন, তোমার এই সৌম্য, শান্তরূপ দেখে আমি শান্ত ও প্রসন্ন হলাম।

যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, যাঁর সমস্ত উপাসনার লক্ষ্য ঈশ্বর, সর্বদা ঈশ্বরের ভজনা করেন, ঈশ্বরের প্রতি যিনি আসক্ত, সকল আত্মীয় সম্পর্কে আসক্তিশূন্য, যিনি সকল ভূতে এমনকী অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও শত্রুভাবশূন্য—তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন—'মৎকর্মকৃৎ-মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ' (গীতা-১১/৫৫)।

শ্রীকৃষ্ণ এবার অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, তোমার এই অহংকার দূর কর। তোমার এখন কর্তব্যকর্ম এই যুদ্ধ। তুমি যুদ্ধ কর। তাছাড়া তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। সকল প্রকার 'আমি, আমার' ভাব আমাতে অর্পণ করে সর্বদা সমস্ত কর্ম করে যাও। মনে রেখো তুমি আমার যন্ত্রমাত্র। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে-অর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা-১৮/৬১)—ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি সকলকে চালাচ্ছেন যন্ত্রের মতো। তিনি যন্ত্রী এবং সকল জীব যন্ত্র। তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা আমাদের তিনি চালাচ্ছেন।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তোমাকে একটা অতি গোপন অথচ সত্য কথা বলছি। কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি। তুমি অত তর্ক-বিতর্ক করতে যেও না। অত বিচার করতে যেও না। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু'(গীতা-৩৪/৯)—তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত রাখ। আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। এভাবে তোমার মন আমাতে সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে। 'সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'—তোমার কাছে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি একথা বিশ্বাস কর।

ভগবান এবার শরণাগতির কথা বলছেন। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা-১৮/৬৬)—সকল প্রকার আচার-বিচার, ধর্ম-অধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। আমি সমস্ত বন্ধনরূপ পাপ থেকে তোমাকে উদ্ধার করব। কোনও ভয় বা দুশ্চিন্তা করো না।

ভগবানের এই আশ্বাসবাণী ও প্রতিজ্ঞা শোনার পর অর্জুন বলছেন, আমার মোহ দূর হয়ে গেল। 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত' (গীতা-১৮/৭৩)—আপনার কৃপাতে এতক্ষণে আমার চোখ খুলে গেল। এখন আমার মন স্থির হয়ে গেছে। 'গতসন্দেহঃ'—মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। আর কখনও তোমার কথার উপরে আমি সন্দেহ করব না। এখন থেকে তোমার সব কথা মেনে চলব।

গীতার সমাপ্তি হচ্ছে সঞ্জয়ের কথা দিয়ে। বলছেন, 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ' (গীতা-১৮/৭৮)—যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত, আর যেখানে পার্থর মতো ধনুর্ধর রয়েছেন, সত্য, রাজশ্রী, বিজয়, সাফল্য, অভ্যুদয় এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করবে এটা নিশ্চিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সংক্ষিপ্ত সারাংশ---

গীতা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়। এটি মানব-ধর্মগ্রন্থ। গীতার ধর্মোপদেশ সার্বভৌম। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই গীতার উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। গীতার উপদেশ সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়—

১) **উদারতা**—গীতার প্রধান শিক্ষা উদারভাবসম্পন্ন হওয়া। তাই গীতা সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। সনাতন ধর্মের যে মূল ভাব উদারতা, সেটাই গীতার বাণী। গীতায় শ্রীভগবানের উদার বাণী—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।।'(গীতা-৪/১১)—যিনি যে-প্রকারে (মোক্ষ, জ্ঞান, কাম্য বস্তু, অথবা আর্তি-নিবারণের জন্য) আমার উপাসনা করেন, আমি (সর্বফলদাতা পরমেশ্বর) তাঁকে

সেই ফল প্রদান করি অর্থাৎ সকামকে তাঁর কাম্য ফল এবং নিষ্কামকে মুক্তি প্রদান করি। হে পার্থ, লোকে যে-পথই অবলম্বন করুক না কেন সকল পথেই আমাতে পৌঁছাবে—যে আমাকে যে-ভাবে ভজনা করে আমি তাঁকে সেই ভাবেই সন্তুষ্ট করি। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, অহিন্দু—গীতোক্ত ধর্মে সকলেরই স্থান আছে। এই উদার বাণী বর্তমান যুগে আরও সহজ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'যত মত তত পথ'। তিনি নিজেই সকল ধর্মমত সাধন করে এই তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ গীতার এই বাণী শিকাগো ধর্মসভায় উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, আমরা সনাতন হিন্দু ভারতবাসী চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। কোটি কোটি নরনারী শৈশব থেকে একটি স্তোত্র পাঠ করে— 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।'—বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়, তেমনি হে ভগবান্, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্রবশত সরল ও কুটিল নানা পথে যারা চলেছে, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

২) **নিষ্কাম কর্ম-শিক্ষা**—কর্ম-শিক্ষা, কর্ম-প্রেরণা গীতার একটি বিশেষত্ব। ভগবান গীতায় সবচেয়ে বেশি নিষ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। কর্ম-বলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে—শৌর্য-বীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সুখ-সমৃদ্ধি, শিক্ষা-সভ্যতা—অর্থাৎ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদই লাভ সম্ভব। ভগবান নিষ্কাম কর্মের আদেশ করছেন—নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম এবং আত্মবান্ হও। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলেও জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হতে পরিত্রাণ পাবে। অতএব তুমি 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর'(গীতা-৩/১৯)— অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্ম কর এবং তুমি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করবে। নিষ্কাম কর্মে যোগী সম ও শান্ত অর্থাৎ 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'—স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা লাভ করে। অহংকারশূন্য হয়ে ঈশ্বরে ফল অর্পণপূর্বক সকল কর্ম (কর্মানুষ্ঠান, আহার, যজ্ঞ, হোম, দান, তপস্যা) করা চাই—'যৎ করোষি যদ্ অশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।' জগতে কোনও ধর্মগুরু বা ধর্মগ্রন্থ এমনভাবে মুক্তকণ্ঠে এই তত্ত্ব প্রচার করেননি। গীতা বলছেন, সচন্দন পুষ্প ভগবানের চরণে অর্পণ করলে যেমন পূজা হয়, তেমনি স্ব স্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করলেও তাঁর উপাসনা হয়। নিষ্কাম কর্মও ঈশ্বরের আরাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কামনাশূন্য হয়ে সেবাবুদ্ধিতে কর্ম করতে বলছেন। স্বার্থবুদ্ধি বা 'আমি করছি' ও 'আমার জন্য করছি'—এই বুদ্ধি (ভাব) মনে যেন না থাকে। কাজ করব কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজ করব। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্মের সব ফল সমর্পণ

করব। আমার নিজের জন্য আমি কিছু চাই না। ঠাকুর বলছেন: কর্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা। এটাই আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'ঈশ্বরার্থং কর্ম'। এই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরলাভ। কর্ম করব শুধু ঈশ্বর লাভের জন্য।

৩) **সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি ও ঈশ্বরভাব**—গীতাতে ভগবান আত্মার অমরত্বের শিক্ষা দিচ্ছেন। এই আত্মা অবিনশ্বর ও চির নিত্য। ভগবান বলছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'(গীতা-৭/৭)—যেমন সূত্রে গাঁথা সব মণি, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মভূত আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত রয়েছে। যাবতীয় বস্তুতে এই ব্রহ্মসত্তার অনুভূতির নামই ব্রহ্মজ্ঞান। এই জ্ঞান অনুভব হলেই সমস্ত ভেদবুদ্ধি দূর হয় এবং প্রকৃতির বন্ধন হতে জীবের মুক্তি লাভ হয়। তখন ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করে, আত্মাতে ও ভগবানে সর্বভূত এবং সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন হয়, সাধক ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, সর্বত্র সমত্ববুদ্ধি জন্মে। 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ'(গীতা-৬/২৯)—ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হয়ে স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন। আর 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।'(গীতা-৬/৩২)—যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী।

৪) **যোগে, ধ্যানে, ভক্তিতে বা কর্মে—ভগবানে চিত্ত-সংযোগ**—গীতা চার যোগের সমন্বয় ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের দ্বারা ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করতে বলছে। ঈশ্বরে মন অর্পণ করেই চার যোগের সমন্বয় সম্ভব। যে-কোনও একটি পথ অবলম্বন করলেই হয় কিন্তু গীতা চারটি যোগের সমন্বয় করতে বলছে। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকে এই চার যোগের সমন্বয় দেখিয়েছেন। গীতা দেখিয়েছে কর্মের ভিতর দিয়েও ঈশ্বর লাভ হয়। কর্মযোগ বহিরঙ্গ সাধন কিন্তু ধ্যানযোগ অন্তরঙ্গ সাধন। ধ্যানযোগের দ্বারা যোগী মন থেকে সর্ব সংকল্প অর্থাৎ শোভন-অধ্যাস—বিষয়ে মনোরমত্ববুদ্ধি, কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। ধ্যানযোগের দ্বারা যোগী নিজের বিবেকযুক্ত মন দ্বারা নিজেই নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে। কখনও নিজেকে বিষয়াসক্ত করবে না। কারণ শুদ্ধ মনই মানুষের বন্ধু এবং বিষয়াসক্ত মনই মানুষের পরম শত্রু—'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।'(গীতা-৬/৫) গীতা এখানে পুরুষকারের কথা বলছেন, যে তুমি নিজেই তোমাকে উত্তোলিত করবে। ধ্যানযোগের দ্বারাই যোগী 'ব্রহ্মভাব', 'ব্রাহ্মীস্থিতি' লাভ করেন। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী এবং তাঁর সত্তায় সমস্ত সত্তাবান্—সেই নিত্যবস্তুকে যোগী ধ্যানযোগের দ্বারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতিই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগী ধ্যানযোগের দ্বারাই এই ব্রহ্মানুভূতি নির্বিকল্প সমাধিতে উপলব্ধি করেন। তখন নিজ আত্মাতে ও ভগবানে

সর্বভূত এবং সর্বভূতে ভগবৎ দর্শন হয়। তাই ভগবান ধ্যানযোগ অভ্যাসের কথা বলছেন—'মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ'—প্রশান্তচিত্ত, ভয়রহিত, ব্রহ্মচর্যপালনকারী ও গুরুসেবাদিপরায়ণ, মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ যোগী মন একাগ্র করে নিত্য ধ্যানাভ্যাস করবে।

৫) **ভগবানে অনন্য শরণাগতি**—ভক্তিমার্গ অন্যান্য পথের থেকে সহজ ও সরল। ভক্তির দ্বারাই ভগবৎকৃপায় জ্ঞান হয়, জ্ঞানেই মোক্ষ। তাই ভগবান বলছেন—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'—তুমি মদ্‌গত চিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও। কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর। মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে। ভগবান স্পষ্ট করে বলছেন, 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।'(গীতা-৭/১৪)—সমষ্টি অজ্ঞানের মায়া। আমার মায়া অতিক্রম করা শক্ত। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী এই মায়া ভগবানেরই।

তাই ভগবান বলছেন, যে আমাকে আশ্রয় করে সে-ই মায়া অতিক্রম করতে পারে। পুরুষকারের দ্বারা মানুষ সাধন ও কর্ম করবে এবং তার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হবে ও অহংকার নাশ হবে। তখন সে বুঝতে পারবে একমাত্র ভগবানের শরণাগতিই পথ। ভগবান আরও প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হতে মুক্ত করব—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ভগবান বলছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে—'সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, কলিতে নারদীয় ভক্তি, ঈশ্বরে শরণাগতি—থাকবে ঝড়ের এঁটো পাতার মতো অথবা বিড়াল ছানার ভাব নিয়ে। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়। প্রেমাভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি—পাকা ভক্তি, কোন বিধি নিষেধ নেই, ঈশ্বরকে শুধু ভালবাসি, গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। সেই ভক্তি এলেই তাঁর উপর পূর্ণ ভালবাসা আসে। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি— যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু প্রেমাভক্তিতে এসব বিচার থাকে না। সর্বসাধারণের জন্য জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ভাল। ভক্তির সাথে সাথে বিচার চাই। কিন্তু অহৈতুকী ভক্তি—সবথেকে শ্রেষ্ঠ। অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভালবাসা। ঈশ্বরে এরূপ ভালবাসা এলেই সংসারাসক্তি, বিষয়বুদ্ধি একেবারে চলে যায়। ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের আবাস স্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।' হে অর্জুন ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে বাস করেন।

৬) **সমদৃষ্টি---সর্বভূতে আত্মদর্শন**—গীতাতে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রাহ্মীস্থিতির কথা বলছেন। এই অবস্থা লাভই মানুষের লক্ষ্য। শাস্ত্র ধর্মের দুটি দিক নির্দেশ করেছে। একটি ধর্মের বাইরের অর্থাৎ ব্যাবহারিক ধর্ম এবং আর একটি অন্তর্মুখ বা মোক্ষধর্ম। ব্যাবহারিক অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক কর্তব্যগুলি যেন নৈতিক মান রেখে আমরা সম্পন্ন করি। ব্যাবহারিক সেইসকল কর্মের সঙ্গে যেন আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করে আমরা মোক্ষধর্ম লাভ করি। সেইজন্য গীতা এই দুই দিক অর্থাৎ অন্তরের আধ্যাত্মিক কর্ম এবং বাইরের ব্যাবহারিক কর্মের মধ্যে কোনও ভেদ দেখায় না। বরং বলে সকল কর্ম—ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক, এক আধ্যাত্মিক উপাসনা।

তাই সকল আচার্যগণ ব্যাবহারিক ধর্মের উপর বেশি জোর দিয়ে বলছেন, 'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্'(গীতা-১৩/২৯)— সেই সমদর্শী সর্বত্র পরমাত্মার অবস্থান দর্শন করেন। এই ভাবে সকল জীবে আত্মবুদ্ধি বা সাম্যবুদ্ধি রেখে কর্ম ও ভক্তি করলে মানুষের নৈতিক কর্তব্যবুদ্ধির বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ দৈবী সম্পদের বিকাশ হয়। সেই ব্যক্তির মধ্যে নানা সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়। যেমন সত্য, পবিত্রতা, সেবা, ত্যাগ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি। গীতাতে ভগবান এইরূপ ছাব্বিশটি সদ্‌গুণের কথা বলেছেন।

এই আত্মবুদ্ধি বা সাম্যবুদ্ধি আনতে গেলে আমাদের কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন পরের দ্রব্য চুরি না করা, অপরকে হিংসা না করা, প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালবাসা ইত্যাদি। মহাভারত বলছে, 'ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ। এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে।।' আপনার নিজের যা প্রতিকূল বা দুঃখজনক বলে বোধ হয়, অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করবে না—এটাই ব্যাবহারিক ধর্মের নৈতিক দিক।

৭) **উপাসনা—ঈশ্বরে সকল কর্ম সমর্পণ, জীবসেবা ও স্বধর্মপালন**। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের উপাসনা সহজভাবে সকল ভগবৎকর্ম, জীবসেবা, স্বধর্মপালনের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। ভগবান সমস্ত গীতার সারাংশকেই সুন্দরভাবে অর্জুনকে বুঝিয়েছেন। তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপদর্শন প্রসঙ্গে বললেন, আমাকে (ঈশ্বরকে) উপাসনার সহজ পথ হচ্ছে—'মৎ কর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।'(গীতা-১১/৫৫) যে ব্যক্তি ভগবৎকর্মকারী, ভগবন্নিষ্ঠ, ভগবদ্ভক্ত, বিষয়ে ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি আসক্তিশূন্য এবং সর্বভূতে এমন কী অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও শত্রুভাবহীন, তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ'—যিনি সর্বভূতে প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত ভগবানকে নিজের আত্মারূপে অভেদজ্ঞানে ভজনা করেন, সেই ভক্ত বা যোগী ভগবানকেই লাভ করেন। তাঁর মোক্ষলাভের কোন বাধা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এই যুগের একমাত্র উপাসনা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' জীবসেবাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং এটিই গীতার স্বধর্ম পালন।

৮) **সাধনা—ত্যাগই গীতার মূল বাণী।** ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম কোন পথেই সিদ্ধিলাভ হয় না। ত্যাগ সাধনার মূল। গীতার সর্বত্র ত্যাগের অনুশীলনের উপদেশ। কিন্তু গীতার ত্যাগের অর্থ কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসমার্গ নয়। গীতার ত্যাগ কামনা-ত্যাগ, কর্মফলত্যাগ—এইটিই গীতার সাধনতত্ত্বের মূলসূত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনাই ছিল ত্যাগ এবং তাঁর ভূষণ ছিল ত্যাগ—তিনি ছিলেন ত্যাগীর সম্রাট। তিনি বলছেন, 'গীতা' শব্দটি তিন চার বার উচ্চারণ করলেই তা পাওয়া যায়। গীতা গীতা বলতে বলতে ত্যাগী ত্যাগী শব্দ উচ্চারিত হয়। সেটিই গীতার সার-মর্ম।

ত্যাগ মানে ভিখারি হওয়া নয়। তাহলে জগতে ভিখারিরা বড় বড় ত্যাগী। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ জনক রাজার উদাহরণ দিচ্ছেন। তিনি রাজা কিন্তু ত্যাগী, ব্রহ্মজ্ঞানী। এই ত্যাগ অনাসক্তি অভ্যাস যোগের দ্বারা আসে। ভগবান বলছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'—সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা অর্থাৎ ধ্যান অভ্যাস এবং তার সঙ্গে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা সাধন দ্বারা মনকে সংযত, শুদ্ধ ও একাগ্র করতে হবে।

৯) **অদ্বৈতভাব**—ভারতীয় শাস্ত্র এই জ্ঞানলাভের সাধনাকে দুইভাবে দেখিয়েছে 'নেতি নেতি' (বৃহদারণ্যক) এবং 'ইতি ইতি' (ছান্দোগ্য)। আচার্য শঙ্করের মতে জড়ভাব দূরীকরণে 'নেতি' এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব জাগরণের জন্য 'ইতি' ভাব অবলম্বন করা হয়। কি দ্বৈতবাদী, বা বিশিষ্টাদ্বৈতী বা অদ্বৈতবাদী (কেবলাদ্বৈতবাদী) সকলের পক্ষেই এই ভাবটিকে অভ্যাস করতে হয় যে—যিনি সাধ্যবস্তু, তিনি শুধু মন্দিরস্থিত একটি বিগ্রহে বা একটি জীবে বা একটি বস্তুতে নেই। সর্বজীব, সকলবস্তুতেই তাঁর প্রকাশ। স্থানে কালে তিনি সীমাবদ্ধ নন। অন্তর্ব্যাপ্তিই তাঁর স্বরূপ—'ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বম্' (ঈশোপনিষৎ)। শ্রীভগবান গীতায় বলছেন—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'—এই মন্ত্রটিই অনুক্ষণ মনন বা চর্চার বিষয় হতে হবে সাধনার প্রথম স্তরে। একেই 'অভ্যাসযোগ' বলা হয়। এর মাধ্যমেই সত্যানুভূতি লাভ অর্থাৎ জীবে জড়ে অধিষ্ঠিত যে একক চৈতন্যসত্তা বা ব্রহ্মসত্তা বর্তমান, তার দর্শন হবে। এই পারমার্থিক অনুভূতি কিন্তু শুধুমাত্র 'feeling' বা সংবেদনাত্মক অনুভূতি নয়, যাতে সংশয়ের অবকাশ থাকে। ভারতীয় দর্শনে একে বলা হয়েছে—'যথার্থানুভবঃ প্রমা'। এই সেই 'যথার্থানুভূতি' যা জ্ঞানেরই নামান্তর।

আচার্যগণের মতে এই অদ্বৈতসাধন দুভাবে করা যেতে পারে। একটিকে ব্যাপ্তির দিক থেকে সর্বজীবকে তাঁর প্রকাশরূপে বুঝতে চেষ্টা করা। অপরটি গভীরতার দিক থেকে, অর্থাৎ ব্যক্তির আত্মচেতনার গভীরে তাঁকে ধরতে চাওয়া। প্রথমটির মন্ত্র যদি 'সর্বংখলু ইদং ব্রহ্ম' তবে অন্যটির 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

গীতা ঐ দুই ভাবকে সুন্দরভাবে সমন্বয় করেছেন। গবেষক সাধক ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতে গীতায় প্রথমটিকে বলা হয়েছে 'বিভূতি', দ্বিতীয়টিকে 'যোগ'। 'বিভূতি' অর্থাৎ তাঁর ঐশ্বর্য হল জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁর প্রকাশ। অনন্ত,

বিচিত্র সেই সত্তার। আর ঐ ঐশ্বর্যের পিছনে গভীরে রয়েছেন সেই পুরুষোত্তম, সেই একক আত্মসত্তা, অরূপ, অব্যক্ত চৈতন্যসত্তা, যার থেকে উদ্ভূত হয়েছে এই জগৎ-সংসার 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্' (গীতা-১৮/৪৬)—যে সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বর থেকে প্রাণিগণের উৎপত্তি বা যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকেই মানুষ কর্ম দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করেন।

বাস্তবিক অদ্বৈতভাব একটি অনুভূতির বিষয়। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, প্রথমে এই অদ্বৈতভাবটির সাধন করতে হবে বা বলা যেতে পারে চিন্তায় ও ব্যবহারে এটিকে 'অভ্যাস' করতে হবে। এরূপ করতে করতে তবেই 'স্বরূপচৈতন্যে'র স্ফুরণ হবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এই ভাবটিকেই অতি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 'সাধন করতে করতে দেখবে আমার মধ্যে যিনি, তোমার মধ্যেও তিনি, দুলে-বাগদির মধ্যেও তিনি'। তিনি আরও প্রাঞ্জল করে বলেছেন, 'ফুল নাড়তে চাড়তেই গন্ধ বেরোয়, চন্দন ঘষতে ঘষতেই গন্ধ বেরোয়, তেমনি তত্ত্ব আলোচনা করতে করতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়'। ফুল ও চন্দনের সৌরভ জীবের অন্তর্লীন চৈতন্যের সঙ্গে তুলনীয়, তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য যে সত্যকাম লাভ, সেকথাই মা বলতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন অদ্বৈত এবং তাঁর শিষ্যরা অদ্বৈতবাদী।

এই 'নাড়াচাড়া' করা, 'ঘষার কাজ' বা 'তত্ত্ব আলোচনা'—এগুলি অভ্যাসযোগ বা সাধনার স্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান না হ'লে চৈতন্য দর্শন হয় না, আর চৈতন্য দর্শন হ'লে তবে নিত্যানন্দ'। সাধন করা মানেই আমাদের মধ্যে যে একক সত্তা আছে 'সূত্রে মণিগণা ইব' সেইটি অনুভব করা।

গীতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই সূত্রের অন্বেষণ করা, চিন্তায় মননে। শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন এ সবই সাধনার স্তর। এই স্তর অতিক্রম করে তবেই ব্রহ্ম-সমীপে স্থিতি, বা চৈতন্যসাগরে অবগাহন, আর তারপরই শাশ্বত আনন্দ বা নিত্যানন্দ লাভ।

যখন সকলের মধ্যে 'অদ্বৈত' বা এক সত্তার উপলব্ধি হচ্ছে, তখনই আর কোনও সীমাবদ্ধতা নেই, এবং তজ্জনিত কোনও মানসিক বৈকল্যও নেই। এইটি চৈতন্য লাভের স্তর। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিচ্ছেন, চৈতন্য দর্শন কীরূপ? একবার দেশলাই জ্বেলে অন্ধকার ঘরে ঢুকলেই যেমন হঠাৎ আলো। তবে এই আলো পারমার্থিক জ্ঞান ও আনন্দ। যে বাণী সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা আমাদের কাছে বেদ-উপনিষদ মারফৎ জানাতে চেয়েছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই বাণীই আরও সহজ, সরল ভাষায় এবং তাঁর জীবনের প্রতি কাজে প্রতিফলিত করেছেন।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলছেন—'সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম'—তিনি 'সৎ' বা আছেন, তিনি 'চিৎ' বা চৈতন্যসত্তা, আর তিনি 'আনন্দ' বা 'আনন্দস্বরূপ'। গীতা সেই আত্মতত্ত্বের কথা বলছেন—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ...'। তিনি আছেন —প্রশ্ন ওঠে—কোথায়

আছেন? ঋষিরা জানাচ্ছেন তিনি আমাদের মতন সৃষ্ট বস্তু নন বা 'জন্য' পদার্থ নন, তাই দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন। তিনি 'ত্রৈকালিক সৎ'। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, 'সর্বংখলু ইদং ব্রহ্ম' 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (উপনিষদ)। তিনি সর্বদা আছেন, সর্বত্র আছেন, 'সঃ পর্যগাৎ-শুক্রম-অকায়ম্-অব্রণম্-অস্নাবিরম্ শুদ্ধম-অপাপবিদ্ধম্।' (ঈশোপনিষৎ-৮) সেই পরমাত্মা সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, নিরবয়ব, অক্ষত, অচ্যুত, নির্মল, সর্বজ্ঞ, নিজ মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভূ এবং চিরন্তন। তিনি প্রত্যেকের জন্য কর্মফল ও ইতিকর্তব্য বিধান করেন।

তিনিই একমাত্র আছেন। 'চৈতন্যরূপে তিনি সর্বজীবে আছেন'—একথা বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—জড় বস্তু তো তাঁর থেকে একান্ত বিলক্ষণ, তাতে তিনি কীভাবে আছেন? উত্তরটি খুব সহজ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, ব্রহ্ম বা চৈতন্য সর্বত্র আছে, তবে মানুষে বেশি প্রকাশ, আর অবতারে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশ।

'জড়ে আছেন' একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু বলছেন তাই নয়, অতি সহজে তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়েছেন, তাঁর সংশয়ের উত্তরে তিনি দেখিয়েছেন ঘটি, বাটি, চৌকাঠ—সবেতেই সেই চৈতন্য জ্বলজ্বল করছে। বিশুদ্ধ জড় বস্তু বলে কিছু নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনে করতেন, অধ্যাত্মজীবন শুরু হয় এই 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে'।

স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি অদ্বৈততত্ত্ব অনুভব করে বলছেন, 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু' তাঁর কাছে সব এক। জগতে এক ছাড়া দুই নেই। দুই দেখা ভ্রম। দুই কেবল প্রকাশে, আবরণে। তাই 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'। ব্রহ্মই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' সর্বভূতে সেই এক প্রেমময়। তাই সকলের প্রতি প্রেম। শুধু প্রেম নয়, শ্রদ্ধা, সম্মান। দয়া নয়, সেবা। তাই 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' এ নূতন এক দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন এক জীবনদর্শন। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। সবই সেবা, সবই পূজা---যদি তা লোকহিতার্থে হয়। ঐহিক বা পারমার্থিক বলে কোন ভেদ নেই। সবই পারমার্থিক। যে-কোনও কাজই পূজা—যদি তা বহুজনহিতায়, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত—রাজা ভরত হতে যে বংশ প্রবর্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় রাজাদের উপাখ্যান রয়েছে। ভরত রাজা হতেই ভারতবর্ষের নাম হয়েছে এবং তাঁর নাম হতেই এই মহাকাব্যের নাম 'মহাভারত' হয়েছে। মহাভারত শব্দের অর্থ—মহান অর্থাৎ গৌরবসম্পন্ন, ভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষ, অথবা মহান ভারতবংশীয়গণের উপাখ্যান। মহাভারত ভারতের সর্বসাধারণের বড়ই আদরের গ্রন্থ এবং ভারতবাসীর উপর এই মহাকাব্য প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি ভারতবর্ষের

সাম্রাজ্যের প্রভুত্বলাভের জন্য কৌরব ও পাণ্ডব—এক বংশজাত জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ। মহাপ্রতিভাবান ও মনীষাসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে অসংখ্য মহাপুরুষের উন্নত ও মহিমময় চরিত্রের সমাবেশ করেছেন। এই চরিত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রই প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও আকর্ষণীয়। মহাভারত ও ভাগবত উভয় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে লীলা তাঁর। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন একজন রাজা, যোদ্ধা, আচার্য, গুরুর ভূমিকায়। গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসীম বৈচিত্র—ষড়ৈশ্বর্য। গীতাতে ভগবান বিশ্বরূপ ধারণ করে অর্জুনকে দর্শন দিচ্ছেন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বর্ণিত বৃন্দাবনের ভগবানের লীলা আনন্দময়, ভগবানের প্রেমময় রূপটি ভক্তের কাছে বেশি আর্কষণীয়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ সেই রসস্বরূপ, আনন্দময়, প্রেমময় রূপ নিয়ে গোপীদের সঙ্গে লীলা করছেন। সেখানে তাঁর নিষ্কাম প্রেম, নিষ্কাম কর্ম। কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু প্রেম ও ভালবাসা। যেন প্রেমই তাঁর স্বরূপ। প্রেমই এখানে ভগবান, 'সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।' (নারদীয় ভক্তিসূত্র)

কুরুক্ষেত্রের এই ধর্মযুদ্ধের পেছনে রয়েছেন পরমেশ্বর স্বয়ং। তিনিই আমাদের 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'—সকল প্রাণীর গতি ও পরিপালক, প্রভু, বাসস্থান, স্রষ্টা, রক্ষক, সংহর্তা ও কৃতকর্মের সাক্ষী। তাঁকে লাভ করা বা তাঁতে পৌঁছানোই লক্ষ্য। তাই যুদ্ধ ব্যাবহারিক দ্বন্দ্বময় জগতে আর তিনি আনন্দঘন শান্তি সকল দ্বন্দ্বের অতীত।

মানবের জীবনে দুটি দিক—একটি কর্মের দিক অপরটি আনন্দ ও রসাস্বাদন ও শান্তির দিক। একটি জ্ঞানের দিক আর একটি ভক্তি বা প্রেমের দিক। একটি বিবেক বুদ্ধির প্রসার আর একটি হৃদয়ে প্রেমের প্রসার। এক দিকে শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মানুভূতি, অপর দিকে লীলাপূর্ণ প্রেম আস্বাদন করা। এখানে ভগবানের লীলাজীবনের দুটি দিক—একটি কুরুক্ষেত্রের রূপ, অপরটি আনন্দপূর্ণ বৃন্দাবনের রূপ। যাঁরা কুরুক্ষেত্রকে বড় করে দেখেন, তাঁরা বলেন জীবন সংগ্রামময়। আর যাঁরা বৃন্দাবনকে বড় করে দেখেন তাঁরা দেখেন জীবন আনন্দপূর্ণ, রসপূর্ণ। একজনের কাছে সংসার ধোঁকার টাটি, আর একজনের কাছে সংসার মজার কুটি। যে দৃষ্টিতে জগৎকে আমি দেখছি জগৎ আমার কাছে সেই ভাবে প্রকাশিত। ভগবান বুদ্ধ বলছেন, জীবনের সমস্তই দুঃখ। যখন আমরা মনে কম দুঃখ পাই তখন মনে করি আমরা খুব সুখে আছি। তাই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে জীবনকে অষ্টাঙ্গমার্গের মধ্যে রাখতে হবে এবং তাই প্রথমে সম্যক দৃষ্টি—সৎ দৃষ্টি চাই। গীতায় অষ্টাঙ্গ মার্গের মধ্যে মনের বিশুদ্ধিকরণের কথা বলা হয়েছে—(১) যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ), (২) নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান), ক্রিয়াযোগ—চিত্তের অবিদ্যা ক্লেশ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ) সকলকে ক্ষীণ করা। (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম,—এই চারটি মার্গ সকল

মানুষকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিত্য অভ্যাস রাখতে হয়। এরপর (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও শেষে (৮) সমাধি।

ভগবান কৃপাপরবশ হয়ে কুরুক্ষেত্রে বলছেন কীভাবে ঈশ্বরে মন রেখে যোগযুক্ত হয়ে কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধ করণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, 'ঈশ্বরকে ধরে সংসার কর'। সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে। সংসারে থাকতে গেলেই সুখ-দুঃখ আছে—একটু -আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালি লাগেই।

তাই কুরুক্ষেত্র যেমন ভগবানের লীলাক্ষেত্র তেমনি বৃন্দাবন তাঁর আর একটি লীলাক্ষেত্র। দুয়ের মিলনে ভগবানকে দেখতে হয়। গীতা ও ভাগবত দুটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যাবে—গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভাগবতের বক্তা ভক্তশিরোমণি শ্রীশুকদেব। গীতায় ভগবান নিজের কথা অর্থাৎ স্বরূপের আভাস নিজেই বলছেন, কিন্তু ভাগবতে ভগবান শ্রীশুকদেব তাঁর সমস্ত লীলা ও স্বরূপের বর্ণনা সুন্দরভাবে করেছেন।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব বক্তা, তাই তিনি দেখাচ্ছেন ভগবান কত সুন্দর, কত মধুর। তাঁর প্রেমের আস্বাদন ভক্ত কত মধুরভাবে করতে পারে। ভগবানের সেই সকল লীলামাধুর্যের কথা তিনি অতি মনোহারী ভাবে বর্ণনা করছেন।

ভক্তি ভক্তের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এটি ভক্তের অমূল্য সম্পদ। তাই ভক্তি ও প্রেমের কথা ও মাধুর্য ভক্তের মুখে আস্বাদন করতে ভাল লাগে। গীতাতে ভগবান আত্মতত্ত্বের কথা—অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ এবং কিভাবে চার যোগের সমন্বয়ে সেই ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই কথাই বলছেন।

ভাগবতে ভক্ত ভক্তিতে প্রেমের দ্বারা ভগবানকে কীভাবে আস্বাদন করতে পারে তার অপূর্ব উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীশুকদেব। যেমন ভক্ত প্রহ্লাদ চরিত্র—যার মধ্যে গীতার সাধনা ভক্তিযোগের লক্ষণ প্রকাশিত, আবার গীতার সারাংশ 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'—এই ভাব প্রকাশিত হয়ে উঠেছে বৃন্দাবনের গোপীদের জীবনে—বিশেষ করে শ্রীমতী রাধার জীবনে। ভক্ত ও ভগবানের মিলন রাসলীলার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

গীতার পরম তত্ত্ব 'পুরুষোত্তমযোগ'। কিন্তু এই পুরুষোত্তমের লীলারসমাধুর্য সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে ভাগবতে। তাই গীতা ও ভাবগত দুটিই একে অপরের পরিপূরক—যেন একটি টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। গীতার উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা কর্মে, দৈনন্দিন জীবনে, ব্যাবহারিক বেদান্তের দর্শন ফুটিয়ে তুলতে হবে। ভাগবতের ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেম, ভালবাসা, ব্যাকুলতা ভগবদনুভূতি বৃদ্ধি করে চিত্তকে ভগবানে অর্পণ করে জীবনকে আনন্দে ও রসে পূর্ণ করে তুলতে হবে। অতএব গীতা ও ভাগবত দুইই আমাদের জীবনকে ঈশ্বরলাভের দিকে নিয়ে যায়।

গীতা ও উপনিষদ্—গীতাও একটি উপনিষদ্। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বেদব্যাস গীতাকে

উপনিষদ্ বলেছেন—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু...' শ্রীমদ্ভবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে ইত্যাদি। উপনিষৎতত্ত্বই গীতায় পত্রপুষ্পে শোভিত ও পরিবর্ধিত। উপনিষদের নিগূঢ় নির্যাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য গীতামৃতরূপে পরিণত করেছেন। উপনিষদ্সমূহের ন্যায় গীতাও আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব ঘোষণা করছেন। ব্রহ্মতত্ত্বের এমন সহজ সরল ব্যাখ্যা অন্য কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য সেইজন্য তাঁর উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্যে একই তত্ত্ব প্রচার করেছেন। অদ্বৈতনিষ্ঠ প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা অন্যতম। উপনিষদের বেশ কয়েকটি শ্লোক সামান্য পরিবর্তিত হয়ে গীতায় উক্ত হয়েছে। গীতার বাণী ভগবানের বাণী। গীতা বেদতুল্য, নিত্য ও অপৌরুষেয়। গীতা পঞ্চম বেদ। গীতাতত্ত্ব ও বেদবাণী অভেদ। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'গীতা বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য।' গীতা ব্রহ্মযোগশাস্ত্র ও অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। ব্রহ্মবিদ্যাই গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা, গুণাতীত যোগরূঢ় বা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়াই গীতার উপদেশ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রামী জীবন—ভাগবতকার বলেন, লীলার ভিতর দিয়ে নিত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করতে হয়। একটি নিত্য সত্তা সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। যা কিছু আমরা দেখছি সবই সেই পরম সত্তা থেকেই উদ্ভূত। সেই পরম সত্তা ছাড়া এই জগৎ নেই কিন্তু এই জগৎ ছাড়াও সেই সত্তা আছেন। তবে এই জগৎকে ধরে জগতের অতীত সেই সত্তায় পৌঁছাতে হয়।

ভাগবতের মতে—ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবের স্তর অতিক্রম করে অপার্থিব প্রেমস্তরে পৌঁছাবে। গোপীদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুই জগৎকারণ, সত্যস্বরূপ, মনোবুদ্ধির অতীত নন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্ত আপনার, তাঁরা তাঁকে প্রিয় প্রেমবল্লভরূপে দেখতে চান এবং তাঁর লীলা আস্বাদন করতে চান। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহধারী মনোহর মূর্তি। পরমকরুণানিকেতন শ্রীহরি কৃপা করে মনোহর মূর্তি ধারণ করে বহুকাল পর্যন্ত সকলকে দেখা দিয়েছেন। যাঁদের জন্মজন্মান্তরীয় তপস্যার ফলে বিশেষ ভাগ্যবল ছিল, তাঁরা ঐ শ্রীমূর্তি দর্শন, পারমার্থিক সৌন্দর্য ও অলৌকিক মাধুর্য উপলব্ধি করে জীবন ধন্য করেছিলেন ও মুক্তি লাভ করেছিলেন। আর যাঁদের সেইরূপ তপস্যা ছিল না তাঁরাও ভগবানের সেই লৌকিক সৌন্দর্য অনুভব করে জীবন ধন্য করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নরদেহেই অবতাররূপে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল অভূতপূর্ব জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্মের সমন্বয়। শক্তি-সামর্থ্য, বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, প্রেমিক হৃদয়, মানবচরিত্র বিচার করবার অসাধারণ ক্ষমতা, বাক্পটুতা, পরোপকার, শুভাকাঙ্ক্ষা, সুহৃদ্-হৃদয়, বাস্তববুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন তিনি। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ, কূটকৌশলী যোদ্ধা। মহাভারত-যুদ্ধের কর্ণধার। ঐশ্বরিক সকল সদ্গুণাবলী শিশুকাল থেকে তাঁকে করে তুলেছিল অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

পৃথিবী যখন আসুরিক শক্তির দ্বারা নিতান্ত উৎপীড়িতা, তখন সেই পরম করুণাময় ভগবান নিজের ইচ্ছায় স্বীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে দেহ ধারণ করেন। ভগবান বলছেন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।'(গীতা-৪/৭-৮)—হে অর্জুন, যখনই ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্ট ব্যক্তিদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। অসুর কংসকে নিধন করার জন্য, শ্রীহরি ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে, এই পৃথিবীর মঙ্গল করার জন্য কংসের কারাগৃহে বসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভে জন্ম নিলেন। দেবকীর অষ্টমগর্ভস্থ সন্তানরূপে ভগবান স্বয়ং জন্ম নিলেন। ভাগবত বলেন, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণে নরলোকে কোনও মঙ্গলশঙ্খ বাজেনি। জন্মের সময়টা ঘোর বর্ষাকাল। কংসের শত্রুতায় ক্ষত্রিয় হয়েও গোপ-গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে থাকতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় ভারতবর্ষের পূর্ব-মধ্যভাগ দখলে ছিল মগধরাজ জরাসন্ধের, চেদিরাজ শিশুপালের এবং পুণ্ড্রবর্ধনের রাজা বাসুদেবের। শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন মথুরায়। কংস নিজের পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। বহু রাজাদের পরাজিত করে তিনি কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। কংস তাঁর হত্যাকারী শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন—-এই কথা শুনে ভয়ে নিজ ভগিনী দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করেন এবং তাঁদের ছয় সন্তানকে হত্যা করেন। সপ্তম সন্তান বলরাম, বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণীর গর্ভে বর্ধিত হওয়ায় বেঁচে যান। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের জন্মের সময় যোগমায়ার প্রভাবে বন্দী বসুদেব কারাগারে শৃঙ্খলমুক্ত হলেন এবং দ্বাররক্ষীগণ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হলেন। তখন ভীত পিতা বসুদেব কংসভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হয়ে ব্রজধামে নন্দালয়ে রেখে এলেন। সেদিন গোকুলে নন্দালয়ে নন্দরাজ-মহিষী যশোদারও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। এই কন্যা ছিলেন স্বয়ং মহামায়া। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ঘুমন্ত যশোদার কোলে রেখে কন্যাটিকে নিয়ে কংস-কারাগারে ফিরলেন এবং পরে কংসের হাতে তুলে দিলেন। কংস যখন কন্যাটিকে হত্যা করতে গেলেন তখন কন্যাটি কংসের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে আকাশে মিলিয়ে গেলেন এবং আকাশ-বাণী করলেন—'তিনি স্বয়ং যোগমায়া। কংসের নিধনকারী গোকুলে বড় হচ্ছেন, যথাসময়ে তিনিই কংসকে বিনাশ করবেন।'

এই ব্রজধামে শুরু হয় শিশু শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা। নন্দালয়ে ভগবান নিজেকে গোপন রেখে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ বসুদেবের অপর স্ত্রী রোহিণীর গর্ভজাত বলরামকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় দ্বাদশ বৎসর অপূর্ব লীলা করেন। একদিকে কংস শিশু কৃষ্ণকে হত্যা

করার জন্য একের পর এক অসুর—পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর, শকটাসুর প্রভৃতিকে পাঠাতে লাগলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন খেলার ছলে সেই সব ভয়ঙ্কর অসুরদের সহজে হত্যা করতে লাগলেন। অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে তাঁর অপূর্ব বাৎসল্য, সখ্য ও মধুরভাবে লীলা করতে থাকেন। সেখানে মনোমুগ্ধকর বালক শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর দৃষ্টিপাত সিংহ শিশুরন্যায় নির্ভীক, কখনও কেঁদে, কখনও হেসে ব্রজবাসিগণের নয়নরঞ্জন বাল্যলীলা প্রদর্শন করিয়ে, নানাবিধ পশু-পাখি পরিবৃত হয়ে, সুশোভিত যমুনা-তীরে গোপবালক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিহার করতে লাগলেন।

একটু বয়স হতেই সেই শ্রীকৃষ্ণ কখনও নানা বর্ণের গরু নিয়ে যমুনার তীরে বাঁশি বাজিয়ে সঙ্গী গোপবালকদের আনন্দ দিতে লাগলেন, কখনও কংসের পাঠানো অসুরদের খেলার পুতুলের মতো অনায়াসে সংহার করতে থাকলেন, কখনও ভয়ঙ্কর কালীয় নাগকে বিনাশ করে গোপবালক ও গরুদের রক্ষা করলেন। এমনকী ইন্দ্ররাজের অহংকার চূর্ণ করার জন্য তিনি তাঁর ঐশ্বর্য প্রয়োগ করে গোবর্ধন পর্বতকে একটি আঙুলের উপর ছাতার মতো ধারণ করে বিপন্ন ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করলেন। তাঁর ঐশী শক্তির কী অপূর্ব মহিমা!

শ্রীভগবানকে যাঁরা যে ভাবে সেবা করেন তিনি সেই ভাবেই তাঁদের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। কংসের পাঠানো রাক্ষসী পুতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিলেন কিন্তু তিনি হত্যা করতে এলেন মা সেজে। বাৎসল্য ভাবের জন্য পুতনা মুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর বৈকুণ্ঠ লাভ হল। ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন, ভগবানের স্পর্শে পুতনার দেহ এতটাই পবিত্র হয়ে উঠেছিল যে, দাহ করবার সময় তাঁর দেহ থেকে অগুরুর গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার ভগবানের অপূর্ব মহিমার কোনও ভাষা বা কারণ পাওয়া যায় না। দেবকী ও বসুদেব কত জন্ম তপস্যা করে ভগবানকে সন্তানরূপে লাভ করেছিলেন অথচ তাঁরা কারাগারে কত যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছেন। আবার পুতনা,কালীয় নাগ প্রভৃতি ভগবানের কৃপায় কত সহজে মুক্ত হয়ে গেলেন। অনির্বচনীয় ভগবানের লীলা।

যশোদা বাৎসল্যভাবে ভগবানের সেবা করেছিলেন। ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলে সন্তানভাবে ভগবানকে লাভ করেছিলেন। ভগবানের কৃপাতে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণপ্রেমে কান্তভাবে ভজনা করেছিলেন। সুতরাং ভগবান সেই প্রেমের উদ্দীপনাবর্ধক শারদ জ্যোৎস্না, তিনি মোহন বংশীধ্বনি, সুমধুর সঙ্গীত প্রভৃতি সহকারে গোপীদের নিষ্কাম প্রেমসেবা গ্রহণ করে, তাঁদের সঙ্গে রাসক্রীড়া করে, তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

বসুদেব ও দেবকী কংসের কারাগারে যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়ে, সেই দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানকে দিন-রাত ডাকতে লাগলেন। কংসবধের কাল পূর্ণ হলে, ভগবান তাঁর বৃন্দাবন-লীলা শেষ করে, বলরামকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় উপস্থিত হলেন পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করতে। কংসরাজ সাধারণের নিকট অতুল

বলবিক্রমশালী হলেও ভগবৎ শক্তির নিকট সেই বলবিক্রম অতি তুচ্ছ। ফলে বালক কৃষ্ণের আঘাতে সেই প্রবলপরাক্রান্ত অতিদুর্ধর্ষ কংসের মৃত্যু হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর সঙ্গে সকল রাজাদের কংসের কারাগার থেকে মুক্ত করলেন। কংসের পিতা উগ্রসেনকে মুক্ত করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। নিজ শক্তিবলে মথুরার সিংহাসন দখল করলেও স্বয়ং বসলেন না, সিংহাসনলাভে নিস্পৃহ রইলেন। এখানে তাঁর প্রচণ্ড মানসিক সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনে থাকা কালে তিনি সনাতন ধর্মের গুরুপরম্পরা অনুসারে বেদের শিক্ষা লাভ করেননি। তাই সনাতন বেদ ও অপর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে অর্থাৎ সন্দীপনী ঋষির আশ্রমে ব্রহ্মচর্য আশ্রম পালন করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকরাজকন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করেন এবং আত্মীয়-পরিজন নিয়ে দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করেন। ভগবানের পরবর্তী এই জীবন আমরা মহাভারতে পাই। মহাভারতের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনের উদ্দেশ্যে ভগবানের মুখ থেকে আমরা গীতার এই অপূর্ব বাণী পাই।

বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটাই নিজের ভিতরে এবং বাইরে সংগ্রাম। এক অনন্য সংগ্রামী জীবন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর জীবন-সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কংস শিশু কৃষ্ণকে হত্যার জন্য অসুরদের পাঠিয়েছেন। শৈশব থেকেই তাঁকে অসুরদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কংস যখন একের পর এক অসুরদের পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারলেন না তখন ধনুর্মহ যজ্ঞকে উপলক্ষ করে বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নিমন্ত্রণ করে হত্যার চক্রান্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একের পর এক অসুর মল্লবীরদের হত্যা করে কংসকে হত্যা করলেন। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিয়ে করেছিলেন। কংসের মৃত্যুতে জরাসন্ধ ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা এবং পৃথিবীকে যাদবশূন্য করবার জন্য মথুরাপুরী আক্রমণ করেন। এইভাবে বিশাল সৈন্য নিয়ে সতেরোবার মথুরা আক্রমণ করেন এবং সতেরোবারই পরাজিত হন। জরাসন্ধের সঙ্গে আরও অনেক অসুররাজ যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। মহা বলবান কালযবন মথুরা আক্রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে কালযবনকে হত্যা করান। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন উভয় পক্ষে বহু সৈন্য নিহত হচ্ছে, তাই তিনি ছল করে যাদবদের নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। জরাসন্ধ ভাবলেন তিনিই জয়ী হয়েছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ কখনই যুদ্ধ করে প্রাণিহত্যা করতে চাইতেন না। কখনও কখনও তাঁকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

তিনি নীতিপরায়ণ ও সত্যবাদী হলেও স্বজনবর্গ তাঁর চরিত্রে মিথ্যাকথনের ও চুরির অপবাদ দিতে ছাড়েননি। সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণি চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। মহামূল্য স্যমন্তক মণি ছিল সত্রাজিতের নিকট। শ্রীকৃষ্ণ একবার এই মহামূল্য মণি বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে যদুপতি উগ্রসেনের নিকট থাকা উচিত বলে সত্রাজিতের নিকট চেয়েছিলেন। সত্রাজিৎ অর্থলোভে এই মণি উগ্রসেনকে দেননি। একদিন এই মহামূল্য মণি নিয়ে সত্রাজিতের ভাই

প্রসেন অশ্বারোহণে বনে গমন করেন। একটি সিংহ অশ্বসহ তাঁকে নিহত করে মণিটি মুখে করে গুহার ভিতর নিয়ে যায়। জাম্বুবান সেই সিংহকে বধ করে ঐ মণি স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে প্রদান করেন।

এদিকে ভাইকে বন হতে ফিরে আসতে না দেখে সত্রাজিৎ রটনা করে দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসেনকে হত্যা করে স্বয়ং মণি আত্মসাৎ করেছেন। এই অপবাদ দূর করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে প্রসেনকে অনুসন্ধান করতে বনে গমন করেন। জানতে পারলেন, জাম্বুবানের নিকট সেই মণি আছে। তিনি জাম্বুবানকে পরাজিত করে স্যমন্তক মণি সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোভবশত শতধন্বা সত্রাজিৎকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি নিয়ে অক্রূরের কাছে রাখে। শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে হত্যা করেন এবং অক্রূরের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি নিয়ে উগ্রসেনকে দেন। এইভাবে সকলের মিথ্যা অভিযোগ হতে মুক্ত হয়েও কারও প্রতি তিনি কোনও অভিযোগ করেননি, নীরবে সব সহ্য করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যুদ্ধ সর্বাত্মক বিনাশী। তাই কৌশল করে যুদ্ধ থামাতে চাইলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হয়ে পাণ্ডবগণ রাজসূয় যজ্ঞ করতে ব্রতী হলেন। এইসময় জরাসন্ধের দুর্বলতা বুঝে তিনি ভীমকে দিয়ে গদা-যুদ্ধে হত্যা করালেন। শিশুপাল আজন্ম শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন। যদিও শিশুপাল সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ তথা পাণ্ডবদের আত্মীয় ছিলেন তাই শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন, শিশুপালের মায়ের কাছে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে অকথ্যভাষায় প্রকাশ্যে অপমান করতে লাগলেন। শিশুপালের অপরাধ সীমা অতিক্রম করে। শ্রীকৃষ্ণ বাধ্য হলেন শিশুপালকে বধ করতে। পাণ্ডবগণ যজ্ঞ পণ্ড হবার ভয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু শিশুপাল যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করলেন। তখনই তিনি শিশুপালকে হত্যা করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন ও শকুনি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডবদের পাশাখেলায় আহ্বান করে হস্তিনাপুরে নিয়ে যান। পাশাখেলার শর্তানুযায়ী পরাজিত পাণ্ডবদের রাজ্য কেড়ে নিলেন দুর্যোধন। শর্তানুযায়ী ১২ বছর বনবাসে এবং ১ বছর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরে এসে রাজ্য চাইলে দুর্যোধন তা ফিরিয়ে দিলেন না। তখন ভারতযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ শত চেষ্টা করে এবং দুর্যোধনকে বুঝিয়ে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। শুধু পাঁচটি গ্রাম চাইলেও দুর্যোধন দিলেন না। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করলেন কৌরবসভায়। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। পরিণামে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হলেন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সখাকে সর্বদা সঙ্গে চেয়েছেন। কিন্তু দুর্যোধন ভগবানের সৈন্য ও ঐশ্বর্য চেয়েছেন। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য বিনষ্ট হল। কৌরবপক্ষের ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ প্রমুখ বহু বীর প্রাণ হারালেন। পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রের মৃত্যু হল। রণক্ষেত্র শ্মশানভূমিতে পরিণত হল।

গান্ধারী সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ ও পতিপরায়ণা ছিলেন কিন্তু ধর্মপ্রাণা জননী

হতে পারেননি, ভয়ঙ্কর অসৎ পুত্রের জননী হয়ে নিজের পাপী পুত্রদের মানুষ করতে পারেননি। পাপী পুত্রের জন্য মাতা গান্ধারীও দায়ী ছিলেন। কিন্তু বিচারবুদ্ধি হারিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়ে বললেন: 'তুমি যখন কুরু-পাণ্ডব জ্ঞাতিদের বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তুমি তোমার জ্ঞাতিগণকেও বিনষ্ট করবে। ছত্রিশ বৎসর পর তুমি জ্ঞাতিবিহীন, অমাত্যহীন, পুত্রহীন এবং বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভারতবংশের নারীরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীদেরও সেইরূপ হবে।' গান্ধারীর অভিশাপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্য ছিল না। গান্ধারী জানতেন তাঁর পাপী শতপুত্রের পাপেই এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। তবুও শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীর অভিশাপ হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

সারাটা জীবন শ্রীকৃষ্ণ সংগ্রাম করেছেন নিজের মনের সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরের শত্রু ও অপরের সঙ্গেও করেছেন। তিনি স্বয়ং রাজা না হয়ে অপরকে রাজা করেছেন। অপরের দুঃখকষ্ট দূর করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিজের দুঃখকষ্ট-বিপদের দিনে কাউকে কিছুই বলেননি। নিজেই সব কিছু সহ্য করেছেন। নিজেকে সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে সংযত ও শান্ত রেখেছেন। অপরে তাঁকে অভিশাপ দিলেও তিনি কাউকে অভিশাপ দেননি। সবারই তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ, তাঁর কর্তব্যকর্মে তিনি অটল, ধীর-স্থির, পক্ষপাতশূন্য। ধার্মিকের রক্ষক, অধার্মিকের নিকট কালস্বরূপ। তিনি এক অনন্য সংগ্রামী আদর্শচরিত্র রেখেছেন সমগ্র মানবসমাজের নিকট। ব্যক্তি ও জগতের সামনে একটা মহান আদর্শ রাখলেন— প্রজ্ঞা ও কর্ম অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম একত্র থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞা ও অর্জুনের কর্মনিষ্ঠা যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সাফল্য ও কল্যাণ অবশ্যই আসবে।

গীতার ভাষ্য ব্যাখ্যা—প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—এই তিন শাস্ত্র সনাতন ধর্মের স্তম্ভ বা ভিত্তিস্বরূপ। বেদ-ভিত্তিক সনাতন ধর্মে কোনও এক নতুন মতবাদ অর্থাৎ নতুন দর্শন-চিন্তা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্য রচনা করে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই সমস্ত দর্শন-চিন্তার মূল বিষয় থাকে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম—এই তিনের পারস্পরিক সম্বন্ধ।

অদ্বৈতবাদ— গীতার যে সমস্ত প্রাচীন ভাষ্য পাওয়া যায়, সে সকলের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই প্রাচীনতম। আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব হয় ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮২০ খ্রীস্টাব্দ। বৌদ্ধযুগের পর তিনিই ভারতের সনাতন ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি সমস্ত প্রাচীন উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন ও গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আচার্য সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে এই দর্শন-চিন্তা প্রচার করেন এবং ভারতের চারপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে সনাতন ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। আচার্য শঙ্করের দর্শন-চিন্তা ছিল অদ্বৈতবাদ। তাঁর মতে সর্ব-অধিষ্ঠানভূত একমাত্র নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই সৎ।

ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোনও পদার্থের পারমার্থিক সত্তা স্বীকৃত হয় না। প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্যের দ্বারা তিনি এই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

উপোদ্ঘাত ভাষ্য— আচার্য শঙ্কর গীতার ভূমিকায় বলছেন, জগতের স্থিতি ও পালন ইচ্ছা করে, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার জন্য সেই আদিকর্তা শ্রীভগবান নারায়ণ বিষ্ণু আবির্ভূত হন। সেই ভগবান ষড়ৈশ্বর্য—জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজের দ্বারা, নিজের ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করে, অজ, অব্যয়, সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হয়েও লোকানুগ্রহ করবার জন্য যেন দেহ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীভগবান পূর্ণকাম, তাঁর নিজের কোনও প্রয়োজন নেই, সকল প্রাণীর প্রতি কৃপা ইচ্ছা করে, শোক-মোহ-রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন অর্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। ভগবানের দ্বারা উপদিষ্ট সেই ধর্ম সর্বজ্ঞ ভগবান বেদব্যাস সাত শত শ্লোকে গীতা নামে নিবদ্ধ করলেন। এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার সংগ্রহস্বরূপ।

দ্বৈতবাদ— এই মতবাদের প্রচারক মধ্বাচার্য। তাঁর অপর নাম আনন্দতীর্থ। তিনি আচার্য শঙ্করের মতের ঘোর বিরোধী। এই মতে একমাত্র পরমেশ্বর হচ্ছেন নিয়ামক। নিয়ম্য ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ—সত্য পদার্থ এবং পরস্পর অভিন্ন। পরমপুরুষ শ্রীহরিই হচ্ছেন পরব্রহ্ম এবং তাঁর থেকেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার এবং জ্ঞান, অজ্ঞান বন্ধ ও মোক্ষ নিয়মিত হচ্ছে। ভগবান নারায়ণ জগতের পালক, কর্মফলদাতা, সকলের অন্তর্যামী, সর্বব্যাপী, অনন্তগুণপরিপূর্ণ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং নানা অবতাররূপধারী। জীব এই মতে পুণ্যপাপভাগী, কর্তা, ভোক্তা ও ঈশ্বর থেকে আলাদা—ঈশ্বর পূর্ণ এবং জীব অণুপরিমাণ। জীব সেবক বা দাসভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবা করবে। পরমসেব্য শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতালাভই জীবের একমাত্র কাম্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ— এটি আচার্য রামানুজের মতবাদ। রামানুজের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকে বলা হয় **শ্রীভাষ্য**। রামানুজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। এই মতে জীব শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ। জীবগণ ভগবানের চিরসেবক। শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র উপাস্য, পরম সেব্য এবং ভক্তিই একমাত্র সাধন। পরমব্রহ্ম বাসুদেব হলেন অশেষকল্যাণগুণসংযুক্ত চতুর্দশ ভুবনের কর্তা, বিশ্বের ও জীবের অন্তর্যামী, নিয়ামক, পরমপুরুষ, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী। বিশ্বের চিৎ (জীবাত্মা), অচিৎ (জড় জগৎ) পদার্থসমূহ ব্রহ্মেরই (পরমাত্মা) প্রকার এবং ব্রহ্মে বিলীন হলেও সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্ম এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও নিত্য।

পুরুষোত্তম বাসুদেব পরম করুণাময়, ভক্তবৎসল এবং সাধনা অনুসারে ফলপ্রদাতা। ফলে সাধনার ক্রমবিকাশে জীব বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হয়ে পরমপুরুষ বাসুদেবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে ধন্য হয়। এই জীব-জগৎ তাঁর শরীর এবং তিনিই বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর—সকলের অন্তরাত্মা।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এই মতের ভাষ্য রচনা করেন নিম্বার্ক স্বামী। এটিকে নিম্বার্ক ভাষ্যও বলা হয়। এই বিচারে নিম্বার্ক বলেন—ব্রহ্মই জগৎকারণ, তিনি কেবল নির্গুণ হতে পারেন না। পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে ব্রহ্ম অভিন্ন এবং এই বিচার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'— এই শ্রুতিবাক্য প্রমাণ করে। ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ উভয়—ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা প্রমাণিত হওয়ায় জীব ও জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধকে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব প্রমাণ করে।

ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, স্রষ্টা ও লয়কর্তা। কিন্তু তিনি জগৎ হতে অতীত হওয়াতে ভেদসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের কোনও উপাদান নাই—এজন্যই অভেদ সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সগুণত্ব নির্গুণত্ব বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত। 'তত্ত্বমসি' বেদবাক্যে প্রতিপন্ন হয়েছে—জীব ঈশ্বর হতে বিভিন্ন নয়। জীব ও ঈশ্বর অভেদ, আবার জীব ও ব্রহ্মে ভেদও বিদ্যমান।

ব্রহ্ম (সগুণ) সর্বশক্তিমান, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ। এই ব্রহ্মকে কেবল ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। ভক্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ণ সাধন। ভক্তিসাধনায় চিত্ত নির্মল হলে যে পূর্ণ নিষ্ঠার উন্মেষ হয়—তাই পরা ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি এবং জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তির মন্ত্রপ্রচারে জীবকে অভয়-বাণী প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে প্রচলিত। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য গোবিন্দভাষ্য নামেও প্রচলিত। এই ভাষ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্ব আলোচিত ও মীমাংসিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিমান বিগ্রহ, অশেষ কল্যাণ-গুণযুক্ত, সর্বশক্তিময় ঈশ্বর। জগৎ সত্য, ব্রহ্মে ও বিশ্বে প্রভেদও সত্য। জীব সত্য, নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের দাস-অণুচৈতন্যবিশিষ্ট।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব ও কার্যসকল অচিন্ত্য। তাঁর এই অচিন্ত্য শক্তিই পরিণামবাদের কারণ। জীব নিত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভই, চরণপ্রাপ্তিই জীবের প্রকৃত মোক্ষ। পরাভক্তি, শুদ্ধ প্রেমই শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমল প্রাপ্তির একমাত্র উপায় এবং এটিই মুক্তির একমাত্র সাধন।

এছাড়া আরও কয়েকটি প্রচলিত ভাষ্য রয়েছে। যেমন—শ্রীকণ্ঠভাষ্য—বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ, বিজ্ঞানভিক্ষুর বিজ্ঞানামৃতভাষ্য—সমন্বয়বাদ-পরিণামবাদ, ভাস্করাচার্যের ভাস্করভাষ্য—ভেদাভেদবাদ, বল্লাভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি।

গীতার টীকা-ব্যাখ্যা—গীতা-শাস্ত্রের আলোচনা করে যাঁরা টীকা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ব্যাখ্যা খুবই প্রচলিত ও আধুনিককালে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। আনন্দগিরি, নীলকণ্ঠ, মধুসূদন সরস্বতী, শঙ্করানন্দ, শ্রীধর স্বামী, বিজ্ঞানভিক্ষু, কেশব ভট্ট, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বহু সাধক ও পণ্ডিত ব্যক্তি গীতার উপর টীকা লিখেছেন।

গীতা-ভাষ্য-বিবেচন—আচার্য শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি টীকা রচনা করেন। তাছাড়া আনন্দগিরি 'গীতাশয়' নামে একটি পৃথক গ্রন্থও রচনা করেন।

আচার্য নীলকণ্ঠ সূরী—মহাভারতের টীকাকার হিসাবে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি শৈবমতে গীতাভাষ্য রচনা করেছেন।

গূঢ়ার্থদীপিকা—যাঁরা গীতা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর বৈদান্তিক মতে 'গূঢ়ার্থদীপিকা' টীকা সকলের কাছে, বিশেষ করে পণ্ডিত-সমাজে বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জ্ঞানেশ্বরী—মহারাষ্ট্রের ভক্ত কবি জ্ঞানদেব বা জ্ঞানেশ্বর 'জ্ঞানেশ্বরী' নামক গীতার পদ্যাত্মিকা ব্যাখা প্রণয়ন করেন। মারাঠী ভাষায় এই গীতা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে প্রচলিত। জ্ঞানেশ্বর এই গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিমার্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতবাদও স্বীকার করেছেন।

সুবোধিনী টীকা—বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামী অদ্বৈতবাদ স্বীকার করে সাধন- পথে ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একান্ত ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের শরণ নিলে তাঁর প্রসাদে আত্মবোধ জন্মে এবং মোক্ষলাভ হয়—এইটি গীতার তাৎপর্য। তাঁর টীকায় লিখছেন, 'ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ। তস্মাৎ ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্'। (সুবোধিনী)

এছাড়া বহু পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা গীতার উপর বাংলা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা। শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারার্থবর্ষিণী'। স্বামী বাসুদেবানন্দের শঙ্করভাষ্য ও তার ব্যাখ্যা। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'সুবোধিনী' টীকার বাংলা অনুবাদে সরল ব্যাখ্যা। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর বৈদান্তিক মতে 'গূঢ়ার্থদীপিকা' টীকার বাংলা অনুবাদ। তাছাড়া বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্য', বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গীতা-ভূষণ-ভাষ্য' ও ঋষি অরবিন্দ ঘোষ-এর গীতার ব্যাখ্যা 'গীতানিবন্ধনিচয়' আধুনিক কালে বেশ প্রচলিত।

স্বামী বিবেকানন্দ গীতা প্রসঙ্গে—স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় গীতার প্রধান দিকগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যা ভগবদ্গীতায় লেখা আছে, তা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না —এর উত্তরে স্বামীজী বলছেন, অবতারদের মধ্যে প্রাচীনতম শ্রীকৃষ্ণ। অমর গীতায় ব্যক্ত তাঁর শিক্ষা মহত্তম, বৃহত্তম, সর্ব-ভাব অঙ্গীকারকারী। গীতা অতি প্রাচিন গ্রন্থ। এটি বেদের ভাষ্যস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদান্তদর্শনই গীতায় নিবদ্ধ। প্রাচীনকালে এখনকার মতো ইতিহাস লেখা বা বইপত্র ছাপার এত ধুমধাম ছিল না। সেজন্য আধুনিক লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতায় বলা ঘটনা যথাযথ

ঘটেছিল কি না, সেজন্য তাদের মাথা ঘামাবার কারণ দেখা যায় না। কেননা, যদি কেউ—শ্রীভগবান সারথি হয়ে অর্জুনকে গীতা বলেছিলেন—এটা অকাট্য প্রমাণ দিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে, তাহলেও কি তারা গীতাতে যা কিছু লেখা আছে, তা বিশ্বাস করবে? সাক্ষাৎ ভগবান তাদের কাছে মূর্তিমান হয়ে এলেও তারা তাঁকে পরীক্ষা করতে ছুটবে ও তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করতে বলবে। তখন গীতা ঐতিহাসিক কি না, এ বৃথা সমস্যা নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলো যতটা সম্ভব জীবনে ফুটিয়ে তুলে কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুণে কী হবে?' আমার মনে হয়, ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation —অর্থাৎ মানুষ যখন কোনও এক অবস্থা-বিশেষে পড়ে তখন তার থেকে উদ্ধার পাবার পথ খুঁজতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোনও ঘটনার সঙ্গে তার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলছে দেখতে পায়, তখনই সে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলে বিশ্বাস করে এবং ধর্মশাস্ত্র ঐ অবস্থার উপযোগী যে উপায়ের কথা বলছেন, তাও সাগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। গীতা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদের জয়ী হতে হবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে সবটুকু আধ্যাত্মিকতাই গ্রহণ করতে হবে। গীতা উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের রূপক বলে যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা-বর্ণনার স্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়।

কলকাতায় আলমবাজার মঠে থাকাকালে স্বামীজী যুবকদের গীতা ও বেদান্তের শিক্ষা দিতেন। তিনি চাইতেন যুবকরা যাতে দৃঢ়ভাবে গীতার উপদেশ জীবনে ধারণ করে। তাই তিনি গীতা-প্রসঙ্গে আলোচনা করবার পূর্বে তাঁদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে দিতে চাইতেন—গীতা মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত অথবা মহাভারতেরই অংশবিশেষ, অর্থাৎ তাহা বেদব্যাস-প্রণীত কি না? দ্বিতীয়—কৃষ্ণ-নামে কেউ ছিলেন কিনা? তৃতীয়—যে-যুদ্ধের কথা গীতায় বর্ণিত হয়েছে, তা যথার্থই ঘটেছিল কিনা? চতুর্থ—অর্জুনাদি যথার্থ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না?—এই সন্দেহগুলি মন থেকে দূর হওয়া চাই, তবেই গীতার উপদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণা করা যাবে।

মনে হতে পারে বেদ-উপনিষদ থাকতেও গীতার মধ্যে ভগবান কী তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। উপনিষদ আলোচনা করলে দেখা যাবে নানা প্রসঙ্গের মধ্যে মহাসত্যের অবতারণা। যেন জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ অপূর্ব গোলাপ। আর গীতা শুধু সেই মহাসত্যগুলি নিয়ে অতি সুন্দররূপে সাজানো—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া।

পূর্বে কর্ম যোগ জ্ঞান ভক্তি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, এদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেউ করেননি। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যা-কিছু ভাল ছিল গীতাকার সেই যুগের প্রয়োজন মতো তা গ্রহণ করেছেন। আবার বর্তমান যুগোপযোগী যে- সমন্বয়ের ভাব প্রয়োজন ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তা সাধিত হয়েছে।

গীতার একটি বিশেষ ভাব হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া নয়। গীতা সকলকে প্রবল কর্মের অনুপ্রেরণা দেয়। গীতা বলে প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নয়। তাঁর অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সঙ্গে আলিঙ্গন করতে পারেন। এই নিষ্কাম প্রেম ও সহানুভূতি সচরাচর মানুষ বুঝতে পারে না। এই সমন্বয়ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—গীতার বিশেষত্ব।

গীতার একটি শ্লোক নিয়ে আলোচনা করলে দেখব ভগবান কী অপূর্ব বাক্যে অর্জুনকে তমোগুণ ত্যাগ করে কর্মে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বলছেন। 'তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্'—ইত্যাদি শ্লোকে কী সুন্দর কবিত্বের ভাবে অর্জুনের অবস্থাটি বর্ণনা করেছেন। তারপর ভগবান অর্জুনকে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে'—এই উপদেশ দিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করছেন। কারণ অর্জুনের মনে সত্ত্বগুণের দ্বারা কর্মে ত্যাগ আসেনি। সত্ত্বগুণী সর্ব অবস্থায় শান্ত ও বিপদেও ধীর—সমদর্শী। এখানে তমোগুণ থেকে অর্জুনের যুদ্ধে অনিচ্ছা হয়েছে। তাঁর মনে ভয় এসেছে। তিনি যুদ্ধের প্রবৃত্তি নিয়েই যুদ্ধ করতে এসেছেন। এখন ভয়ে তাঁর মনে দুর্বলতা এসেছে। তাই নানা যুক্তি দ্বারা কর্মত্যাগের গুণগান করছেন।

ভগবান তাই অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য তাঁকে পাপী বা হীন না বলে তাঁর মধ্যে যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। তাই ভগবান বলছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—তোমাতে এটা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপ ভুলে নিজেকে পাপী, রোগী ও শোকগ্রস্ত করে তুলেছ—এ তোমার সাজে না।

ভগবান কঠিন ভাবে বলছেন, 'ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ'—তুমি এই ক্লীবভাব, কাতরতা, কাপুরুষতা আশ্রয় করো না। জগতে পাপতাপ নেই, রোগশোক নেই, যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তা এই ভয়। যে কার্য তোমার ভিতর শক্তির উদ্রেক করে দেয়, তাই পুণ্য। আর যা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। তুমি বীর তোমার এ সাজে না।

জগতে গীতার এই বাণী শোনাতে হবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বইছে। এই কম্পন উলটিয়ে দাও। তুমি সর্বশক্তিমান—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করো না। মহাপাপীকেও ঘৃণা করো না, তার বাইরের দিকটা দেখো না। ভিতরে যে পরমাত্মা রয়েছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করো। সমগ্র জগৎকে বলো—তোমাতে পাপ নেই, তাপ নেই, তুমি মহাশক্তির আধার।

গীতার কেন্দ্রীয় ভাব হলো, পার্থিব বিষয়ে নির্লিপ্তি। যদি এই পৃথিবীর কোনও কিছুকে ভালবাসা যায়—পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, স্বামী-পুত্র, ধনসম্পদ, নাম-যশ—সে ভালবাসায় আসক্তি থাকলে কেবলই দুঃখ আসবে। তাই ঈশ্বরই হোন একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু, আর কিছু নয়, এবং সর্বকর্মফল অর্পিত হোক তাঁর ওপরে। সবং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঈশ্বরের প্রতি

এই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত। কাজ, কাজ, কাজ দিবারাত্র কাজ করো—গীতা বলছেন। কাজ ছেড়ে পালানো শান্তির পথ নয়। স্বামীজী আর বললেন—'কাজের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না। মনকে কেবল জিজ্ঞাসা কর, তুমি নিঃস্বার্থ কি না? তা যদি হও কোনও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করো না, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনে যে কর্তব্য আছে তা যদি পালন করে যাও, তাহলেই তুমি গীতার সত্য উপলব্ধি করবে। প্রত্যেক কাজই পবিত্র। পৃথিবীর কোনও কাজকে নীচ কাজ বলার অধিকার তোমার নেই। ঝাড়ুদারের কাজের সঙ্গে সম্রাটের রাজ্য চালানোর কাজের মধ্যে ভালমন্দ কোনও পার্থক্য নেই।'

গীতার সর্বত্র এই নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা। ভগবান বলছেন, অন্য সমস্ত সকাম কর্মে প্রত্যবায় হয় কিন্তু নিষ্কাম কর্মে কখনও প্রত্যবায় হয় না। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'(গীতা-২/৪০)—এই নিষ্কাম কর্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলে মানুষ জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। এই নিষ্কাম কর্মে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা, একনিষ্ঠ স্থিরবুদ্ধি হয়। 'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্'(গীতা-২/৪৫)—তুমি এই নিষ্কাম কর্ম কর এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম কর। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও সর্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণের) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হও। কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। তাই হে অর্জুন! তুমি 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'(গীতা-২/৪৮)—যোগস্থ হয়ে কেবল ঈশ্বরার্থে কর্ম কর। এমনকী 'ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন'—এই আশাও ত্যাগ করে।

অগ্রসর হও, কর্ম কর, কেবল দৃষ্টি রেখ যেন আসক্ত হয়ে না পড়। যে ব্যক্তি অনাসক্তির কৌশল জানে না বা তার সাধন করে না, তার প্রজ্ঞা কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।...পৃথিবীর নদীগুলি অবিরত তাদের জলরাশি সমুদ্রে ঢালছে, কিন্তু সমুদ্রের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি অবিচলিত, অপরিবর্তিতই থাকে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে প্রকৃতির সকল সংবেদন আনলেও জ্ঞানীর হৃদয় কোনও প্রকার বিক্ষেপ বা ভয়ের কথা ভাবতে পারে না। লক্ষ লক্ষ স্রোতে দুঃখ আসুক, শত শত স্রোতে সুখ আসুক—আমি দুঃখের অধীন নই, আমি সুখেরও ক্রীতদাস নই। (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩০)

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণ গীতার এই নিষ্কাম কর্ম প্রসঙ্গে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে অপূর্বভাবে উপদেশ দিচ্ছেন। ১৮৮২, ২৪শে আগস্ট, তৃতীয় পরিচ্ছেদে মাস্টার মহাশয় বর্ণনা করছেন—'সন্ধ্যা হইল। ফরাশ কালীমন্দিরে ও রাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্যান্য ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনো দেওয়া হইয়াছে। একপার্শ্বে একটি পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কালীবাড়িতে আরতি হইতেছে। শুক্লা দশমী তিথি, চতুর্দিকে চাঁদের আলো।

'শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—নিষ্কামকর্ম করবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে-কর্ম করে সে ভাল কাজ—নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করে।

'মণি—আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি এক সঙ্গে হয়? হিন্দীতে একটা কথা সেদিন পড়লাম। 'যাহাঁ রাম তাহাঁ নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাহাঁ নাহি রাম।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম সকলেই করে—তার নামগুণ করা এও কর্ম—সোহহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম—নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নাই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।...বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।...ঈশ্বরলাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না।'

গীতার আর একটি ভাব স্বামী বিবেকানন্দের খুব প্রিয় ছিল। 'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।'(গীতা-১৩/২৮-২৯)—জগতের বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন (সমদর্শী)। কারণ, পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে তিনি নিজে নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। (অবিনশ্বর মুক্ত অব্যয় আত্মাকে খণ্ডিত, পৃথক পৃথক ভাবে জীবে অবস্থিত ক্ষুদ্র, বদ্ধ এবং জন্মমৃত্যুর অধীন দেখাই হিংসা করা।) সেই সমদর্শী দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তিশূন্য, ভয়মুক্ত ও ক্রোধরহিত হন। তিনি নিজেকে নিত্য অবিনশ্বর, অজ ও অব্যয় আত্মা মনে করেন। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই।

গীতা বলেন, নিজেকে অসহায় মনে করা দারুণ ভুল। কারও কাছে সাহায্য চাইবে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করি। যদি তা না পারি, তবে আমাদের সাহায্য করবার কেউ নেই।

তুমি নিজেই তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু। আত্মা বা মন ছাড়া অন্য কোনও শত্রু নাই, আত্মা বা মন ছাড়া অন্য বন্ধু নাই। এই শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

গীতা কর্মযোগের শিক্ষা দেয়। যোগারূঢ় হয়ে আমাদের কর্ম করতে হবে। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং'-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করলে 'আমি এই করছি, ঐ করছি'—এই বোধ কখনও থাকে না। গীতায় আমরা পুনঃপুন পাঠ করি—আমাদের কর্ম করতে হবে। সকল কর্মই স্বভাবত শুভাশুভমিশ্রিত। তথাপি শাস্ত্র আমাদের অবিরত কর্ম করতে বলছে। গীতায় এর এই মীমাংসা করা হয়েছে যে, যদি আমরা কর্মে আসক্ত না হই, তবে

কর্ম আমাদের বন্ধন হতে পারবে না। যাঁর প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্যদ্রষ্টাগণ তাঁকেই জ্ঞানী বলে থাকেন — 'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ' (গীতা, ৪/১৯)।

গীতার আর একটি মহান ভাব যা অবতারপুরুষদের জীবনে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। 'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।' (গীতা–৬/৩২)—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী আত্মভাবে সর্বত্র সমদর্শী হয়ে সমস্ত ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে গীতার এই সকল মহৎ ভাবগুলি অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

জীবনের পরম সত্য এই—শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন। দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ, দুর্বলতাই মৃত্যু।

ভারতের বিপ্লববাদ ও গীতা—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রকৃত তীব্র বিপ্লববাদ শুরু হয় স্বামী বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোয় পূর্ণ সাফল্যের পর পাশ্চাত্য জয় করে স্বামীজী যখন ভারতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন থেকেই ভারতে প্রকৃত বিল্পব শুরু। অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ, দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের প্রধান শিক্ষা ছিল ব্রহ্মচর্যপালন, দৈহিক শক্তিসঞ্চয়, দেশ ও জাতিকে ভালবাসা এবং আদর্শ দৃঢ় করবার জন্য প্রত্যহ গীতা-অনুধ্যান। যুবক বিপ্লবীর কাছে একমাত্র গীতা ও বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ ছিল জীবনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী।

বিপ্লবী চাপেকার ভাইদের বিচারে মৃত্যুদণ্ড হলে তাঁরা হাসিমুখে সেই দণ্ড বরণ করে নেন। ফাঁসির মঞ্চে দামোদর চাপেকার যাচ্ছেন হাতে ভগবদ্‌গীতা। জেলখানায় দামোদর চাপেকারের নিত্য সঙ্গী ছিল গীতা।

চাপেকার- ভাইদের প্রকৃত শক্তি-উৎস সন্ধানে ভগিনী নিবেদিতা পুণা শহরে ছুটে গিয়েছিলেন। চাপেকার-গৃহে তাঁদের জননী এক মহীয়সী নারীকে, পূজার আসনে বসে থাকতে দেখলেন। নিবেদিতা অনুভব করলেন এই মহীয়সী মহিলা বিরাজ করছেন এক অখণ্ড শক্তির রাজ্যে, আপন শক্তিতে। তাঁর সকল শোক-তাপ, দুঃখ-বেদনা 'নারায়ণের' পায়ে অর্পণ করেছেন। চাপেকার ভাইদের শক্তি ছিল মাতৃভক্তির আদর্শ। তাই তাঁর দেশকে জননীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলায় 'আনন্দমঠে' নিয়মিত গীতাপাঠ। গীতা পাঠ করে বিপ্লবীরা অবিনাশী আত্মার

সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতেন। তাঁরা হয়ে উঠতেন বিগতভয়, অবিচল। শহিদ—প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, সত্যেন বসু, চারু বসু, বীরেন দত্তগুপ্তরা প্রত্যেকেই মৃত্যুভয় জয় করেন। জেলখানায় অরবিন্দ গীতাপাঠের মাধ্যমে অনুভূতি লাভ করেন। গীতার শ্লোকগুলি ছিল বিপ্লবীদের কাছে ভারতের মর্মবাণী, রক্তের সম্পদ। তরুণ যতীন দাস, বিনয়, বাদল, দীনেশ গুপ্ত—তাঁরা বলতেন—গীতা পড়তে ভাল লাগে। গীতা পড়লেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তখনি ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি সে যুদ্ধের সৈনিক হব! সংগ্রামী নায়ক বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র—তাঁর সমগ্র জীবন ব্যাপ্ত ছিল গীতার নিগূঢ় প্রভাবে। দেখা যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর ধরে সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রকৃত শক্তির উৎস ছিল গীতার বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ছিলেন স্বাধীনতার জনক, তিনিই ভারতবর্ষের যুবকদের অনুপ্রাণিত করে এই উৎস-মুখে এগিয়ে দিয়েছিলেন। গীতার বাণীর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত শক্তি। বিবেকানন্দ বলতেন—গীতার একটি বাণী সবার মুখস্থ থাকা চাই—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।'—হাজার বছরের অন্ধকার জাতির জীবনে ক্লীবত্ব এনেছে। এই ক্লীবত্বকে দূর করতে হবে। হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের দুর্বলতা পরিহার করে জাতির প্রতিটি অংশকে জাগ্রত হতে হবে, কর্মে উদ্যোগী হতে হবে। গীতার এই বাণী প্রত্যেক বিপ্লবীর কাছেই বরণীয় ছিল। রক্তের অক্ষরে সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ছিল তাঁদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে।

গীতার প্রাচীনত্ব ও শ্লোকসংখ্যা— গীতা প্রকৃত মহাভারতের অংশ এবং ইহা প্রমাণিত। মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন। পণ্ডিতগণ মনে করেন গীতা খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে রচিত। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে ৩১০১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে কুরুপাণ্ডবের মহাসমর ঘটেছিল। আবার কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে খ্রীঃ পূঃ ২৫৬৬ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল। আধুনিক বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটেছিল খ্রীস্টপূর্ব দুই হাজার বছর পূর্বে। তাঁরা মনে করেন সরস্বতী নদী শুকাতে শুরু করে ঐ সময়ে।

মহাভারতের অন্যান্য পর্বে গীতার উল্লেখ আছে। ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায় ভগবদ্‌গীতা। প্রচলিত গীতায় ৭০০টি শ্লোক (৫৭৫টি শ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উক্ত, ৮৪টি অর্জুন দ্বারা উক্ত, ৪০টি সঞ্জয়ের এবং একটি শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের)। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় অন্য মতে বলা হয়েছে ৭৪৫টি শ্লোক (৬২০ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উক্ত, অর্জুনকথিত ৫৭, সঞ্জয়-কর্তৃক উক্ত ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক ১টি শ্লোক এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এই ৭৪৫টি শ্লোক নিয়ে গীতা প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা যে গীতা পাই তাতে ৭০০টি শ্লোক। ১ম অধ্যায়ে—৪৬টি, ২য় অধ্যায়ে—৭২টি, ৩য় অধ্যায়ে—৪৩টি, ৪র্থ অধ্যায়ে—৪২টি, ৫ম অধ্যায়ে—২৯টি, ৬ষ্ঠ

অধ্যায়ে—৪৭টি, ৭ম অধ্যায়ে—৩০টি, ৮ম অধ্যায়ে—২৮টি, ৯ম অধ্যায়ে—৩৪টি, ১০ম অধ্যায়ে—৪২টি, ১১শ অধ্যায়ে—৫৫টি, ১২শ অধ্যায়ে—২০টি, ১৩শ অধ্যায়ে—৩৫টি, ১৪শ অধ্যায়ে—২৭টি, ১৫শ অধ্যায়ে—২০টি, ১৬শ অধ্যায়ে—২৪টি, ১৭শ অধ্যায়ে—২৮টি, এবং ১৮শ অধ্যায়ে ৭৮টি।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে চার্লস উইলকিন্স মূল সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন। অনূদিত পাণ্ডুলিপিখানি হেস্টিংস লণ্ডনে কোম্পানির অফিসে পাঠিয়ে দেন এবং সুপারিশ করেন কোম্পানি যেন অনুবাদটি ছাপায়। সেইমতো লণ্ডন থেকে প্রথম ইংরেজীতে গীতা ছাপা হয় ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর থেকে সারা বিশ্বে মনীষীদের চিন্তায় ও লেখায় গীতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং নানা ভাষায় অনুবাদও হয়।

গীতার মাহাত্ম্য— গীতাকে বলা হয়েছে বেদ-গাভীর দুগ্ধ। সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার। যদিও গীতা স্মৃতিশাস্ত্র কিন্তু এই মহাগ্রন্থটিকে উপনিষদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলা হয় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু...'। 'সর্বোপনিষদো গাবো-দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।'—উপনিষদ্‌সকল যেন গাভীস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ তার দুধ দোহন করছেন, অর্জুন সেই গাভীর বাছুরের মতো হয়েছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী দুধ দেয় না, সেই রকম অর্জুনের প্রশ্নেই শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোপদেশ এবং গীতারূপ দুধের উৎপত্তি। এই দুধ পান করবে কে? সুধী অর্থাৎ বিবেকী নরনারীগণ। পণ্ডিত মানে বিবেকী ব্যক্তি।

একশ্রেণীর হাঁস আছে, যারা দুধে-জলে মিশে থাকলে শুধু দুধটুকু খেতে পারে, তেমনি এই সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত সংসারে যিনি অসৎ বাদ দিয়ে সৎ নিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত বা জ্ঞানী। তিনিই গীতা বুঝতে ও বোঝাতে পারেন।

সমস্ত বেদের জ্ঞানস্বরূপ এই গীতা। গীতার স্থান সর্বোচ্চ। সনাতন ধর্মকে বুঝতে গেলে প্রথমে গীতার ভিতর দিয়ে বুঝতে হবে। উপনিষদে উপদেশ কিন্তু গীতায় আদেশ। উপনিষদের শিক্ষা তত্ত্বগভীর কিন্তু গীতার উপদেশ বিপদাপন্ন ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও সান্ত্বনার সঙ্গে আদেশ। 'বক্ষ্যেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া'—অর্জুন, তোমাকে ভালবাসি, তাই বলছি। তাই গীতা মধুর ও সার্বজনীন। 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা' অর্থাৎ গীতা সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ।

গীতা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। অনেকে মনে করেন, যদি শুদ্ধ উচ্চারণ না হয় তবে গীতা-পাঠে প্রত্যবায় হবে। গীতা ভগবানের বাণী। ভগবান এসব দেখেন না। তিনি 'ভাবগ্রাহী'—ভাবটা দেখেন তিনি। ভাব যদি থাকে তাহলে উচ্চারণ শুদ্ধ হল কি অশুদ্ধ হল, শব্দটা ঠিক বললাম কি না বললাম তাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ছোট ছেলেমেয়ে ভাল করে 'বাবা' বলতে পারে না, ভাল করে 'মা' বলতে পারে না—মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করে শুধু। বাবা বুঝছেন তাঁকেই ডাকছে, মা জানেন

তাঁকেই ডাকছে। দুজনেই খুশি। ভগবানও তাই। আমার যদি অন্তরে ভক্তি থাকে, তাহলে যে-ভাবেই তাঁকে ডাকি, যে ভাষায়, যে-নামেই ডাকি না কেন, তিনি বুঝতে পারেন তাঁকেই ডাকছি। সেই ডাক তিনি নিশ্চয়ই শোনেন।

চৈতন্যদেব তীর্থভ্রমণে গেছেন। এক জায়গায় দেখলেন এক ব্রাহ্মণ গীতা পাঠ করছেন, কিন্তু তিনি ভুল উচ্চারণ করছেন। উচ্চারণ শুনেই বোঝা যাচ্ছে তিনি সংস্কৃত জানেন না—অথচ তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। চৈতন্যদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'...শুন মহাশয়। কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়?' —কী তুমি বুঝছ, যার জন্য তুমি এতটা আনন্দ পাচ্ছ? আনন্দে তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে?

ব্রাহ্মণ বলছেন : '...মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি। শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু- আজ্ঞা মানি। অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর। বসিয়াছে যেন তাহে শ্যামল সুন্দর। অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ। তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ।'—আমি গীতার অর্থ কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু চোখের সামনে আমি যেন দেখতে পাই—অর্জুনের রথের রশি ধরে শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন আর অর্জুনকে গীতা উপদেশ করছেন। তাই দেখে আনন্দে আমার চোখে জল এসে যায়। বস্তুত, কী ভাষা দিয়ে আমরা তাঁকে ডাকতে পারি? কী ভাষা আমাদের আছে যা দিয়ে আমরা তাঁকে বশ করতে পারি? তা কি পারি কখনও? তিনি যদি দয়া করে ধরা দেন, দয়া করে তিনি যদি কাছে আসেন আমার, সহজ হয়ে আসেন—তাহলেই আমি তাঁকে পাই, তিনি ধরা দেন আমার কাছে। যার ভাব আছে—'হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ঠিক সেভাবেই ধরা দেন।'

গীতা ভগবানের হৃদয়—'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে সারমুত্তমম্'—হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সারসর্বস্ব। গীতায় শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলছেন, তাঁর কাছে ভক্ত আত্মসমর্পণ অর্থাৎ অনন্যচিত্তে তাঁকে চিন্তা ও উপাসনা করলে তিনি ভক্তের 'যোগক্ষেম' বহন করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী আছে—

কাশীর এক ভক্ত-সাধক অর্জুন মিশ্র নিত্য গীতাপাঠ করেন। তিনি গীতার 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।'—শ্লোকটি পড়ে তাঁর মনে একটা সংশয় জাগে—ভক্তের প্রয়োজনীয় জিনিস এবং তাকে রক্ষার দায়িত্ব শ্রীভগবান স্বয়ং বহন করেন—এ সম্ভব নয়। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি শেষে শ্লোকের 'বহাম্যহম্' (বহন করি) শব্দের স্থলে 'দদাম্যহম্' (দান করি) লিখে দিলেন।

গীতা পাঠ শেষ করে প্রতিদিনের মতো তিনি গঙ্গাস্নানে গেলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী দেখলেন সেদিন কোনও খাবার নেই। তিনিও জপ-ধ্যান করতে করতে ভাবলেন তাঁর স্বামী স্নান সেরে আসলে তাঁকে কী খেতে দেবেন। এমন সময় দেখলেন দুটি সুন্দর বালক মাথায় একটি করে ঝুড়ি-ভর্তি শাকশব্জি ও অন্যান্য খাবার নিয়ে দরজায় এসে উপস্থিত। তারা ঝুড়ি দুটি নামিয়ে রেখে বলল, 'মা, এই জিনিসগুলি নাও'। গৃহিণী অবাক হয়ে

বালক দুটিকে দেখেন—তাঁদের বুক থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। ব্রাহ্মণী যন্ত্রণায় শিউরে উঠে বললেন, 'কে তোমাদের এ অবস্থা করেছে? কে এমন নিষ্ঠুর?' তারা বলল—এ অবস্থা তাঁরই স্বামী অর্জুন মিশ্র করেছেন একথা বলে বালকদ্বয় চলে গেল।

ব্রাহ্মণী নিশ্চিত মনে স্বামীর জন্য আহার প্রস্তুত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জুন মিশ্র গঙ্গা স্নান সেরে বাড়ি ফিরলেন। তিনি ব্রাহ্মণীর কাছে সমস্ত কথা শুনলেন এবং সমস্ত খাবারের ঝুড়ি দেখলেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গীতার ঐ শ্লোকে পূর্বের শব্দ (বহাম্যহম্) রেখে দিলেন এবং ব্রাহ্মণীকে লক্ষ করে আকুল নয়নে কেঁদে বললেন, তুমিই ভাগ্যবতী, কৃষ্ণ-বলরামের আজ দর্শন পেয়েছ।

গীতার ধ্যান

ওঁপার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।। ১

অম্ব ভগবদ্গীতে (হে জননী ভগবদ্গীতা) স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন (স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক) পার্থায় প্রতিবোধিতাং (পার্থকে উপলক্ষ্য করে কথিতা) পুরাণমুনিনা ব্যাসেন গ্রথিতাং (প্রাচীন মুনি ব্যাসদেব কর্তৃক গ্রথিতা) মধ্যে মহাভারতে (মহাভারতের মধ্যে) অদ্বৈত-অমৃত-বর্ষিণীং (অদ্বৈততত্ত্বরূপ-অমৃতবর্ষিণী)ভব-দ্বেষিণীম্ (সংসার-নাশিনী) অষ্টাদশ-অধ্যায়িনীং ভগবতীং ত্বাং (অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ভগবতী তোমাকে) অহং অনুসন্দধামি (আমি তোমার ধ্যান করি।)

জননী ভগবদ্গীতাকে প্রণাম—ওঁ! হে জননী ভগবদ্গীতা, তুমি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃতা ও অর্জুনকে উপদিষ্টা এবং প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্বে গ্রথিতা। (ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত আঠারো অধ্যায়ের সাত শত শ্লোকে) অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈত-তত্ত্ব-অমৃতবর্ষিণী ও সংসার-নাশিনী। হে মাতঃ ভগবতি, তোমাকে আমি সদা ধ্যান করি।

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।। ২

আদিগুরু ব্যাসদেবকে প্রণাম—বিশালবুদ্ধে ব্যাস (হে, মহামতি ব্যাসদেব) ফুল্ল-অরবিন্দ-আয়ত-পত্র-নেত্র (প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট) যেন ত্বয়া (আপনার দ্বারা) ভারত-তৈল-পূর্ণঃ (মহাভারতরূপ তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্বলিতঃ (তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ প্রদীপ প্রজ্বালিত হয়েছে) তে নমঃ অস্তু (আপনাকে প্রণাম)।

হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনি বিশালবুদ্ধি ও আপনার চক্ষুঃদ্বয় প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রতুল্য মনোহর। আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন। আপনাকে প্রণাম করি।

ব্যাসদেবের নাম শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। তাঁর পিতা পরাশর মুনি এবং মাতা মৎস্যকন্যা সত্যবতী। তাঁর জন্ম যমুনার এক দ্বীপে। তাঁর শরীর ছিল কৃষ্ণবর্ণ। তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। জন্মের পরমুহূর্তেই তিনি জননীর অনুমতি নিয়ে তপস্যায় চলে যান এবং তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি জননীর সমীপে উপস্থিত হবেন—এই কথা জননীকে বলেন। তিনি মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়ে তপোবলে বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগ করেন। তাই তিনি 'বেদব্যাস' বা 'ব্যাস' নামে পরিচিত এবং বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে মহর্ষিত্ব লাভ করেন, তাই 'বাদরায়ণ'। তাঁর একমাত্র পুত্র শুকদেব জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব ও বৈশম্পায়ন—এই পাঁচজন শিষ্যকে বেদচতুষ্টয় ও মহাভারত অধ্যাপনা করান।

ব্যাসদেবের প্রজ্ঞা, মনস্বিতা ও প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি বেদের চার ভাগ, অষ্টাদশ পুরাণ, উত্তরমীমাংসা প্রভৃতি রচনা করেন। তিনি মহাভারত রচনা করেন। সনাতন ধর্মের জনক ও গুরু তিনি। তাই তাঁর জন্মদিন গুরুপূর্ণিমা রূপে পালিত হয় এবং সর্বত্র তিনি পূজা পান।

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ।।৩

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম—প্রপন্নপারিজাতায় (শরণাগতের পক্ষে পারিজাত বা কল্পবৃক্ষ-তুল্য) তোত্র-বেত্র-এক-পাণয়ে (যাঁর হস্তযুগল অশ্বচালনের জন্য বেত্র ও লাগামধারী) গীতা-অমৃত-দুহে (গীতারূপ অমৃত দোহনকারী) জ্ঞান-মুদ্রায় (জ্ঞানরূপ মুদ্রাধারী) কৃষ্ণায় নমঃ (শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি)।

পারিজাত কল্পবৃক্ষতুল্য যিনি শরণাগত ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন, অর্জুনের সারথিরূপে যাঁর হস্তযুগল অশ্বচালনার জন্য বেত্র ও লাগামধারী, যিনি গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও (দক্ষিণ হস্তে) জ্ঞানমুদ্রাধারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ।।৪

সর্ব-উপনিষদঃ (সমস্ত উপনিষদ্) গাবঃ (গাভীস্বরূপ), গোপালনন্দনঃ দোগ্ধা (শ্রীকৃষ্ণ-—দোহনকারী), পার্থঃ বৎসঃ (অর্জুন বৎসতুল্য), সুধীঃ (পণ্ডিত ব্যক্তিগণ), ভোক্তা (পানকর্তা), গীতা-অমৃতং (গীতার অমৃতস্বরূপ বাণী), মহৎ দুগ্ধং (মহা উৎকৃষ্ট দুগ্ধসদৃশ)।

সমস্ত উপনিষৎ গাভীসমূহ, সেইসব গাভীর দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, অর্জুন বৎস, গীতামৃতই মহাদুগ্ধ ও বিবেকী নারী-পুরুষগণই সেই অমৃতময়ী দুগ্ধের পানকর্তা।

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্‌ ।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌ ।।৫

বসুদেবসুতং (বসুদেবের পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ), কংস-চাণূরমর্দনং (কংস ও চাণূর নামক দৈত্যের বিনাশক) দেবকীপরমানন্দং (দেবকীর পরম আনন্দপ্রদ) জগদ্‌গুরুং দেবং কৃষ্ণং বন্দে (জগতের গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি)।

কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়ের বিনাশক, জননী দেবকীর পরম আনন্দদায়ক, বসুদেব-পুত্র জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে ।।৬

ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা (ভীষ্ম ও দ্রোণ যে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধরূপ নদের তট), জয়দ্রথ-জলা (জয়দ্রথ যার জল), গান্ধার-নীল-উপলা (গান্ধাররাজরূপ নীল প্রস্তর), শল্যগ্রাহবতী (শল্যরূপ কুম্ভীর), কৃপেণ বহনী (কৃপাচার্যরূপ খরস্রোত প্রবাহ) কর্ণেন বেলাকুলা (কর্ণরূপ তীরপ্লাবী তরঙ্গ), অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোর-মকরা (অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ঘোর মকরসদৃশ)দুর্যোধন-আবর্তিনী (দুর্যোধন যার আবর্ত) সা রণনদী (সেই রণনদী), কেশবে কৈবর্তকে (কেশব—শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়াতে) খলু পাণ্ডবৈঃ উত্তীর্ণাঃ (নিশ্চিতরূপে পাণ্ডবরা উত্তীর্ণ হয়েছে)।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধরূপ যে নদীর ভীষ্ম ও দ্রোণরূপ দুই তীর, জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরূপ নীল পিচ্ছিল প্রস্তর, শল্যরূপ কুম্ভীর, কৃপরূপ খরস্রোত প্রবাহ, কর্ণরূপ তীরপ্লাবী তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ভয়ঙ্কর দুই মকর এবং দুর্যোধনরূপ ঘূর্ণাবর্তোভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায় পাণ্ডবরা সেই রণনদী নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

পারাশর্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্‌ ।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ।।৭

পরাশর্য-বচঃ-সরোজং (পরাশর পুত্র বেদব্যাসের বাক্যরূপ-সরোবর জাত), অমলং (অমল) কলিমল-প্রধ্বংসি (কলিযুগের কলুষ নাশক) গীতা-অর্থ-গন্ধ-উৎকটম্‌ (গীতার উপদেশরূপ সুগন্ধযুক্ত), নানা-আখ্যানক-কেশরং (বিবিধ আখ্যানরূপ কেশরবিশিষ্ট) হরি-কথা-সম্বোধন-আবোধিতং (হরিকথা—শ্রীকৃষ্ণের বাণীদ্বারা বিকশিত) লোকে

(জগতে), সৎ-জন-ষট্‌-পদৈঃ (সজ্জনরূপ ভ্রমর দ্বারা) অহরহঃ (সর্বদা) মুদা পেপীয়মানং (সানন্দে পুনঃ পুনঃ পীয়মান), ভারত-পঙ্কজং (মহাভারতরূপ পদ্ম), নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে ভূয়াৎ (কল্যাণের নিমিত্ত হোক)।

পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের বাক্যরূপ সরোবরে উৎপন্ন, হরিকথা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা-প্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত, নানা আখ্যানরূপ কেশরযুক্ত সেই পদ্মের মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন, কলিযুগের কলুষ নাশক গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত, অমল মহাভারতরূপ সেই মহাপদ্ম, আমাদের কল্যাণের কারণ হউক।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌ ।। ৮

যৎকৃপা (যাঁর কৃপা) মূকং বাচালং করোতি (মূককে বাগ্মী করে), পঙ্গুং গিরিং লঙ্ঘয়তে (পঙ্গুকে পর্বত অতিক্রম করায়) তং পরমানন্দ-মাধবং অহং বন্দে(পরমানন্দঘন মাধবকে আমি বন্দনা করি)।

যাঁর কৃপা মূককে বাগ্মী করে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ।। ৯
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামঙ্গলধ্যানং সমাপ্তম্‌ ।

ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎ) দিব্যৈঃ স্তবৈঃ যং স্তুন্বন্তি (দিব্য স্তব দ্বারা যাঁকে স্তুতি করেন) সামগাঃ (সামবেদ গায়কগণ) স-অঙ্গ-পদক্রম-উপনিষদৈঃ বেদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদদ্বারা), যং গায়ন্তি (যাঁরা গুণগান করেন), যোগিনঃ (যোগিগণ) ধ্যান-অবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা (ধ্যানে নিমগ্ন মন দ্বারা) যং পশ্যন্তি (যাঁকে দর্শন করেন), সুর অসুরগণাঃ (দেব ও অসুরগণ) যস্য অন্তং ন বিদুঃ (যাঁর সীমা জানেন না), তস্মৈ দেবায় নমঃ (সেই দেবতাকে প্রণাম করি)।

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্য স্তব দ্বারা যাঁর-স্তব করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সঙ্গে বেদ দ্বারা যাঁর মহিমা গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণও যাঁর পরম তত্ত্ব অবগত নন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি।—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মঙ্গলধ্যান সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, অবতাররূপে অধর্মের নাশ ও ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য দেহধারণ করেছেন। তিনি সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ, ধর্মসংস্থাপক এবং মহাযোগী। অর্জুনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এক গভীর সখাভাবে ভালবাসার সম্পর্ক। অর্জুন তাঁর সকল কাজে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ ও পরামর্শ মানতেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্যোধন এবং অর্জুন দুজনই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য চাইতে যান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নারায়ণ–সেনা দ্বারা দুর্যোধনকে সাহায্য করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে নির্লিপ্ত ও শস্ত্রহীন থেকে অর্জুনের সারথিরূপে সাহায্য করেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। দুই পক্ষই কুরুক্ষেত্রে সজ্জিত। কিন্তু অর্জুন এক অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়েছেন। তাঁর মন আজ শোকে–দুঃখে খুবই ব্যথিত। তিনি যদিও ধর্ম ও সত্যকে রক্ষার জন্য অধর্ম ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন কিন্তু এই গৃহযুদ্ধে পরম আত্মীয়দের দেখে তাঁর মন যেন অনার্য–ভাব তমোগুণের প্রভাবে ক্ষাত্রধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম পালন করতে অসমর্থ হচ্ছেন। মন দুর্বল ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

দুর্বলতা বা তমোগুণজাত অজ্ঞান–আবরণশক্তি জীবের বিবেক বুদ্ধিকে মোহগ্রস্থ করে রাখে। এই অজ্ঞানমোহ চিৎস্বরূপকে আবৃত করে জীবের আত্মজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান প্রকাশে বাধা দেয়। সত্ত্বগুণ জ্ঞানের প্রকাশক। তমোগুণ সত্ত্বগুণের বিরোধী। তমোগুণের জন্য মানুষের সৎ বস্তুতে অসৎ ভ্রম হয়। কাজেই সত্ত্বগুণ যেমন জ্ঞানের প্রকাশক তমোগুণ তেমন জ্ঞানের আবরক, ভ্রম ও মোহের উৎপাদক। তমোগুণ জীবের কর্মপ্রচেষ্টা হ্রাস করে, মনকে দুর্বল করে, আলস্য উৎপাদন করে, বিকৃত বুদ্ধির প্রকাশ করে। এই তমোগুণ থেকে প্রমাদ অর্থাৎ ভ্রম জন্মায়। মোহ সৃষ্টি করাই তমোগুণের কাজ। এই

মোহের দ্বারা জীবের বিচারবুদ্ধিতে ভ্রম উপস্থিত হয়। অবিবেকবশত জীব অসৎকে সৎ মনে করে, অনিত্যকে নিত্য মনে করে, অসুন্দরকে সুন্দর মনে করে এবং তাতেই আকৃষ্ট হয়। দেহেতে আত্মাভিমানবশত দেহের সুখদুঃখে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। তমোগুণের দ্বারা মানুষ আচ্ছন্ন হলে মানুষ তার মনোযোগ অথবা একগ্রতা হারায়, ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, জীবনকে ভুল পথে চালিত করে, কার্যকালে প্রমাদ আলস্য কুঁড়েমি আসে, অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি করে, জীবন ঘোর অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

তমোগুণের প্রভাবে অবিবেকবশত মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হলে সেই প্রবৃত্তিই তার কাছে বিষাদে পরিণত হয়। মানুষের মনের বিষাদ ভয়ঙ্কর। অশুভ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ কখনই শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে না। মানুষের শত গুণের মধ্যে একটিমাত্র দুর্বল প্রবৃত্তির দ্বারা জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। সেটি দেহাত্মবোধ বা অহংবোধ ও কর্তাবোধ। এই অহংবোধ থেকেই মানুষের মনে অসৎ প্রবৃত্তি ঈর্ষা, দ্বেষ ও আসক্তি জন্মায়।

একজন মানুষের অসৎ প্রবৃত্তির জন্য সমগ্র সংসার নষ্ট হয়। দুর্যোধনের সমরপ্রবৃত্তি ও ঈর্ষা ভয়ঙ্কর বিষময় ফল উৎপন্ন করেছিল এবং ঐ প্রবৃত্তিই ভারতবর্ষে চরম অশান্তি ও ধ্বংস এনেছিল। সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের সামান্য পাশাখেলার নিছক শখ কতখানি সর্বনাশ এনেছিল তাও শিক্ষণীয়। ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অনেক মহৎ চরিত্রের ব্যক্তিও দুর্যোধনের অসৎ প্রবৃত্তির পক্ষে যুদ্ধ করছেন এবং ধ্বংস হয়েছেন।

অন্যদিকে ধর্মপথে রাজ্যলাভের উদ্দেশে অর্জুন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু সং উদ্যম থাকলেও আত্মীয়স্বজন বধ, কুলক্ষয় ইত্যাদি চিন্তায় অর্জুনের মনে গভীর বিষাদ, চিত্ত বিভ্রান্ত। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে চান। এর কারণ 'আমি যুদ্ধ করব, আমি রাজ্যলাভ করব, আমার আত্মীয়'—এই অহংযুক্ত মমত্ববোধ অর্থাৎ অবিবেকজাত সকাম কর্মই মোহ সৃষ্টি করেছে। অর্জুন নিজেকেই সমস্ত কর্মের কর্তা মনে করছেন, তাই তাঁর মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু ভগবানের কৃপায় শরণাগত অর্জুনের শুদ্ধবুদ্ধির উদয় হয়। অর্জুন বিষাদযুক্ত শোক-মোহরূপ সাগর থেকে উদ্ধার লাভ করেন। তাঁর বুদ্ধিতে রাজ্যলাভ কামনার পরিবর্তে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালনরূপ কর্তব্যবুদ্ধির উদয় হয় এবং যা তাঁকে নিষ্কাম কর্মের পথে, জ্ঞানের পথে নিয়ে যায়। ভগবানের অশেষ কৃপায় ও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ শ্রবণের ফলে অর্জুনের এই রাজ্যলাভের ইচ্ছা অর্থাৎ সকাম কর্মের মোহরূপ অহং নাশ হয় এবং তিনি চিত্তে পরম শান্তিরূপ ভগবান লাভের উপায় নিষ্কামকর্ম যোগের প্রতি নিষ্ঠাবান হন।

অর্জুনের মোহ বা মনের বিষাদ দূর করার জন্যই গীতার অবতারণা। স্বয়ং ভগবান সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও অর্জুনের মন মোহাচ্ছন্ন ও বিষাদগ্রস্ত হয়েছে। কারণ প্রথমে অর্জুন আত্মবুদ্ধি বা ঈশ্বরবুদ্ধিতে স্বধর্ম কর্মে প্রবৃত্ত হননি। তাই অজ্ঞানতার প্রভাবে অর্জুনের মন মোহগ্রস্ত এবং তাঁর মনে বিষাদ ও দুর্বলতা এসেছে। অর্জুনের মতো প্রত্যেক মানুষের

জীবনেই মোহ ও বিষাদ আসে। তাই ভগবান অর্জুনের মোহ ও দুর্বলতাকে লক্ষ করে সমগ্র মানবজাতির মোহ ও দুর্বলতা নাশের জন্য এই অপূর্ব গীতার বাণী উপদেশ দিয়েছেন। একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপায় আত্মবুদ্ধি বা ঈশ্বরবুদ্ধির দ্বারাই মানুষের চিত্তের দুর্বলতা, মোহ, অসৎ প্রবৃত্তি, অহঙ্কার ইত্যাদির নাশ সম্ভব। সকল কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ঈশ্বরবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি রাখা একান্ত কর্তব্য এবং কর্মক্ষেত্রে কিংবা ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রেই মানুষ স্বধর্ম পালন করেই আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরলাভ করতে সক্ষম।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।। ১

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ (দুর্যোধনের পিতা, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বললেন)—সঞ্জয় (হে সঞ্জয়) ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (দেবতাদের যজ্ঞস্থান, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ এব (এবং পাণ্ডবেরা) সমবেতাঃ (সমবেত হয়ে) কিম্ অকুর্বত (করেছিল)?

ধৃতরাষ্ট্রঃ জিজ্ঞাসা করলেন—হে সঞ্জয়, পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ সমবেত হয়ে কী করেছিল?

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে দেখা যায় যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরের অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! তোমার আত্মীয় ও সুহৃদ্‌দের ধর্মের পথ দেখাও, তুমি একটু ইচ্ছা করলেই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পার।' ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'পিতা, মানুষ স্বার্থের জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমিও মানুষমাত্র। আমার অধর্মে মতি নেই, কিন্তু পুত্রগণ আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হন।'

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন হস্তিনাপুরের রাজা এবং কৌরবদের পিতা। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। চন্দ্রবংশের মহারাজা ভরত-এর উত্তরপুরুষ ছিলেন মহারাজা শান্তনু। তাঁর প্রথমা পত্নী দেবী গঙ্গা। শাপগ্রস্ত অষ্টবসুকে উদ্ধারার্থে মা গঙ্গা মর্তে নারীশরীরে অবতীর্ণা হন। অষ্টবসুদের সন্তানরূপে ধারণ করে তিনি সাতটি পুত্রকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে উদ্ধার করেন। ভীষ্ম ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ শাপগ্রস্ত অষ্টম বসু। গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার পূর্বে মহারাজা শান্তনু তাঁকে দেবী গঙ্গার কাছ থেকে রক্ষা করেন। শর্ত অনুযায়ী দেবী গঙ্গা মহারাজা শান্তনুকে ত্যাগ করে চলে যান।

মহারাজা শান্তনু ও তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী সত্যবতীর পুত্র ছিলেন বিচিত্রবীর্য। তাঁর দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকা। বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে সত্যবতী ব্যাসদেবকে বংশরক্ষার জন্য আহ্বান করেন। তাঁর আশীর্বাদে অম্বিকা, অম্বালিকা ও এক দাসীর

গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারী ছিলেন শতপুত্রের জননী। ধৃতরাষ্ট্র শুধু অন্ধ ছিলেন না পরন্তু পুত্রস্নেহে এমনই অন্ধ যে, তাঁর পুত্র পাপী দুর্যোধন, দুঃশাসন—এঁদের পাপকর্মে কোনও দোষ দেখতে পেতেন না। আবার গান্ধারী পতিব্রতা হতে গিয়ে চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করলেন সারা জীবন। কিন্তু সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে পারেননি, তাই তিনি ইতিহাসের পাতায় অসৎ সন্তানের জননীরূপে পরিচিতা হলেন। অন্যদিকে মাতা কুন্তী সন্তানদের ভালবাসা ও সুশিক্ষা দিয়ে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাই অর্জুনকে ডাকা হয় গর্বের সঙ্গে কৌন্তেয় বলে।

ধৃতরাষ্ট্রের ভাই পাণ্ডু। তাঁর দুই পত্নী— কুন্তী ও মাদ্রী। তাঁদের পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। দুর্যোধনের ভয়ঙ্কর ঈর্ষা পাণ্ডব-ভাইদের প্রতি। গান্ধারের রাজকুমার তথা গান্ধারীর ভাই শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন ষড়যন্ত্র করে পাশাখেলায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করেন। তারপর পাণ্ডবদের রাজত্ব, ধনসম্পদ প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করেন। এমনকী তাঁদের স্ত্রী দ্রৌপদীকেও কৌরবগণ সভাস্থলে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত করে। পাণ্ডবরা সমস্ত অপমান সহ্য করে প্রতিজ্ঞা করেন দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গী বিশেষ করে দুঃশাসন ও কর্ণদের যুদ্ধে উপযুক্ত সাজা দেবেন। পাশাখেলায় পরাজয়ের নিয়ম অনুসারে পাণ্ডবগণ বারো বৎসর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাত বাস করেন। বনবাস থেকে ফিরে তাঁরা তাঁদের নিজেদের রাজত্ব ফিরে চাইলে দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে রাজত্বের কোনও অংশ পাণ্ডবদের ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবদের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। ব্যাসদেব, ভীষ্ম, দ্রোণ—এঁরা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন—যুদ্ধ না করে পাণ্ডবদের অংশ ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু কোনও কথা পাপী দুর্যোধন শুনতে চান না। তিনি যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাস্ত করতে চান। ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রস্নেহের মোহে দুর্যোধনকে কিছু বলতে পারছেন না। তাই তিনি বলছেন—'পুত্রগণ আমার বশবর্তী নয়।'

যুদ্ধ নিশ্চিত দেখে ব্যাসদেব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমগ্র যুদ্ধ দর্শনের জন্য দিব্যচক্ষু প্রদান করতে চেয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাতে অসম্মত হয়ে বললেন—আমি জ্ঞাতি-কুটুম্বের নিধন দেখতে চাই না, আপনার তপস্যা-প্রভাবে যাতে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শ্রবণ করতে পারি, আপনি তা-ই করুন। তখন ব্যাসদেব সঞ্জয়কে বর প্রদান করেন। সেই বরপ্রভাবে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। রাজপ্রাসাদে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসেই যুদ্ধ-দর্শন, যুদ্ধে উপস্থিত সকলের বাক্য-শ্রবণ ও তাঁদের সকল মনোভাব জ্ঞাত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন। গীতার সমস্তই সেই সঞ্জয়-বাক্য। সঞ্জয় ছিলেন রথচালক। তাঁর পিতা ছিলেন গবল্‌গণ। সঞ্জয় অতি বিদ্বান, চরিত্রবান ও শুদ্ধমতি পুরুষ ছিলেন। তিনি এক অসাধারণ পুরুষ এবং মুনির ন্যায় তপস্বী ছিলেন।

অনেক টীকাকার বলেন ধৃতরাষ্ট্র যখন সারথি সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বর্ণনা শুনতে চাইলেন, তখন দশদিন মহাযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যার শায়িত, উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হয়েছে, দুর্যোধনের জয়লাভ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাই এখানে ধৃতরাষ্ট্র 'কিম্ অকুর্বত' অর্থাৎ আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডব পুত্রগণ কী করেছিল—বলে জিজ্ঞাসা করছেন।

এখন প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হল কেন? 'জাবাল উপনিষদে' বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্র 'ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্', 'মোক্ষনিকেতন' অর্থাৎ মুক্তিলাভের স্থান। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' এই স্থানকে 'দেবানাং দেবযজনং' অর্থাৎ দেবতাদের যজ্ঞস্থান বা ধর্মভূমি বলে উল্লেখ করেছে। কৌরবদের পূর্বপুরুষ বিখ্যাত কুরু রাজা এই স্থানে হাল চালনা দ্বারা যজ্ঞ করে বর লাভ করেন যে, যে-ব্যক্তি এই স্থানে তপস্যা করবে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গে গমন করবে। তাই এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র এবং ধর্মক্ষেত্র। দেবীভাগবত পুরাণ ও তন্ত্রমতে কুরুক্ষেত্র মহাপীঠ। আবার বলা হয় 'কুরু' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সকলের 'ক্ষেত্র' অর্থাৎ শরীর। সমস্ত সাংসারিক ধর্মের উৎপত্তির ক্ষেত্র হল—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর। শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তির পরস্পর হিংসা, বিদ্যা ও অবিদ্যার, পরা ও অপরা, মোক্ষমার্গের সাধন হয়।

এই স্থানে সকলের মনে ধর্মভাবের উদ্রেক হয়। কিন্তু যাদের মন তৈরি হয়নি, তাদের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় হয়েছিল যদি স্থান-মাহাত্ম্যের গুণে তাঁর ছেলেরা শান্তির পথ নেয়। তাঁর ইচ্ছা পাণ্ডবেরা ধ্বংস হোক। যুদ্ধের জন্যে এতটা প্রস্তুত হবার পর যদি যুদ্ধ না হয়, তাহলে তা দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যের প্রভাব কৌরবদের মনে কোনও পরিবর্তন আনতে পারল না। এমনকী ভগবানের সান্নিধ্যও তাদের কোনও পরিবর্তন ঘটাল না। পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে দেখেছে কিন্তু কৌরবরা দেখেছে শত্রু বলে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আরও ধর্মপরায়ণ হয়েছে, ধর্মবিমুখ কৌরবেরা হয়েছে আরও ধর্মভ্রষ্ট ও অসৎ।

কুরুক্ষেত্র শহরটি দিল্লি থেকে প্রায় ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে বহু মানুষ ঐ স্থান দর্শনে যান এবং তীর্থযাত্রীরা সেখানে সরোবরে স্নান ও প্রার্থনা ও সাধন-ভজন করেন। একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ।। ২

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বললেন)—তদা (তখন) পাণ্ডব-অনীকং (পাণ্ডব সৈন্যদেরকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে সজ্জিত) দৃষ্ট্বা তু (দেখে) রাজা দুর্যোধনঃ আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে) বচনম্ অব্রবীৎ (এই কথা বললেন)।

সঞ্জয় বললেন—তখন যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যদেরকে ব্যূহাকারে সজ্জিত দেখে গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে এই কথা বললেন।

মহাভারতে দ্রোণাচার্য পিতামহ ভীষ্মের মতোই যোদ্ধা ও গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষকে তিনি ধনুর্বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি হস্তিনাপুরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে বাস করতেন তাই এই যুদ্ধে তিনি কৌরবদের পক্ষ নিয়েছিলেন। দ্রোণ ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের স্বভাবধর্ম যজন, অধ্যয়ন, পূজা, তপস্যা প্রভৃতি ছেড়ে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। অগ্নিবেশ মুনির নিকট অস্ত্র-শিক্ষা লাভ করেন এবং পরশুরামের নিকট থেকে বহু অস্ত্র-লাভ ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কৃপাচার্যের ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। তাঁদের এক পুত্র ছিল নাম অশ্বত্থামা। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু কিন্তু দ্রুপদ রাজৈশ্বর্য গর্বে বাল্যসখা দ্রোণকে অপমান করেন। দ্রুপদ বলেন—'ঐশ্বর্যশালী রাজার সঙ্গে এক শ্রীহীন লোকের বন্ধুত্ব হওয়া একেবারেই অসম্ভব।' এই অপমান ও ক্রোধ দ্রোণকে জীবনভোর ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তিনি ক্ষত্রিয়বধে কৃতসঙ্কল্প হন। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হস্তিনাপুরে বাস করেন এবং পরে পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দ্রুপদকে বন্দী অবস্থায় চাইলেন। অর্জুন দ্রুপদরাজকে বন্দী অবস্থায় দ্রোণের নিকট উপস্থিত করালেন। দ্রোণ তাঁকে ক্ষমা করে অর্ধেক পাঞ্চালরাজ্য দান করলেন। দ্রুপদ এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম হয়। এই দ্রৌপদী দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুন ও অপর চার পাণ্ডবকে বিবাহ করেন। অর্জুনকে জগতে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর করার জন্য দ্রোণ নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যকে ত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও একলব্য গোপনে দ্রোণের মূর্তি বসিয়ে ধনুর্বিদ্যা শিখে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হয়েছিল। অর্জুনের কাছে একলব্যের যুদ্ধবিদ্যার কথা শুনে দ্রোণ তাকে দেখতে যান। যখন দেখলেন একলব্য নিজের চেষ্টায় প্রচুর যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে কিন্তু এই বিদ্যা ভয়ঙ্কর এবং মানুষের কল্যাণের চেয়ে ক্ষতি করবে, গুরুর নিকট কোন নৈতিক শিক্ষা লাভ করেনি, তখন তিনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ একলব্যের ডান হাতের বুড়ো আঙুল কাটা অবস্থায় চেয়ে একলব্যের যুদ্ধবিদ্যার শক্তি কমালেন। পরে একলব্য দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেন।

যাই-হোক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনে দ্রোণের নিকট তাঁর প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা হত হয়েছে বলে যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই অপ্রিয় খবর দেন, তাতে দ্রোণ পুত্রশোকে অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং যোগমার্গে দেহত্যাগ করবার সংকল্প নেন। সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের

শিরচ্ছেদ করেন।

মহাভারতকার দুর্যোধন-চরিত্র সম্পর্কে বলছেন, দুর্যোধন দুর্বুদ্ধি, দুরাচারী এবং কুরুবংশের কীর্তিনাশী। তাঁর প্রবৃত্তিদোষেই ভারতের বহু প্রসিদ্ধ বংশ লুপ্ত হয়েছে। কলির অংশে তাঁর জন্ম। জন্মিবামাত্র দুর্যোধন গর্দভের ন্যায় চিৎকার করে উঠেছিল। শকুনি, শৃগাল প্রভৃতি উচ্চ চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে তুলেছিল। নানাবিধ এরূপ দুর্লক্ষণ দেখে রাজপুরোহিতগণ ও বিদুর শঙ্কিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই পুত্রকে ত্যাগ করবার জন্য। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে তাঁকে ত্যাগ করতে পারেননি। দুর্যোধন শৈশব থেকেই পাণ্ডবদের শক্তি দেখে ঈর্ষা করতে থাকেন। কৈশোর ও যৌবন এই পাণ্ডব-নিধনের চেষ্টায়ই তাঁর সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন। তাই দুর্যোধন বলছেন, 'আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে দেহত্যাগ করব কিন্তু শত্রুকে সমৃদ্ধ দেখে কিছুতেই বাঁচতে পারব না।' তিনি ও ভীম উভয়ে বলরামের কাছে গদা-শিক্ষা লাভ করেন। গদাযুদ্ধে দৈহিক বলে ভীম এবং কৌশলে দুর্যোধনের কৃতিত্বই বেশি ছিল। তাই কুরুক্ষেত্রের শেষ যুদ্ধে ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে ভীম কিছুতেই দুর্যোধনের সঙ্গে কৌশলে পেরে উঠছিলেন না। তাই ভীম নিয়ম ভঙ্গ করে দুর্যোধনের উভয় ঊরুতে প্রচণ্ড আঘাত করে ঊরুদ্বয় ভেঙে দেন এবং যুদ্ধে জয় লাভ করেন।

এখানে সঞ্জয় বলছেন যে, রাজা দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবদের সৈন্যব্যূহ দেখে আচার্য দ্রোণকে তা বর্ণনা করলেন। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে দূত দ্বারা আহ্বান না করে স্বয়ং তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন। যেহেতু তিনি শিষ্য তাই আচার্যের নিকট উপস্থিত হলেন। সঞ্জয়, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে খুশি করবার জন্য দুর্যোধনকে 'রাজা দুর্যোধন' বলে বর্ণনা করছেন। সঞ্জয় দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধির পরিচয়ও কিছু বলবেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩

আচার্য (হে গুরুদেব), তব (আপনার), ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদ-পুত্র দ্বারা), ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে অবস্থিত), পাণ্ডু-পুত্রাণাম্ (পাণ্ডুপুত্রদের), এতাং (এই), মহতীং চমূং (বিপুল সেনা), পশ্য (দেখুন)।

(দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বললেন)হে গুরুদেব! পাণ্ডবদের এই বিপুল সৈন্যদল দেখুন। আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র দ্বারা ব্যূহাকারে সেই সৈন্যদল সজ্জিত রয়েছে।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন যে, দুর্যোধন ধর্মক্ষেত্রে পূর্বের মতোই রয়েছেন। পাণ্ডবদের বিপুল সেনাদল দেখাতে গিয়ে দ্রুপদরাজের সঙ্গে দ্রোণাচার্যের পূর্ব-শত্রুতা ছিল তাই দুর্যোধন 'আপনার ধীমান শিষ্য' ও 'দ্রুপদপুত্র' বলে দ্রোণাচার্যের পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করে দিচ্ছেন। দ্রুপদরাজ দ্রোণাচার্যের বধের জন্য পুত্রকাম যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে

ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তাঁর দেহের বর্ণ অগ্নির ন্যায়। দ্রোণাচার্যের নিকট ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন।

তাই দুর্যোধন বলছেন, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান, কেননা আপনাকেই বধ করবার জন্য আপনার নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। তাই আপনি একবার আপনার শিষ্যের ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তা দেখুন। গুরুর প্রতি দুর্যোধনের যে রাগ ও দ্বেষ আছে তাই এইসব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করছেন।

দুই সৈন্যদল—পাণ্ডব ও কৌরবদলের মধ্যে যুদ্ধ। পাণ্ডবসৈন্য অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির সঙ্গে অনান্য রাজাগণ। কৌরবসৈন্য অর্থাৎ দুর্যোধন, তাঁর শত ভাই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং অন্যান্য রাজাগণ।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ।।৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ।।৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ।।৬

অত্র (এই পাণ্ডবসেনাদের মধ্যে) শূরাঃ (শৌর্যশালী) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধর) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ) যুযুধানঃ (সাত্যকি, যদুবংশের বীর) বিরাটঃ চ (ও মৎস্যরাজ বিরাট, অভিমন্যুর শ্বশুর) চ (এবং) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) দ্রুপদঃ (দ্রুপদরাজ, পাণ্ডবদের শ্বশুর) ধৃষ্টকেতুঃ (শিশুপালের পুত্র) চেকিতানঃ (যদুবংশীয় বীর) চ (এবং) বীর্যবান্ (মহাবীর) কাশীরাজঃ (কাশীরাজ, দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ) পুরুজিৎ (পুরুজিৎ) কুন্তিভোজঃ চ (এবং রাজা কুন্তিভোজ) চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ (ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য) চ বিক্রান্তঃ (ও পরাক্রমশালী) যুধামন্যুঃ (যুধামন্যু) চ বীর্যবান (ও শক্তিমান্) উত্তমৌজাঃ (উত্তমৌজা) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রার পুত্র, অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র) চ সর্বে এব (সকলেই) মহারথাঃ (মহাযোদ্ধা)।

পাণ্ডবদের এই সেনাদলে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ, মহাধনুর্ধারী বহু বীরপুরুষ রয়েছেন। সাত্যকি, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ রাজা, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান কাশীরাজ, কুন্তিভোজ পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রা–পুত্র (অভিমন্যু), দ্রৌপদীর পুত্রগণ—এঁরা সকলেই মহারথী।

দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে বলছেন, শুধু ধৃষ্টদ্যুম্ন নয়, আরও অনেক ধনুর্ধারী ও পরাক্রান্ত বীর রয়েছেন। যুযুধান (যদুবংশের সত্যকের পুত্র সাত্যকি), যিনি মহাবীর, শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও মহারণে অক্লান্ত। শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুগত। বিরাটরাজ যিনি মৎস্যদেশের অধিপতি। পাণ্ডবগণ বনবাসে বিরাটরাজ্যে একবৎসর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের মিত্র

ছিলেন। বিরাটরাজের কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়। দ্রুপদরাজ, যাঁর বিজয়পতাকা সদা উড্ডীয়মান। শত্রুদের মহাভয় ধৃষ্টকেতু। বীরবর চেকিতান। কাশীধামের রাজা কাশীরাজ। বহু শত্রুকে যিনি জয় করেছেন, পুরুজিৎ। মহারাজ কুন্তিভোজ। শিবিরাজের পুত্র নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য। যুধামন্যু, যিনি যুদ্ধের নামে ক্রোধে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন ও পাঞ্চলদেশের বিক্রান্ত রাজা। মহা বলবিক্রমে প্রশংসনীয় উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রার (অর্জুনের স্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী অর্থাৎ রাজা বসুদেবের দ্বিতীয় পত্নী রোহিণীর কন্যা) গর্ভজাত রণকৌশলে মহাযোদ্ধা অভিমন্যু—শৌর্যে, বীর্যে, রূপে ও আকৃতিতে তিনি কৃষ্ণের সমান পুরুষসিংহ, মহাবীর ও সৎচরিত্র। জন্ম থেকেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহযত্নে প্রতিপালিত হয়েছেন। অর্জুনের নিকট তিনি সর্ববিধ শস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রের ত্রয়োদশ দিনে দ্রোণাচার্য সপ্তরথী দ্বারা চক্রব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবদের আক্রমণ করেন। একমাত্র এই চক্রব্যূহে প্রবেশ করবার ক্ষমতা ছিল অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন এবং অভিমন্যুর। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ জানতেন কিন্তু বার হবার কৌশল জানতেন না। তাই চক্রব্যূহে সপ্তরথী একসঙ্গে অভিমন্যুকে বধ করেন।

তাদের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর মহাপরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্রগণ (প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক, শ্রুতসেন) রয়েছেন। তাছাড়া আরও মহারথী ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ ইত্যাদি রয়েছেন। এঁরা সকলেই মহারথ অর্থাৎ যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধরীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে অতি নিপুণ ও অভিজ্ঞ।

এরপর রাজা দুর্যোধন নিজ সৈন্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আচার্য দ্রোণকে বলবেন–

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ।।৭

(হে) দ্বিজোত্তম (বিপ্রশ্রেষ্ঠ) অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁরা) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যের নায়ক) তান্ (তাঁদের) নিবোধ (অবগত হউন) তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্ অবগতির জন্য) তান্ ব্রবীমি (সেই সকল নাম বলছি)।

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আমাদের পক্ষেও যাঁরা মহান যোদ্ধা ও সেনাপতিগণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে শুনুন, আপনার অবগতির জন্য তাঁদের নাম বলছি।

দুর্যোধন পাণ্ডবপক্ষের যাঁদের নাম বললেন তাঁরা অনেকেই দ্রোণাচার্যের শিষ্য। তাঁদের নাম শুনে দ্রোণাচার্যের গর্ব বোধ করা স্বাভাবিক। তাই দ্রোণাচার্য অবগত থাকলেও দুর্যোধন কৌরবপক্ষের মহাবীরদের নাম তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, ভীষ্ম, কর্ণ এঁদের মতো মহাবীর সেখানে আছেন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ।। ৮

ভবান্ (আপনি অর্থাৎ দ্রোণাচার্য) ভীষ্মঃ চ (ও ভীষ্ম, বশিষ্ট কর্তৃক অভিশপ্ত অষ্টম বসু দ্যুনামা) কর্ণঃ (কর্ণ—সূর্যের অংশে সম্ভূত) সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরজয়ী) কৃপঃ (কৃপাচার্য—দ্রোণের শ্যালক) অশ্বত্থামা চ (এবং অশ্বত্থামা—দ্রোণপুত্র) বিকর্ণঃ চ (ও বিকর্ণ—দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভাই) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তের পুত্র, ভূরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ চ (সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ)।

আমাদের পক্ষে স্বয়ং আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ—এঁরা সব আছেন।

মহাভারতে ভীষ্মের চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাভারত-কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র ভীষ্ম। ভীষ্ম চরিত্র না থাকলে মহাভারতের অনেক ঘটনাই ঘটত না। ভীষ্ম অর্থাৎ দেবব্রত ছিলেন মহারাজ শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র। অষ্টবসুর এক বসু ভীষ্ম বা দেবব্রতরূপে মা গঙ্গার গর্ভে জন্ম নেন। অষ্টবসু দেবতা একবার বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম থেকে সুরভী গাভী চুরি করেন এবং বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপে অষ্টবসু মর্তে মা গঙ্গার গর্ভে জন্ম নেন। মা গঙ্গা সাত বসুকে জন্মের পরে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে মুক্ত করেন কিন্তু রাজা শান্তনু অষ্টম বসুকে রক্ষা করেন। তখন পূর্বশর্ত অনুযায়ী মা গঙ্গা শিশু দেবব্রতকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী শান্তনুকে ত্যাগ করেন। জননী গঙ্গাদেবীই দেবব্রতের শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। দেবব্রত ঋষি বশিষ্ঠ-থেকে বেদ-শিক্ষা ও পরশুরাম-থেকে অস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করেন। পরে গঙ্গা কৃতবিদ্য পুত্রকে রাজা শান্তনুর হস্তে সমর্পণ করেন। যুবরাজ দেবব্রত পিতা শান্তনুর সঙ্গে বাস করেন।

কিছুদিন পরে রাজা শান্তনু ধীবররাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করতে চাইলেন এবং ধীবররাজ বিবাহের শর্ত রাখলেন যে, সত্যবতীর পুত্রকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে রাজা করতে হবে। মহারাজ শান্তনু তখন দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ভীষ্ম এই খবর পেয়ে ধীবররাজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি নিজে রাজসিংহাসনের দাবিদার হবেন না, সত্যবতীর পুত্র হস্তিনাপুরের রাজা হবে। ভীষ্ম চিরদিন ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করবেন অর্থাৎ বিবাহ করবেন না এবং হস্তিনাপুরকে সর্বদা রক্ষা করবেন। ভীষ্মের এই আত্মত্যাগ দেখে রাজা শান্তনু তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন।

ভীষ্ম সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্যকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসালেন এবং তাঁকে বিবাহ দেবার জন্য কাশীরাজের কন্যাদের স্বয়ংবর সভা থেকে তুলে আনলেন। দুই কন্যা—অম্বিকা ও অম্বালিকা বিচিত্রবীর্যকে বিবাহ করলেন কিন্তু অপর কন্যা অম্বা বিবাহ করলেন না। যেহেতু তিনি শাল্বরাজের বাগদত্তা ছিলেন। ভীষ্ম যথাসম্মানে তাঁকে শাল্বরাজের কাছে পাঠালেন কিন্তু শাল্বরাজ তাঁকে গ্রহণ করলেন না। তখন অম্বা ভীষ্মকে বিবাহ করতে চাইলেন কিন্তু ভীষ্ম বিবাহ করলেন না। তাই তিনি ভীষ্মের মৃত্যুর জন্য মহাদেবের তপস্যা করতে লাগলেন। মহাদেব তাঁকে বর দেন যে, পরজন্মে তিনি ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। তাই তিনি অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন এবং পরজন্মে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের

কন্যারূপে প্রথমে জন্ম নেন। পরে মহাদেবের কৃপায় পুরুষরূপ লাভ করে। তাঁর নাম হয় শিখণ্ডী এবং ভীষ্মের মৃত্যুর নিমিত্তভূত হলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রথম থেকেই ভীষ্ম সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতি হয়ে তিনি দুর্যোধনের কাছে দুটি প্রতিজ্ঞার কথা বলেন—প্রথমত তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না। দ্বিতীয়ত তিনি পাণ্ডবদের মধ্যে কাউকে বধ করবেন না। তাছাড়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি তাঁর মৃত্যুর উপায় বলে দেন। যুদ্ধের দশম দিনে তিনি শিখণ্ডীকে দেখে অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে সহস্র তীর দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করেন। ভীষ্ম শরশয্যায় উত্তরায়ণের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি জ্ঞান-উপদেশ করেন। সেগুলি মহাভারতের শান্তিপর্বে পাওয়া যায়। শেষে আটান্ন দিন শরশয্যায় থেকে ইচ্ছামৃত্যু দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং দেহত্যাগ-কালে বলেন—'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'—অর্থাৎ ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে। অতএব তোমারা সত্য পালনে যত্ন করবে। সত্যই পরম বল।

মহাভারতে কর্ণচরিত্র খুব দুঃখের। সূর্য দেবতার কৃপায় কুন্তীর কুমারী বয়সে কর্ণের জন্ম। শরীরে কবচ এবং কানে কুণ্ডল নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তী সমাজে লজ্জার ভয়ে শিশু কর্ণকে ত্যাগ করেন। সূতজাতীয় অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী শিশুকে পেয়ে মানুষ করতে থাকেন। শিশুকাল থেকেই কর্ণ বিক্রমশালী ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখতে চাইলেন কিন্তু সুতপুত্র বলে দ্রোণাচার্য তাঁকে শিষ্যরূপে স্বীকার করলেন না। এই সময় হতে কর্ণচরিত্রে দ্রোণশিষ্য অর্জুন-বিদ্বেষ দেখা দেয়। কর্ণ পরিচয় গোপন করে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেন। পরশুরাম তাঁর আসল পরিচয় জানতে পেরে অভিশাপ দেন যে, মৃত্যু সন্নিহিত হলে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ ভুলে যাবে। তাছাড়া অস্ত্রশিক্ষাকালে তিনি এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুকে বধ করলে ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন যে, তুমি যাঁকে লক্ষ করে এই অস্ত্রশিক্ষা করছ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হলে তোমার রথের চাকা ভূমি গ্রাস করবে এবং সেই অবসরে প্রতিপক্ষ তোমার শিরশ্ছেদ করবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধকালে কর্ণের রথের চাকা ভূমি গ্রাস করে এবং অর্জুন তাঁর শিরশ্ছেদ করেন।

কৃপাচার্য ছিলেন মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র। মহর্ষি শরদ্বানের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। মহারাজ শান্তনু তাঁদের আশ্রম থেকে নিয়ে এসে পরম যত্নে পালন করেন। তাঁদের নাম রাখেন কৃপ ও কৃপী। মহর্ষি শরদ্বান কৃপকে শাস্ত্র ও ধনুর্বেদ শিক্ষা দান করেন। হস্তিনাপুরে কুরুপাণ্ডব-কুমারদের ধনুর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কৃপকেই প্রথমত আচার্যরূপে নিয়োগ করেন। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করেন। পরে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসে কৃপাচার্যকে সসম্মানে রাজপুরীতে স্থান দিয়েছেন।

অশ্বত্থামা ছিলেন আচার্য দ্রোণের পুত্র। তিনি জন্ম হয়েই অশ্বের মতো চিৎকার

করেছিলেন তাই নাম ছিল অশ্বত্থামা। পিতা দ্রোণের নিকট থেকে তিনি অস্ত্রশিক্ষা এবং অনেক দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ শিখেছিলেন। তিনি অহঙ্কারী, দুরাত্মা, চপল এবং ক্রূর ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রের প্রয়োগ জানতেন। তিনি পিতার সঙ্গে হস্তিনাপুরে বাস করতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেন। দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গ দেখে প্রতিজ্ঞা করেন যে-কোনও উপায়ে তিনি পাণ্ডববংশকে সমূলে নিধন করবেন। তিনি অন্ধকারে গভীর রাতে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সঙ্গে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা-তাঁকে অনুসরণ করলেন। অশ্বত্থামা মহাদেব থেকে প্রাপ্ত দৈব খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজাঃ, যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং শিখণ্ডীসহ বহু বীরকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রমে পালিয়ে যান। ভীম, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে খুঁজে ব্যাসদেবের আশ্রমে উপস্থিত হলে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র পাণ্ডবদের উদ্দেশে প্রয়োগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনও ঐ অস্ত্রের নিষেধ করতে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন। ফলে পৃথিবীতে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। মহর্ষি নারদ ও ব্যাসদেব, তাঁদের দুজনকে এই দিব্যাস্ত্র সংবরণ করতে বললেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁর অস্ত্র সংবরণ করলেন কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁর অস্ত্রের সংবরণ করতে জানতেন না। ফলে ব্যাসদেব তাঁকে তিরস্কার করেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে সেই অস্ত্র পাণ্ডববংশের সন্তান উত্তরার গর্ভের সন্তান পরীক্ষিৎকে আঘাত করল এবং শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে পরীক্ষিৎকে দর্শন দিয়ে তাঁকে পুনরায় জীবন দান করেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ভ্রূণঘাতী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অভিশাপ দেন যে, তিন হাজার বৎসর গলিত-কুষ্ঠরোগী হয়ে দুর্গম বনে বনে ঘুরে বেড়াবে, কোথাও কোনও সঙ্গ ও স্থান পাবে না। ফলে অশ্বত্থামা মহাপাপের জন্য ঐভাবে দীর্ঘজীবন বেঁচে থাকেন।

বিকর্ণ ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের অষ্টম পুত্র। তিনি সত্যপ্রিয় ও ভদ্রস্বভাব এবং দুর্যোধন ও দুঃশাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি দুর্যোধনের নানা কাজে বাধা দিয়ে আসছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ হয়েও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দিলেন এবং ভীমের বাণে নিহত হন। সৌমদত্তি অর্থাৎ সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা।

জয়দ্রথ ছিলেন সিন্ধুরাজ এবং তিনি ধৃতরাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দুঃশলাকে বিবাহ করেন। তিনি একবার পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে দ্রৌপদীকে হরণ করবার চেষ্টা করেন এবং পঞ্চপাণ্ডবের নিকট লাঞ্ছিত হন। পরে মহাদেবকে তুষ্ট করে অর্জুন ব্যতীত অপর চার ভাইকে একদিনের যুদ্ধে শুধু ঠেকিয়ে রাখবার বর পেলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যখন অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করলেন তখন ব্যূহের দ্বাররক্ষার ভার জয়দ্রথ নিয়েছিলেন এবং মহাদেবের বরে সেইদিন অর্জুন ভিন্ন সকলকে পরাজিত করেন। ফলে অভিমন্যুর মৃত্যু হয় এবং পরের দিন অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন জয়দ্রথকে বধ করবেন। জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবের কাছে বর লাভ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর পুত্রের শির ভূপাতিত করবে,

সেই ব্যক্তির শিরও শত বিদীর্ণ হবে। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুন তাঁর বাণের দ্বারা জয়দ্রথের ছিন্ন মস্তক তপস্যারত তাঁর পিতার কোলে নিয়ে গিয়ে ফেললেন। তাঁর পিতার কোল থেকে যখন মাটিতে ছিন্ন মস্তক পড়ল তখন তাঁর পিতারও মস্তক শত বিদীর্ণ হল।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।। ৯

অন্যে চ (এবং আরও) বহবঃ শূরাঃ (বহু বীরগণ) মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে প্রস্তুত) সর্বে (সকলে) নানাশস্প্রহরণাঃ (নানা অস্ত্র নিক্ষেপে সুদক্ষ) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধনিপুণ)।

আমার জন্য জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরও অনেক বীরপুরুষ আছেন তাঁরা সকলেই নানা অস্ত্রধারী, যুদ্ধবিশারদ।

দুর্যোধন তাঁর নিজের দলের অন্য বীরদের আর নাম নিলেন না। বিপক্ষ দলের বীরদের সকল নাম বলেছেন। এখন শুধু এই কথাগুলি আচার্য দ্রোণাচার্যকে বোঝাতে চাইছেন তিনি যাতে মনে না করেন যে, দুর্যোধনের দল দুর্বল।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।। ১০

অস্মাকম্ (আমাদের) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্ম দ্বারা সুরক্ষিত) তৎ বলং (সেই সৈন্যবল) অপর্যাপ্তম্ (অপরিমিত, অসংখ্য, অপরাজেয়) এতেষাং তু (কিন্তু এদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের) ভীম-অভিরক্ষিতম্ (ভীমের দ্বারা রক্ষিত) ইদং বলং (এই সেনা) পর্যাপ্তম্ (পরিমিত, সংখ্যায় কম)।

সেনাপতি ভীষ্ম দ্বারা আমাদের সৈন্যবল অপরিমিত ও যুদ্ধে অপরাজেয়। কিন্তু ভীমের দ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পরিমিত সংখ্যায় অল্প।

বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রতিদিন যুদ্ধে দশ সহস্র সৈন্য হত্যা করবেন কিন্তু পাণ্ডব ও শিখণ্ডীকে হত্যা করবেন না। তাই দুর্যোধনের ভয় ও সন্দেহ। কিন্তু দুর্যোধনের একমাত্র সাহস ও গর্ব যে, পিতামহ ভীষ্ম দ্বারা কৌরব সৈন্য রক্ষিত।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি।। ১১

ভবন্তঃ সর্বে এব হি (আপনারা সকলেই) সর্বেষু চ অয়নেষু (সকল ব্যূহপ্রবেশ-পথে)

যথাভাগম্ (নিজ নিজ যুদ্ধস্থানে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হয়ে) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করতে থাকুন)।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলছেন আপনারা সকলেই নিজ নিজ বিভাগ অনুসারে সমস্ত ব্যূহদ্বারে অবস্থিত থেকে পিতামহ ভীষ্মকেই সকল দিক হতে রক্ষা করতে থাকুন।

এখানে দুর্যোধন দ্রোণের প্রতি একটু উপেক্ষা প্রকাশ করছেন। কারণ তাঁর ধারণা যতক্ষণ ভীষ্ম জীবিত আছেন, ততক্ষণ তাঁরা নিরাপদ। তাই সকলে যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করেন। ভীষ্মদেব কৌরবদের সেনাপতি এবং তিনি যুদ্ধে অপরাজেয়, অথচ তাঁর রক্ষার জন্য এমন সতর্ক ব্যবস্থা দুর্যোধন কেন করছেন? কারণ দুর্যোধন জানেন, ভীষ্ম একাই সসৈন্য পাণ্ডবদের ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু তিনি শিখণ্ডীকে বধ করবেন না। ভীষ্মের মৃত্যুর কারণরূপে শিখণ্ডী জন্ম নিয়েছেন এবং ভীষ্ম তাঁকে সামনে দেখলেই অস্ত্র ত্যাগ করবেন। অতএব শিখণ্ডী যেন অতর্কিতভাবে ভীষ্মের সামনে এসে অনিষ্ট করতে না পারে, সে-বিষয়ে সতর্ক হয়ে সবদিক থেকে যেন সকলে তাঁকে রক্ষা করেন।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ।। ১২

প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (প্রতাপশালী কুরুকুলের প্রবীণ পিতামহ ভীষ্ম) তস্য (তাঁর, দুর্যোধনের) হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন, বর্ধন করে) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ করে) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করলেন)।

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ তাঁর (দুর্যোধনের) আনন্দ উৎপাদন করে উচ্চ সিংহনাদ-সহকারে শঙ্খধ্বনি করলেন।

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ কিভাবে শুরু হচ্ছে সঞ্জয় সেই দৃশ্য বর্ণনা করছেন। পিতামহ ভীষ্ম প্রথমে শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধ শুরু করছেন। ভীষ্ম একজন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, বিপুল সাহসের অধিকারী, প্রতাপশালী মহাবীর ও অসাধারণ ধীশক্তিমান জ্ঞানী পুরুষ। তবুও তিনি যেন দুর্যোধনের দাস এবং তাঁকে খুশি করবার জন্য তিনি সিংহ-গর্জন সহকারে রণ-শঙ্খধ্বনি করে, যুদ্ধের আহ্বান করলেন। তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি তাই তাঁর প্রতিজ্ঞার শর্ত অনুসারে হস্তিনাপুরের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন। যদিও তিনি জানেন দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করা অর্থাৎ অধর্মের পক্ষ। কিন্তু তাঁর এই কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বধর্ম পালনের জন্য তিনি চির অমর এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ।। ১৩

ততঃ (তারপর) শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ (শঙ্খ ও ভেরীসকল) পণব-আনক-গোমুখাঃ

(পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (সহসা একসাথে বেজে উঠল) সঃ শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হয়ে উঠল)।

ভীষ্মের শঙ্খধ্বনির পর শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি যুদ্ধ-বাদ্যযন্ত্র সহসা একসাথে বেজে উঠল এবং সেই শব্দ তুমুল হয়ে উঠল।

ভীষ্ম প্রথমে শঙ্খধ্বনি করে জানিয়ে দিলেন, যুদ্ধ আসন্ন। তখন কৌরবসেনারা নানা বাদ্য বাজিয়ে জানাল যে তারাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে প্রস্তুত। কৌরবরা যুদ্ধের জন্য উদ্গ্রীব। ফলে এক তেজোদ্দীপক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি করল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।। ১৪

ততঃ (অনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজালেন)।

অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত এক মহারথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দিব্য শঙ্খধ্বনি করলেন।

কৌরবদের শঙ্খধ্বনির পর পাণ্ডবরা শঙ্খধ্বনি করলেন। রণবাদ্য বাজিয়ে কৌরবরা প্রথমে পাণ্ডবদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধ করেছিলেন। শ্বেত অশ্বযুক্ত (চারটি সাদা ঘোড়াযুক্ত) মহারথে ভগবান ও তাঁর শিষ্য ধর্মযুদ্ধের জন্য শঙ্খধ্বনি করলেন। তাঁদের দিব্য শঙ্খ। অর্জুনের রথের ধ্বজায় মহাবীর হনুমান বিরাজ করছেন। আসুরিক শক্তি ও অধর্মশক্তি বিনাশ করতে ভগবান আজ অর্জুনের সারথি হয়েছেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ।।১৫

হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ) ধনঞ্জয় (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীম-কর্মা (ভয়ঙ্কর কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজালেন)।

হৃষীকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ বাজালেন। অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। বৃকোদর অর্থাৎ সকলের ভীষণ ভয়ের কারণ ভীম তাঁর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন।

মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রই সবচেয়ে বৃহৎ এবং জটিল। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, অবতাররূপে অধর্মের নাশ ও ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য দেহধারণ করেছেন। তিনি অসাধারণ বেদ-বেদাঙ্গবিদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তপস্বী, বলবান এবং সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। তিনি ছিলেন

সুগৃহস্থ, রাজনীতিজ্ঞ, দণ্ডপ্রণেতা, যোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক, ধর্মসংস্থাপক এবং মহাযোগী। অর্জুনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এক গভীর সখাভাবে ভালবাসার সম্পর্ক। অর্জুন তাঁর সকল কাজে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ ও পরামর্শ মানতেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে সকল ক্ষত্রিয়বীরগণ অংশ নিয়েছেন। দুর্যোধন এবং অর্জুন দুজনই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য চাইতে যান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বর্য নারায়ণ-সেনা দ্বারা দুর্যোধনকে সাহায্য করেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে নির্লিপ্ত ও শস্ত্রহীন থেকে অর্জুনের সারথিরূপে সাহায্য করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনের সারথি হয়েছেন শুনে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলছেন—বাসুদেব সারথি, যোদ্ধা ধনঞ্জয়। কে এই দুর্ধর্ষ অর্জুনকে নিবারণ করবে?

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। দুই পক্ষই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত। শ্রীকৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য' ও অর্জুনের 'দেবদত্ত' শঙ্খের শব্দে সকল যোদ্ধাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন নামক এক ভয়ঙ্কর অসুরকে হত্যা করেন এবং তার অস্থি হতে এই 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ নির্মিত। পঞ্চজন ছিলেন অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। পঞ্চজন অসুর প্রভাস-সমুদ্রে শঙ্খরূপ ধারণ করে থাকতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপন ঋষির পুত্রকে একবার হরণ করেন। ঋষি শ্রীকৃষ্ণের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁর পুত্রকে ফেরত চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের ভিতর পঞ্চজন অসুরকে বিনাশ করে গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণের গদার নাম—কৌমোদকী। তাঁর রথ একখণ্ড মেঘের মতো। শ্বেতবর্ণ চার অশ্বের নাম—বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য এবং সুগ্রীব। রথের ধ্বজে গরুড় অবস্থিত এবং সারথি দারুক।

ভগবানের লীলা পূর্ণ হবার পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে দ্বারকায় যদুবংশের বীরগণ নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন। বলরামও যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকা থেকে দূরে প্রভাষতীর্থে এক নিভৃত অরণ্যে যোগ অবলম্বন করেছিলেন। তখন জরা নামে এক ব্যাধ হরিণ মনে করে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বাণ নিক্ষেপ করেন। ব্যাধ এসে দেখেন তিনি চতুর্বাহু পীতাম্বর এক মহাযোগীকে তীরবিদ্ধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত অপরাধী মনে করে শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে পতিত হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে যোগবলে শরীর ত্যাগ করেন। ভগবানের ইচ্ছাই তাঁর দেহত্যাগের কারণ। দেহধারণ ও দেহত্যাগ উভয়ই তাঁর লীলামাত্র।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ।। ১৬

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ) নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ) (দধ্মৌ) বাজালেন।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর অনন্তবিজয়-নামক শঙ্খ বাজালেন, নকুল সুঘোষ নামক

শঙ্খ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভাই পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। তাঁদের পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। কিন্দম মুনির অভিশাপে পাণ্ডুর কোনও সন্তান না হওয়ায় তাঁর দুই স্ত্রী কুন্তী এবং মাদ্রী দেবতাদের আশীর্বাদে পাঁচ পুত্র লাভ করেন। কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজের আশীর্বাদে যুধিষ্ঠির, বায়ুদেবের আশীর্বাদে ভীমসেন, দেবরাজ ইন্দ্রের আশীর্বাদে অর্জুন জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বিনীকুমার দুই দেবতার আশীর্বাদে মাদ্রী যমজ দুই পুত্র—নকুল এবং সহদেবকে লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির নরশ্রেষ্ঠ ধার্মিক, বীর, সত্যবাদী এবং মহারাজ ছিলেন। তাঁর ধৃতি, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, রাজ্যপরিচালনা প্রভৃতি সৎ গুণের জন্য তিনি জগতে শ্রেষ্ঠ। তাঁর বহু মহৎ গুণের মধ্যে একটি দোষ ছিল যে, তিনি অত্যধিক পাশাখেলায় আসক্ত ছিলেন। মানুষের শত গুণের মধ্যে একটি মাত্র দুর্বল প্রবৃত্তি দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। এক জনের অসৎ প্রবৃত্তিতে সংসার নষ্ট হয়। ফলে তিনি যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে পরম সুখে রাজ্যশাসন এবং রাজসূয়-যজ্ঞ করেন, তখন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য দেখে সেইসকল ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করবার জন্য দ্যূতক্রীড়া ষড়যন্ত্র করেন। কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির কপটাচারে তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় পরাজিত করেন। পাশাখেলার পণ অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যহারা হয়ে তেরো বৎসর বনবাসে কাটান। বনবাসের কাল পূর্ণ হলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ না করে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাইলেন। কিন্তু অসহায় ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তাতে সম্মত করাতে পারলেন না। দুর্যোধন পণ করেছেন বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচাগ্র ভূমিও ছেড়ে দেবেন না। অতএব কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে জয়লাভ করে যুধিষ্ঠির পুনরায় হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করেন। পরিশেষে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী একসঙ্গে সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গলোকে যাত্রা করেন। যুধিষ্ঠিত সর্বদা সত্য'কে ধরে ছিলেন। তবে ছলপূর্বক একটি অসত্য বলে দ্রোণাচার্যকে নিধন করায় যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শনও করতে হয়েছে।

ভীমসেন ছিলেন দ্বিতীয় পাণ্ডব। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রমশালী বীর। দেহের শক্তিতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। অধিক আহার করতেন বলে নাম ছিল 'বৃকোদর'। তাঁর দেহ সিংহের ন্যায় সুদৃঢ় এবং অযুত হস্তীর বল তিনি ধারণ করতেন। ভীমের শক্তি দেখে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজতেন। রণক্ষেত্রে 'পৌণ্ড্র' নামক শঙ্খের শব্দে তিনি শত্রুপক্ষের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করতেন। তিনি বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষালাভ করেন। অন্যপ্রকার যুদ্ধ অপেক্ষা তিনি গদাযুদ্ধেই বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধেই পরাস্ত করেন। ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ ছিলেন রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীর এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নানা মায়া অবলম্বনে সকল কৌরব বীরদের পরাজিত করেন। শেষে কর্ণের একবীরঘাতিনী বৈজয়ন্তী-শক্তি (অর্জুন-

বধের নিমিত্ত সযত্নে রক্ষিত) বাণের দ্বারা ঘটোৎকচ নিহত হন।

অর্জুন ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব। তিনি ছিলেন পরশুরামের ন্যায় তেজস্বী, বিষ্ণুর সমান পরাক্রমশালী, বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় যশস্বী। তিনি আচার্য কৃপ ও আচার্য দ্রোণের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণাচার্যের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন অর্জুন। অর্জুন অপূর্ব গুরুসেবা করে দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র বা ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভ করেন। অর্জুন অন্ধকারেও বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন। তা লক্ষ করে দ্রোণাচার্য একদিন বলেন: 'হে অর্জুন, তোমার জন্য এমন চেষ্টা আমার থাকবে, যাতে জগতে অন্য কোন ধনুর্ধরই তোমার মতো না হতে পারে। এ তোমাকে সত্য বললাম।'

সকল বীরের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের সমকক্ষ কেউ ছিল না। বহু রাজ্য তিনি জয় করে ধন ঐশ্বর্য আহরণ করতেন বলে তাঁর এক নাম ধনঞ্জয়। উভয় হাতে তিনি সমানভাবে গাণ্ডীব চালাতে সমর্থ ছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম সব্যসাচী। তিনি নিদ্রাকে জয় করেছিলেন তাই তাঁকে 'গুড়াকেশ' বলা হয়। নৃত্যগীতাদি গন্ধর্ববিদ্যায় তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। দ্রুপদরাজ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদ করে তাঁকে লাভ করেন কিন্তু মাতা কুন্তীর আদেশে তাঁরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গেও তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের দুজনের গর্ভে যথাক্রমে বভ্রুবাহন ও অভিমন্যু নামে দুই মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

এই সময় তিনি মহাদেবকে তপস্যা, পূজা ও প্রার্থনায় সন্তুষ্ট করেন। অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য মহাদেব কীরাত বেশে উপস্থিত হন। এক বরাহকে হত্যা নিয়ে তিনি অর্জুনের সঙ্গে তুমুল ধনুর্যুদ্ধে লিপ্ত হন। অর্জুন কিছুতেই কীরাতকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন তিনি মহাদেবের প্রার্থনা করে তাঁর গলায় একটি মালা পরালেন। আশ্চর্য হলেন যখন দেখলেন ঐ মালা কীরাতের গলায়। তখন তিনি কীরাতের চরণে শরণাগত হন এবং মহাদেবের দর্শন পান। মহাদেব তাঁর পূর্বজন্মের 'নর-ঋষি' রূপের কথা বলেন এবং 'পাশুপত' সহ নানা দিব্যাস্ত্র দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তিনি মহাবীর হনুমানেরও দর্শন ও কৃপা পান। মহাবীর কথা দেন তিনি অর্জুনের রথের ধ্বজায় উপস্থিত থেকে শত্রু নিধনে সাহায্য করবেন। তাই অর্জুনের রথে মহাবীর হনুমান-চিহ্নিত পতাকা ছিল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অগ্নিদেবকে খাণ্ডববন দাহ করতে সাহায্য করেছিলেন। এই সময় বরুণদেব তাঁকে চারটি শ্বেত-অশ্বযুক্ত দিব্যরথ ও গাণ্ডীব-নামক ধনু দান করেন। এই ধনু গণ্ডারের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা নির্মিত। এবং ময়দানব অর্জুনকে দেবদত্ত-নামক একটি দিব্য শঙ্খ উপহার দেন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্বন্ধ ছিল এবং তিনি ছিলেন কৃষ্ণগতপ্রাণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে পেয়েছিলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জুন এবং সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—এই দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ভগবদ্গীতামৃত পান করবার পক্ষে অর্জুন ছিলেন ভাগ্যবান পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাই অর্জুন সমগ্র পৃথিবী বিনাশ করতে সক্ষম।

উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হলে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—'হে মহাবাহো, শুদ্ধ হয়ে ভগবতী দুর্গাদেবীর স্তবপাঠ কর। দেবীর প্রসাদে যুদ্ধে জয়লাভ করবে।' অর্জুন রথ হতে নেমে জোড়হাতে ভক্তিভরে ভগবতীর স্তুতি করলেন। অন্তরীক্ষ হতে দেবী তাঁকে জয় লাভের বর দিয়ে কৃতার্থ করলেন।

অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্ম-সমেত সকল মহাবীরদের পরাস্ত করলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করে অর্জুনকে প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর অর্জুনও তাঁর সমস্ত শক্তি ও দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ ভুলে যান। ব্যাসদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সকলই এইভাবে প্রয়োজনকালে ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়, আবার ঈশ্বরেচ্ছাবশত প্রয়োজন শেষ হলেই এইগুলি লোপ পায়—তোমার মহাপ্রয়াণের সময় নিকটবর্তী। অর্জুন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর মনে করতেন—এই অহংকারে মহাপ্রস্থানের পথে তিনি ভূপতিত হন।

নকুল ছিলেন চতুর্থ পাণ্ডব। পৃথিবীতে নকুল ছিলেন সুপুরুষ। রূপে, বলে ও চরিত্রে তিনি অনুপম। তিনি শিশুপালের কন্যা, ধৃষ্টকেতুর ভগিনী করেণুমতীকে বিবাহ করেন। নকুলের শঙ্খের নাম 'সুঘোষ'। মহাপ্রস্থানের পথে তিনি দ্রৌপদী ও সহদেবের পতনের পরে (নকুল) পতিত হলে ভীম যুধিষ্ঠিরকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 'নকুল মনে করতেন, তাঁর ন্যায় রূপবান আর কেউ নেই। এই অহঙ্কারই তাঁর পতনের কারণ।'

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন সহদেব। নকুল ও সহদেব যমজ সন্তান। মাতা কুন্তী সহদেবকে বেশি ভালবাসতেন। শাস্ত্রবিদ্যায় তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তাঁর রণবাদ্য শঙ্খের নাম 'মণিপুষ্পক'। সহদেব রণক্ষেত্রে শকুনিকে বধ করেন। সহদেব জ্ঞানী ছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর সহদেব যুধিষ্ঠিরের শোক দেখে বলছেন—'হে রাজন, শুধু বাহ্য উপভোগ্য বস্তু ত্যাগ করলে সিদ্ধি লাভ হয় না, মনঃকল্পিত বস্তুর উপভোগ পরিত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে রাজ্যশাসন করলেই যথার্থ ধর্মাচরণ হবে। বস্তুত মমত্বাভিমানই সংসারে দুঃখের হেতু, আর মমত্ব পরিত্যাগই মুক্তিলাভের উপায়। বনে বাস করেও যদি বিষয়াশক্তি শিথিল না হয়, তবে সেই বনবাস একান্তই নিষ্ফল।' মহাপ্রস্থানের পথে সহদেবের পতন দেখে ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলে যুধিষ্ঠির বলছেন, 'সহদেব নিজেকে সকলের থেকে প্রাজ্ঞ মনে করতেন। সেই দোষেই সে ভূপতিত।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।।১৮

পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীপতি, রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র) পরম-ইষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ চ

(কাশীরাজ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ (দ্রুপদ রাজার দুই সন্তান, মহারথ শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন) বিরাটঃ চ (এবং রাজা বিরাট) অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (এবং অজেয় সাত্যকি) দ্রুপদঃ (রাজা দ্রুপদ) দ্রৌপদেয়াঃ চ (ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) মহাবাহুঃ চ (ও মহাবীর) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু) সর্বশঃ (সকলে) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (পৃথক পৃথক ভাবে শঙ্খসকল বাজালেন)।

হে রাজন্, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু—এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রথম থেকেই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, পাণ্ডবদের পরাজয় এবং দুর্যোধনের জয় নিশ্চিত। তাই সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে পাণ্ডব-পক্ষের কয়েকজন অজেয় মহাবীরদের নাম শুনিয়ে একটু সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পাণ্ডব-পক্ষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া রয়েছেন—মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী, আচার্য দ্রোণের মৃত্যুর কারণ দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যদুবংশের মহাবীর সত্যকের পুত্র সাত্যকি (প্রকৃত নাম যুযুধান), পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদ (অপর নাম যজ্ঞসেন এবং আচার্য দ্রোণের বাল্যকালের বন্ধু কিন্তু পরে শত্রুতে পরিণত হয়), দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র সুতসোম, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকর্মা, নকুলের পুত্র শতানীক, সহদেবের পুত্র শ্রুতসেন এবং সুভদ্রার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু—এঁরা সকলেই প্রায় অপরাজেয় মহাবীর। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের বুঝে নেওয়া উচিত দুর্যোধনের জয়লাভ অসম্ভব।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ।। ১৯

সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ঙ্কর) ঘোষ (শব্দ, শঙ্খধ্বনি) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনি পূর্ণ করে) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অর্থাৎ কৌরবদের) হৃদয়ানি (হৃদয় সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করল)।

সেই তুমুল শঙ্খের শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ও কৌরবপক্ষীয় সকলের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করে তুলল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের সকল বীর ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি করে আকাশ-বাতাস ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলল। এই তুমুল শব্দে কৌরবদের হৃদ্‌কম্প হতে লাগল। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাইছেন যে, যারা অসৎ পথে চলে তাদের এরকম হওয়া স্বাভাবিক। অসৎ পথের মানুষের পেছনে ভয় সর্বদা তাড়া করে। অপরদিকে পাণ্ডবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রচুর। কারণ তাঁরা জানেন সর্বদা তাঁরা সৎ পথ অনুসরণ করেছেন, ধর্ম তাঁদের সহায় এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে আছেন।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ।। ২০

মহীপতে (হে রাজন্) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডব (কপি-চিহ্নিত অর্থাৎ হনুমান-চিহ্নিত রথে আরূঢ় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধের জন্য উপস্থিত) দৃষ্ট্বা(দেখে) শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্র নিক্ষেপ করতে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হল) ধনুঃ উদ্যম (ধনু উত্তোলন করে) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (কৃষ্ণকে) ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (বললেন)।

হে রাজন্, তখন মহাবীর হনুমান ধ্বজরূপে অর্থাৎ রথে থেকে যাঁকে অনুগ্রহ করেছেন সেই কপিধ্বজ অর্জুন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের যুদ্ধে অবস্থিত দেখে শস্ত্র-নিক্ষেপে উদ্যত হয়ে ধনু উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন।

যুদ্ধের বিকল্প আর কিছুই রইল না। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর বুদ্ধিদাতা ও সারথি হলেন স্বয়ং হৃষীকেশ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক এবং সকলের মনের বৃত্তি বুঝতে পারেন। অর্জুন ইন্দ্রিয়গুলির মতো শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাধীন। এই যুদ্ধে হৃষীকেশ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বদা অর্জুনের পাশে। ঈশ্বর যাদের সহায় তারা তো জয়ী হবেই। পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। কৌরবরা কিন্তু তা মানতে প্রস্তুত নয়। অহংকার মানুষকে অন্ধ করে, মোহযুক্ত করে। মহাবীর হনুমান রামচন্দ্রকে রাবণবংশ ধ্বংস করতে সহায়তা করেছিলেন। সেই বীর হনুমান অর্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট থেকে তাঁকে শত্রু নিধনে সাহায্য করছেন। অর্জুনের প্রার্থনায় বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান কথা দেন যে, তিনি অর্জুনের রথের ধ্বজায় অবস্থান করবেন এবং যুদ্ধের সময় সেখান থেকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হুংকার করে কৌরবসেনা ধ্বংস করবেন।

অর্জুন উবাচ
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ।।২১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বললেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনাদলের মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন করুন)।

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন।

এরপর অর্জুন তাঁর রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তাঁর রথকে এমন জায়গায় নিয়ে রাখে, যাতে তিনি দুই পক্ষের শক্তি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। অর্জুন সিংহের মতো সম্মুখ সমরে দাঁড়াতে চান এবং দেখতে চান দুর্যোধনের সঙ্গে

যুক্ত মহাবীরগণ কোথায় ও কীভাবে যুদ্ধে অবস্থান করছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এ আদেশ নয়, এ প্রার্থনা। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে 'অচ্যুত' বলা হয়েছে। তিনি অচ্যুত কারণ তাঁর কোনও 'চ্যুতি' অর্থাৎ পরিবর্তন ঘটে না।

উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদের মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উপযুক্ত স্থানে রথ স্থাপন করলেন। যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে অর্জুন, যুদ্ধে জয় লাভের জন্য শুদ্ধ হয়ে ভগবতী দুর্গাদেবীর স্তবপাঠ করো। দেবীর প্রসাদে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করবে। অর্জুন রথ হতে নেমে জোড়হাতে ভক্তিভরে ভগবতীর স্তুতি করলেন। অন্তরীক্ষ হতে দেবী তাঁকে জয়লাভের বর দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই, দেবীদুর্গাকে প্রসন্ন করার জন্য অর্জুন স্তব করছেন—
'নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি!। কুমারি! কালি! কপালি! কৃষ্ণ পিঙ্গলে!।।
ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি! নমোঽস্তুতে। চণ্ডী! চণ্ডে! নমস্তভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি!।।
কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে!। শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে!।।'
ইত্যাদি।

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ।।২২

যাবৎ (যতক্ষণ) অহম্ (আমি) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) এতান্ (এই সকল) যোদ্ধুকামান্ (যুদ্ধকামী) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) অস্মিন্ (এই) রণ-সমুদ্যমে (যুদ্ধ ব্যাপারে) কৈঃ সহ (কাদের সাথে) ময়া (আমাকে), যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করতে হবে)।

এই যুদ্ধে কাদের সাথে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে সেইসব যুদ্ধকামনায় আগত যোদ্ধাদের যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি সেই স্থানে রথ স্থাপন কর।

উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে অর্জুন সিংহ-তাই কৌরবদের পক্ষে কোন কোন বীর আছেন তা দেখতে চেয়েছিলেন। তার কারণ যাঁদের বিরুদ্ধে অর্জুন যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই তাঁর পরমাত্মীয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আজ তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে-—এ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অর্জুন তাঁর প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রপ্রয়োগ করতে চান না। তাই তিনি তাঁর অতি নিকট গুরুজনদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বীরদেরও দেখে নিতে চান।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ।।২৩

দুর্বুদ্ধেঃ (দুষ্টবুদ্ধি) ধার্তরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের অর্থাৎ দুর্যোধনের) যুদ্ধে (যুদ্ধে) প্রিয়-চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী) যে এতে (যে সকল, যোদ্ধা রাজারা) অত্র (এখানে) সমাগতাঃ

(সমাগত) (তান—সেই) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধাভিলাষিগণকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (দেখি)।

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে-সকল যোদ্ধা বীরপুরুষ যুদ্ধ করবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেইসব যুদ্ধার্থীগণকে আমি দেখব।

অর্জুন জানতেন যে দুর্যোধনের পক্ষে অনেক বীরপুরুষ সমবেত হয়েছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছে তাঁর নিজ আত্মীয়, বন্ধু, গুরুজন—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি বীরগণ। অনেকে দুর্যোধনের হিংসা-লোভের প্রবৃত্তিকে একপ্রকার ইন্ধন জোগাচ্ছেন এবং ধর্মপ্রাণ পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁকে উৎসাহিত করছেন। অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি ঠিক করেছেন, তিনি প্রথম অস্ত্রপ্রয়োগ করবেন না। তাই তিনি ভাল করে দেখে নিতে চান কৌরবপক্ষের যোদ্ধাবীরগণ—কে কোথায় কীভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন শুধু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এই কথা বলছেন না। তিনি যুদ্ধের পূর্বে একদিকে যেমন মহাবীরদের অবস্থান ও তাঁদের সাজসজ্জা দেখে নিতে চান অন্যদিকে গুরুজন ও প্রিয়জনের প্রতি যথোচিৎ শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ।।২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ।।২৫

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বললেন)—ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র, ভরতের বংশধর) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র, নিদ্রা আলস্য জয়ী অর্জুন কর্তৃক) এবম্ (এইভাবে) উক্তঃ (অভিহিত হয়ে) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দ্রিয়গণের প্রভু অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাঁর বশে) সেনয়োঃ উভয়োঃ মধ্যে (দুই সেনাদল—কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে) স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ (তাঁর রথটি স্থাপন করলেন)।

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ (ভীষ্ম, দ্রোণ ও সকল রাজাদিগের সম্মুখে) পার্থ (অর্জুন) এতান্ সমবেতান্ (এই সকল সমবেত) কুরূন্ (কুরুগণকে) পশ্য (দেখ)—-ইতি (এই) উবাচ (বললেন)।

সঞ্জয় বললেন—হে ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), অর্জুন কর্তৃক এইরূপ আদেশ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে তাঁর অপূর্ব রথ স্থাপন করে বললেন—'হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।'

সঞ্জয়, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের প্রস্তুতির ক্রম জানাচ্ছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে 'হে ভারত' সম্বোধন করে সঞ্জয় মনে করে দিচ্ছেন যে, আপনি ভরত বংশে জাত ও মহারাজ। অতএব

আপনি এইরূপ জ্ঞাতিগণের প্রতি বিদ্বেষ দূর করুন। সঞ্জয় বলছেন, অর্জুন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, দুই পক্ষের মাঝখানে রথ নিয়ে যেতে। শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথকে স্থাপন করে অর্জুনকে বলছেন, 'হে পার্থ, সমবেত কৌরবদের তুমি ভাল করে দেখে নাও।' এখানে অর্জুন যে শুধু কৌরবদের সেনা ভাল করে দর্শন করতে চাইছেন তা নয়। অর্জুন যে-সকল গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তিনি তাঁর রথকে দুই সেনাদলের মধ্যে স্থাপন করলেন।

অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সখ্য ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। অর্জুন আদেশ করছেন এবং ভগবান আদেশ পালন করছেন। অনেক ভক্ত অর্জুনের এই কর্মকে যথাযথ মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা রাম-ভক্ত হনুমানের ভাবটি অনেক বেশি পছন্দ করেন। তাঁদের কাছে ভগবানের আদেশ ও ইচ্ছাই প্রথম ও শেষ কথা। তাই আমরা সারা ভারতে অজস্র রাম-ভক্ত হনুমানের মন্দির ও পূজা দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ রাম-ভক্ত হনুমান-চরিত্র জীবনে প্রকাশ করতে চায়। হনুমান-চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধার মন্দির এবং পূজা অজস্র দেখা যায় কিন্তু অর্জুনের মন্দির কম দেখা যায়।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ।। ২৬

তত্র পার্থঃ (সেখানে অর্জুন) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (উভয় সেনাদলের মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন্ (পিতৃব্যদের) পিতামহান্, আচার্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (ভীষ্ম—পিতামহগণ, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য—আচার্যগণ, পুরুজিৎ শল্যাদি—মাতুলগণ, ভীম-দুর্যোধনাদি—ভ্রাতৃগণ, অভিমন্যু—পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং অশ্বত্থামাদি—বন্ধুগণ) শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব (দ্রুপদ ইত্যাদি—শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি-মিত্রগণকে) অপশ্যৎ (দেখলেন)।

সেখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) অর্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে অবস্থিত পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও বন্ধুগণদের উপস্থিত দেখলেন।

সমগ্র যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে এইটিই ছিল সঙ্কট-সঙ্কুল মুহূর্ত। শুধু অর্জুন নয় অপর পক্ষে ভীষ্ম ও দ্রোণ এঁদেরও একই অবস্থা। নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁরাও উপস্থিত। সংসারের এই ভয়ঙ্কর চিত্র। সুখ-শান্তির সঙ্গে প্রচণ্ড দুঃখও রয়েছে। সংসারে দু-একজনের প্রবৃত্তির দোষে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং অপর সকলের ইচ্ছা না থাকলেও এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ।।২৭

সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্ (অবস্থিত যুদ্ধের জন্য) তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ (সেই সমস্ত বন্ধুজনকে) সমীক্ষ্য (দেখে) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপায় অভিভূত হয়ে) বিষীদন্ (বিষণ্ণ চিত্তে) ইদম্ অব্রবীৎ (এই কথা বললেন)।

কুন্তীপুত্র অর্জুন সেইসব বন্ধুবান্ধবদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অত্যন্ত পরম করুণায় অভিভূত হয়ে দুঃখিত ব্যথিত চিত্তে এই কথা বললেন।

অর্জুন চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সবাই তাঁর আত্মীয়-স্বজন। কাউকে শত্রু বলে ভাবতে পারলেন না। যেমন পাণ্ডব, তেমন কৌরব—উভয় পক্ষই তাঁর আত্মীয়-স্বজনে ভরা। এঁদের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে—এই ভেবে তিনি গভীর দুঃখে বিচলিত হলেন। অর্জুনকে এক অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ পরিস্থিতির সামনা-সামনি হতে হলো। সংসারে এইরূপ গৃহযুদ্ধের সময় মানুষ ঈর্ষা, হিংসা ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

অর্জুন ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে মহাদুঃখ প্রকাশ করছেন। অর্জুনের মহাদুঃখ অর্থাৎ বিষাদ প্রকাশ হচ্ছে। তাই এই অধ্যায়কে *বিষাদযোগ* বলা হয়। মানুষের অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই এই মহাশোক বা বিষাদ উপস্থিত হয়। এই বিষাদ আবার যোগ হয় কারণ—সেই বিষাদ থেকেই কর্মের ও ধর্মের বিচার শুরু হয়। তখন সেই অশুভ কর্ম বা প্রবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে হলে চাই সৎ উপদেশ। অহংকারের মোহে বিবেক আচ্ছন্ন থাকে বলেই সঠিক বিচার হয় না। তাই শাস্ত্র, গুরু বা আচার্যের উপদেশ তখন সঠিক পথ অর্থাৎ শুভ কর্ম বা প্রবৃত্তির সন্ধান দেয়। তাই এই অধ্যায়টি যোগ অর্থাৎ অর্জুন-বিষাদযোগ বলা হয়। ভগবান স্বয়ং অর্জুনের মহাবিষাদ দূর করবার জন্য উপদেশ করবেন সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে।

অর্জুন উবাচ
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ।। ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ।। ২৯

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন)—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) সমবস্থিতান্ (সমবেত) ইমান্ স্বজনান্ (এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধ-অভিলাষী) দৃষ্ট্বা (দেখে) মম গাত্রাণি সীদন্তি (আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে) মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি (মুখও শুষ্ক হচ্ছে) মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ জায়তে (শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হচ্ছে) হস্তাৎ (হাত হতে) গাণ্ডীবং স্রংসতে (খসে পড়ছে) ত্বক্ এব চ (এবং ত্বক্ অর্থাৎ গা যেন) পরিদহ্যতে (জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে)।

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধকামী স্বজনদের সামনে উপস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে, মুখও শুকিয়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে, হাত থেকে

গাণ্ডীব-ধনু খসে পড়ছে, সর্বাঙ্গে চর্ম যেন জ্বলছে।

অর্জুন এক অত্যন্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়েছেন। তাঁর মন আজ শোকে-দুঃখে খুবই ব্যথিত। তিনি যদিও ধর্ম ও সত্যকে রক্ষার জন্য অধর্ম ও অসত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছেন কিন্তু এই গৃহযুদ্ধে পরম আত্মীয়দের দেখে তাঁর মন যেন অনার্য-ভাব তমোগুণের প্রভাবে ক্ষাত্রধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম পালন করতে অসমর্থ হচ্ছেন। মন দুর্বল ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অর্জুনের মনে যে বিষাদ জন্মেছে তা এত গভীর যে তাঁর দেহের বাইরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। চিত্তে কোনও প্রবল ভাবের উদ্রেক হলে তা দেহের বাইরের অঙ্গগুলিতে কতকগুলি পরিবর্তন সচরাচর দৃষ্ট হয়। কপটব্যক্তি ছাড়া সরল ও শুদ্ধচিত্তের ব্যক্তিদের অর্থাৎ যাদের মন-মুখ এক, তাদের মনের ভাব বাইরে প্রকাশ পায়। সেইরূপ অর্জুনেরও হৃদয়ের গভীর শোকদুঃখ বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।। ৩০

(হে) কেশব (কেশব) (আমি) অবস্থাতুং চ (অবস্থান করতে বা স্থির থাকতে) ন শক্নোমি (পারছিনে) মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি ইব (মন যেন ঘুরছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি (বিপরীত, অশুভ লক্ষণ সকল) পশ্যামি (দেখছি)।

হে কেশব, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। আমার মনও যেন ঘুরছে, আমি নানা কুলক্ষণ- সকল দেখছি চারদিকে।

অর্জুনের শরীর ও মন দুইই যেন ভেঙে পড়েছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সামনে। চারদিকে কুলক্ষণ- সকল দেখছেন। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় মাথাও যেন ঘুরছে। তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। একদিকে আত্মীয়-গুরুজনদের প্রীতি ভালবাসা এবং অন্যদিকে পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য দ্রোণ এঁদের মতো মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। সব মিলিয়ে অর্জুনের মনে এক গভীর মোহ আবিষ্ট হয়েছে। তাই তাঁর এমন অবস্থা। তাঁর মোহযুক্ত বিবেক তখন তাঁকে এক সত্ত্বগুণের অর্থাৎ অহিংসার পথে চালনা করতে চাইছে। মোহযুক্ত বুদ্ধি তাঁর ক্ষত্রিয় স্বধর্ম—যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে অহিংসার পথে চালনা করছে। অর্জুন তাঁর নিজের মোহযুক্ত বিবেকের দেখানো সেই পথকে মনে করছেন শ্রেষ্ঠ পথ। এ এক প্রকার দুর্বল ব্যক্তির অহিংসাধর্ম পালন।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।। ৩১

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (স্বজনকে বধ করে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখছি না) চ (এবং) ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং (আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধজয়ে নয়) ন চ রাজ্যং (এবং রাজ্যলাভে নয়) সুখানি চ (এবং সুখভোগে নয়)।

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করে আমি কোনও মঙ্গল দেখছি না। আমার যুদ্ধজয়ের আকাঙ্ক্ষা নেই, রাজ্যও চাই না এবং সুখভোগও চাই না।

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, নিকট আত্মীয় ও গুরুজনদের হত্যা করে জয়লাভের কীর্তি তিনি অর্জন করতে চান না এবং কোনও সুখভোগও চান না। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে অর্জুন রজোগুণে অহংভাবে অর্থাৎ সকামভাবে এই যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। তাই এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করবেন যেন এটা নিশ্চিত ছিল। যেন সেই জয়লাভের কীর্তি, রাজ্য ও সুখভোগ তিনি লাভ করবেন এটা ধরেই নিয়েছিলেন। তাঁর কর্মে পূর্বনির্ধারিত এই হেতু বা সকামভাব ছিল বলেই অর্জুনের মনে এই বিষাদ এসেছে। অনাসক্তভাব থাকলে এই মহাদুঃখ আসত না। তাই আমরা পরে দেখতে পাব ভগবান তাঁকে নিষ্কাম কর্ম যোগে আসক্তিশূন্য হওয়ার কৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন। সত্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে লক্ষ করেই কর্ম। কর্মে হেতু বা ফলের আশা থাকা অর্থাৎ দুঃখ, শোক অনিবার্য।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।।৩৩

গোবিন্দ (হে কৃষ্ণ) নঃ (আমাদের) রাজ্যেন (রাজ্যে) কিং (কী প্রয়োজন) ভোগৈঃ (বিষয়ভোগে) জীবিতেন বা (জীবনে বা) কিং (কী ফল) যেষাম্ (যাঁদের) অর্থে (জন্য) নঃ (আমাদের) রাজ্যং (রাজ্য) ভোগাঃ (ভোগসমূহ) সুখানি চ (ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (অভিলষিত) তে ইমে (সেই সকল) আচার্যাঃ (আচার্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যগণ) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) তথা চ (এবং) পিতামহাঃ এব (পিতামহগণও) মাতুলাঃ (মাতুলগণ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুরগণ) পৌত্রাঃ (পৌত্রগণ) শ্যালাঃ (শ্যালকগণ) তথা (এবং) সম্বন্ধিনঃ (বন্ধুগণ অর্থাৎ কুটুম্বগণ বা জ্ঞাতিগণ) প্রাণান্ (প্রাণের আশা) ধনানি চ (এবং ধনসম্পত্তির আশা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) যুদ্ধে (যুদ্ধক্ষেত্রে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত হয়েছেন)।

হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কী প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবনধারণেই বা কী প্রয়োজন? কারণ, যাঁদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখাদি আমাদের অভিলষিত (কামনা করি), সেই আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ, ও স্বজনবৃন্দ সকলে নিজ নিজ প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। অর্জুন যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণাগতি প্রার্থনা করছেন।

ভগবান শ্রীহরি পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন বলে দেবতাগণ তাঁকে গোবিন্দ নামে স্তব করেন। আবার যিনি 'গো' ইন্দ্রিয় সকল 'বিন্দতি' পালন করেন, তিনি গোবিন্দ। মানব, দেবগণ ও মুনিগণ সকলে তাঁকে গোবিন্দ বলে স্তব করেন।

যুদ্ধ এমন একটি বিষয় যা মানুষকে উদ্দীপিত করে। যুদ্ধে সমগ্র পরিবার উপস্থিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে মোট আঠারো অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ করেছিল—কুরু ও পাণ্ডবপক্ষে যথাক্রমে এগারো ও সাত অক্ষৌহিণী। একটা দেশের মধ্যে এমন ভীষণ যুদ্ধ পূর্বে আর হয়নি, অবশ্য আধুনিক বিশ্বযুদ্ধের কথা ধরছি না। যুদ্ধের লক্ষ্যই তো প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা। অর্জুন বড় যোদ্ধা, শৌর্যে, বীর্যে উদ্যমে ভরপুর হয়ে এসেছেন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে পেয়েছেন। তাই অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ বলে সম্বোধন করছেন। তবুও অর্জুন বিষাদগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত হয়েছেন।

যতক্ষণ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন থাকে ততক্ষণ ভোগ-সুখ কামনাগুলিও থাকে। পরিবারদের নিয়েই ভোগ-সুখ। তাই অর্জুনের যুক্তি হচ্ছে, এই যে ভোগ-সুখ যুদ্ধে চেয়েছিলাম, কিন্তু কাদের জন্য চেয়েছিলাম? যাঁদের নিয়ে এই ভোগ-সুখ তাঁরাই যখন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে তবে আমি কাকে বধ করব এবং আর কাদের নিয়েই বা রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ ভোগ করব? অর্জুনের লক্ষ্যই ছিল যুদ্ধ জয় অর্থাৎ হস্তিনাপুর লাভ করে ভোগ-সুখ লাভ। কিন্তু ভগবান অর্জুনের লক্ষ্যের মোড় ফিরিয়ে দিতে চান—আত্মাকে জানা অর্থাৎ সত্যকে জানাই জীবনের লক্ষ্য।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।।৩৪

মধুসূদন (হে মধুসূদন) ঘ্নতঃ অপি (আমাকে হত্যা করলেও) ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই তিন লোকের) হেতোঃ অপি (হেতুও) এতান্ (এঁদের) হন্তুং (হত্যা করতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) মহীকৃতে (কেবল মাত্র পৃথিবীর জন্য) কিং নু (কী কথা)?

হে মধুসূদন (মধু নামক অসুরকে হত্যা করেছিলেন), এঁরা সবাই আমার অতি প্রিয়জন। আমাদের এঁরা বধ করলেও ত্রৈলোক্যরাজের জন্যেও এঁদের হত্যা করতে আমি ইচ্ছা করি না, শুধু পৃথিবীমাত্র রাজ্যের জন্য কী কথা?

অর্জুনের যুক্তি—কৌরবরা যতই অন্যায় করুক, দুর্যোধন তাঁদের ভাই। তাঁকে কোনও অবস্থাতেই পাণ্ডবরা আঘাত করতে পারেন না। এইভাবে অর্জুনের মন দুর্বল তমোভাবে আচ্ছাদিত। সেই অবস্থা থেকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে দেখাতে চান, তিনি যেন সত্ত্বগুণের আচরণ করতে চাইছেন। ফলে এই তামসিক পরিস্থিতির মধ্যে এক মোহাচ্ছন্ন আবেগে আবিষ্ট হয়ে অর্জুন মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি সরে যাবেন। অর্জুনের

চিন্তা—সংসারে কিছু লাভ হলে তা এঁদের সঙ্গে নিয়ে ভোগ করা উচিত। তাতে সকলেই সুখী হবে। এঁদের হত্যা করলে কাদের নিয়ে এই সুখ ভোগ করবেন? অর্জুন আত্মীয়-স্বজনের অনুরাগে ব্যাকুল, তাঁর যুক্তি—একা কেউ রাজ্যভোগ করতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই রাজ্যভোগ করে থাকে। তাঁরাই যখন যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তখন আর রাজ্য লাভের কী প্রয়োজন?

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।।৩৫

জনার্দন (হে জনার্দন, শ্রীকৃষ্ণ) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) নিহত্য (হত্যা করে) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কী সুখ হবে ?) এতান্ (এই সব) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে) হত্বা (বধ করে) অস্মান্ (আমাদের) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করবে অর্থাৎ পাপ হবে)।

হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করলে আমাদের কী সুখ হবে? যদিও এরা আততায়ী তবু এদের হত্যা করলেই অবশ্যই আমাদের পাপ আশ্রয় করবে।

আততায়ী বলতে বোঝায় 'অগ্নিদো গরদশ্চৈব পাণির্ধনাপহঃ, ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ' (বশিষ্ঠ-সংহিতা) অর্থাৎ অগ্নিদ—যে ঘরে আগুন দেয়, গরদ—খাদ্যে যে বিষ দেয়, বধের জন্য অস্ত্রধারী, ধন-অপহারী, ভূমি-অপহারী, স্ত্রীহরণকারী—এই ছয় জন আততায়ী। মনু বলছেন, আততায়ীকে নিকটে আসতে দেখলে কোনও বিচার না করে তাকে হত্যা করবে। দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গিগণ প্রায় এ সমস্ত কর্ম—জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা, ধন, গো ও রাজ্য হরণ, দ্রৌপদীর অপমান ইত্যাদি পাপ করেছেন--তাই তাঁরা আততায়ী। তথাপি অর্জুন বলছেন তাঁদের বধ করলে পাপ হবে।

মনু বা নীতিশাস্ত্রমতে আততায়ী বধে কোন পাপ নাই। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রমতে ক্ষমাই ধর্ম। 'ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি'—সর্বভূতের হিংসা করবে না। অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুজনাদি অবধ্য—সেইজন্য অর্জুন কৌরবদের ক্ষমা করতে চান। নীতিশাস্ত্রের চেয়ে ধর্মশাস্ত্র বলবৎ। সুতরাং আততায়ী হলেও গুরুজনদের বধ করলে পাপের ভাগী হতে হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চান।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ।।৩৬

তস্মাৎ (সেই হেতু) সবান্ধবান্ (সবান্ধব) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের) বয়ং (আমরা) হন্তুং ন অর্হাঃ(হত্যা করতে পারি না) হি (যেহেতু) মাধব (হে মাধব, শ্রীকৃষ্ণ) স্বজনং (স্বজনকে) হত্বা (হত্যা করে) কথং সুখিনঃ স্যাম (কীভাবে সুখী হব আমরা)?

সেজন্য আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের হত্যা করতে পারি না। হে মাধব, স্বজনদের হত্যা করে আমরা কীভাবে সুখী হব?

অতএব হে মাধব, স্বীয় বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। অর্জুন এখানে দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গীদের বান্ধব বলছেন। যেহেতু কৌরবরা পাণ্ডবদের স্বজন। কিন্তু স্বজন হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পাণ্ডবদের কখনই বান্ধব ছিলেন না বরং তাঁরা সর্বদাই হিংসা করেছেন, তাঁরা আততায়ী। অর্জুন তাঁদেরকে স্বজন বলে সম্বোধন করছেন— আমার বন্ধু, আমার পরিবার, আমার রাজ্য মনে করছেন যেহেতু পাণ্ডবরা ধর্মের পথে আছেন। কিন্তু দুর্যোধনরা অধর্মের পথে, তাঁরা সর্বদা অধর্ম আচরণ করেন এবং শত্রুভাবে পাণ্ডবদের দেখেন।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ।।৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ।।৩৮

যদ্যপি (যদিও) এতে (এঁরা, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) লোভ-উপহত-চেতসঃ (লোভের দ্বারা অভিভূতচিত্ত হয়ে) কুল-ক্ষয়-কৃতং (বংশনাশ জনিত) দোষং (দোষ) চ (এবং) মিত্র দ্রোহে (মিত্রের প্রতি শত্রুতায়) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখছে না) (তথাপি) জনার্দন (হে কৃষ্ণ) কুল-ক্ষয়-কৃতং দোষং (বংশনাশজনিত দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (দর্শনকারী) অস্মাভি (আমাদের দ্বারা) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ থেকে) নিবর্তিতুং (নিবৃত্ত হতে) কথং (কেন) ন জ্ঞেয়ম্ (জানব না)।

যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ রাজ্যলোভে প্রমত্ত বা অভিভূত হয়ে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহরূপ পাতক সম্বন্ধে উদাসীন, তথাপি হে জনার্দন, আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষের বিষয় জেনেও সে পাপ হতে কেন নিবৃত্ত হব না?

অর্জুন স্বজন-হননে অনিচ্ছুক। অর্জুনের ধারণা, ভীষ্মের মতো মানুষ কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করছেন, তিনি হয়তো লোভের চাপে যুদ্ধ করছেন। ভীষ্মের জীবন সবদিক থেকে অনুকরণীয় কিন্তু এদিক থেকে নয়—ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সত্যবতীর পিতার কাছে যে, তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনকে রক্ষা করবেন। সেই প্রতিজ্ঞাহেতু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে বসলেও তিনি তাঁকে রক্ষা করছেন এবং তিনি দুর্যোধন তথা অধর্মের পক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। ঐ প্রতিজ্ঞাই ভীষ্মকে সারা জীবন হস্তিনাপুরের সঙ্গে আবদ্ধ রেখেছিল। তাই তাঁকে অধর্মের পক্ষে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

ভীষ্ম ক্ষত্রিয়। স্বধর্ম পালন করতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। অর্জুনও ক্ষত্রিয়। কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম ভুলে গিয়ে সাময়িকভাবে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেজন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। অপরদিকে ভীষ্মের আচরণ বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

তিনি যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন নিষ্কামভাবে। ক্ষত্রিয় বলে তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য। আবার যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কীভাবে তাঁর নিজের পরাজয় ঘটবে তাও তাঁকে বলে দিচ্ছেন। যুদ্ধ করছেন শুধু স্বধর্ম পালনের জন্য। তাঁর আচরণের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিচার বিদ্যমান, অর্জুন তা তখনও ধারণা করতে পারেননি।

যুদ্ধ করতে অর্জুনের দ্বিধার কারণ কুলক্ষয়। কুলক্ষয় মহাপাপ। নিজের এবং নিজের প্রিয়জন উভয়ের ধ্বংস—এ মহাপাপের ক্ষমা নেই। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অর্জুন যেন বোঝাতে চাইছেন যে, ভগবান ঠিক ঠিক পাপ-পুণ্য বুঝতে পারছেন না—তাই অর্জুন ভগবানকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অর্জুন বলছেন, ওরা না বুঝুক, কিন্তু আমরা তো বুদ্ধিমান, কুলনাশজনিত দোষের বিষয়ে আমাদের অবশ্যই বিচার করা উচিত। অর্জুন নিজেকে অধিক বুদ্ধিমান জ্ঞানী মনে করছেন—অথচ তাঁর বুদ্ধি এখন মোহযুক্ত তাই কুলনাশে কী কী দোষ হয় সেকথাই বলছেন।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ।। ৩৯

কুলক্ষয়ে (বংশনাশে)সনাতনাঃ (চিরাচরিত, সনাতন) কুলধর্মাঃ (কুলোচিত ধর্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) উত (এবং) ধর্মে নষ্টে (কুলধর্ম নষ্ট হলে) অধর্মঃ (অধর্ম, অনাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ (কুলকে, বংশকে) অভিভবতি (অভিভূত করে)।

কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। এবং কুলধর্ম নষ্ট হলে সমগ্র কুল অনাচাররূপ অধর্মে অভিভূত হয়।

সনাতন কুলধর্ম—অর্থাৎ বংশানুক্রমিক চিরন্তন পরম্পরাপ্রাপ্ত (অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়া-সাধ্য কর্ম) বংশের ধর্মানুশীলনকারী প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যু হলে কুলাগত আচার-অনুষ্ঠানাদির ক্রম রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বংশের অবশিষ্ট আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমাজে অধর্ম বৃদ্ধি করে। তাছাড়া কুলক্ষয় হলে ধর্মেরও ক্ষয় হয়। যাঁরা প্রধান, তাঁরাই ধর্মকে রক্ষা করেন এবং অপরকে ধর্মশিক্ষা দেন। প্রবীণরাই কুলকে রক্ষা করেন। তাই তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুলধর্মও নষ্ট হয়।

অর্জুনের যুক্তি—এই যুদ্ধের ফলে সমাজের অবক্ষয় হবে, পরিবার ভেঙে যাবে—যার ফলে কত নারী বিধবা হবে, কত শিশু অনাথ হবে। এই কৌরবরা যুদ্ধজনিত এই সব ফলের কথা জেনেও জানে না, কারণ তাঁরা বিবেকহীন কিন্তু আমরা তো জানি। অতএব আমরা যখন এই অন্যায় বুঝতে পারছি তবে কেন আর ঐ বিষয়ে অগ্রসর হব?

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ।।৪০

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) অধর্ম অভিভবাৎ (অধর্মের প্রভাবে অর্থাৎ অধর্মে লিপ্ত হলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (দুষ্টা হয়) স্ত্রীষু (স্ত্রীলোকগণ) দুষ্টাসু (দুষ্টা হলে) বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশজ কৃষ্ণ) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে (বর্ণের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়)।

হে কৃষ্ণ, কুল অধর্মে অভিভূত হলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

বর্ণসঙ্কর—বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন সন্তান। মনুসংহিতানুসারে বর্ণের ব্যভিচার, অবেদ্যা-বেদন অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহ ও স্বকর্মত্যাগ—এই তিন কারণে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। (ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা-বেদনেন চ। স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। মনু-১০-২৪)

মূলত অর্জুন বলতে চাইছেন, যুদ্ধের ফলে সমাজে নানা অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ধর্মের কাঠামো ভেঙে যাবে। যার যেমন খুশি চলবে। তাই এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেকে অর্জুন সরে যেতে বলছেন। অর্জুনের যুক্তি—প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক সমাজ--ধর্মসম্বন্ধে সবার সচেতন থাকা দরকার। কোনও অবস্থাতেই যা সত্য ও ন্যায়—তার থেকে যেন বিচ্যুত না হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদের) কুলস্য চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের জন্যই হয়) হি (যেহেতু) এষাং (এদের) লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণ-বিরহিত) পিতরঃ (পিতৃপিতামহগণ) পতন্তি (পতিত হন অর্থাৎ নরকগামী হন)।

বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ কুলের সংমিশ্রণ হলে কুলনাশকারীগণ নরকগামী হন। শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাঁদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হন।

সমাজে বর্ণসঙ্কর নিষিদ্ধ। ('আনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম সব বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।।—নারদসংহিতা-১২-১০২) 'নারদসংহিতা' মতে অনুলোমক্রমে বিবাহ—উত্তম বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরুষ অধম বর্ণের অর্থাৎ অব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ—উত্তম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা অধম বর্ণের অর্থাৎ অব্রাহ্মণ পুরুষকে বিবাহ করলে—এরূপ বিবাহ বর্ণসঙ্কর। এই বিবাহের ফলে যেসব পুত্রাদি হবে, তাদের পিতৃশ্রাদ্ধে ও পিণ্ডদানের অধিকার থাকে না। 'স্মৃতিশাস্ত্র' মতে প্রেতের উদ্দেশে জলদানকে উদকক্রিয়া বলে। প্রেত-পিণ্ডদানের পর জীব কর্মানুযায়ী সূক্ষ্ম ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী তার স্থুলশরীর গঠিত হয়। অতএব বংশ না থাকলে লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া হওয়ায় উর্দ্ধগতি হয় না, পরন্তু অধঃগতি হয়। মৃত পিতৃপুরুষ ও অন্যান্যদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমরা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির দ্বারা তাঁদের

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। অর্জুন বলছেন, যদি এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় তাতে সমাজব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে, ফলে সমাজের নানা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হবে না এবং এক দুর্নীতির সমাজ সৃষ্টি হবে।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২

কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদের) এতৈঃ (এই সব) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্মাঃ (জাতিধর্ম) কুলধর্মাঃ চ (এবং কুলধর্মাদিও), উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হয়ে যায়)।

এই সব কুলনাশকারীদের বর্ণসাঙ্কর্যদোষের জন্য সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম এবং আশ্রমধর্মাদিও উৎসন্ন হয়।

জাতিধর্ম—যথা ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ও রক্ষাদি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি, শূদ্রের পরিচর্যাদি কর্ম। কুলধর্ম—কৌলিক উপাসনাপদ্ধতি ও আচার-নিষ্ঠাদি। আশ্রমধর্ম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রমের আচরণযোগ্য বিহিত ধর্মকার্য।

এখানে অর্জুন মনে করছেন মানুষের জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম নষ্ট হলে শাশ্বত সনাতন ধর্ম নষ্ট হয় এবং সেই ব্যক্তির নরক গমন অনন্তকাল। অর্জুন কেবল এই কুলধর্মকেই শাশ্বত সনাতন ধর্ম মনে করছেন। কিন্তু সনাতন ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে পরম সত্যের উপর। সেই সত্যই—সৎ-চিদ্-আনন্দ স্বরূপ, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। সনাতন ধর্মের লক্ষ্য সেই পরম সত্যকে জানা। 'ন হি সত্যাৎ পর ধর্মঃ'—সত্যের চেয়ে আর কোনও বড় ধর্ম নেই।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।।৪৩

জনার্দন (হে জনার্দন) উৎসন্ন-কুল-ধর্মাণাং (যাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হয়েছে) মনুষ্যাণাং (সেই মনুষ্যদের) নিয়তং (চিরদিন বা দীর্ঘদিন) নরকে বাসঃ (নরকে অবস্থিতি) ভবতি (হয়ে থাকে) ইতি (একথা) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনেছি)।

হে জনার্দন, যাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হয়েছে, তাদের নিয়ত নরকে বাস হয়, একথা আমরা (শাস্ত্র ও আচার্যমুখে) শুনেছি।

অর্জুন বলছেন, তিনি শুনেছেন যে, যাঁদের কুলধর্ম নষ্ট হয়, তাঁদের অনন্তকাল পর্যন্ত নরকে বাস করতে হয়। শ্রীরঘুনন্দনকৃত 'শ্রাদ্ধতত্ত্বাদি' গ্রন্থে পাওয়া যায়—মানুষ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 'আতিবাহিক' নামক দেহলাভ করে, পরে পিণ্ডদানাদির ফলে ঐ দেহের পরিবর্তে ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধাদির পরে ঐ ভোগদেহ পরিত্যাগ

করে জীবাত্মা কর্মানুরূপ স্বর্গ বা নরকে যায়। কিন্তু পিণ্ডাদি দান না হলে প্রেতাত্মার নরকভোগের আর শেষ হয় না।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ।।৪৪

অহোবত! (হায় কি কষ্ট) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং কর্তুং (মহা পাপ করতে) ব্যবসিতাঃ (প্রবৃত্ত বা বদ্ধপরিকর) যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখ-লোভে) স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ (স্বজনগণকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছি)।

হায় ! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়েছি।

অর্জুন দুঃখ প্রকাশ করে বলছেন কী মহাপাপ করতে তাঁরা চলেছেন। অর্থাৎ রাজ্য ভোগ করার লোভে তাঁরা আত্মীয়দের হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছেন। লোভই মহাপাপ। সেই মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন দেখে অর্জুন অনুশোচনা করছেন। সেইসঙ্গে অর্জুন সখা কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন যে, তাঁরা উভয়েই সেই মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই যুদ্ধ কখনই পরমকল্যাণ আনতে পারে না, পরন্তু এই যুদ্ধই তাঁদেরকে নরকে নিয়ে যাবে।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ।।৪৫

যদি অপ্রতীকারম্ (যদি প্রতিকারে বিরত অর্থাৎ নিজের প্রাণরক্ষায় চেষ্টাশূন্য) অশস্ত্রম্ (শস্ত্রহীন) মাম্ (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা) রণে হন্যুঃ (যুদ্ধে বধ করে) তৎ (তাও) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অত্যন্ত কল্যাণকর) ভবেৎ (হবে)।

আমি শস্ত্রত্যাগ করে নিজপ্রাণরক্ষায় চেষ্টাশূন্য হলে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করে, তাও আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে।

অর্জুন এত মর্মাহত যে, তিনি মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মরক্ষার প্রতিকারে বিরত থাকবেন এবং সেইসময় যদি কৌরবরা তাঁকে হত্যা করেন, সেই মৃত্যুকে তিনি স্বাগত জানাবেন।

অর্জুন তাঁর অন্তিম সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন। অর্জুন চান সম্পূর্ণ নির্বাধ অহিংসা পদ্ধতি অবলম্বন করতে। সত্যই এটি একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতি। যুদ্ধারম্ভ আসন্ন, অর্জুন এর জন্য আগেই প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি যুদ্ধ চেয়েছিলেন, অথচ এই সঙ্কট মুহূর্তে দুঃখে, অবসাদে অভিভূত হয়ে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এই চরম সিদ্ধান্ত নেবার পর অর্জুন কী করলেন সেই দৃশ্য সঞ্জয় তুলে ধরেছেন।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ।।৪৬

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বললেন)—অর্জুনঃ (অর্জুন) এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলে) সংখ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) সশরং (শরসহিত) চাপং (ধনু) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করে) শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ (শোকাকুল চিত্তে) রথ-উপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবেশন করলেন)।

সঞ্জয় বললেন—শোকাভিভূত অর্জুন এইরূপ কথা বলে, যুদ্ধে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বিষণ্ণচিত্তে রথের উপর বসে পড়লেন।

অর্জুনের অবস্থা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে 'শোকার্ত' বলে বর্ণনা করে শোনালেন। অর্জুন শোকার্ত, বিচলিত হয়েছেন—এই ভেবে যে, কী এক সর্বনাশ ঘটতে যাচ্ছে। তাঁর শোক তমোগুণের শোক।

যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে। 'আমি যুদ্ধ করব না' বলে অর্জুন দয়া, করুণা ও অহিংসা সম্পর্কে বেশ ভাল ভাল যুক্তি দিয়েছেন। অহিংসা পরম ধর্ম—অর্জুন সেই যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু অহিংসা বলবান, সাহসীর ধর্ম, ইতিবাচক ধর্ম। তমোগুণ আশ্রয় করে দুর্বলের মুখে অহিংসা ইত্যাদি সত্ত্বগুণের প্রশংসা করা শোভা পায় না। অসৎ ও আততায়ীদের সামনে অহিংসা ধর্ম দেখিয়ে পালিয়ে গেলে সমাজে অসৎ ও আততায়ীরা শাসন করবে। অতএব এই অবস্থায় অর্জুনের মন মোহগ্রস্ত, ঘূর্ণায়মান, স্নায়বিক বিপর্যয়, শরীর কম্পমান—এই তমোযুক্ত মনে অহিংসার কথা সদ্গুণ নয়। তাই ভগবান বলবেন—যোদ্ধা, সাহসী, বুদ্ধিমান, নির্ভীক অর্জুন এই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরু কাপুরুষের মতো আচরণ করছেন। যা তার উচিত নয় ও তাকে শোভা পায় না। এইভাবে প্রথম অধ্যায়ের ইতি হলো।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **অর্জুনবিষাদযোগ** নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

এই অধ্যায়ের মূল তত্ত্বই হল আত্মজ্ঞান। আত্মা সৎস্বরূপ, চিদ্‌স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, অজ, নিত্য, অবিনাশী ও শাশ্বত। কিন্তু জীবের দেহ—স্থূল ও সূক্ষ্ম অনিত্য বস্তু। অবিদ্যাবশত জীব এই স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি করে। 'সাংখ্যযোগ' অধ্যায়ের 'সাংখ্য' অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। 'জ্ঞানযোগ'-এর মূল বিষয় সম্যকরূপে প্রকাশিত আত্মতত্ত্ব। বেদান্ত বা উপনিষদ এবং সাংখ্য উভয়ের বিষয় আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব বেদান্তদর্শন অর্থাৎ প্রস্থানত্রয়—উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব।

একমাত্র আত্মজ্ঞান জীবের দুঃখ, অবিদ্যা ও মোহ নাশ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনের মোহ দূর করা এবং সঠিক দিশা দেখানোর জন্য স্বয়ং যুদ্ধে সারথি হয়েছেন। অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য ভগবানের এই দীর্ঘ গীতার উক্তি। ভগবান 'ভবরোগবৈদ্য'। ভগবানের অধীন মায়া। অর্জুনের মন অবিদ্যা মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। অর্জুন এখানে ঈশ্বরবুদ্ধিতে ঈশ্বরের শরণাগত না হয়ে, তিনি অহংবুদ্ধিতে নিজেকে কর্তা মনে করে, কর্ম করতে চাইছেন, তাই তাঁর মনে দুর্বলতা ও বিষাদ। অর্জুনের মতো মোহ বা বিষাদ প্রত্যেক মানুষের জীবনে আসে। তাই অর্জুনকে উপলক্ষ করে তিনি আমাদের সমগ্র মানবজাতির মনের দুর্বলতা ও মোহ দূর করবার জন্য গীতার বাণী বলছেন। ভগবানের কৃপাতেই মানুষের মনের মোহ দূর হওয়া সম্ভব।

প্রাচীনকাল থেকে আত্মজ্ঞান বা মোক্ষ লাভের দুই পথ—জ্ঞানমার্গ এবং কর্মমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ এবং প্রবৃত্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গের একজন বিশিষ্ট প্রাচীন মহর্ষি কপিলদেব পুরুষপ্রকৃতি-বিবেক বা সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব— প্রকৃতি ও চৈতন্যকে জানা এবং দুঃখ থেকে নিস্তার। অপরদিকে বেদান্তও সেই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের কথা বলে। এখানে গীতায় সাংখ্য শব্দের অর্থ 'পরমার্থবস্তুবিবেক-বিষয়' বা আত্মজ্ঞান।

এই অধ্যায়ে সেই আত্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ষড়দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্যদর্শন-এর ব্যাখ্যা নয়।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭২টি মন্ত্র আছে। সঞ্জয় তিনটি শ্লোক বলছেন। অর্জুন ছয়টি শ্লোক বলছেন এবং বাকি ৬৩টি শ্লোকে কয়েকটি পর্যায়ে ভগবান মানবজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করছেন, যেটি তাঁর প্রধান শিক্ষা। (১) আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সাংখ্য প্রকরণ (২) স্বধর্ম প্রকরণ (৩) যোগ প্রকরণ (৪) স্থিতপ্রজ্ঞ প্রকরণ।

এই অধ্যায়ে ভগবান মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্যটি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন। মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, 'ঈশ্বরলাভ'। অর্জুন ও সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে স্মিতহাস্য-সহকারে কঠোর শাসন ও তীব্র কটাক্ষ করে ভগবান শুরু করছেন তাঁর অপূর্ব গীতার বাণী— ১) 'অনার্যজুষ্টম্-অস্বর্গম্-অকীর্তিকরম্-অর্জুন'—অনার্যজনোচিত, স্বর্গহানিকর ও অকীর্তিকর মোহ কোথা থেকে তোমার মনে উপস্থিত হয়েছে? ২) 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে'— ক্লীবের ন্যায় কাতরতা, কাপুরুষতা আশ্রয় করো না, এটি তোমাতে শোভা পায় না। ৩) 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'-যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তুমি তাদের জন্য শোক করছ, এদিকে আবার জ্ঞানীর মতো কথা বলছ। তাই ভগবান শুরুতে অর্জুনকে চরম বেদান্তের তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শুরুতেই আত্মতত্ত্ব উপদেশ করছেন কারণ একমাত্র আত্মবিষয় নিত্য, সংসারে জাগতিক অনিত্য দ্বন্দ্ববিষয়ের অনেক ঊর্ধ্বে। অর্জুন যে বিচার করছেন তার কারণ অর্জুনের মন জাগতিক দ্বন্দ্বময় ভূমিতে ডুবে রয়েছে। সংসারের দ্বন্দ্বের আঘাতে অর্জুনের মতো বীরপুরুষ ভেঙে পড়েছেন। তাই ভগবান তাঁর মন থেকে মোহ চিরদিনের মতো সমূলে উৎপাটিত করতে চাইলেন। মন দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে উঠলেই অর্থাৎ অন্তরাত্মার নিকটবর্তীহলেই সহজে বোঝা যাবে মন কোথায় কীভাবে আসক্ত হতে চাইছে। এটাই ঋষিসম্মত পন্থা। তাই ভগবান প্রথমে আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করছেন। একমাত্র আত্মতত্ত্ব শ্রবণে মানুষের অজ্ঞানতা দূর হয়।

আত্মতত্ত্ব বা সাংখ্য প্রকরণে ভগবান শ্রুতির বাছা বাছা মন্ত্রসমূহের নির্যাস তুলে ধরেছেন। শ্রুতির নির্যাসই বেদান্ত। ভগবান বেদান্তই বলেছেন। সাংখ্য ও বেদান্তের মূল তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা যা নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। আত্মা অবিনশ্বর এবং আত্মা ছাড়া সবই ধ্বংস হয়। তাই ভগবান মানুষের দেহের অনিত্যতা সম্পর্কে বলছেন। 'মৃত্যু' অর্থ দেহের নাশ, আত্মা জন্মমরণহীন। আত্মার পক্ষে জন্ম অর্থ দেহগ্রহণ, মৃত্যু অর্থ দেহত্যাগ বা দেহান্তর প্রাপ্তি। দেহান্তর প্রাপ্তি অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, বিনাশ নয়।

অর্জুন সূক্ষ্ম বিচার ও সমালোচনা করেই শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন যুদ্ধ না করাই শ্রেয়। ভগবান নিষ্কাম স্বধর্মের কথা বলছেন কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য শ্রেয় কোনও

কর্ম নাই। যুদ্ধকেই কর্তব্যরূপে গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় যোদ্ধা কখনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসে না। সে মৃত্যুবরণ করতে ভয় পায় না। ভগবান অর্জুনকে স্থির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা জয় ও পরাজয়ের দিকে লক্ষ না করে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করতে বলছেন এবং তাতে কিছুতেই পাপ হবে না। নিষ্কাম কর্মযোগ—স্বধর্ম ও 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা'-এই দুটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা আত্মবুদ্ধির কথা বলছেন। এই বুদ্ধি আত্মা অর্থাৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই চিরকাল একই থাকে। বুদ্ধিকে সর্বদা আত্মচিন্তায় রত রাখাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। তদ্বিপরীতই অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—এটাই মিথ্যা ও বহুমুখী। অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ব্যক্তিগণ সকাম কর্ম অর্থাৎ স্বর্গলোভ, ঐশ্বর্যলোভ এবং নানা ভোগবাদের উপদেশ দেয়। তাতে বুদ্ধি সমাহিত হয় না, বিক্ষিপ্ত হয়। ভগবান তাই অর্জুনকে তিন গুণের অতীত হয়ে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে অবস্থান করতে বলছেন অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিত হয়ে যোগক্ষেম-রহিত হতে বলছেন। আত্মস্বরূপে স্থিত হলেই আত্মবান হওয়া যায়। তাই ভগবান বলছেন, হে অর্জুন! তুমি যোগস্থ হয়ে কর্ম কর, যুদ্ধ কর। কর্ম ত্যাগ নয়। কর্মের লক্ষ্য যেন আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর লাভ হয়। অথবা যোগস্থ বা আত্মজ্ঞান লাভ করেও তুমি সৎকর্ম যা জগতের মঙ্গল করে, তাই কর।

কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলেই আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব। আত্মা নিত্য, নির্লিপ্ত ও অবধ্য। সেই আত্মাকে জানতে হলে নিষ্কাম কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ করতে হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে লক্ষ করে সমগ্র মানবজাতিকে নিষ্কাম কর্মে উৎসাহ দান করছেন। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্ত স্থির হলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব। নিষ্কাম কর্মযোগের কৌশলে যোগী ভগবৎ সাক্ষাৎকার করে শান্তি লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে ভগবান অর্জুনকে স্থিতপ্রজ্ঞের উপদেশ দিচ্ছেন। ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ বলছেন—কীভাবে কথা বলেন, কীরূপে অবস্থান করেন এবং কীভাবে বিচরণ করেন। মানবজীবনে সর্বোচ্চ অবস্থা—'ব্রাহ্মীস্থিতি'। সংসারে বিষয়চিন্তা মানুষকে নিম্নমুখী করে। তাই ভগবান বলছেন—মন যদি প্রজ্ঞাভূমিতে থাকে তাহলে তিনি আসক্তিশূন্য হয়ে সংসার করতে পারেন। তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞ হও'। শাস্ত্র বলে পরা জ্ঞান লাভ কর অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হও বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ কর এবং সেটাই জীবের পরম শান্তির স্থান। পরা জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের জনক রাজার উদাহরণ দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য। তা বলে অপরা জ্ঞানকে অস্বীকার করা চলবে না। জগৎকে অস্বীকার করলে চলবে না। প্রথমে অপরা জ্ঞানের সাধন-পথ ধরে চলতে হয় এবং পরে পরা জ্ঞান উপলব্ধি করলে বোঝা যাবে—এক পরা জ্ঞানই সব হয়েছে এবং পরা জ্ঞানই সব

জ্ঞানের মূল। পরা জ্ঞানকে জানলে আর কিছু অজানা থাকে না। পরা জ্ঞান লাভ, আত্মজ্ঞান লাভ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং ঈশ্বরলাভ এক। অনন্ত-কে নানা নামে ও নানা ভাবে উপলব্ধি করা।

সঞ্জয় উবাচ
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ।।১

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বললেন) মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তথা (এভাবে) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপাদ্বারা আবিষ্ট বা স্নেহাবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র) বিষীদন্তম্ (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাঁকে—অর্জুনকে) ইদং বাক্যম্ উবাচ (এই কথা বললেন)।

সঞ্জয় বললেন—ঐ প্রকারে করুণাদ্বারা অভিভূত অশ্রুপূর্ণনয়ন বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বললেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে অর্জুনের অবস্থা বর্ণনা করছেন। অর্জুন যুদ্ধ করতে রাজি নন। অর্জুন যুদ্ধ করবে বলেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। কিন্তু এসে বলছেন, 'আমি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি এরা সবাই আমার ভাই-বন্ধু। এদের সঙ্গে কত খেলেছি। আমার এই আত্মীয়স্বজন, এঁদের হত্যা করে আমি রাজ্য উপভোগ করতে চাই না। 'এঁরা আমার আত্মীয়'—এই থেকেই মোহ উৎপন্ন। মোহ থেকেই স্নেহ ও কৃপা। আত্মীয়স্বজনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এই স্নেহভালবাসা। অর্থাৎ স্নেহ—দুর্বলতা। সেই দুর্বলতার দ্বারা অভিভূত অর্জুনের চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। অর্জুন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছেন। স্বজনের প্রতি মমতাবশত তিনি স্বীয় কর্তব্য ভুলে গেছেন, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। তিনি যে ধর্ম ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য, দুর্বৃত্তের দমনের জন্য, সমগ্র মানবসমাজের হিত সাধনের জন্য কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসেছেন—তা ভুলে গেছেন। তাঁর ক্ষত্রিয়-স্বভাব—তেজঃ ও বীর্য এই মোহ দ্বারা অভিভূত এবং রথের উপর তিনি কাঁদছেন।

গীতা আমাদের শিক্ষা দেয়—কোনও সমস্যা নিয়ে কাঁদা বা বিলাপ করা সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নয়। সমস্যা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তখন অবশ্যই কাঁদতে ও বিলাপ করতে পারা যায়। কিন্তু যদি পার তবে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে চেষ্টা কর। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'Face the brute'—সমস্যার মুখোমুখি হও। সমস্যার সঙ্গে আমি লড়ব। লড়াই না করে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। অথবা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে আসবার পথ দেখব। সেটা দোষের নয়, কিন্তু যদি লড়াই করার যথেষ্ট চেষ্টা হয়ে থাকে। এটি ইতিবাচক মনোভাব। এই লড়াই অর্থাৎ কর্মকে জীবনে স্বীকার করতে হবে। এক বিস্ময়কর জীবনদর্শন। সর্বকালের, সকল মানুষের জন্য।

অন্যদিকে অর্জুনের এই যুদ্ধত্যাগ ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকে দেখে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে

স্থির করলেন, আমার পুত্রগণের রাজ্যজয় নিশ্চিত। অতুলবিক্রম অর্জুন-ভিন্ন পাণ্ডবগণ ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখীন হতে পারবে না। কোনও বীরই এঁদের সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। ফলে কৌরবদের যুদ্ধ-জয় নিশ্চিত। ধৃতরাষ্ট্র এই কথা মনে করছেন দেখে সঞ্জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'মধুসূদন' বলে বোঝাতে চাইছেন, মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান চিরদিনই দুষ্টগণের দমন করেন।

'তম্ ইদম্ বাক্যম্ উবাচ মধুসূদনঃ'—তখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বললেন। ভগবানের কথা অর্থাৎ পরা বিদ্যা। এই কথা পরা জ্ঞান। এই কথার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মুক্তিলাভ হয়। জীবনে চলার পথের সন্ধান পাব। আমরা নিজেকে বুঝব, জানব, আনন্দ পাব। শান্তি পাব জীবনে। ভগবানের কথা মহাবাক্য। যে বাক্য পরম সত্যকে উদ্ঘাটিত করে। ভগবান অর্জুনকে যে-সকল বাক্য বলছেন তা মহাবাক্য।

শ্রীভগবানুবাচ
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।২

শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বললেন)—অর্জুন (হে কৌন্তেয়) বিষমে (সঙ্কটকালে) কুতঃ (কোথা হতে, কি কারণে) অনার্যজুষ্টম (অনার্য-জনোচিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গের অযোগ্য) অকীর্তিকরম্ (অযশস্কর) ইদং কশ্মলম্ (এই মোহ বা চিত্তের মলিনতা) ত্বা সমুপস্থিতম্ (তোমাতে উপস্থিত হল)।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন, এই ঘোর সঙ্কটকালে কোথা হতে তোমার চিত্তে এমন অনার্যজনোচিত, স্বর্গের অযোগ্য ও অকীর্তিকর মোহ উপস্থিত হল?

ভগবান—সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান—এই ছয়টি গুণ যাঁর আছে, যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূল কারণ, ভূতগণের গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত, তিনি ভগবান। অর্জুনের কথা শুনে এবং এই সঙ্কটকালে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটু বিস্মিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই বিপদের সময়ে তোমার এই মোহ, এই নির্বুদ্ধিতা কোথা থেকে এল? তুমি আর্য। এ তোমাকে মানায় না। আর্য ও অনার্য—এই দুরকমের চরিত্র আছে। যাঁরা সৎ, বুদ্ধিমান, বিচারশীল, গুরুস্থানীয়—তাঁরা আর্য। আর্য অর্থাৎ মহৎ-চিত্ত ব্যক্তি। আর অসভ্য, বর্বর, হীনবুদ্ধি, নির্বোধ যারা, তারা অনার্য। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অনার্যজুষ্টম্'—যারা অনার্য, মূর্খ— তাদের এই আচরণ মানায়। তুমি আর্য হয়ে এরকম আচরণ করছ? তাহলে তুমি তো স্বর্গলাভ থেকে বঞ্চিত হবে—'অস্বর্গ্যম্'। স্বর্গ কেন বলছেন? আমরা সবাই মুক্তি চাই, সে আলাদা কথা। আর অতদূর যদি না পারি, মৃত্যুর পরে অন্তত স্বর্গে যেতে চাই। স্বর্গ বলতে কী বুঝি? আমাদেরই মতো মানুষ যাঁরা দেবলোকে উন্নীত

হয়েছেন তাঁরা স্বর্গে গেছেন। আমরা যদি নিজে ভাল হই, তাহলে দেবতার মতো মানুষের সঙ্গে থাকতে চাইব। মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গে যেতে চাইব।

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সুপ্ত দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলা। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তোমার যদি এই দুর্বুদ্ধি হয় তাহলে তুমি কখনও দেবত্বে উন্নীত হতে পারবে না। তোমার স্বর্গলাভও হবে না। 'অকীর্তিকরম্'—তোমার দুর্নাম হবে। কীর্তি মানে সুনাম, অকীর্তি মানে দুর্নাম। কেন দুর্নাম হবে? কারণ অর্জুন, তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান। তুমি যা করতে চলেছ তা ক্ষত্রিয়জনোচিত হচ্ছে না। লোকে তোমাকে কাপুরুষ বলবে। তোমার নিন্দা করবে। অর্জুন যে একজন মহান যোদ্ধা সে— দৌর্বল্যের শিকার হবে এবং লোকে তাকে নিন্দা করবে।

অর্জুন আশা করেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনার্যজুষ্টম্, অস্বর্গ্যম্, অকীর্তিকরম্—এমন কঠিন তিরস্কার করে বলবেন। ঐরূপ বলবার উদ্দেশ্য, ভগবান লক্ষ করেছেন—অর্জুন তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছেন। আর্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের অভিপ্রায় যাঁদের আছে। স্বধর্ম পালন করলেই চিত্ত শুদ্ধি এবং চিত্ত শুদ্ধি হলেই মুক্তি বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। ৩

পার্থ (হে অর্জুন) ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ (ক্লীবভাব,কাপুরুষতা আশ্রয় করো না) এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (এটা তোমাতে শোভা পায় না) হে পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) উত্তিষ্ঠ (ওঠ)।।

হে অর্জুন, তুমি বীর্যহীন ক্লীবের ন্যায় কাতরতা, কাপুরুষতা আশ্রয় করো না। এই ভীরুতা তোমার ন্যায় বীরপুরুষের শোভা পায় না। হে পরন্তপ, শত্রুতাপন, হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠো।

ধর্ম আমাদের মনকে ঈশ্বরমুখী করে। কিন্তু ধর্ম কর্তব্যবিমুখতা শেখায় না। অলসতা, কাপুরুষতা, জীবনযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানো—সেটি অধর্ম। ধর্ম বলে তুমি ক্লীব, কাপুরুষ হয়ো না। কর্তব্যে অবহেলা করো না। যেটা করছ সেটা আরও ভাল করে করতে চেষ্টা করো। তবেই জীবন ঈশ্বরমুখী হবে। জীবনের সকল কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে হবে। ফাঁকি, অবহেলা নয়। মনে এক রেখে মুখে আর এক বলা ধর্ম নয়। মানুষকে এ মানায় না—মনুষ্যত্বের মর্যাদাহানি।

এটি স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রিয় শ্লোক। শক্তিদায়ী শ্লোক। ক্লীবের সঙ্গে তুলনা করে ভগবান অর্জুনের প্রসুপ্ত বীর্যকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। ভগবান বলছেন—হে পার্থ, তুমি ক্লীব হয়ো না। অর্থাৎ তুমি দুর্বল, কাপুরুষ, মেরুদণ্ডবিহীন হয়ো না। শাস্ত্র বারবার বীর হতে বলছেন। তাইতো স্বামী বিবেকানন্দ বলে বসলেন, গীতা পড়ার চেয়ে

ফুটবল খেললে তাড়াতাড়ি ঈশ্বরলাভ করবে। এ একটা সাংঘাতিক কথা। এই অর্থে বলছেন যে, যদি তুমি দুর্বল হও তাহলে শাস্ত্রের সহজ অর্থ করতে গিয়ে ভুল অর্থ করবে। গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবে না। তোমাকে বীর হতে হবে। কারণ সত্যকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। সত্য যে সব সময় মোলায়েম হবে, মধুর হবে তা নয়। কিন্তু যত নিষ্ঠুরই হোক, কঠিনই হোক তবু সত্যকে জানব। জানতে গেলে বীর হতে হবে। সরল হতে হবে। তাই বলছেন, অর্জুন তুমি কাপুরুষ হয়ো না। ভীরু হয়ো না। তুমি হয়তো ভাবছ এঁরা আমার গুরুজন, আত্মীয়, এঁদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। তুমি খুব অহিংসা দেখাচ্ছ, কিন্তু 'নৈতৎ ত্বয়ি উপপদ্যদে', এটা তোমার শোভা পায় না। কারণ তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করা তোমার কর্তব্য। 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং-যা তোমাকে ক্ষুদ্র করে, ক্ষীণ, দুর্বল, অক্ষম করে সেই হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ কর। তুমি ওঠ। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। 'পরন্তপ' কথাটার অর্থ হচ্ছে শত্রুকে নিধন করা, দমন করা। 'পরন্তপ' কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্জুনের ক্ষাত্র-মনোভাবকে জাগিয়ে দেওয়া। তাঁর মধ্যে যে দুর্বলতার মেঘ দেখা দিয়েছে তা সরিয়ে দেওয়া। তাঁর আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলা। অর্জুনকে 'পার্থ' বলে সম্বোধন করার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। শ্রীভগবান তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি 'পৃথা'র পুত্র অর্থাৎ দেবী কুন্তীর পুত্র। তাঁর মা অনেক পূজা-আরাধনা করে তাঁকে পেয়েছেন। দৈবশক্তি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং মানবীয় কোনও তুচ্ছ দুর্বলতা তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ এই জায়গায় ভগবানের এই উক্তির প্রসংশা করে বলছেন, অর্জুনের মনে সত্ত্বগুণের দ্বারা কর্মে ত্যাগ আসেনি। সাময়িক এই বৈরাগ্য হল মর্কট-বৈরাগ্য যা স্থায়ী হয় না। সত্ত্বগুণী সর্ব অবস্থায় শান্ত ও বিপদেও ধীর—সমদর্শী। এখানে তমোগুণ থেকে অর্জুনের বৈরাগ্য, যুদ্ধে অনিচ্ছা হয়েছে। তাঁর মনে ভয় এসেছে। তিনি যুদ্ধ-প্রবৃত্তি নিয়েই যুদ্ধ করতে এসেছেন। এখন ভয়ে তাঁর মনে দুর্বলতা এসেছে। তাই নানা যুক্তি দ্বারা কর্ম-ত্যাগের গুণগান করছেন।

ভগবান তাই অর্জুনের মোহ দূর করবার জন্য তাঁকে পাপী বা হীন না বলে তাঁর মধ্যে যে মহাশক্তি আছে, সেই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইলেন। তাই ভগবান বলছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—তোমাতে এটা সাজে না। তুমি সেই আত্মা, তুমি স্বরূপ ভুলে নিজেকে পাপী রোগী শোকগ্রস্ত করে তুলেছ—এ তোমার সাজে না। ভগবান কঠিনভাবে বলছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'—তুমি এই ক্লীবভাব, কাতরতা, কাপুরুষতা আশ্রয় করো না। জগতে পাপতাপ নাই, রোগশোক নাই, যদি কিছু পাপ জগতে থাকে, তা এই ভয়। যে কাজ তোমার ভিতর শক্তির উদ্রেক করে দেয়, তাই পুণ্য। আর যা তোমার শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাই পাপ। এই দুর্বলতা পরিত্যাগ করো। তুমি বীর তোমার এ সাজে না। জগতে গীতার এই বাণী শোনাতে হবে। এখানকার বায়ুতে ভয়ের কম্পন বইছে। এই

কম্পন উলটিয়ে দাও। তুমি সর্বশক্তিমান—যাও, তোপের মুখে যাও, ভয় করো না। মহাপাপীকেও ঘৃণা করো না, তার বাইরের দিকটা দেখো না। ভিতরে যে পরমাত্মা রয়েছেন, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমগ্র জগৎকে বলো—তোমাতে পাপ নেই, তাপ নেই, তুমি মহাশক্তির আধার। জীবনের পরমসত্য এই শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু। শক্তিই সুখ ও আনন্দ, শক্তিই অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন। দুর্বলতাই অবিরাম দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ, দুর্বলতাই মৃত্যু।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দুর্বলতা দ্বারা ঈশ্বরলাভও হয় না। ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো!' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।—কি! আমি তাঁর (ঈশ্বরের) নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে। তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোখ হওয়া চাই! এইরূপ তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর, তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক। আবার তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন উত্তম বৈদ্য—রোগীকে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়। এই বৈদ্যের তমোগুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

বস্তুত স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হলে মানুষ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তার সত্তার যেন মৃত্যু হয়। এক দুর্বলতা যেন মেঘের মতো তার সত্তার উপর ঢেকে যায়। মানুষ মূলত দেবভাবাপন্ন, দুর্বলতা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নয়। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে। বেদান্ত মানুষের সেই দুর্বলতা দূর করবার কথা বলে —তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি, 'তুমিই সেই', 'তুমিই সেই'—তুমি এই ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয়- সর্বস্ব নও—তোমার মধ্যে এক নিগূঢ় সত্তা বিদ্যমান। বেদান্ত সর্বদা শক্তির কথা, ইতিবাচক কথা বলে। তাই ভগবান এখানে বলছেন, 'নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—এ দুর্বলতা তোমার শোভা পায় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলছেন, 'আমরা অনেক দিন ধরে কেঁদেছি, এখন আর কাঁদার প্রয়োজন নেই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও।'

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানযুগে স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে নতুনভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং স্বামীজী এই প্রথম শ্লোক-দুটিকে খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর গীতা-বিষয়ক আলোচনায় তিনি বলছেন, যদি তুমি এই দুটি শ্লোকের ভাব বুঝে থাক, তবে তুমি গীতার সামগ্রিক ভাবও বুঝতে পারবে। এতে এমন একটি দর্শনের প্রবর্তন করা হয়েছে যা কাদামাটিকেও বীর যোদ্ধায় পরিণত করতে পারে। এই ভাবটি ধরতে হবে। আমরা সবাই গীতা পড়েছি। কিন্তু আমরা গীতার এই শক্তিপ্রদ বাণীর যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে পারিনি। এখন স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন ও একই শক্তিপ্রদ মর্মবাণী আমাদের দিয়েছেন সমস্যার সম্মুখীন হতে।

বিবেকানন্দ যখন পরিব্রাজক জীবনে বারাণসীতে পৌঁছান সেখানে দুর্গামন্দিরের কাছে রাস্তায় একদল বানর তাঁকে তাড়া করেছিল। বানরগুলি তাঁকে তাড়া করতে থাকলে স্বামীজী দৌড়ে পালাচ্ছিলেন। দূর থেকে এক সাধু চিৎকার করে তাঁকে বললেন, 'বাবাজী, পালিয়ে যেয়ো না, পশুগুলির মুখোমুখি হও।' স্বামীজী ভাবলেন, 'এতো এক চমৎকার শিক্ষা।' তিনি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তখুনি ফিরে দাঁড়ালেন বানরদের দিকে। বানরগুলি পালিয়ে গেল। পরবর্তীকালে স্বামীজী এই ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর বক্তৃতায় বলছেন, 'পশুর মুখোমুখি হও', 'পশুর মুখোমুখি হও।' অন্যথায় তুমি যদি পালাতে থাক তাহলে পশুটিও তোমাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। একে মনুষ্যত্ব বলে না। মানুষের অন্তরে অনেক বেশি শক্তি সামর্থ্য লুকানো রয়েছে। তাই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই ঔষধ প্রয়োগ, যা আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। সমগ্র জাতি, তথা এই বিশ্বের দরকার এই ঔষধের।

ভগবান এই শ্লোকে আর একটি শব্দ ব্যবহার করছেন— 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'। ক্লৈব্যের কাছে নতি স্বীকার করো না। বস্তুত ক্লৈব্যের অর্থ হলো যে, মানুষ ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ নপুংসক নয়। ক্লৈব্য কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুর্বলতা, কাপুরুষতা, মনোবলশূন্যতার ভাব। তাই এই দুর্বলতাকে আশ্রয় করো না। 'ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'-—ভগবান বলছেন, উত্তিষ্ঠ—'উঠে পড়'। যতক্ষণ বসে রয়েছ, ততক্ষণ দুর্বলতাকে আশ্রয় করে রয়েছ। উঠে দাঁড়াও, নিজের পায়ে দাঁড়াও—মানুষ হও, এই ক্লীবভাবকে ছাড়। হৃদয়ের দুর্বলতা হীনতাকে দূর কর।

যখন আমরা বিপদে পড়ি এবং আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে থাকি, তখন আমরা মনে করি আর অগ্রসর হওয়া যেন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন আমরা ভেঙে পড়ি। তখন আমাদের চাই কোনও সৎ ব্যক্তির প্রেরণা। সেই প্রেরণা মনে শক্তি আনে। রামায়ণে আছে, সীতার অন্বেষণে সকলে এদিক-ওদিক যাচ্ছেন। কিন্তু সমুদ্রের পারে লঙ্কায় যেতে কেউ রাজি হল না। হনুমান যেতে রাজি হলেন। তখন অঙ্গদ এবং অন্যান্য বানর তাঁর প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, 'তুমি এত বড় মহাত্মা, তুমি জীবনে কত বড় বড় কাজ করেছ। সেই প্রশংসায় হনুমান তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় গেলেন ও সীতাদেবীর সংবাদ নিয়ে ফিরলেন।

মানুষকে যদি তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বারবার নেতিবাচক বলা হয় তখন সে আরও হীনমন্যতায় ভোগে এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি এই কাজ 'পারি না'—এটি ভাল নয়। সর্বদা সকল কাজে বলতে হয়ে 'হ্যাঁ, আমি পারি'। তাই সমাজে বীরপুরুষ ও সাহসী যোদ্ধাই আদর্শ পুরুষ। স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজীর চরিত্রই আমাদের সমাজের আদর্শ। বিবেকানন্দের বাণী ছিল শক্তি ও অভীঃ—এই দুই মহামন্ত্র। গীতায় ভগবান অর্জুনকে লক্ষ

করে সমগ্র মানবজাতিকে বেদান্তের এই শক্তি ও নির্ভীকতার মন্ত্র দিয়ে যান। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগে দেশবাসীকে সেই শক্তি ও নির্ভীকতার মন্ত্র শোনালেন।

বেদান্তের মূল মন্ত্রই হল অভীঃ অভীঃ—নির্ভীক হও, নির্ভীক হও। সমগ্র বিশ্বের এবং মানব- সত্তার আদি উৎস হল ব্রহ্ম অর্থাৎ অভয়ম্। উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে বলছেন, 'অভয়ম্ বৈ প্রাপ্তোঽসি জনকঃ'—জনক তুমি ভয়হীন অবস্থা অর্জন করেছ। আত্মজ্ঞান লাভ অর্থাৎ এই অভয় লাভ করা। আধ্যাত্মিক উন্নতির এইটি হল মাপকাঠি। একমাত্র মানব ভয়হীন হতে পারে স্বীয় অন্তরে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরসত্তার অনুভূতিতে। আধ্যাত্মিক পথে যতই আমরা অগ্রসর হব আমরা ততই আরও নির্ভীক হব, শক্তিমান হব, হৃদয়বান হব। ভয়হীনতা ও হৃদয়বত্তা—এই দুটি গুণের সংহতি ঘটাতে হবে। কারণ ভগবান গীতায় বলছেন, সেই আমার প্রকৃত ভক্ত—যে নর বা নারী নির্ভীক ও শক্তিমান হয়েও সর্বজীবের প্রতি হৃদয়বান। সে কাউকেও ভয় করে না, সে অন্যের ভয়ের কারণও নয়, যেহেতু তার স্বভাব এমনই শান্ত।

সমাজে গীতার বাণীর প্রয়োগ নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গীতার প্রথম অধ্যায়েই যুদ্ধের বর্ণনা। পরের অধ্যায়গুলিতে শক্তি ও হৃদয়বত্তা, নম্রতার সমন্বয়ের কথা বলে মানবচরিত্রের বিকাশের কথা বলেছেন। একদিকে মানসিক উদারতা এবং অন্যদিকে বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। একমাত্র গীতার বাণীই মানুষকে প্রকৃত চরিত্রবান নিঃস্বার্থ কর্মী, সাহসী, হৃদয়বান ও বিশ্বনাগরিকে রূপান্তরিত করতে পারে। বিবেকানন্দ বলছেন, বেদান্ত চায় গভীরতার সঙ্গে বিস্তার, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহাবস্থান। এ দুই-এর সমন্বয়েই উৎকৃষ্ট চরিত্র গড়ে ওঠে। আমাদের হতে হবে, 'সমুদ্রের মতো গভীর আর আকাশের মতো বিস্তৃত'। বেদান্ত চায় জগতে সব লোকের চরিত্র ধীরে ধীরে ঐরকম গড়ে উঠুক।

সুতরাং আমাদের চাই শক্তি, অভয়, বুদ্ধি, উন্নতি ও পূর্ণতা সাধন। কিন্তু আমরা যদি দুর্বল হই তাহলে এই উদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারব না। তাই ভগবান এই দুটি শ্লোকের দ্বারা অর্জুনের ভগ্ন মনে শক্তির সঞ্চার করতে চাইছেন। আমরা দেখব ভগবানের এই বাণীর পরেই অর্জুন প্রথম অধ্যায়ের মতো আর কাঁদছেন না। তাঁর কথায় একটু সংহত ভাব দেখা যাচ্ছে, পূর্বের বিমর্ষতা আর নেই।

উপনিষদ বলে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।'—হে মানব, ওঠো জাগো। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভ করো এবং তাঁদের কাছ থেকে আত্মজ্ঞান শিক্ষা করো। স্বামী বিবেকানন্দও যুবকদের তাই বলছেন, 'ওঠো জাগো এবং এগিয়ে চলো যতক্ষণ না তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছ।' কঠোপনিষদে নচিকেতা বলছেন, 'বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ'—আমি পিতার সন্তান ও শিষ্যদের মধ্যে অবশ্যই প্রথম। আর প্রথম না হলেও আমি তাদের মধ্যে অবশ্যই দ্বিতীয়। কিন্তু কোনও বিচারেই আমি অধম নই।—এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়েই নচিকেতা যমরাজের কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। বলহীনের দ্বারা

কোনওভাবেই কোনও কিছু লাভ হয় না। ফলে ভগবানের এই শক্তির প্রেরণাময় বাক্যের দ্বারা অর্জুনের মন এখন একটু শান্ত হল। মন স্থির, প্রশান্ত হলেই তবে বুদ্ধি ও চিন্তায় স্বচ্ছতা আসে, তখন ঠিক ঠিক বিচার, কর্মের কৌশল ও জ্ঞানলাভ সম্ভব। অজ্ঞানী কখনও নিজের বুদ্ধিকে স্থির ও সমাহিত করতে পারে না। পক্ষান্তরে জ্ঞানীর চিত্তই সবল, তা আত্মজ্ঞানে সমাহিত—স্থিরলক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত—ভাবের উচ্ছ্বাসে তা বিচলিত হয় না। কাজেই চিত্তকে শুদ্ধ ও সবল করবার নিমিত্ত আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক কর্তব্য।

অর্জুন উবাচ
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।। ৪

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন) অরিসূদন (শত্রুনাশন) মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি (ভীষ্ম ও দ্রোণের সঙ্গে) ইষুভিঃ (বাণের দ্বারা) কথং যোৎস্যামি (কী প্রকারে যুদ্ধ করব)।

অর্জুন বললেন—হে শত্রুনাশন, হে শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়েই আমাদের পূজনীয়, আমি কী করে এঁদের সঙ্গে বাণের দ্বারা যুদ্ধ করব? অর্থাৎ কী করে যুদ্ধে এঁদের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে আহত করব?

অর্জুন এখন অনেকটা সুসম্বদ্ধ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন। শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত কঠিন-বাক্যে অর্জুন নিজের দুর্বলতা বুঝতে পারলেন কিন্তু তা এখনও ত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি এখন হৃদয়ের আবেগে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেনঃ হে কৃষ্ণ, আমি ভীরুতা বা বীর্যহীনতাবশত যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হচ্ছি না, কিন্তু আমি কেমন করে পিতামহ ভীষ্মদেব ও শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্যের উপর অস্ত্রক্ষেপ করব? পিতামহ ভীষ্মদেব আমাদের শিশুকালে পালন করেছেন, দ্রোণাচার্য আমাদের অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। এঁরা আমাদের পূজনীয়। এঁদের পুষ্প দিয়ে অর্চনা করাই আমাদের কর্তব্য। কোনও বাক্য দ্বারাই তাঁদের আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অথচ এই যুদ্ধে এঁরাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদেরকে 'ইষুভিঃ'—তীরের দ্বারা আমি কীভাবে যুদ্ধ করব। হে অরিসূদন, হে মধুসূদন, তুমি আমাকে বলে দাও, এ আমি কীকরে যুদ্ধ করব। অর্জুন যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। অর্জুন বোঝাতে চাইছেন, এ তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা নয়। এ যুদ্ধ ধর্মবিরুদ্ধ। ভীষ্ম, দ্রোণ এঁরা তাঁর নমস্য। এঁদের প্রতি কোনও কর্কশ শব্দই ব্যবহার করা চলে না। অস্ত্র দিয়ে আঘাত দূরের কথা।

অর্জুন এখানে নিজের কর্তব্য ভুলে যাচ্ছেন—'হায়, আমি কেমন করে আমার প্রিয়জনের প্রাণে আঘাত দেব, কেমন করে তাঁদের দুঃখ উৎপাদন করব।'—এক স্নেহের আকর্ষণে অর্জুন কর্তব্যের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে প্রিয়জনের সন্তোষবিধানেই ব্যস্ত। তিনি যে যুদ্ধক্ষেত্রে এক মহান বীর ও এক মহান উদ্দেশ্যে, ভগবানের সঙ্গে ধর্ম স্থাপন কর্মে

এসেছেন—সেই কর্তব্য ভুলে আবেগবশত নানা যুক্তি দিতে শুরু করেছেন। অর্জুন যুক্তি দিচ্ছেন—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।৫

হি (যেহেতু) মহা-অনুভাবান্ (মহানুভব) গুরূন্ (গুরুজনদের) অহত্বা (বধ না করে) ইহ-লোকে (এ সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (উচিত)। তু (কিন্তু) গুরূন্ হত্বা (গুরুজনদের বধ করে) রুধির-প্রদিগ্ধান্ (রুধিরলিপ্ত) অর্থ-কামান্ (অর্থকামরূপ ভোগ্যবস্তুসমূহ) ইহ এব (এ সংসারেই) ভুঞ্জীয় (ভোগ করতে হবে)।।

মহানুভব গুরুজনদের হত্যা করার চেয়ে ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। কেননা গুরুজনদের বধ করলে ইহলোকেই এঁদের রক্তে রঞ্জিত অর্থ ও কাম্য বস্তুসকল আমাকে ভোগ করতে হবে।

অর্জুন এক মহা সমস্যায় পড়েছেন—যুদ্ধ করবেন কি করবেন না। তাই বলছেন, গুরুজনদের হত্যা করে আমি ধনসম্পদ লাভ করব? সিংহাসনে বসব? না, তা আমি চাই না। এ অতি ঘৃণ্য জীবন। তার চেয়ে বরং আমি ভিক্ষা করে খাব। এও আমার পক্ষে শ্রেয়। বাস্তবিক, এ অবস্থায় কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত এ নির্ণয় করা শক্ত। শাস্ত্র আমাদের সবসময় পথ দেখিয়ে দেয়। ধর্ম কতকগুলি ন্যায়-নীতি ধারণ করে রাখে। যেটা একজনের নীতি, সেটা অপরের নীতি নাও হতে পারে। ভারতবর্ষ বলে, সবার জন্য এক নীতি চলে না। ভিক্ষা কে করবে?—সন্ন্যাসী। ব্রাহ্মণ। তাছাড়া খুব অক্ষম যারা তারা ভিক্ষা করবে। এছাড়া ভিক্ষা করার অধিকার আর কারোও নেই। অর্জুন ক্ষত্রিয়সন্তান। তিনি ভিক্ষা দেবেন। ভিক্ষা করবেন কেন? ভিক্ষা করলে তো তিনি অন্যকে বঞ্চিত করবেন, নিজের ধর্ম ত্যাগ করবেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এর মতো পাপ আর কিছু নেই। অর্জুন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধে অদ্বিতীয়। পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তিনি কিনা বলছেন, 'আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে আমি এ রাজ্যসুখ, ধনসম্পদ ভোগ করতে চাই না। তার চেয়ে বরং ভিক্ষা করে খাব।' তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝাচ্ছেন, 'হ্যাঁ, যুদ্ধ করা হিংসাত্মক কাজ ঠিকই। কিন্তু যদি ধর্ম রক্ষা, আত্মরক্ষা কিংবা দেশরক্ষার জন্য তুমি হিংসা কর, হত্যা কর, তাহলে তোমার কোনও পাপ হবে না।' উত্তরে অর্জুন বলছেন, 'ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্'—আমার আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের হত্যা করে আমি যা ভোগ করব তা রক্তরঞ্জিত। কাদের রক্তে? আমারই গুরুজনদের রক্তে। আমার চোখের সামনে ওঁদের রক্তে মাখা জিনিস সব ভেসে উঠবে। না, এই বিষয়- সম্পদ আমি চাই না। এর চেয়ে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করাও শ্রেয়। একটা বিষয় আমরা এখানে লক্ষ করছি যে, অর্জুনের দৃষ্টি কর্মের ফলের

দিকে অর্থাৎ যুদ্ধের ফলের দিকে। ফলের মূল্য দেখে তিনি কর্মের বিচার করছেন। পরে দেখব ভগবান তাঁর দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে কর্মের দিকে নিয়ে যাবেন।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ।।৬

যৎ-বা (যদি বা) জয়েম (আমরা) (জয়লাভ করি), যদি বা (অথবা) নঃ (আমাদের) (এঁরা) জয়েয়ুঃ (পরাজিত করেন) (এই উভয়ের মধ্যে) কতরৎ (কোনটি) নঃ (আমাদের পক্ষে) গরীয়ঃ (শ্রেয়) এতৎ চ (তা-ও) ন বিদ্মঃ (জানি না) যান্ (যাঁদের) হত্বা (বধ করে) ন জিজীবিষামঃ (বেঁচে থাকতে চাই না) তে (সেই) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) প্রমুখে (সামনে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত) (রয়েছেন)।

এই যুদ্ধে আমরা যদি জয়লাভ করি অথবা এঁরা আমাদের পরাজিত করেন, এই উভয়ের মধ্যে কোনটি যে আমার পক্ষে শ্রেয়, তা আমি বুঝতে পারি না। যাঁদের বধ করে আমরা বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণই আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার শুনে অর্জুন বলছেন, তা না হয় মানলাম যে, ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। কিন্তু যুদ্ধে যদি আমরা হেরে যাই তবে তো আমাদের ভিক্ষা করেই খেতে হবে। আর যদি জয়লাভ করি তবে রাজ্যলাভ হবে ঠিকই, কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের বধ করতে হবে। এই দুই-এর মধ্যে কোনটা করণীয় তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

বস্তুত যুদ্ধ করা উচিত না উচিত নয়—এ একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। এই প্রশ্ন—একজনের প্রশ্ন নয়। সকল যুগের, সমগ্র মানবজাতির প্রশ্ন। পরাজয়ে আমাদের মৃত্যু ঘটবে অথবা বেঁচে থাকলে আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করতে হবে—এটা নিতান্ত দুঃখকর—এ সন্দেহ নেই। অপরদিকে যুদ্ধে জয়লাভ অর্থাৎ আমাদের স্বজনদের হত্যা করতে হবে—এটিও কম দুঃখের নয়। এ দুয়ের মধ্যে কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ তা অর্জুন বুঝতে পারছেন না। তারপর বলছেন, 'আমাদের জয়লাভ হলেও তা পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সমস্ত আত্মীয়-বন্ধুদের হত্যা করে তাদের বিষয়সম্পত্তি ভোগ করা তো দূরে থাক, আমার আর বেঁচে থাকতেও ইচ্ছা করবে না, 'ন জিজীবিষামঃ'। সেই আত্মীয়-স্বজনরাই এখন আমার সামনে রয়েছেন। কারা তাঁরা? 'ধার্তরাষ্ট্রাঃ', ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ। তাঁরা অর্জুনেরই জ্যেঠতুতো ভাই।

এই শ্লোকেও অর্জুনের চরিত্রের একটা মহৎ দিকও দেখা যাচ্ছে। কৌরবরা স্বজন কিন্তু

শঙ্খ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভাই পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। তাঁদের পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। কিন্দম মুনির অভিশাপে পাণ্ডুর কোনও সন্তান না হওয়ায় তাঁর দুই স্ত্রী কুন্তী এবং মাদ্রী দেবতাদের আশীর্বাদে পাঁচ পুত্র লাভ করেন। কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজের আশীর্বাদে যুধিষ্ঠির, বায়ুদেবের আশীর্বাদে ভীমসেন, দেবরাজ ইন্দ্রের আশীর্বাদে অর্জুন জন্মগ্রহণ করেন। অশ্বিনীকুমার দুই দেবতার আশীর্বাদে মাদ্রী যমজ দুই পুত্র—নকুল এবং সহদেবকে লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির নরশ্রেষ্ঠ ধার্মিক, বীর, সত্যবাদী এবং মহারাজ ছিলেন। তাঁর ধৃতি, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, রাজ্যপরিচালনা প্রভৃতি সৎ গুণের জন্য তিনি জগতে শ্রেষ্ঠ। তাঁর বহু মহৎ গুণের মধ্যে একটি দোষ ছিল যে, তিনি অত্যধিক পাশাখেলায় আসক্ত ছিলেন। মানুষের শত গুণের মধ্যে একটি মাত্র দুর্বল প্রবৃত্তি দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। এক জনের অসৎ প্রবৃত্তিতে সংসার নষ্ট হয়। ফলে তিনি যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে পরম সুখে রাজ্যশাসন এবং রাজসূয়-যজ্ঞ করেন, তখন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য দেখে সেইসকল ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করবার জন্য দ্যূতক্রীড়া ষড়যন্ত্র করেন। কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির কপটাচারে তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় পরাজিত করেন। পাশাখেলার পণ অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব রাজ্যহারা হয়ে তেরো বৎসর বনবাসে কাটান। বনবাসের কাল পূর্ণ হলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ না করে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাইলেন। কিন্তু অসহায় ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তাতে সম্মত করাতে পারলেন না। দুর্যোধন পণ করেছেন বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র ভূমিও ছেড়ে দেবেন না। অতএব কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে জয়লাভ করে যুধিষ্ঠির পুনরায় হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ্য পরিচালনা করেন। পরিশেষে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী একসঙ্গে সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গলোকে যাত্রা করেন। যুধিষ্ঠিত সর্বদা সত্য'কে ধরে ছিলেন। তবে ছলপূর্বক একটি অসত্য বলে দ্রোণাচার্যকে নিধন করায় যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শনও করতে হয়েছে।

ভীমসেন ছিলেন দ্বিতীয় পাণ্ডব। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রমশালী বীর। দেহের শক্তিতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। অধিক আহার করতেন বলে নাম ছিল 'বৃকোদর'। তাঁর দেহ সিংহের ন্যায় সুদৃঢ় এবং অযুত হস্তীর বল তিনি ধারণ করতেন। ভীমের শক্তি দেখে দুর্যোধন ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজতেন। রণক্ষেত্রে 'পৌণ্ড্র' নামক শঙ্খের শব্দে তিনি শত্রুপক্ষের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করতেন। তিনি বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষালাভ করেন। অন্যপ্রকার যুদ্ধ অপেক্ষা তিনি গদাযুদ্ধেই বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধেই পরাস্ত করেন। ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ ছিলেন রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীর এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নানা মায়া অবলম্বনে সকল কৌরব বীরদের পরাজিত করেন। শেষে কর্ণের একবীরঘাতিনী বৈজয়ন্তী-শক্তি (অর্জুন-

বলো। 'শিষ্যস্তেহহং', আমি তোমার শিষ্য। এখানে অর্জুন বলছেন, 'ননু ত্বং মম সখা নতু শিষ্যঃ অত আহ'—আমি এখানে তোমার বন্ধুত্ব দাবি করছি না। কারণ বন্ধু হলে, 'এ আর তোমাকে আমি কী বলব'—একথা বলে তুমি উপেক্ষা করতে পার। কিন্তু তা আর তুমি পারবে না। কারণ আমি তোমার শিষ্য। 'তদনুশাসনযোগ্যত্বাৎ'—কারণ আমি তোমার উপদেশের যোগ্য বলেই তোমার শিষ্য হয়েছি। আমার দাবি আছে। তুমি আমাকে শেখাবে। 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' তুমি আমাকে শাসন কর, শিক্ষা দাও, হাত ধরে নিয়ে চল। আমি তোমার শরণাগত। আমি তোমার আশিস প্রার্থনা করছি। আমি আত্মসমর্পণ করতে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমায় কৃপা করো। বস্তুত ভগবানের কাছে তিরস্কৃত হয়ে অর্জুনের কিছুটা আত্মসচেতনতা এসেছে এবং এখন বিনীতভাবে ভগবানের উপদেশ শুনতে আগ্রহী।

শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি তীব্র ভর্ৎসনা শুনে অর্জুনের দুর্বল মনে সন্দেহ ও বিচার এসেছে। অর্জুন সেই সন্দেহ দূর করবার জন্য ভগবানের কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। আর শরণাগত ব্যক্তিকেই গুরু কৃপাপূর্বক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব ত্যাগ করে, তাঁকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করে, এই ধর্মসঙ্কটে তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন। এই শ্লোকে দেখা যাচ্ছে অর্জুন জ্ঞান লাভ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন। তিনি এই কুরুক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে এসে মুমুক্ষু হয়ে ভগবানের নিকট যেন ব্রহ্মবিদ্যার প্রার্থী। অর্জুনের এই বৈরাগ্য এসেছে—স্বজন হত্যায় যে মহাপাপ হবে তাতে নরকবাস, তাই যুদ্ধ ত্যগ করে ভিক্ষালয়ে জীবনযাপন করতে প্রস্তুত এবং ঐ বৈরাগ্য থেকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপদেশ লাভ করবার জন্য শরণাগত। অজ্ঞানীর বুদ্ধিতে মোহ ও সন্দেহ জন্মায়। বুদ্ধি শুদ্ধ ও নির্মল না হলে পরমাত্মায় সমাহিত হয় না। কাজেই বুদ্ধিকে সর্বপ্রকার মোহ ও সন্দেহ থেকে নির্মুক্ত করে শুদ্ধ, স্থির ও নিশ্চয়াত্মিকা করলে তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তাই অর্জুনের চিত্তকে মোহ ও সন্দেহের আক্রমণ হতে নির্মুক্ত করে তাঁকে প্রকৃত কর্মের পথে চালনা করতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়েছেন।

সংসারে ভীরু লোকের স্থান নেই। সু-উন্নত চরিত্র চায়। শক্তিধর ও নির্ভীক চরিত্র চায়। মানবতার আদর্শ হচ্ছে যে—নিজে সৎ, নির্ভীক, শক্তিধর হও এবং অপরকে সেরূপ হতে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করা। সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চতম অবস্থার দিকে যাত্রাকেই গীতা ব্যাখ্যা করছে মানবিক উৎকর্ষ সাধনের দর্শন। এই পথে তোমাকে কখনো কখনো অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে লড়াই করে, সংগ্রাম করে—যেমন সংসারে হয়ে থাকে। তা না করলে তুমি তোমার নিজের ও সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতিসাধন করতে পারবে না। অশুভ শক্তি বৃদ্ধি পাবে, যদি বর্তমান অশুভ শক্তিকে বাধা না দাও। গীতা মানবজাতিকে ঐ অশুভ শক্তিকে দূর করতে উপদেশ দেয়।

গীতাকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণ মানবজাতিকে এক শিক্ষা দিতে চাইছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বলছেন, অর্জুনকে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বাস্তব যুদ্ধে নামতে হয়েছিল।

তোমাদের সামনে তেমন যুদ্ধ নেই, কিন্তু তোমার সামনে রয়েছে, তোমার জীবন-যুদ্ধ। এখানে নানা বিপদ আসবে, তার সামনা-সামনি হওয়ার আহ্বান আসবে। তুমি কি অর্জুনের মতো পালাতে চাইবে? না, তার মুখোমুখি হবে। এই বাণীই তিনি দিয়েছেন সমগ্র ভারতীয় তথা বিশ্বের সকল মানবজাতিকে। এই কাজে অশুভ যা কিছু আছে তার প্রতিরোধ করো। তুমি এমন কর্ম করো যাতে জগতের মঙ্গল ও একটু উন্নতি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'ফোঁস করবে, কিন্তু কামড়াবে না' ফোঁস করতে শেখো নচেৎ অশুভ শক্তি তোমাকে মেরে ফেলবে। আমরা অপরের ক্ষতি করব না কিন্তু অপরে যেন আবার আমাদের ক্ষতি না করে, তাই একটু ফোঁস চাই। নিজের আত্মবিশ্বাস থেকেই আমাদের অশুভ শক্তি প্রতিরোধ করতে হবে। নিজের বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে প্রতিকার চাই, সঙ্গে চাই সমাজের শান্তি, চাই মানবিকতা, প্রেম, অপরের জন্য উদ্বেগ এবং নিজের স্বধর্ম-সহায়ে অনাসক্ত হয়ে নিষ্কাম কর্ম করা যাতে জগতের মঙ্গল ও উন্নতি হয়। গীতা এইভাবে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে—কীভাবে আত্মোন্নতি করতে হয়, আত্মবিশ্বাস জাগাতে হয়, বাধা-বিপর্যয়ের সামনাসামনি হবার সামর্থ্য অর্জন করতে হয়, নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে হয়। সবশেষে চাই নিজের সবকিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করা।

অর্জুনের এই অবস্থা আমরা দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। তিনি ঠিক করেছেন, ঈশ্বরের সাকার রূপ অর্থাৎ মা-কালীকে কিছুতেই মানবেন না। কিন্তু মহামায়া তাঁকে কিছুতেই নিস্তার দেবেন না, তিনি ঠিক তাঁর নিজ স্বরূপ-সন্তানকে বুঝিয়ে দেবেন। বহু দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার পর মহামায়া তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসলেন। এখানে অর্জুন যেমন ভগবানকে বলছেন, 'শিষ্যস্তেহহং', আমি তোমার শিষ্য। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে—আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর তা নিশ্চিত করে বলুন। স্বামী বিবেকানন্দ সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হলেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ও তাঁর পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নিলেন এবং তাঁকে বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ওরে, আমি যে কারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখনও করতে পারি না, আমার মুখ দিয়ে যে ঐসব বার হয় না। তোকে বললুম, মায়ের কাছে যা চাইবি তাই পাবি, তুই তো চাইতে পারলি না। তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নেই, তা আমি কী করব বল?' নরেন্দ্রনাথ তবু বললেন, 'তা হবে না মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐ কথা মাকে বলতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আপনি বললেই তাদের আর দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।' ঐরূপে যখন নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই ছাড়লেন না, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না।' শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতে নরেন্দ্রনাথের পূর্ণ বিশ্বাস হলো। তাঁর মনের সকল সন্দেহ দূর হয়ে শান্ত হলো। মা কালীর মহিমা তিনি বুঝতে পারলেন। মন্দিরের মা সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর সম্পর্কে যা দেখেন ও বলেন

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ (দ্রুপদ রাজার দুই সন্তান, মহারথ শিখণ্ডী এবং কাশীরাজ) মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (এবং অজেয় সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন) বিরাটঃ চ (এবং রাজা বিরাট) দ্রৌপদেয়াঃ চ (ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) মহাবাহুঃ চ (ও মহাবীর) দ্রুপদঃ (রাজা দ্রুপদ) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু) সর্বশঃ (সকলে) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (পৃথক পৃথক ভাবে শঙ্খসকল বাজালেন)।

হে রাজন্, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু—এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন।

ধৃতরাষ্ট্র প্রথম থেকেই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, পাণ্ডবদের পরাজয় এবং দুর্যোধনের জয় নিশ্চিত। তাই সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে পাণ্ডব-পক্ষের কয়েকজন অজেয় মহাবীরদের নাম শুনিয়ে একটু সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পাণ্ডব-পক্ষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া রয়েছেন—মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী, আচার্য দ্রোণের মৃত্যুর কারণ দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যদুবংশের মহাবীর সত্যকের পুত্র সাত্যকি (প্রকৃত নাম যুযুধান), পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদ (অপর নাম যজ্ঞসেন এবং আচার্য দ্রোণের বাল্যকালের বন্ধু কিন্তু পরে শত্রুতে পরিণত হয়), দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের পুত্র সুতসোম, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকর্মা, নকুলের পুত্র শতানীক, সহদেবের পুত্র শ্রুতসেন এবং সুভদ্রার পুত্র মহাবাহু অভিমন্যু—এঁরা সকলেই প্রায় অপরাজেয় মহাবীর। অতএব ধৃতরাষ্ট্রের বুঝে নেওয়া উচিত দুর্যোধনের জয়লাভ অসম্ভব।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ।। ১৯

সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ঙ্কর) ঘোষ (শব্দ, শঙ্খধ্বনি) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনি পূর্ণ করে) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অর্থাৎ কৌরবদের) হৃদয়ানি (হৃদয় সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করল)।

সেই তুমুল শঙ্খের শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ও কৌরবপক্ষীয় সকলের হৃদয় যেন বিদীর্ণ করে তুলল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের সকল বীর ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি করে আকাশ-বাতাস ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলল। এই তুমুল শব্দে কৌরবদের হৃদ্‌কম্প হতে লাগল। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চাইছেন যে, যারা অসৎ পথে চলে তাদের এরকম হওয়া স্বাভাবিক। অসৎ পথের মানুষের পেছনে ভয় সর্বদা তাড়া করে। অপরদিকে পাণ্ডবদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রচুর। কারণ তাঁরা জানেন সর্বদা তাঁরা সৎ পথ অনুসরণ করেছেন, ধর্ম তাঁদের সহায় এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে আছেন।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।। ২০

মহীপতে (হে রাজন্) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডব (কপি-চিহ্নিত অর্থাৎ হনুমান-চিহ্নিত রথে আরূঢ় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধের জন্য উপস্থিত) দৃষ্ট্বা(দেখে) শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্র নিক্ষেপ করতে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হল) ধনুঃ উদ্যম (ধনু উত্তোলন করে) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (কৃষ্ণকে) ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (বললেন)।

হে রাজন্, তখন মহাবীর হনুমান ধ্বজরূপে অর্থাৎ রথে থেকে যাঁকে অনুগ্রহ করেছেন সেই কপিধ্বজ অর্জুন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের যুদ্ধে অবস্থিত দেখে শস্ত্র-নিক্ষেপে উদ্যত হয়ে ধনু উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন।

যুদ্ধের বিকল্প আর কিছুই রইল না। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাঁর বুদ্ধিদাতা ও সারথি হলেন স্বয়ং হৃষীকেশ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক এবং সকলের মনের বৃত্তি বুঝতে পারেন। অর্জুন ইন্দ্রিয়গুলির মতো শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাধীন। এই যুদ্ধে হৃষীকেশ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বদা অর্জুনের পাশে। ঈশ্বর যাদের সহায় তারা তো জয়ী হবেই। পাণ্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। কৌরবরা কিন্তু তা মানতে প্রস্তুত নয়। অহংকার মানুষকে অন্ধ করে, মোহযুক্ত করে। মহাবীর হনুমান রামচন্দ্রকে রাবণবংশ ধ্বংস করতে সহায়তা করেছিলেন। সেই বীর হনুমান অর্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট থেকে তাঁকে শত্রু নিধনে সাহায্য করছেন। অর্জুনের প্রার্থনায় বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান কথা দেন যে, তিনি অর্জুনের রথের ধ্বজায় অবস্থান করবেন এবং যুদ্ধের সময় সেখান থেকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হুংকার করে কৌরবসেনা ধ্বংস করবেন।

অর্জুন উবাচ
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।।২১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বললেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনাদলের মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন করুন)।

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন।

এরপর অর্জুন তাঁর রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, তাঁর রথকে এমন জায়গায় নিয়ে রাখে, যাতে তিনি দুই পক্ষের শক্তি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। অর্জুন সিংহের মতো সম্মুখ সমরে দাঁড়াতে চান এবং দেখতে চান দুর্যোধনের সঙ্গে

উদ্দেশেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ, হৃষীকেশ—এই বলে সম্বোধন করছেন।

ন যোৎস্যে—আমি যুদ্ধ করব না—এই বলে অর্জুন নীরব হয়ে রথের উপর বসে পড়লেন। বস্তুত এটি ঠিক জিজ্ঞাসু শিষ্যের উপযুক্ত ভাব। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করে তাঁর উপদেশ শ্রবণ করবার জন্য যুদ্ধ ত্যাগ করে শান্ত সমাহিত চিত্তে রথের উপর উপবিষ্ট হলেন। কারণ যুদ্ধ করা কর্তব্য, কি অকর্তব্য তা স্থির করতে না পেরেই তিনি গুরুর উপদেশ প্রার্থনা করছেন। তাঁর ঐরূপ করবার উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ না গুরুর উপদেশ তাঁর চিত্তের সংশয় দূর করছে ততক্ষণ তিনি যুদ্ধ করবেন না। শেষে দেখব শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করে যখন তাঁর মন থেকে সংশয় দূর হল তখন তিনি নিজেই বলছেন, 'আমার সংশয় দূর হয়েছে, তোমার আদেশ আমি পালন করব'।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ।।১০

ভারত (হে ভরতবংশে জাত, হে ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনাদলের মধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদকারী) তম্ (তাঁকে অর্থাৎ অর্জুনকে) প্রহসন্ ইব (ঈষৎ হাসতে হাসতে, যেন উপহাস করে) ইদং (এই) বচঃ (বাক্য) উবাচ (বললেন)।

হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুনের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যে বিষণ্ণচিত্ত অর্জুনকে হাসতে হাসতে এই কথা বললেন।

অর্জুন যুদ্ধ করবেন বলেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। কিন্তু এসে উভয় সেনাদলের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছেন—আমি আমার আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কয়েকটি শক্ত কথা বলে তাঁর রজোগুণের প্রকাশ ঘটাতে চাইলেন। ভৎর্সনাও করছেন অনুচিত আচরণের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে লজ্জাসমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছেন। লজ্জায় অর্জুনের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। অর্জুন যুদ্ধকে উপেক্ষা করলেও শ্রীকৃষ্ণ যে তা করেননি সেকথা বোঝাতেই তিনি অর্জুনকে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে প্রথমে তাঁর পুরুষকার জাগ্রত করতে চেষ্টা করছেন।

অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে বিষণ্ণচিত্তে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে হাসছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘোর যুদ্ধক্ষেত্রেও শান্ত সমাহিত। মধুর হাসিতে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল। মহাভারতে বহু জায়গায় পাওয়া যায়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেতেও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই হাসি উপহাসের হাসি নয় কারণ অর্জুন এখন তাঁর শরণাগত এবং তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য আগ্রহী। অতএব এই সময় ভগবান উপহাসের হাসি হাসতে পারেন না, বরঞ্চ এই হাসি স্বতঃস্ফূর্ত অনির্বচনীয় দিব্য হাসি। ভগবান এখানে আনন্দে হাসছেন, তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন কারণ অর্জুন ভগবানের পরম শিষ্যরূপে তাঁর উপদেশমতো কর্ম

করতে আগ্রহী হয়েছে।

এই দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বর্তমানযুগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন-দৃশ্যের। নরেন্দ্রনাথও যখন অনেক তর্ক ও লড়াইয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন, জগন্মাতা মাকালীর শরণাগত হলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণও ঐরূপ খুশীতে হেসেছিলেন। ঘটনাটি এরূপ—নরেন্দ্রনাথ কিছুতেই মূর্তিপূজা ও মা কালীকে মানবেন না। মা কালীর অবতার শ্রীরামকৃষ্ণকেও মানতে নারাজ। মহামায়া তাঁকে সংসারে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট দিতে লাগলেন কিন্তু নিজের পুরুষকারে বলীয়ান নরেন্দ্রনাথ মহামায়ার কাছে হার মানতে নারাজ। শেষে নরেন্দ্রনাথ হার স্বীকার করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন এই সংসারে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সবই মহামায়ার হাতে। আমরা সবাই মহামায়ার হাতের পুতুল। তখন তিনি ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ, আমি মাকে তোর দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছি কিন্তু মা বললেন—''ও আমাকে মানে না''। তুই মাকে মানিস না বলে তোর এত দুঃখ-কষ্ট। যা আজ মায়ের কাছে যা। মাকে যা চাইবি তাই দেবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে নরেন্দ্রনাথ মাকালীর মন্দিরে উপস্থিত হলেন। নরেন্দ্রনাথ সত্যিই দেখলেন—মা মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ীদেবী সাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে বিরাজ করছেন। তিনি মায়ের কাছে শুধু চাইলেন জ্ঞান,ভক্তি ও বিবেক-বৈরাগ্য। মন্দির থেকে ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, তিনি যেন তাঁর গর্ভধারিণী মা, ভাইদের অন্নকষ্ট দূর করে দেন। কারণ নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মা কালী স্বয়ং ঐ নর দেহে লীলা করছেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন, 'মহাশয়, আমায় মায়ের নাম শিখিয়ে দিন।' ঠাকুর তাঁকে একটা গান শিখিয়ে দিলেন—'আমার মা ত্বং হি তারা'। নরেন্দ্রনাথ এই গান সারা রাত ধরে গাইতে লাগলেন। সেইদিন থেকে নরেন্দ্রনাথ মা কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়কেই মানলেন। নরেন্দ্রনাথ যখন মা কালীকে মানলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব আনন্দ। তিনি পরের দিন আগত সকল ভক্তদের কাছে সেই আনন্দের কথা হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—নরেন কালী মেনেছে। এখানেও সেইরূপ অপূর্ব দৃশ্য—ভগবানের উপদেশ শ্রবণের জন্য অর্জুন তাঁর সখা, বন্ধু প্রভৃতি ভাব ত্যাগ করে শিষ্যভাব গ্রহণ করলেন। ভগবানের নিকট শরণাগত হলেন। তাই ভগবান এখানে উপহাসের হাসি হাসতে পারেন না বরঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ এখানে অনির্বচনীয় দিব্য হাসি হাসছেন।

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ।।১১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন)—ত্বম্ অশোচ্যান্ (তুমি যাদের জন্য শোক করা

আপনি এইরূপ জ্ঞাতিগণের প্রতি বিদ্বেষ দূর করুন। সঞ্জয় বলছেন, অর্জুন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, দুই পক্ষের মাঝখানে রথ নিয়ে যেতে। শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথকে স্থাপন করে অর্জুনকে বলছেন, 'হে পার্থ, সমবেত কৌরবদের তুমি ভাল করে দেখে নাও।' এখানে অর্জুন যে শুধু কৌরবদের সেনা ভাল করে দর্শন করতে চাইছেন তা নয়। অর্জুন যে-সকল গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তিনি তাঁর রথকে দুই সেনাদলের মধ্যে স্থাপন করলেন।

অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সখা ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। অর্জুন আদেশ করছেন এবং ভগবান আদেশ পালন করছেন। অনেক ভক্ত অর্জুনের এই কর্মকে যথাযথ মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা রাম-ভক্ত হনুমানের ভাবটি অনেক বেশি পছন্দ করেন। তাঁদের কাছে ভগবানের আদেশ ও ইচ্ছাই প্রথম ও শেষ কথা। তাই আমরা সারা ভারতে অজস্র রাম-ভক্ত হনুমানের মন্দির ও পূজা দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ রাম-ভক্ত হনুমান-চরিত্র জীবনে প্রকাশ করতে চায়। হনুমান-চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধার মন্দির এবং পূজা অজস্র দেখা যায় কিন্তু অর্জুনের মন্দির কম দেখা যায়।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ।। ২৬

তত্র পার্থঃ (সেখানে অর্জুন) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (উভয় সেনাদলের মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন্ (পিতৃব্যদের) পিতামহান্, আচার্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (ভীষ্ম—পিতামহগণ, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য—আচার্যগণ, পুরুজিৎ শল্যাদি—মাতুলগণ, ভীম-দুর্যোধনাদি—ভ্রাতৃগণ, অভিমন্যু—পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং অশ্বত্থামাদি—বন্ধুগণ) শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব (দ্রুপদ ইত্যাদি—শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি--মিত্রগণকে) অপশ্যৎ (দেখলেন)।

সেখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে) অর্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে অবস্থিত পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও বন্ধুগণদের উপস্থিত দেখলেন।

সমগ্র যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে এইটিই ছিল সঙ্কট-সঙ্কুল মুহূর্ত। শুধু অর্জুন নয় অপর পক্ষে ভীষ্ম ও দ্রোণ এঁদেরও একই অবস্থা। নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁরাও উপস্থিত। সংসারের এই ভয়ঙ্কর চিত্র। সুখ-শান্তির সঙ্গে প্রচণ্ড দুঃখও রয়েছে। সংসারে দু-একজনের প্রবৃত্তির দোষে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং অপর সকলের ইচ্ছা না থাকলেও এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ।।২৭

সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্ (অবস্থিত যুদ্ধের জন্য) তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ (সেই সমস্ত বন্ধুজনকে) সমীক্ষ্য (দেখে) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপায় অভিভূত হয়ে) বিষীদন্ (বিষণ্ণ চিত্তে) ইদম্ অব্রবীৎ (এই কথা বললেন)।

কুন্তীপুত্র অর্জুন সেইসব বন্ধুবান্ধবদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অত্যন্ত পরম করুণায় অভিভূত হয়ে দুঃখিত ব্যথিত চিত্তে এই কথা বললেন।

অর্জুন চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সবাই তাঁর আত্মীয়-স্বজন। কাউকে শত্রু বলে ভাবতে পারলেন না। যেমন পাণ্ডব, তেমন কৌরব—উভয় পক্ষই তাঁর আত্মীয়-স্বজনে ভরা। এঁদের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে—এই ভেবে তিনি গভীর দুঃখে বিচলিত হলেন। অর্জুনকে এক অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ পরিস্থিতির সামনা-সামনি হতে হলো। সংসারে এইরূপ গৃহযুদ্ধের সময় মানুষ ঈর্ষা, হিংসা ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

অর্জুন ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে মহাদুঃখ প্রকাশ করছেন। অর্জুনের মহাদুঃখ অর্থাৎ বিষাদ প্রকাশ হচ্ছে। তাই এই অধ্যায়কে *বিষাদযোগ* বলা হয়। মানুষের অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই এই মহাশোক বা বিষাদ উপস্থিত হয়। এই বিষাদ আবার যোগ হয় কারণ—সেই বিষাদ থেকেই কর্মের ও ধর্মের বিচার শুরু হয়। তখন সেই অশুভ কর্ম বা প্রবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে হলে চাই সৎ উপদেশ। অহংকারের মোহে বিবেক আচ্ছন্ন থাকে বলেই সঠিক বিচার হয় না। তাই শাস্ত্র, গুরু বা আচার্যের উপদেশ তখন সঠিক পথ অর্থাৎ শুভ কর্ম বা প্রবৃত্তির সন্ধান দেয়। তাই এই অধ্যায়টি যোগ অর্থাৎ অর্জুন-বিষাদযোগ বলা হয়। ভগবান স্বয়ং অর্জুনের মহাবিষাদ দূর করবার জন্য উপদেশ করবেন সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে।

অর্জুন উবাচ
দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ।। ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ।। ২৯

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন)—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) সমবস্থিতান্ (সমবেত) ইমান্ স্বজনান্ (এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধ-অভিলাষী) দৃষ্ট্বা (দেখে) মম গাত্রাণি সীদন্তি (আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে) মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি (মুখও শুষ্ক হচ্ছে) মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ জায়তে (শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হচ্ছে) হস্তাৎ (হাত হতে) গাণ্ডীবং স্রংসতে (খসে পড়ছে) ত্বক্ এব চ (এবং ত্বক্ অর্থাৎ গা যেন) পরিদহ্যতে (জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে)।

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধকামী স্বজনদের সামনে উপস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে, মুখও শুকিয়ে যাচ্ছে, সর্বাঙ্গে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে, হাত থেকে

ভীষ্ম একজন গঙ্গার পুত্র 'গাঙ্গেয়' রূপে পরিচিত, কিন্তু এই নৃপতিগণও এক-একটি দেহ ধারণ করেছেন কিন্তু এঁরা এই দেহ ধারণের পূর্বে অন্য অবস্থায় ছিলেন এবং এঁদের দেহ ধ্বংস হলেও ভবিষ্যতে এঁরা আত্মারূপে থাকবেন কারণ আত্মা নিত্য।

বস্তুত আমাদের সত্তার মধ্যে রয়েছে এক শাশ্বত আত্মতত্ত্ব। শরীর আসে যায়, আত্মা থেকে যায়। তাই মৃত্যু হলে আমরা বলি, দেহত্যাগ হয়েছে, শরীর ছেড়ে দিয়েছে। আমি আত্মা, আমার একটি শরীর আছে, আমি তা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে এইরকম বলে থাকি। এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আমরা সবাই অতীতে ছিলাম, বর্তমানে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। আমরা থাকব না—এমনটি কখনো হয় না। আমরা মরণহীন আত্মা। ভারতের সনাতনধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকে—মানবসত্তা মূলত ঐশ্বরিক, আমাদের আত্মা দিব্য ও অমৃত। আমরা সকলেই অমৃতস্য পুত্রাঃ। কাল 'পূর্বে আমি ছিলাম না, তুমি ছিলে না, এই সব নৃপতিরা ছিলেন না, এমন নয়— পরে আমরা থাকব না, এমনও না। আমরা সর্বদাই আত্মারূপে রয়েছি।

ভগবান গীতাতে বলছেন—যুদ্ধক্ষেত্রেও জ্ঞানের সাধন করা যায়। দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম সাধন হয় না। সংগ্রামের মধ্যেই ধর্ম সাধন হয়। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—তুমি বলছ, 'আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করা উচিত, অর্জুন, তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছ, কিন্তু তুমি নিজে তো জ্ঞানী নও, অত্যন্ত কাপুরুষ।' তাই জ্ঞানী বলেন, জলে থেকেও যেমন পদ্মপত্র জলদ্বারা সিক্ত হয় না, জীবাত্মাও তেমনি এই সংসারে দেহ ধারণ করে অনাসক্ত হয়ে থাকবে। সংসার যুদ্ধক্ষেত্র—এখান হতেই মুক্তির পথ খুঁজবে। সংসারে এই জীবনধারণ একটা ঈশ্বরলাভের প্রয়াস মাত্র। জ্ঞাতসারে আমাদের বুদ্ধিকে নির্দিষ্ট করে, ত্যাগের বলে বলীয়ান প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীবনকে গড়ে তুলতে হবে ও আত্মাকে জানতে হবে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।।১৩

যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) কৌমারং (কৌমার) যৌবনং (যৌবন) জরা (বার্ধক্য) তথা (সেরূপ) দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ (অন্য দেহ গ্রহণও) তত্র (তাতে) ধীরঃ (জ্ঞানী) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না)।

জীবের এই স্থূল দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাতে দেহীর (আত্মার) কোনও পরিবর্তন হয় না, সেরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিতে (মৃত্যুতে) দেহী অবিকৃত থাকেন। এইজন্য দেহান্তর-প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না।

প্রতিটি মানুষকেই বাল্য, যৌবন আর বার্ধক্য—এই তিন অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক দেহধারী ব্যক্তিকে কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, এর কোনও ব্যতিক্রম হয় না। আমি প্রথমে শিশু ছিলাম, তারপরে যুবক হলাম। ক্রমে

বৃদ্ধ। সব অবস্থাতেই আমি (অর্থাৎ আত্মা) কিন্তু বরাবর একই আছি। আমার রূপটা বদলেছে মাত্র। একদিন এই রূপও থাকবে না। আমার মৃত্যু হবে। মৃত্যু অর্থাৎ দেহের নাশ হবে। বেদান্তে একটা সুন্দর উপমা আছে। একতাল মাটি ছিল। কুমোর তা দিয়ে একটা হাঁড়ি করল। হাঁড়িটা আগে ছিল না, এখন হল। তারপর হাঁড়িটা ভেঙে গেল। আসলে মাটির ওপরে একটা নাম-রূপ আরোপ করা হয়েছিল। তার নাশ হল। কিন্তু মাটি মাটিই রয়ে গেল। আত্মাও ঠিক তাই। এই দেহ আত্মার ওপর আরোপিত। দেহের নাশ হয়। কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়।

প্রশ্ন হল, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়? বলছেন, 'দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ'। একটা দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে চলে যায়। এ যেন জলৌকা। জলৌকা অর্থাৎ জোঁক যেমন গাছের এক পাতা থেকে অন্য পাতায় যায়। আত্মাও তেমনি এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে প্রবেশ করে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা জানেন দেহ অনিত্য, আত্মাই একমাত্র নিত্য। তাই দেহের মৃত্যুতে তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।

মৃত্যু ও পুনর্জন্ম প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন-পরিক্রমার অঙ্গ। এতে জ্ঞানী ব্যক্তি বিভ্রান্ত হন না। মানুষের ক্রমবিকাশ চলছে নূতন নূতন দেহের মাধ্যমে। পুনর্জন্ম—সনাতনধর্মের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মানুষ জন্মের পর জন্ম লাভ করে থাকে, যতদিন না অধ্যাত্মজ্ঞানের আগুনে তার নিজ কর্মের ফলগুলি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—যতদিন স্বীয় অন্তরে নিহিত অমর আত্মা—সত্যকে উপলব্ধি করে। তাই সনাতনধর্ম বলে—এই শরীরের সাহায্যে আধ্যাত্মিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে শরীরের জন্ম-মৃত্যুকে বন্ধ করো। নচেৎ শরীর কোনও না কোনও রূপে দেহধারণ করবে। শাস্ত্র বলে মানবদেহধারণ করা কেবল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্য নয়। তার জন্য পশুদেহ আরও উপযুক্ত। মানব দেহধারণ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জ্ঞান পরা ও অপরা দুইই চাই। তাই শাস্ত্র বলে চরম সত্য উপলব্ধি করো, দগ্ধ করে ফেলো তোমার সকল কর্মফল, তারপর তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই তুমি মুক্ত।

শাস্ত্রে ঋষিগণ বলেন, মানবদেহ ইন্দ্রিয়যুক্ত, স্থূলশরীরের গভীরতম প্রদেশে রয়েছে সূক্ষ্মশরীর। তাঁরা বলেন, মৃত্যু কেবল স্থূলশরীরেরই হয়, সূক্ষ্মশরীরের মৃত্যু নেই, কারণ তার পেছনে রয়েছে কারণশরীর বা আত্মা—তা সর্বদাই বিদ্যমান, চিরনিত্য। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীর আর একটি স্থূলশরীর আশ্রয় করে। অতীত জীবনের ঘটনাবলী ভুলে গিয়ে প্রকৃত সত্যস্বরূপ আত্মার অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য। সনাতনধর্ম এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে এবং একে বলে দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। অতএব 'ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি'—মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তনে ধীর, জ্ঞানী ও বীর ব্যক্তিগণ মোহগ্রস্ত হন না। ধীর ব্যক্তি স্থূল দেহের এই পরিবর্তন সত্ত্বেও জানেন যে তিনি এক ব্যক্তিই আছেন। স্থূল, দেহের পরিবর্তন

ভগবান শ্রীহরি পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন বলে দেবতাগণ তাঁকে গোবিন্দ নামে স্তব করেন। আবার যিনি 'গো' ইন্দ্রিয় সকল 'বিন্দতি' পালন করেন, তিনি গোবিন্দ। মানব, দেবগণ ও মুনিগণ সকলে তাঁকে গোবিন্দ বলে স্তব করেন।

যুদ্ধ এমন একটি বিষয় যা মানুষকে উদ্দীপিত করে। যুদ্ধে সমগ্র পরিবার উপস্থিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে মোট আঠারো অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ করেছিল—কুরু ও পাণ্ডবপক্ষে যথাক্রমে এগারো ও সাত অক্ষৌহিণী। একটা দেশের মধ্যে এমন ভীষণ যুদ্ধ পূর্বে আর হয়নি, অবশ্য আধুনিক বিশ্বযুদ্ধের কথা ধরছি না। যুদ্ধের লক্ষ্যই তো প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা। অর্জুন বড় যোদ্ধা, শৌর্যে, বীর্যে উদ্যমে ভরপুর হয়ে এসেছেন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে পেয়েছেন। তাই অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ বলে সম্বোধন করছেন। তবুও অর্জুন বিষাদগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত হয়েছেন।

যতক্ষণ পরিবার, আত্মীয়-স্বজন থাকে ততক্ষণ ভোগ-সুখ কামনাগুলিও থাকে। পরিবারদের নিয়েই ভোগ-সুখ। তাই অর্জুনের যুক্তি হচ্ছে, এই যে ভোগ-সুখ যুদ্ধে চেয়েছিলাম, কিন্তু কাদের জন্য চেয়েছিলাম? যাঁদের নিয়ে এই ভোগ-সুখ তাঁরাই যখন যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে তবে আমি কাকে বধ করব এবং আর কাদের নিয়েই বা রাজ্য ঐশ্বর্য্য সুখ ভোগ করব? অর্জুনের লক্ষ্যই ছিল যুদ্ধ জয় অর্থাৎ হস্তিনাপুর লাভ করে ভোগ-সুখ লাভ। কিন্তু ভগবান অর্জুনের লক্ষ্যের মোড় ফিরিয়ে দিতে চান—আত্মাকে জানা অর্থাৎ সত্যকে জানাই জীবনের লক্ষ্য।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।।৩৪

মধুসূদন (হে মধুসূদন) ঘ্নতঃ অপি (আমাকে হত্যা করলেও) ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই তিন লোকের) হেতোঃ অপি (হেতুও) এতান্ (এঁদের) হন্তুং (হত্যা করতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) মহীকৃতে (কেবল মাত্র পৃথিবীর জন্য) কিং নু (কী কথা)?

হে মধুসূদন (মধু নামক অসুরকে হত্যা করেছিলেন), এঁরা সবাই আমার অতি প্রিয়জন। আমাদের এঁরা বধ করলেও ত্রৈলোক্যরাজের জন্যেও এঁদের হত্যা করতে আমি ইচ্ছা করি না, শুধু পৃথিবীমাত্র রাজ্যের জন্য কী কথা?

অর্জুনের যুক্তি—কৌরবরা যতই অন্যায় করুক, দুর্যোধন তাঁদের ভাই। তাঁকে কোনও অবস্থাতেই পাণ্ডবরা আঘাত করতে পারেন না। এইভাবে অর্জুনের মন দুর্বল তমোভাবে আচ্ছাদিত। সেই অবস্থা থেকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে দেখাতে চান, তিনি যেন সত্ত্বগুণের আচরণ করতে চাইছেন। ফলে এই তামসিক পরিস্থিতির মধ্যে এক মোহাচ্ছন্ন আবেগে আবিষ্ট হয়ে অর্জুন মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি সরে যাবেন। অর্জুনের

চিন্তা—সংসারে কিছু লাভ হলে তা এঁদের সঙ্গে নিয়ে ভোগ করা উচিত। তাতে সকলেই সুখী হবে। এঁদের হত্যা করলে কাদের নিয়ে এই সুখ ভোগ করবেন? অর্জুন আত্মীয়-স্বজনের অনুরাগে ব্যাকুল, তাঁর যুক্তি—একা কেউ রাজ্যভোগ করতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই রাজ্যভোগ করে থাকে। তাঁরাই যখন যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, তখন আর রাজ্য লাভের কী প্রয়োজন?

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।।৩৫

জনার্দন (হে জনার্দন, শ্রীকৃষ্ণ) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) নিহত্য (হত্যা করে) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কী সুখ হবে ?) এতান্ (এই সব) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে) হত্বা (বধ করে) অস্মান্ (আমাদের) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করবে অর্থাৎ পাপ হবে)।

হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করলে আমাদের কী সুখ হবে? যদিও এরা আততায়ী তবু এদের হত্যা করলেই অবশ্যই আমাদের পাপ আশ্রয় করবে।

আততায়ী বলতে বোঝায় 'অগ্নিদো গরদশ্চৈব পাণির্ধনাপহঃ, ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ' (বশিষ্ঠ-সংহিতা) অর্থাৎ অগ্নিদ—যে ঘরে আগুন দেয়, গরদ—খাদ্যে যে বিষ দেয়, বধের জন্য অস্ত্রধারী, ধন-অপহারী, ভূমি-অপহারী, স্ত্রীহরণকারী—এই ছয় জন আততায়ী। মনু বলছেন, আততায়ীকে নিকটে আসতে দেখলে কোনও বিচার না করে তাকে হত্যা করবে। দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গিগণ প্রায় এ সমস্ত কর্ম—জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা, ধন, গো ও রাজ্য হরণ, দ্রৌপদীর অপমান ইত্যাদি পাপ করেছেন--তাই তাঁরা আততায়ী। তথাপি অর্জুন বলছেন তাঁদের বধ করলে পাপ হবে।

মনু বা নীতিশাস্ত্রমতে আততায়ী বধে কোন পাপ নাই। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রমতে ক্ষমাই ধর্ম। 'ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি'—সর্বভূতের হিংসা করবে না। অহিংসা পরম ধর্ম, গুরুজনাদি অবধ্য—সেইজন্য অর্জুন কৌরবদের ক্ষমা করতে চান। নীতিশাস্ত্রের চেয়ে ধর্মশাস্ত্র বলবৎ। সুতরাং আততায়ী হলেও গুরুজনদের বধ করলে পাপের ভাগী হতে হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে অর্জুন যুদ্ধ থেকে বিরত হতে চান।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।৩৬

তস্মাৎ (সেই হেতু) সবান্ধবান্ (সবান্ধব) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের) বয়ং (আমরা) হন্তুং ন অর্হাঃ(হত্যা করতে পারি না) হি (যেহেতু) মাধব (হে মাধব, শ্রীকৃষ্ণ) স্বজনং (স্বজনকে) হত্বা (হত্যা করে) কথং সুখিনঃ স্যাম (কীভাবে সুখী হব আমরা)?

যাবে। সহ্য করার জন্য আমাদের মনে শক্তি চাই। তাই ভগবান বলছেন, দুর্বল হয়ো না। জীবনে নানা পরিবর্তনের, ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হতে হয়। জীবনের সবটাই খেলা বা সুখভোগ নয়, প্রায়ই দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে। তাই স্বামীজী বলছেন, লৌহের মতো শরীর, ইস্পাতের মতো স্নায়ু এবং বজ্রের মতো মন চাই। শরীর ও মনকে কখনও দুর্বল করা যাবে না।

ভগবান বারবার বলছেন, মনের শক্তি চাই এবং তার জন্য চাই সংযম। ইন্দ্রিয়সংযম না থাকলে সাধুতা ও নৈতিক উৎকর্ষতা সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে। তাই সহ্য চাই। সমুদ্রে সাঁতার দেবার সময় যেমন ঢেউয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় তেমনি সংসারে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদি মন শক্ত হয় তখন কোন সমস্যায় ভেঙে পড়ে না, তখন সে বলে—আমি সহ্য করব, এই বাধা কাটিয়ে উঠব। একেই বলে আত্ম-শ্রদ্ধা—আত্মবিশ্বাস। যদি আমরা সকলে তিতিক্ষা পালন করি তবে আমরা আত্ম-শ্রদ্ধার অধিকারী হব। বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলছে—সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতীকারপূর্বকম্। চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে—'কোনও উদ্বেগ ও ক্রন্দন রহিত হয়ে, কোনওরূপ প্রতিরোধের ইচ্ছা রহিত হয়ে—স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী সর্বদুঃখ সহ্য করাকেই বলে তিতিক্ষা। মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য চাই। এই উপেক্ষা করার পদ্ধতি হল—

১. ইন্দ্রিয়ের ধর্ম—বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ-দুঃখ অনুভব—কাজেই সহ্য করা।

২. এই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি মনেই আবদ্ধ থাকে, আত্মাকে স্পর্শ করে না কাজেই দুঃখকে তুচ্ছ অনিত্য বলে সহ্য করা।

৩. এই সকল সুখ-দুঃখ ক্ষণিক অনুভব—এই মুহূর্তে সুখ অনুভব হচ্ছে, এই মুহূর্তে দুঃখ অনুভব— ক্ষণিক অনুভব, কাজেই সহ্য করা।

৪. সুখ-দুঃখ সহ্য করলেই তাদের অনুভূতির তীব্রতা কমে যায়—কাজেই সহ্য করা, বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

এই তিতিক্ষা তখনই সম্ভব যখন মানসিক শক্তি বা মনোবল ও ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাসে কোনও ব্যক্তি পারদর্শী। আত্মসংযম না থাকলে সাধুতা ও নৈতিক উৎকর্ষতা জীবনে সম্ভব নয়। তাই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চাই উচ্চ চরিত্রবল।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫

পুরুষ-র্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) হি (যেহেতু) এতে (এই সকল, শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (দুঃখে ও সুখে সমভাবাপন্ন) যং (যাকে) ধীরং (জ্ঞানী, ধীর) পুরুষং (ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (অমৃতত্বলাভে) কল্পতে (অধিকারী হন)।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি এইসকল বিষয়স্পর্শ-জনিত সুখ-দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, এবং তাতে কখনও বিচলিত হন না, সেই ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ অমৃতত্বলাভের (মোক্ষলাভে) যোগ্য অধিকারী।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে বলছেন, 'পুরুষর্ষভ', পুরুষশ্রেষ্ঠ। তাছাড়া অর্জুন সমস্ত গুণের অধিকারী। পুরুষ কথার অর্থ হচ্ছে 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি'—যিনি স্বয়ং-প্রকাশ। একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোকে দেখবার জন্য অপর আলোর প্রয়োজন হয় না। শুধু তাই নয় ঐ আলোতে তার চারপাশও আলোকিত হয়। সূর্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হয়েও জগতের বাহ্যদোষে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সর্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্যদুঃখে লিপ্ত হয় না।

এই স্বয়ং-প্রকাশ পুরুষ বলতে আত্মাকেই বোঝানো হয়েছে। আত্মা পরমানন্দস্বরূপ। তাই 'ঋষভ'। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার আত্মা সর্বব্যাপী—সকল দেহের মধ্যে, সমস্ত জগতের মধ্যে, সমগ্র ভূমণ্ডলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অন্তঃকরণের ক্রিয়া সুখ-দুঃখ, আত্মার নয়। অনেকে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলে মনে করে থাকে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা শরীররূপ অষ্টপুরে বাস করেন, তাই তাঁকে 'পুরুষ'বলা হয়। অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের ক্রিয়া ও ধর্ম ভ্রমবশত আত্মাতে আরোপিত হয়ে থাকে।

আমাদের শরীররূপ অষ্টপুর হল—১. কর্মেন্দ্রিয়—(বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ) ২. জ্ঞানেন্দ্রিয়—(শ্রোত্র, নেত্র, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক), ৩. অন্তঃকরণ—(মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার), ৪. প্রাণ—(প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), ৫. ভূত—(ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম) ৬. কাম, ৭. কর্ম, ৮. তমঃ (অবিদ্যা)।

আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন—আমাদের শরীর—প্রথমতঃ স্থূলদেহ, তার পেছনে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধির পশ্চাতে রয়েছেন আত্মা। সেইরূপ এই বিশ্বপ্রকৃতির সমষ্টি মনকে মহৎ বলা হয়। মহৎ—আকাশ ও প্রাণ এই দুইরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আকাশ ও প্রাণ থেকে এই স্থূল পঞ্চভূতের প্রকাশ। আর সেই সমষ্টি মনের পশ্চাতে যে আত্মা রয়েছেন তাঁকে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলা হয়।

এই আত্মা আমাদের শরীর হতে পৃথক এবং মন হতেও পৃথক। এখানে একটু ধর্মজগতে মতভেদ দেখা যায়—দ্বৈতবাদীগণ বলেন—আত্মা সগুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ এবং ভোগের সব অনুভূতিই আত্মার ধর্ম। অদ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা নির্গুণ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ অন্তকরণ মনের ধর্ম, আত্মা নির্লিপ্ত।

অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, তাঁর জন্ম নেই, আবার মৃত্যুও নেই। তিনি দেহ থেকে পৃথক এক সত্তা—আত্মা। দেহের কষ্ট থাকতেই পারে। জরা, ব্যাধি, বার্ধক্য এসবও আসবে। হয়তো মৃত্যুও আসন্ন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সবেতেই নির্বিকার। উদাসীন। জ্ঞানী ব্যক্তি অসাধারণ সহ্যশক্তি ও সন্তোষ লাভ করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলছেন, 'সন্তোষের

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) অধর্ম অভিভবাৎ (অধর্মের প্রভাবে অর্থাৎ অধর্মে লিপ্ত হলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (দুষ্টা হয়) স্ত্রীষু (স্ত্রীলোকগণ) দুষ্টাসু (দুষ্টা হলে) বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশজ কৃষ্ণ) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে (বর্ণের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়)।

হে কৃষ্ণ, কুল অধর্মে অভিভূত হলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

বর্ণসঙ্কর—বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন সন্তান। মনুসংহিতানুসারে বর্ণের ব্যভিচার, অবেদ্যা-বেদন অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহ ও স্বকর্মত্যাগ—এই তিন কারণে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। (ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা-বেদনেন চ। স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। মনু-১০-২৪)

মূলত অর্জুন বলতে চাইছেন, যুদ্ধের ফলে সমাজে নানা অশুভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ধর্মের কাঠামো ভেঙে যাবে। যার যেমন খুশি চলবে। তাই এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেকে অর্জুন সরে যেতে বলছেন। অর্জুনের যুক্তি—প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক সমাজ—ধর্মসম্বন্ধে সবার সচেতন থাকা দরকার। কোনও অবস্থাতেই যা সত্য ও ন্যায়—তার থেকে যেন বিচ্যুত না হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ।।৪১

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকারীদের) কুলস্য চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের জন্যই হয়) হি (যেহেতু) এষাং (এদের) লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণ-বিরহিত) পিতরঃ (পিতৃপিতামহগণ) পতন্তি (পতিত হন অর্থাৎ নরকগামী হন)।

বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ কুলের সংমিশ্রণ হলে কুলনাশকারীগণ নরকগামী হন। শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাঁদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হন।

সমাজে বর্ণসঙ্কর নিষিদ্ধ। ('আনুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম সব বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।।—নারদসংহিতা-১২-১০২) 'নারদসংহিতা' মতে অনুলোমক্রমে বিবাহ—উত্তম বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পুরুষ অধম বর্ণের অর্থাৎ অব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ—উত্তম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা অধম বর্ণের অর্থাৎ অব্রাহ্মণ পুরুষকে বিবাহ করলে—এরূপ বিবাহ বর্ণসঙ্কর। এই বিবাহের ফলে যেসব পুত্রাদি হবে, তাদের পিতৃশ্রাদ্ধে ও পিণ্ডদানের অধিকার থাকে না। 'স্মৃতিশাস্ত্র' মতে প্রেতের উদ্দেশে জলদানকে উদকক্রিয়া বলে। প্রেত-পিণ্ডদানের পর জীব কর্মানুযায়ী সূক্ষ্ম ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী তার স্থূলশরীর গঠিত হয়। অতএব বংশ না থাকলে লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া হওয়ায় ঊর্ধ্বগতি হয় না, পরন্তু অধঃগতি হয়।

মৃত পিতৃপুরুষ ও অন্যান্যদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমরা শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির দ্বারা তাঁদের

বা নাশ নেই, তত্ত্বদর্শিগণ অর্থাৎ জ্ঞানীরা সৎ ও অসৎ এই উভয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

ভগবান এই শ্লোকে অর্জুনের ও আমাদের আশঙ্কা দূর করতে চাইছেন—প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হলেই সংসারে সৎ ও অসৎ ভ্রম দূর করা সম্ভব। অন্যথায় আমাদের মনে হতে পারে, যদি সৎস্বরূপ আত্মা এক হয়, তবে ঐ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সৎ এবং এই সংসারে বিদ্যমান সুখ-দুঃখ-শীত-উষ্ণ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। জ্ঞানের কোনও প্রয়োজনই নেই—ইত্যাদি মনে হতে পারে।

এই শ্লোকে সৎ ও অসৎ পদার্থের স্বরূপ নির্দেশ করে তাদের পার্থক্য প্রদর্শন করা হয়েছে। একমাত্র আত্মাই সৎ পদার্থ। এই দৃশ্যমান জগৎই অসৎ। যা অনিত্য, চঞ্চল এবং বিনাশধর্মী তাই অসৎ। অসৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। অসৎ পদার্থের প্রকৃত ভাব বা সত্তা নাই। আত্মা নিত্য, অবিকারী, সর্বদা একরূপ।

সৎ মানে সত্য—যা চিরকাল আছে। অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। অর্থাৎ যা নিত্য। আর অসৎ মানে যা চিরস্থায়ী নয়। অনিত্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিত্য ও অনিত্যের পার্থক্য বোঝাচ্ছেন। বলছেনঃ 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'—যা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য তা আবার থাকে কী করে? যেমন শশশৃঙ্গ—খরগোশের শিং। খরগোশ তার কোনও শিং নেই। তার খাড়া কান দুটো-দেখে শিং মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে মিথ্যা। বেদান্তে রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত দেয়। অন্ধকারে দড়িকে দেখে সাপ মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে মিথ্যা। এটা ক্ষণিক ভ্রম। মুহূর্তের জন্য আমাদের ভ্রম হয় তাই অন্ধকারে সাপ মনে হয়।

যা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় বেদান্ত তাকেই অসৎ বা মিথ্যা বলে। জগতের সকল বস্তুকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে থাকি, তা সদা পরিবর্তনশীল, তাই মিথ্যা। যা আদিতে নেই, অন্তে নেই, তা বর্তমানেও নেই, তাকে বর্তমানে সত্য মনে হলেও মিথ্যা। সুতরাং আমরা সেই অনন্ত অমর সত্যের উদ্দেশেই সৎ কথাটি ব্যবহার করি, আর এই মরণশীল বিশ্বের উদ্দেশেই অসৎ কথাটি ব্যবহৃত হয়। জগতে কেবল একটি সত্যই আছে। আমরা তাঁকে ব্রহ্ম বা আত্মা বলে থাকি। বেদান্তের ভাষায় তিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আমার সেই শুদ্ধ চৈতন্যের উপর এই জগৎ-ভ্রম উৎপন্ন হয়। এই জড় জগৎ— স্থূলজড়, সূক্ষ্মজড় ও অতি সূক্ষ্মজড় পদার্থরূপে দেখা যায়। যা সৎ, তা সদাই বিদ্যমান। আর যা অসৎ তার অস্তিত্ব নেই।

ভগবান বলছেন, 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' আবার যা সৎ তা ভবিষ্যতে থাকবে না, এ হতে পারে না। যা নিত্য তা চিরকালই বিদ্যমান থাকবে। সৎ বস্তুর নাশ বা অভাব নেই। যা নিত্য তা সৎ এবং তাই আত্মা। তার থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব হয়েছে। পূর্বে বীজাকারে ছিল, বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শুধু নাম ও রূপে

বহু দেখাচ্ছে। সৎ ও অসৎ বস্তুর বিচারের পর বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যখন অবগত হব তখন বোঝা যাবে যে এক সৎ বস্তুর স্বরূপ। বহু দর্শন অজ্ঞতা। যা সৎ অর্থাৎ নিত্য তা ত্রিকাল-অবাধিত।

অসৎ পদার্থের ভাব নাই, সৎ পদার্থের অভাব হতে পারে না। অভাব চারপ্রকার—প্রাগ-অভাব অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে বস্তুর যে অভাব থাকে। ধ্বংসাভাব—বস্তুর বিনাশ বা ধ্বংস হলে তার যে অভাব হয়। অত্যন্তাভাব—বস্তু যে স্থানে থাকে সেই স্থান ছাড়া অন্য সকল স্থানে যে অভাব অনুভূত হয়। অন্যোন্যাভাব—ঘট পট নয় কিম্বা পট ঘট নয় অর্থাৎ ঘটে পটের অভাব এবং পটে ঘটের অভাব। এই অভাব অসৎ জাগতিক বস্তুতে থাকে কিন্তু আত্মায় থাকে না।

বস্তুর ভেদ বুঝতে গেলে তিন ধরনের ভেদ বুঝতে হয়। স্বগতভেদ—একই বৃক্ষের অঙ্গগত ফল, পুষ্প ও পত্রের যে ভেদ। স্বজাতীয়—এক বৃক্ষের সঙ্গে অপর বৃক্ষের যে ভেদ। বিজাতীয়—বৃক্ষের সঙ্গে অপর প্রাণী গরু মানুষের মধ্যে যে ভেদ। অতএব এই ভেদ বস্তুতে থাকে কিন্তু আত্মায় নয়। যার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে তাই অসৎ। সৎ—নিজের সত্তায় সত্তাবান। ঋষিরা বিচার করে, এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করে, এইরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ন্যায়মতে—জ্ঞান (বুদ্ধি) হয় স্মৃতি ও অনুভব থেকে। স্মৃতি—প্রমা জ্ঞান ও অপ্রমা জ্ঞান। অনুভব—যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান যথাক্রমে—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। অযথার্থ জ্ঞান যথাক্রমে-সংশয়জ্ঞান (যে জ্ঞানে বিকল্প আছে অর্থাৎ অন্যরূপও হতে পারে), বিপর্যয়জ্ঞান (মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম জ্ঞান), তর্ক (যে জ্ঞান অপর জ্ঞানের সত্তার উপর নির্ভর করে)।

এই নিত্য-অনিত্য, সত্য-মিথ্যা এই দুয়ের তফাত আমাদের বুঝিয়ে দেবেন—যিনি সত্যদ্রষ্টা, জ্ঞানী, নিজে জ্ঞানলাভ করেছেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি। এমনই একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এখানে ধীরে ধীরে নিত্য-অনিত্যের পার্থক্যটা অর্জুনের সামনে তুলে ধরছেন।

যাঁরা জ্ঞানলাভ করে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হয়েছেন সেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অনিত্য ও নিত্য বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করেছেন। তাঁরা কোন বস্তু সৎ, কোন বস্তু অসৎ—তাদের প্রভেদ কোথায় তা সম্যক অবগত হয়েছেন। অন্যদিকে অজ্ঞানীরা অসৎ বস্তুকে সৎ মনে করে ভ্রমে পতিত হন। দেহাদি অসৎ বস্তুকে সৎ মনে করে সুখদুঃখ ভোগ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত নিত্য সৎ বস্তুর অস্তিত্বই উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ভগবান বলছেন, 'হে অর্জুন, তুমি অজ্ঞ বলেই ভীষ্মাদি ও প্রিয়জনের দেহের বিনাশে শোক করছ। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হলে এবং সৎ ও অসৎ পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হলে, তোমার আর কোনও শোকের কারণ থাকবে না।

উপনিষদে গুরু শিষ্যকে বলছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—হে সৌম্য! এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ, উৎপত্তির পূর্বে সৎ রূপেই ছিল। সেই সৎ বস্তু এক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত জগত আত্মময়। সেই আত্মা সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতো! সেই সৎ স্বরূপ আত্মাই তুমি।

বেদান্তের সাধন-চতুষ্টয়ের প্রথম সাধন হল—নিত্য অনিত্য বস্তু বিবেক বিচার। অবতার আসেন মানবকে এই বিচার শেখাতে। সত্য মিথ্যার ভেদ, বিদ্যা অবিদ্যার ভেদ শেখাতে। এই সংসারে সকল মানুষের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ। সংসারে সকল কর্মের মধ্যে একটি লক্ষ্য বিবেকজ্ঞান তৈরি করা। সংসারে থাকবে কিন্তু সর্বদা সৎ অসৎ বিচার নিয়ে থাকবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে শুরুতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ করে এই বিচারের কথা বলছেন—'সর্বদা সৎ অসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ—কিনা অনিত্য। এসব বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।' 'কাম-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কী হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবানলাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার, বুঝেছ?'

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥১৭

যেন (যাঁর দ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ) ততম (ব্যাপ্ত), তৎ তু (তাঁকেই, আত্মাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত অর্থাৎ অমর) বিদ্ধি (জানবে) কঃ-চিৎ (কেউ) অস্য (এই) অব্যয়স্য (অব্যয়স্বরূপের) বিনাশং (বিনাশ) কর্তুম্ (করতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না)।

যিনি এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁকে অবিনাশী আত্মা বলে জেনো। কেউই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করতে পারে না।

পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সৎ বস্তুর অভাব বা বিনাশ নাই। এই সৎ বস্তুটি কী এবং কেন তার বিনাশ নাই—সেই সৎ বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে এই শ্লোকে বলা হচ্ছে। অনেকের মনে সন্দেহ—এই দৃশ্যমান স্থূল জগতের বিনাশ হলেই আত্মার বিনাশ নিশ্চয়ই হয়। উত্তরে বলা হয়—দৃশ্যমান স্থূল জগতের বিনাশ হলে যদি সবই বিনষ্ট হয়, তবে মানুষের প্রতিদিনের নিদ্রায়, সুষুপ্তিতেও স্থূল জগতের বিনাশ উপলব্ধ হয় কিন্তু সুষুপ্তির পূর্বে যে 'আমি' ছিল, জাগ্রতঅবস্থায়ও সেই 'আমি'র বোধ হয়। অতএব আত্মা বা তাঁর স্ফুরণরূপ অনন্ত সত্তার কখনই বিনাশ হয় না। আত্মাতে অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি প্রতিবিম্বিত হলেই এই জগৎ প্রপঞ্চের কল্পনা করা হয়। এই কল্পনা অসৎ, ভ্রম—তাই এই জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে চেষ্টা করব। আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিরোধী মত চার্বাক অর্থাৎ বৌদ্ধরা অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন—এই শরীর ও মনের পশ্চাতে 'আত্মা' বলে একটা পদার্থ আছে তা মানবার আবশ্যকতা নেই। এই দুটি পদার্থই সব, তৃতীয় পদার্থের প্রয়োজন নেই। নিয়ত-পরিণামশীল জড়স্রোতের নাম 'শরীর' আর নিয়ত-পরিণামশীল চিন্তাস্রোতের নাম 'মন'। জড়রাশি ক্রমাগত বয়ে চলেছে। সমুদয় জড়রাশিকে এক মনে হয় এবং মনে প্রত্যেকটি চিন্তা অপর চিন্তা হতে পৃথক কিন্তু এই প্রবল চিন্তাস্রোতই এক মনে হয়—এই দুয়ের পেছনে যে একত্ব প্রতীতি হচ্ছে তা বাস্তবিক নেই। সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা নেই। দেহ-মনের এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত—কেবল এদের অস্তিত্ব আছে। এদের পশ্চাতে আর কিছু নেই। এই চমৎকার যুক্তি সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাকে নাড়া দেয়।

বাস্তবিক খুব অল্প ব্যক্তিই এই দৃশ্যমান জগৎতরঙ্গের পেছনে সেই স্থির সমুদ্রের আভাস পেয়েছেন। এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা আশ্রয়রূপে রয়েছেন। অপরিণামী কোন পূর্ণ বস্তু থাকে বলেই আমরা পরিণাম কল্পনা করতে পারি। এই জগৎপ্রপঞ্চ এক সময় অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, তখন উহা শান্ত, নিঃশব্দ এবং শক্তিগুলি সাম্যাবস্থায় ছিল, ক্রিয়াশীল ছিল না। অতএব এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর—তিনটি পৃথক বস্তু নয়, এরা এক। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলে প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্যন্ত দেখতে পান না, যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখতে পান না। আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁর পক্ষে শরীর ও মন উভয়ই কোথায় চলে যায়। যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি পরম শান্ত স্থিরভাব দেখতে পান না, আর যিনি সেই পরম শান্তভাব দেখেন, তাঁর পক্ষে গতি ও চঞ্চলতা কোথায় চলে যায়। ভ্রম দূর হলে এক বস্তু দেখেন--সেই এক নানারূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এক আত্মা এবং একমাত্র তারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ 'বহু' প্রতীত হয়েছে। নাম ও রূপ সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। এই সমগ্র বৈচিত্র জগৎ এক সত্তার প্রকাশ। নাম-রূপই যত পার্থক্য রচনা করেছে। একই সত্তা অসংখ্য নাম-রূপের বিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলে কিছু নাই—সবই এক। হয় বল—সবই আমি, না হয় বল—সবই তুমি।

যে পরমাত্মা আধাররূপে এই নিখিল জগৎ ব্যেপে আছে তাই সৎ বস্তু, এই সৎ বস্তু অবিনাশী। কারণ সর্বব্যাপকত্বই যার স্বরূপ, তার বিনাশ হবে কীরূপে? যা বিনাশশীল তা সর্বব্যাপী হতে পারে না। আত্মাই এই জগৎকে ধারণ করে আছে। সেই পরমাত্মার বিনাশ হলে এই জগৎও বিনষ্ট হয়। সুতরাং সর্বব্যাপী আত্মার বিনাশ অসম্ভব। যা সৎ, তা নিত্য, অব্যয় ও অনন্ত।

শুদ্ধ-অদ্বৈত-চৈতন্য স্বরূপ অনন্ত সত্যবস্তু সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করে আছেন। নানা বস্তু সৃষ্ট হচ্ছে আবার বিনষ্টও হচ্ছে, কিন্তু যা থেকে ঐ বস্তুসমষ্টিরূপ বিশ্ব সৃষ্ট হয় তা কোনওভাবেই বিনষ্ট হয় না। বিশ্বের পিছনে যে অবিনাশী সৎ বস্তু বা সত্য রয়েছে, তাকে বিনাশ করার সামর্থ্য কারও নেই। সেই আত্মাই এই দেহের মধ্যেও রয়েছে। কেবল মানবশরীরেই তাকে উপলব্ধি করা যায়, তাই হলো মানবসত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধ জ্ঞান।

সেই আত্মাকে জানাই মানবজীবনে একমাত্র লক্ষ্য। আত্মা অতীন্দ্রিয় পুরুষ। সেই আত্মাকে এখানে 'তৎ' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর আর কী নাম দেবেন? তিনি যে 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্'—তিনি এক কিন্তু দুই নয়। যা নিত্য, যা শাশ্বত, যা সনাতন তাঁকেই 'তৎ' বলা হচ্ছে। এই 'তৎ' অর্থাৎ আত্মার স্বরূপটা কী? বলছেন, আবিনাশী। আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলতে চাইছেন, যার আরম্ভ আছে, তার শেষও আছে। যার আদি আছে, তাঁর অন্তও আছে। কিন্তু আত্মা অজর, অমর, নিত্য। আত্মার সৃষ্টিও নেই, বিনাশও নেই। বেদান্তমতে, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্টি। যেমন, মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা তার নিজের ভেতর থেকেই জাল সৃষ্টি করে। মাকড়সা নিজেই উপাদান, নিজেই স্রষ্টা। এই তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। আবার সেই একই বহু হয়েছেন। তারপরে বলছেন, 'সর্বম্ ইদম্ ততম্'—সকলের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন। সকলকে তিনি ঘিরে রেখেছেন। সেজন্য তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় 'ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্বম্'। যেমন সর্বব্যাপী আকাশ। ঘটাকাশ আর পটাকাশ। একটা ঘটের মধ্যে যেমন আকাশ আছে, আবার ঘটের বাইরেও সর্বত্র সেই একই আকাশ আছে। আত্মাও ঠিক তেমনি। সর্বত্র রয়েছেন।

এই আত্মাকে কেউ মারতে পারে না। তিনি অব্যয়। তাঁর ব্যয় অর্থাৎ ক্ষয় নেই। আমাদের শরীরের সবসময় ক্ষয় হচ্ছে। কিন্তু শরীরের মধ্যে যিনি আছেন তিনি অপরিবর্তনীয়। এমন নয় যে, আত্মা একবার বড় হচ্ছেন, আর একবার ছোট হচ্ছেন। আত্মা অক্ষয়, অমর। তাঁর সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায় না। তিনি যা, তিনি তাই। তিনি 'কেবলম্', 'কুটস্থ'। এই অবিনশ্বর, নিত্য আত্মাকে কেউ কখনও বিনাশ করতে পারে না। আত্মা নিজে বিনষ্ট হতে পারে না এবং অপর কারও কর্তৃকও এর বিকার বা বিনাশ হতে পারে না। কারণ আত্মাই একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, আর সমস্তই পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তু অপরিচ্ছিন্নকে বিনাশ করতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ।।১৮

নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অনুপলব্ধ) শরীরিণঃ (জীবাত্মা—যিনি শরীর ধারণ করেছেন) ইমে (এই) দেহাঃ (দেহসকল)

অন্ত-বন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হয়েছে শাস্ত্রে) তস্মাৎ (অতএব) ভারত (হে অর্জুন) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

দেহাশ্রিত জীবাত্মার এইসকল শরীর নশ্বর বলে কথিত। কিন্তু আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধির অযোগ্য, অপরোক্ষানুভূতি চাই)। অতএব হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ করো।

পূর্ব শ্লোকে আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে, এই শ্লোকে দেহাদি পদার্থের নশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হচ্ছে। ভগবান এখানে বলছেন, দেহ আর দেহী, শরীর আর শরীরী অর্থাৎ দেহ ও আত্মা— এ দুটি পৃথক। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলছেন, তুমি সামনে যাঁদেরকে দেখছ, এঁদের সকলের মৃত্যু হবে। কিন্তু শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তিনি নিত্য। তিনি শরীরী। তিনি আমাদের সকলের হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন। আমরা আত্মাকে দেখতে পাই না। কিন্তু তাঁকে অনুভব করা যায়। তিনি আমাদের অন্তরে আছেন বলেই এই দেহ সজীব এবং আমরা কর্ম করছি। তিনি অনাশিনঃ অর্থাৎ আত্মার কোনও নাশ নেই। কোনও বিকার বা পরিবর্তন নেই। আত্মা অবিকারী, নিত্য। আত্মাকে বলা হয় অপ্রমেয়। আত্মাকে পরিমাপ করা যায় না। আমরা সসীম এবং আত্মা অসীম। অসীমকে সসীম দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। অসীমকে মাপতে যাওয়া অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়ার মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, পুতুলনাচের সময় পিছন থেকে পুতুলকে দড়ি ধরে কেউ টানে বলেই পুতুল নাচে। সেইরূপ এই নাম-রূপের দেহটি পুতুলের মতো এবং তার পিছনে ঐ আত্মা রয়েছে। তাঁর ইচ্ছাতেই এই দেহ নড়ে।

আত্মাকে যখন অবিনাশী বলা হচ্ছে তখন বোঝানো হচ্ছে যে, আত্মার নাশ নেই অর্থাৎ আত্মা একরূপ বলেই নিত্য। যখন আত্মা অপ্রমেয় বলা হচ্ছে তখন বোঝানো হচ্ছে যে, আত্মার উপলব্ধির নিমিত্ত কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই, কোনও প্রমাণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রমাণ দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। যে বস্তু কখনও থাকে, কখনও থাকে না, কখনও জ্ঞাত কখনও অজ্ঞাত—তারই অস্তিত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যা স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ তার প্রতিপাদনের জন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যকতা নাই—তা স্বতঃই উপলব্ধ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রমাণদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, স্থূল, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের উপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মা অপরিচ্ছিন্ন, অতি সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতএব তাঁকে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাতার গোচরে আনাই প্রমাণের কাজ, কিন্তু আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা—এবং আত্মাই প্রমাতা। যিনি নিজেই জ্ঞাতা, নিজেই প্রমাতা তাঁকে প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় না। তাই শাস্ত্র বলে অপরোক্ষানুভূতি চাই। জ্ঞানী আত্মাকে প্রত্যক্ষানুভব করে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীদের কাছে আত্মা 'করামলকবৎ' অর্থাৎ এই যে আত্মা এখানে হাতের মুঠোয় রয়েছে। তাই প্রত্যক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম।

অতএব আমাদের বুঝতে হবে এই সর্বব্যাপী আত্মাই বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করে জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোনও শরীর নেই, আত্মা অশরীরী। আত্মা শরীর গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশিত করেন বলে আত্মাকে শরীরী বলা হয়। এই শরীরী বা আত্মা এক, কিন্তু এঁর শরীর বা দেহ বহু। এই শরীরী বা আত্মা যে-সকল শরীর বা দেহ গ্রহণ করেছেন, সেই-সকল শরীরেরই শেষ বা অন্ত আছে, কিন্তু বিভিন্ন শরীরে যে এক আত্মা বর্তমান তাঁর শেষ বা অন্ত নাই অর্থাৎ দেহেরই বিনাশ হয় দেহস্থ আত্মার বিনাশ হয় না। এক দেহের বিনাশ হলে আত্মা পুনরায় দেহান্তরে নতুন দেহ ধারণ করেন। এই সংসারে মৃত্যু বা ধ্বংস বলতে দেহের ধ্বংস বা মৃত্যু কিন্তু আত্মার মৃত্যু বা ধ্বংস হয় না। আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে জন্মমৃত্যু এসব শিশুদের কল্পনা মনে হবে। জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে নয়। প্রকৃতিই পরিণামপ্রাপ্ত হচ্ছে, আত্মা নয়।

উপনিষদ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বলছেন, 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।' তিনি প্রকাশিত আছেন বলে জগৎ প্রকাশিত এবং তাঁর আলোকে নিখিল জগৎ আলোকিত। অতএব হে অর্জুন, তুমি মনে করছ এই যুদ্ধে ভীষ্ম এবং এইসকল সৈন্যদের বিনাশ হবে তা তোমার ভ্রম মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভীষ্মাদির দেহেরই বিনাশ হবে, আত্মার বিনাশ হবে না। কাজেই স্বজনবিয়োগের আশঙ্কায় শোকাকুল হয়ে, স্বধর্ম পরিত্যাগ করে, যুদ্ধে বিরত হওয়া তোমার কর্তব্য নয়। তুমি যুদ্ধ করো এবং মনে কর তুমিই সেই অবিনাশী পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবজগৎ সকলেই সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রকাশ।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্ ।।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ।।১৯

যঃ (যিনি) এনং (এঁকে অর্থাৎ এই আত্মাকে) হন্তারাং (হন্তারূপে), বেত্তি (জানেন) যঃ চ (এবং যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হতম্ (নিহত) মন্যতে (মনে করেন) উভৌ তৌ (তাঁরা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (জানেন না) (যেহেতু) অয়ং (এই আত্মা) (কাউকেও) ন হন্তি (হনন করেন না), ন হন্যতে (হতও হন না)।

যিনি এই আত্মাকে হন্তা (অন্যকে বধ করে) বলে মনে করেন, এবং যিনি আত্মাকে নিহত (অন্যের দ্বারা হত হয়) বলে ভাবেন—তাঁরা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। কারণ এই আত্মা কাউকে হত্যা করেন না বা কারোর দ্বারা হতও হন না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণের নিকট আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষানুভব হয়—আত্মা অবিনাশী, অবিকারী। অকর্তা। তিনি কিছুই করেন না। বাস্তবিক আত্মা কোনও কর্মই করে না। আত্মা নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়—আত্মা সাক্ষী, নির্লিপ্ত। আত্মা শরীর ধারণ করে জীবাত্মা হন এবং তাঁর সংস্পর্শে জীবের দেহ মন ইন্দ্রিয় কর্ম করে। জীব অহঙ্কারের বশীভূত হয়েই দেহে আত্মাভিমান করে—মনে করে 'এই দেহই আমি'। আমি কর্তা, আমি কর্ম করছি—

অর্জুনও তাই মনে করছেন, তিনি ভীষ্মাদিকে হনন করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অহংকে 'কাঁচা আমি' বলছেন।

এখানে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি দেহের কাজ বা প্রকৃতির কাজকে আত্মার কাজ বলে মনে হয়। এইজন্য জীব অহং জ্ঞানে কর্তৃত্ববোধে করে। জীব দেহে আত্মাভিমান করে বলেই, নিজেকে কর্তা মনে করে বলেই তার পাপ-পুণ্যের বোধ হয়। যতদিন এই দেহ-কেন্দ্রিক অহংবোধে আত্মাভিমান থাকবে ততদিন পাপ-পুণ্যের বোধ দূর হবে না এবং তার ফলভোগও করতে হবে। কিন্তু আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হলে পাপের ভয় বা পুণ্যের আকর্ষণ উভয়ই দূর হবে। আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হলে আর পাপের আশঙ্কাও থাকবে না।

তাই ভগবান আত্মার স্বরূপ ও কর্ম সম্পর্কে বলছেন যে, আত্মা কাউকে হত্যাও করেন না। আবার কারোর দ্বারা নিহতও হন না। আত্মা অব্যয়স্বরূপ, অবিনাশী। আত্মা যদি হত হন না, তবে হত হয় কে? দেহই হত হয়, দেহেরই বিনাশ হয়। আত্মার বিনাশ নাই। জীব দেহে আত্মাভিমান করে বলে দেহ হত হলেই মনে করে 'আমিই হত হলাম'। আত্মার স্বরূপ জানলে তখন আর শোকের কোনও কারণ থাকবে না। তখন তিনি পাপ-পুণ্যের পার। অথচ আত্মা আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি পাপ-পুণ্য বলে কিছুই নেই? এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেনঃ যতক্ষণ তিনি 'অহংবুদ্ধি' অর্থাৎ 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা'—এই বোধ রেখে দেন, ততক্ষণ তিনি পাপ-পুণ্য ভেদজ্ঞানও রেখে দেন। আমরা হয়তো মুখে বলতে পারি, আমাদের কাছে পাপ-পুণ্য দুইই সমান। কিন্তু মনে মনে ঠিক জানি ওসব কথামাত্র। মন্দ কাজটি করলেই বুক ধুক্‌ধুক্ করে। আর যাঁদের চৈতন্য হয়েছে—ঈশ্বর নিত্য আর সব অনিত্য বলে বোধ হয়েছে, তাঁদের আর একরকম ভাব। তাঁদের 'অহং বুদ্ধি' দূর হয়ে গেছে। তাঁরা জানেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। আর সব অকর্তা। তাঁদের আর বেচালে পা পড়ে না। হিসেব করে তাঁদের পাপ ত্যাগ করতে হয় না। তাঁরা দেখেন ঈশ্বরই সব করছেন। আর তিনি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রস্বরূপ। 'তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন চালান তেমনি চলি, যেমন বলান তেমনি বলি।'—এই বুদ্ধিতে কাজ করেন বলেই তাঁরা যা কিছু করেন তা-ই সৎকর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।২০

অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ ন জায়তে (কখনও জন্মগ্রহণ করেন না) বা ন ম্রিয়তে

(বা মৃত হন না) বা (অথবা) ভূত্বা (উৎপন্ন হয়ে) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (থাকেন না) ন (এমন নয়) অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (ক্ষয়হীন) (এবং) পুরাণঃ (পরিণামশূন্য, বৃদ্ধিহীন) শরীরে (দেহ) হন্যমানে (হত হলেও) ন হন্যতে (হত হন না)।

এই আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না বা মৃতও হন না। ইনি পূর্বে ছিলেন না, এখন জন্ম হয়েছে এমন নয়। অথবা পূর্বে ছিলেন, এখন থাকবেন না এমনও নয়, আত্মা চিরবিদ্যমান। আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ অর্থাৎ ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।

জড়ের ষড়্‌বিকার আছে। জন্ম, কিছুকাল অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি বা সুপক্ক অবস্থা, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ছয় অবস্থা। আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই সেইসঙ্গে আত্মার পক্ষে এই ষড়্‌বিকারও নেই। তাই আত্মার কোন অবস্থান্তর নেই। আত্মা ষড়্‌বিকারের ঊর্ধ্বে। আত্মার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 'কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ'। পূর্বে না থেকে, পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম। আবার পূর্বে থেকে, পরে না থাকার নাম মৃত্যু। আত্মার এই দুই অবস্থার কোনটিই নেই। তাই আত্মাকে বলা হয় অজ ও নিত্য। আত্মার ক্ষয় নেই—শাশ্বত। যার ক্ষয় নেই তার বৃদ্ধিও নেই। তাই আত্মাকে 'পুরাণঃ' বলা হয়। অর্থাৎ আত্মা সনাতন, চিরনবীন।

অতএব এই শ্লোকে ষড়্‌বিধ বিকার আত্মার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে। ন জায়তে—এর দ্বারা প্রথম বিকার জন্ম নিষিদ্ধ হল। নূতন উৎপন্ন হওয়ার নাম জন্ম, দেহই জন্মাচ্ছে, আত্মা কখনও জন্মায় না, আত্মা চিরকাল আছে। ন ম্রিয়তে—এর দ্বারা ষষ্ঠ বিকার 'বিনাশ' প্রতিষিদ্ধ হল। দেহেরই বিনাশ হতে পারে, আত্মার বিনাশ হয় না। ন ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন—পূর্বে না থেকে পরে হল, এও নয়। এর দ্বারা বিকার 'অস্তিত্ব' নিষিদ্ধ হল। পূর্বে বিদ্যমান না থেকে পরে বিদ্যমান থাকার নাম অস্তিত্ব বিকার। নিত্যঃ—এর দ্বারা তৃতীয় বিকার 'বৃদ্ধি' নিষিদ্ধ হল। আত্মা অজঃ, নিত্য, অর্থাৎ সর্বদাই একরূপ, কাজেই তার বৃদ্ধি অসম্ভব। শাশ্বতঃ—এর দ্বারা পঞ্চম বিকার 'অবক্ষয়' নিষিদ্ধ হল। আত্মা শাশ্বত অর্থাৎ সমভাবে আছে, তার ক্ষয় অসম্ভব। পুরাণঃ—এর দ্বারা চতুর্থ বিকার 'পরিণাম' নিষিদ্ধ হল। এই আত্মা পুরাতন অথচ নূতন।

শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না। এ প্রসঙ্গে আলেকজান্ডারের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসীর সাথে আলেকজান্ডারের পরিচয় হয়। আলেকজান্ডার ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে, ঐ সন্ন্যাসীকে তাঁর দেশে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সন্ন্যাসী যেতে রাজি হলেন না। তা শুনে আলেকজান্ডার ভীষণ রেগে যান এবং সন্ন্যাসীকে বলেন, 'তুমি যদি আমার সাথে না যাও, তবে অমি তোমাকে হত্যা করব।' সন্ন্যাসী অট্টহাসি হেসে এই কথার

উত্তরে বলেন, 'আলেকজান্ডার, তুমি একটা বড় মিথ্যা কথা বলছ। কারণ, তুমি আমার এই শরীরকে হত্যা করতে পার কিন্তু আমাকে হত্যা করতে পার না। আমি 'অজর, অমর, অবিনাশী আত্মা'। এই আত্মজ্ঞানই ভারতের সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি।

আত্মার এই সত্তাই প্রকৃত মানবসত্তাকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে ঘোষণা করে। এই সত্যের সামান্য জ্ঞানেও আমরা প্রভূত শক্তি, প্রভূত নির্ভীকতা ও প্রভূত করুণার অধিকারী হতে পারি। প্রতিটি সত্তায় একই আত্মা বিদ্যমান আছে। এই সত্যের জ্ঞান আমাদের সবাইকে এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করে, মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রেম ও সেবার ভাব ফুটিয়ে তোলে। সমস্ত নীতিজ্ঞানের পেছনেই রয়েছে এই তত্ত্ব, এই একত্বের ভাব। সকল নীতিবোধের পেছনে মৌলিক একত্বের সত্যটি রয়েছে। আমরা মূলত এক।

এই পরিবর্তনশীল শরীর ও মনের জটিল সমাহারের পেছনে মানুষের অন্তরে কিছু শাশ্বত, এক অনন্ত সত্তা রয়েছে। উপনিষদের ঋষিরা আমাদের শিক্ষা দেন যে, মুক্তির জন্য আমাদের স্বর্গের কোনও দেবতার উপর নির্ভর করার দরকার নেই। আমাদের মুক্তির ছক আমাদের অন্তরেই আছে, চিরমুক্ত আত্মারূপে, তাই হলো আমাদের শাশ্বত প্রকৃতি। ঈশ্বরের ক্ষমতা নেই মানব আত্মার বিনাশ করা। সকল জীবের অন্তরে এই আত্মা রয়েছেন। পশুরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল মানব সেই সত্য আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। এই জন্য মানব শ্রেষ্ঠ। উপনিষদের মর্মবাণী হলো—হে মানব তুমি তোমার স্বরূপকে জান।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ।। ২১

পার্থ (হে অর্জুন) যঃ (যিনি) এনম্ (একে, এই আত্মাকে) নিত্যম্ (নিত্য) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অবিনাশিনং (এবং অবিনাশী) বেদ (জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথম্ (কী প্রকারে) কং হন্তি (কাকে হত করবেন) কং ঘাতয়তি (কাকেই বা হত করাবেন)।

হে অর্জুন, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত ও অব্যয় বলে জানেন, সেই পুরুষ কী প্রকারে কাকে হত করবেন, কাকেই বা অপরের দ্বারা হত করাবেন? অর্থাৎ সেই ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে বধ করা বা করানো সম্ভব নয়।

প্রত্যক্ষানুভূতি সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী এই সত্য উপলব্ধি করেন—আত্মার জন্ম নেই, বিনাশও নেই। আত্মা অজ, নিত্য, অবিনাশী। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছে ও তিনিই বুঝতে পারেন যে, আত্মা নিজেও কাউকে বধ করতে পারেন না, আবার অন্যের দ্বারাও বধ করাতে পারেন না। তাছাড়া আত্মা কাকেই বা হত্যা করবেন, আর কার দ্বারাই বা হত হবেন? বিনাশই যখন নেই, তখন কে কাকে বিনাশ করবে? আর কীভাবেই বা করবে? তিনি আরও

জানেন যে, আত্মা কিছুতেই হত হতে পারেন না। আত্মতত্ত্ব বোধে বোধ হলে জানব, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। আমি আছি বলেই সব হচ্ছে। অথচ আমি অকর্তা, নিজে কিছু করছি না। প্রকৃতিই করাচ্ছে। তখন সুখ-দুঃখ কোনওটাই আমাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। নির্লিপ্ত। এ অবস্থায় শরীর, মন আপনা-আপনিই কাজ করে চলে। সৎকাজ, পরোপকার আমার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়। ইচ্ছে করলেও আমি কারোর ক্ষতি করতে পারি না।

বাড়িতে, অফিসে বা কারখানায় কাজ করার সময় এবং সব রকম মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এই গূঢ় সত্যটি আমরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারি। এইভাবেই আমাদের জীবনচর্যা চালিয়ে যেতে হবে। দুটি সত্য—বাহ্য সত্য ও আন্তর সত্য। এই দুটি প্রকৃতি নিয়েই আমাদের জীবন। আমরা বহির্জগৎ নিয়ে কাজ করে যাব। কিন্তু সেই কাজ করতে করতে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপও উপলব্ধি করব। আত্মজ্ঞান লাভ করব কিন্তু সেইসঙ্গে কর্মে যেন গভীর প্রবণতা থাকে। একেই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'ব্যবহারিক বেদান্ত'। জ্ঞানকে ভিত্তি করেই যেন জীবনযাত্রার সকল কর্ম সম্পন্ন হয়। 'কাজ না করার' প্রবণতা যেন গড়ে না ওঠে। আমাদের অন্তরের আত্মার সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। জ্ঞানমার্গ শেখায়—নেতি নেতি বা 'এটা নয়' 'এটা নয়' 'এ জগৎ মায়াময়', একে নিয়ে আমার কিছু করণীয় নেই, আমাকে আত্মার অমৃত ও শাশ্বত আনন্দমাত্রটি উপলব্ধি করতে হবে ইত্যাদি—কিন্তু এই ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে কর্মে, সংগ্রামে আহ্বান করছেন, জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হতে বলছেন। কর্ম ও ধ্যান অর্থাৎ আত্মচিন্তা একই সঙ্গে জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে।

জ্ঞানমার্গের সাধকেরা এতদিন 'নেতি'বাচক দিকটির দিকে বেশি জোর দিয়েছিলেন। গীতার সামগ্রিক আধ্যাত্মিকতার রূপটি তুলে ধরাই হলো স্বামী বিবেকানন্দের মহান অবদান। কাউকেই বলতে হবে না আমি সংসারী। তুমি কর্মরত হও অথবা নানাভাবে সংসারের কাজে জড়িত হও, তবু তুমি সংসারী কখনই নও, তুমি সংসারে আছ কিন্তু সংসারী নও। তোমার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা আছে, দিনের পর দিন তুমি সেই আধ্যাত্মিক ধারণাকে শক্তিশালী করে তুলছ। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, যদি কোনও নরনারী আধ্যাত্মিক না হয়, আমি তাকে হিন্দু বলি না। সব কিছুতেই ব্যাপ্ত করে আছে আমাদের আধ্যাত্মিকতা। আমরা আমাদের গৃহের মধ্যে ও কর্মস্থলেই আধ্যাত্মিক হয়ে রয়েছি এবং এই স্থানই আমার উপাসনালয়। স্বামীজী বলছেন, 'আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম'। কেবল এবিষয়ে প্রত্যেককে জ্ঞাত হতে হবে ও তদনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে, অবশ্য সে যতটা পারে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।। ২২

যথা (যেরূপ) নরঃ (মনুষ্য) জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় (জীর্ণ বস্ত্রসকল ত্যাগ করে) অপরাণি গৃহ্ণাতি (অন্য নূতন বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে) তথা (সেই প্রকার) দেহী (দেহস্থ আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় (জীর্ণ শরীরসকল ত্যাগ করে) অন্যানি (অন্য) নবানি সংযাতি (নূতন শরীর প্রাপ্ত হন)।

মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন জীর্ণ দেহসকল ত্যাগ করে নূতন দেহসমূহ গ্রহণ করে।

আত্মা নিরবয়ব। তাঁর কোন অবয়ব নেই। অর্থাৎ কোনও দেহ নেই। তাহলে দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধটা কী? যেমন ঘর আর ঘরনীর সম্পর্ক। ঘরের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই ঘরনী। তেমনি দেহের মধ্যে আত্মা আছেন। বলছেন, পুরোনো জীর্ণ কাপড় ফেলে দিয়ে আমরা যেমন নতুন কাপড় পরি তেমনি আত্মাও এই জীর্ণ, ভগ্ন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করেন।

ভারতের শাশ্বত চিন্তা হচ্ছে, দেহ আর আত্মা আলাদা। এই দেহের জন্ম হয়েছে। সুতরাং এর মরণ অবশ্যম্ভাবী। একথা মনে রেখে মৃত্যুকে আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। মৃত্যু যেন আমাদের অতি আপনার, এরূপ প্রার্থনা—'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'। মৃত্যুটা আসলে কী? 'দেহান্তর-প্রাপ্তি', একটা দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করা। আমার কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে। তাই সেটা পালটে আমি আর একটা কাপড় পরলাম। কিন্তু তাতে আমার কী এসে যায়? আমি সবসময় একই আছি। তেমনি মৃত্যুর পরে নতুন দেহ প্রাপ্ত হলেও আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না।

কথা হতে পারে যে, পুরাতন বস্ত্র ত্যাগে মানুষ কোনও দুঃখ অনুভব করে না, বরং আনন্দের সঙ্গে তা ত্যাগ করে। কিন্তু দেহত্যাগের সময় জীবের দুঃখবোধ হয়, দেহ প্রাচীন হলেও তা কেউ ছাড়তে চায় না। তার কারণ দেহের প্রতি জীবের মমতা। দেহের প্রতি অত্যধিক মমতাবশত দেহ জীর্ণ, পুরাতন হলেও মানব তা ছাড়তে চায় না। অজ্ঞ জীব দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। মৃত্যুর পর আত্মা যে নূতন দেহ গ্রহণ করে —তা মানুষ বুঝতে পারে না। তাই মৃত্যুর পর কী গতি হবে, এই ভেবে সে আকুল হয়। সে একেবারেই লুপ্ত হবে অথবা কোনও অন্ধকার অজানা প্রদেশে চলে যাবে—এই ভেবে বিলাপ করে। তাছাড়া মানুষ পার্থিব দেহ ত্যাগের পর কিছুকাল স্বর্গাদি লোকে বাস করে কর্মের ফলভোগান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। আবার শাস্ত্র বলে, জলৌকা

যেরূপ এক তৃণ পরিত্যাগ করে অপর তৃণ আশ্রয় করে সেইরূপ আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ আশ্রয় করে।

এই হলো মৃত্যু ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বেদান্তের চমৎকারী ভবনা। যখন আমি আমরা দেহত্যাগ করি তখন আমাদের বোধ হয় আমিই দেহ ছিলাম, এখন এই দেহের নাশ হয়েছে। এই দেহভিত্তিক জ্ঞান আমাদের সকল সাধারণ মানুষের। কিন্তু যাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিক বোধসম্পন্ন তাঁরা বোঝেন যে, এই দেহ একখণ্ড পুরাতন বস্ত্রের মতো, যা ফেলে দিয়ে আমরা নতুন বস্ত্র পরে থাকি। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা—৪ জুলাই ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের রাত্রি ৯টার একটু পরেই স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ), সেই রাত্রেই মাদ্রাজে একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি শুনতে পান স্বামী বিবেকানন্দ যেন তাঁকে বলছেনঃ 'শশী, আমি থুতু ফেলার মতো আমার দেহটাকে ত্যাগ করেছি।' পরদিন কলকাতা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ বহন করে টেলিগ্রাম আসে।

বাস্তবিক আত্মাকে উপলব্ধি করলে আমাদের মনে হবে এই জগৎ স্বপ্নমাত্র। আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝব যে, আমরা এই জগতে অভিনেতা মাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমি, তখনই প্রবলবেগে অনাসক্তির ভাব আমাদের ভিতরে আসবে। জীবনের উপর তীব্র আসক্তি—এই 'সংসার' চিরকালের জন্য চলে যাবে। তখন আমাদের স্পষ্টই ধারণ হবে—আমরা জগতে কতবার এসেছি, আবার কতবার চলে গিয়েছি। কতবার সংসার-তরঙ্গের চূড়ায় উঠেছি, আবার কতবার আমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছি। জীবনের ঐ ওঠা-পড়া দেখে বীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে বলতে পারব—মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও? যখন জানতে পারব আমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই আমি মৃত্যুকে জয় করতে পারব।

আমাদের ভারতীয় হিন্দুদের ভাষা হলো—তিনি দেহত্যাগ করেছেন বা শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। পাশ্চাত্যদেশের বলা হয়, তিনি তাঁর আত্মাকে হরিয়েছেন। তাই তাঁরা দেহটিকে রক্ষা করেন। ভারতে আমরা দেহটিকে রক্ষা করি না পুড়িয়ে ফেলি। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। অন্য সব দেশে দেহটাকে রক্ষা করা হয়, এমনকী সব রকম ভাল ভাল জিনিস তাঁর কাছে রেখে দেওয়া হয়। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মে দেখা যায় মৃতব্যক্তিদের, বিশেষত ফারাওগণের প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র কবরে রাখা হতো। কিন্তু আমরা দেহটিকে পুড়িয়ে ফেলি।

এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে: নারকেল কাঁচা অবস্থায় ডাব আর পাকা অবস্থায় ঝুনো। ডাব অবস্থায় শাঁস খোলের সঙ্গে লেগে থাকে। কিন্তু ঝুনো নারকেলের শাঁস ও খোল আলাদা হয়। সেইরূপ আমাদের অপরিণত বুদ্ধিতে শরীর ও আত্মা মিলেমিশে এক হয়ে থাকে। শরীরের প্রতি আমরা আসক্ত। কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হলে তখন দেহ ও আত্মা আলাদা অনুভব হয়। আমরা কেবল জীবনে বেঁচে থাকার দিকটাই জানি। জীবনের অন্য দিক—মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। মৃত্যু ও জীবন হলো একই সত্যের দুটি

রূপ। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের এক প্রাচীন শিক্ষা হলো—'যস্য ছায়া অমৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ'—সেই সত্যেরই ছায়া হলো অমৃতত্ব ও মৃত্যু। অতএব সত্যকে জানতে হলে, জীবন ও মৃত্যু দু-টিই জানতে হবে, কেবল জীবন জানলেই হবে না। যে জাতি মৃত্যুকে ভয় করে, তারা কখনই বড় হতে পারে না। মৃত্যুর মুখোমুখি হলেই তুমি মহান হতে পার, এই শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছিলেন বর্তমান যুগে। তিনি তাঁর 'কালী দি মাদার' কবিতায় বলছেন—'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২৩

শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং ন ছিন্দন্তি (এই আত্মাকে ছেদন করে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (এঁকে দগ্ধ করে না) আপঃ চ এনং ন ক্লেদয়ন্তি (জলও এঁকে সিক্ত করে না) মারুতঃ ন শোষয়তি (বায়ু এঁকে শুষ্ক করে না)।

এই আত্মাকে শস্ত্রসকল ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি এই আত্মাকে দগ্ধ করতে পারে না, জলরাশি একে আর্দ্র করতে পারে না, বায়ুও একে শুষ্ক করতে পারে না।

আত্মা নিরবয়ব বলে তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায় না। আত্মা অমূর্ত বলে তা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং জল দ্বারা সিক্ত বা বাতাস দ্বারা শুষ্ক করা যায় না। অর্থাৎ আত্মার কোনও বিকার নেই। বিকার কথাটার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন। দেহের বিকার আছে। যেমন, চারপাশের পরিবেশ আমাদের দেহকে প্রভাবিত করে। কিন্তু আত্মা কোনও বাইরের বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ, আত্মার কোনও আকার নেই, রূপ নেই। 'আকাশবৎ'। আকাশের যেমন কোনও রূপ নেই, আত্মাও ঠিক তেমনি। নিরাকার। নিরবয়ব। যাঁর অবয়ব নেই তাঁকে কি কেউ কাটতে পারে? যাঁর দেহই নেই তাঁকে আগুনে পোড়াবে কী করে? জলই বা তাঁকে ভেজাবে কী করে? এবং বায়ুই বা আর্দ্র করবে কী করে? কাজেই আত্মা নির্বিকার, নির্গুণ। বাইরের কোনওকিছুই আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।

এই শ্লোকে সুন্দরভাবে ভগবান অবয়ববিশিষ্ট জড়পদার্থ দেহের সঙ্গে, নিরবয়ব চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রভেদ দেখিয়েছেন। জড়পদার্থ দেহকে শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন, জলদ্বারা সিক্ত, অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং বায়ুদ্বারা শোষণ করা যায়। কিন্তু আত্মা অজড়, চৈতন্যস্বরূপ বলে তাঁর কোনও পরিবর্তন করা যায় না। আত্মা অমূর্ত এবং নিরবয়ব তাই শস্ত্রাদি দ্বারা তাঁকে বিভক্ত করা যায় না।

প্রশ্ন হয় যে, দেহ দগ্ধ হয়ে বিনষ্ট হলে দেহস্থ আত্মার বিনাশ হবে না কেন? ভগবান তাই বলছেন, যুদ্ধে ভীষ্মাদির দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মা অমূর্ত, নিরবয়ব, নিত্য ও অজড় বলে তা বিনাশ হতে পারে না। আত্মা যে কোনও অস্ত্রের দ্বারা খণ্ডিত হন

না—এটা তাঁর প্রকৃতি। সূক্ষ্ম মনকে যেমন ছেদন করা যায় না তেমন আত্মা সূক্ষ্মের থেকেও সূক্ষ্মতর। তাই কোনওভাবে আত্মার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আত্মা চির নিত্য।

সহজ করে চিন্তা করলে বুঝতে পারব—প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ বাইরের আবরণ, মন আত্মার ভিতরের আবরণ। এই আত্মাই প্রকৃত জ্ঞাতা, প্রকৃত দ্রষ্টা, এই আত্মাই অন্তঃকরণের সাহায্যে দেহকে পরিচালিত করছে। দেহ জড় এবং আত্মা জড় নয়, চৈতন্য বস্তু। আত্মা জড় নয় বলে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ-নিয়মের অধীনও নয়, সেইজন্য আত্মা অমর, অনাদি, নিরাকার। সকল সাকার বস্তুর অন্ত বা নাশ আছে। আত্মা আদি-অন্তের নিয়মাধীন নয়। আত্মা শাশ্বত ও সর্বব্যাপী। জড় দেহের বিনাশ হয় আত্মার বিনাশ নেই।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।২৪

অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অচ্ছেদ্য—ছেদন করা যায় না) অয়ম্ (এই আত্মা) অদাহ্যঃ (অদাহ্য—দগ্ধ হন না) অক্লেদ্যঃ (আর্দ্র হন না) অশোষ্যঃ চ এব (এবং শুষ্ক হন না)। অয়ম্ (এই আত্মা) নিত্যঃ (নিত্য) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) স্থাণুঃ (স্থিরভাবাপন্ন) অচলঃ (অচল) সনাতনঃ (সনাতন)।

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী। আত্মা একরূপ, স্থির, অচল এবং সনাতন।—ছেদনের অযোগ্য, দহনের অযোগ্য, শোষণের অযোগ্য। সর্বদা একরূপ, সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট, স্থিরভাব, স্পন্দনবিহীন, চিরন্তন, শাশ্বত। এই শ্লোকে এখানে ভগবান কেন আত্মাকে ছেদন, দহন বা শোষণ করা যায় না, তার কারণগুলি বলছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নানাভাবে আত্মার প্রকৃতস্বরূপ বোঝাচ্ছেন। বলছেন, আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু। আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনিত্য। নিত্য অর্থাৎ যা ত্রিকাল-অবাধিত। কালাতীত। যা নিত্য এবং একরূপ তার ছেদন সম্ভব নয়। আত্মা আছেন বলেই সবকিছু হচ্ছে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: এক লিখে তারপরে শূন্য বসালে অঙ্কটা বড় হতে থাকে—যথাক্রমে দশ, একশো, হাজার ইত্যাদি। কিন্তু 'এক'টা মুছে দিলে কিছুই নেই, সব শূন্য। সেই এক অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র নিত্য আর সব অনিত্য, পরিবর্তনীয়। আবার আত্মা 'সর্বগতঃ'। অর্থাৎ তিনি কোনও একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ নন। তিনি সর্বব্যাপী—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চনিত্যঃ'। যা সর্বত্র ব্যাপ্ত তা অনিত্য বা বিনাশী হতে পারে না। এই আত্মা আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন, আমাদের বাইরেও আছেন। আবার বলা হচ্ছে 'স্থাণুঃ' অর্থাৎ আত্মা স্থির, নিষ্ক্রিয় এবং শান্ত। কী সুন্দর সব কথা আছে! 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো

দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'। অচল বৃক্ষের মতো আত্মা একা সাক্ষীস্বরূপ আকাশরূপে বিরাজমান। আত্মা সর্বব্যাপী বলেই আত্মা স্থিরস্বভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, আমরা প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখি। তাতে একটা পর্দা সবসময় স্থির থাকে। যদি অচল কিছু না থাকত, তবে আমাদের গতির ধারণা হত না। একমাত্র আত্মাই অচল। আর সব সচল অর্থাৎ গতিশীল। কতভাবেই এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। আত্মা সনাতন। তিনি পুরাতনও নন, আবার নতুনও নন। আত্মা শাশ্বত, নিত্য। অপরিবর্তনীয়। সেই আত্মাই হল আমাদের দেহের মধ্যে রত্ন। মীরাবাই তাঁর গানে বলছেন—'রাম-রতন মই নে পায়ো।' আমি রাম-নামরূপ রত্নটি পেয়েছি। এটি মৃত্যুহীন, এর প্রভাবে সব ভয় চলে যায়, ইত্যাদি। আত্মাকে জানলে মৃত্যুকে জয় করা যায়।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ।। ২৫

অয়ম্ অব্যক্তঃ (এই আত্মা অব্যক্ত, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (এই আত্মা অচিন্ত্য—মনের অতীত) অয়ম্ (এই আত্মা) অবিকার্যঃ (অবিকারী), উচ্যতে (বলা হয়) তস্মাদ্ (অতএব) এনম্ (এই আত্মাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদিত্বা (জেনে) অনুশোচিতুম্ (অনুশোচনা করা) (তোমার) ন অর্হসি (উচিত নয়)।

এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী। অতএব এই আত্মাকে এই প্রকার জেনে, হে অর্জুন—তোমার শোক করা উচিত নয়।—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অপ্রত্যক্ষ, মনের অগোচর, অনুমান দ্বারা জানা যায় না, বিক্রিয়া রহিত, কর্মেন্দ্রিয় সকলেরও অগোচর।

এখানে 'অয়ম্' বলতে আত্মাকেই বোঝানো হয়েছে। 'অয়ম্' মানে এই। আর 'অসৌ' বললে 'ওই' বোঝায়। এ দ্বৈত মনোভাব। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি এক দেখেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'আমি এই রূপে কথা বলছি, আর ওই রূপে শুনছি।' আসলে দুই যখন নেই তখন কে-ই বা বলে আর কে-ই বা শোনে। মানুষ যখন নিজেকে বিশ্বের অনন্ত অসীম সত্তার সঙ্গে এক বলে উপলব্ধি করেন, তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়। সকল নর-নারী, সকল দেবতা-দেবদূত, সকল পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই একত্বে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তিনি সবার মধ্যে আত্মাকেই দেখেন। এই আত্মাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—অব্যক্ত। তিনি চিন্তার অতীত—অচিন্ত্য। এমনকী তাঁর সম্বন্ধে কোনও কল্পনাও করা যায় না। তিনি 'অবাঙ্মনসগোচরম্'। বাক্যমনাতীত। তারপর বলছেন, আত্মার কোনও বিকার বা পরিবর্তন নেই—অবিকার্যঃ। কোনওকিছুই আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। আত্মা আকাশের ন্যায় সর্বগত, নিত্য, বৃক্ষের ন্যায় স্থব্ধ, অচল, স্বাধীন, অটল, ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আত্মা নির্গুণ, নিরাকার। তাঁকে দেখা যায় না। মন এই আত্মাকে চিন্তাও করতে পারে না। কোনও উপায়েই আত্মার বিনাশ সম্ভব নয়। তুমি দেহটাকে ধ্বংস

করতে পার, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। আত্মার এই প্রকৃত স্বরূপ জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়।

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, আত্মার উপরোক্ত স্বরূপ অবগত হলেই তোমার শোকের কোনও কারণই থাকবে না। তুমি যদি উপলব্ধি করতে পার যে, দেহ আত্মা নয়, দেহের ধ্বংস সম্ভব, তবে আর যুদ্ধে আত্মীয়-বধে তোমার শোক হতে পারে না। অজ্ঞ মানুষ মনে করেন এই ক্ষণস্থায়ী দেহের সঙ্গে যুক্ত বস্তুসমূহই তার সর্বস্ব। এদের সংযোগ বা বিয়োগে সে সুখ ভোগ করে। আর যে ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ অবগত হয়েছেন তিনি জানেন সুখ-দুঃখ দেহেন্দ্রিয় মনের বিক্রিয়া মাত্র। ফলে তিনি জাগতিক পদার্থের সংযোগ-বিয়োগে সুখী বা দুঃখী হন না। আত্মার জ্ঞানলাভ করাই জগতের শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হবে ততদিন মানবের শোক-দুঃখের নিবৃত্তি কিছুতেই হবে না। উপনিষদ বলেন, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—যিনি আত্মজ্ঞ তিনিই শোক হতে উত্তীর্ণ হতে পারেন। অতএব হে অর্জুন, তুমি আত্মার স্বরূপ সম্যক অবগত হয়ে শোক পরিত্যাগ কর। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, জ্ঞানের একটি মাত্র পথ—বিশ্বজগতের মধ্যে যে বহু ভেদ আছে তা দূর কর, একটি মাত্র চৈতন্য সত্তা বিরাজ করছে। অতএব এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে যিনি সেই এককেই দর্শন করেন, এই জড় জগতের মধ্যে যিনি সেই চেতন সত্তাকেই দর্শন করেন, এই ছায়াময় পৃথিবীতে যিনি সেই সত্যকেই উপলব্ধি ও ধারণ করেন, তিনি শাশ্বত শান্তি লাভ করেন, অন্য কেহ নয়।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ।। ২৬

অথ চ (আর যদি) এনং (এই আত্মাকে) নিত্য-জাতং (প্রতি শরীরের সঙ্গে নূতন জাত) নিত্যং বা মৃতম্ (প্রতি শরীরের সঙ্গে নিত্য মরণশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তা হলেও) মহাবাহো (হে মহাবাহো, মহাভুজ) ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি (তোমার এর জন্য শোক করা উচিত নয়)।

হে মহাবাহো, আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা প্রতি দেহের জন্মের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতি দেহের নাশের সঙ্গেই মৃত হন, তা হলেও আত্মার অবিরত জন্ম-মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

ভগবান এখানে সাধারণ মানুষের মনবুদ্ধির উপলব্ধির কথা ভেবে অর্জুনকে বলছেন, তোমার কথামতো না হয় মেনেই নিলাম যে, আত্মার জন্ম-মৃত্যু আছে। শরীরের সাথে সাথে আত্মা জন্মাচ্ছে। আবার শরীরের নাশ হলে আত্মারও বিনাশ হচ্ছে। তাহলেও, অর্জুন, তোমার শোক করা উচিত নয়। কারণ যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। এ হবেই

হবে। যেদিন জন্মালাম সেদিন থেকেই আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। তাই বলছেন, যা অপরিহার্য, যা ঘটবেই, তার জন্য মিছে শোক করা কেন? আত্মা মরলেই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করবে, কাজেই শোকের কোনও কারণ নেই। তুমি যে পাপের কথা বলছ, দেহের বিনাশের সঙ্গে যদি সমস্ত বিনষ্ট হল তবে আর পাপের ফল ভোগ করবে কে? সুতরাং আত্মাকে জন্মমৃত্যুর অধীন বলে মনে করলেও তোমার শোক পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করাই কর্তব্য।

আসলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন, দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মা জন্মরহিত। অমর। আত্মাকে তো আমরা দেখতে পাই না। তবে কী করে তিনি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন? এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবে বলছেন, একটা হাঁড়িতে জলের ভেতর আলু-পটল রয়েছে। তার নীচে আগুন ধরানো হল। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল আলু-পটল লাফাচ্ছে। সেগুলি নিজের শক্তিতে লাফাচ্ছে না। তলায় আগুন আছে বলেই তা হচ্ছে। ঠিক তেমনি আত্মা আছেন বলেই সব চলছে। অথচ তিনি নিজে নির্লিপ্ত, উদাসীন, সাক্ষীস্বরূপ।

বস্তুত জগৎ এক অখণ্ড সত্তা—মানুষের কাছে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে জড়রূপে, বুদ্ধির মধ্য দিয়ে বিচিত্র জীবরূপে, আবার আত্মার মধ্য দিয়ে এক ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হচ্ছে। একজন দুর্বলচিত্তে জগতে সর্বত্র পাপ দেখে এবং তারই আবরণে সে নিজেকে আবৃত করে রাখে এবং তখন এই জগৎ পরিবর্তিত হয়ে তার নিকট বিকট আকার ধারণ করে। একজন ভোগসুখকামীর নিকট এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গের আকার ধারণ করে, সেই ব্যক্তি তখন ভোগসুখের আনন্দে ডুবে থাকে কিন্তু একজন পূর্ণ জ্ঞানী মানবের নিকট সব ভেদ দূর হয়ে, সবকিছুর মধ্যে তিনি তাঁর নিজেরই আত্মা দর্শন ও আত্মানন্দে পরমসুখ অনুভব করেন। সুতরাং প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন। তবে এটাই সত্য যে—নিম্নস্তরের সত্য থেকে সেই পূর্ণ সত্যের দিকে সকলেই অগ্রসর হচ্ছে। ইচ্ছা করলে সকলেই সেই সত্যে উপনীত হতে পারে। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে নিম্নতর সত্য ও উচ্চতর সত্যের প্রভেদ ধারণা করতে বলছেন।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ।। ২৭

হি (যেহেতু) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত) মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং (মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই জন্য) অপরিহার্যে অর্থে (এই অপরিহার্য বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি (তুমি শোক করতে পার না)।

যে জন্মে তার মৃত্যু যেহেতু নিশ্চিত, আবার যে মরে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। হে

অর্জুন, এই অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য বিষয়ের জন্য তোমার শোক করা কর্তব্য নয়।

জাত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। জন্ম হলেই মৃত্যুও হবে। এ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা তা স্বীকার করতে চাই না। যমরাজ যখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস কি, তখন যুধিষ্ঠির বললেন, 'চারপাশে এত মৃত্যু হতে দেখছি তবুও ভাবি আমি মরব না, আর সবাই মরবে।' কিন্তু এ অসম্ভব। যখন জন্মেছি তখন মৃত্যু ঘটবেই। তা এখনই হোক আর পরেই হোক। একথা ধ্রুব সত্য।

আবার বলছেন 'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—মৃত ব্যক্তির জন্মও ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত। আবার পুনর্জন্মে বিশ্বাস কর। কর্মক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা জন্ম-মৃত্যুর পাকচক্রে ঘুরপাক খাই। ঠিক পেণ্ডুলামের কাঁটার মতো। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাচ্ছে। আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছে।

আত্মা জন্ম-মৃত্যুর পার। এক ও অভিন্ন। তবে আমরা বহু দেখি কেন? অজ্ঞতার জন্য। কামনা-বাসনার জন্য। এই অপূর্ণ বাসনার জন্যই মৃত্যুর পর আমরা পুনরায় দেহ ধারণ করি। আমাদের প্রত্যেকের বাসনা এক নয়। নিজের নিজের বাসনা অনুযায়ী আমাদের দেহ-মন গড়ে উঠেছে। এই দেহ-মন কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর অধীন। বাসনা ক্ষয় হলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যাই। 'আমি দেহ নই, আত্মা'—এই তত্ত্বে আমি তখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হব। দেহের মৃত্যু আর আমাকে টলাতে পারে না।

তখন আমরা উপলব্ধি করি—একমাত্র আত্মাই জন্ম-মরণের অতীত—আত্মার জন্মও নাই, সুতরাং মৃত্যুও নাই। আত্মা যে-দেহে বিদ্যমান থাকে সেই দেহেরই জন্ম এবং মৃত্যু হয়। বস্তুত জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য ইত্যাদি জাগতিকশক্তি সেই বিশ্বব্যাপী পরম চৈতন্যেরই প্রকাশ। ঐ চৈতন্যই পরম প্রভু ঈশ্বর। জগতে যা কিছু, দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সবই তাঁর সৃষ্টি। বস্তুত তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই অতি নিম্নতর অণু পরমাণু হন, তিনিই জীব জগৎ সূর্য ও তারকারূপে প্রকাশিত হন, আবার তিনিই স্বরূপে ঈশ্বররূপে বিরাজমান। উপনিষদ বলছেন—তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্বে ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরে কোনরূপে চলেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সব কিছু। আমরা তোমা হতে জন্মগ্রহণ করি, তোমাতেই জীবিত এবং তোমাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করি।

অতএব হে অর্জুন, তোমার সম্মুখে যে রাজগণ উপস্থিত আছেন—এঁরা যখন জন্মগ্রহণ করেছেন তখন এঁদের মৃত্যু হবেই—তুমি যুদ্ধ করলেও হবে, না করলেও হবে। তুমি কিছুতেই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ।। ২৮

ভারত (হে অর্জুন) ভূতানি (ভূতসকল, জীবগণ অর্থাৎ জীবের শরীর) অব্যক্ত-আদীনি (আদিতে অব্যক্ত ছিল), ব্যক্ত-মধ্যানি (মধ্যকালে—অর্থাৎ স্থিতিকালে ব্যক্ত হয়েছে), অব্যক্তনিধনানি এব (মরণান্তেও অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও অব্যক্তভাবই প্রাপ্ত হবে) তত্র (তাতে) কা (কী) পরিবেদনা (শোকের কী কারণ আছে?)

হে অর্জুন, জীবগণ আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্বে অব্যক্তরূপে ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে, মধ্যে অর্থাৎ জন্মের পর স্থিতিকালে প্রকাশিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, আবার মৃত্যুর পর অর্থাৎ বিনাশে বা প্রলয়কালে আবার অপ্রকাশিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়। অতএব অল্প সময়ের জন্য জীবের স্থিতিকাল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় ফলে তার জন্য শোকের কী কারণ আছে?

মানুষ কোথা থেকে এসেছে, আবার মৃত্যুর পর কোথায় যাবে—তা কেউ জানে না। তাই তো উপনিষদে পাই, 'কুতোহয়মৃজাতঃ'। কোথা থেকে এই দেহ এল? সংসার, জগৎ এসবই বা কোথা থেকে এল? তখন সব ঋষিরা ধ্যানে বসলেন। ধ্যান করে জানলেন, আমরা সব ব্রহ্ম থেকে এসেছি, আবার ব্রহ্মেই ফিরে যাব। চিরকাল মানুষ এই প্রশ্নই করে আসছে। আমি আমার অতীতকে জানি না। আবার মৃত্যুর পর কী হবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎও আমার অজানা। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝের সময়টাই কেবল আমরা জানি। কিন্তু এও তো দুদিনের জন্য। এই আছে, এই নেই। ক্ষণস্থায়ী। এর জন্য আবার মিছে শোক করা কেন? যেমন, স্বপ্নে আমরা বাঘ দেখি, রাজা হওয়া ইত্যাদি কত কীই তো দেখি। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে কি তার জন্য মন খারাপ করি? নিশ্চয়ই নয়। এও ঠিক তাই। সুতরাং জন্ম বা মৃত্যুর জন্য শোকের কোনও কারণই নেই।

মৃত্যুর পর জীব ব্যক্ত অবস্থা হতে অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়—এটাই জীবের মৃত্যু। এই অব্যক্ত অবস্থা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। এই অব্যক্ত অবস্থা হতে জীব পুনরায় ব্যক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়—এটাই জীবের জন্ম। ব্যক্ত অবস্থায় জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রকারে জীব ব্যক্ত হতে অব্যক্ত, আবার অব্যক্ত হতে পুনরায় ব্যক্ত—এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে চলছে।

ব্যক্ত অবস্থায় জীব কেউ পিতা, কেউ মাতা, কেউ বন্ধু বলে অভিহিত হয়। হে অর্জুন, তোমার আত্মীয়গণ এই জীবিতকালের কয়েকদিন মাত্র তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হচ্ছে। কাজেই এঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়। জীব অদর্শন হতে এসেছে, পুনরায় অদর্শনে গমন করছে। সে তোমার নয়, তুমিও তার নয়, বৃথা কেন ভাবনা? আত্মা অবিনাশী, কাজেই তার জন্য শোক করা উচিত নয়।

অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি। প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ আদিতে সমভাবে থাকে। বৈষম্য হলেই তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং তারপর সৃষ্টির প্রবাহ চলতে থাকে। প্রলয়ে সৃষ্টির অবসান হলে তা আবার মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। এইপ্রকার সৃষ্টি

এবং লয় পুনঃপুন ঘটে থাকে। সৃষ্টিতে ভূতগণ একবার অব্যক্ত হতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, পুনরায় প্রলয়ে ব্যক্ত অবস্থা হতে অব্যক্তে লীন হয়। এটাই ভৌতিক দেহের পরিণাম, এর জন্য আবার শোক কী?

শূন্য হতে কিছুই উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিসই অনন্তকাল ধরে রয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে। কেবল তরঙ্গের ন্যায় একবার উঠছে, আবার পড়ছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ। সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে—আবার ক্রমসঙ্কুচিত হয়ে অব্যক্তভাব ধারণ করবে। বীজ হতে বৃক্ষের উদ্ভব, আবার বীজে উহার পরিণাম অর্থাৎ সকল বস্তুর আদি ও অন্ত এক। পৃথিবীর উৎপত্তি তার কারণ হতে, আবার কারণেই তার বিলয়। বেদান্ত বলে আরম্ভকে জানতে পারলে পরিণাম জানতে পারব। আবার অন্ত জানতে পারলে আদি জানতে পারব। এইজন্যই সকল শাস্ত্রই বলে 'আমরা ঈশ্বর হতে এসেছি এবং তাঁতেই ফিরে যাব। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই 'ঈশ্বর' অতএব ঈশ্বরকে জানাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

ভগবান অর্জুনকে 'ভরত' বলে সম্বোধন করে বলছেন, তুমি শুদ্ধ ভরতবংশের সন্তান, জ্ঞানি- শ্রেষ্ঠ। তুমি সাধারণ নও, শাস্ত্রের অর্থ বোঝার ক্ষমতা তোমার যথেষ্ট আছে। সুতরাং এইসব তুচ্ছ বিষয়ের জন্য তুমি শোক-বিলাপ কোর না।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।। ২৯

কশ্চিৎ (কেউ) এনং (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (আশ্চর্য বস্তু বলে দেখেন) তথা এব চ (সেই জন্য) অন্যঃ (অন্য কেউ) আশ্চর্যবৎ বদতি (আশ্চর্য বস্তু বলে বর্ণনা করেন) অন্যঃ চ (অন্য কেউ) এনং (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ শৃণোতি (আশ্চর্য বস্তু বলে অপরের নিকট শ্রবণ করেন) শ্রুত্বা অপি (শুনেও) এনং ন বেদ (এই আত্মাকে জানতে পারে না)।

কেউ কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন। আবার কেউ কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ বলে বর্ণনা করেন। অন্য কেউ আবার, আত্মা আশ্চর্যবৎ—এই রকম কথা শোনেন। কিন্তু শুনেও কেউ কেউ এই আত্মাকে জানতে পারেন না। অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন না।

প্রশ্ন হল, আত্মা যদি শোক-দুঃখের অতীত হন, তবে মানুষ শোক করে কেন? শ্রীকৃষ্ণ

উত্তরে বলছেন, আত্মতত্ত্ব বড়ই দুর্বোধ্য। এ এমনই এক অভিনব তত্ত্ব যে, যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন তিনিও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যান। আত্মার সম্বন্ধে বলা হয়, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। ভাষা এই আত্মার কথা বলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। মনও সেখানে পৌঁছুতে পারে না। আত্মা বাক্যমনাতীত। অদ্বিতীয়। তাঁর জুড়ি নেই। আবার আত্মবিৎ পুরুষও আত্মার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে তাঁকে আশ্চর্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমাধি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলতেনঃ 'ইচ্ছে তো করে তোমাদের কাছে বুঝিয়ে বলি। কিন্তু কে যেন গলাটা চেপে ধরে।'

আবার গুরু হয়তো শিষ্যকে আত্মার স্বরূপ বলছেন। কিন্তু শিষ্য শুনেও তা বুঝতে পারছে না। এর কারণ কী? বলতে চাইছেন, আমি আমার থেকে পৃথক কোনও বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি। কিন্তু আমি কি কখনো আমাকে জানতে পারি? না, এ উপলব্ধির ব্যাপার। বিবেক-বৈরাগ্য, শমদমাদিকে সহায় করে, গুরুবাক্য ও বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ-মনন-ধ্যান ইত্যাদি সাধন-মার্গকে অবলম্বন করে শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মতত্ত্ব বোধে বোধ হয়। আত্মা তখন শিষ্যের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হন। বেদান্তে আছে, আত্মা 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' তিনি অণুর থেকেও অণু, আবার মহতের থেকেও মহান। সেজন্য আশ্চর্য ছাড়া আর কিছুই আত্মার সম্বন্ধে বলা যায় না। আত্মা নিজে আশ্চর্য। তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তা আশ্চর্য। যাঁরা বলেন তাঁরা আশ্চর্য। আবার যাঁরা শোনেন তাঁরাও আশ্চর্য।

আত্মা বরাবরই এক রহস্য হয়ে রয়েছেন। এই রহস্য ভেদ করবার উপায় অধ্যাত্ম সাধন। কঠোপনিষদ বলছেন, 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ'—আত্মার উপদেষ্টাকে আশ্চর্য পুরুষ হতে হবে। শিষ্যকেও আশ্চর্য হতে হবে, যখন এই দুই-এর মিলন হয় অর্থাৎ দক্ষ গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়ে যে শিষ্য আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করে সেই শিষ্যও দক্ষ। অতএব আত্মা আশ্চর্যবৎ। আত্মতত্ত্ব অনেকের শোনাই হয় না, আবার অনেকে শুনেও তাঁকে জানতে পারে না। আত্মতত্ত্ব বক্তা আশ্চর্যবৎ। আত্মসাক্ষাৎকার পুরুষ পরম কুশলী। আত্মজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মকে জেনে শিষ্য আশ্চর্যবৎ হন। বস্তুত আত্মতত্ত্বকে শোনা ও উপলব্ধি করা বড় কঠিন। আশ্চর্যগুরু ও আশ্চর্য শিষ্যের মিলনও জগতে দুর্লভ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজের অনুভূতির প্রসঙ্গে বলছেন—দক্ষিণেশ্বরে একটি গাছের নিচে আমি একজন গুরুকে দেখেছিলাম—ষোড়শবর্ষীয় এক যুবক শিষ্য এবং এক আশ্চর্য বৃদ্ধ গুরু। গুরু নীরবে শিক্ষা দিচ্ছেন, আর শিষ্যের সব সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত জাগতিক কোন পদার্থের সঙ্গে আত্মার সাদৃশ্য নাই। আত্মার আশ্চর্য স্বরূপ বেদের বহু বাক্যে বিবৃত হয়েছে। অতএব সেই আশ্চর্য আত্মাকে জানাই মানবজীবনের

উদ্দেশ্য। তাই বিবেকানন্দ ধর্মের সংজ্ঞা দিচ্ছেন—ধর্ম হলো পূর্ব হতেই মানবের অন্তরে যে দেবত্ব নিহিত রয়েছে তাকে প্রকাশ করা। গীতার বাণী সেই অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশের কথাই বলছে। আত্মার অনন্ত শক্তি। মানুষ সেই আশ্চর্য শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে। সেই আত্মার মহিমা অনন্ত। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'যে আত্মা জীবাত্মারূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁর মহিমা, কোনও গ্রন্থ, কোনও শাস্ত্র, কোনও বিজ্ঞান কল্পনাও করতে পারে না।' এই আত্মার মহিমা আশ্চর্যরূপে অনুভব হবে যখন আমরা সেই আত্মা বুঝতে চেষ্টা করব।

তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে বলছেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। তাহলে শোক-মোহ আর তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ৩০

ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য দেহে (সকল জীবদেহে) অয়ং দেহী (এই আত্মা) নিত্যম্ অবধ্যঃ (নিত্য অবধ্য) তস্মাৎ (সেইজন্য) ত্বম্ (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীর জন্য) শোচিতুম্ ন অর্হসি (শোক করতে পার না)

হে ভারত, প্রাণিগণের দেহে অবস্থিত আত্মা চিরকালই অবধ্য। সেজন্য কোনও প্রাণীর দেহনাশের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

এ পর্যন্ত আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, এই শ্লোকে তার উপসংহার করা হল। ভগবান বলছেন সকল জীবের দেহ ভিন্ন হলেও আত্মা এক। দেহের মধ্যে আত্মা রয়েছেন। দেহ হত হলেও আত্মা অবধ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, দেহ আর দেহী এক নয়। দেহকে কখনও ঘর, কখনও ঘট, আবার কখনও বা গুহা বলা হয়ে থাকে। আর এই ঘরের মধ্যে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন ঘরনি। দেহী হচ্ছেন এই ঘরনি অর্থাৎ আত্মা। আত্মাকে কেউ বধ করতে পারে না—অবধ্য। স্থূল জিনিসকে বধ করা যায়। কিন্তু যা সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, নিরাকার তাঁকে কি কেউ বধ করতে পারে? আত্মা নিত্য, সর্বদা রয়েছেন। তিনি কালাতীত। শাশ্বত।

আবার বলছেন, 'দেহে সর্বস্য ভারত'। এই আত্মাই সকলের দেহে বিরাজ করছেন—'মা বিরাজেন ঘটে ঘটে।' অল্ডাস্ হাক্সলে বড় সুন্দর কথা বলছেন, 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক' (H.C.F-Highest Common Factor) অর্থাৎ সকলের মধ্যে তিনি আছেন। এমন নয় যে, আমার মধ্যে এক টুকরো আর আপনার মধ্যে আর এক টুকরো। না, তা নয়। তিনি পূর্ণ—অন্তঃপূর্ণ, বহিঃপূর্ণ। তাঁকে খণ্ডিত করা যায় না। তিনিই আমাদের সকলকে ধারণ করে আছেন। তবে আপনি যখন 'আমি' বলেন বা আমি যখন 'আমি' বলি, তখন আমরা একটা কল্পিত ভেদ সৃষ্টি করি মাত্র। যতক্ষণ দেহবোধ আছে ততক্ষণ

আমি আপনার থেকে আলাদা। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই 'এক'-কে অর্থাৎ দেহীকে চেনা, জানা। তখন দেখব 'একদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।' সকলের মধ্যে সেই এক আত্মা বিরাজমান। সূত্রে গ্রথিত মুক্তো—যেমন মালার সকল মুক্তোর ভিতর দিয়ে এক সুতো প্রবেশ করেছে, সেইরূপ সকল জীবের মধ্যে এক আত্মা প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অনন্ত শক্তি রয়েছে। জীবনের লক্ষ্য সেই দেবত্বের অনুসন্ধান ও প্রকাশ করা। গীতায় শ্রীভগবান এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। মানব- জীবনে, কর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আশ্চর্য আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। জীবনই ধর্ম কারণ আধ্যাত্মিকতাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। আধ্যাত্মিকতা আমাকে অন্যের কাছ থেকে ধার করে নিতে হবে না। আধ্যাত্মিকতাই মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং সেই অনন্ত শক্তির সাধন। মানব মাত্রই সেই আত্মার শক্তির সংস্পর্শে আসলে সে দেবতা হয়ে যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—হে অর্জুন! আত্মার সেই অপূর্ব মহিমা অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত স্বরূপের কথা অনুধাবন কর। এই সত্যকে যদি উপলব্ধি করতে পার, প্রকৃত স্বরূপের সান্নিধ্যে পৌঁছাতে পার, তুমি অসীমের আনন্দ লাভ করবে। অসীমই সত্য, সসীম তো খেলামাত্র। তুমি একাধারে অসীম আত্মা ও সসীম দেহ। দেহের নাশ কিন্তু আত্মা অবিনাশী, নিত্য, সর্বব্যাপী। আর কার জন্যই তুমি শোক, মোহ বা ভয় করবে, সবই তো তোমার আত্মা। অতএব তোমার শোক, মোহ, ভয় ত্যাগ করা উচিত।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।। ৩১

স্বধর্মম্ অপি চ (এবং নিজ স্বভাবজাত ধর্মও) অবেক্ষ্য (দেখেও, লক্ষ করে) বিকম্পিতুম্ ন অর্হসি (বিচলিত হওয়া কর্তব্য নয়) হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (অন্য কিছুই) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর) ন বিদ্যতে (নেই)।

আর স্বধর্মের কথা ভেবেও তোমার ভীত, বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নেই।

স্ব-ধর্ম মানে নিজের ধর্ম। ধর্ম মানে হচ্ছে কর্তব্য, চরিত্র, স্বভাব। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। জলের ধর্ম যেমন শৈত্য, আগুনের ধর্ম তার দাহিকা শক্তি, দুধের ধর্ম ধবলত্ব ইত্যাদি। এখন যদি জল থেকে তার চরিত্রকে অর্থাৎ শৈত্যকে সরিয়ে নেওয়া যায় তখন জল আর জল থাকে না। তেমনি প্রতিটি মানুষের মনের একটা ঝোঁক আছে। এমনকী ছোট শিশুরও আছে। অনেক সময় দেখা যায় ছোট শিশুরা আপন মনে ছবি আঁকছে বা যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এ তাদের স্বভাব। স্বধর্ম। আমরা কেউ এক-ছাঁচে গড়া

নই। আমার একটা আলাদা পথ আছে, আপনারও একটা আছে। আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। অনেক সময় শোনা যায়, বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের বলেন তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে। তাঁদের নিজেদের হয়তো ইচ্ছা ছিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। হননি বা হতে পারেননি। তাই সন্তানকে বাধ্য করছেন সেই পথ বেছে নিতে। সন্তানের হয়তো ঝোঁক অন্যদিকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন তুমি ক্ষত্রিয়। তোমারও একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যটা কী? সত্যকে রক্ষা করা। দুর্বল, পীড়িত, অত্যাচারিত যাঁরা, তাঁদের রক্ষা করা। ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই যুদ্ধ নিজের জন্য নয়। ধর্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, স্বদেশরক্ষা বা ন্যায়নীতি রক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ। এই ধর্মযুদ্ধে সামিল হওয়াই ক্ষত্রিয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

অতএব হে অর্জুন, আত্মার স্বরূপকে জানলে তোমার শোকের কারণ থাকবে না। সেইরূপ তোমার স্বধর্মের বিষয় যদি আলোচনা কর তা হলেও শোকে-দুঃখে বা পাপের ভয়ে তোমার ভীত হওয়া কর্তব্য নয়। কারণ স্বধর্মে ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়োলাভ হয়।

এই জগৎ তিন গুণের সমন্বয়ে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ক্রিয়াতে সৃষ্টি। কোথাও গুণ সমভাবে নেই। গুণবৈষম্যই সৃষ্টির মূল। মানবপ্রকৃতিও এই তিন গুণের সমবায়ে গঠিত। এই গুণবৈষম্য অনুসারে মানবপ্রকৃতি চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান তার নাম ব্রাহ্মণপ্রকৃতি, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতির নাম ক্ষত্রিয় প্রকৃতি, তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতি বৈশ্যপ্রকৃতি এবং রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান প্রকৃতির নাম শূদ্রপ্রকৃতি। এইরূপ ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ ও শূদ্রবর্ণ।

প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি ও তদনুযায়ী কর্মই তার স্বধর্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বভাব—শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, দান, ঈশ্বরভাব প্রভৃতি গুণের প্রকাশ হয়। রাজ্যশাসন, রক্ষা, শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন, সমাজে শান্তিস্থাপন প্রভৃতি কাজ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। ভগবান বলছেন, এই যুদ্ধে হে অর্জুন তুমি শ্রেয় অর্থাৎ সর্বপুরুষার্থ লাভ হয়। ধর্মযুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র শ্রেয়। ক্ষত্রিয়ের গৌরব।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তার বুদ্ধিবল, সামর্থ্য, মানবপ্রেমের প্রয়োগের জন্য মানবিক মূল্যবোধ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সুযোগ আর কিছু হতে পার না। বেদান্ত ঘোষণা করে যে মানুষমাত্রই দেবস্বরূপ। তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। এই আত্মা শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, অনন্ত, নিত্যমুক্ত, আনন্দময় এবং ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। মানুষ কখনই পাপী নয়। সে অজান্তে ভুল করে ও দুঃখভোগ করে। একবার জ্ঞানের আলো পেলে ও মন থেকে অবিদ্যা দূর হলে, তার দ্বারা আর কখনই ভুল কর্ম হবে না। তখন সে মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে।

নিজেকে দুর্বল ও বদ্ধ ভেবে মানুষ দুর্বল ও অন্যায় নিষিদ্ধ কর্ম করে। প্রকৃতপক্ষে কোনও মানুষ দাসত্ব চায় না কারণ মুক্তিতেই আনন্দ ও মুক্তিই মানুষের প্রকৃত স্বভাব।

তাই মানুষ এই সংসারের দুঃখ ও বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে সর্বদা সংগ্রাম করে চলেছে। এই মুক্তিলাভ বা ঈশ্বর লাভকেই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলা হয় এবং কী করে মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রকাশিত হয় সেই শিক্ষা দেওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে বেদান্তধর্ম চারটি পথের নির্দেশ দিয়েছে। নিষ্কাম কর্মের পথ, জ্ঞানের পথ, ধ্যানের পথ ও ভক্তির পথ। উপনিষদের যুগে ও তার পরবর্তী যুগে ঋষি ও মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবনে এই সকল পথে সাধনা করে দেখিয়ে গেছেন কীকরে মানুষ তার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করে ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে পারে। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ।।৩২

পার্থ (হে অর্জুন) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই) যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্‌ (অযাচিতভাবে প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বয়ং উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্‌ (মুক্ত স্বর্গের দ্বারস্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধম্‌ (এই প্রকারের যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন)।

হে অর্জুন, অযাচিতভাবে প্রাপ্ত বা স্বয়ং উপস্থিত মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এইপ্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করেন।

দুর্যোধনদের বিদ্বেষবুদ্ধির জন্যই এই যুদ্ধের আয়োজন। অর্জুনকে নিজের জন্য যুদ্ধ করতে বলছেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ শাস্ত্রবিহিত। ক্ষত্রিয় যদি কোনও ফলের আশায় যুদ্ধ করেন তাহলে তাতে পাপ হয়। তাকে ধর্মযুদ্ধ বলে না। কিন্তু কেবল কর্তব্যবোধের তাগিদে, ন্যায়নীতিকে রক্ষা করার জন্য যদি যুদ্ধ করা হয়, তাতে কোনও পাপ হয় না। এমনকী ব্রাহ্মণকে হত্যা করলেও হয় না।

তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি পরম ভাগ্যবান। ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ তুমি আপনা থেকেই লাভ করেছ। তুমি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তাহলে স্বর্গদ্বারও তোমার নিকট উন্মুক্ত বলে জানবে। ক্ষত্রিয়ের দেশ ও ধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ করা ও প্রাণনাশ করা পুণ্য এবং স্বধর্ম।

এখানে ভগবান পরিস্কার করে বলছেন, ধর্মযুদ্ধ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—হে অর্জুন, তুমি নিজের ইচ্ছাতে এই যুদ্ধে লিপ্ত হওনি—এমনকী এই যুদ্ধ তুমি প্রার্থনাও করনি, বরং এই যুদ্ধ নিবারণের জন্যই চেষ্টা করেছ। এই যুদ্ধের ফলে ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় হবে—কাজেই এটাই ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধে যাঁরা ধর্মের পক্ষে থাকবেন তাঁদের স্বর্গলাভ নিশ্চিত। সুতরাং এই ধর্মযুদ্ধে তোমার নিকট স্বর্গের দ্বার যেন আপনা হতে খুলে গিয়েছে। নিতান্ত সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়েরাই এরূপ অপ্রার্থিত ধর্মযুদ্ধ করবার সুযোগ পায়। আপনা হতে উপস্থিত সাক্ষাৎ

স্বর্গলাভের দ্বার। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এক বৃহত্তম গৃহযুদ্ধ ছিল। যেখানে ধ্বংস হয়েছিল বহু মানুষ ও আমাদের সংস্কৃতি। মহাভারতের যুদ্ধ আমাদের দেশের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এর পর থেকে সভ্যতা বদলে গেল।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ।।৩৩

অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্‌ (তুমি) ইমং ধর্ম্যং সংগ্রামম্‌ (এই ধর্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তা হলে) স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা (স্বধর্ম এবং কীর্তি ত্যাগ করে) পাপম্‌ অবাপ্স্যসি (পাপকে প্রাপ্ত হবে)।

আর যদি তুমি এ ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে নিজ ক্ষত্রিয়ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগের জন্য প্রত্যবায়রূপ পাপগ্রস্ত হবে।

মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র বলে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধে বিরত থাকা গর্হিত পাপ। আর্যরা শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলেছিল বলে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেক আর্যসন্তানই সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করা মহাগৌরবের ও স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করত।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি তোমার কর্তব্য থেকে সরে যেও না। অর্থাৎ এই ধর্মবিহিত যুদ্ধ কর, নাহলে তুমি পাপের ভাগী হবে। অর্জুন তুমি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যদি তুমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ কর, তাহলে তুমি ক্ষমারও অযোগ্য।' অবশ্য যে-কোনও উপায়ে যুদ্ধ করলেই কিন্তু ধর্মরক্ষা হয় না। যুদ্ধ তো কৌরবরাও করবে, কিন্তু তারা ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে করবে—এ অধর্ম। তাই তারা পাপী। অর্জুন ধর্ম ও দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে। তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পক্ষে সারথি হয়েছেন। কারণ তিনি ধর্মস্থাপনের জন্যই এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন।

ভগবান বলছেন, তুমি স্বধর্ম পালন না করলে পাপ হয়। তোমার অকল্যাণ, সমাজের ও ধর্মের ক্ষতি। আত্মার নিঃশ্রেয়স্‌ অর্থাৎ মোক্ষ এবং জগতের অভ্যুদয়সাধন—মানুষ জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হলেই পাপ। প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রকৃতিগত জাতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের কোনও না কোনও বর্ণের অন্তর্গত। প্রত্যেক বর্ণের কতকগুলি কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। স্বীয় বর্ণ বা প্রকৃতি অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাই মানুষের স্বধর্ম। শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে এই স্বধর্ম পালন করলে আত্মার কল্যাণ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স্‌ ও জগতের অভ্যুদয় হবে।

অর্জুন ক্ষত্রিয় সুতরাং যা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাই অর্জুনের স্বধর্ম। ক্ষত্রিয় ধর্মের অনুশাসন মেনে যুদ্ধ করবে। তাতে ধর্মের মর্যাদা রক্ষা, অত্যাচারী ও দুর্বৃত্তের দমন এবং সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি হবে। অতএব ধর্মযুদ্ধ ত্যাগ করলে আততায়ী জয়লাভ করবে, তাতে

ধর্মের ক্ষতি, জগতের অকল্যাণ ও পাপীদের সুযোগ করে দেওয়া হবে—এতে পাপ বিস্তারলাভ করবে।

এই অধর্ম আচরণের ফলে অর্জুনের অকীর্তি হবে। ধর্মপালনের দ্বারা কীর্তি অর্জন হয় এবং ধর্ম পালন না করলে অকীর্তি হয়। কীর্তি ত্যাগ করলে ধর্মত্যাগ করা হয়। সুতরাং তাতেই পাপ হবে। অর্জুন পূর্বে বলেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধ করলে তাঁদের পাপ হবে। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধ না করলেই পাপ হবে।

ভগবদ্গীতায় ভগবান বর্ণাশ্রম-গত কর্তব্য কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যে সমাজে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সেই সমাজের আদর্শ ও কর্তব্য কর্মের ধারা অনুসারে কর্ম করে আমাদের জীবন উন্নত ও মহৎ হয়। এটা মনে রাখতে হবে সকল সমাজে ও সকল দেশে একপ্রকার আদর্শ ও কার্যপ্রণালী প্রচলিত নয়। এই বিষয়ে অজ্ঞতা থাকায় আমরা অপর জাতির প্রতি দ্বেষ করে থাকি। বাস্তবিক কর্তব্য কর্মের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকতে পারে না। অনাসক্ত কর্মীর নিকট সকল কর্তব্য কর্মই সমান এবং কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেই তার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪

অপি চ (আরও) ভূতানি (লোকসকল) তে অব্যয়াম্ অকীর্তিম্ (তোমার চিরকালব্যাপী অযশ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করবে) সম্ভাবিতস্য অকীর্তিঃ (সম্মানিত ব্যক্তির অপযশ) মরণাৎ চ অতিরিচ্যতে (মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক হয়)।

আরও দেখ, সকলেই (দেব, ঋষি, মানুষ প্রভৃতি) চিরকাল ধরে তোমার অকীর্তি ঘোষণা করবে, সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক পীড়াদায়ক।

ভগবান বলছেন, অর্জুন তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তাহলে মানুষ, দেবতা, ঋষি সকলেই তোমার চিরকাল নিন্দা করবে। এবং অনন্তকাল ধরে তুমি নিন্দিত হবে। কারণ তুমি সাধারণ ব্যক্তি নও। তুমি সম্মানিত ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। মহান। সকলে তোমাকে সম্মান করে। শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এমন ব্যক্তির পক্ষে নিন্দা বা দুর্নাম মৃত্যু অপেক্ষা বেশি কষ্টদায়ক। যুদ্ধ থেকে সরে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের চোখে অর্জুন হেয় হয়ে যাবেন। চিরকালের জন্য সকলের নিন্দার পাত্র হবেন। তাই অর্জুনকে এই যুদ্ধ করতেই হবে। সাধারণ অখ্যাত ব্যক্তির অপযশ হলে সে তা অনায়াসে সহ্য করতে পারে, কিন্তু সম্মানিত লোকের অযশ মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

যে একবার যশের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার পক্ষে এই যশ হারানোর থেকে মরণও শ্রেয়। 'অপযশ নিয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।' এটি এক চমৎকার ভাব।

সকল বীর্যবান পুরুষই এইভাবে চিন্তা করে। আমাদের সকলের উচিত ব্যক্তিগত যশ ও আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন থাকা। সৎ ব্যক্তি কখনও লোভে বা অর্থের বিনিময়ে নিজের মর্যাদা হারাতে চান না। আত্মমর্যাদাকে শ্রেয় জ্ঞান করেন। তাঁরাই সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বর্তমানে সমাজেও সেইসব সৎ ব্যক্তির প্রয়োজন। ভগবান বলছেন, যিনি ধর্মাত্মা, অতিশয় বীর ও নানা গুণে ভূষিত, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই সমাজে গুণবান পুরুষ নামে বিখ্যাত এবং তিনি কখনোই অকীর্তির কথা সহ্য করতে পারবেন না। তার চেয়ে মৃত্যু বরণ করা তিনি শ্রেয় মনে করবেন। সৎ কর্মের কথা যেমন মানুষ মনে রাখে অপর দিকে অকীর্তি, ও পাপের কথাকে তারা অধিক ঘৃণা করে। দুর্যোধন বা রাবণের পাপের কথা মানুষ চিরকাল মনে রাখে ও ঐ চরিত্রগুলিকে ঘৃণা করে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫

মহারথাঃ (মহারথিগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ রণাৎ উপরতম্ (ভয়ে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করবে) যেষাং বহুমতঃ ভূত্বা (যাদের কাছে সম্মানিত হয়েও) ত্বং লাঘবং যাস্যসি (তুমি এখন হেয়ত্ব প্রাপ্ত হবে)।

(কর্ণ, দুর্যোধন) মহারথগণ মনে করবে যে, তুমি ভয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছ (দয়াবশত নয়)। সুতরাং যাঁরা তোমাকে সম্মান করেন, তাঁদের সামনেও তুমি হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যাবে।

ভগবান বলছেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই ধর্মযুদ্ধ থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। যুদ্ধ থেকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। ভয়ে যদি অর্জুন যুদ্ধ থেকে পিছপা হন, তাহলে বীরপুরুষরা তাঁকে কাপুরুষ বলবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এসব মহারথিগণ অর্জুন সম্বন্ধে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। ভালবাসেন। এইসব মহারথীদের দৃষ্টিতে অর্জুন হচ্ছেন বীর। কিন্তু যুদ্ধ না করলে এঁরাই তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখবেন। বলবেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, এঁদের ভয়ে অর্জুন যুদ্ধ করছেন না। অর্জুনকে তাঁরা কাপুরুষ, ভীরু বলে মনে করবেন। অতএব অর্জুনের এই ধর্মযুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য।

কর্ণ, দুর্যোধন—এঁরা মনে করবেন অর্জুন ভয়ে যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হয়েছেন। অর্জুন যে আত্মীয়দের প্রতি স্নেহবশত অস্ত্রত্যাগ করেছেন একথা শত্রুপক্ষের বীরগণ মোটেই বুঝবেন না। এতকাল অর্জুন তাঁদের কাছে সম্মানের পাত্র ছিলেন, কারণ বহু যুদ্ধে তাঁরা অর্জুনের শৌর্য বীর্যের পরিচয় পেয়েছেন। এখন তাঁকে যুদ্ধ ত্যাগ করতে দেখলে তাঁরা অর্জুনকে ভীরু বলে উপহাস করবেন। সাধারণ লোকের নিন্দা বরং সহ্য হয়, কিন্তু কৌরব প্রতিপক্ষের উপেক্ষা অসহনীয়।

অর্জুন মনে করেছিলেন যুদ্ধ না করলেই দুর্যোধনাদি সকলেই তাঁর প্রশংসা করবেন

কারণ অর্জুন যুদ্ধ না করলেই তাঁদের মঙ্গল ও জয়। অর্জুনের এই ভ্রম দূর করার জন্য ভগবান বলছেন—প্রশংসা দূরে থাকুক, অর্জুনকে দুর্বল কাপুরুষ দেখে তাঁরা ধিক্কারপূর্বক গ্লানির সঙ্গে হাসবেন ও নিন্দা করবেন। সেই অপমান অর্জুনের পক্ষে সহ্য করা থেকে যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করাই শ্রেয়।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।।৩৬

তব (তোমার) অহিতাঃ চ (শত্রুরাও) তব (তোমার) সামর্থ্যং (শক্তি বা বল) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করে) বহূন্ (অনেক) অবাচ্যবাদান্ (কুকথা) বদিষ্যন্তি (বলবে), ততঃ (তার চেয়ে) দুঃখতরং (অধিক দুঃখজনক) নু কিম (আর কী আছে?)

শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক কুকথা বলবে। তার চেয়ে অধিক দুঃখের আর কী হতে পারে?

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন! শত্রুরা তোমার নিন্দা করবে। এমন সব কথা বলবে যা মুখেও উচ্চারণ করা যায় না। বীরকে যদি কাপুরুষ বলা হয়, তার থেকে অপমানজনক আর কী হতে পারে? এরকম অশোভন ব্যবহারই শত্রুরা করতে থাকবে। এক সময়ে যাঁরা তোমার প্রশংসা করতেন তাঁরাই এখন তোমাকে অক্ষম, দুর্বল বলবেন। তোমাকে অপমান করবেন। এর চেয়ে বেশি দুঃখের বিষয় আর কিছুই থাকতে পারে না।

ভগবান বলতে চাইছেন যে, অর্জুনের হঠাৎ যুদ্ধবিরতি দেখে সকলে নিন্দা করবে। সত্য-মিথ্যা নানা কুৎসা প্রচার করবে। এইসকল কথা শুনে তোমার দুঃখ তো হবেই, পরন্তু আমাদের দুঃখও অধিক হবে। অতএব অযশ এবং অযথা নিন্দার দুঃখ হতে যদি ত্রাণ পেতে চাও, তবে তোমার যুদ্ধ করাই কর্তব্য। এই পরিস্থিতিতে স্বধর্ম পালন অর্থাৎ স্বজন বধ করে যুদ্ধ করাই শ্রেয়। যুদ্ধ না করলে অধিক দুঃখের কারণ হবে। মানীর অপমান শিরশ্ছেদতুল্য, বীরের জীবনে ভীরুতা বা অসামর্থ্যের অপবাদ মৃত্যু অপেক্ষাও অসহনীয়। অতএব এই ভীরুসুলভ আচরণ ত্যাগ কর। তোমার সমস্যার সম্মুখীন হও।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।৩৭

(কৌন্তেয়, (হে কৌন্তেয়) হতঃ বা (হত হলে) স্বর্গং (স্বর্গ) প্রাপ্স্যসি (পাবে) জিত্বা বা (জয়ী হলে) মহীম্ (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করবে) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃতনিশ্চয়ঃ (দৃঢ়সংকল্প হয়ে) উত্তিষ্ঠ (ওঠো)।

হে অর্জুন, এই ধর্মযুদ্ধে যদি হত হও তার ফলে স্বর্গলাভ হবে, আর যুদ্ধে যদি জয়ী হও তাহলে পৃথিবী ভোগ করবে। অতএব হে কৌন্তেয়, স্থির সংকল্প করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

যুদ্ধরূপ কর্তব্যকর্ম সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে করলে তুমি পাপভাগী হবে না।

প্রত্যেককেই স্বধর্ম অনুযায়ী কর্তব্য করতে হয়। এই কর্তব্য এক-এক জনের এক এক রকম। আর তা না করলেই প্রত্যবায়। প্রত্যবায় মানে স্খলন। আমার যা কর্তব্য, যা আমার করা উচিত ছিল, তা করলাম না—ফলে আমি পাপের ভাগী হব। কর্তব্যকর্ম করলে কী ফল হবে তা আমি জানি না। কিন্তু কর্তব্যজ্ঞানেই তা আমাদের করা উচিত।

ধর্মবিহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: 'স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তুমি নিহতও হতে পার। তাহলেও তুমি স্বর্গলাভ করবে, 'প্রাপ্স্যসি স্বর্গম'। অর্থাৎ ভগবান বলতে চাইছেন, আদর্শকে রক্ষা করতে গিয়ে, সত্যকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি তুমি মরেও যাও, সেই মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। মরে গিয়েও তুমি স্বর্গলাভ করবে। আর যদি জয়ী হও তাহলে এই জগৎকে ভোগ করবে। তারপর 'কৌন্তেয়' বলে অর্জুনকে তাঁর বংশ-পরিচয় মনে করিয়ে দিচ্ছেন। অর্জুন বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তাই ভগবান বলছেন: 'অর্জুন, মনে রেখো তুমি কুন্তীপুত্র। কাপুরুষতা, ভীরুতা এই সব দুর্বলতা তোমার শোভা পায় না। অতএব দৃঢ়সংকল্প হও। যুদ্ধের জন্য উঠে-পড়ে লাগো।

পার্থ অর্থাৎ পৃথাপুত্র—পৃথা, দেবী কুন্তীর পিতৃদত্ত নাম। রাজা কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা বলে দেবী পৃথা—কুন্তী দেবী নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। পার্থ বা কৌন্তেয় এই উভয় নামে সম্বোধন করে ভগবান অর্জুনকে উজ্জীবিত করতে চাইছেন।

ভগবান অর্জুনকে লক্ষ করে আমাদের পুরুষকার দৃঢ় করতে বলছেন। দুর্বলের কোনও স্থান নাই। আমাদের সৎ কর্ম করতেই হবে, কর্মে মৃত্যু যদি আসে তাতে ভয় পাব না। সেই মৃত্যু আমাদের স্বর্গের কাছে নিয়ে যাবে। কোন কর্মের দ্বারা মনকে নিম্নমুখী করা চলবে না। স্বামী বিবেকানন্দ একটি কবিতায় বলছেন—'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।' তাই আমাদের দৃঢ় পুরুষকার দ্বারা কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তবেই ঈশ্বরের কৃপা আসবে। দৈনন্দিন সমস্যার সামনাসামনি হতে হবে এবং সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে হবে। ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে বলছেন কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য হলো জীবন-সমস্যার সমাধানের জন্য সাহসী ও শক্তিমান হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া। মানুষ তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সেইজন্য ভগবানের এই উক্তি। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে আমাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক চেতনাকে গড়ে তুলতে পারব সেই কথাই বলছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—সজাগ হও, তেজস্বী হও, কর্মঠ হও। আমাদের মধ্যে অলস ও আরামপ্রিয় হওয়ার একটা প্রবণতা আছে, কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—ওঠো জাগো। জীবন কঠোর পরিশ্রমী লোকের জন্য, দুর্বলের জন্য নয়, নিদ্রালু অলসপ্রকৃতির লোকের জন্য নয়। তাই ভগবান সকল মানবজাতিকে বলছেন—কাজ করে জীবনকে উপভোগ করো।

ভগবান অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য বলছেন—বৃথা চিন্তা পরিহার করো। এই ধর্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হলে স্বর্গলাভ এবং বিজয় হলে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ। দুটো পথই খোলা এবং দুটিই মঙ্গল। অতএব শোক, বৃথা চিন্তা ও সংশয়যুক্ত হয়োও না। বীরের ন্যায় অস্ত্র ও গাণ্ডীব নিয়ে গাত্রোত্থান কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।। ৩৮

সুখদুঃখে (সুখ এবং দুঃখ) সমে কৃত্বা (সমান জ্ঞান করে) লাভ-অলাভৌ (লাভ ও ক্ষতিকে) জয়-অজয়ৌ (জয় ও পরাজয়কে) সমাঃ কৃত্বা (সমান জ্ঞান করে) ততঃ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) যুজ্যস্ব (প্রস্তুত হও) এবং (এইভাবে করলে) পাপম্ ন অবাপ্স্যসি (পাপকে প্রাপ্ত হবে না)।

অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় এই পরস্পর দ্বন্দ্বভাবকে সমান জ্ঞান করে অর্থাৎ এদের প্রতি উদাসীন থেকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এইরূপে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করলে তোমার কোনও পাপ হবে না।

ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ত্যাগ করা যেমন পাপ, গুরুজনদের বধ করাও তেমনি পাপ। উভয়ই যদি পাপ হয় তবে কোন পথ অবলম্বনীয়—এটাই অর্জুনের সমস্যা। তাই ভগবান বলছেন—হে অর্জুন, তুমি যদি সুখ, জয় বা লাভের আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে গুরুজনদের বধ কর তাহলে তোমার পাপ হবে, কিন্তু তুমি যদি জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ সমান জ্ঞান করে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত বা আত্মবুদ্ধিযুক্ত হয়ে যুদ্ধ কর, তবে গুরুজন বধজনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

জীবন ও কর্ম আমাদের মনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই মনকে সঠিক পথে চালনা করতে শিখতে হবে। মনকে শান্ত ও একাগ্র করে রাখা চাই। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমরা ব্রাহ্মণ হই বা ক্ষত্রিয়, পণ্ডিত অথবা মূর্খ, যা-ই হই না কেন, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা সাধারণ উদ্দেশ্য আছে। তা হল আমরা আমাদের ধর্মকে অর্থাৎ সত্যকে রক্ষা করে চলব। পরিণামে যাই আসুক না কেন, আমাদের লক্ষ্য থেকে আমরা কোনওরকমে বিচ্যুত হব না। 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা'—সুখই পাই আর দুঃখই পাই, দুটোকেই সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। শুধু সুখ নেব আর দুঃখ নেব না, এ হয় না। ভাল চাইলে মন্দটাও নিতে হবে। দুয়ে মিশে আছে। আমাদের ইচ্ছেমতো কোনকিছুই হয় না। সব আপনা-আপনিই ঘটে। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া। অঘটন—যা ঘটবার নয়, ঘটন—সেটাই ঘটাচ্ছেন, পটিয়সী—যিনি মায়া, তিনিই কৌশল করে ঘটাচ্ছেন। বাস্তবিক, অনবরত তা-ই দেখছি আমরা। সুতরাং 'লাভালাভৌ'—লাভ বা ক্ষতি, 'জয়াজয়ৌ'—জেতা বা হারা যাই আসুক, আমরা লক্ষ্য থেকে, সত্য থেকে যেন সরে না যাই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

তাই বলছেন, 'যুদ্ধায় যুজ্যস্ব', যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হও। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর। কর্মের জন্য কর্ম কর। কর্তব্যজ্ঞানে যুদ্ধ কর। এতে তোমার কোনও পাপ হবে না।

বস্তুত, হিংসা কথাটা আপেক্ষিক। কোনও কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। হত্যা করতে চাইছি না, কিন্তু হত্যা করতে হচ্ছে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। গান্ধীজীর আশ্রমে একটা বাছুরের অসুখ করেছে। বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার এসে বলছেন, 'ওকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলুন। ওর কষ্ট সহ্য করা যাচ্ছে না।' গান্ধীজী রাজি হয়েছেন। তখন ভারতবর্ষের কাগজে গান্ধীজীর নিন্দা। এ কীরকম তুমি? মুখে অহিংসা প্রচার করছ। আর তোমার উপর নির্ভর করে আছে একটা অসহায় প্রাণী। তাকে কি জিজ্ঞাসা করেছো কষ্ট থেকে মুক্তি দেবার জন্য তুমি তাকে মারতে পার কী না? আজকাল যেমন শোনা যায় 'স্বেচ্ছামৃত্যু'। মুমূর্ষু রোগীকে কোনও রকমে কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ডাক্তার যদি যন্ত্রটা বন্ধ করে দেন তাহলেই মৃত্যু। কিন্তু তাকে কি হত্যা বলা যাবে? সহজে এর একটা উত্তর আপনি দিতে পারবেন না। প্রতিটি পরিস্থিতি আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। কখন, কেন, কোন অবস্থায়—এসব আপনাকে দেখতে হবে। আপনার কী কোনও উদ্দেশ্য ছিল? কোনও স্বার্থ ছিল? না, তা ছিল না। তাহলে কেন করলেন? অন্য উপায় ছিল না। বিকল্প কিছু ছিল না।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অর্জুন, তুমি জাতিতে ক্ষত্রিয়। ধর্মযুদ্ধ তোমার স্বধর্ম। আর ধর্মরক্ষার জন্য এই যুদ্ধে তোমার যদি হত্যাও করতে হয়, তাতেও তোমার কোনও পাপ হবে না।' যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্তব্যবোধে স্বধর্ম আচরণ করা যায় তবে পাপ স্পর্শ করে না। সমত্ববুদ্ধি অর্থাৎ আত্মবুদ্ধিতে স্থিত থাকে। পরমেশ্বরে স্থিত হয়ে যখন সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভকে সমান জ্ঞান করে কোনও ব্যক্তি যদি কর্ম করে তখন সেই ব্যক্তি পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে উত্থিত হয়। ভগবান অর্জুনকে লক্ষ করে আমাদের সকলকে বলছেন, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করলে আর পাপ হবে না। সবকিছুর মূলে রয়েছে আমাদের চঞ্চল মন। মনকে অন্তর্মুখী করলে তা হবে অনন্যসাধারণ। এর থেকে বড় বড় সাফল্য আসবে। মানবমনের পূর্ণ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ অবস্থা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।। ৩৯

পার্থ (হে পার্থ) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে বলা হয়েছে) যোগে তু (কর্মযোগ বিষয়ে) ইমাং শৃণু (এই বুদ্ধির কথা শোন) যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হয়ে) কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি (কর্মের বন্ধন ত্যাগ করতে পারবে)।

হে পার্থ, তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্যতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছি। এখন তোমাকে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলছি, তা একাগ্র হয়ে শ্রবণ কর। এই কর্মযোগ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে দৃঢ় বুদ্ধিতে কর্ম করলে তুমি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

ভগবান বলছেন, 'পার্থ, তোমাকে আমি এতক্ষণ আত্মতত্ত্ব বোঝালাম। আত্মা কী, আর আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী, এসব তোমাকে বললাম। কিন্তু কীভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় এখন সে-কথা মন দিয়ে শোন— 'এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে বিদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।' গীতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই ব্যাবহারিক পথনির্দেশ। কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে ভাল লাগে, কিন্তু কীভাবে তা প্রয়োগ করব? এখানে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলছেন। 'বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি'— 'বুদ্ধ্যা যুক্তো' মানে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ঈশ্বরের সেবা করছি এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কাজ করলে 'কর্মবন্ধং', কর্মের বন্ধন 'প্রহাস্যসি', খসে পড়বে। নিষ্কাম কর্মযোগের সাহায্যে কর্মের বন্ধন আপনা-আপনি কেটে যাবে। কর্মের দ্বারা বন্ধন হয়। কোন কর্মের দ্বারা? সকাম কর্মের দ্বারা। কর্ম দুরকম—সকাম আর নিষ্কাম। স-কাম, কাম মানে বাসনা। আমি পুত্র চাই, ধন চাই, ক্ষমতা চাই, দীর্ঘজীবন চাই, স্বর্গলাভ করতে চাই। সেইজন্য কর্মকাণ্ড—এই-এই করতে হবে। যাগ-যজ্ঞ কতরকম সব রয়েছে। প্রত্যেক বেদে দুটি ভাগ আছে—জ্ঞানকাণ্ড আর কর্মকাণ্ড। তোমার যদি এসব বাসনা থাকে তাহলে তুমি যা-কিছু কর্ম করছ সব সকাম কর্ম। শুধু শাস্ত্র সাবধান করে দিচ্ছেন, বিচার কর— 'নিত্য-অনিত্যবস্তুবিবেকঃ'। নিত্য-অনিত্য বিচার। সৎ-অসৎ বিচার। বলছেন, ভাল কাজ করেছ তুমি। নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে, আনন্দ করবে, এমনকী ইন্দ্রত্বও পেতে পার। কিন্তু তাও তো শেষ হয়ে যাবে। সবসময় আমাদের যেন একটা ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অর্থ থাকলে ভয়, কে কবে কেড়ে নিয়ে যাবে। ভাল স্বাস্থ্য থাকলে ভয়, কী জানি হয়তো ক্যান্সার হয়ে বসে আছে। শাস্ত্র বলছেন, আমাদের অভয়পদ লাভ করতে হবে। যদি নিত্যবস্তু লাভ করা যায়, যার মৃত্যু নেই, অমৃত, তাহলে আমাদের কাছ থেকে তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই নিত্যবস্তু হল আত্মজ্ঞান। কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে এই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তশুদ্ধি মানে মনে কোনও মলিনতা নেই। মলিনতা অর্থাৎ অহংবুদ্ধি— 'আমি' 'আমার' বোধ। এসব কিছু নেই। এ-ই গীতার সার কথা। নিষ্কাম কর্ম। কাজ কর, কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা করো না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হতে পারে, একি সম্ভব? আমি কাজ করব অথচ ফলের আশা করব না? ফলের আকাঙ্ক্ষা করব না মানে কী? আমি কাজ করব, কিন্তু নিজের জন্য নয়, অপরের মঙ্গলের জন্য— এটাই বড় কথা। এটা সাধনার বিষয়। কার জন্য করব তাহলে? ঈশ্বরার্থং, লোকহিতার্থং— ঈশ্বরের জন্য, লোককল্যাণের জন্য। আমি যা-কিছু করছি সব ঈশ্বরের উদ্দেশে। আমি খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, অফিসে কাজ করছি, দোকান চালাচ্ছি, মাঠে কাজ করছি, এমনকী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত সব তাঁরই উদ্দেশে। তাঁরই পূজা করছি। বাস্তবিক, আমাদের কোনও কাজই ঐহিক নয়, সবটাই আধ্যাত্মিক। কর্মই পূজা। সে কর্মে আমার এতটুকু ত্রুটি হবে না। বেদান্তসারের একেবারে গোড়াতে রয়েছে 'অহং কর্তা, অহং ভোক্তা'—ধর্মপথের প্রতিবন্ধক এই ভাবটি আমাদের মনে আছে। যদি এক কথায় বলতে হয় ধর্ম কী, তা হল এই 'অহং'টাকে নিজের হাতে বলি দেওয়া। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'নাহং নাহং, তুহুঁ'—প্রভু, তুমি। আমরা সব সময় 'আমি' 'আমার' পূজা করছি। সেটা মুছে দিতে হবে। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী—তিনিই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। আমি তাঁর, আমার ঘরবাড়ি তাঁর, আমার পুত্রকন্যা তাঁর। আমার কিছু না। এই যে একটা ভাব, একে বলে আত্মসমর্পণ। আমি সংসারে থাকব কিন্তু সংসার যেন আমার মধ্যে না থাকে। সংসারের সব করব। কিন্তু সংসারী হব না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভক্তি-তেল অর্থাৎ হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা —যাতে কাঁঠালের আঠা হাতে জড়িয়ে না যায়। 'বড়লোকের বাড়ির ঝিয়ের মতো মুখে বলবে আমার বাড়ি। কিন্তু মনে ঠিক জানবে, এ আমার নয়, প্রভুর বাড়ি।' সবচেয়ে সহজ হচ্ছে সর্ব বস্তু ও জীবকে ঈশ্বর দিয়ে আবৃত করে দেওয়া। সকলের মধ্যে ঈশ্বর দেখে সেবা করা। এই অভ্যেসটা করতে হবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোন কেন্দ্রে যদি যান কী দেখবেন? সাধুরা কেউ কম্পিউটারে টাইপ করছেন, কিউ হিসাব লিখছেন, কেউ ওষুধ দিচ্ছেন, কেউ গরুর দেখাশুনা করছেন, কেউ রান্নার তরকারি কুটছেন। কিন্তু সবই পূজা। কারণ ভগবানের উদ্দেশে করছেন। স্বামীজী বলছেন, যে মাটি কাটে সে যদি 'ঈশ্বরের সেবা করছি'—এই জ্ঞানে ভালভাবে কাজটা করে, তাহলে সে ধ্যান করার ফল পাবে। এই হচ্ছে আমাদের নিষ্কাম কর্মের আদর্শ।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।।৪০

ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি (আরম্ভ বা আরব্ধ কর্মের নাশ নাই) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (কোনও প্রত্যবায়, অন্যায়, স্খলন হয় না) অস্য ধর্মস্য স্বল্পম্ অপি (নিষ্কাম কর্মযোগের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান) মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে (মহা ভয় থেকে রক্ষা করে)

এই নিষ্কাম কর্মযোগ অর্থাৎ মুক্তির পথস্বরূপ কর্মযোগে কোন প্রকার প্রচেষ্টায় (আরম্ভ বা আরব্ধ) কর্মের ফল নিষ্ফল হয় না। এই কর্মে ত্রুটিবিচ্যুতি বা অঙ্গহানিজনিত প্রত্যবায় বা পাপ হয় না। এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্ম অল্প অনুষ্ঠিত হলেও জন্মমৃত্যুরূপ সংসার মহাভয় থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

নিষ্কাম কর্মে আমাদের চরিত্রের উপর যে সংস্কার গড়ে ওঠে সেই সংস্কারের প্রভাবে আমরা নিজেদেরকে নানা রিপুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হব। ভগবান বলছেন, নিষ্কাম ধর্ম পালন করলে এই দর্শন আমাদের মহাভয় থেকে রক্ষা করে। এই নিষ্কাম কর্ম সামান্য সামান্য অনুষ্ঠান করতে করতে চরিত্র দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠবে।

নিষ্কাম কর্ম এমন জিনিস, কেউ হয়তো আরম্ভ করলেন কিন্তু শেষ করতে পারলেন না, তবু এর কোনও প্রচেষ্টাই নষ্ট হয় না। কিন্তু ধরা যাক কৃষিকাজে—একজন ব্যক্তি চাষ করছেন। তিনি একটুখানি খুঁড়ে দিয়ে চলে এলেন। জল দিলেন না, বীজ বপন করলেন না, সার দিলেন না। পরপর অনেক কিছু করার ছিল, করলেন না। তাহলে কিন্তু ফল হবে না।

আবার নিষ্কাম কর্মে 'প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে'—অজান্তে ভুলত্রুটি হয়ে গেলেও প্রত্যবায় বা পাপ হয় না। কারণ নিষ্কাম কর্মে কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন চাষাভূষো চাষার কথা। বৃষ্টি হোক বা না হোক, সে চাষ করবেই। হয়তো যতটা ফল হতে পারত ততটা হল না। তা না হোক, ক্ষতি তো কিছু হবে না। উলটো ফল কিছু হবে না। প্রত্যবায় ঘটবে না। কিন্তু বেদে যে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সকাম কর্মের কথা বলা হয়, সেখানে যদি মন্ত্র ঠিক করে উচ্চারণ করতে না পারি, যজ্ঞের উপকরণ ঠিক ঠিক জোগাড় করতে না পারি তাহলে ভুল, ত্রুটি, ছিদ্র থেকে গেল, এর ফলে প্রত্যবায় হবে। স্খলন হবে। একেবারে উলটো ফল হয়ে যাবে। স্বর্গের বদলে একেবারে নরকে স্থান হবে। চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাক্তার হয়তো এমন ভুল করলেন যে রোগীর প্রাণ বেরিয়ে গেল।

শ্রীমা সারদাদেবী দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষদের সেবা করছেন কিন্তু এতটাই তাদের কষ্ট সমবেদনার সঙ্গে অনুভব করছেন যে, তারা যখন গরম খিচুড়ি খাচ্ছে তখন ছোট্ট সারদা হাত-পাখা নিয়ে তাদের গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বলে দেয়নি ঐ কাজটি করবার জন্য। তিনি স্বেচ্ছায় হৃদয় থেকে অনুভূতি সহকারে নিষ্কাম কাজটি করছেন। সংসারের সকল ছোট ছোট কাজের মধ্যে ছোট সারদা সর্বদা আনন্দে ডুবে রয়েছেন। কাজগুলিকে ঐভাবে সম্পন্ন করাই প্রকৃত নিষ্কাম কর্মযোগ।

তাই বলছেন, দেখ এমন একটা জিনিস আছে যার কোনও প্রত্যবায় নেই। নিষ্কাম কর্ম এতটুকুও যদি করতে পার তা কখনও নিষ্ফল হয় না। কাঠবিড়ালী আমি। একটু বালি ছিটিয়ে দিচ্ছি। অন্যরা যা পারে আমি তা পারি না। নিজেই গরিব, একটা পয়সা দিতে পারি। তাই দিচ্ছি। নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করতে সময় লাগে। তা এতটুকুও যদি করতে পারি 'স্ব-অল্পম্-অপি অস্য ধর্মস্য'—এ এমন একটা ধর্ম সামান্য অভ্যাস করতে পারলে, 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—মহাভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিসের ভয়? এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারবন্ধনের ভয় থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়।

বাস্তবিক জগৎ আমার বা আপনার সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না। আমরা জগতের

কিছুই উপকার করতে পারি না। তথাপি আমাদের কাজ করতে হবে, সর্বদাই লোকের অর্থাৎ জগতের মঙ্গলচিন্তা ও উপকার করতে হবে, কারণ ঐ কাজ আমাদের নিজেদের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ। কেবল এই উপায়ে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করতে পারি। আমাদের আসক্তশূন্য হয়ে এই কর্ম করতে হবে। কোন প্রতিদান আশা করব না। যাকে সাহায্য করছি তার প্রতিই আমরা কৃতজ্ঞ হব, তাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করব। মানুষকে সাহায্য করে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারা—এ মহাসৌভাগ্য। আসক্তিশূন্য হয়ে কাজ করলে অশান্তি ও দুঃখ কখনই আসবে না। পরোপকার-মূলক প্রতিটি কাজ এবং সহানুভূতি-সূচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে আমরা যেটুকু সাহায্য করি—এরূপ প্রতিটি সৎকাজ আমাদের ক্ষুদ্র অহং 'আমি'কে কমায়, স্বার্থত্যাগ শেখায়। এখানে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সুন্দর মিলন হয়। সর্বোচ্চ আদর্শ—অনন্তকালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ লাভ করা, যেখানে কোন অহং 'আমি' নেই, সবই 'তুমি'। নিষ্কামকর্ম মানুষকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঐ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ।। ৪১

কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন অর্জুন) ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, জ্ঞান, একনিষ্ঠ হয়) অব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধয়ঃ (অস্থিরচিত্ত, অনিশ্চিতবুদ্ধি বিষয়ী সকাম ব্যক্তিদের) বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ (বহু শাখাবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ)।

হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগীদের বিচারবুদ্ধি নিষ্কাম, ভগবৎপরায়ণা বলে নিশ্চিত (কোনও ফাঁকি নেই) এবং একনিষ্ঠ ঈশ্বরমুখী। কিন্তু অস্থিরচিত্ত অনিশ্চিত বিষয়ী সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুবিধ, অনন্ত এবং নানা দিকে ধাবিত হয়।

'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ' অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি 'এক জ্ঞান'—একনিষ্ঠ, ঈশ্বরমুখী। নিশ্চয়াত্মিকা মানে কোনও ফাঁকি থাকবে না। অধ্যবসায়, চেষ্টা, কঠোর সঙ্কল্প থাকবে এমন বুদ্ধি নিয়ে মানুষ কর্ম করবে। মন-মুখ এক করে চলতে হবে। একদিকে একটা সঙ্কল্প নিয়ে চলতে হয়। ঈশ্বর ছাড়া কিছু বুঝি না, জানি না। বিষয়ও চাই, আবার ঈশ্বরকেও চাই, তা হয় না। দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের পরীক্ষা করছেন। গাছে একটা পাখি রয়েছে। তার চোখ বিঁধতে হবে। অন্য ভাইরা তীর-ধনুক হাতে গাছের ডালপালা দেখছে, পাতা দেখছে, পাখি দেখছে, আরও কত কী। কিন্তু অর্জুন পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এই হচ্ছে 'ব্যবসায়াত্মিকা'। অর্থাৎ মন তাঁর সম্পূর্ণ সংযত। অন্য বুদ্ধি আসছে না। অন্য চিন্তা আসছে না। অন্য সংকল্প উঠছে না। 'এক জ্ঞান'—অর্থাৎ যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে সাধারণ কর্ম নিষ্কাম কর্মযোগে পরিণত হয় সেই বুদ্ধি—এক, লক্ষ্যে সর্বদা স্থির। অব্যভিচারিণী।

কঠোপনিষদে যেমন নচিকেতা যমকে বলছেন, 'তবৈববাহাঃ'—এসব রথ, সারথি, বাহন তোমারই থাক। আমি অমৃতত্ব লাভ করতে চাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি যে বিষয়-সম্পত্তি আমাকে ভাগ করে দিতে চাইছেন, তাতে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব?'—পারবেন না, শুনে বলছেন 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্, তেনাহং কিং কুর্যাম্?' অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না তা দিয়ে আমি কী করব? এ-ই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। শুধু ঈশ্বরকে চাই। আর কিছু চাই না। আমাদের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধিই একমুখী হয় অর্থাৎ একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ হয়ে থাকে। ঐহিক বা জগতের বিষয় জ্ঞান বহুমুখী হয়ে থাকে।

তারপর বলছেন, 'অব্যবসায়িনাম্' অর্থাৎ অবিবেকী, যাদের কামনা-বাসনা রয়েছে, যারা সকাম কর্ম করে, তাদের 'বুদ্ধয়ঃ বহুশাখা অনন্তাঃ চ'। তাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, বহুমুখী জ্ঞান। কামনা-বাসনা ব্যাপারটা কী? দরজাটা একটু ফাঁক করে দিলেন, 'আচ্ছা একটু আসুক', অমনি হুহু করে অনেক রকম বাসনা ঢুকে পড়বে। একটা বাসনা থেকে আর একটা বাসনা, তার পেছনে আর একটা। অবিবেকী লোকের বুদ্ধি এইভাবে বহুশাখাবিশিষ্ট হয়ে পড়ে। নানা ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাদের মন বহুদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণ বলছে—'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।'(৪-১০-৯)—কাম্যবস্তু অর্থাৎ বিষয় উপভোগে বাসনার কখনও নিবৃত্তি হয় না, ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন বাসনা বরং ভোগের দ্বারা বাড়তেই থাকে।

তাই কামনাশূন্য না হলে বুদ্ধি যথার্থভাবে একমুখী, ঈশ্বরাভিমুখী হতে পারে না। সবকিছু বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মনের দুটি অবস্থা—বিক্ষিপ্ত ও সংহত। সবরকম যোগশিক্ষায় সংহত অবস্থার কথা বলে থাকে। সব শক্তিকে সংহত কর। আত্মবুদ্ধি করলে মন সংহত হয় কিন্তু বিষয়ের দিকে মন দিলে বহুশাখাবিশিষ্ট বিক্ষিপ্ত মন তৈরি হয়। এখানে ভগবান বলছেন—যে বুদ্ধি অন্তরাত্মার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত তাই 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ'।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ।। ৪২

পার্থ (হে পার্থ) অবিপশ্চিতঃ (অল্পবুদ্ধি, অবিবেকী) বেদবাদরতাঃ (বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের কথায় অনুরক্ত) অন্যান্য(সকাম কর্মানুষ্ঠান ছাড়া অন্য কিছু) ন অস্তি (নেই) ইতিবাদিনঃ (এইরূপ মতবাদীরা) যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (আপাত-মনোরম, সকাম কর্মের প্রশংসাসূচক) বাচং প্রবদন্তি (কথা বলে)।

হে পার্থ, অল্পবুদ্ধি অবিবেকী লোকেরা বেদের কর্মকাণ্ডের সকাম পুণ্যকর্মের প্রশংসা করে সুন্দর সুন্দর সব কথা বলে। তারা মনে করে বেদের স্বর্গাদি পুণ্যফললাভের জন্য

সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনও ধর্ম নেই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন—হে পার্থ, অবিবেকী অল্পবুদ্ধি লোকেরা 'অবিপশ্চিতঃ', অর্থাৎ তাদের বিচারবুদ্ধি নেই। বেদের তাৎপর্য কোথায় সে জ্ঞান তাদের নেই। তারা 'বেদবাদ' অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের কথা বলে—'বেদবাদরতাঃ'। কর্মকাণ্ড ভোগের পথ। সকাম কর্ম। আপাতরমণীয় ভোগের পথে, কর্মকাণ্ডের পথে তারা নিজেরা চলে। অপরকেও সেই পথেই যেতে বলে। 'পুষ্পিতাং বাচং'—সুন্দর সুন্দর সব কথা বলে প্রলোভন দেখায়। 'এই-এই কর্ম কর, নানারকম যাগযজ্ঞ সব আছে। তাহলে তুমি এই-এই ভোগ করতে পারবে। রোগ সেরে যাবে, চাকরি পাবে, সন্তান হবে' ইত্যাদি। এইভাবে এরা অপরকে ভুল পথে নিয়ে যায়। 'ন অন্যৎ অস্তি ইতিবাদিনঃ'—এরা মনে করে কর্মকাণ্ড ছাড়া বেদে জ্ঞানকাণ্ড বলে কিছু নেই। বলে ব্রহ্ম, আত্মা, জ্ঞান, মুক্তি এসব ছেড়ে দাও। সকাম কর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

বাস্তবিক, আমাদের দেশে ধর্ম বলতে কী ছিল? এক হচ্ছে বর্ণাশ্রম—এর হাতে জল খাওয়া চলে, এর হাতে চলে না ইত্যাদি। গার্হস্থ্য আশ্রমেও কত রকমের যাগযজ্ঞ প্রতিদিন করতে হত। এই ছিল ধর্ম। সবটাই কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এসে দেখালেন, ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বর-অনুরাগ। আর সবকিছুই গৌণ। আমাদের দেশে যাগযজ্ঞ এখনও হয়। বিশেষত দক্ষিণ ভারতে। শান্তিযজ্ঞ। এক মণ ঘি পোড়ানো হল শান্তির জন্য। কর্মকাণ্ড এটা। বাস্তবিক এতে শান্তি আসবে কি? বলা যায় না। কিন্তু যারা মনে করে এক মণ ঘি পোড়ালে শান্তি আসবে, তাদের যদি এক ছটাক ঘি কম পড়ে, অথবা মন্ত্রের ভুল উচ্চারণ হয় বা যজ্ঞের কোনও ত্রুটি বা ছিদ্র থাকে, তাহলে প্রত্যবায় ঘটে গেল। তখন উলটো ফল। তখন শান্তির জায়গায় অশান্তি।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ।।৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ।।৪৪

কামাত্মানঃ (কামনাযুক্ত অর্থাৎ যাদের ভোগবাসনা রয়েছে) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গলাভই যাদের প্রধান উদ্দেশ্য) জন্মকর্মফলপ্রদাম্ (জন্মরূপ কর্মফল প্রদানকারী) ভোগ-ঐশ্বর্য-গতিং প্রতি (ভোগ-ঐশ্বর্য-লাভের উপায়স্বরূপ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (বেদের কর্মকাণ্ডে বিহিত ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট) ভোগ-ঐশ্বর্য-প্রসক্তানাম্ (ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিদের) তয়া (অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের প্রশস্তিসূচক পুষ্পিতবাক্যের দ্বারা) অপহৃত-চেতসাম্ (যাদের চিত্ত বিমুগ্ধ হয়েছে) ব্যবসায়াত্মিকা (একমুখী) বুদ্ধিঃ (বিবেক) সমাধৌ (সমাধিতে বা অন্তঃকরণে) ন বিধীয়তে (স্থির হয় না)।

যারা কামনাযুক্ত, স্বর্গলাভকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করে তারা নানা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য জন্মরূপ কর্মফল-প্রদানকারী বেদের যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করে। আর যাদের চিত্ত এসব আপাতমনোরম বাক্যে বিমুগ্ধ হয় তাদের বুদ্ধি একমুখী, আত্মনিষ্ঠ হতে পারে না।

যাদের ভোগবাসনা রয়েছে, স্বর্গলাভকেই তারা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ বলে মনে করে। তারা নানা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে। 'এই সব যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে স্বর্গলাভ হবে। স্বর্গে কত ভোগের উপকরণ আছে—কত নাচ, গান, আনন্দ' ইত্যাদি বলে তারা লোভ দেখায়। যাদের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত, তাদের বিবেকবুদ্ধি সহজেই ওই সব প্রলোভনে মুগ্ধ হয়। আর যাদের মন সহজেই এভাবে টলে যায়, 'অপহৃত-চেতসাম্' তাদের বুদ্ধি একমুখী, ঈশ্বরমুখী হয় না। অর্থাৎ যতদিন ভোগবাসনা থাকে ততদিন কর্ম যোগে পরিণত হয় না। মন স্থির না হলে, সংযত না হলে ভোগে আসক্ত ব্যক্তি কখনও সমাধি লাভ করতে পারে না। নানা বাসনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত তাদের চিত্ত আত্মায় স্থির হতে পারে না। তাদের আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। যোগ আর ভোগ—দুই-ই নেব তা হয় না। দুয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। এছাড়া উপায় নেই।

বাস্তবিক আমাদের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎ-রূপ দুই বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রন। আমারা প্রায় সকলেই নিত্য সৎ বস্তুর অন্বেষণ ছেড়ে, অসৎ বা অলীক বস্তুর খোঁজে ছুটে বেড়াই। প্রত্যেকের মনে হয়ে হয়—আমিই বেশি সম্পদ লাভ করব ও সুখী হব। কিন্তু জ্ঞানী, আত্মবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি বুঝতে পারেন এই অসৎ অনিত্য সুখের সন্ধান করা শিশুর খেলা। একেই বলে মায়া এবং বৈরাগ্যই ধর্মলাভের অর্থাৎ সত্যকে জানার একমাত্র পথ।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ।।৪৫

অর্জুন (হে অর্জুন) বেদাঃ (বেদের কর্মকাণ্ডসমূহ) ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ (কামনামূলক, ত্রিগুণাত্মক—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বেদের কর্মকাণ্ডের বিষয়) নিঃ-ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণভাবের অতীত অর্থাৎ নিষ্কাম, ত্রিগুণাতীত) নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমে অনাসক্ত অর্থাৎ যোগ ও ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষারহিত) আত্মবান্ (পরমাত্মনিষ্ঠ, আত্মাকে প্রাপ্ত) ভব (হও)।

হে অর্জুন, বেদের কর্মকাণ্ড ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, অর্থাৎ কামনামূলক। তুমি নিষ্কাম হও অর্থাৎ ঈশ্বরার্থে নিষ্কাম কর্ম কর এবং সকল প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত হও, সদা সত্ত্বগুণে স্থিত হও, যোগ ও ক্ষেমের আকাঙ্ক্ষারহিত অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে উদাসীন হয়ে আত্মবান্, পরমাত্মনিষ্ঠ হও।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রত্যেকের মধ্যে এই তিন গুণ মিশে আছে। পৃথক করা যায় না। এই তিনগুণের যা কর্ম তা হল ত্রৈগুণ্য। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মায়ার মধ্যে আমরা সবাই বদ্ধ হয়ে আছি। তমঃ, রজঃ তো নিশ্চয়ই, আবার সত্ত্বগুণও বন্ধন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে তিন ডাকাতের গল্প আছে। বনের মধ্যে তিনজন ডাকাত এক ধনীর সর্বস্ব কেড়ে নেয়। নিয়ে প্রথম ডাকাতটি বলছে 'একে আর রেখে কী হবে, মেরে ফেল'। তখন দ্বিতীয় জন বলল, 'না মেরে কী লাভ, হাত-পা বেঁধে ফেলে যাও'। তারা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটি আবার ফিরে এসে লোকটির বাঁধন খুলে দিল। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সদর রাস্তার পথ দেখিয়ে দিল। কৃতজ্ঞ হয়ে লোকটি তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। ডাকাতটি বলল, 'না, ওখানে আমার যাওয়ার জো নাই, পুলিশ টের পাবে।' প্রথম ডাকাতটি হল তমোগুণ—তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় জন রজোগুণ, রজোগুণ মানুষকে নানা কাজে জড়ায়। আর তৃতীয় ডাকাতটি সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ মানুষকে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি তমোগুণ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও ডাকাত। ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। আসলে সোনার শিকলও শিকল।

বেদের কর্মকাণ্ড মানুষকে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করতে বলে। ত্রিগুণাত্মক সংসারই বেদের কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু। তাই বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া' বলা হচ্ছে। এইসকল কর্ম মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্যঃ' অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের অতীত হতে বলছেন। অজ্ঞান ও অবিদ্যার ঊর্ধ্বে যেতে বলছেন। বলছেন, জ্ঞানলাভ কর। জ্ঞানলাভ হলে মুক্তি, একথা বলতে চাইছেন। তারপর বলছেন, 'নির্দ্বন্দ্ব' হও। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, শীত-উষ্ণ, এইসব পরস্পরবিরোধী ভাবসমূহই দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের পারে যেতে বলছেন। 'নিত্যসত্ত্বস্থঃ' অর্থাৎ সর্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত হও। সর্বদা ধৈর্যশীল হও। প্রশ্ন উঠতে পারে, অর্জুনকে একদিকে নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন, আবার সত্ত্বগুণে স্থিত হতে বলছেন কেন? কারণ সত্ত্বগুণের সাহায্যেই রজঃ ও তমঃ গুণকে দমন করতে হবে। তারপর সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে যেতে হবে। আবার জ্ঞানলাভ করার পরও নিষ্কাম কর্মযোগী সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করেই লোকহিতার্থে কর্ম করেন। 'নির্যোগক্ষেমঃ'—'যোগ' মানে যা নেই তা পাওয়া, আর 'ক্ষেম' মানে যা আছে তা রক্ষা করা, 'নিঃ' মানে না। অর্থাৎ তুমি বিষয়লাভ ও বিষয়রক্ষা উভয় বিষয়েই চিন্তা ত্যাগ কর। ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত, পরমেশ্বরে নির্ভরশীল হও।

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন! তুমি দ্বন্দ্বমুক্ত ও যোগক্ষেমরহিত হয়ে সত্ত্বগুণের সাহায্যে নিষ্কাম কর্ম কর। সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরে নির্ভরশীল হও, তিনিই তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করবেন—এরূপ নিশ্চয় দৃঢ় করে তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি আত্মনিষ্ঠ হও। স্বরূপজ্ঞান লাভ কর। বাস্তবিক ত্রিগুণাতীত বা তিনগুণের অতীত অবস্থা লাভ করলে সেই

ব্যক্তি 'আত্মবান' আত্মাকে লাভ করেন এবং 'নিত্যসত্ত্বস্থঃ' অর্থাৎ স্থির, অচঞ্চল, অসীম ধৈর্যশক্তি লাভ করেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ।।৪৬

উদপানে (উদ্ক অর্থাৎ জল, কূপ, ক্ষুদ্র জলাশয় ইত্যাদি) যাবান্ অর্থঃ (যে পরিমাণ প্রয়োজন, স্নান, পান ইত্যাদির জন্য) সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে (সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হলে) তাবান্ (সেই পরিমাণ প্রয়োজন) (সিদ্ধ হয়) (তেমনি) সর্বেষু (সকল) বেদেষু (বেদে) (যে প্রয়োজন বা ফল লাভ হয়) তাবান্ (সেই সমস্ত) বিজানতঃ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের) (লাভ হয়) (ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়)।

সমস্ত স্থান জলে প্লাবিত হলে কূপ, তড়াগ ইত্যাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে না, প্লাবনের জলেই সকল প্রয়োজন সাধিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মানন্দরূপ যে ফল, তাতে বেদোক্ত সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অসীম আনন্দের মধ্যেই সংসারের সকল আনন্দ, কাম্য কর্মের আনন্দও চরিতার্থ হয়।

সর্বত্র জলপ্লাবিত হলে কুয়ো, পুকুর, সরোবর ইত্যাদি ছোট ছোট জলাধারের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। কারণ সেগুলি তখন প্লাবনের জলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন এসব ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্নান-পান ইত্যাদি প্রয়োজনগুলি বন্যার জলেই মেটানো যায়। ঠিক সেইরকম বেদোক্ত সকাম কর্মের দ্বারা যে বিষয়সুখের আনন্দ পাওয়া যায়, তার থেকে নিষ্কাম কর্মযোগীও বঞ্চিত হন না। কারণ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। ভূমানন্দ লাভ হয়। ছোট ছোট সাংসারিক ভোগের আনন্দগুলি সেই ভূমানন্দেরই অন্তর্গত। আমাদের ছোট-বড় সব পার্থিব আনন্দের উৎসও সেই অসীম ব্রহ্মানন্দ। মানুষ সকাম কর্ম করে সেই পরমানন্দেরই কণিকামাত্র ভোগ করে। এই আনন্দ অল্প। কিন্তু যিনি ভূমাকে, বৃহত্তমকে জেনেছেন, তাঁর আর ক্ষুদ্র ভোগানন্দের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। মলয়ের বাতাস যখন বয় তখন কি আর তালপাতার পাখার প্রয়োজন থাকে? বৃহৎ জলাশয় পেলে কি আর ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে?

এখানে ভগবান বলছেন, নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। যেহেতু শুভকর্মের ফলরূপ সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইজন্য ক্ষুদ্র আনন্দের অপ্রাপ্তিতে উদ্গ্রীব হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিষ্কাম কর্ম করলেই সমস্ত সিদ্ধ হবেই। ব্রহ্মকে জানতে পারলেই চিত্ত আনন্দে ভরে যায়, মানবের সর্বসিদ্ধি হয়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি 'সর্বেষু বেদেষু' অর্থাৎ বেদের সকল জ্ঞান অবগত হয়েছেন। ফলে বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ হয়, ভোগসুখাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তা অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তার তুলনায় স্বর্গাদি সুখভোগ অতি

সামান্য। যিনি সমগ্রের আস্বাদ পেয়েছেন তাঁর কাছে কণিকামাত্র আনন্দের আর কি প্রয়োজন আছে?

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ।। ৪৭

কর্মণি এব (কেবলমাত্র কর্মে) তে অধিকারঃ (তোমার অধিকার) কদাচন (কখনও) ফলেষু মা (কর্মফলে না হোক) কর্মফল-হেতুঃ (কর্মফলের আশায়, স্বার্থে কর্মে প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হয়ো না) অকর্মণি (কর্মত্যাগে) তে সঙ্গঃ (তোমার প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হোক)।

হে অর্জুন, কেবলমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে নয়। কর্মফল যেন তোমার কর্ম করার হেতু বা স্বার্থ না হয় অর্থাৎ ফল ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়ো না। আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

কর্মের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি থেকে জ্ঞানলাভ। কর্মের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে এই মন্ত্রের চারটি ভাগ—১) কর্মে আমার অধিকার অর্থাৎ কর্মই আমার জীবন, কর্মই আমার জীবনের লক্ষ্য, কর্মের জন্য কর্ম করা। কর্মে পুরুষকারের অধিকার ২) কর্মের ফলে যেন আমার অধিকার না হয় অর্থাৎ কর্মের ফল সকলের মঙ্গলের জন্য। অনাসক্ত কর্মের ফল বা নিষ্কাম কর্মের ফল সর্বদাই সকলের মঙ্গল করে। এ সংসারে শুধু আমি একা ভোগ করব এই সকাম ভাব যেন না আসে। সকলের সুখে আমি সুখী, আবার সকলের দুঃখে আমি দুঃখী। তাছাড়া কর্ম আমার পুরুষকারের অধীন কিন্তু ফল দৈবীর অধীন। আমার স্বধর্ম কর্তব্যকর্ম আমি করব কিন্তু ফল ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেব। ৩) কর্মের সঙ্গে হেতু অর্থাৎ সুপ্ত অভিপ্রায়, স্বার্থ, বাসনা যেন যুক্ত না হয়। অথবা কর্মের ফলকে উদ্দেশ্য করে কর্ম না করা। হেতু—দাসসুলভ মনোবৃত্তি যেন না থাকে ৪) আবার অকর্মের প্রতি, কর্ম না করার প্রবণতার প্রতি যেন আসক্ত না হই অর্থাৎ কর্ম না করবার প্রবৃত্তি যেন আমার মধ্যে না আসে। কর্মে যেন কোনওপ্রকার অলসতা, অবহেলাও না আসে।

আমরা কেউ কাজ না করে থাকতে পারি না। এই সংসারে কর্ম করেই আমাদের কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। তাই কাজ আমাদের সবসময়ই করতে হয়। হয় হাত-পা ব্যবহার করে কাজ করছি, না হয় মুখে কথা বলছি। আবার মনে-মনেও চিন্তা করতে পারি। সেটাও কাজ। এখন কাজ করলেই একটা ফল হবে। কিন্তু কর্ম ও তার ফল দুটিকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমাদের পুরুষকার নিজের নিজের আয়ত্তে রয়েছে তাই পুরুষকারের দ্বারা কর্ম করতে হবে। পুরুষকারকে কখনও দুর্বল বা মোহগ্রস্ত করা উচিত নয়। কিন্তু ফল দৈবের কৃপাতে হয়ে থাকে, তাই ফলের আশা না রেখে কর্ম করতে হবে। কর্মের ক্ষেত্রে পুরুষকার ও দৈব উভয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষকারের আয়ত্তে

থাকে কর্ম এবং কর্মের উপায় অর্থাৎ কর্ম করবার কৌশল যদি সৎ হয়, ফল দৈবের কৃপায় শুভ ও মঙ্গলজনক হবে—এটা নিশ্চিত।

'ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবৎ'—ভাল জিনিস কিছু খেলে তৃপ্তি হবেই। তেমনি ভাল কাজ করলে ভাল ফল আর মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল হবেই। এই যে আমরা এত দুঃখ পাই, এর একটা কারণ আছে। আমাদের সব নানারকমের বাসনা রয়েছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে। তখন কর্মের উপায়ের সঙ্গে নানা বাসনা ও ত্রুটি যুক্ত হয়ে পড়ে। এই বাসনার জন্যই যত দুঃখ। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলছেন, 'ভগবানের কাছে যদি কিছু চাইতে হয়, তাহলে নির্বাসনা চাইবে'।

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'—তুমি কাজ করে যাও। ওই পর্যন্ত তোমার অধিকার—অর্থাৎ জগতে তোমার শুধু একমাত্র কর্মে অধিকার। আর কোনও কিছুতেই অধিকার নেই। 'মা ফলেষু কদাচন'—ফলের লোভ করো না। ফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কাজ করা অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করা। শাস্ত্র এইটাকেই আরও সহজ করে দিচ্ছেন—ঈশ্বরার্থং। কাজ সবসময় করবে। কিন্তু ঈশ্বরবুদ্ধিতে, ঈশ্বরের উদ্দেশে, নিজের জন্য নয়। 'আমি তোমার সেবা করে যাচ্ছি, ভাল-মন্দ জানি না'—এই ভাবটা নিয়ে কাজ করা। অর্থাৎ আমি ভাল ফলও চাই না। মন্দ ফলও চাই না। সব তোমার। ভাল ফলও বন্ধন। সোনার শিকলও শিকল। আমাদের ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানে বলে, 'যৎ কৃতম্, যৎ উক্তম্, যৎ স্মৃতম্' অর্থাৎ যা করেছি, যা বলেছি, যা মনে করেছি, সমস্ত প্রভু আমি তোমার পায়ে সমর্পণ করছি। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে দেখছি স্নান করে উঠে গঙ্গার ঘাটে একজন ব্রাহ্মণের হাতে একটা ফল দিয়ে বলছেন, 'এই ফলটা আপনার। আর এই ফলদানের যে ফল তাও আপনার।' কর্ম এবং কর্মের ফল দুটোই ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি সবই ঈশ্বরের পায়ে দিয়ে দেব তাহলে কাজ করার দরকার কী? বলছেন 'তত্ত্বজ্ঞানাৎ'। কাজ করতে হবে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য। সকাম কর্ম বন্ধনের কারণ। তাই কর্ম করবার সময় যেন কোনও সকাম হেতু, উদ্দেশ্য, কারণ অর্থাৎ সংকল্প, কামনা, আকাঙ্ক্ষা যেন মনে সুপ্তভাবে না থাকে। কিন্তু নিষ্কামভাবে, ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে কাজ করলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও বন্ধন কেটে যায়। চিত্তের মলিনতা কেটে গেলে অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' মুছে গেলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। 'তৎ' থেকে তত্ত্ব। তৎ অর্থ ঈশ্বর, ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বাইরের কোনও জিনিস নয়। আমাদের ভেতরেই আছেন। চাপা রয়েছে মাত্র। অহংবুদ্ধি মুছে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়। কী হয় তখন? সর্বভূতে প্রেম হয়, দয়া হয়। তখন অন্যের দুঃখে দুঃখ, অন্যের সুখে সুখ। 'আমি' মুছে গেছে। 'আমি'র জায়গায় তুমি। নাহং, তুঁহুঁ।

তারপর অর্জুনকে বলছেন, 'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'। তোমার মাথাতে যেন এ দুর্বুদ্ধি না চাপে যে, কাজ করলে যখন বন্ধন বাড়ে তাহলে আর কাজ করব না। কাজ না করে

কেউ থাকতে পারে না। তুমি বলছ বটে যুদ্ধ করব না, কিন্তু তোমার প্রকৃতি তোমাকে বাধ্য করবে। আর কাজ যখন করতেই হবে তখন ফলের আশা ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে কাজ কর। কর্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। কর্মফল ত্যাগ মানে কোনও নেতিবাচক নয়। মানুষ তার অহংবোধ থেকে নিষ্কৃতি পায় এবং বৃহত্তর সত্তায় অংশীদার পায়। ক্ষুদ্র স্বরূপকে এক বৃহত্তর স্বরূপে বিলীন করে দিতে পারে। তাই আসক্তি ত্যাগ করেই কর্মে ডুবে যেতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'আমি আশীর্বাদ করি তোরা খাটতে খাটতে মরে যা।' নিষ্কাম কর্মের ফল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ—পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা। বাস্তবিক জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি সকল যোগের লক্ষ্য মুক্তিলাভ সাক্ষাৎ করা। জ্ঞানীগণ জানেন আপাতত পথগুলি পৃথক বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত মানুষকে পূর্ণতারূপ মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।। ৪৮

ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) যোগস্থঃ সন্ (যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা (সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমান তুল্য মনে করে) কর্মাণি কুরু (কর্মসকল কর) সমত্বং যোগ উচ্যতে (সমতা বা সম-ভাবকেই যোগ বলা হয়েছে)।

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করে, সমস্ত কর্ম (লৌকিক ও বৈদিক) সম্পাদন কর। এরূপ সমত্ববুদ্ধিকেই যোগ বলা হয়েছে।

'যোগস্থ' হয়ে কর্ম করা অর্থাৎ— (ক) কেবল ঈশ্বরার্থে, ঈশ্বরকে আশ্রয় করে কর্ম করা। প্রত্যেক কর্ম করবার সময় মনে করবে যেন ভগবানের কাজই করছি। নিজের কোনও ইচ্ছা বা স্বার্থ থাকবে না। (খ) নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম করা। কর্মফলে আসক্তি থাকবে না এবং 'আমি কর্তা' এই অভিমানও থাকবে না। শুধুই একটাই উদ্দেশ্য পূজারূপে ঈশ্বরবুদ্ধিতে কর্ম সম্পাদন করা। (গ) সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করা। কর্মের সফলতা বা নিষ্ফলতাকে সমান মনে করবে। সফল ও বিফলে সমত্বভাব। 'সমত্বম্'-ই যোগ। মনের সমতা, মন যখন সম্পূর্ণ সাম্যভাবে স্থিত, তাকেই যোগ বলে। তাই ভগবান বলছেন—যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ কর।

ভগবান এখানে বলছেন—হে অর্জুন, তুমি যোগস্থ হয়ে কর্ম কর। যোগস্থ কর্ম অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরার্থে কর্ম করা—'ঈশ্বরই তুষ্ট হউক'—এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বরকে আশ্রয় করে কর্ম করা। নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম করা। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে কর্ম করা। এখানে তিনটি ভাবের কোনও বিরোধ নেই। পরমেশ্বরে বুদ্ধি সমাহিত করে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে কর্ম করাই নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ঈশ্বরে যুক্ত বুদ্ধিই সমত্ব

এবং শান্ত হয়ে থাকে। নিষ্কাম কর্মযোগ করতে হলে পরমেশ্বরের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ স্থাপন করা চাই। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, সম্পূর্ণ মন ও হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে এবং তাঁর কাজ করতে হবে।

সমস্ত গীতার সারবস্তু যদি এককথায় বলতে হয় তা এই—'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'। নিষ্কাম কর্মের একমাত্র প্রধান উপদেশ। কর্মযোগী বা সাধকের সর্বপ্রথম কর্তব্য যোগস্থ হওয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরের সঙ্গে বুদ্ধির যোগস্থাপন করা। 'যোগস্থঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে। 'যা কিছু করছি, তাঁর পূজা করছি'—এই বুদ্ধিতে কাজ করা—ঈশ্বরার্থং। শঙ্করাচার্য এটাকে বলছেন 'লোকহিতার্থং'—লোককল্যাণের জন্য কাজ করা। কোনও স্বার্থবুদ্ধি নেই সেখানে। 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা' অর্থাৎ ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। 'আমি কর্তা'— এই বুদ্ধি ত্যাগ করে, অনাসক্ত হয়ে, কাজ করে যেতে হবে। অনাসক্ত মানে কী? ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত। মন কখনও শূন্য থাকে না। 'আমি' টাকে সরিয়ে 'তুমি' অর্থাৎ ঈশ্বরকে বসাতে হবে। সমস্ত মন ঈশ্বরে সমর্পণ করে আমরা যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করে যাব। হয়তো বারবার ব্যর্থ হচ্ছি, তবু চেষ্টা করব। সিদ্ধি বা অসিদ্ধি—সাফল্য লাভ করতেও পারি, আবার নাও পারি। তবে ফল ভালই হোক অথবা মন্দ, প্রভু সব তোমার—ঈশ্বরার্পণম্। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে যা কিছু করা হয় সব শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যজ্ঞ করা। কত যত্ন করে, নিষ্ঠা-সহকারে কর্ম করা। সবশেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু'--যাঁর পূজা করছি, তাঁকেই দিয়ে দিলাম। 'সমো ভূত্বা'—ভাল-মন্দ, সাফল্য-ব্যর্থতা সব তোমার। এমন নয় যে, ভাল ফল হলে আমার, আর মন্দ হলে তোমার —এই রকম নয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুর এক ব্রাহ্মণের গল্প বলছেন। তিনি সুন্দর বাগান করেছেন। একদিন একটি গরু বাগানে ঢুকে গাছ নষ্ট করলে এক ব্রাহ্মণ অসাবধানতাবশত গোহত্যা করে বসেন। মনে ভাবলেন একি, গোহত্যা করলাম! তখন বিচার করে ভাবছেন—'আমি তো কর্তা নই। হাতের দেবতা ইন্দ্র। তিনিই করেছেন এই গোহত্যা, তাই এই পাপ তাঁর। তখন ইন্দ্র ছদ্মবেশে এসে বাগানে উপস্থিত হলেন। তিনি বাগান ঘুরে দেখে খুব প্রশংসা করছেন, 'কী সুন্দর বাগান, কী সুন্দর সব ফুল। কে করেছে?' ব্রাহ্মণ তখন প্রশংসা শুনে খুব খুশি। 'বাগানে সবকিছু আমি করেছি'। তখন ইন্দ্র স্বরূপ ধারণ করে বললেন, 'সব সুন্দরগুলি তুমি করেছ, আর গোহত্যার বেলায় ইন্দ্র করেছে? এই পাপও তোমার।'

আমাদের জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুয়েই সমত্ববুদ্ধি আনতে হবে। নির্লিপ্ত থাকতে হবে। এই সমত্ববুদ্ধি কার পক্ষে সম্ভব? যার চিত্ত ঈশ্বরে অর্পিত। প্রভু, তোমার ইচ্ছা। তুমি করিয়ে নাও। আমি জানি না। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। এটা মস্ত বড় জিনিস। এইটাকেই যোগ বলা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ এই মহান শিক্ষা দিচ্ছেন। কাজ কর, কিন্তু যে চেতনাস্তর থেকে তোমার কাজের সূচনা হবে তাকেও অনুরূপ হতে হবে, ধীর ও স্থির হতে হবে। একেই বলে

যোগবুদ্ধি—যোগে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধি। ঐ অবস্থাই সব কাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উৎস। এই সব কাজ সব সময়েই ভাল হবে, নিজের পক্ষে, সকলের পক্ষেও, আর তাঁকেই বলে কর্মবীর। অন্তরে সমত্বভাব নিয়ে লক্ষ্যের দিকে প্রচণ্ড কর্ম করে এগিয়ে যাওয়া।

ভারতের আচার্যগণ বলেন—আরামপ্রদ জীবন খুঁজো না, প্রচুর পরিশ্রম কর, ভিক্ষা করবে না। কাজ কর আর রোজগার কর। ঈশ্বরে মন স্থির রাখ। শান্ত ধীর স্থির মানুষই সব চেয়ে বেশি কাজ করে, অস্থির উত্তেজিত ব্যক্তি নয়। তারা হৈচৈ করতে পারে, কিন্তু তাদের কাজ সঠিক কাজ হয় না।

শিশুদের এই সমত্বভাব একটু শেখাতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের এ মন্ত্রে অভিষিক্ত করতে হবে—'মনকে শান্ত করতে চেষ্টা কর, সব সময় উত্তেজিত হয়ো না।' শম ও দম অর্থাৎ বাহ্য জগৎ এবং মনের অন্তর জগৎ—দুই জগতের তরঙ্গ থেকে মনকে শান্ত রাখা। মন সমত্ব অবস্থায় থাকলে কোন তরঙ্গ এসে আমার কর্মের উদ্দেশ্যকে বিচলিত করতে পারবে না। তাই আমাদের প্রধান কাজ হল মনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ।।৪৯

ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধিযোগ হতে অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম হতে) কর্ম (কাম্যকর্ম) দূরেণ হি অবরম্ (অত্যন্ত নিকৃষ্ট) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিযোগে, সমত্ববুদ্ধিতে) শরণম্ অন্বিচ্ছ (আশ্রয় গ্রহণ কর) ফলহেতবঃ কৃপণাঃ (ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দীন)।

হে ধনঞ্জয়, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম বা সকাম কর্ম অতি নিকৃষ্ট। অতএব তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। যারা কেবল ফলের উদ্দেশে কর্ম করে, তারা অতি দীন। ফল-তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক ঈশ্বরাশ্রিত হয়ে সকল কর্ম সম্পাদন কর।

পূর্বে বলা হয়েছে, মানুষের বুদ্ধি দুই প্রকারের —ব্যবসায়াত্মিকা, অপরটি অব্যবসায়াত্মিকা বা বাসনাত্মিকা। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ঈশ্বরমুখী অর্থাৎ উর্দ্ধাভিমুখী। একমাত্র ঈশ্বরকে নিশ্চয় করে তাতেই নিবিষ্ট থাকে। তাই বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ 'ঈশ্বরের সেবা করছি'--এই বুদ্ধিতে কাজ না করে নিজের স্বার্থের জন্য ফল আকাঙ্ক্ষা করে যে-কাজ করা হয় তা নিতান্তই নিকৃষ্ট কর্ম। নিকৃষ্ট এই অর্থে যে, তা দুঃখের কারণ হয়। কাম্যকর্মে কোনও উচ্চ সত্তার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকে না। মনের বাসনা-কামনা দ্বারাই বুদ্ধি চালিত হয়ে থাকে।

কতরকম ফলের আশা করছি আমরা। কিন্তু ফল তো সব সময় পাওয়া যায় না। তাই বলা হয়, 'আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।' কিন্তু নিষ্কাম কর্মে সব কাজই

ঈশ্বরের পূজা। বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি—এসব দিয়ে কাজ করা। অনিচ্ছায় নয়। বাধ্য হয়ে নয়।— ভালবেসে। বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির সমস্ত কর্মের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য থাকে। তাঁর চিত্তে কোনও সন্দেহ বা সংশয় থাকে না। তিনি শান্তি ও সমতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন। আমরা সংসারে যা-কিছু করি—যেমন, রান্না করি, মাঠে চাষ করি, দোকান চালাই বা অফিসে যাই, যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে করি তবে তা-ই নিষ্কাম কর্মযোগ। একজন পণ্ডিত, তিনি চণ্ডীপাঠ করুন। আমার বিদ্যেবুদ্ধি নেই, আমি জুতো সেলাই করি। ঈশ্বরের সাথে ঠিকঠিক যুক্ত হয়ে আমি যে কাজ পারি, সে কাজ করব। কিন্তু ঈশ্বরের প্রীতির জন্য না করে কেউ যদি নিজের বাহাদুরির জন্য চণ্ডীপাঠ করেন তাহলে তিনি কৃপণ, আত্মকেন্দ্রিক, কৃপার পাত্র। কর্ম ,ছোট না বড়, ভালো, না মন্দ—তা বিচার করতে হবে কর্তার উদ্দেশ্য দিয়ে। কি বুদ্ধিতে তিনি কাজ করছেন তা দিয়ে। কর্মের ফল দিয়ে নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, 'যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ'—অর্থাৎ যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে না জেনে, আত্মজ্ঞান লাভ না করে, এই সংসার থেকে চলে যায় 'স কৃপণঃ'—সে কৃপণ। অনুকম্পার পাত্র। বড় দুর্ভাগ্য তার। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ না করে চলে গেল। সেই জন্য বলে 'আত্মহত্যা মহাপাপ'। তাই বাসনাচালিত ব্যক্তির কর্মে কোনও ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকে না। প্রবল বাসনা অনুযায়ী কর্ম করে। চিত্তে কোনও স্থিরতা নেই। সর্বদা সংশয় ও সন্দেহে আন্দোলিত-চিত্ত।

বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা পরমানন্দ লাভ করেন। এখানে তাই বলছেন, ফললাভের সামান্য লোভও যাঁদের নেই, নিষ্কাম কর্ম করে তাঁরা পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আর যারা তুচ্ছ ফলের লোভে সকাম কর্ম করে, তারা পরমার্থলাভের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তারা কৃপণ, কৃপার পাত্র।

তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, তুমি বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর। পরমাত্মাতে মন রেখে নিষ্কাম কর্ম কর। সাম্যবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে কর্ম কর, তাহলে তুমি সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ।।৫০ ।।

বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগে অবস্থিত নিষ্কাম কর্মযোগী), ইহ (এই লোকে) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ) উভে জহাতি (উভয়ই ত্যাগ করেন) তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগায় যুজ্যস্ব (সমত্ব-বুদ্ধি যুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হও) যোগঃ (যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ) কর্মসু কৌশলম্ (কর্মের কুশলতা)।

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগী ইহলোকেই পাপ-পুণ্য উভয় ফলই সমানভাবে ত্যাগ

করেন। সুতরাং তুমি সমত্ববুদ্ধিযোগ লাভ করার জন্য প্রবৃত্ত হও। কর্ম করার কৌশলই যোগ-প্রাপ্তি।

সুফল লাভের নিমিত্ত যে কর্ম করা হয় তাই সুকৃত। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কর্ম করা হয় অথবা যে কর্মের ফলে মানুষের দুঃখ উৎপন্ন হয় তাই দুষ্কৃত। দুষ্কৃতের ফল ইহকালে দুঃখ এবং পরকালে দুর্গতি। সুকৃত-দুষ্কৃতের বা পাপ-পুণ্যের কোনও মাপকাঠি দ্বারা বুদ্ধিযোগাশ্রিত কর্মের বিচার করা যায় না। যাতে কোনও ফলেরই আকাঙ্ক্ষা নেই, শুভ বা অশুভ কোনওপ্রকার কামনা নেই, যা ঈশ্বরাশ্রিত বুদ্ধিতে কৃত হয়ে থাকে, তা পাপ-পুণ্যের বিচারের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

'যা কিছু করি তা ঈশ্বরের উদ্দেশে'—এইভাবে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে যে নিষ্কামভাবে কর্ম করে সে-ই বুদ্ধিযুক্ত। ঈশ্বরের সাথে যোগ অর্থাৎ সবসময় ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করা। প্রভু, আমি তোমার কাজ করছি। পাপ বা পুণ্য আমি কোনটাই চাই না। সব তোমার। কাজ করতে গিয়ে হয়তো একটা ভুল হয়ে গেল। পাপ হল। আবার ভাল কাজ করলে পুণ্য হল। কিন্তু সব কাজ আমি যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে করি তাহলে পাপ বা পুণ্য কোনওটাই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। দুই-ই আমার কাছে সমান হবে। তাই পাপটাকে যেমন ত্যাগ করব, তেমনি পুণ্যটাকেও সমানভাবে ত্যাগ করতে হবে। আমি প্রশংসাও চাই না। নিন্দাও চাই না। তাই ভগবান বলছেন, 'যোগায় যুজ্যস্ব', পাপ ও পুণ্য—এই দুয়ের প্রতি সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ লাভ করার জন্য যত্নবান হও। হে অর্জুন, তুমি সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগে প্রবৃত্ত হও।

আমাদের কাজ করার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। চিত্তে মলিনতা রয়েছে। 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা', এই অহংবুদ্ধিই মলিনতা। আমাদের কাজ করতে হবে বৈকি! কিসের জন্য কাজ করব? ফলের লোভে? না। আমাদের 'আমি'-টাকে মারব বলে। তাহলেই সমস্ত মলিনতা দূর হবে। চিত্তশুদ্ধি হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাবে। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে পাপ ও পুণ্য দুই-ই মুছে যাবে। তখন আসবে বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, প্রীতি।

ভগবান বলছেন, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। কর্মের কৌশলই যোগ। সুকৌশল কর্মসম্পাদনের একমাত্র উপায়। কর্মের কৌশল যত নিখুঁত হবে কর্মসম্পাদন ততই সুন্দর হবে। একই কর্ম ঈশ্বরবুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে করা যায় আবার সকামভাবে করা যায়। কারণ কর্মের স্বভাবই বদ্ধ করা। ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করলে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম করলে তাতে সংসারে আবদ্ধ হয় না এবং কর্মসম্পাদন সঠিক হয়ে থাকে। জল অশুদ্ধ হলেও আমরা জল খাওয়া বন্ধ করতে পারি না। তাকে শুদ্ধ করে নিয়ে পান করতে হয়। ঠিক তেমনি, কর্ম বন্ধনের কারণ হলেও

কর্ম ত্যাগ করা চলে না। কৌশলে তাকে দোষমুক্ত করে নিতে হয়। যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' এই বুদ্ধিতে কাজ করলে কর্মের স্বাভাবিক বন্ধনশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কর্ম-ফলের উপর আসক্তি চলে যায়। ঈশ্বরের প্রতি আসক্তি মানেই ফলে অনাসক্তি। ভাল বা মন্দ উভয় ফলের প্রতি অনাসক্তিই সমত্ববুদ্ধি। সংসারে সাধারণ কর্তব্যকর্মকে ঈশ্বর-কর্মে পরিণত করাই কৌশল। ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, এই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম করার কৌশল আয়ত্ত কর। সেই কৌশলই কর্মের রহস্য। কৌশল সঠিক হলে কর্মের ফলও সঠিক হবে। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম করার কৌশলই ঈশ্বরলাভের পথকে সুগম করবে। দুটি উদাহরণ এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

মা দুর্গা তাঁর দুই সন্তানকে বললেন—তাঁর গলার মুক্তোর হারটি নিতে হলে বিশ্বপরিক্রমা করে প্রথম যে আসবে সেই পাবে। কার্তিক খুশি হয়ে ময়ূরে চেপে তাড়াতাড়ি বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু গণেশের ছিল সমত্ববুদ্ধি। সে মা দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করল—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে? মা দুর্গা বললেন তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। গণেশ আর অন্য কিছু না ভেবে মা দুর্গাকে সাতবার পরিক্রমা করে বসে পড়ল এবং মা দুর্গার আশীর্বাদসহ মুক্তোর হারটি লাভ করল। কার্তিক কঠিন পরিশ্রম করে বিশ্বপরিক্রমা করল কিন্তু মা দুর্গার মুক্তোর হারটি পেল না।

ছোট শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা নন্দরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, গোকুলের বাজারে দুজন ব্যাপারী আছে। একজন ক্ষীর, মিঠাই ও দধি বিক্রি করে, অপরজন লঙ্কা বিক্রি করে। কিন্তু বাবা, দিন দিন দেখছি লঙ্কার ব্যাপারী আরও ধনবান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মিঠাই-ব্যাপারী অতি পরিশ্রম করেও যেমন গরিব তেমনই আছে। এর কারণ কী? নন্দরাজ বললেন, পুত্র কর্ম সকলেই করে কিন্তু কর্মের কৌশলই যে ভাল জানে সেইই জীবনে উন্নতি করে। মিঠাই-ব্যাপারী অতি পরিশ্রম করলেও কর্কশ-ভাষায় কথা বলে আর লঙ্কা-ব্যাপারী লঙ্কা বিক্রি করে মিষ্ট-ভাষায় তাই তার উন্নতি। তাই আমাদের কর্ম করতে গেলে মনে রাখতে হবে ভগবানের এই উপদেশ—কর্মের কৌশলই যোগ।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ।। ৫১

বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্মযোগী) কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা (কর্মজাত ফল ত্যাগ করে) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) জন্ম-বন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ (জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে) অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি (নিরুপদ্রব অর্থাৎ অবিদ্যার সংস্পর্শশূন্য, পরমপদ নিশ্চয় লাভ করেন)।

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজাত ফলকামনা পরিত্যাগ করে ঈশ্বরযোগরূপ নিষ্কামকর্মে

জ্ঞানলাভ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সকল অবিদ্যার পারে ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

মনীষী কাদের বলব? যাঁদের মন শুদ্ধ, ঈশ্বরে অর্পিত, তাঁরাই মনীষী। তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করেন। তার মানে এই নয় যে, আমি কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু সফল হতে চাই না। না, তা নয়। নিজের জন্য ফলের আশা করব না। কিন্তু আমি ঈশ্বরের সেবা করছি। যথাসাধ্য নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করব। তবু ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই কত প্রার্থনা—'ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' 'যৎ কৃতম, যৎ উক্তম্, যৎ স্মৃতম্'—যা করেছি, যা বলেছি, যা স্মরণ করেছি, প্রভু, সব তোমার পায়ে অর্পণ করলাম। এইভাবে মনীষীরা বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, কর্মজাত সব ফল ত্যাগ করে কাজ করেন। তাঁদের কী হয়? তাঁরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। 'পদং গচ্ছন্তি অনাময়ম্'—অর্থাৎ তাঁরা সকল অবিদ্যার পারে পরমানন্দস্বরূপ বিশুদ্ধ পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, গ্রামে যেতে হলে মাঠের ওপর আলপথ দিয়ে যেতে হয়। আল দিয়ে জমিগুলো ভাগ করা থাকে—এটা ওর জমি, ওটা আমার ইত্যাদি। কিন্তু বর্ষাকালে প্লাবন হলে সব একাকার। ঠিক সেইরকম আত্মজ্ঞান লাভ হলে সকল অবিদ্যা অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি চলে যায়। তখন সর্বভূতে এক দর্শন। তাকেই মোক্ষ বা পরমপদ বলা হচ্ছে।

জন্মের বন্ধন হতে মুক্ত হলে জন্মজনিত সংসারের দুঃখ, অশান্তি ভোগ করতে হয় না এবং তাঁকে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। তিনি পরমাত্মাকে লাভ করে পরম শান্তি লাভ করেন। চিরশান্তি, চির আনন্দ—ব্রাহ্মী স্থিতি।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।। ৫২

যদা (যখন) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহকলিলম্ (মোহরূপ অজ্ঞান কলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করবে) তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য অর্থাৎ শ্রবণযোগ্য এবং শ্রুত অর্থাৎ কর্মফল বিষয়ে) নির্বেদং গন্তাসি (তোমার বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা প্রাপ্ত হবে)।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কলুষতা অতিক্রম করবে অর্থাৎ নির্মোহ হবে, তখন তুমি স্বর্গাদি কর্মফল (লৌকিক ও বৈদিক কর্মফল) বিষয়ে যা শুনেছ এবং যা শুনবে উভয় বিষয়েই বৈরাগ্যলাভ হবে।

'মোহকলিলং' অর্থ ঘোর মোহ। মোহমুগ্ধ। আমরা যেন গভীর মোহনিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছি। মোহ কাকে বলা হচ্ছে? মানুষের বুদ্ধি যখন মোহাচ্ছন্ন হয় তখন সে অনিত্য অসৎ পদার্থকে সৎ বলে মনে করে। তীব্র কামনাবাসনার অধীন হয়ে পড়ে। আত্মার

সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অবিবেক। নিজেকে আমি জানি না, চিনি না। এই অজ্ঞতার জন্য নিজেকে ক্ষুদ্র, অক্ষম, কৃপার পাত্র বলে মনে করছি। আমাদের সবকিছু এই 'কাঁচা আমি'-কে ঘিরে। 'আমি' এবং 'আমার' এই মোহ দিয়ে আমাদের স্বরূপ ঢেকে আছে। মন কামনাবাসনার দ্বারা সর্বদা মলিন, কলুষিত। যেন আয়নার উপর ময়লা পড়েছে। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটা গল্প বলছেন। ভেড়ার পালে সিংহের বাচ্চার বেড়ে ওঠার গল্প। ভেড়াদের মতো সেও ঘাস খায়। ভ্যা ভ্যা করে ডাকে। একদিন আর একটা সিংহ সেখানে এসে উপস্থিত। দেখে, এ তো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। দৌড়ে গিয়ে সে সিংহের বাচ্চাটাকে ধরে বলল, 'এই, তুই ভ্যা ভ্যা করছিস কেন? তুই তো সিংহ'। সে তখন ভয় পেয়ে বলছে, 'না, না, আমি সিংহ নই।'

আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরকম। নিজেদের শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ভুলে গিয়ে নিজেকে পাপী, দুর্বল, বদ্ধ মনে করছি। সেই সিংহ তারপর বাচ্চাটাকে জোর করে ধরে জলের ধারে দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, 'দেখ, তোর ছায়া আর আমার ছায়া কি এক নয়?'

এই হল বেদান্তের মহাবাক্য—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'! গুরু শিষ্যকে বলছেনঃ 'শ্বেতকেতু, তুমিই সেই'। শিষ্যকে তার স্বরূপ মনে করিয়ে দিচ্ছেন। যদি আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমাদের স্বরূপের ওপর থেকে এই মোহ-আবরণ সরাতে পারি, তাহলে কী হবে? 'শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ' অর্থাৎ যা আমরা শুনি, দেখি, আপাতমধুর যা-কিছু আমাদের আকর্ষণ করে, তার প্রতি আমরা নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যবান হব। কোন্ বুদ্ধির সাহায্যে আমরা এই বৈরাগ্য লাভ করব? শ্রীশঙ্করাচার্য বলছেন, 'যোগানুষ্ঠানজনিত সত্ত্বশুদ্ধিজা' বুদ্ধির দ্বারা। যোগ অর্থে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। 'পাকা আমি'র সঙ্গে 'কাঁচা আমি'র যোগ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—যদিও ভাল-মন্দ উভয় মোহ আত্মার অখণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসৎ ভাব আত্মার বাহ্য আবরণ এবং সৎ ভাব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা—তাঁর অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসৎ'-এর স্তর ভেদ করতে পারছে, ততদিন সৎ-এর স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। আর যতদিন না মানুষ সৎ-অসৎ উভয় স্তর ভেদ করতে পারছে, ততদিন আত্মার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। অতএব অসৎ কর্মের গতিবেগকে রহিত করতে হলে সৎ অর্থাৎ অনবরত নিষ্কাম কর্মের গতি দ্বারা শুভসংস্কার বাড়াতে হবে। শুদ্ধ ও নির্মল বুদ্ধিতে আত্মার প্রত্যক্ষানুভূতি হয়।

ভগবান বলছেন—হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা দ্বারা তোমার বুদ্ধি যখন মোহজনিত মলিনতা হতে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ এবং নির্মল হবে, জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে আত্মস্থ হবে, তখন ঐহিক ও স্বর্গাদি সুখভোগের নিমিত্ত তোমার মনে আর কোনও আকাঙ্ক্ষা জন্মাবে না। আত্মাকে জানলে অনিত্য বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমার চিত্ত হতে দূরীভূত হবে।

অতএব তোমার মোহ অন্ধকার দূর হলে বুদ্ধি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে প্রকৃত শ্রেয় নির্ণয় করতে সমর্থ হবে।

এ তপস্যার বিষয়। তপস্যা মানে আত্মচিন্তা, স্বরূপ চিন্তা। যা কিছু আত্মার বিরোধী তা-ই অবিদ্যা। তাকে প্রত্যাখান করতে হবে। এই 'না' বলাটা কঠিন কাজ। কিন্তু ঠিক তা-ই বলতে হবে। মনের জোর চাই। এরই নাম বিচারবুদ্ধি। এইভাবে অভ্যাস করলে আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হবে। বুদ্ধি শুদ্ধ হবে। সেই শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে আমরা নির্বেদ হব, বৈরাগ্য লাভ করব, প্রকৃত শ্রেয় আত্মাকে জানব।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।। ৫৩

যদা (যখন) শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না (নানা ফলশ্রুতির দ্বারা বিক্ষিপ্ত) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল হয়ে) অচলা স্থাস্যতি (স্থির থাকবে) তদা (তখন) যোগম্ অবাপ্স্যশি (যোগ বা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়ে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে)।

লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ ফলশ্রুতি-শ্রবণে তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে নিশ্চল হয়ে থাকবে, তখনই তুমি যোগাবস্থা প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখানে ভগবান যোগের চরম ফল যে স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ করা সেই কথাই বলছেন। নানা লৌকিক ও বৈদিক কর্ম শ্রবণ করে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। শ্রুতি মানে শাস্ত্র। কিন্তু এখানে এর অর্থ অধ্যাত্মশাস্ত্র নয়। অধ্যাত্মশাস্ত্র ছাড়া যে শাস্ত্র, সে শাস্ত্র বলছে 'খাও, ঘুমোও' ইত্যাদি। সাধনার বিষয়ে আমরা লোকমুখে কত কথা শুনি। কেউ বলছে, জীবনের লক্ষ্য অর্থ। আবার আর একজন বলছে 'না, অন্য কিছু'। নানা মুনির নানা মত। এইভাবে নানারকম শুনে আমাদের মন বিভ্রান্ত, বিচলিত 'শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না'। শাস্ত্রের পরস্পরবিরোধী নানা কথা শুনে সংশয় ও অস্থিরতায় ভুগছি আমরা। কিন্তু তা হবে কেন? পরের দাস কেন হব? অন্যের কথায় বুদ্ধিবিভ্রম কেন ঘটবে? আমরা নিজেরা বিচার করব কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস।

স্বামীজী বলছেন, 'তোমরা বল যার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, সে নাস্তিক। আমি বলি যার নিজের ওপর আস্থা নেই, সে নাস্তিক।' অন্যের কথায় বা বিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্যে বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের আত্মবুদ্ধিতে স্থির থাকতে হবে।

কঠোপনিষদে নচিকেতার মত—শুধু অমৃতত্ব চাই। আর কিছু চাই না। কোনও বিক্ষেপ নেই। এক লক্ষ্যে স্থির। এই একমুখীনতা যখন হবে তখনই বুদ্ধি সমাধিতে স্থির হবে। সমাধির অর্থ কি? 'সমাধীয়তে অস্মিন্ ইতি সমাধিঃ'—অর্থাৎ নিজের আত্মাতে নিজে ডুবে

আছি, স্থির হয়ে আছি। এতটুকুও চাঞ্চল্য বা বিপরীত ভাবনা নেই। আত্মা ছাড়া কিছুই নেই। শান্ত, বিক্ষেপবর্জিত অবস্থা। এভাবে বুদ্ধি সমাহিত হলে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভব হয়। আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। সেই অবস্থায় বাসনা না থাকায় মানুষ কৃতকৃত্য হয়। অর্থাৎ তাঁর সকল কর্মের অবসান হয়। যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হন।

এখানে নিশ্চলা আর অচলা দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'নিশ্চলা' মানে বুদ্ধি যখন সকল বিপরীত ভাবনা থেকে মুক্ত। নানা বিষয়ের দিকে আর ছোটাছুটি করে না। একাগ্র। আর 'অচলা' অর্থ দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে বুদ্ধি যখন আত্মচিন্তারূপ সমাধিতে স্থির হয়ে থাকে।

বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিকে স্থির অচঞ্চল করতে হলে বিষয় থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে পরমেশ্বরে সমাহিত করতে হবে। এজন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। বুদ্ধিযোগের অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির চঞ্চলতা দূর করতে হবে। বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে পরমেশ্বরে নিবিষ্ট হবে, বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হবে না, তখনই যোগের পরম ফল আত্মজ্ঞান লাভ বা স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ।

অর্জুন উবাচ
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।। ৫৪

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন) কেশব (হে কেশব) সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (আত্মসমাহিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) কা ভাষা (লক্ষণ কী) স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত (স্থিতধী ব্যক্তি কী বলেন) কিম্ আসীত (কীভাবে অবস্থান করেন) কিং ব্রজেত (কীরূপ চলেন)।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কী? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন, কীভাবে থাকেন এবং কীভাবেই বা চলাফেরা করেন?

স্থিতপ্রজ্ঞ কথাটার অর্থ—যার প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে স্থিত। প্রজ্ঞা মানে জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান। অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এই বুদ্ধিতে যিনি স্থির, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি বাহ্য বিষয় হতে ইন্দ্রিয়সংযম করে পরমাত্মাতে সমাধিমগ্ন। একটা জাহাজ যেন নোঙর ফেলা আছে—অচল, অটল। এককথায় জীবন্মুক্ত, সমাধিমান পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ। এমন একটা জিনিস তিনি পেয়ে গেছেন যা পেলে মনে হয় আর কিছু চাওয়ার নেই। 'নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ' তাঁর মন ঈশ্বরাভিমুখী। ভগবান ছাড়া তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোনও বস্তু নেই। পরমাত্মাই তাঁর আশ্রয়। সেই আশ্রয়ে, সেই নীড়ে তিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করছেন। আবার জানতে চাইছেন, সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি কীভাবে অবস্থান করেন, কী ভাষায় কথা বলেন এবং কীভাবে চলাফেরা করেন। অর্থাৎ কীভাবে তাঁকে আমরা চিনতে পারব? সংসারে তিনি অবস্থান করলে বিষয়কে কীরূপে গ্রহণ করেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণগুলি মুমুক্ষু সাধকের

মোক্ষলাভের উপায় হতে পারে, এই অর্জুনের অভিপ্রায়।

মানুষের তিনটে অবস্থা আছে—জাগ্রত, অর্থাৎ যখন আমরা জেগে আছি। স্বপ, যখন আমরা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। আর সুষুপ্তি অর্থাৎ গভীর নিদ্রার অবস্থা, যখন আমরা স্বপ্নও দেখছি না। যে-কোনও অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সমাধিমান স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কিছুই জানেন না। বাতাসহীন স্থানে প্রদীপের শিখা যেমন স্থির, নিষ্কম্প তেমনি 'নির্বাতপ্রদীপশিখাবৎ' তাঁর ঈশ্বরের সাথে যোগ। তিনি কথা বললে, ভগবানের কথা বলেন। চিন্তা করলে, ভগবানের চিন্তা করেন। কাজ করলে ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করেন। এমনই একজন মানুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শিক্ষা নেই কিন্তু তিনি ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানেন না। ঈশ্বরই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত।

অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কেশব বলে সম্বোধন করছেন। 'কেশব' কথাটার অর্থ সকলের অন্তর্যামী। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞের গোপন রহস্য বলতে একমাত্র তিনিই সক্ষম।

শ্রীভগবানুবাচ
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। ৫৫

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) পার্থ (হে অর্জুন) যদা (যখন) সর্বান্ মনোগতান্ কামান্ (চিত্তস্থিত সমস্ত কামনা) প্রজহাতি (সম্যক্ পরিত্যাগ করেন) আত্মনি (পরমাত্মাতে) আত্মনা তুষ্টঃ (নিজেই তুষ্ট থাকেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ আত্মাতেই তুষ্ট, বাহ্যবিষয়-নিরপেক্ষ হয়ে আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত) তদা (তখন) স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়)।

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন, পার্থিব ফললাভে নিরপেক্ষ হয়ে, এবং পরমানন্দস্বরূপ আত্মভাবে তৃপ্ত হয়ে, যোগী যখন সমস্ত মনোগত কামনা-বাসনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের প্রথম লক্ষণ—তিনি সমস্ত বিষয়কামনা ত্যাগ করেছেন। 'প্র-জহাতি' মানে প্রকৃষ্টভাবে ত্যাগ। সব কামনা-বাসনাকে সমূলে নাশ করা। কাজটা সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অশ্বত্থ গাছকে যদি ওপর থেকে কেটে ফেলা যায়, পরের দিন দেখা যাবে একটা নতুন ফেঁকড়ি গজিয়েছে। মানুষের মনও সেইরকম। ওপর থেকে মনে হচ্ছে পরিষ্কার। কিন্তু কামনা-বাসনার শিকড় ভেতরে কতদূর ছড়িয়ে আছে তা দেখা যাচ্ছে না। 'মনোগতান্' অর্থাৎ এই সব কামনা-বাসনা মনেরই ধর্ম, আত্মার নয়। কামনাই মনের চঞ্চলতার কারণ। এই কামনা আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।

আত্মাতে কোনও অভাববোধ নেই। আত্মা স্বয়ংসম্পূর্ণ। মনোগত এইসব কামনা-বাসনাকে নির্মূল করা কখন সম্ভব হয়? যখন যোগী আত্মাতে স্থিত হন। তখন তাঁর আনন্দ

বাইরের কোনও বস্তুর উপর নির্ভর করে না। নিজেকে তিনি জেনেছেন। জেনে পরমানন্দস্বরূপেই তিনি ডুবে আছেন। যোগী তখন দেখেন তিনি নিজেই জীবজগৎ সবকিছু হয়েছেন। তিনি সর্বব্যাপী। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও বস্তুই নেই। কী কামনা করবেন তিনি। তাই তিনি আত্মকাম, পূর্ণকাম। 'আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ'—নিজের মধ্যে নিজের দ্বারাই তিনি পরিতুষ্ট হয়ে আছেন। স্বপ্রকাশ। 'আমি চৈতন্যস্বরূপ'—এই বোধে তিনি স্থির। এই জ্ঞান লাভ হলে আত্মসমাহিত যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হন।

শ্রুতি বলেন—যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ মর্তধামে অমরত্ব লাভ করে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন অর্থাৎ গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরমানন্দ লাভ। বাইরের বস্তুতে সুখ নয়, একমাত্র আত্মানন্দেই তৃপ্ত।

এ সংসারে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, অনাসক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিচ্ছেন—পাখি যখন ডিমে তা দেয়, তার চোখ দুটো দেখেছ? সে চোখ চেয়ে আছে, কিন্তু কিছুই যেন দেখছে না। ফ্যালফ্যালে চোখ! ডিমের দিকে তার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে। চোখ চেয়েও সে বাইরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না। জীবন্মুক্ত যিনি, তিনি ঐ ডিমেতা-দেওয়া পাখির মতো। আমরা যে-ভাবে জগৎটাকে দেখি, সেটাকে তিনি দেখতেই পান না। তাঁর কাছে সেটা স্বপ্নের মতো। তাঁর জগৎ আত্মার জগৎ, চৈতন্যের জগৎ। 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'—নিজেতেই নিজে তুষ্ট। নিজের পরমাত্মস্বরূপ তিনি জেনেছেন। তাই তিনি নিজের মধ্যে নিজে বুঁদ হয়ে আছেন।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। ৫৬

দুঃখেষু ন-উদ্বিগ্ন মনাঃ (দুঃখে উদ্বেগশূন্য চিত্ত) সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (সুখে স্পৃহাশূন্য) বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মুনিঃ (মননশীল ব্যক্তি) স্থিতধীঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়)।

দুঃখে যাঁর চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেও যাঁর অনুরাগ নেই, যিনি ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়েছেন—এরূপ মননশীল ব্যক্তিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ এখানে বিস্তারিতভাবে বলছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের কোনও উদ্বেগই হয় না। 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ'—দুঃখে তিনি উদ্বিগ্ন হন না, 'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'—সুখের প্রতি তাঁর কোনও স্পৃহা নেই। বিদ্যামায়া আর অবিদ্যামায়ার পারে চলে গেছেন তিনি। তাঁর দুঃখে যেমন উদ্বেগ হয় না, সুখেতেও তাঁর কোনও স্পৃহা থাকে না। কারণ সুখ আর দুঃখ টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। অবিমিশ্র সুখ বা অবিমিশ্র দুঃখ বলে কিছু নেই। দুয়ে মিশে আছে। সুখ চাইলে দুঃখকেও নিতে হবে। আবার আজ যা সুখ, পরিবর্তিত অবস্থায় কাল তা দুঃখের কারণ হতে পারে। অথবা একজনের পক্ষে যা সুখের, আরেকজনের পক্ষে তা

দুঃখজনক হতে পারে। দুঃখও আবার কতরকমের। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। আধিভৌতিক অর্থাৎ মশা, মাছি, হিংস্র প্রাণী ইত্যাদি ভূতবর্গ যখন দুঃখের কারণ হয়। আর আধিদৈবিক—অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুঃখ। ভগবান বুদ্ধদেব বলছেন 'দুঃখ সমুদায়', সব মানুষ দুঃখী। রাজারও দুঃখ আছে, আবার প্রজারও দুঃখ আছে। সুতরাং দুঃখ থাকবেই একথা জেনে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কখনও দুঃখে অভিভূত হন না। আবার সুখের প্রতিও তিনি কোনও আকর্ষণ অনুভব করেন না। কিন্তু সে কোন সুখ? যা ক্ষণিক, যা অনিত্য সেই জাগতিক সুখ। কিন্তু যা ভূমা, যা নিত্য সেই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর একমাত্র স্পৃহা, ভালবাসা। সেই নিঃশ্রেয়সকে লাভ করে তিনি সব পেয়েছেন।

রাগ মানে আসক্তি, অনুরাগ, কোনও জিনিসের প্রতি আকর্ষণ। 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ'—তাঁর সমস্ত আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ দূর হয়ে গেছে। তাঁর ভয়ও নেই, ক্রোধও নেই। তিনি বীতরাগ। কোনও বস্তুর প্রতি তাঁর রাগ বা আকর্ষণ নেই অর্থাৎ কোনওকিছুর প্রতি অনুরাগ নেই, আবার বিরাগও নেই। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ—দুই-ই অনিত্য, একথা তিনি বুঝেছেন। তাই তিনি দুটোকেই সমানভাবে গ্রহণ করেন। আবার তাঁর ভয়ও নেই। যারা ভোগ্যবস্তু লাভের জন্য লালায়িত তাদের মনে সর্বদা ভয় থাকে। 'আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বুঝি পেলাম না, যা পেয়েছি তাও বুঝি হারিয়ে গেল'—এই আশঙ্কা মানুষের মনে ভয় উৎপন্ন করে। সুখে কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি তিনি দুঃখে-সমভাবাপন্ন অতএব তাঁর ভয়ের কোনও কারণ থাকতে পারে না। ক্রোধও তাঁর জন্মাতে পারে না, কারণ তিনি সমস্ত কামনাবাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। এমন যে একটা নির্লিপ্ত জীবন্মুক্ত অবস্থা, তা লাভ করে যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হন।

বাস্তবিক, যেখানে আকর্ষণ আছে সেখানে বিকর্ষণও আছে। একটাকে ছাড়া আর একটাকে ভাবা যায় না। আমাদের আদর্শ হচ্ছে দুয়ের ঊর্ধ্বে যাওয়া, দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, তিনি রাগ দ্বেষ উভয়কেই অতিক্রম করে গেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ 'কর্মযোগে' বলছেন—আদর্শ মানুষ তিনিই যিনি তীব্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সম্পূর্ণ প্রশান্ত থাকেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে ঠিক সেটাই দেখতে পাওয়া যায়। কী অদ্ভুত সংসার তাঁর! একদিকে ত্যাগী সন্ন্যাসী-সন্তান ও মঠ—শরৎ মহারাজ, যোগীন মহারাজ, এঁদের মতো মহাপুরুষদের সঙ্গে বাস, অন্যদিকে পাগলী মামী, রাধু, বিষয়ী ভায়েরা—কেউ পাগল, কেউ তার থেকেও বেশি। একদিকে ঘোর ত্যাগী, আর একদিকে ঘোর বিষয়ী। এঁদের সবাইকে নিয়ে মা সংসার করে যাচ্ছেন। কত কোলাহল, সামান্য জিনিস নিয়ে কত ঝগড়া, কত কী! তার মধ্যে শ্রীশ্রীমা শান্ত, নির্বিকার, উদাসীন, দ্রষ্টা—এটাই আমাদের সকলের জন্য আদর্শ। গীতা এই আদর্শকে জীবনে পালন করতে বলছেন।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।।৫৭

যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহরহিত) তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য (সেই সেই শুভ ও অশুভ প্রাপ্ত হয়ে) ন অভিনন্দতি (আনন্দ প্রকাশ করেন না) ন দ্বেষ্টি (বিরক্তি প্রকাশও করেন না) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁরই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত)।

যিনি সকল ব্যক্তি ও বস্তুতেই স্নেহ বা মমতাশূন্য, যিনি কোনও শুভ বা প্রিয় বিষয় উপস্থিত হলেও হর্ষপ্রকাশ করেন না, অশুভ বা অপ্রিয় বস্তু পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন না, তাঁরই প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

'সর্বত্র অনভিস্নেহঃ' অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি ও বিষয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ নেই, আকর্ষণ নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রকম যে একটা জীবন, তা কি নেতিবাচক? না, কখনোই নয়। ঈশ্বরের প্রতি যখন তীব্র ভালবাসা হয় তখন আর কোনও কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে না। তখন তাঁর একমাত্র স্নেহ বা আকর্ষণ ঈশ্বরের প্রতি। অনেকসময় আমরা দেখি রাস্তার ভিখারি, তার আছে হয়তো একটা ভাঙা টিন আর দু-একটা ছেঁড়া কাপড়। কিন্তু তার প্রতিই কী আকর্ষণ! ধরতে গেলে তেড়ে আসবে। অর্থাৎ ত্যাগ মানে দারিদ্র নয়। ত্যাগের অর্থ হল আসক্তি ত্যাগ। ঈশ্বরকে যিনি ভালবেসেছেন, সেই নিত্যবস্তুর সন্ধান যিনি পেয়েছেন তাঁর এত সুখ, এত আনন্দ হয় যে, শুভ-অশুভ যাই আসুক না কেন, তাঁর হর্ষ বা বিষাদ কোনোটাই হয় না। তিনি জানেন, প্রিয় ও অপ্রিয় দুইই অনিত্য। ভাল স্বাস্থ্য যেমন চিরদিন থাকে না, তেমনি অসুস্থতাও চিরদিন থাকে না। জাগতিক বিষয়ে তিনি হর্ষ-বিষাদের পারে অবস্থান করেন—নির্দ্বন্দ্ব। এইরকম যে ব্যক্তি তাঁর প্রজ্ঞা আত্মজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ইনিই স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। ৫৮

কূর্মঃ (কচ্ছপ) অঙ্গানি ইব (যেমন অঙ্গসকল) (সঙ্কুচিত করে) যদা (যখন) অয়ং চ (ইনি, এই যোগী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলিকে) ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ (শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) (তখন) তস্য (তাঁর) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি, জ্ঞান) প্রতিষ্ঠিত (পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত)।

ভয় পেলে কচ্ছপ যেমন সমস্ত অঙ্গ শরীরের ভেতরে গুটিয়ে নেয় তেমনি যোগী যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বতোভাবে প্রত্যাহার করে নেন, তখন বুঝতে হবে তাঁর প্রজ্ঞা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, স্থিতপ্রজ্ঞ কী করে হওয়া যায়? আমাদের মনটা যেন মত্ত হাতী। তার

স্বভাবই হচ্ছে এদিক-ওদিক ছোটা। কখন কী করে বসবে ঠিক নেই। ভালও করতে পারে আবার মন্দও করতে পারে। হয়ত মাহুতকেই মেরে ফেলল। এই মনটাকে বশে আনতে হবে। কচ্ছপ যেমন একটু বাধা পেলেই হাত-পা-মাথা সব ভেতরে গুটিয়ে নেয়, তেমনিভাবে মনটাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে তুলে ভেতরে টেনে নিয়ে আসতে হবে। এটা নিরন্তর অভ্যাসের ব্যাপার। একদিনে হয় না। আবার মনটাকে গুটিয়ে এনে তো শূন্যও রাখা যায় না, তার একটা আশ্রয় চাই। ঈশ্বরে অনুরাগ যদি হয়, মনটাকে যদি ঈশ্বরমুখী করা যায়, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই শান্ত, সংযত হয়ে যায়। 'ইন্দ্রিয়ার্থ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়। চোখের বিষয় দর্শনীয়-অদর্শনীয় নানা বস্তু, কানের বিষয় শব্দ, নাকের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। কিন্তু মনটা যদি একবার ভগবানে ডুবে যায়, তখন চোখ, দেখেও দেখে না, কান, শুনেও শোনে না। ইন্দ্রিয়গুলি যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভক্ত তখন বলে—'এই চোখ দিয়ে ঈশ্বরীয় রূপ দেখব, কান দিয়ে ঈশ্বরের নামগান শুনব, হাত দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করব। আর পা দিয়ে যেখানে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হচ্ছে সেখানে যাব।' আসল কথাটা হচ্ছে—'মোড় ফিরিয়ে দেওয়া'। মনটা একবার যদি ঈশ্বরের আস্বাদ পায়, সে আর কিছু চায় না। মন তখন ঈশ্বরে স্থিত। পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। তাই যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁর ইন্দ্রিয়সংযম সহজ, স্বাভাবিক। কচ্ছপের উপমা দিয়ে সেকথাই এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। এই স্বভাবসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংযমই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের প্রধান লক্ষণ। গীতা এখানে অন্তরের সংযমের উপর বিশেষে গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইসঙ্গে সাধককে প্রথম অবস্থায় স্থলবিশেষে বাহ্যিক উপায়গুলি আশ্রয় করে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয় এবং ধীরে ধীরে কচ্ছপের মতো তা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ।।৫৯

নিরাহারস্য (আহারগ্রহণে অর্থাৎ বিষয়গ্রহণে অসমর্থ) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল) রসবর্জং (বিষয়রস ব্যতীত) বিনিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) কিন্তু পরং (ব্রহ্ম, পরমার্থ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করলে) অস্য (এঁর) রসঃ (বিষয়ের প্রতি অনুরাগ) অপি (ও) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়)।

আহারগ্রহণে অসমর্থ অসুস্থ ব্যক্তি বা বিষয়ভোগে পরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু তাদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগ শান্ত হয় না। কিন্তু যিনি পরমার্থ লাভ করেছেন অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই নিবৃত্ত হয়ে যায়।

এখানে একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাটা বোঝানো হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ, তিনি কিছু খান না, কারণ খেতে পারেন না। তাঁকে কী খুব সংযমী বলা যাবে? খুব ত্যাগী কী তিনি? না, তা তো নয়। তাঁর তো রসনার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। হয়তো মনে

মনে খাচ্ছেন। মনে মনে খাওয়াটাও খাওয়া। এখানে রস মানে বিষয়বাসনা, ভোগস্পৃহা। শুধু বাহ্যিক ত্যাগ হলে যোগী হয় না। অন্তরে তাঁর ভোগবাসনা রয়েছে।

ভগবান বলছেন, ইন্দ্রিয়সংযম ও প্রত্যাহার স্থিতপ্রজ্ঞের যেমন বাহ্যিক লক্ষণ, আবার তিনি পরমাত্মাকে লাভ করায় তাঁর মন থেকে বিষয়ভোগ ও আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। তাঁর বুদ্ধি নির্মল, স্থির এবং একাগ্র। অন্যদিকে স্থিতপ্রজ্ঞ না হয়েও কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ দূর হয় না। মানুষ যদি ভগবান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাস করে, অহং দ্বারা চালিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ জয় করতে পারে না। পরমাত্মাতে মন একাগ্র হলেই ভোগবস্তুর প্রতি আকর্ষণের অবসান হয়।

আসলে মনের ত্যাগই ত্যাগ। ত্যাগ কথাটার অর্থ হচ্ছে, বৃহতের জন্য ক্ষুদ্রকে ত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও'। আবার বলতেন 'পূবের দিকে যত এগোবে পশ্চিম তত পেছনে পড়ে থাকবে'। ঈশ্বরে আসক্তি মানেই বিষয়ে অনাসক্তি। ব্রহ্মানন্দরসের অমৃত-আস্বাদ যিনি একবার পেয়েছেন, বিষয়রসের চিটেগুড় কি আর তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে? 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে'— সেই পরম পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স্ যিনি লাভ করেছেন একমাত্র তাঁরই বিষয়াসক্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয় এবং বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই সমূলে নাশ হয়ে যায়।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।। ৬০

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) হি (যেহেতু) প্রমাথীনি (প্রকৃষ্টরূপে মন্থনকারী অর্থাৎ বলপূর্বক চিত্ত- বিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং (বলপূর্বক) হরন্তি (হরণ করে, বিক্ষুব্ধ করে)।

হে কুন্তীপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত বলবান। চিত্ত-বিক্ষেপকারী। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও এই বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। তিনি হয়তো সৎ-অসৎ বিচার করছেন। বিষয়ের দোষ-দর্শন করে বারবার বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে আনছেন। কিন্তু তাঁর বিবেক-বুদ্ধি সবসময় জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গুলি বলপূর্বক তাঁর সদ্বৃত্তিগুলিকে অভিভূত করতে পারে। দস্যুরা জোর করে ধনী ব্যক্তিকে কাবু করে ফেলে তার চোখের সামনে থেকেই ধনসম্পদ চুরি করে নিয়ে যায়। তেমনি বিষয়ের সম্পর্শে এলে ইন্দ্রিয়গুলি মানুষের বিবেককে অভিভূত করে মনটাকে বিষয়ের দিকে টেনে

নিয়ে যায়। অতএব একদিকে বিবেকী তাঁর বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীন থেকে মনকে ঊর্ধ্বে তুলতে চেষ্টা করে, অপরদিকে ইন্দ্রিয়গণ মনকে টেনে ভোগের দিকে নিয়ে যেতে চায়। ইন্দ্রিয়গণ এতই শক্তিশালী যে বিবেকবান ব্যক্তির বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর মনকে হরণ করে নেয়। কাজেই বিবেকবান ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয়জয় করতে হলে তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে।

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।৬১

তানি (সেই) সর্বাণি (সকল ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করে) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ অর্থাৎ ঈশ্বরনির্ভর) যুক্তঃ (সমাহিতভাবে) আসীত (অবস্থান করবেন) হি (যেহেতু) যস্য (যাঁর) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁর) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি, আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত)।

যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বসে থাকবেন। কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূত হয়েছে, তাঁর বুদ্ধি পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত।

ইন্দ্রিয়গুলি জোর করে আমাদের মনকে বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেলে কী করে তার প্রতিকার করব? তার উত্তরে বলছেন—নিজেকে সব সময় ঈশ্বরের আশ্রিত জেনে, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনতে হবে।

ইন্দ্রিয়সংযমই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার প্রথম সাধন। প্রশ্ন হল, কীভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায়? এটা সাধনার বিষয়। মনকে বোঝাতে হয়। শাসন করতে হয়। বিচার করতে হয়। এখন ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা ঠিক এর উলটোটা করতে হবে। তখন আমি প্রভু। ইন্দ্রিয়গুলিই আমার দাস। হিন্দুদের জীবন ঈশ্বরকেন্দ্রিক। সকালে উঠে শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে তুলসীতলায় জল দিয়ে দিনের শুরু। তারপর ঠাকুরকে তোলা, ঠাকুরের জন্য রান্না করা। তিনি খাবেন, তারপর আমরা তাঁর প্রসাদ পাব। এইভাবে ধীরে ধীরে মনটাকে ঈশ্বরমুখী করে তোলা। ইন্দ্রিয়গুলি কখন পুরোপুরি আমার বশে আসে? যখন ঈশ্বরচিন্তায় মন একেবারে মগ্ন হয়ে যায়—'মৎপরঃ'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি বাসুদেব, সর্বভূতের আত্মা—এই জেনে যে একান্তভাবে আমার উপর নির্ভর করে থাকে সেই মৎপর। সমাজে দেখা যায়, যে ব্যক্তি রাজাকে আশ্রয় করে থাকে, তস্করবাও তার বশীভূত হয়। একইভাবে, ভগবানকে আশ্রয় করলে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলে, তাঁর প্রভাবে আমাদের শত্রু এই ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবেই নিবৃত্ত হয়। আসল কথা ভগবানকে ভালবাসা। অকৃত্রিম ভালবাসা। ব্যাস্, তাহলেই হল। ইন্দ্রিয়সংযম তখন আপনা-আপনি হয়। ঈশ্বরের যিনি শরণাগত, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে রক্ষা করেন। অতএব দস্যুরূপ ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের

আশ্রয় গ্রহণ করে আমাদের অবস্থান করা অবশ্যই কর্তব্য। ভগবানের শরণ নিয়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হবে, বুদ্ধিও স্থির হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। ভগবানের প্রতি আসক্ত হলে আমাদের আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। বলবান ইন্দ্রিয়গুলি আর আমাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে না। এইরূপ যিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করেছেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩

বিষয়ান্ (ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমূহকে) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করতে করতে) পুংসঃ (পুরুষের, মানুষের) তেষু (সেই সমস্ত বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি, আকর্ষণ) উপজায়তে (জন্মায়) সঙ্গাৎ (আসক্তি থেকে) কামঃ (কামনা, তৃষ্ণা) সঞ্জায়তে (জন্মায়) কামাৎ (কামনা থেকে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মায়) ক্রোধাৎ (ক্রোধের থেকে) সম্মোহঃ (কর্তব্য-অকর্তব্যরূপ বিবেক নাশ, অবিবেক) ভবতি (হয়) সম্মোহাৎ (অবিবেক থেকে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশের স্মৃতি নাশ) স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিনাশ থেকে) বুদ্ধিনাশঃ (সৎ-অসৎ বিচারবুদ্ধির নাশ) বুদ্ধিনাশাৎ (বিচার-বুদ্ধি নাশ থেকে) প্রণশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়) অর্থাৎ পুরুষার্থলাভের অযোগ্য হয়।

সবসময় বিষয়চিন্তা করতে করতে সেগুলির উপর মানুষের আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে সেই বিষয়গুলিকে পাওয়ার লোভ বা কামনা হয়। কামনা বাধা পেলেই ক্রোধ। আর ক্রোধ থেকে কর্তব্য-অকর্তব্যরূপ বিবেক নাশ। তখন মানুষ শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ ভুলে যায়। স্মৃতিবিভ্রম হলে সৎ-অসৎ বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়। বিচারবুদ্ধি নষ্ট হলে মানুষ পুরুষার্থলাভের অযোগ্য হয়।

এখানে প্রসঙ্গ হচ্ছে আমাদের মনটাকে জয় করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে একটা সতর্কবাণী দিচ্ছেন। বাইরের ভোগ্যবস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে না হয় সংযত করা গেল কিন্তু মনটাকে যদি জয় করতে না পারি? মন ঈশ্বরে যুক্ত না হলে কীভাবে মানুষের অধোগতি হয়, এই দুটি শ্লোকে সেকথাই বলছেন।

'ধ্যায়তঃ বিষয়ান্'—অর্থাৎ মনে মনে যে বিষয়চিন্তা করছে, বিষয়ের ধ্যান করছে। বিষয় মানে ভোগ্যবিষয়। ইন্দ্রিয়সুখের বিষয়। টাকাপয়সা, মানসম্মান, রাজনৈতিক প্রভাব, পদমর্যাদা—অধিকাংশ মানুষের কাছে এগুলিই একমাত্র কামনার ধন। এই বিষয়চিন্তা দিয়েই শুরু। বস্তুতঃ চিন্তা একটা মস্ত বড় জিনিস। আমাদের এই শরীর, মন, আমাদের ব্যবহার,

আমাদের চরিত্র, জীবনধারা সবই নিজেদের চিন্তার দ্বারা গড়ে ওঠে—'যা মতি সা গতি'। মজা হচ্ছে, মন যা চিন্তা করবে আমরা সেই গতিই লাভ করব। অর্থাৎ আমরা মানুষটাও সেরকমই হয়ে যাব। ভাল চিন্তা করলে ভাল হব। মন্দ চিন্তা করলে মন্দ। সেই কথাই সমর্থন করছেন এখানে। সবসময় বিষয়চিন্তা করতে করতে মানুষের সেই বিষয়ের প্রতি 'সঙ্গঃ' অর্থাৎ আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে 'কামঃ'—সেই বিষয়টাকে পাওয়ার লোভ হয়। আবার পেলেও তো মানুষ সহজে খুশি হয় না। লোভ বেড়েই চলে। কিন্তু আমরা যা আশা করি তা তো সবসময় পাই না। কামনা বাধা পেলেই ক্রোধ হয়। কাম আর ক্রোধ, দুটো আলাদা জিনিস নয়। যা পাওয়ার কামনা জাগে, তা না পেলেই আবার ক্রোধ। কার ওপরে ক্রোধ? আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'গুরুমপি আক্রোশতি'—গুরুর উপরে ক্রোধ, ইষ্টের উপরেও ক্রোধ হয়। এতদিন ধরে ভগবানকে ডাকলাম, কই, কিছু পেলাম না তো। টাকাকড়ি চাই। কেউকেটা হতে চাই। তা তো হল না। তাহলে কেন ভগবানকে ডাকব?—এই ক্রোধ, এই অভিমান। তখন কী হয়? মানুষ বুদ্ধিশুদ্ধি হারায়। রাগের মাথায় মানুষ কি করে, কি বলে ঠিক থাকে না। একটা যে ভাল মানুষের স্বভাব ছিল, সেই মানুষটাই নেই, কেউ যাদু করেছে তাকে—'সম্মোহঃ'—মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম—শাস্ত্রের উপদেশ, আচার্যের উপদেশ মানুষ ভুলে যায়। তখন বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ মানুষের বিচারবুদ্ধির নাশ হয়। ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য সব ওলটপালট হয়ে যায়। সৎ-অসৎ বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিবেকবুদ্ধি নাশ হলে মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়।

যোগ শাস্ত্র বলে—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি হলো জীবনের আসক্তি। এইগুলি পঞ্চক্লেশ বলা হয়। অর্থাৎ পঞ্চবন্ধনরূপে আমাদের জীবনকে বেঁধে রাখে। অবিদ্যা হলো মূল কারণ এবং তার থেকে চারটি ফলের উৎপন্ন হয়। অবিদ্যারূপ মূল কারণ থেকে অস্মিতা (অহংভাব), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মোহভাব)—ঐ আসক্তিগুলি উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কারগুলি বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্নরূপে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। একটি মানুষকে নিরীহ মনে হচ্ছে কিন্তু ঐ মানুষের ভিতরেই হয়তো দেবতা বা অসুরের ভাব রয়েছে। ঐ আসক্তি বা মোহ ভাব ক্রমশ প্রকাশ পাবে। অনুকূল পরিবেশ পেলেই শুভ বা অশুভ সংস্কারগুলি বুদ্ধির ওপর প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে। দেবভাব বা অসুরভাবের প্রকাশ ঘটে।

দেখা যাচ্ছে, বিষয়চিন্তা দিয়ে আরম্ভ, তারপর একটার থেকে আরেকটা, পরিণতিতে বিনাশপ্রাপ্তি। তাই বিষয়চিন্তা না করে আমরা উলটোটা কেন ভাবি না? আত্মবুদ্ধি, ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে আমরা ঈশ্বরের কৃপা ও দর্শন লাভ করব। ঈশ্বর তো সকলেরই ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'চাঁদামামা সবার মামা'। যে দাবি করে সেই পায়। আমি ঈশ্বরকে চাই। না পেলে ছাড়ব না। আমার রাগ, অভিমান, ক্রোধ সব তাঁকে ঘিরে। এই রকম একটা মনোভাব চাই। ঈশ্বরে অনুরাগ, ঈশ্বরে শরণাগতি—মনকে জয় করার এই একমাত্র উপায়।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪

তু (কিন্তু) (পক্ষান্তরে) রাগ-দ্বেষ-বিযুক্তৈঃ (আসক্তি ও বিদ্বেষবর্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (স্বীয় বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈ (ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (বিচরণ করে, গ্রহণ করে) বিধেয়-আত্মা (সংযতচিত্ত পুরুষ) প্রসাদম্ (প্রসন্নতা) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

যাঁর ইন্দ্রিয় বশীভূত অর্থাৎ সংযতচিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তুতে বিদ্বেষ বর্জন করে, রাগদ্বেষবিহীন হয়ে নিজের বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সমূহ অনাসক্তভাবে গ্রহণ করে চিরপ্রসন্নতা লাভ করেন।

আগের মন্ত্রে আমরা দেখেছি বিষয়চিন্তা করতে করতে কী দশা হয়। এখানে আরেকটা দিক দেখাচ্ছেন। 'রাগ' মানে অনুরাগ, ভালবাসা, আকর্ষণ। আর 'দ্বেষ' অর্থ হিংসা, বিদ্বেষ, অনীহা। শাস্ত্র বলছেন, রাগ আর দ্বেষ দুইই খারাপ। একটা থাকলেই আর একটা থাকবে। ইন্দ্রিয়সুখে যদি অনুরাগ থাকে, তা বাধা পেলেই আবার বিদ্বেষ। তাই বলছেন, দুই-ই বর্জন কর। বর্জন করে কী করতে হবে? 'বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈশ্চরন্'—সেই বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে বিষয় গ্রহণ করতে হবে। বলতে চাইছেন, বিষয় আর ইন্দ্রিয় এরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করুক। আমি তার মধ্যে নিজেকে জড়াব না। চোখ যা দেখার দেখুক, কান যা শোনার শুনুক, হাত-পা যা ইচ্ছে করুক, আমি তাতে কোনওরকমে যুক্ত নই। কোনও বিষয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। বিকর্ষণও নেই। শুনে মনে হয় যেন অবাস্তব কথা। সে আবার কী করে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ওদেশে ছুতোরের মেয়েরা ঢেঁকি নিয়ে চিড়ে কোটে। একদিকে ঢেঁকির পাট পড়ছে, আর হাত দিয়ে ধানগুলো ঠেলে দিচ্ছে। আবার কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে। এদিকে খদ্দের এসেছে। তার সঙ্গেও কথা চলছে। সবই করছে, কিন্তু পনেরো আনা মন রয়েছে ঢেঁকির পাটের দিকে। পাছে হাতে পড়ে যায়। তেমনি পনের আনা মন ঈশ্বরে রেখে বাকি এক আনায় অন্যান্য কাজকর্ম করতে হবে। অর্থাৎ মনটা যেন আমাদের বশে থাকে।

মন জয় না হলে ইন্দ্রিয় জয় হয় না। মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা। অনুরাগ বা দ্বেষ বাস্তবিক পক্ষে মনেরই বৃত্তি। ইন্দ্রিয় মনের বাহন মাত্র। আবার মনকে সংযত করতে বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধি যদি আত্মবুদ্ধি বা ঈশ্বরবুদ্ধি হয় তখন মন আত্মার বশীভূত। মনটা বশে থাকলে বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ কোনওটাই হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিও তখন নিজের অধীনে থাকে। তার ফলে কী হয়? 'প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি'—মনের প্রসন্নতা লাভ হয়। মন তখন আত্মার অধীন, প্রকৃতির অধীনতা হতে মুক্ত, শান্ত ও প্রসন্ন। এইরূপ অবস্থায় বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবনধারণের জন্য বিষয়গ্রহণ করেও স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি দোষে লিপ্ত হন না। এইরকম আসক্তি-বিদ্বেষহীন পুরুষই জীবন্মুক্ত।

প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি নিজ আত্মার আনন্দেই বিভোর থাকেন, সুখেও তাঁর হর্ষ নাই, দুঃখেও বিষাদ নেই। কত সুখদুঃখ, আপদ-সম্পদের ঝড় তাঁর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি নির্বিকার, নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধীর, স্থির ও শান্ত। তাঁর চিত্ত উদার বিশাল স্থির সমুদ্রের মতো। আত্মানন্দে তিনি মগ্ন, কারও প্রতি অনুরাগ নেই, দ্বেষ নেই—সর্বত্র সমভাবাপন্ন। অতএব একমাত্র ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হলেই আত্মযুক্ত চিত্তে বিষয়সমূহ অনাসক্তভাবে গ্রহণ করে প্রসন্নতা লাভ হয়।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।।৬৫

প্রসাদে (চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হলে) অস্য (এঁর, এই যোগীর) সর্বদুঃখানাম্ (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (নিবৃত্তি) উপজায়তে (হয়) হি (যেহেতু) প্রসন্ন-চেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) আশু (শীঘ্র) পর্যবতিষ্ঠতে (আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়)।

চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হলে এই যোগীর সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়। যাঁর চিত্ত শুদ্ধ, স্বচ্ছ এবং নির্মল সেইরূপ ব্যক্তির বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা শীঘ্রই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করে।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে। মন যদি স্থির থাকে, আমাদের বশে থাকে, তাহলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। মন তখন সমস্ত বিপরীত ভাবনামুক্ত। আমি কর্তাও নই, ভোক্তাও নই। আমি সুখও চাই না, দুঃখও চাই না। আমি নির্লিপ্ত, উদাসীন। মনটা যদি এরকম হয়, তাহলে কোনও দুঃখই তাকে বিচলিত করতে পারে না। মন তখন শান্ত, নিস্তরঙ্গ। গভীর সমুদ্রের মতো অচঞ্চল। তাঁর চিত্ত থেকে স্বাভাবিক রাগদ্বেষ তিরোহিত হয়েছে, তাঁর মন আত্মার বশবর্তী, চিত্ত প্রসন্ন, তাঁর আর দুঃখের কোন কারণ থাকতে পারে না। বুদ্ধির চঞ্চলতাও দূর হয়ে যায়। বুদ্ধি তখন মনের অসংখ্য কামনাবাসনা দ্বারা বিচলিত না হয়ে ঈশ্বরে সমাহিত হয়।

সেই নির্মল শান্ত চিত্তে আত্মজ্ঞান আপনা-আপনি প্রকাশ পায়। জ্ঞান তো বাইরের জিনিস নয়। ভেতরেই আছে। কিন্তু চাপা রয়েছে। যেমন হীরের টুকরো মাটি দিয়ে চাপা। কেন চাপা আছে? রাগ-দ্বেষের এই যে তরঙ্গ—এটা চাই, এটা চাই না, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ—তরঙ্গের মতো মনটা একবার উঠছে, আবার নামছে। ঢেউয়ের জন্য জলের নীচে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। এই বিক্ষোভ শান্ত হলে বুদ্ধি দ্রুত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শান্তি, অনন্ত তৃপ্তি। আর কোনও কামনা-বাসনা নেই। কারণ কোনও অপূর্ণতা নেই, পূর্ণকাম। সব পেয়ে গেছেন তিনি।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬

অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যে যুক্ত নয় তার) বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) নাস্তি (নেই) অযুক্তস্য (অসমাহিত ব্যক্তির) ভাবনা চ (আত্মচিন্তাও, ঈশ্বরচিন্তাও) ন (নেই) অভাবয়তঃ চ (আত্মচিন্তাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি, বিষয়তৃষ্ণার বিরতি) ন (নেই)

কুতঃ (কোথায়)? অশান্তস্য (বিক্ষুব্ধচিত্ত ব্যক্তির) সুখম্ (ব্রহ্মানন্দ সুখ) কুতঃ (কোথায়)?

যার চিত্ত স্থির ও সমাহিত হয়নি, সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়ক বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নেই। তাই তার আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশ হয় না। আত্মচিন্তাশূন্য ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা কখনো নিবৃত্তি হয় না। তাই তার শান্তি নেই। এইরূপ অশান্তচিত্ত ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়?

জগতে দু-ধরনের মানুষ 'যুক্ত' ও 'অযুক্ত'। যুক্তস্য ভাবনা—আত্মচিন্তায় যুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, যোগে যুক্ত, ইন্দ্রিয় তার বশীভূত, জিতেন্দ্রিয়। অযুক্তস্য ভাবনা—বিষয়চিন্তায় যুক্ত, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অর্থাৎ 'অযুক্ত' মানে যে যোগে যুক্ত নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত নয়। ইন্দ্রিয় যার বশীভূত হয়নি, অজিতেন্দ্রিয়। যোগ মানে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ। যোগযুক্ত হওয়ার জন্যই যত তপস্যা, ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রপাঠ, গুরুর সন্ধান। আত্মার বিষয়ে বারবার শুনতে হয়—'শ্রোতব্যঃ', মনের মধ্যে সেই আত্মকথা, ঈশ্বরকথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, বিচার করতে হয়—'মন্তব্যঃ', তারপর আত্মার বিষয়ে গভীরভাবে ধ্যান করতে হয়—'নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। কিন্তু অধিকাংশ লোকই আত্মচিন্তা করে না। জীবনটাকে তারা খুব হালকাভাবে নেয়। খাও, দাও, ঘুমোও। ব্যস্, হয়ে গেল। তারা একবারও ভাবে না, 'আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাব? আমার প্রকৃত স্বরূপ কি?' তাদের মন বিষয়চিন্তায় মগ্ন। বহির্মুখী। মনে অসংখ্য কামনা-বাসনা রয়েছে। তাই ইন্দ্রিয়গুলি তাদের বশীভূত নয়। এই অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি জোর করে তাদের প্রজ্ঞা, অর্থাৎ বুদ্ধিকে হরণ করে। তাই অযুক্ত, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রজ্ঞা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মানুষ মানে 'মান-হুঁশ'। 'হুঁশ' অর্থ জ্ঞান, আত্মজ্ঞান। যার জ্ঞান নেই, অজ্ঞ, যে আত্মচিন্তা করে না, তার মনও স্থির হয় না। ভগবান বুদ্ধদেবের মুখের দিকে তাকালে দেখি কী প্রসন্ন, শান্ত, মধুর! এই আনন্দকে বলে আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ! কিন্তু যার মন অশান্ত, চিত্ত বিক্ষুব্ধ সে এই পরমানন্দ লাভ করতে পারে না। চিত্তের নানা বিক্ষেপের নীচে যে নিত্য শান্ত অবস্থা রয়েছে, তার সন্ধান সে পায় না। অশান্ত চিত্তে সুখও নেই।

ভগবান এখানে একটি সুন্দর উপদেশ করলেন—'ন চ অভাবয়তঃ শান্তিঃ অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'—যে ঈশ্বরচিন্তা করে না তার চিত্তের শান্তি নেই এবং অশান্ত চিত্তে কখনও সুখ হতে পারে না। মানুষ সংসারে কেবল সুখ খুঁজে বেড়ায়। দুঃখকে অতিক্রম করে কিরূপে সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করা যেতে পারে—তার জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। গীতা এখানে বলছেন—বাইরের বিষয় হতে সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখ নিবৃত্তির যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, তাতে সম্যক্ সফলতা লাভ করা যাবে না। সুখদুঃখ অন্তরের বিষয়। চিত্তকে সংযত ও নির্মল করতে না পারলে প্রকৃত সুখ হতে পারে না। মন যদি অনুরাগ, দ্বেষ, অহংকার, ঈর্ষা ও কামনাবাসনা দ্বারা পূর্ণ ও চঞ্চল থাকে তবে তাতে প্রকৃত সুখ হবে না। প্রকৃত সুখলাভের পথ—ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তজয়। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করে দুঃখের ভাগ

কমিয়ে ক্ষণিক সুখ লাভ করা যায় কিন্তু অন্তরের প্রকৃতিকে জয় করলে সুখ-দুঃখের অতীত নিত্য পরমাত্মার সুখ লাভ করা সম্ভব হয়। তবে বাহ্য প্রকৃতি ও আন্তর প্রকৃতি একই সূত্রে গ্রথিত। কাজেই বাহ্য প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাগুলিকেও জয় করার চেষ্টা করতে হবে এবং সেইসঙ্গে আন্তর প্রকৃতিকেও জয় করতে হবে। ঐরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, প্রজ্ঞা পরমেশ্বরে সমাহিত হয়। তাঁর চিত্ত পরমশান্তি ও পরমসুখ লাভ করে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ।।৬৭

হি (যেহেতু) চরতাম্ (স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে) যৎ (যাকে, যে ইন্দ্রিয়কে) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (অনুসরণ করে) তৎ (তা সেই ইন্দ্রিয়টি) বায়ুঃ (বাতাস) অম্ভসি (জলের উপর) নাবম্ ইব (নৌকাকে যেমন চালিত করে সেইরূপ) অস্য (এর, এই অসংযত ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (প্রজ্ঞাকে, বিবেকবুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে, বিষয়াভিমুখী করে)।

বায়ু যেমন জলের মধ্যে নৌকাকে স্থানচ্যুত করে ডুবিয়ে দেয়, তেমনি স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে মন যেটিকে অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযতচিত্ত ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি প্রজ্ঞা হরণ করে, মনকে বিষয়াভিমুখী করে এবং আত্মবিষয়া চিন্তাকে বিনাশ করে।

অযুক্তস্য বা অসংযত ব্যক্তির কেন প্রজ্ঞা জন্মায় না, এখানে সেকথাই বলছেন। মনই বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেই যত অনর্থ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—আমাদের এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর এদের ভোগ্য বিষয়গুলি হল যথাক্রমে—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ভাল কাজে লাগাতে পারি। আবার অকাজেও লাগাতে পারি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মন যদি এই বিষয়গুলির একটির প্রতিও আসক্ত হয় তাহলে ওই একটি ইন্দ্রিয়ই বলপূর্বক মানুষের প্রজ্ঞাকে হরণ করে নিতে পারে। প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিই মানুষের সম্বল। মানুষই পারে ভাল-মন্দ বিচার করতে। ইতর প্রাণী পারে না। ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত হলে মানুষের প্রজ্ঞা লোপ পায়।

ঝড়ের মুখে নৌকা পড়লে ঝড় তাকে যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে যায়। শেষে জলে ডুবিয়ে দেয়। তেমনি আমরা যদি মনকে সংযত না করি, বাধা না দিই, ইন্দ্রিয়ের পেছনে ছেড়ে দিই, তাহলে আমাদের অবস্থাও সেই ঝড়ে পড়া নৌকার মতো হয়। মন যদি অসাবধান হয় তবে ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে নষ্ট করে দেবে। বায়ু যেমন বলবান, চঞ্চল ও উদ্দামগতি, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও অতি বলবান এবং উচ্ছৃঙ্খল। এই সংসার সমুদ্র বিপদসঙ্কুল। এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করতে প্রজ্ঞা, আত্মবুদ্ধির

ভোগের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, বিষয়সমূহ দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট। অপরদিকে পরমার্থ বিষয় তাদের নিকট অন্ধকারময়, পরমার্থ বিষয়ে তাদের কোন বোধই নেই, কোন চেতনাই নেই, তা লাভের জন্য কোন চেষ্টাই করে না।

অর্থাৎ আমরা কীরকম জীবনযাপন করব, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ—তা নিজেকে বিচার করে নিতে হবে। যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরা মিথ্যা বুঝে যেটা ত্যাগ করেন, অজ্ঞ মানুষ সেটাকেই সত্য বলে লুফে নেয়। তাই বলছেন একজনের কাছে যেটা দিন, আর একজনের কাছে সেটা রাত। একেবারে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। উলটোপুরাণ।

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ।৭০

যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (জলরাশি) আপূর্যমাণম্ (যা পূর্ণ হচ্ছে এমন) অচলপ্রতিষ্ঠং (নির্বিকার, যা বেলাভূমি অতিক্রম করে না এমন) সমুদ্রম্ (সমুদ্রে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে, অথচ তাকে বিক্ষুব্ধ করে না) তদ্বৎ (সেইরকম) সর্বে (সকল) কামাঃ (বাসনা, বিষয়সমূহ) যং (যাতে, যে পুরুষে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে, বিলীন হয়) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন) কামকামী (যে ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে) ন (সে শান্তি লাভ করে না)।

পরিপূর্ণ প্রশান্ত সমুদ্রে নদনদীর জল প্রবেশ করে মিশে যেমন বিলীন হয়ে যায় কিন্তু সমুদ্র নির্বিকার, কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ বিষয়ভোগসমূহ সংযমীর মধ্যে প্রবেশ করলেও যিনি অবিচলিত থাকেন, তিনিই পরম শান্তিলাভের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ভোগ্যবিষয়সমূহ কামনা করে সেই ব্যক্তির পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব।

আত্মজ্ঞান লাভ করে যোগী কী অবস্থায় থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থাটা কেমন তা বোঝাতে চাইছেন। বলছেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সমুদ্রের মতো গভীর ও শান্ত। সমুদ্র সবসময় জলে ভরপুর হয়ে আছে, কোথাও কোনও হ্রাসবৃদ্ধি নেই। তার ওপর নদনদীর জলরাশি অবিরাম সমুদ্রে প্রবেশ করছে। সমুদ্রে মিশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তখন সমুদ্রের কী অবস্থা হয়? সমুদ্রের কোনও পরিবর্তন হয় না। 'অচলপ্রতিষ্ঠং'—সমুদ্র কখনও নিজের সীমারেখা অতিক্রম করে না। তার মধ্যে কোনওরকম বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না। সমুদ্র সর্বদা স্থির, প্রশান্ত।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও সেইরকম। জ্ঞান ও আনন্দে পরিপূর্ণ, গভীর, স্থির, নির্বিকার। ভোগ্যবিষয় ইন্দ্রিয়ের গোচরে এলেও তাঁর মধ্যে কোনও বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। বৃন্দাবনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তপস্যা করছেন। একজন এসে একটা কম্বল দিয়ে গেল। তাঁর

ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার কিছুক্ষণ পরে আরেকজন এসে সেটা নিয়ে গেল। তখনও তিনি সমান নির্লিপ্ত। বিষয় আসুক বা না আসুক, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বদাই ভরপুর। সকল অবস্থাতেই তিনি শান্ত, পূর্ণ। বৃহত্তমকে, ভূমাকে লাভ করেছেন তিনি, লাভ করে নিজেই ভূমা হয়ে গেছেন। জ্ঞানসমুদ্র। সেই জ্ঞানসমুদ্রে বিষয়রাশি প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়। বাসনা তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। সংযমের বাঁধ অতিক্রম করে না।

কিন্তু যার বিষয়তৃষ্ণা রয়েছে তার কি হয়? তার এটা চাই, ওটা চাই। একটা জিনিস পেলে খুশি। আবার পরমুহূর্তেই—না, এটায় হল না, আরও চাই। আবার যা পাওয়া গেছে, তা হারাবার ভয়। স্বাস্থ্য থাকলে রোগের ভয়, ধন থাকলে চোরের ভয়, সৌন্দর্যে জরার ভয়, মান থাকলে অসম্মানের ভয়। সবসময় মনটা ভোগের কামনায় আকুল। অজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্ত কর্দমাক্ত ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ জলস্রোত। বিষয়াসক্ত লোকের হৃদয়ও সঙ্কীর্ণ অগভীর। চিত্তও সর্বদা চঞ্চল, অস্থির, বিষয়ের সংস্পর্শে ভোগের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে এবং সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলে। ফলে শান্তি লাভ করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আপ্তকাম, পূর্ণকাম। ঈশ্বরের অভয়পদ লাভ করেছেন তিনি। সর্বদাই আত্মানন্দে পরিপূর্ণ। তাঁর হৃদয় ও চিত্ত বিশাল। প্রকৃতপক্ষে শান্তি আমরা সবাই চাই। কিন্তু বাসনা আছে বলে পাচ্ছি না। জীবন্মুক্ত পুরুষ সেই পরাশান্তি লাভ করেন।

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ।। ৭১

যঃ (য) পুমান্ (পুরুষ) সর্বান্ (সকল) কামান্ (কামনাসমূহকে) বিহায় (ত্যাগ করে) নির্মমঃ (মমতাশূন্য অর্থাৎ যার 'আমার' বোধ নেই) নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কারশূন্য অর্থাৎ যার 'আমি'–বুদ্ধি দূর হয়েছে) নিঃস্পৃহঃ (প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত সকল বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হয়ে) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (সকল সংসার–দুঃখের নিবৃত্তিরূপ শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।

যিনি নিঃশেষে সমস্ত বাসনা ত্যাগ করে, মমত্ববুদ্ধি ও অহংবুদ্ধি বর্জন করে, স্পৃহাশূন্য হয়ে বিচরণ করেন তিনি পরা শান্তি লাভ করেন।

এখানেও জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করছেন। 'বিহায় কামান্ সর্বান্' অর্থাৎ সমস্ত বাসনাকে তিনি নিঃশেষে ত্যাগ করেন। অনেকে মনে করে, অমুক ব্যক্তি খুব ত্যাগী। কেন? না, তিনি নিরামিষ খান। আরেকজন আছেন—তিনি পান খান না, তামাক খান না। কিন্তু না, একে ত্যাগ বলে না। এরকম একটু একটু করে ত্যাগ নয়। ঢিমে গতিতে চলবে না। ত্যাগ মানে ন্যাস্, সম্যক্ ন্যাস্। একেবারে সমস্ত ত্যাগ। আমার কিছুই দরকার নেই। বলছেন, 'পুমান্', অর্থাৎ পুরুষ, যে শক্ত, অদম্য মনোবল যার—এরকম লোক হওয়া চাই, যে সব ছাড়তে পারে। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প আছে। একজনের স্ত্রী বলছে—

'অমুকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হল না।' তা সে কি করেছে? তার কয়েকটি স্ত্রী, সে এক-এক করে ত্যাগ করছে। স্বামী স্নান করতে যাচ্ছিল। বলল, 'দূর ক্ষেপী! একটু-একটু করে কি ত্যাগ হয়। সে কখনও ত্যাগ করতে পারবে না। আমি পারব।' বলে গামছা কাঁধেই বেরিয়ে গেল। সংসার গোছগাছ করে যাওয়ার কথা মনে এল না। বাড়ির দিকে একবার ফিরেও চাইল না। এর নাম ত্যাগ। যেই বিবেক হল, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ।

এইরকম সর্বত্যাগী জীবন্মুক্ত পুরুষ কীভাবে বিচরণ করেন? কীরকম তাঁর চালচলন? 'নিঃস্পৃহঃ'—স্পৃহা শূন্য—তাঁর স্পৃহা বলে কোনও জিনিস নেই। এই বস্তু আমার প্রিয়, আমার চাই, এইরূপ তীব্র বাসনা তাঁর নেই। অর্থাৎ কোনও কিছুতে লোভ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। মুণ্ডক উপনিষদে আছে গাছের উপর দুটি পাখির গল্প। উপরের পাখিটা স্থিরভাবে বসে আছে। নড়াচড়া করছে না। আর নীচের পাখিটা একবার এই ফলে মুখ দিচ্ছে, টক লাগছে। আবার অন্য ফলে মুখ দিচ্ছে, মিষ্টি লাগছে। টক লাগলে দুঃখ, মিষ্টি হলে আনন্দ। এই জীবাত্মা। কিন্তু উপরের পাখিটা? ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে নির্বিকার। উপরের পাখিটা পরমাত্মা, দ্রষ্টা, সাক্ষী। জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থাও এইরকম। তিনি নিঃস্পৃহ।

আবার তিনি 'নির্মমঃ'—কোন কিছুতে তাঁর মমত্ববোধ নেই। অর্থাৎ 'আমার' বোধ নেই। মমতা মানুষের চিত্তে নানা ভাবে, নানা আকারে প্রকাশ পায়। দেহের সুখদুঃখ মমতার প্রথম অভিব্যক্তি। তারপর আমার বাড়ি, আমার পরিবার এদের ছেড়ে আমি থাকতে পারি না—এইরূপ মমতার তীব্র রূপ, মায়া বা মমতাশূন্য তিনি। এরপর 'নিরহঙ্কারঃ'—অহংকার বর্জন করেছেন, অহংকার নেই অর্থাৎ 'আমি' বোধও নেই। মানুষ ধন, জন ও বিদ্যার গর্ব করে থাকে। আমি বড়, আমি বিদ্বান, আমি কর্তা, আমি কর্ম করছি—এই প্রকার অনুভূতি অহংকার। এই 'আমি'-কে কেন্দ্র করেই তো আমাদের সমস্ত জগৎ। অহংতা আর মমতা, 'আমি' ও 'আমার'— এই হচ্ছে মায়া, অবিদ্যা। সকল বন্ধনের কারণ। জীবন্মুক্ত পুরুষ এই অবিদ্যার পারে অবস্থান করেন। স্পৃহাহীন, মমত্বরহিত ও অহঙ্কারশূন্য হয়ে সংসারে বিচরণ করেন। তখন কী হয়? 'শান্তিম্ অধিগচ্ছতি'—তিনি সকল দুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরাশান্তি লাভ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ।।৭২

পার্থ (হে অর্জুন) এষা (এই) ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি) এনাং (একে) প্রাপ্য (পেয়ে) (কেউ) ন বিমুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না) অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাম্ (এই অবস্থায়) স্থিত্বা (থেকে) ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্মস্বরূপ যে নির্বাণ অর্থাৎ আত্মা ও

ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান) ঋচ্ছতি (লাভ করেন)।

হে পৃথাপুত্র অর্জুন, এই অবস্থাই ব্রাহ্মীস্থিতি। এই অবস্থা লাভ করলে কেউ আর মোহগ্রস্ত হন না। জীবনের শেষ সময়েও যদি এ অবস্থা লাভ করা যায়, তাহলেও তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

'ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'—এ একটা খুব বড় কথা। যিনি সমস্ত কামনাবাসনা বর্জন করেছেন, কাম্যবস্তুতে স্পৃহা ত্যাগ করেছেন, মমত্ববুদ্ধি ও অহংকার পরিত্যাগ করে পরমাত্মাতে চিত্ত সমাহিত করেছেন—তিনি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতি হয়েছেন। 'আমি ব্রহ্মে ডুবে থাকব, ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। এক হয়ে যাব ব্রহ্মের সঙ্গে'—আমাদের সকলের জীবনে এই-ই একমাত্র উদ্দেশ্য। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি যোগী—সকলেরই এতে অধিকার। মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা ব্রাহ্মী স্থিতি।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই এই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেছেন। 'আমি-আমার' জ্ঞান কখন নিঃশেষে লোপ পায়? সকল কামনা কখন নিবৃত্তি হয়? কখন মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হয়? যখন এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। ব্যক্তি সত্তা সেই এক অনন্ত সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়। আমি এতদিন আলাদা ছিলাম। ক্ষুদ্র ছিলাম। এখন 'আমিই ব্রহ্ম'—এই অভেদ জ্ঞান আমার হয়েছে। আমি পূর্ণ হয়েছি। আমি জলবিন্দু। সমুদ্রে পড়ে সমুদ্র হয়ে গেছি। আর নিজের স্বরূপ একবার যে জেনে ফেলেছে, সে বদলে গেছে। সে আর কখনও মোহমুগ্ধ হবে না। সকল পুরুষার্থের অবসান হয়েছে তার। সংসারের কোনও বন্ধন, কোনও প্রলোভন তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। জীবনের শেষ মুহূর্তেও যদি এ অবস্থা লাভ হয় মানুষ ধন্য হয়ে যায়। হয়ত সারাজীবন চেষ্টা করে হল না। কিন্তু মৃত্যুকালে হঠাৎ অজ্ঞান-পরদা সরে গেল। আত্মজ্ঞান হল। ভাগ্যবান। শেষ সময়ে চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। মুখে হাসি ফুটে উঠল। দর্শন পাচ্ছে। তাই ভক্ত বলে, 'প্রভু, অন্তত শেষকালে দর্শন দিও'। বলছেন, মৃত্যুকালেও যদি কারও স্বরূপ জ্ঞান হয়, আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান হয়, তাহলেও তিনি নির্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যান।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **সাংখ্যযোগ** নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান সাংখ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের সাধন এবং আত্মজ্ঞানী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা বলছেন। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, আত্মবুদ্ধি, যুক্তস্য ভাবনা, জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রাহ্মীস্থিতি—এই অপূর্ব অবস্থাগুলি মানবজীবনের পরম সম্পদ। ভগবান এখানে নিশ্চিত করে দিয়েছেন—মানব জীবনের পরম লক্ষ্য একমাত্র আত্মজ্ঞানলাভ। আত্মজ্ঞান লাভের পথ নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানের সাধন। একদিকে নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হলেই আত্মজ্ঞানের প্রকাশ। নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির ফল আত্মজ্ঞান লাভ বা ব্রহ্মনিষ্ঠা—এ ছাড়া কিছুই নয়। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ই বেদান্তের মূল কথা। এই ত্রিবিধ যোগ আত্মজ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে সেই যোগগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়কে সমগ্র গীতার সার বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুটি খুব সুন্দর। অর্জুনের মনের বিষাদ বা দুর্বলতা দূর করার জন্য ভগবানের স্মিতহাস্য-সহকারে কঠোর শাসন করলেন—তুমি অনার্যের মতো কথা বলছ, এটা অস্বর্গ এবং অকীর্তিকর। এই ক্লীবের ন্যায় কাতরতা অর্জুনের ন্যায় বীরপুরুষের শোভা পায় না। হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে তার স্বধর্ম যুদ্ধ করাই শ্রেয়। অর্জুনের মনের দুর্বলতার কারণ অহংবোধ, মমত্ববোধ বা স্বার্থবোধ থেকেই। তিনি শুধু পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ ও জয়লাভ ভাবছেন। তাই তিনি বলছেন—স্বজনবধ, কুলক্ষয়, স্বজনবধে দুঃখ, পাপ এবং ভয় ইত্যাদি। কিন্তু অর্জুন ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যুদ্ধ করবে। অধর্মের নাশ ও ধর্মের স্থাপনই এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। তাই বিশ্বসংসারে ধর্ম স্থাপনে ভগবান তাঁকে একজন প্রধান উপলক্ষ্য ও সাহায্যকারী ব্যক্তিরূপে স্থাপন করছেন। অর্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হলো বলেই ভগবান গীতা বললেন। এবং এই শোক নিবৃত্তির একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞান। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হয়ে বললেন, আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। আমাকে শিক্ষা দাও। আমার হৃদয়ের দুর্বলতা ও চিত্তের শোক দূর করতে তুমি উপদেশ দাও। আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয় ও কর্তব্যকর্ম তা আমাকে শিক্ষা দাও। তারপরই ভগবান শুরু করলেন আত্মজ্ঞানের উপদেশ।

ভগবান সুন্দর করে মানব জীবনের উদ্দেশ্য বললেন—আত্মার স্বরূপ প্রকাশ ও সাধন, মানবের স্বধর্মের শিক্ষা, নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা, চিত্তশুদ্ধি হলেই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি লাভ। আত্মজ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ—কীরূপে তিনি কথা বলেন, কীরূপে অবস্থান করেন ও কীরূপে বিচরণ করেন। তার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযম ও জিতেন্দ্রিয় হলেই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ। ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করা যায় না। একমাত্র পরমাত্মাতে যুক্ত হয়ে বুদ্ধি স্থির হলেই ইন্দ্রিয়সংযম বা জিতেন্দ্রিয় হওয়া সম্ভব।

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের সর্বদা বিষয় চিন্তা থেকে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হতে কামনা, কামনা ব্যাহত হলে ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ হতে চিত্তের মোহ জন্মে, মোহ হতে স্মৃতিভ্রম হয়, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হতে বিনাশ ঘটে।

কিন্তু একমাত্র জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষয়ে বিচরণ করেও স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করেন। কারণ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত, আত্মবুদ্ধি। আত্মাকে লাভ করে চিরপ্রসন্ন। তিনি ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন। তিনি বিশাল চিত্তের অধিকারী, সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল, নিথর, এবং আত্মানন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হন। কামনা-বিষয় তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করে অনাসক্ত হয়ে আত্মানন্দে বিচরণ করেন। তিনি স্পৃহাশূন্য, মমত্বশূন্য, অহংকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে সকলের প্রতি সহমর্মী এবং পরম শান্তি লাভ করেন।

ভগবান বললেন, হে অর্জুন, এটাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে মানবের আর মোহ থাকে না এবং মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় অবস্থান করে ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষলাভ করেন। এটিই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে অপূর্ব সমুচ্চয় ঘটেছে তৃতীয় অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় ও আত্মজ্ঞান লাভের পথে সাধনা হল নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের কৌশল ও নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির ফল আত্মজ্ঞান, ব্রাহ্মীস্থিতি বা স্থিতপ্রজ্ঞ লাভের কথা বললেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ভগবান যখন ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ মানব জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তিলাভ সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন, মনে হল তাতেই যেন সকল কথার অবসান হল। কিন্তু অর্জুনের এখন শুদ্ধবুদ্ধি, মোহমুক্ত, অহং নাশ হয়েছে। তাই অর্জুন এখন একটি সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ প্রশ্ন করলেন, যেন গুরুর কাছে শিষ্য প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উপস্থাপন করছেন, যার জন্য শ্রীভগবান আবার উপদেশ দিতে শুরু করলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন—শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সৎ-অসৎ বিচার দ্বারা নিষ্কামভাবে কতর্ব্যকর্ম অনুষ্ঠান করে যোগের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। অর্জুন ভগবানকে দুটি প্রশ্ন করেন—১) যদি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁকে কর্মে প্ররোচিত করবার কারণ কি? ২) কে জীবকে পাপে প্ররোচিত করে?

বর্তমান কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের সঙ্গে গীতার এই জায়গার একটা সুন্দর মিল দেখতে পাওয়া যায়। কথামৃতকার অর্থাৎ মাস্টারমশাই শিক্ষিত ও কলেজে পড়ান। বিবাহ করে স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সংসার করছেন। কিন্তু সংসারের প্রতি তিনি

বীতশ্রদ্ধ, তাই সংসার ত্যাগ বা আত্মহত্যার পথ দেখছেন। এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখলেন। প্রথম দর্শনে মনে হল তিনি যেন শুকদেব বা শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি অপূর্ব কথা মাস্টারমশাইয়ের কর্ণে এসে প্রবেশ করল যা শুনে তাঁর মনের ভাব পরিবর্তন হতে শুরু করল— শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যখন একবার হরি নাম বা রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম-আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে— কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।

মাস্টার মশাই ভাবলেন এই ব্যক্তির কাছে তিনি আধ্যাত্মিক কথা শ্রবণ করবেন এবং সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করবেন। তাই তিনি শীঘ্রই এক সকালে দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিচয় জানলেন এবং কাঁচের আলমারির ভিতর রাখা জিনিসপত্র যেমন পরিষ্কার দেখা যায় সেইরকম তিনি মাস্টারের জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পেলেন। তিনি মাস্টারমশাইকে প্রতাপের ভাইয়ের কথা শোনালেন কারণ প্রতাপের ভাই তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের ছেড়ে এই দক্ষিণেশ্বরে সাধন-ভজন, আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে খুব তিরস্কার করে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের দেখাশোনা করতে বলেছেন। কর্তব্যকর্ম করেই আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন। গৃহীদের সংসার ত্যাগ ও কর্ম ত্যাগ, বাহ্যিক সন্ন্যাস সম্ভব নয়। তাই গৃহীদের চাই অন্তর-সন্ন্যাস। সংসারে সকাম কর্মের পরেই নিষ্কাম কর্ম আসবে, নিষ্কাম কর্মের ফল আত্মজ্ঞান লাভ।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইকে তাঁর বিবাহ, পুত্র ও তাঁর স্ত্রীর স্বভাব সম্বন্ধে সব জিজ্ঞাসা করলেন। মাস্টারমশাই শিক্ষিত তাই তিনি নিজেকে জ্ঞানী মনে করতেন এবং তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে বললেন, তিনি ভাল কিন্তু অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে খুব তিরস্কার করে বললেন, 'আর বুঝি তুমি জ্ঞানী?' মাস্টারমশাই বুঝলেন তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করাটি তাঁর নিজের অহং বা অজ্ঞানতার পরিচয়। তিনি পরে বুঝলেন ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান এবং না জানার নামই অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারে মাস্টারের অহঙ্কার বিশেষভাবে চূর্ণ হল।

ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে মাস্টারমশাই-এর একটা ধারণা হয়েছিল যে, ঈশ্বর নিরাকার এবং তিনি কখনই সাকার হতে পারেন না। কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'নিরাকারে বিশ্বাস তা ভালো। তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।' ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার দুই-ই সত্য এই কথা শুনে মাস্টার অবাক হয়ে রইলেন এবং তাঁর অহংকার তৃতীয়বার চূর্ণ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বললেন, ঈশ্বরকে সাকার রূপে কল্পনা করার জন্য মূর্তি করা

হয় কিন্তু তা মাটি নয়। চিন্ময়ী প্রতিমা। যখন মাস্টার বললেন, তাহলে সব লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ খুব বিরক্ত হয়ে মাস্টারকে তিরস্কার করে বললেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই! তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন।...যদি বোঝাবার দরকার হয় তিনিই বুঝাবেন। তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ওই মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ওই পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।' মাস্টারমশাই ঠিক করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এই শেষ তর্ক।

মাস্টারের এখন অহঙ্কার কিছুটা নাশ হয়েছে, বুদ্ধিও এখন কিছুটা মোহমুক্ত হয়ে শান্ত হয়েছে তাই এখন অতি সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ, যেন গুরুর কাছে শিষ্য, প্রশ্ন করছেন——১) ঈশ্বরে কী করে মন হয়? ২) সংসারে কীরকম করে থাকতে হবে? ৩) ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়? ৪) কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ উত্তর দিলেন— ১) ঈশ্বরের নাম ও লীলা অনুধ্যান করা, সৎসঙ্গ-- ঈশ্বরের ভক্ত এঁদের সঙ্গ করা, সংসারের বিষয়কর্ম থেকে মাঝে মাঝে নির্জনে (মনে, কোণে ও বনে) ঈশ্বর চিন্তাকরা, সর্বদা সদসৎ বিচার— ঈশ্বরই সৎ নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ— কিনা অনিত্য বস্তু। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করা। ২) সংসারে থেকে সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। তুমি যে-সব কর্ম করবে, এ-সব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পার, তাহলে খুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামভাবে কর্ম করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়। কর্ম সকলেই করে— তাঁর নামগুণ করা এও কর্ম— সোঽহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম— নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নাই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে। (মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন— আজ্ঞা যাতে অর্থ বেশি হয় এ-চেষ্টা কি করতে পারি?) বিদ্যার সংসাররের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নেই। ৩) যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে। নিষ্কামকর্মের দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়। ঈশ্বরলাভ হলে কর্ম আর থাকে না। ফললাভ হলে আর ফুল থাকে না। নিষ্কামকর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। ৪) ঈশ্বরকে ভালবসতে হবে। ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হল।

তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।

অর্জুনের অপূর্ব এক প্রশ্নে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায় 'কর্মযোগ' শুরু হল। অর্জুন প্রশ্ন করছেন—হে জনার্দন! তোমার মতে যদি কর্ম হতে জ্ঞান শ্রেয় হয়, তাহলে হে কেশব, তুমি আমাকে কেন এই হিংসাত্মক যুদ্ধরূপ কর্মে নিয়োজিত করছ?

ভগবান বলছেন—এই জগতে শ্রেয়োলাভের পথ দুটি—জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ। কিন্তু কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেউ কর্মবন্ধন বা কর্তব্যকর্ম, দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জীব প্রকৃতির দ্বারা অবশ অর্থাৎ ক্ষণকাল মাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। অতএব সকলকেই কর্ম করতে বাধ্য। কর্ম অর্থাৎ কর্মন্ শব্দ। কৃ ধাতুর অর্থ করা। কাজেই যা-কিছু করা হয় তাই কর্ম। কর্ম প্রধানত দুই প্রকার—শুভ (পুণ্য) বা অশুভ (পাপ)। শুভ কর্মের ফল শুভ এবং অশুভ কর্মের ফল অশুভ বা পাপ হওয়া। শুভ কর্মের দ্বারা স্বর্গাদি এবং অশুভ কর্মের দ্বারা নরকাদি পর্যন্ত হতে পারে। অতএব কামনা-বাসনাই মানুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়, কামনা-বাসনাই জীবের অবিদ্যা, নিত্য শত্রু ও সর্ব পাপের মূল।

শুভ কর্ম আবার সকাম ও নিষ্কাম ভেদেও দুই প্রকার। সকাম কর্মে কামনা থাকে তাই পরে বন্ধন আসে। নিষ্কাম কর্মে কামনা থাকে না বলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং কোনও বন্ধন আনে না এবং এই নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরলাভে ও মুক্তিলাভে সহায়ক হয়।

কর্মের ফলের দিক থেকে সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ—এই তিন প্রকার কর্মের ব্যাখ্যাও আছে। যা জন্মজন্মান্তর ধরে জমা হয়ে আছে তাকে সঞ্চিত কর্ম বলে। সঞ্চিত কর্মের যে অংশ এই জন্মে ফল দিতে আরম্ভ করেছে তা প্রারব্ধ কর্ম, আবার এই জন্মে যেসব কর্ম নূতন ভাবে করা হচ্ছে তা ক্রিয়মাণ কর্ম। যে-কোনও কর্ম করতে গেলে তিনটি দিক লক্ষ রাখতে হবে। ১) বুদ্ধিকে পরমেশ্বরে সমাহিত করা প্রধান উদ্দেশ্য, কর্মটি সেখানে গৌণ। ২) ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন অর্থাৎ সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমপর্ণ ৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, কর্মী নিজেকে যন্ত্ররূপে কর্মে নিয়োজিত করবে। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য-কর্ম করবে।

অর্জুন উবাচ
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।। ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বললেন) জনার্দন (হে কৃষ্ণ) চেৎ (যদি) কর্মণঃ (কর্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠতর) তে (আপনার) মতা (মত) তৎ (তা হলে) কেশব (হে কৃষ্ণ) কিং (কী জন্য) ঘোরে (হিংসাত্মক) কর্মণি (কর্মে, যুদ্ধে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (নিযুক্ত করছ)?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন - হে জনার্দন, যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়

হয়, তবে আমাকে এই হিংসাত্মক কর্মে কেন নিযুক্ত করছ?

অর্জুনের প্রশ্ন জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেয়? যেহেতু দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বারবার কর্মের কথা বলেছেন, কেননা অর্জুন যুদ্ধ করবেন বলেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন। এসে বিপক্ষে আত্মীয়স্বজনদের দেখে মনে তাঁর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। অর্জুন যখন যুদ্ধ করবেন না বলে স্থির করলেন তখন ভগবান তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। ভর্ৎসনার সঙ্গে তিনি কর্মের অনেক স্তুতি করলেন। বললেন 'ধর্মাৎ হি যুদ্ধাৎ শ্রেয়ো অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।' অর্থাৎ ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার চেয়ে অন্য শ্রেয় ধর্ম ক্ষত্রিয়ের আর কিছু নেই। বললেন: 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে'—কর্মেই তোমার অধিকার। কর্ম করব না একথা ভেবো না। একদিকে কর্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের কথা বলছেন। অথচ আবার বলছেন, আত্মবুদ্ধি, পরমেশ্বরবুদ্ধি, নিত্যসত্ত্বস্থ বুদ্ধি, নিত্য সত্ত্বগুণের অবস্থাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও বা 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব'—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের অতীত হও। অজ্ঞতা, অবিদ্যার পারে চলে যাও। এভাবে জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ দিচ্ছেন। এবং 'এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ'—এই বলে জ্ঞাননিষ্ঠার প্রশংসাও করছেন। স্বভাবতই অর্জুন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি মনে করলেন, প্রবৃত্তিমার্গ বা কর্মনিষ্ঠার চেয়ে নিবৃত্তিমার্গ বা জ্ঞাননিষ্ঠা শ্রেয়—একথাই শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে চাইছেন।

তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'হে জনার্দন, যদি আত্মবুদ্ধি, স্থিতপ্রজ্ঞ লাভ অর্থাৎ জ্ঞান কর্মের চেয়ে বড় হয়, এই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তুমি আমাকে কর্ম করতে বলছ কেন? তাও আবার কীরকম কর্ম? ঘোর যুদ্ধ কর্ম, নিষ্ঠুর কর্ম, হিংসাত্মক কর্ম—যে যুদ্ধে আমাকে প্রিয়জনদের হত্যা করতে হবে, সেই দারুণ কর্ম। সেই কর্মে লিপ্ত হতে তুমি আমাকে বাধ্য করছ কেন, তা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

'জনার্দন' শব্দটার অনেক রকম অর্থ আছে। শ্রীকৃষ্ণ জনা নামে এক অসুরকে বধ করেছিলেন। তাই তিনি জনার্দন। আবার জনার্দন মানে হল যিনি প্রত্যেকের বাসনা পূর্ণ করেন। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন সকলের বাসনা পূর্ণ করতে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলতে চাইছেন, 'আমি তোমার শরণাগত, তুমিই তো আমার বাসনা পূর্ণ করবে। আমাকে পথ দেখাবে। আমাকে বলে দেবে আমার কি করা কর্তব্য।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ।। ২

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন (বিমিশ্র বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ কোথাও কর্মের প্রেরণা, কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা, এইরকম সন্দেহউৎপাদক বাক্যের দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (যেন মোহযুক্ত করছ) যেন (যার দ্বারা) অহম্ (আমি) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) আপ্নুয়াম্ (লাভ করতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটি) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করে) বদ (বল)।

তুমি বিমিশ্র(দ্ব্যর্থবোধক) বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন বিভ্রান্ত করছ। যার দ্বারা আমি শ্রেয় লাভ করতে পারি সেই একটা পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলে দাও।

অর্জুন মহামুশকিলে পড়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যবুদ্ধি ও কর্মযোগ—এই দুই প্রকারের বুদ্ধি বা যোগের উল্লেখ করছেন। অর্জুন বুঝতে না পেরে বলছেন, হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য বিমিশ্র। তুমি কখনও কর্মের প্রেরণা দিচ্ছ, কখনও জ্ঞানের প্রশংসা করছ, আবার বলছ দুটো আলাদা পথ। এই দুয়ের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব দেখছি। এইরকম পরস্পরবিরোধী কথা বলে তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করছ, মোহমুগ্ধ করছ। তুমি আমার বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, অভিভাবক। আমি তোমার শরণাগত। জ্ঞান ও কর্ম, এ দুয়ের মধ্যে যা আমার পক্ষে শ্রেয়, কল্যাণকর, যা আমার মুক্তির পথ—দয়া করে সেটাই আমাকে স্পষ্ট করে বলো। আমাকে ধাঁধায় ফেলো না। হেঁয়ালি করো না আমার সঙ্গে। আমি নিজে কিছুই স্থির করতে পারছি না। 'শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্'—যে পথ অনুসরণ করলে আমি শ্রেয় লাভ করতে পারি আমাকে তাই বলে দাও।

শ্রেয় আর প্রেয় – এ দুয়ের মধ্যে আমরা কোনটা চাই, বিচার করে আমাদেরই তা ঠিক করে নিতে হবে। শ্রেয় অর্থ যা শুভ, যা পবিত্র, যা কল্যাণকর। আর প্রেয় মানে যা আকর্ষণীয়, আপাত – সুখকর। যদি কেউ মনে করে তার পক্ষে ধন, মান, সম্পদ, পদমর্যাদা এসবই শ্রেয়, তা বেশ, সে সেই পথেই চলুক। কিন্তু মনে রাখতে হবে এসব অনিত্য, ক্ষণিক। শেষ পর্যন্ত বিচার করে সে বুঝতে পারে এগুলো আপাত-সুখকর বটে, কিন্তু তাকে চিরস্থায়ী শান্তি দিতে পারে না। মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট হয় না – 'নাল্পে সুখমস্তি'। যা সবচেয়ে শ্রেয়, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে পবিত্র, যা চিরন্তন, মানুষ তা-ই লাভ করতে চায়। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই হল নিঃশ্রেয়স্‌কে লাভ করা। নিঃশ্রেয়স্ সংস্কৃত শব্দ। নিঃ মানে না, আর শ্রেয়স্ মানে আরও ভাল। অর্থাৎ এর চেয়ে ভাল, এর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। একেই আমরা ঈশ্বর বলি, ব্রহ্ম বলি, মুক্তি বলি, আত্মজ্ঞান বলি। জ্ঞান ও কম— এ দুয়ের মধ্যে কোন পথে নিঃশ্রেয়স্‌কে লাভ করা যায়, অর্জুন সেকথাই জানতে চাইলেন।

শ্রীভগবানুবাচ
লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ।। ৩

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন) ন-অঘ (অনঘ, হে নিষ্পাপ অর্জুন) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (পথ) ময়া (আমার দ্বারা) পুরা (পূর্বে) প্রোক্তা (বলা হয়েছে) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাং (সাংখ্য

অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারীদের) কর্মযোগেন (নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (কর্মযোগীদের নিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে)।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে নিষ্পাপ অর্জুন, এ জগতে আত্মজ্ঞান লাভ বা শ্রেয়োলাভের দুটি পথ আছে। জ্ঞানমার্গীদের জন্য জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগীদের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ পথের কথা বলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে অনঘ! আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দুটি পথ আছে। 'অনঘ' মানে নিষ্পাপ, পূত-আত্মা। অর্জুন শুদ্ধ আধার, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত। ভগবান তাই 'অনঘ' বলে তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। বলছেন, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয় পথেই ঈশ্বরলাভ করা যায়। একটা নিবৃত্তিমার্গ, আরেকটা প্রবৃত্তিমার্গ। আপাতদৃষ্টিতে দুয়ের মধ্যে তফাত আছে। কিন্তু দুটো পথেরই মূল লক্ষ্য এক। সেটা কী? চিত্তশুদ্ধি। যে জ্ঞানের অধিকারী, সে জ্ঞান বিচার করছে, গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য শুনে তা মনে মনে আলোচনা করছে, ধ্যান করছে। কিসের জন্য করছে? চিত্তশুদ্ধির জন্য। বিবেক, বৈরাগ্য ও সংযম অভ্যাসের দ্বারা এরা নিবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছে। নিত্য – অনিত্য বিচার করছে। আত্মা নিত্য অর্থাৎ সৎ, অনাত্মা (বিষয়) অনিত্য অর্থাৎ অসৎ। অনিত্য থেকে দূরে থাকব। তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হব না। বারবার এই বিচার করতে করতে তাদের মধ্যে বৈরাগের উদয় হয়। তারা বলে : 'মলিন কোনও বস্তু আমি স্পর্শ করব না। যা শুদ্ধ, যা পবিত্র শুধু তাই আমি চাই।' আবার যারা প্রবৃত্তি মার্গে চলে তারা নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করে। অর্থাৎ ঈশ্বরার্থং, লোকহিতার্থং কর্ম করে। কোনও মমত্ববুদ্ধি নেই। তারাও চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। আসলে আত্মজ্ঞান বাইরের কোনও বস্তু নয়। আমাদের ভেতরেই আছে। কিন্তু চাপা রয়েছে। আবরণটাকে সরাতে হবে। এই আবরণটা কী? অহংবুদ্ধি আর মমতা, 'আমি' ও 'আমার' বোধ, এই আমাদের মলিনতা। এই মলিনতা দূর হয়ে চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান আপনা-আপনি আত্মপ্রকাশ করে। এ জ্ঞান নিত্য, আমাদের চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং জ্ঞানযোগের যা লক্ষ্য, নিষ্কাম কর্মেরও সেই একই লক্ষ্য। তা হল চিত্তশুদ্ধি এবং আত্মজ্ঞান লাভ।

এখানে অধিকারীভেদ দেখানোই ভগবানের উদ্দেশ্য। তবে আচার্য শঙ্কর বলেন, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুটি স্তর। প্রথমে নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করতে হয় অর্থাৎ কর্মযোগ। কর্মযোগ দ্বারা চিত্ত নির্মল হলে জ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলেই জ্ঞানলাভ সম্ভব। 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্' সাংখ্য অর্থাৎ যারা জ্ঞানমার্গী, চিন্তাশীল, যারা তর্কবিচারের পথে চলে, যাদের মধ্যে সংযমের ভাব আছে, শুদ্ধ আধার, তারাই জ্ঞানপথের অধিকারী। তার অর্থ অবশ্য এই নয়, যে জ্ঞানবিচার করে, সে কর্ম করে না। আর যে নিষ্কাম কর্ম করে, সে জ্ঞানবিচার করে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মিশানো থাকে। যার যে দিকে ঝোঁক বেশি, সে সেই

পথ বেছে নেয়। 'কর্মযোগেন যোগিনাম্' – যারা অতটা বিচারশীল নয়, যাদের উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে, ভাল স্বাস্থ্য আছে তাদের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ। এদের যোগী বলা হচ্ছে। কারণ এরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই বুদ্ধিতে কাজ করে। সব কর্মের ফল তারা ঈশ্বরে সমর্পণ করে। বস্তুত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যা-কিছু করি সব কর্মের উদ্দেশ্যই চিত্তশুদ্ধি। অর্জুন যুদ্ধ করছে। কিন্তু সে যদি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে, অর্থাৎ নিজের জন্য নয়, সত্যের জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে তাহলে তাই হবে নিষ্কাম কর্ম। এই নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্যও আত্মজ্ঞানলাভ, ঈশ্বরলাভ। তাই জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মের সমন্বয় সহজ পথ। আর ঈশ্বরলাভই মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।। ৪

কর্মণাম্ (কর্মের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করেই) পুরুষঃ (মানুষ) নৈষ্কর্ম্যং (কর্মসন্ন্যাস, সর্বকর্মশূন্যতা) ন অশ্নুতে (লাভ করতে পারে না) সংন্যসনাৎ চ এব (কেবলমাত্র কর্মত্যাগ থেকে) সিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্য) ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধিলাভ করতে পারে না)।

কর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের সাধন না করে মানুষ নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করতে পারে না, কর্মের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। আবার চিত্তশুদ্ধি ছাড়া কেবলমাত্র বাহ্যিক কর্মত্যাগ করলেই মানুষের মোক্ষলাভ সম্ভব হয় না।

এখানে একটা কথা বলছেন 'নৈষ্কর্ম্য'। অর্থাৎ সকল কর্মের ঊর্ধ্বে, যেখানে কোনও কর্ম নেই – কর্মসন্ন্যাস। কর্ম থেকেই আমরা নৈষ্কর্ম্যে যাব। সেটা আবার কী করে হয়? কর্ম করতে বলছেন, আবার বলছেন নৈষ্কর্ম্যে অর্থাৎ কর্মের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। মানুষ কখন নৈষ্কর্ম্য লাভ করে? যখন তার অহংবুদ্ধি দূর হয়ে যায়, অবিদ্যা দূর হয়ে যায়, যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। নৈষ্কর্ম্য অবস্থা জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা। কোনও কর্ম নেই। যাগযজ্ঞ বা নিত্য – নৈমিত্তিক কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রে যেসব কর্মের কথা আছে, সেসব তাঁর কিছুই নেই। যাগযজ্ঞ মানে সকাম কর্ম। নিত্য কর্ম অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম। আর শ্রাদ্ধাদি কর্ম হল নৈমিত্তিক কর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মায়ের শ্রাদ্ধ করতে পারছেন না। হাত দিয়ে জল তর্পণ করবেন, কিন্তু জল গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে নৈষ্কর্ম্য। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, কেউ আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলে। কেউ আবার অন্যকে খবর দেয়, পথ দেখিয়ে দেয়- লোকহিতার্থং। তাঁরাই জীবন্মুক্ত পুরুষ, অবতারপুরুষ—এঁরা লোককল্যাণ করে আনন্দ পান। ইচ্ছা করেই তাঁরা কর্ম রেখে দেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা, যাদের কামনা-বাসনা রয়েছে, প্রারব্ধ রয়েছে তাদের

কর্মের প্রয়োজন আছে। কর্ম দ্বারাই তাদের কর্মকে জয় করতে হবে। কীরকম কর্মের দ্বারা? যা ঈশ্বরের উদ্দেশে, লোককল্যাণের উদ্দেশে করা হয়—শুধু সেই কর্মের দ্বারা। সেই কর্ম করেই আমাদের চিত্তশুদ্ধি হবে। এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। তোলা হয়ে গেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন কর্ম আপনা-আপনি খসে পড়ে।

তারপর বলছেন, 'ন চ সংন্যসনাদেব'—সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই যে জ্ঞান হবে, সিদ্ধিলাভ হবে তা নয়। সন্ন্যাস অর্থ—সম্যক্ ন্যান্। ন্যাস মানে ত্যাগ, সমস্ত ত্যাগ। এখানে সাবধান করে দিচ্ছেন। শুধু বাইরের ত্যাগ করলেই হবে না। সন্ন্যাস কোনও বাইরের আবরণ নয়। মনের সন্ন্যাসই সন্ন্যাস। আসল কথা বৈরাগ্য, তীব্র বৈরাগ্য। চিত্তশুদ্ধি থাকা চাই । না হলে হবে না। সন্ন্যাসমার্গে মোক্ষলাভ হয় ঠিকই, কিন্তু তা হয় জ্ঞানলাভের ফলে, কর্মত্যাগের দ্বারা নয়। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়। অহঙ্কার ও আসক্তিই বন্ধনের কারণ। চেষ্টা করে কর্মত্যাগের দরকার হয় না। কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়ে জ্ঞানলাভ হয়। তখন নৈষ্কর্ম্য অবস্থা আপনা—আপনিই আসে।

স্বামী বিবেকানন্দ সেইজন্যই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের জন্য নিষ্কাম কর্মের অর্থাৎ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সূচনা করে গেছেন । কর্মদ্বারা কর্মত্যাগের এ এক বাস্তব রূপায়ণ। কাজেই যারা মনে করে যে, কর্মত্যাগ করলেই মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ সম্ভব—তারা ভ্রান্ত। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পিত ফলবুদ্ধিতে শাস্ত্রীয় কর্মের যিনি অনুষ্ঠান করেন তিনিই নৈষ্কর্ম্যরূপ সিদ্ধলাভ করেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ।। ৫

জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেউ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালও, অল্পক্ষণও) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করে) ন হি তিষ্ঠতি (থাকতে পারে না) হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত বা সহজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহের দ্বারা) অবশ (অবশ হয়ে) সর্বঃ (সকলেই) কর্ম (কর্ম) কার্যতে (করতে বাধ্য নয়)।

কর্ম না করে কেউ কখনও ক্ষণকালও থাকতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজাত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) গুণের প্রভাবে অবশপ্রায় হয়েই কর্ম করতে বাধ্য।

কাজ ছাড়া আমরা (জ্ঞানী ও অজ্ঞানী) একমুহূর্তও থাকতে পারি না। সে কাজ শরীর দিয়ে, হাত-পা নেড়ে হতে পারে। আবার লোকে দেখছে আমি কোনও কাজ করছি না, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করছি, সেটাও কাজ। সেইরকম কথা বলাটাও কাজ। তা ভালও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। হয়তো কাউকে কথা দিয়ে এমন আঘাত করলাম যা সে জীবনে ভুলবে না। এইভাবে কায়মনোবাক্যের দ্বারা কোনও না কোনভাবে

আমরা কাজ করে চলেছি। আপনি হয়তো কাজ করতে চাইছেন না। কিন্তু আপনার প্রকৃতি আপনাকে কাজ করতে বাধ্য করবে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ আমাদের সকলের মধ্যে আছে, মিশে আছে। কেউ হয়তো সত্ত্ব-প্রধান, কেউ বা রজোপ্রধান, আবার কেউ তমোপ্রধান। যতদিন দেহ আছে ততদিন দেহ এই তিনগুণের প্রভাবে ক্রিয়া করবে।

যারা সত্ত্বগুণী তাদের মধ্যে দয়া, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি গুণের বেশি প্রকাশ। রজোগুণী লোকেরা সব সময় ছটফট করছে; এটা করছে, ওটা করছে, বসে থাকতে পারে না। আর তমোপ্রধান কারা? যারা অলস, বোকা, যাদের অতিরিক্ত আহার, অতি নিদ্রা, নড়তে চড়তে চায় না, তারাই তমোগুণী। 'প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ' প্রকৃতিজাত এই তিন গুণের দ্বারা আমরা চালিত হচ্ছি। আমাদের নিজেদের কোনও স্বাধীনতা নেই সেখানে। আমরা ভাবি এক, করি আর এক। হয়তো ভাবছি খুব লেখাপড়া করব। কিন্তু কার্যত সেসব কিছুই করছি না। তাই বলছেন 'অবশঃ – অবশ, যেন কেউ আমাদের বাধ্য করছে। আমাদের চিত্ত অবশীকৃত। মন আমাদের অধীন নয়। জিতেন্দ্রিয় নই আমরা। বাসনা যতক্ষণ আছে, চুপ করে আমরা বসে থাকতে পারি না। সুতরাং কর্ম যখন করতেই হবে, তখন এমন কাজ করব যা বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম করা। একেই কর্মযোগ বলে। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে কর্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন। বলছেন, সাম্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুমি কর্ম করো, যা বন্ধনের কারণ না হয়ে মোক্ষলাভের কারণ হয়।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।। ৬

যঃ (যে) বিমূঢ়াত্মা (মূঢ় ব্যক্তি) মনসা (মনের দ্বারা) কর্ম – ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়কে) সংযম্য (সংযত করে) ইন্দ্রিয় – অর্থান্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে) স্মরন্ (স্মরণ করে) আস্তে (অবস্থান করে) সঃ (সে) মিথ্যাচারঃ (মিথ্যাচারী, পাপাচারী) উচ্যতে (বলা হয়)।

যে মূঢ় ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে থাকে, অথচ মনে-মনে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়সকল চিন্তা করতে থাকে, তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়।

অনেকে মনে করে কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যরোধ করলেই কর্মত্যাগ হল। অথচ মনে ভোগ-বাসনা রয়েছে। তাই শুধু কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে দাবিয়ে রাখলেই কর্মত্যাগ হয় না। কেবল বাইরের কর্মত্যাগই সন্ন্যাস নয়। আমরা কতরকম ত্যাগের কথা শুনি। কেউ হয়তো ছেঁড়া কাপড় পরে থাকে, জুতো পায়ে দেয় না, মাথায় তেল দেয় না। শুধু এইগুলিই যদি ত্যাগের লক্ষণ হয়, তাহলে রাস্তার যে ভিখিরি, যার সম্বল একটা ভাঙা টিন সে-ই সবচেয়ে বড় ত্যাগী। আসলে ত্যাগ শারীরিক ব্যাপার নয়। ত্যাগের অর্থ হল আসক্তি

ত্যাগ। আমাদের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় - বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু। কেউ হয়তো আপাতদৃষ্টিতে সব কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করে রেখেছে। কিন্তু মনে-মনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করছে। সে মিথ্যাচারী । মিথ্যাচারণ করছে সে। প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী হওয়া মানে কায়-মনো-বাক্যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া। একটা আদর্শকে আমি অনুসরণ করব বলে ঠিক করেছি, সর্বতোভাবে সেই আদর্শকে ধরে থাকব। আমার ভেতর-বার এক হবে। আমার যদি কোনও জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থেকে থাকে, তাহলেই বুঝতে হবে যে, ত্যাগ হয়নি। এই আকর্ষণটি ত্যাগ করে অনাসক্ত হতে হবে। অনাসক্তি আর কিছু নয়, ঈশ্বরের প্রতি 'আসক্তি'ই হচ্ছে অনাসক্তি। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন যায়, তাহলে আপনা-আপনিই বিষয় থেকে মনটা দূরে সরে আসে। ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাও, ঈশ্বরকে ভালবাস, তাঁকে আপনার করে নাও, তাহলে মন থেকে বিষয় আপনা-আপনি সরে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ 'মন মুখ এক করো'। এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই । আমরা তো কতসময় মুখে একরকম বলি, মনে আর একরকম ভাবি। তাই এখানে সাবধান করে দিচ্ছেন। বলছেন, এইরকম ব্যক্তি 'বিমূঢ়াত্মা'—নির্বোধ সে। বাইরে ত্যাগব্রত নিয়েছে, স্থূলভাবে কোনও কিছু ভোগ করছে না, সে ভাবছে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বশে রেখে সে খুব সংযত জীবন-যাপন করছে। কিন্তু মনে-মনে সে ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করছে। আসলে মনের ভোগই ভোগ, আবার মনের ত্যাগই ত্যাগ। মানুষ মনেই বদ্ধ, আবার মনেই মুক্ত। জ্ঞান না হলে, সব কামনা-বাসনা নির্মল না হলে কর্মত্যাগ হয় না। ইন্দ্রিয়জয় অন্তরে, বাহ্যিক বিষয়ত্যাগে ইন্দ্রিয়জয় হয় না। অতএব কর্মত্যাগ না করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাই কর্তব্য। এটিই মোক্ষলাভের প্রকৃত পথ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ।। ৭

অর্জুন (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে—চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) মনসা (বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করে) অসক্তঃ (অনাসক্ত হয়ে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা) কর্মযোগম্ (নিষ্কাম কর্মযোগ) আরভতে (আরম্ভ করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হন, শ্রেষ্ঠ হন)।

কিন্তু যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্ত অর্থাৎ যোগস্থ হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, হে অর্জুন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ভগবান তুলনা করে দুটি ভাবের মানুষের কথা বলেছেন। কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত

করে যে মনে-মনে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) ভোগ করে সে মিথ্যাচারী। পুরুষার্থ লাভের অযোগ্য সে। লোকে হয়তো দেখছে সব কর্মেন্দ্রিয়গুলি শান্ত রেখে সে ধ্যান করছে। আসলে তার মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটছে। আমাদের ঠিক এর উলটোটাই করতে হবে। সেকথাই বলছেন এখানে। যিনি বিবেকবুদ্ধিযুক্ত মনের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে কাজ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ, তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়। তিনি হয়তো বিষয়কর্মই করছেন, কিন্তু তাঁর কাছে এও ঈশ্বরের পূজা। কর্মফলে তাঁর আসক্তি নেই। এরকম যে কর্মযোগী তিনিই পরম পুরুষার্থ লাভের যোগ্য। তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি, সকলের শ্রদ্ধাভাজন, এটাই বলতে চাইছেন। অর্থাৎ জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্মত্যাগ করা যায় না। ততক্ষণ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়।

সম্পূর্ণ কর্মরহিত অবস্থায় না পৌঁছালে শান্তি পাওয়া যায় না, একথা ঠিক। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই সে অবস্থা লাভ হয় না। তাকে কর্মত্যাগ বলে না। বরং আমার শরীর-মন নিয়ত কাজ করবে। কিন্তু আমি কর্মরহিত হয়ে থাকব। অর্থাৎ 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা'—এই অভিমান ত্যাগ করতে হবে। সেটাই হচ্ছে ঠিক অ-কর্ম বা কর্মরহিত অবস্থা। ইন্দ্রিয়সংযম ও অনাসক্তি—এইটি হল কর্মযোগের সার কথা। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্বক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তোমার স্বধর্ম কর্ম করে যাও।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ।। ৮

ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম (শাস্ত্রোক্ত ও নিত্য কর্ম) কুরু (কর) হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (অকর্ম অর্থাৎ কিছু না করা অপেক্ষা) কর্ম (কর্ম) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ) অকর্মণঃ চ (কর্মহীন হলে শরীর-যাত্রা) অপি (দেহধারণও) তে (তোমার) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্বাহ হবে না)।

তুমি শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্তব্যকর্ম এবং তোমার স্বধর্ম (বর্ণাশ্রমোচিত) কর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। কর্ম না করলে তোমার দেহরক্ষার জন্য জীবিকানির্বাহও হবে না।

কাজ না করে আমরা থাকতে পারি না । তবে আমরা কীরকম কাজ করব? এই বিষয়ে আমরা শাস্ত্রের পরামর্শ নেব। শাস্ত্র বলে দেবে কোন কর্ম আমাদের করা উচিত। শাস্ত্রে অনেক রকম কর্মের বিধান দেওয়া আছে। কিন্তু সব কর্মের লক্ষ্য এক—চিত্তশুদ্ধি।

ভগবান বারবার বলছেন, অকর্ম হতে কর্ম শ্রেয়। নিয়ত কর্ম বলতে বোঝায় শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্তব্যকর্ম এবং বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম কর্ম। নিত্য কর্ম মানে শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সন্ধ্যা-উপাসনাদির বিধান দেওয়া আছে। আর কোনও বিশেষ উপলক্ষে, বিশেষ

কারণে যেসব কর্ম করা হয় তা নৈমিত্তিক কর্ম – যেমন শ্রাদ্ধাদি। আবার গৃহীর জন্য আছে বর্ণাশ্রমজনিত কর্তব্য–কর্মের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণের কর্ম হল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয় যিনি তিনি সমাজকে রক্ষা করবেন। ধর্মকে, ন্যায়–নীতিকে রক্ষা করবেন। বৈশ্য লেনদেনের ভেতর দিয়ে সমাজে অর্থ উপার্জন করবেন, ব্যবসা–বাণিজ্য করবেন। আর শূদ্র, তার হয়তো কোনও বিশেষ গুণ নেই, কিন্তু কায়িক শক্তি আছে। তাঁর সবল, সক্ষম শরীর দিয়ে তিনি দৈহিক পরিশ্রম করবেন। কিন্তু যে কর্মই করা হোক না কেন, নিষ্কামভাবে, ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে করলে তাতেই চিত্তশুদ্ধি হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, কাজ না করার চেয়ে কাজ করাই শ্রেয়। সাধারণ বুদ্ধি বিচার করেও দেখ, কাজ না করলে তোমার শরীর রক্ষা হবে না। তার জন্য অন্ন দরকার, বস্ত্র দরকার, আশ্রয় দরকার। তাই কাজ যখন করতেই হবে তখন তুমি নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্ম, নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্মোচিত সকল কর্ম করো, ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করো, আসক্ত শূন্য হয়ে যন্ত্রবৎ কর্ম করো, কর্মের উপায় বা কৌশল যেন সৎ ঈশ্বর উদ্দেশে হয় এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করো। হে অর্জুন, তুমি সর্বদা নিষ্কামভাবে তোমার স্বধর্মোচিত কর্ম সম্পাদন করে যাও, কখনও কর্মত্যাগ করো না।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ।। ৯

যজ্ঞ–অর্থাৎ (যজ্ঞের জন্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে) কর্মণঃ (কর্ম ব্যতীত) অন্যত্র (অন্য কর্ম – অনুষ্ঠানে) অয়ং (এই) লোকঃ (কর্মাধিকারী ব্যক্তি) কর্মবন্ধনঃ (কর্মে আবদ্ধ হয়) কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিমুক্ত হয়ে) তৎ–অর্থং (তাঁর জন্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে) কর্ম (কাজ) সমাচর (অনুষ্ঠান কর) ।

যজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে কর্ম করা ছাড়া অন্য কর্মে প্রবৃত্ত হলে এই কর্মাধিকারী পুরুষ কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে তোমার করণীয় কর্ম করতে থাক।

'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ পরমেশ্বর বা দেবের পূজা। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।' শ্রুতি বলছেন – যজ্ঞই বিষ্ণু। সেই যজ্ঞরূপী ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে যে-কর্ম করা হয় তা-ই যজ্ঞার্থ কর্ম। আমরা যা কিছু করি, যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রবিহিত কর্ম সবই যজ্ঞ, সবই পূজা। ঈশ্বরের আরাধনা করছি মনে করে, আমাদের সব কাজ করতে হবে। আমাদের এ দেহ একটা যজ্ঞভূমি। সেখানে যাজযজ্ঞ সবকিছু করা হচ্ছে। খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করছি—সবই যজ্ঞ। রামপ্রসাদ যেমন বলছেন, 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে'।

আমরা সংসারে রয়েছি। সংসারে থেকে তো সংসারকে বাদ দেওয়া যায় না। এর ভেতরে থেকেই মুক্তির পথ বার করে নিতে হবে। তাই বলছেন, যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম কর, সব কর্মকে যজ্ঞ বলে মনে কর, তাহলে এর দ্বারাই সমস্ত কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাভক্ত। কিছুতেই মদ ছাড়তে পারছেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানিয়েছেন সেকথা। তিনি বলেছেন, মদ খাওয়ার আগে মা–কালীকে নিবেদন করে খেতে। পরে গিরিশ চন্দ্রের মনে অনুশোচনা হয়েছে। ভাবছেন : লোকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিস নিবেদন করে, আর আমি কিনা মদ খেতে দিচ্ছি। তখন আর মাকে দিতে পারেন না, নিজেও খেতে পারেন না।

'মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' – অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ কর। যজ্ঞার্থ কর্ম তখন ঠিক ঠিক হয়। ঈশ্বরের প্রীতিতেই তখন পরম আনন্দ। ফল ভাল হোক বা মন্দ, তার দিকে লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম না করে যদি নিজের ভোগের জন্য কেউ কাজ করে তখন সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। তখন কাজে সফল হলে সুখ আর বিফল হলে দুঃখ। এই সুখ–দুঃখ–রূপ ফলের দ্বারা তখন মানুষ বদ্ধ হয়। তাই সব কর্মই নিষ্কামভাবে যজ্ঞবুদ্ধিতে অর্থাৎ ঈশ্বরবুদ্ধিতে করা উচিত।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ।। ১০

পুরা (পূর্বে, সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (প্রাণীগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের মানুষ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করে) উবাচ (বলেছিলেন) অনেন (এর দ্বারা, এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও) এষঃ (ইহা, এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ফলদানে কামধেনুতুল্য অর্থাৎ সর্ব–অভীষ্টপ্রদ) অস্তু (হোক)।

সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর। এই যজ্ঞ তোমাদের সর্ব–অভীষ্ট ফলদানে কামধেনুতুল্য হোক।

ভগবান এখানে স্বধর্মোচিত সকাম কর্তব্যকর্মের কথা বলছেন। শাস্ত্রমতে সকাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই মানুষ জীবনে ঈশ্বরপথে এগিয়ে যাবে। প্রজাপতিই ব্রহ্মা। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, পতি, কর্তা। নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনিই প্রজাপতি। নতুন কল্পের প্রারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞ করে এই জগৎ, প্রজা ও সেইসঙ্গে তাদের রক্ষার্থে যজ্ঞ (কর্ম) সৃষ্টি করলেন। হে যজ্ঞ, তুমি এই সব জীবের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হও, এই যজ্ঞের সাহায্যেই জীবের শ্রীবৃদ্ধি হোক। সকল জীব উৎকৃষ্টভাবে

জীবনযাপনে সক্ষম হোক। এই যজ্ঞ যেন সকলের কাছে কামধেনুস্বরূপ হয়। প্রজাপতি পরমেশ্বর যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা সেইরূপ তার কর্মেরও (যজ্ঞ) সৃষ্টিকর্তা। তারপর আশীর্বাদ করে বললেন, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উন্নতি লাভ কর। সহযজ্ঞ করবে যারা কর্মাধিকারী পুরুষ তারা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এদেরই কর্মে অধিকার আছে। এরাই কর্মাধিকারী পুরুষ। ব্রহ্মা তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্মোচিত সকাম কর্ম কর। এই শাস্ত্রবিহিত স্বধর্মোচিত কর্তব্যকর্মকেই যজ্ঞ বলে। কর্মই যজ্ঞ হিসেবে করতে বলছেন। বলছেন, তোমরাও যজ্ঞ কর। তাহলে সব কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে। মানুষকে সংসার-জীবনে অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনে কর্তব্যকর্ম করতে উৎসাহিত করছেন। কারণ মানুষ তার কর্তব্যকর্ম করতে বাধ্য। কর্তব্যকর্ম করবে সংসারে শুভ ফল অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধি লাভের জন্য।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি ভগবান সকাম কর্ম করতে বলছেন? এতদিন যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন সেসব কি বৃথা ? না, তা নয়। সংসারে কর্মাধিকারী পুরুষের স্বধর্মোচিত কর্তব্যকর্ম ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে সম্পাদন করলে বাস্তবিক মনে ত্যাগভাব অর্থাৎ অনাসক্তি আসবে। ফলে সংসারের সকল সকাম কর্তব্যকর্মের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ দেবতা বা ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত নিত্যকর্মকে যজ্ঞ হিসাবে করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, ঈশ্বরে মন রেখে সংসার করা। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এক ধার্মিক গৃহী দম্পতি নবগোপাল ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী নিস্তারিণীদেবী আসতেন। গৃহস্থদের কর্তব্য কর্মের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিস্তারিণীদেবীকে একদিন বললেন, তুমি তোমার এক সন্তানকে আমাকে দান করো। নিস্তারিণীদেবীও তাঁকে কথা দিলেন। কিছুদিন পরে নিস্তারিণীদেবী তাঁর এক শিশু সন্তানকে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পায়ের কাছে রাখলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে তারপর নিস্তারিণীদেবীর কোলে দিয়ে বললেন, তুমি এই ছেলেকে সুন্দরভাবে পালন করো, সময় হলে আমি ওকে কাছে ডেকে নেবো। সেই সন্তান পরে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৃহীদের শিক্ষা দিলেন কিভাবে সংসারে অনাসক্ত হয়ে সন্তান পালন করতে হয়।

এইরূপ যজ্ঞ কর্ম দ্বারা দেবতাগণ প্রীত হলে মানুষের অভীষ্ট বস্তুসকল দান করবেন। এই প্রকারে মানুষ ও দেবতার মধ্যে আদানপ্রদান দ্বারাই সৃষ্টিরক্ষা ও প্রজাগণের বৃদ্ধি ও ইষ্টলাভ সম্ভব হবে। তাই স্বধর্মোচিত ত্যাগমূলক সমস্ত কর্তব্যকর্মই যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞে সকল চার বর্ণের অধিকার আছে।

এখানে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, আমরা যে আমগাছ

মাটিতে পুঁতি, তা আম খাব বলে। আম তো হল। কিন্তু তার সঙ্গে গাছের ছায়া পেলাম, আবার মুকুল আর সুগন্ধও পেলাম। শুধু ফল চেয়েও কতকগুলি বাড়তি জিনিস পেয়ে গেলাম। তাই বলছেন যারা নিষ্কামভাবে নিয়মিত অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম করে, ঈশ্বরের প্রীতিই যাদের সব কর্মের উদ্দেশ্য,তাদের যা-কিছু কামনাবাসনা আছে তা আপনা-আপনি পূর্ণ হয়ে যায়। চাইতে হয় না, বলতে হয় না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম এমন একটা জিনিস যে, চাওয়া হোক বা না হোক, সুফলটা আপনাআপনি লাভ করা যায়। ফলের ইচ্ছা না থাকলেও কর্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন সন্ধ্যাহ্নিক যারা করবে তাদের যত কালিমা, যত মলিনতা, ধুয়ে-মুছে যাবে। নির্মল, শুদ্ধ, পবিত্র ব্রহ্মলোক লাভ করবে তারা।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ।। ১১

অনেন (এর দ্বারা, এই যজ্ঞের দ্বারা) (তোমরা) দেবান্ (দেবতাগণকে) ভাবয়ত (সংবর্ধনা, তৃপ্ত কর) তে (সেই) দেবাঃ (দেবতাগণ) বঃ (তোমাদেরকে) ভাবয়ন্ত (বৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা তৃপ্ত করুন) পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (সংবর্ধনের দ্বারা) (তোমরা) পরম্ (পরম) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ, মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করবে)।

এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তৃপ্ত কর এবং সেই দেবগণও বৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন করে তোমাদের সংবর্ধিত করুন। এইভাবে পরস্পরের তৃপ্তি সম্পাদন করে তোমরা পরম শ্রেয়োলাভ করবে।

কীভাবে স্বধর্মোচিত সংসারের সকাম কর্তব্যকর্ম যজ্ঞরূপে করতে হবে, এখানে তাই বলছেন। জীবের সকল কর্ম যজ্ঞকর্মরূপে দেবতাদের উদ্দেশে সম্পাদিত হবে এবং দেবতাগণের কার্যে জীবের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সমস্ত বিশ্বব্যাপি এক বিরাট যজ্ঞক্রিয়া চলছে। প্রকৃতির দেবতাগণ সর্বদা এই যজ্ঞ করছেন। আমরা যদি দেবতাদের ভালবাসি, আরাধনা করি, ধ্যান বা চিন্তা করে তাঁদের সন্তুষ্ট করি তাহলে খুশি হয়ে তাঁরাও আমাদের মঙ্গল কামনা করবেন। বৃষ্টি ইত্যাদি দান করে ভালো ফসল ফলিয়ে তাঁরা মানুষকে পুরস্কৃত করবেন। আমরা না চাইলেও করবেন। স্বামীজী বলতেন, এ দোকানদারি নয়। এত ধ্যান করছি, এত পূজা করছি—বিনিময়ে এই সব ফল পাব—এ হয় না। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরচিন্তা করলে, ঈশ্বর যেন আমাদের কাছে ঋণী হয়ে গেলেন। তখন তাঁর কৃপাতেই আমরা যা শ্রেয়, যা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর তা লাভ করব। শ্রেয় অর্থাৎ প্রেম, পবিত্রতা, ঈশ্বর-অনুরাগ, বিবেকবুদ্ধি। যা পরম, যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই আমরা লাভ করব। যজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান হবে—এই কথাটাই বলতে চাইছেন। যজ্ঞার্থে কর্ম অর্থাৎ পরহিতার্থে বা ঈশ্বরার্থে কর্ম করলে

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা প্রসন্ন হন। এর ফলে ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয়, সাত্ত্বিক হয়। চিত্তের মলিনতা দূর হয়। অন্তরে জ্ঞানের আলো ফুটে ওঠে। আর এই জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়।

ভগবান বলছেন, প্রকৃতির দেবতা, মানুষ, প্রাণীজগৎ বাস্তবিক বিশ্বে একে অপরের শুভকামনা না করে কেবল যদি নিজের-নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যেই কর্ম করে, তবে কারও মঙ্গল হতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়ে মানবসমাজ তখন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হবে। পারস্পরিকতা, পরস্পর নির্ভশীলতাই প্রগতির পথ, নিজেকে গুটিয়ে রেখে অপরের সংস্পর্শ বর্জন করে নয়, পরস্পর লড়াই করে নয়, একে অন্যের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসাধন করে নয়। আমরা প্রকৃতির নিয়ম যদি লঙ্ঘন করি, তাহলে আমরাও প্রকৃতির অবদান থেকে বঞ্চিত হব। প্রাকৃতিক ভাণ্ডার থেকে যেমন সম্পদ ব্যবহার করব, তেমনি সেই সম্পদের ভাণ্ডার পূরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত মানবসমাজের শ্রেয়োলাভের জন্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরস্পরের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার একান্ত প্রয়োজন। নিঃস্বার্থ হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ ও সেবার যজ্ঞ মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'—এই অপূর্ব আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মানবজাতির উদ্দেশেই বলছেন। পরস্পর সাহায্য, সেবা, ও ত্যাগের সহায়তায় সকলেই উচ্চতম স্তরে উঠতে পারবে। একেই বলে যজ্ঞ কর্ম। নৈতিক বোধ, সেবার মনোভাব, দেবার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে, নেওয়ার নয়, প্রকৃতিকে শোষণ করা নয়।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ।। ১২

দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞ-ভাবিতাঃ (যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত বা সেবিত হয়ে) ইষ্টান্ (বাঞ্ছিত, অভীষ্ট) ভোগান্ (ভোগ্যবস্তু সকল) বঃ (তোমাদেরকে) দাস্যন্তে (দান করবেন) হি (সেইহেতু) তৈঃ (তাঁদের দ্বারা) দত্তান্ (প্রদত্ত ভোগ্যবস্তুগুলি) এভ্যঃ (এঁদের অর্থাৎ দেবতাগণকে) অপ্রদায় (নিবেদন না করে) যঃ (যিনি) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন) সঃ (তিনি) স্তেনঃ এব (চোরই)।

দেবতারা যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হয়ে আমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন। সুতরাং দেবতাদের দেওয়া জিনিস তাঁদেরই নিবেদন না করে যে ভোগ করে সে চোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

যজ্ঞদ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে দেবতাগণ আমাদের অভীষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি প্রদান করেন। যজ্ঞের দ্বারা যে কেবল পরম শ্রেয়োলাভ হয় তা নয়, ভোগ্যবস্তুও পাওয়া যায়। আমাদের মনে সুপ্ত বাসনা থাকতে পারে, হয়তো ভোগ করতে—চাই কিন্তু তা আমি জানাইনি, প্রার্থনা

করিনি। কিন্তু আমরা যজ্ঞ করেছি, দেবতাদের স্মরণ-মনন করেছি, তাঁদের আরাধনা করেছি। তাতে তাঁরা তুষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁরা আমাদের সুপ্ত ইচ্ছাও পূর্ণ করেন। অন্ন, পশু, ধন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি যার যা কাম্য-বস্তু তা তাদের দেবেন। দেবতাদের কাছ থেকে এইসব পেয়ে মানুষ তাঁদের প্রীতির জন্য কাজ করবে। তা না করে যে কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওইসব বস্তু ব্যবহার করে সে চোর ছাড়া আর কিছুই নয়। দেবতাদের দেওয়া জিনিস সবটাই নিজের জন্য রাখলাম, তাঁদের উৎসর্গ করলাম না, তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার পর্যন্ত করলাম না, একবারও বললাম না, 'প্রভু, তোমারই দেওয়া জিনিস তুমি দয়া করে গ্রহণ কর'। এই হল হিন্দু-দৃষ্টিভঙ্গি—আমরা যা-কিছু ভোগ করি, তা আগে ঈশ্বরকে নিবেদন করে তাঁরই প্রসাদ গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি দেবঋণ শোধ না করেই তাঁদের দেওয়া জিনিস নিজের বাসনা-তৃপ্তির কাজে লাগায় সে তস্করেরই সামিল।

ভগবান দু-ধরনের মানুষের কথা বলছেন—একপ্রকার মানুষ ঈশ্বরপরায়ণ, ত্যাগী, যজ্ঞবান। আর একপ্রকার মানুষ হলো ঈশ্বরবিমুখ, ভোগী ও যজ্ঞহীন—তারাই চোর। ঈশ্বরপরায়ণ মানুষ সমস্ত বস্তুকে ভগবানের দান বলে মনে করেন। তাই তাঁরা যজ্ঞরূপে সেইসকল বস্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে অপরের সেবায় দান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়ঃ এরাই প্রকৃত মানুষ, মান ও হুঁশযুক্ত মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলছেন, নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ।। ১৩

যজ্ঞশিষ্ট – অশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (সজ্জনগণ) সর্বকিল্বিষৈঃ (সমস্ত পাপ থেকে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) তু (কিন্তু) যে (যারা) আত্মকারণাৎ (শুধু নিজের জন্য) পচন্তি (পাক করে) তে (সেই) পাপাঃ (পাপাচারিগণ) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে)।

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অর্থাৎ দেবতা, অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন নিবেদন করে অবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁরা সব পাপ থেকে মুক্ত হন। কিন্তু যে পাপাত্মারা কেবল নিজের উদরপূরণের জন্য অন্নপাক করে, তারা পাপ-অন্নই ভোজন করে।

যাঁরা ইষ্টদেবতাকে অন্ন নিবেদন করে সেই প্রসাদী অন্ন নিজেরা গ্রহণ করেন তাঁরা 'সন্তঃ' সজ্জন। তাঁদের চোখে খাদ্যগ্রহণ যজ্ঞের হোমাগ্নিতে খাদ্যবস্তু, আহুতি দেওয়া। ঈশ্বরের উদ্দেশে তাঁরা খাদ্যবস্তু অর্পণ করছেন। তাঁর পূজা করছেন।

শাস্ত্রে হিন্দুর নিত্য-করণীয় পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে। সেগুলি হল ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ। ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ নিত্য শাস্ত্রপাঠ এবং সন্ধ্যা-উপাসনা ইত্যাদি। হোমাদি অগ্নিহোত্র-কর্ম হল দেবযজ্ঞ। পশুপক্ষীদের খাওয়ানো হল ভূতযজ্ঞ।

অতিথি সেবা করা, নৃযজ্ঞ। আর পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, পিতৃযজ্ঞ। সমাজে মানুষের সকলের প্রতি কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যকেই শাস্ত্রে ঋণ বলা হয়। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ, ভূতঋণ ও নৃঋণ ইত্যাদি শোধ করতে হয়। তা না করে কেউ কেউ শুধু নিজের জন্য অন্নপাক করে। মনে করে সে-ই এসবের কর্তা, সব সে-ই সংগ্রহ করেছে, সব তারই প্রাপ্য। সে ব্যক্তি আদতে পাপই ভোজন করে।

বাস্তবিক, স্বার্থপর ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক। তারা মনে করে তাদের জন্যই ঘরবাড়ি, তাদের জন্যই সমাজ, তাদের জন্যই ভগবান – 'আত্মকারণাৎ'— সব শুধু নিজের জন্য। আমরা রান্না করার আগে কাপড় ছাড়ি, স্নান করি, হাত ধুই। কারণ আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করছি, তাই শুদ্ধ হতে হবে। এই শুচি-চিন্তা বা শুদ্ধ হওয়া শুধু কায়িক নয়, মানসিক হওয়া চাই । ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করলে তা শুদ্ধ, পবিত্র হয়। সব কাজই পূজা হয়ে যায়। তাই বলছেন, সব কাজ, শাস্ত্রবিহিত হওয়া চাই। গৃহস্থ জীবনরক্ষার্থে প্রতিদিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণিহিংসা করতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রকারেরা গৃহস্থের পাঁচ প্রকার 'সূনা' অর্থাৎ জীবহিংসা-স্থানের উল্লেখ করেন। যথা 'কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জনী – অর্থাৎ হামানদিস্তা (উদুখল), শিলনোড়া (জাঁতা), চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা। এগুলি গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য, অথচ এগুলিতে কীটপতঙ্গাদি প্রাণীবধও অনিবার্য, সুতরাং পাপও অবশ্যম্ভাবী। এই পাপ স্খলন করার জন্যই গৃহস্থের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের উপদেশ। আর এই যজ্ঞাবশেষ-প্রসাদ ভোজন করলে অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য কর্ম সম্পাদন করলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। সকল পাপমুক্ত হয়। নিজের তৃপ্তির জন্য কর্ম মানুষের মনকে সঙ্কুচিত করে। মানুষের এই স্বার্থপরতা, ভোগাকাঙ্ক্ষা, সঙ্কোচনই পাপ। আর যজ্ঞার্থ অর্থাৎ পরার্থ বা ঈশ্বরার্থ কর্মের দ্বারা চিত্ত প্রসারতা লাভ করে। এই নিঃস্বার্থপরতা, প্রসারণই পুণ্য।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ।। ১৪

অন্নাৎ (অন্ন থেকে) ভূতানি (ভূতগণ অর্থাৎ প্রাণীদেহ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) পর্জন্যাৎ (মেঘ থেকে) অন্ন সম্ভবঃ (অন্নের সৃষ্টি হয়) যজ্ঞাৎ (অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ থেকে) পর্জন্যঃ (বৃষ্টি, মেঘ) ভবতি (হয়) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ, কর্মফল) কর্মসমুদ্ভবঃ (শাস্ত্রবিহিত বা বেদবিহিত কর্ম থেকে উৎপন্ন)।

অন্ন থেকে প্রাণীর শরীর জন্মায়, মেঘ থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞধূম থেকে মেঘের সৃষ্টি এবং বেদবিহিত বৈধ কর্ম থেকে সেই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

ঈশ্বরপ্রবর্তিত কর্মপ্রবাহ চক্রবৎ আবর্তিত হয়ে জগৎচক্র অর্থাৎ এই সংসারকে চালাচ্ছে, পরবর্তী তিনটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেকথাই বলছেন।

আমরা বলি অন্নময় কোষ অর্থাৎ এই শরীর। এই শরীরও একটা দেবস্থান। এই শরীর দিয়েই আমরা দেবতার সেবা করব, তাঁর পূজা করব। সমুদয় জীবজগতের শরীর অন্নের উপর নির্ভরশীল। অন্ন ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। ভুক্ত অন্নই শুক্র ও শোণিতে পরিণত হয়। তার থেকেই জীবের উৎপত্তি। এই অন্ন আবার আসে মেঘ থেকে। তাই বৃষ্টি না হলে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ। মেঘ কোথা থেকে আসে? যজ্ঞ (প্রকৃতির কর্ম, বাষ্প হওয়া) থেকে। আবার নানারকম যজ্ঞ করার বিধি আছে। হয়তো কোনও বছর বৃষ্টি কম হল। পণ্ডিতেরা তখন নানারকম যজ্ঞ করার বিধান দেন। এই যজ্ঞের ধোঁয়া থেকে মেঘ হয়। অবশ্য শুধু যে যজ্ঞ (প্রকৃতির সকল কর্ম) থেকেই মেঘ হয় তা নয়, আরও কারণ আছে। যজ্ঞ বলতে শুধু অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বোঝায় না। শাস্ত্রবিহিত, বেদবিহিত, প্রকৃতির সব কর্মই যজ্ঞ। এই কর্মপ্রবাহ একটা চক্রাকারে চলছে। জীব-অন্ন-মেঘ-যজ্ঞ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ। কেউ স্বতন্ত্র নয়।

আজকাল আমরা দেখি মানুষ পরিবেশ সচেতন হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, পশুপক্ষী এবং মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আগে তো বাঘ মারাটা একটা মস্ত বড় বীরত্বের কাজ বলে মনে করা হত। আর আজ? ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাহায্যে বাঘকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। এখন বোঝা যাচ্ছে সবার সঙ্গে সবার একটা সম্পর্ক রয়েছে। সেই অর্থে সমস্ত জগৎসংসারই একটা কর্মযজ্ঞ। শাস্ত্র যেন ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যাতে এই জগৎচক্রের সাম্য অবস্থা নষ্ট না হয়।

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ।। ১৫

কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম) ব্রহ্ম-উদ্ভবং (বেদ থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকেই জানা যায়) বিদ্ধি (জেনো) ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষর-সমুদ্ভবং (পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন) তস্মাৎ (সেহেতু) সর্বগতং ব্রহ্ম (সর্বব্যাপী ব্রহ্ম) নিত্যং (সর্বদা) যজ্ঞে (যজ্ঞাদি কর্মে) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছেন)।

যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জেনো। অর্থাৎ কর্ম বলতে বেদবিহিত কর্মই বুঝবে। বেদরূপ ব্রহ্ম আবার অক্ষর পরব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। সেই কারণে সর্বপ্রকাশক বেদ বা ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম বা যজ্ঞ যেমন ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন, সর্বব্যাপী ব্রহ্মও তেমনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা যেসব কর্ম করি সব শাস্ত্রবিহিত, বেদবিহিত কর্ম। বেদ বলে দিচ্ছে কখন, কোন অবস্থায় কী করতে হবে। তাই বলা হচ্ছে 'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং'। ব্রহ্ম মানে শাস্ত্র, বেদ। কেন বেদই ব্রহ্ম? কারণ বেদ হল পরম সত্য নিত্য। আবার ব্রহ্মও পরম সত্য নিত্য। বেদ অপৌরুষেয়, স্বয়ংপ্রকাশ। সত্যও স্বয়ংপ্রকাশ। সত্যকে কোনও প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা

করতে হয় না। এই বেদ বা ব্রহ্ম আবার অক্ষর পরব্রহ্ম, পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত।

গীতাতে কর্ম করার কথা বারবার বলা হয়েছে। এখন কোন ধর্ম করব আমরা? নিজেদের ইচ্ছামতো, খেয়ালখুশিমতো কর্ম করব? না, তা নয়। সব শাস্ত্র-অনুসারে করতে হবে। ধরা যাক একজন পণ্ডিত বলছেন, এটা কর, করলে ভাল ফল হবে। আরেকজন বলছেন, না, এটা করো না। আবার আরেকজন হয়তো আরেকরকম বলছেন। তখন কার কথা শুনব? উত্তরে বলছেন, সেক্ষেত্রে শাস্ত্রই আমাদের পথনির্দেশ করবে। মহাপুরুষই হোন বা অসাধারণ শক্তিসম্পন্নই হোন, সব ক্ষেত্রেই শাস্ত্রের সমর্থন চাই। শাস্ত্র আমাদের প্রমাণ। ধর্ম সম্বন্ধে বেদবিরোধী কথা কখনই গ্রহণীয় নয়।

তারপর বলছেনঃ 'সর্বগতং ব্রহ্ম'—সর্বব্যাপী যে আত্মা বা ব্রহ্ম সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন, সেই ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞ অর্থ বেদবিহিত কর্ম। সর্বব্যাপী বলে কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মই আছেন। প্রকৃতিতে যত কর্ম আছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে শুরু করে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া – সবই যজ্ঞ। এই সর্বব্যাপী-যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মকে জানাই প্রকৃত বৈদিক জ্ঞান। শুধু দেবতাদের উদ্দেশে সকাম যজ্ঞ করে পরম শ্রেয়োলাভ হয় না। যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করেই শ্রেয়োলাভ করা যায়। ব্রহ্মসূত্রে আছে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—শাস্ত্র ব্রহ্ম থেকে এসেছে। আবার সেই শাস্ত্রের মাধ্যমেই আমরা ব্রহ্মকে বুঝতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত। ঠিক সেভাবে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম যেমন ব্রহ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সর্বব্যাপী ব্রহ্মও তেমনি যজ্ঞেই অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করলে ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হয়। কামনা-বাসনা দূর হয়ে যায়। তখন মানুষ নিজের মধ্যেই আনন্দস্বরূপকে খুঁজে পায়। বাইরে আর খুঁজতে হয় না। তখন সব ভেতরে – আত্মানন্দেই তৃপ্ত। বাইরের কর্ম তখন আপনাআপনি ত্যাগ হয়ে যায়, বাইরের কোনও সুখ তিনি কামনা করেন না, নিজের আত্মাতেই তিনি তৃপ্ত।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ।। ১৬

পার্থ (হে অর্জুন) যঃ (যে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্তিতং (প্রবর্তিত, স্থাপিত) চক্রং (কর্মচক্র) ন অনুবর্তয়তি (অনুষ্ঠান না করে, অনুগামী না হয়) ইন্দ্রিয়-আরামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) অঘ-আয়ুঃ (পাপী) সঃ (সে ব্যক্তি) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে)।

হে পার্থ, এই সংসারে যে মানুষ এই প্রকারে পরমেশ্বর-প্রবর্তিত যজ্ঞচক্রের অনুগামী না হয়, সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা বৃথাই জীবনধারণ করে।

বেদবিহিত কর্ম বা যজ্ঞ শুধু যে বিশেষ কোনও সময়ে করতে হবে তা নয়, নিত্যকর্তব্য। আর তা সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কর্ম একটা চক্রের মতো ঘুরে চলেছে। সকলকে এই কর্মচক্রের বিধি মেনে চলতে হবে। প্রথমত পরব্রহ্ম থেকে বেদের উদ্ভব। বেদবিহিত বা শাস্ত্রবিহিত কর্মই যজ্ঞ। যজ্ঞের বাষ্প থেকে মেঘের উৎপত্তি। এই মেঘ (বৃষ্টি) থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে প্রাণীবর্গের সৃষ্টি। প্রাণীবর্গ আবার কর্মযজ্ঞ করে পরস্পর ও বিরাট প্রকৃতি ও দেবতাদের সেবা করে তুষ্ট করে। এই হল সম্পূর্ণ জগৎচক্র। সমস্ত জীবজগৎ অন্নের উপর নির্ভরশীল। অন্ন যেমন আত্মদান করে ভূতবর্গ সৃষ্টি করে, তেমনি এই জগৎচক্র আত্মত্যাগ ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মত্যাগ ও সেবার দ্বারাই কর্মযজ্ঞের যথার্থ অনুষ্ঠান হয়। কর্মচক্র ঠিক ঠিক আবর্তিত হয়। কিন্তু কেউ যদি বেদবিহিত কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে না করে, আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য করে তাহলে সে পাপী। ঈশ্বর-প্রবর্তিত জগৎ-চক্রের পরিচালনায় সে সাহায্য করে না। ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত এরূপ ব্যক্তির জীবনধারণ বৃথা হয়ে যায়।

বিশ্বপ্রকৃতি পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিরাট যজ্ঞ করছে, মানুষ ও দেবতা সেই যজ্ঞের একটা অংশ। সুতরাং মানুষকেও তার সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সম্পাদন করতে হবে। ভগবান এই শ্লোকে মানবজীবনের আদর্শ সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন। স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মানুষের সর্বনাশের মূল। আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থপর হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করাই মানবজীবনের আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ।। ১৭

তু (কিন্তু) যঃ (যে) মানবঃ (ব্যক্তি, জ্ঞানী) আত্মরতিঃ (পরমাত্মাতে প্রীত) আত্মতৃপ্তঃ এব চ (ও পরমাত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব চ (এবং পরমাত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ (তুষ্ট) স্যাৎ (আছেন) তস্য (তাঁর) কার্যং (কর্তব্যকর্ম) ন বিদ্যতে (কিছুই নাই)।

কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং কেবল আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর নিজের কোনওরকম কর্তব্য নাই।

অন্যদিকে যিনি পরমার্থদর্শী, পরমানন্দস্বরূপ আত্মাকে যিনি বোধে বোধ করেছেন, ঈশ্বরপ্রবর্তিত এই কর্মচক্রের অনুষ্ঠান না করলেও তাঁর কোনও প্রত্যবায় হয় না। হিন্দুরা বিশ্বাস করে আত্মাই তার প্রকৃত সত্তা। এই আত্মা নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। যিনি এই আত্মাকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে জেনেছেন, চিনেছেন, তিনি আত্মাতেই ডুবে আছেন – 'আত্মরতি'। 'আত্মক্রীড়', নিজেকে নিয়েই তিনি খেলা করছেন। নিজের স্বরূপ ছাড়া তাঁর কাছে আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু নাই। তিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, সন্তুষ্ট-আত্মারাম। তিনি জানেন যা-কিছু ভাল, যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু কাম্য সব তাঁর মধ্যেই

রয়েছে। বাইরে আর কিছু চাওয়ার নাই। 'যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে', রামপ্রসাদ বলছেন। সেই আনন্দস্বরূপকে তিনি নিজের মধ্যে পেয়েছেন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তাঁর কিছু নাই। নিঃস্ব। বাড়ী নাই, ভাল পোশাক নাই, গাড়ী নাই। তবু তাঁর সব আছে। পরম আকাঙ্ক্ষিত যে সম্পদ, যা কখনও হারায় না, সেটি তাঁর নিজের আত্মা। তাঁকে লাভ করে তিনি ভরপুর হয়ে আছেন। এই জগতের সব কিছুর সঙ্গে তিনি নিজেকে অভিন্ন বোধ করেন। তাঁর কোনও শত্রু নাই। নিজের সঙ্গে কি নিজেকে হিংসা করা যায়? সবাই তাঁর বন্ধু। সবার সুখে তিনি সুখী, আবার সবার দুঃখে দুঃখী।

এমন যে ব্যক্তি তাঁর 'কার্যং ন বিদ্যতে', কর্তব্যকর্ম বলে কিছু নাই। আমরা তো প্রয়োজনেই কাজ করি। হয়তো কিছু বস্তুলাভ করতে চাই – বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি বা সমাজে প্রতিষ্ঠা। তাই কাজ করি। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম, আত্মকাম তাঁর বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনও প্রয়োজন নাই। যজ্ঞাদি কর্ম সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেই কর্ম না করলেও আত্মজ্ঞ ব্যক্তির কোন প্রত্যবায় বা ত্রুটি হয় না। কারণ তাঁর হৃদয়ে কোনও কামনা – বাসনা নাই। আছে শুধু সর্বভূতে প্রেম। তিনি কেবল লোকশিক্ষার্থ ও লোকহিতার্থ কর্ম করেন।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ।। ১৮

ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁর, আত্মজ্ঞানীর) অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাই) অকৃতেন (অবশ্য কর্তব্যকর্ম না করলেও) কশ্চন (কোনও) (প্রত্যবায়) ন (নাই) সর্বভূতেষু চ (এবং কোনও প্রাণীতেই) অস্য (এঁর) কঃ চিৎ (কোন) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (নিজ প্রয়োজনসম্বন্ধ) ন (নাই)।

যিনি আত্মারাম তাঁর কর্ম করার কোন প্রয়েজন নাই। নিত্যকর্ম না করলেও তাঁর কোনও প্রত্যবায় হয় না। আবার কর্ম থেকে বিরত থাকারও প্রয়োজন নাই। সর্বভূতের কারোর সঙ্গ তাঁর কোনও প্রয়োজন – সম্বন্ধও নাই।

যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য। কৃত অর্থ যা করা হয়ে গেছে। আর কৃত্য মানে যা করা দরকার। কৃতকৃত্য অর্থ হল যা-যা কর্তব্য ছিল তা করা হয়ে গেছে। তিনি স্বয়ং পূর্ণকাম। তাঁর আবার কাজের কী প্রয়োজন? আর একটু বিশ্লেষণ করে বলছেন, 'কৃতেন তস্য অর্থঃ ন' – তাঁর আর কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। আবার 'অকৃতেন চ কশ্চন ন'—করা হয়নি করতে হবে, অকৃত, এমন কিছুও তাঁর নাই। কারণ তাঁর অভাববোধ নাই। আমাদের বাসনাই আমাদের কর্মের প্রেরণা। যার বাসনা নাই, অপূর্ণতা কিছু নাই, নিত্য কর্ম না করলেও তাঁর কোনও ত্রুটি বা প্রত্যবায় হয় না।

মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ। অভ্যুদয় অর্থ জাগতিক উন্নতি।

আর নিঃশ্রেয়স্ মানে যার থেকে বড় আর কিছু নাই। যিনি আত্মজ্ঞ, আত্মারাম তিনি নিঃশ্রেয়স্‌কেই পেয়ে বসে আছেন। যা পেলে মনে হয়, সব পাওয়া হয়ে গেছে, তিনি তা পেয়ে গেছেন। তাঁর সব প্রয়োজন মিটে গেছে। আর অন্য কিছুর দরকার নাই। 'সর্বভূতেষু কশ্চিৎ ব্যপাশ্রয়ঃ ন' – আব্রহ্মস্তম্ব সর্বভূতে অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত কারও সঙ্গে তাঁর আর কোনও প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই। কোনও লেনদেনের ব্যাপার নাই। সুতরাং আত্মজ্ঞ পুরুষের কর্ম করা বা না করা উভয়ই সমান। একমাত্র তাঁর পক্ষেই কোনও স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া কাজ করা সম্ভব। দেহ যতদিন থাকে ততদিন কাজ করতেই হবে। তবে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর মধ্যে তফাত হল, অজ্ঞানী যে-কাজ 'আমার কর্ম' বোধে করে, জ্ঞানী জানেন, সেই কর্মের কর্তা, স্বয়ং ঈশ্বর। আর তিনি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন তাঁর ভাব কী জান? আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।' জ্ঞানী পুরুষ জানেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, আবার কর্মও তাঁর। তিনি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র—তাই তিনি অনাসক্ত হয়ে যথাপ্রাপ্ত কর্ম করে যান। যদিও আত্মারাম পুরুষের কর্মের দ্বারা কিছু লাভ করার নাই কারণ তিনি পূর্ণকাম, তা বলে তিনি কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ তাঁর সব কর্মই লোকসংগ্রহার্থ। শ্রীভগবানই বলেছেন, তিনি সর্বদা লোককল্যাণের জন্য কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর কর্মের বিরাম নাই। মুক্ত পুরুষেরাই ঠিক ঠিক জনহিতকর কার্য করেন। মুক্তপুরুষের কাছে কর্মত্যাগ ও কর্মের অনুষ্ঠান উভয়ের প্রয়োজন নাই। তাই তাঁরা কর্মত্যাগের প্রতি আগ্রহ না দেখিয়ে যথাপ্রাপ্ত মঙ্গল কর্ম করেন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ।। ১৯

তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত হয়ে) সততং (সর্বদা) কার্যং কর্ম (কর্তব্যকর্ম) সমাচর (সম্যকরূপে অনুষ্ঠান কর) হি (যেহেতু) পুরুষঃ (মানুষ) অসক্তঃ (নিষ্কাম হয়ে) কর্ম (কর্ম) আচরন্ (অনুষ্ঠান করলে) পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)।

অতএব তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা নিজ কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান কর। নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।

সর্বদা তোমরা কর্তব্যকর্ম করে যাও, কিন্তু অনাসক্তভাবে। অনাসক্তভাবে করতে পারলে তার দ্বারাই মানুষ পরমার্থ লাভ করে। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার অর্থ—কর্মের ফলে আকাঙ্ক্ষা না করা। নিষ্কামভাবে কাজ করে যাওয়া। কর্মযোগ মানে নিষ্কাম কর্মযোগ। নিষ্কামভাবে কাজ করলে সেটাই ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। যে-কাজ ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে করি সেই কাজের জন্যই আমাদের বন্ধন হয়। এই অর্থে যে, সেই কর্মের ফল আমাকে ভোগ করতে

হয়। কিন্তু কেউ যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে কাজ করে, তাহলে সেই কাজের জন্য তার কোনও বন্ধন হয় না।

ভগবান বলছেন, যেহেতু কর্মত্যাগের চেয়ে কর্ম অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়, তাই জগচ্চক্র অনুসরণ করে সকলকেই যজ্ঞার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম করতে হয়। কর্ম না করে মানুষ থাকতে পরে না, থাকা উচিতও নয়। সুতরাং কাজ যখন করতেই হবে তখন 'অসক্তঃ' অর্থাৎ ফলে অনাসক্ত হয়ে, পরার্থে কাজ করা কর্তব্য। বিনিময়ে কিছু চাই না – নামযশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধনদৌলত, পদমর্যাদা, কিছু না। সেবা করতে পারছি এ আমার সৌভাগ্য। করতে পেরে ধন্য হয়ে যাচ্ছি, এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। এভাবে পরার্থে কর্ম করতে করতে কী হয়? চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হয়ে জ্ঞান লাভ হলে 'পরম্ আপ্নোতি' মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। 'পুরুষঃ' তিনিই আদর্শ পুরুষ যিনি এভাবে কাজ করতে পারেন।

উচ্চতর সত্যলাভ করার পূর্বে ও পরে নিষ্কাম কর্মসাধনই গূঢ় রহস্য। তিনিই আদর্শ পুরুষ যিনি কর্ম থেকে বিরত না থেকে অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ না করে জগতের জন্য, লোকসংগ্রহার্থে সর্বদা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন। অতএব হে অর্জুন, তুমিও মুক্তপুরুষগণের ন্যায় অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য- কর্ম সম্পাদন করলে, তুমি পরমপুরুষ ঈশ্বর লাভ করবে।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ।। ২০

জনকাদয় (জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ) কর্মণা এব হি (নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (সিদ্ধি, মোক্ষ) আস্থিতাঃ (লাভ করেছিলেন) লোক-সংগ্রহম্ এব অপি (লোককল্যাণের দিকেই) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রেখে) (তোমার) কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করা কর্তব্য)।

জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ নিষ্কাম কর্ম করেই মোক্ষলাভ করেছিলেন। সুতরাং লোককল্যাণের জন্যও অর্থাৎ মানুষকে সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক তোমার নিষ্কাম কর্ম করা উচিত।

নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে জনকাদি রাজর্ষিরা মোক্ষ লাভ করেছিলেন। জনক রাজা জীবন্মুক্ত পুরুষ। তিনি এক হাতে জ্ঞানের অসি, আর এক হাতে কর্মের অসি ঘোরাতেন। জীবন্মুক্ত মানে যিনি আত্মাতেই নিত্যতৃপ্ত। যাঁর কোনও কামনা-বাসনা নেই । বাইরের কোনও বস্তু যাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না। 'জনকাদয়ঃ' বলতে জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি প্রভৃতি শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে প্রসিদ্ধ রাজর্ষিদের বোঝানো হয়েছে। জনক রাজা বলতেন, 'আমি মিথিলার অধিপতি, বিপুল বিত্তের অধিকারী। কিন্তু সমগ্র মিথিলা যদি আগুনে পুড়েও যায় তাতেও আমার কোনও আপশোস নেই ।' এই হল পূর্ণ অনাসক্তি - সব করছি, কিন্তু 'আমি কর্তা' বোধ নেই । এই অবস্থাই জ্ঞানীর যথার্থ নৈষ্কর্ম্য অবস্থা।

শুধু কর্মত্যাগ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করা যায় না। এই অবস্থায় পাপ-পুণ্য বলে কিছু থাকে না।

আবার জ্ঞান লাভের পরও জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজারা 'লোকসংগ্রহার্থ' কাজ করতেন। সমাজে মানুষকে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করে সৎপথে চালনা করাই 'লোকসংগ্রহ'। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা কাজ করতেন । নিজেদের কোনও প্রয়োজনে কাজ করতেন না। কিন্তু তাঁরা অলস হয়েও বসে থাকতেন না। ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ লোক হিতার্থ কর্ম করতেন। তাঁরাই ধর্মের ধারক, সমাজের অন্যান্য লোক তাঁদের জীবন দেখে শিক্ষালাভ করে। স্ব স্ব ধর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই ভাবেই তাঁরা সমাজকে ন্যায়পথে চালিত করেন। জগতে তাঁরা একটা আদর্শ রেখে যান।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে নিষ্কাম কর্ম করার উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ প্রত্যেক মানুষেরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য। জনকাদি ক্ষত্রিয়রাজগণ আদর্শ পুরুষ তাই অর্জুনের কর্তব্য তাঁদের আদর্শে স্বধর্মোচিত নিষ্কাম কর্ম করা। অপরদিকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করে, শ্রেষ্ঠত্ব লাভপূর্বক জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, অপর মানুষদের স্বধর্মোচিত কর্মের পথে অনুপ্রাণিত করাই জগতের কল্যাণ।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।। ২১

শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যা যা) আচরতি (আচরণ করেন) ইতরঃ (অন্য সাধারণ লোক) তৎ তৎ এব (সেই সেই) [আচরণ করে] সঃ (তিনি) যৎ (যা) প্রমাণং (প্রামাণ্য মনে করে) কুরুতে (অনুষ্ঠান করেন) লোকঃ (অন্য লোক) তৎ (তাই) অনুবর্ততে (অনুসরণ করে)।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাই করে। তিনি যা প্রামাণসিদ্ধ বা কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন, সাধারণ লোক তারই অনুসরণ করে।

জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে যাঁরা বিশিষ্ট, সমাজের শীর্ষস্থানীয় সেইসব মহাজনদেরই এখানে 'শ্রেষ্ঠ' ব্যক্তি বলা হয়েছে। তাঁদের জ্ঞানের প্রভায় সমাজ প্রভাবিত হয়। 'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ' মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণই সমাজের রীতি। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরকম আচরণ করেন, 'ইতরজনাঃ' অর্থাৎ সাধারণ মানুষও সেইরকম আচরণ করে। শুধু ধর্মকর্ম নীতি নয়, আচার -ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, এক কথায় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সব বিষয়েই এই কথা সত্য। রাজা বা সমাজপতি যে আদর্শ স্থাপন করেন, প্রজারা তাকেই প্রমাণ করে। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসারেই লোকব্যবহার চলতে থাকে। অতএব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনেক বিচার করে চলতে হয়। তাঁরা যদি কর্মত্যাগ করেন তবে অন্যান্য লোকও তাঁদের অনুসরণ করবে। ফলে সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বহু লোকের আদর্শস্থল। তুমি যদি স্বধর্ম পালন না কর, কাপুরুষের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাও, তবে সমাজের কী দশা হবে ? ক্ষাত্রধর্মের পতন হবে। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধত্যাগ শাস্ত্রবিরোধী কাজ। সেই কাজ করে তুমি সমাজকে বিপথে চালিত করবে। সাধারণ মানুষ অজ্ঞান, তাই আদর্শ কর্তব্য নীতি তারা সঠিক নির্ণয় করতে পারে না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচরণের আদর্শ তাদের সামনে না থাকলে সহজেই তারা অন্ধকার পথে ধ্বংসমুখে পতিত হবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই সমাজের অগ্রগামী ও সাধারণ মানুষের নেতা, তাঁরাই দেখাতে পারেন কোন আদর্শ ধর্মনীতি মানবজাতিকে অনুসরণ করতে হবে। হে অর্জুন, তুমিই আগামী দিনের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ।। ২২

পার্থ (হে অর্জুন) ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) মে (আমার) কিঞ্চন (কোনও মাত্র) কর্তব্যং (কর্তব্য) নাস্তি (নেই) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং চ (এবং প্রাপ্তব্য) ন (কিছুই নাই) (তথাপি) কর্মণি এব (কর্মেই) বর্ত (ব্যাপৃত আছি)।

হে পার্থ, স্বর্গমর্ত্যাদি এই তিন লোকে আমার করণীয় কিছু নেই এবং আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নেই। তথাপি আমি লোককল্যাণের নিমিত্ত সবসময় কর্মে ব্যাপৃত আছি। কর্মত্যাগ করিনি।

ভগবান যে অবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হন, তাঁর সেই নিজের আদর্শ অর্জুনের সামনে তুলে ধরলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকে যা কিছু পাওয়ার তা আমি সব পেয়ে গেছি। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নাই । এমনকি ভবিষ্যতেও আমার আর পাওয়ার কিছু নাই অর্থাৎ প্রাপ্তব্য কিছু নাই'। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁর আবার কিসের অভাব? মানুষ যা যা পেতে চায় সে সবই তাঁর করায়ত্ত। সব তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর নিজের কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব, তাঁর কোনও কর্তব্যও নাই। তাই বলছেন, অর্জুন, দেখ, আমার কোনও কর্তব্য নাই। তবু আমি কর্ম ত্যাগ করিনি। অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছি। নিজের জন্যে করছি না, পরার্থে করছি।

ভগবান পূর্বে বলেছেন, আত্মতৃপ্ত, আপ্তকাম ব্যক্তির কোনও বস্তুতে প্রয়োজন নাই বা কর্তব্য কর্ম নাই। ভগবান সর্বাপেক্ষা আত্মতৃপ্ত, আত্মকাম হয়েও অনলস হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত রয়েছেন। অতএব ভগবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আত্মতৃপ্ত, আত্মকাম ও সকলের পক্ষে কর্তব্যকর্ম করাই উত্তম।

অবতার কেন আসেন? সেকথা শঙ্করাচার্য সুন্দরভাবে বলছেন 'স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি' তাঁর নিজের কোনও অভাব নেই, নিজের কোনও প্রয়োজন নেই। 'ভূতানুজিঘৃক্ষয়া' - ভূত মানে প্রাণী, প্রাণীদের অনুগ্রহ করার জন্য, মানুষকে অনুগ্রহ করার জন্য অবতার

আসেন। তাঁর একমাত্র প্রয়োজন লোককল্যাণ – 'লোকসংগ্রহার্থং'। কাজেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অবতারের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি নিঃশ্বাস – প্রশ্বাস, প্রতিটি আচরণ হচ্ছে লোককল্যাণের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি অবিরাম কাজ করে চলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেনঃ ঈশ্বরের নানা রূপ, নানা লীলা। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যুগে যুগে আসেন। প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই শ্রীভগবানের প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।। ২৩

পার্থ (হে অর্জুন) যদি (যদি) অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসভাবে) কর্মাণি (কর্মে) ন বর্তেয়ং (প্রবৃত্ত না হই) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম (আমার) বর্ত্ম হি (পথই) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করবে)।

হে পার্থ, আমি যদি অনলসভাবে কর্ম না করি, তবে সব মানুষ সর্বতোভাবে আমারই জীবন অনুসরণ করবে (অর্থাৎ অলস হয়ে কর্মত্যাগ করবে) ।

শ্রীকৃষ্ণ আগে বলেছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা লোকহিতার্থে কাজ করবেন। জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাও লোকরক্ষার জন্য কর্ম করতেন। কিন্তু তাঁরা কর্ম না করলে কী হবে তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন।

ব্যক্তি বা সমাজ স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ আমি যদি কর্ম না করি, 'অতন্দ্রিতঃ' তন্দ্রাহীন অনলসভাবে কাজ না করি, তবে লোকে বিভ্রান্ত হবে। তারা আমাকে ভুল বুঝবে। আমাকে অনুকরণ করবে। আমাকে দেখিয়ে বলবে : 'উনি তো আমাদের নেতা, পথপ্রদর্শক। উনি যদি এরকম অলস জীবন যাপন করেন তাহলে আমরা কেন কাজ করব?' সেইজন্যই মহৎ ব্যক্তিদের উচিত সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে লোককল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়া।

সমাজে প্রতিটি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হয়। বর্ণাশ্রম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যয়ন–অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকরক্ষা, নীতিরক্ষা, সমাজ রক্ষা – এককথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। কৃষি, ব্যবসা–বাণিজ্য ও টাকার লেনদেন করেন বৈশ্য। আর শূদ্রের কাজ হল অপর তিন বর্ণের সেবা। এইসকল কর্তব্যকর্ম না করে সবাই যদি নেতার অনুসরণে কর্মত্যাগ করে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। শ্রীকৃষ্ণ সেকথাই বলতে চাইছেন ।

অবতারপুরুষগণ মানবদেহে অবস্থানকালে তাঁদের জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত যা-কিছু কাজ করেন সবই জীবকল্যাণের জন্য এবং তাঁরা অক্লান্তকর্মা। তাঁদের সাধন-ভজন, ত্যাগ-তপস্যা, ধর্মাচরণ-এমনকী দুষ্টের দমনের জন্য যে-যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে থাকে, সে সব কিছু প্রচেষ্টার পেছনেও থাকে একমাত্র জীবকল্যাণের ইচ্ছা। তাঁদের সব কর্মই লীলা। যদিও তাঁরা সাধারণের মতো ব্যবহার করেন এবং রোগ-শোক, হাসি-কান্না, বিরহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি অবস্থার মধ্য দিয়ে যান। কিন্তু সব অবস্থাতেই তাঁরা যে স্বয়ং ঈশ্বর, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই লৌকিক ব্যবহারাদি করেন। এইটি হল তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্য। তাঁদের লৌকিক অলৌকিক সব কর্মদ্বারাই লোককল্যাণ সাধিত হয়।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্‌।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ।। ২৪

চেৎ (যদি) অহম্‌ (আমি) কর্ম (কর্ম) ন (না) কুর্যাম্‌ (করি) ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসকল) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হয়ে যাবে, বিনষ্ট হবে) সঙ্করস্য চ (এবং বর্ণসঙ্করের) কর্তা স্যাম্‌ (কর্তা হব) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (জীবসকল) উপহন্যাম্‌ (বিনাশের কারণ হব)।

যদি আমি কর্ম না করি তবে (লোকস্থিতিকর কর্মের অভাবে) এই সকল লোক উৎসন্নে যাবে। ফলে আমি বর্ণসঙ্করাদি সামাজিক বিশৃঙ্খলার হেতু হব এবং তার ফলস্বরূপ প্রজাগণের বিনাশের কারণ হব।

সমাজে প্রত্যেকের একটা কর্তব্য আছে। একটা কাজ ঠিক করে দেওয়া আছে – যার যা যোগ্যতা, যার যা স্বধর্ম, যার যা রুচি সেই অনুযায়ী। সমাজ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। সেই নিয়ম আদর্শ না হতে পারে, শ্রেষ্ঠ না হতে পারে, তবুও একটা শৃঙ্খলা থাকে। আমি হয়তো একজন কেরানি। আপনি বুদ্ধিজীবী। কিন্তু প্রত্যেককে তার নির্দিষ্ট কর্ম সুষ্ঠুভাবে করতে হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : আমি যদি কাজ না করি, যে নিষ্কাম কর্মযোগের পথ আমি দেখাচ্ছি তা অনুসরণ না করি, তবে সবাই আমার দেখাদেখি কর্ম ত্যাগ করবে। স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। সমাজব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যাবে। প্রজারা উচ্ছন্নে যাবে। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমি যে-আদর্শ, যে- নীতির প্রতিষ্ঠা করব লোকেরা তারই অনুসরণ করবে। লোকে স্বধর্মোচিত কর্মে প্রবৃত্ত আছে বলেই সমাজ টিকে আছে, সমাজে শৃঙ্খলা বর্তমান আছে। তারা কর্ম ত্যাগ করলে সমাজ ভেঙে যাবে, যে ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা সমাজকে রক্ষা করছে তা নষ্ট হবে, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবে, তারা ধর্ম হতে বিরত হয়ে ক্রমশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হবে। 'সঙ্কর' শব্দের অর্থ পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থের মিলন বা মিশ্রণ এবং তার ফলস্বরূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সমাজের লোকেরা তাদের স্বধর্মোচিত কর্ম ত্যাগ করলে, সামাজিক নীতি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। বর্ণসঙ্কর,

ধর্মসঙ্কর, কর্মসঙ্কর ইত্যাদি নানাভাবেই এই বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক বিশৃঙ্খলার ফল ধর্মলোপ। ধর্মলোপে প্রজাদের সমূহ বিনাশ।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্‌ ।।২৫

ভারত (হে অর্জুন) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞানীরা) কর্মণি (কর্মে) সক্তাঃ (আসক্ত হয়ে) যথা (যেরূপ) কুর্বন্তি (কর্ম করে) বিদ্বান্‌ (জ্ঞানী) অসক্তঃ (অনাসক্ত হয়ে) লোকসংগ্রহম্‌ (লোককল্যাণ) চিকীর্ষুঃ (করবার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্যাৎ (কর্ম করবেন)।

হে অর্জুন, অজ্ঞ ব্যক্তিরা আসক্ত হয়ে যে-কর্ম করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত হয়ে লোকশিক্ষার জন্য সেই কর্মই করবেন।

সমাজে দু-ধরনের লোক আছে। একদল লোক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। তাঁরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু তাঁরা সবসময় কাজ করেন। কেন করেন? লোকহিতার্থং – অপরের মঙ্গলের জন্য, নিজের জন্য নয়। আরেক দল মানুষ আছেন যাঁরা স্বার্থপর, অজ্ঞান। দিনরাত নিজের স্বার্থ ছাড়া তাঁরা আর কিছু ভাবেন না।

এই উভয় প্রকার (অর্থাৎ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী) লোকই কর্ম করেন। লৌকিক দৃষ্টিতে মনে হবে উভয়ের কর্মেও কোনও তফাত নেই, সাধারণ মানুষ যে-কাজ করছেন জ্ঞানী ব্যক্তিও সেই একই কাজ করছেন। এমনকী দেহরক্ষাদির ক্ষেত্রেও। তফাত কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। অজ্ঞ ব্যক্তি কাজ করেন নিজের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, জ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সেই কাজই ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে লোককল্যাণার্থে করে থাকেন। সব কর্মই নিষ্কামভাবে করেন, তাই তাঁদের সব কর্মই যজ্ঞ বা পূজা এবং তাতে লোককল্যাণ সাধিত হয়।

জ্ঞানী জানেন তিনি কর্মের কর্তা নন, প্রকৃতিই কর্ম করছে। তিনি ইন্দ্রিয় নন, মন নন, তিনি আত্মা। তিনি সম্পূর্ণ অহংকারশূন্য হয়ে কর্ম করেন বলে কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না, কিন্তু অজ্ঞানী অহংকারবশত নিজেকে কর্তা মনে করে, ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করে কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জ্ঞানী ভগবানের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছা এবং ভগবানের কর্মই তাঁর কর্ম মনে করেন। নিজের জীবনে কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, অজ্ঞ লোকদের আধ্যাত্মিক পথে চালিত করাই, লোকসংগ্রহই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলিতে সাধুদের দেখা যায়—হিসাব লিখছেন, টাইপ করছেন, ছাত্র পড়াচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, বই বিক্রি করছেন, প্রয়োজনে মামলা-মোকদ্দমাও করছেন। বাহ্যত সবই লৌকিক। কিন্তু তাঁরা সব কাজই করেন ঈশ্বরের উদ্দেশে। পরহিতার্থে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শে। এই নিষ্কাম

কর্মযোগ শুধু তাঁদের সাধনার অঙ্গ (আত্মানো মোক্ষার্থং) নয়, এর দ্বারা জগতেরও মঙ্গল (জগদ্ধিতায় চ) হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এখানে 'ভারত' বলে সম্বোধন করছেন। এই সম্বোধন উদ্দেশ্যমূলক, 'ভারত' অর্থ 'ভা' বা জ্ঞানে 'রত'। বলতে চাইছেন : তুমি যদি আনন্দ চাও, শান্তি চাও, আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাও তবে মন থেকে সব স্বার্থচিন্তা মুছে ফেল। নিষ্কামভাবে ধর্মের জন্য যুদ্ধ কর। তাহলে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান হবে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ।। ২৬

কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞ ব্যক্তিদের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ, বুদ্ধির ভ্রম) ন জনয়েৎ (জন্মাবে না) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) যুক্তঃ (অবহিত চিত্তে, সতর্কতার সঙ্গে) সর্বকর্মাণি (সকল কর্ম) সমাচরন্ (অনুষ্ঠান করে) (অজ্ঞানীদের) জোষয়েৎ (কর্মে নিযুক্ত রাখবেন)।

জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না। নিজেরা অবহিতচিত্তে অর্থাৎ সতর্ক হয়ে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করে, অজ্ঞানীদের কর্মে নিযুক্ত রাখবেন।

যাঁরা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ তাঁরা অন্যদের ভুল পথে চালিত করবেন না। তাদের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাবেন না। সমাজের যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁদের লোকে অনুসরণ করে। মহৎ ব্যক্তিদের সমাজের প্রতি একটা কর্তব্য আছে, একটা ঋণ আছে। এমন কিছু তাঁরা করবেন না যাতে তাঁদের আশেপাশের লোক বিভ্রান্ত হয় – 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ।'

তারপর বলছেন 'অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' – আশেপাশে যারা আছে তারা অজ্ঞান, খুব বিচক্ষণ নয়। তারা সকাম কর্মে আসক্ত। তারা ফললাভের আশায় বিবিধ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম করে থাকে। তারা জানে কিছু নিষিদ্ধ কর্ম করলে পাপ হয় এবং কিছু শুভ কর্ম করলে পুণ্য হয় এবং পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গাদি বাস, এই আশায় তারা পাপকর্ম বর্জন করে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকে। এর অতিরিক্ত যে মোক্ষলাভ বা ঈশ্বরলাভ আছে, তার ধারণা তারা করতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি যেন তাদের কাছে কর্মত্যাগই মুক্তির উপায় বা কর্মের অসারতার কথা না বলেন। 'জগৎ মিথ্যা, তোমরা কাজ করছো কেন' – এই উপদেশ যেন না দেন। এতে তাদের মহা অনিষ্ট হবে। কারণ কাজ করতে-করতেই অজ্ঞ ব্যক্তিদের চিত্তের মলিনতা দূর হয় এবং ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্মের প্রতি নিষ্ঠা আসে। অতএব বড় বড় কথা বলে তাদের ঘাবড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাহলে কী করা উচিত? 'জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি'—জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানুষকে কর্মে উৎসাহ দেবেন। 'বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্' – বিচারশীল, সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সাবধানে চলাফেরা করবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্মত্যাগ করবেন না, তাঁরা নিজেরা অনাসক্ত হয়ে, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত

হয়ে সকল কতর্ব্যকর্ম অনুষ্ঠান করবেন। তা হলে অজ্ঞানীগণও কর্মত্যাগ করবে না, পরন্তু জ্ঞানীর নিষ্কাম ভগবৎ কর্ম দেখে তারাও নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের শিক্ষালাভ করবে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ।। ২৭

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির, মায়ার) গুণৈঃ (গুণত্রয়ের দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বতোভাবে) কর্মাণি (সকল কর্ম) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হয়) অহংকার-বিমূঢ়-আত্মা (অহংকারে যার বুদ্ধি আচ্ছন্ন) অহম্ (আমি) কর্তা (কর্তা) ইতি (এই) মন্যতে (মনে করে)।

প্রকৃতির তিন গুণের সাহায্যে সর্বতোভাবে (লৌকিক ও আধ্যাত্মিক) সকল কর্ম সম্পন্ন হয়। (অথচ) অহংকারে যার বুদ্ধি আচ্ছন্ন (বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি), সে মনে করে 'আমিই কর্তা', আমি সব কিছু করছি।

সব মানুষের প্রকৃতি এক নয়। সকলের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রকৃতিই আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা – সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই গুণগুলি প্রকাশ হয় কর্মের ভিতর দিয়ে। সত্ত্বপ্রধান যিনি, তিনি শান্ত, ধীর, স্থির, বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করেন। চিন্তাশীল তিনি। আবার যিনি রজোগুণসম্পন্ন, তিনি সবসময় ছটফট করছেন। চঞ্চল। এটা করছেন, ওটা করছেন। আর তমোগুণী ব্যক্তি – অলস, ঝিমুচ্ছে। কিছু করতে চায় না। এইভাবে প্রকৃতির গুণ অনুসারে আমরা সব কর্ম করি। ভেতর থেকে কে যেন করায়। না করে উপায় নেই। এই প্রকৃতি কিন্তু আত্মা থেকে স্বতন্ত্র। আত্মা নিষ্ক্রিয়, অকর্তা, সাক্ষী। আত্মা কোনও কর্ম করেন না। মানুষের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ই কর্ম করে থাকে। যিনি একথা ঠিক ঠিক বুঝেছেন তিনি জানেন, 'আমি' কিছুই করি না, প্রকৃতিই করায়। অপরদিকে, যিনি প্রকৃতিকেই আত্মা বলে মনে করেন, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই আত্মার কর্ম বলে মনে করেন, তিনি মূঢ়। তিনি এই প্রকৃতিকেই অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম দেহ, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গুলিকে 'আমি' বলে মনে করেন। দেহ-মনে এই 'আমি'-বুদ্ধিই হল অহংকার। 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা' অর্থাৎ এই অহঙ্কারে যার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নিজেকে তিনি বুদ্ধিমান মনে করেন। একজন কেউকেটা বলে মনে করেন। তিনি জানেন, দেহ-মনের সমষ্টি এই 'আমি'ই সকল কর্মের কর্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'হাঁড়িতে আলু-পটল আছে। নীচ থেকে আগুন দেওয়া হয়েছে। জল ফুটে আলু-পটলগুলি লাফাচ্ছে। তারা মনে করছে আমরা নিজেরাই লাফাচ্ছি। আগুন সরিয়ে নিলে যেই কে সেই।' সেইজন্য শাস্ত্র আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। শস্ ধাতু থেকে শাস্ত্র। শস্ মানে শাসন করা, পরিচালিত করা। শাস্ত্র আমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, শিখিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ শিক্ষক। তিনি অর্জুনকে ভৎসনা করছেন। অর্জুনের সামাজিক কর্তব্য

আছে। সেকথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন : 'তুমি অহংকারবশে নিজেকে কর্তা বলে মনে করছ। বলছ, তুমি যুদ্ধ করবে না, ভিক্ষে করে খাবে। ভুলে যেও না, তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান। তুমি অন্যকে খাওয়াবে, তাদের প্রতিপালন করবে, এটাই তোমার কর্তব্য।'

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ।। ২৮

তু (কিন্তু) মহাবাহো (হে মহাবীর) গুণ – কর্ম – বিভাগয়োঃ (গুণ ও কর্মবিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও তাদের পরিণাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল) গুণেষু (গুণবিষয়ে অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়ে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত রয়েছে) ইতি মত্বা (এই জেনে) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না অর্থাৎ 'আমি কর্তা' এই অভিমান করেন না)।

কিন্তু হে মহাবাহো, যিনি তিন গুণ ও মন – বুদ্ধি – ইন্দ্রিয়াদির বিভাগ ও তাদের পৃথক পৃথক কর্মবিভাগের তত্ত্ব জেনেছেন, তিনি ইন্দ্রিয়গুলি তৎ তৎ ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে জেনে কর্মে আসক্ত হন না (অর্থাৎ 'আমি কর্তা'—এই অভিমান করেন না)।

'গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ' – অর্থাৎ যিনি গুণ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানেন। প্রকৃতির তিন গুণের (সত্ত্ব,রজঃ ও তমোর) পরিণাম দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। তাদের বিভাগকে যিনি জানেন তিনি গুণবিভাগের তত্ত্ববিৎ। আর যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পৃথক পৃথক কর্মবিভাগকে জানেন তিনি কর্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের-বিষয়ের সংযোগই কর্ম। যাঁরা তত্ত্ববিৎ তাঁরা জানেন যে, আমাদের সব কর্মই প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রকৃতির তিন গুণের ক্রিয়া মাত্র। 'গুণা গুণেষু বর্তন্তে' – ইন্দ্রিয়রূপে (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইত্যাদি) পরিণত প্রকৃতিগুণ বিষয়রূপে (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি) পরিণত প্রকৃতিগুণে যুক্ত হয়ে কর্ম করে। কিন্তু আত্মা গুণ ও কর্ম থেকে ভিন্ন – নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, সাক্ষীস্বরূপ। একথা জেনে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি 'আমি কর্তা'—এই অভিমান করেন না। তাই তিনি কর্মফলেও আসক্ত হন না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'মহাবাহো' বলে সম্বোধন করছেন। বলতে চাইছেন, তুমি বীর, তুমি শক্তিমান। তুমি তো তত্ত্ববিদ্, অজ্ঞ নও। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তার স্বভাব অনুসারেই চলুক। তুমি আর তাতে ইন্ধন জোগাবে না। তাকে আরও বাড়িয়ে তুলো না! যার মধ্যে যে-গুণ প্রবল সে সেই গুণ অনুসারে কর্ম করে। দেহ-মন-বুদ্ধি নিজের নিজের কর্ম করুক। কিন্তু তুমি নির্লিপ্ত থাক। কর্মফলে আসক্ত হয়ো না। গুণের দাস হয়ো না। তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা – একথা তুমি ভুলে যেয়ো না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, মানুষের মধ্যে দু-রকমের 'আমি' আছে—কাঁচা আমি ও পাকা আমি। কাঁচা আমি বন্ধনের কারণ। পাকা আমি জ্ঞানী, তত্ত্ববিদ্। শুধু কর্ম করলেই কর্মযোগী হয় না। কর্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি বর্জন করে কর্ম করলেই তবে তা কর্মযোগ। কর্মযোগী ও জ্ঞানীর গন্তব্যস্থান ও প্রাপ্তব্য বস্তু এক।

ভগবান বলছেন, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়ের যে সংযোগ তাই কর্ম। যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনি জানেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়, ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম করে। আবার যাঁর আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি তিনি মনে করেন আমিই কর্মকর্তা, আমিই ফলভোগী, তাই তিনি ফলের আশায় কর্মে আসক্ত হন।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ।। ২৯

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণ-সংমূঢ়াঃ (গুণের দ্বারা বিমোহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) গুণকর্মসু (গুণের কর্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে) সজ্জন্তে (আসক্ত হন) কৃৎস্নবিৎ (সর্বজ্ঞ, আত্মবিৎ) তান্ (সেই সকল) অকৃৎস্নবিদঃ (অল্পজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদেরকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করবেন না) ।

যাঁরা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়চিত্ত, তারা দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে আসক্ত হয় (অর্থাৎ ফলের জন্য আমরা কর্ম করি এই অভিমান করে)। জ্ঞানীরা এইসকল অজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের বিচলিত করবেন না (অর্থাৎ তাদের কর্মত্যাগের উপদেশ দেবেন না)।

যারা প্রকৃতির গুণে (অর্থাৎ প্রকৃতির বিকাররূপ দেহ,মন, ইন্দ্রিয়াদিতে) মোহগ্রস্ত, তারা দেহ-মনের সমষ্টিকেই 'আমি' বলে মনে করে। দেহ-মনের অতিরিক্ত নিজের স্বরূপকে তারা জানতে পারে না। যতদিন মানুষ গুণের পারে না যায় ততদিন সে অজ্ঞান। নিজেকে তখন সে সকল কর্মের কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। কর্মফলে আসক্ত হয়। তারা অজ্ঞ, অবিদ্বান, অকৃৎস্নবিদ্। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কম। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তারা বোঝে না। এইসব অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের চিত্তশুদ্ধি হয়নি। এদের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেনি। এদেরকে কৃৎস্নবিদ্ অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও ভুলপথে চালিত করবেন না – 'ন বিচালয়েৎ'। যাঁরা আত্মবিদ্ তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন না থাকলেও নিষ্কাম কর্ম করবেন। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও' – নিজে কর্ম করে তাঁরা অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্মে প্ররোচিত করবেন। তাই ভগবান বলছেন, জ্ঞানীগণ কর্মত্যাগ করে অজ্ঞানীদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না বা তাদের সকাম কর্মনিষ্ঠা হতে বিচলিত করবেন না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের অধীন হয়ে কর্ম করে থাকে। তাদের বিবেকবুদ্ধি নানা কামনাবাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। তারা আত্মতত্ত্বে অভিনিবেশ করতে পারে না এবং সমস্ত কর্মের কর্তা বা প্রকৃতির প্রভু যে পরমাত্মা আছেন এ-বিষয়ে তাদের

ধারণা আসে না। তারা জ্ঞানীদের নিষ্কামকর্ম করতে দেখে নিজেরাও নিষ্কাম কর্ম করার জন্য অনুপ্রাণিত হয় এবং ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হয়।

আসল কথাটা হল আমরা আমাদের প্রকৃতিকে বশ করব। নিজ প্রকৃতির দ্বারা, স্বভাবের দ্বারা, প্রবণতার দ্বারা, মানুষ সম্মোহিত হয়ে আছে। এই দুর্বলতাকে জয় করতে হবে। তবেই মানুষের মধ্যে যে অসীম শক্তি তার প্রকাশ ঘটবে। আত্মজ্ঞান লাভ হবে।

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।। ৩০

সর্বাণি (সকল) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে) সংন্যস্য (সমর্পণ করে) অধ্যাত্ম-চেতসা (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্মমঃ (মমতাহীন) বিগত-জ্বরঃ (শোকশূন্য) ভূত্বা (হয়ে) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।

পরমেশ্বরের জন্য কর্ম করছি - এইরূপ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা আমাতে (পরমেশ্বরে) সমস্ত কর্ম অর্থাৎ কর্মফল সমর্পণ করে কামনা ও মমতাশূন্য এবং শোকমোহবর্জিত হয়ে তুমি যুদ্ধ কর ।

এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'সর্বাণি কর্মাণি' লৌকিক ও বৈদিক, ভালো ও মন্দ সকল প্রকার কর্ম, 'ময়ি সংন্যস্য' আমাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ কর। তারপরে বলছেন, 'অধ্যাত্মচেতসা' অর্থাৎ অধ্যাত্মবুদ্ধিতে কাজ কর। ভৃত্য রাজার অধীনে থেকে তাঁর জন্য যেমন কাজ করে, ঠিক তেমনি পরমেশ্বরের অধীনে থেকে, তাঁর জন্যই সমস্ত কাজ করতে হবে। যিনি এই মনোভাব নিয়ে কাজ করেন তিনি কখনো কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়েন না। এই সদ্বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে যে কাজ করা হয় তাই নিষ্কাম কর্ম। 'নিরাশীঃ' কোনও কিছু আশা করছি না। ভক্ত ভগবানকে বলছেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে কত কী দিতে পার। কিন্তু আমি কিছুই চাই না। কোনও কিছুর প্রতি আমার কোনও লোভ, মোহ নেই। অর্থাৎ আমি তোমার কাছে কোনও কিছুর প্রার্থী নই । তবে হ্যাঁ, আমি কেবলমাত্র তোমাকে চাই।' ভক্তের ভাবটি হল : যা দেবার তা তিনিই দেবেন। তাঁর কাছে চাইতে যাব কেন? 'নির্মমঃ' কোনও মমত্ববুদ্ধি নেই । অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' বলে কিছু নেই। আমার আমিত্বকে একেবারে মুছে ফেলেছি। ঠাকুর বলছেন, 'নাহং, তুহুঁ' - 'আমি নই, সব তুমি'। আমার 'আমি'র জায়গায় প্রভু তোমাকেই বসিয়েছি। ভক্ত বলছে : 'ভগবান, আমি শিশু। আমি কিছু বুঝি না, জানি না, জানতেও চাই না। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।' যিনি এইভাবে কাজ করেন তিনি 'বিগতজ্বরঃ' অর্থাৎ শোকসন্তাপ থেকে মুক্ত। কামনাযুক্ত হয়ে কাজ করলে সুখ ও দুঃখ দুই - ই ভোগ করতে হয়। কাজে সফল হলে সুখ,ব্যর্থ হলে দুঃখ। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে

বলছেন, তুমি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে, কামনা-বাসনা, হর্ষ-শোক ইত্যাদি ত্যাগ কর। ধর্মরক্ষার্থে যুদ্ধ কর।

প্রকৃত কর্মযোগীর লক্ষণ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয় করা। এই শ্লোকে এই তিনেরই সমন্বয় হয়েছে। যিনি 'ঈশ্বরার্থং' অর্থাৎ সব কাজ ঈশ্বরে সমর্পণ করে, তাঁর উদ্দেশেই কাজ করেন, তিনি পরম ভক্ত। সুতরাং এখানে কর্মত্যাগেই ভক্তিযোগ। আবার যিনি সম্পূর্ণরূপে 'আমি' ও 'আমার' বোধ ত্যাগ করে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনিই পরম জ্ঞানী। সুতরাং কর্মযোগেই জ্ঞানযোগ ।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন, ঈশ্বর সব কিছুরই কর্তা, আমি তাঁরই ভৃত্যস্বরূপ হয়ে কাজ করছি—এইভাবে বিচারশীল হয়ে, চিত্তকে আত্মস্থ করে কাজ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই ভাবটি সাধক রামপ্রসাদের গাওয়া একটি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন: 'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।' ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে যিনি সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত কর্মযোগী। কর্মযোগী হতে গেলে আত্মাভিমানও ত্যাগ করতে হবে। এ-প্রকার ত্যাগের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যিনি নিষ্কামভাবে নিত্যনৈমিত্তিক ও লৌকিক কর্ম এবং পূজা-অর্চনা, সেবা-বন্দনা, দান-ধ্যান ও তপস্যাদি সর্ববিধ কর্ম 'আত্মসংস্থ' হয়ে করেন তিনিই কর্মযোগী। এভাবে কর্ম করার মধ্যেই নিহিত আছে—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমিই সেই পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম। আমিই প্রকৃতির সকল কর্মের প্রভু ও ভোক্তা। হে অর্জুন, তুমি আমাকেই তোমার সকল কর্ম সমর্পণ কর। নিজেকে তোমার কর্মের কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে না করে আমাকেই কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে সকল কর্ম সম্পাদন কর। এটিই হলো প্রকৃত কর্ম-সমর্পণ। আমাতে কর্ম ও কর্মফল সমর্পণ করে তোমার স্বধর্মোচিত সমুদয় কর্ম সম্পন্ন করলে, তাতে তোমার চিত্তে কোনো প্রকার দুঃখ, শোক বা সন্তাপ থাকবে না।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ।। ৩১

যে (যে সকল) মানবাঃ (মানুষরা) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়াশূন্য হয়ে) মে (আমার) ইদং (এই) মতম্ (মত) নিত্যম্ (সবসময়) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করেন) তে অপি (তাঁরাও) কর্মভিঃ (কর্মবন্ধন থেকে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)।

যে-সকল মানুষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য হয়ে আমার এই মতের (নিষ্কাম কর্মযোগ) অনুষ্ঠান করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

প্রকৃত নিষ্কামকর্মযোগ করতে গেলে একদিকে শ্রদ্ধাবান হওয়া অপরদিকে অসূয়াশূন্য

হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং একে অপরের পরিপূরক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'মে ইদং মতম্'—এই আমার মত। এখানে 'আমার মত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করা। বস্তুত প্রচলিত সন্ন্যাসবাদকে লক্ষ করেই উপরোক্ত কথাগুলি বলা হয়েছে। সন্ন্যাসীরা বলেন, কর্মই বন্ধনের কারণ। সুতরাং কর্মত্যাগেই মুক্তি। কিন্তু শাস্ত্রে আছে 'মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মণাং' – অর্থাৎ একমাত্র মানুষই কর্মের অধিকারী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কর্মত্যাগ করা জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কর্মত্যাগে সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সুতরাং নিষ্কামভাবে কাজ করাই একান্ত কর্তব্য। তাই এখানে গীতাকার বলছেন : নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য হয়ে আমার মতকে অনুসরণ কর। তাহলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। 'শ্রদ্ধাবন্তঃ' অর্থ যাঁরা শ্রদ্ধাবান। শাস্ত্র ও গুরু যে-উপদেশ দিয়েছেন তা হয়তো এই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারিনি, কিন্তু এই উপদেশ অভ্রান্ত—এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে – এরই নাম শ্রদ্ধা। আবার 'অসূয়ন্তঃ' কথাটির অর্থ হল অন্যের গুণে দোষ দেখার স্বভাব। অর্থাৎ ভগবান আমাদের দুঃখজনক কর্মে লিপ্ত করেছেন। তিনি নির্দয়। এই দোষদৃষ্টিই অসূয়া। যাঁর এই দোষদৃষ্টি নেই তিনি 'অনসূয়ন্তঃ'। শ্রীমা সারদাদেবীর উপদেশ, 'যদি শান্তি চাও মা, তবে কারো দোষ দেখো না।'

আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। একটা হল নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করা, আরেকটা হল : প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক। তুমি যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি। তুমি যন্ত্রী। আমি তোমার হাতের যন্ত্রস্বরূপ।—এই মনোভাব নিয়ে নিষ্কামভাবে কাজ করা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : যারা আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আমিই যাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, কর্মের শৃঙ্খল তাদের বদ্ধ করতে পারবে না। জ্ঞানীরা তো মুক্ত হতে পারেনই। আবার প্রকৃত নিষ্কাম কর্মযোগীরাও কর্মের মধ্য দিয়েই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। ভগবান দৃঢ়ভাবে বলছেন, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হবেই। আবার যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁরাও 'নিরাশী, নির্মম, বিগতজ্বর' (নিষ্কাম, মমত্ববোধশূন্য, শোকশূন্য) হয়ে সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরে সমর্পণপূর্বক লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করবেন। সেই কর্মে তাঁদের কর্মবন্ধন হয় না, তাঁরা মুক্তপুরুষ। তাই কর্মত্যাগ না করে, কর্ম করেই, কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ।। ৩২

তু (কিন্তু) যে (যারা) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্ (মতকে) অভ্যসূয়ন্তঃ (নিন্দা করে) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না) তান্ (সেই) অচেতসঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণকে) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সকল জ্ঞানরহিত) নষ্টান্ (বিনষ্ট, পরমার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানবে)।

কিন্তু যারা আমার এই মতের নিন্দা করে এবং নিষ্কাম কর্মের অনুসরণ করে চলে না, সেই-সকল অবিবেকী সর্বজ্ঞানবর্জিত ব্যক্তিদের বিমূঢ় ও বিনষ্ট বলে জেনো।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, একদল লোক আছে যারা আমার কথা শোনে না। আমার মত নিয়ে চলে না। বরং বলে বেড়ায় সব দোষ ভগবানের। তাদের কী হয়? 'সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্'—তাদের সব জ্ঞানবুদ্ধি যেন হারিয়ে গেছে, লোপ পেয়ে গেছে। 'নষ্টান্ বিদ্ধি' – তাদের বুদ্ধিনাশ হয়েছে বলে জেনো। অর্থাৎ তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। উদ্ধারের আর কোনও উপায় তাদের নেই। এইসকল ব্যক্তিরা 'অচেতসঃ'—অজ্ঞ, নির্বোধ, অবিবেকী। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই আত্মজ্ঞান লাভের আগে কর্মত্যাগ করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এখানে আমাদের বলতে চাইছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরাই কর্মত্যাগের অধিকারী। আবার তাঁরা কর্মত্যাগের অধিকারী হয়েও নিষ্কাম কর্ম করেন।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ।। ৩৩

জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানী ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ (নিজ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির বা স্বভাবের) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (চেষ্টা অর্থাৎ কাজ করেন) ভূতানি (ভূত অর্থাৎ প্রাণীরা) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) যান্তি (অনুসরণ করে) নিগ্রহঃ (শাসন, নিষেধ) কিং করিষ্যতি (কী করবে)?

জ্ঞানী ব্যক্তিরাও নিজ প্রকৃতি (পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার) অনুযায়ী কাজ করেন। প্রাণীরাও নিজ নিজ প্রকৃতি স্বভাবকে অনুসরণ করে চলে। সুতরাং আমার বা অন্যের শাসন বা নিষেধে কী ফল হবে?

'কেন মানুষ তোমার কথামতো না চলে নিজের মত অনুযায়ী চলে? তোমার আদেশ অমান্য করতে কি তারা ভয়ও পায় না?'—অর্জুনের মনে এই প্রশ্ন উঠতে পারে, একথা আশঙ্কা করেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি বলছেন। 'সদৃশম্' অর্থাৎ অনুরূপ। কিসের অনুরূপ? 'প্রকৃতেঃ' – প্রকৃতির। অর্থাৎ জীবমাত্রই একটি বিশেষ প্রকৃতি নিয়ে জন্মায় এবং সেই প্রকৃতি অনুযায়ীই সে কাজ করে। প্রকৃতি বলতে কী বোঝায়? পূর্বজন্মের সংস্কার যা বর্তমান জন্মে প্রকাশ পায় তা-ই প্রকৃতি। মানুষ প্রকৃতির বশ। প্রকৃতি যেমন চালায় তেমনি চলে। প্রকৃতি মানুষকে যেদিকে ঠেলে দেয় সেই স্রোতেই সে গা ভাসিয়ে দেয়।

আচার্য শঙ্কর বলছেন : 'সা প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বে জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্মূর্খঃ' – মূর্খের তো কথাই নেই এমনকী জ্ঞানী ব্যক্তিরাও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করেন। জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁরা বুদ্ধিমান, পণ্ডিত। এঁরা আত্মজ্ঞানী নন, যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছেন তাঁদের লক্ষ করে বলছেন। সেইসকল জ্ঞানী

ব্যক্তিরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী যা ঠিক মনে করেন, তাই করে থাকেন। অপরোক্ষানুভূতির পূর্ব পর্যন্ত সকলেই প্রারব্ধের অধীন এবং পূর্বপূর্ব-জন্মার্জিত কর্মফল অনুসারে চালিত হন। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল, পিতামাতা হতে প্রাপ্ত সংস্কার এবং প্রবৃত্তি দ্বারাই মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়। জন্মের পর শিক্ষা ও সংসর্গও এই প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষের স্বভাবগুণ যথা—সত্ত্ব-প্রধান, সত্ত্ব-রজঃ-প্রধান, রজ-তমঃ-প্রধান ও তমঃ-প্রধান হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : আমি যদি হাজার বারও বারণ করি তবুও মানুষ শুনবে না, এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি? আর শাস্ত্রই বা কী করবে? ওদের বাধা দিয়ে বা নিষেধ করে কিছু লাভ হবে না। কারণ স্বভাব বা প্রকৃতিই বলবান। ইন্দ্রিয়নিগ্রহে বা শাস্ত্রের শাসনে কোনও ফল হয় না।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎতৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ।। ৩৪

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সকল ইন্দ্রিয়েরই) অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগ-দ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নির্দিষ্ট আছে) তয়োঃ (সেই দুটির) বশম্ ন আগচ্ছেৎ (বশীভূত হয়ো না) হি (যেহেতু) তৌ (তারা) অস্য (এর অর্থাৎ মুমুক্ষু জীবের (শ্রেয়োমার্গের) পরিপন্থিনৌ (পরিপন্থী বা শত্রু)।

সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব-স্ব বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ আছে। কিছুতেই ঐ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হয়ো না। কারণ, এ দুটি জীবের শ্রেয়োমার্গের প্রতিকূল, বিঘ্নকারক।

মানুষ-মাত্রই নিজ-নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে। তাহলে কি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের কোনও প্রয়োজন নেই? প্রকৃতি যদি প্রবল হয় এবং পুরুষকার যদি দুর্বল হয় তবে তো মানুষ শাস্ত্রসম্মত কোনও কাজই করতে চাইবে না। তবে কি জীবের আত্মোন্নতির কোনও উপায় নেই? এইসব সংশয়ের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : হ্যাঁ, আছে। ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ না করে বশীভূত করতে হবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব-স্ব বিষয়ে রাগ এবং দ্বেষ আছে। অনুকূল বিষয়ে রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। রাগ অর্থাৎ ভালবাসা আর দ্বেষ অর্থ হল বিরাগ। যেমন, কোনও মনোরম দৃশ্য দেখতে আমরা ভালবাসি। আমাদের চোখ সেদিকে ছুটে যায়। ঠিক তেমনি কুৎসিত রূপ দেখতে অপছন্দ করি। ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। রাগ-দ্বেষ থাকলে শ্রেয়লাভ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায় না। সুতরাং মানুষকে রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে যেতে হবে।

মানুষমাত্রই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ – এই তিন গুণের অধীন। যতদিন প্রকৃতিতে রজঃ ও তমঃ ভাবের প্রাবল্য থাকে ততদিন কোনওভাবেই মোক্ষলাভ করা যায় না। সুতরাং সত্ত্বপ্রকৃতি দ্বারা রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিকে দূর করতে হবে। এভাবে সাধক যখন সাত্ত্বিক

হন, তখন তিনি রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে যান। তিনি আর তখন ইন্দ্রিয়ের অধীন নন। ইন্দ্রিয়সকলই তাঁর দ্বারস্থ। আমাদের ভক্তিশাস্ত্রে কী সুন্দর সব কথা আছে। বলছেন, আমাদের চোখ কিসের জন্য? ঈশ্বরীয় রূপ দেখব বলে। কান কিসের জন্য? তাঁর নামকীর্তন শুনব বলে। জিভ কিসের জন্য? তাঁর কথা বলব বলে। হাত কিসের জন্য? তাঁর সেবা করব বলে। আর পা? পা দিয়ে সেখানে যাব, যেখানে হরিকথা হচ্ছে। এছাড়া যা-কিছু মোক্ষলাভের প্রতিকূল তা তিনি বিচার করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন।

ভগবান সাবধান করে বলছেন, হে অর্জুন, ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যবিষয়ের অনুরাগে আকৃষ্ট হয়ে অনেক স্থলে মন ও বুদ্ধির শাসন অতিক্রম করে থাকে। তাই ইন্দ্রিয়ের এই রাগ-দ্বেষে তুমি অভিভূত হয়ো না। এই রাগ-দ্বেষই তোমার শ্রেয়োমার্গের বিরোধী।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।। ৩৫

সু-অনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম থেকে) বিগুণঃ (দোষযুক্ত) স্ব-ধর্মঃ (স্বধর্ম) শ্রেয়ান্ (উৎকৃষ্ট) স্ব-ধর্মে (নিজ ধর্মে) নিধনম্ (নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর) পরধর্মঃ (অন্যের ধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল অর্থাৎ অনিষ্টকর)।

স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ আশ্রমোচিত কর্ম-অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত হলেও তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠেয়। নির্দোষ পরধর্ম অপেক্ষা অনুষ্ঠিত স্বধর্মে নিধনও কল্যাণকর। কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা ভীতিপ্রদ ও বিপজ্জনক।

স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম। ধর্ম মানে হচ্ছে চরিত্র, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব ধর্ম আছে – স্বভাব। যেমন জলের ধর্ম শৈত্য, দুধের ধর্ম ধবলত্ব, আগুনের ধর্ম তাপ ইত্যাদি। এখন যদি দুধ থেকে তার ধবলত্বকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তা আর দুধ থাকে না। ছোটবেলা থেকেই আমরা এক-এক-জন এক-এক-রকমের। সবাই এক ছাঁচে গড়া নই। ক্ষত্রিয় হিসেবে অর্জুনের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। সত্যকে রক্ষা করা, ন্যায়নীতিকে রক্ষা করা, দুর্বল, পীড়িত, অত্যাচারিত যারা তাদের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম।

ধর্ম কখনও জীবনসংগ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে বলে না। হিন্দুধর্ম মোটে সেকথা বলেন না বা দুর্বল মনোভাবের সৃষ্টি করে না। নিজের ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি তোমার নিধন হয় সেও ভাল। সংসারে আছ, সংসারের ধর্মই তুমি পালন করে যাও। সংসারে থেকে সন্ন্যাসীর মতো আচরণ করতে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

আসলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন : আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করে সিংহাসন লাভ করতে চাই না, বরং আমি সন্ন্যাসীর মতো ভিক্ষা করে খাব। সেই সূত্র ধরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের ধর্ম অনুযায়ী চলা উচিত।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করে চলবে। এমনকী নিজের ধর্ম যদি নিখুঁতভাবে পালন করা না যায় তবুও অন্যের ধর্ম অনুকরণ করা ঠিক নয়। অনেক সময় দেখা যায় আমরা পরধর্মকে হয়তো খুব সুন্দরভাবে পালন করতে পারছি। বরং নিজের ধর্মপথ অনুযায়ী চলতে গিয়ে কত দোষ-ত্রুটি, ভুল করে ফেলছি। হয়তো নিজের ধর্মপথ 'বিগুণ' অর্থাৎ দোষযুক্ত। তবুও দোষ-ত্রুটিবিহীন পরধর্ম অনুষ্ঠানের চেয়ে নিজের ধর্ম পালন করা ভাল। বলছেন : 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহঃ'— নিজের ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যুও হয় সেও ভাল। কিন্তু অন্যের ধর্ম অনুকরণ করা বিপজ্জনক। বাস্তবিক, আমরা রাতারাতি আমাদের প্রকৃতিকে পালটাতে পারি না। তা করার দরকারও নেই। আমার প্রকৃতি অনুযায়ী যা আমার কর্তব্যকর্ম তাই সাধ্যমতো আমি করে যাব। তাতেই আমার কল্যাণ হবে। আবার অপর কোনও একজন হয়তো আমার থেকে অনেক ভাল কাজ করছে। কিন্তু আমি যদি তাকে অনুকরণ করি তাতেও কোনও লাভ হবে না। যেমন একজন সবেমাত্র প্রথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তার জন্য বর্ণপরিচয়ই একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ণপরিচয় না পড়ে যদি কেউ এম.এ.-ক্লাসের বই পড়তে যায় তাহলে তার কোনওটিই পড়া হয় না। দুকুলই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সব অবস্থায় স্বধর্ম পালন করাই একান্ত কর্তব্য। পরধর্ম ভালো হলেও তা বিপজ্জনক। আবার কেউ কেউ বলেন, মানুষের স্বধর্ম হচ্ছে সর্বদা ঈশ্বরের নামগান করা, চিন্তা করা, সবসময় মনটাকে তাঁর দিকে দিয়ে রাখা। আসল কথা হল, মন বেটাকে কোনওরকমে ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তাঁর চিন্তায় ডুবিয়ে রাখা। তা চাবুক মেরেই হোক আর গায়ে হাত বুলিয়েই হোক।

ভগবান বলছেন, স্বধর্ম-পালন দ্বারাই মানুষের শ্রেয়োলাভ হয়, এবং স্বধর্ম পালন করাই সকলের অবশ্যকর্তব্য। স্বধর্ম পালন অপেক্ষা পরধর্ম পালন অধিকতর সহজ এবং সুখকর বলে মনে হলেও স্বধর্মের অনুষ্ঠানই একমাত্র কাম্য এবং উত্তম। স্বধর্মে অবস্থিত থেকে যদি মৃত্যুও ঘটে তথাপি স্বধর্ম ত্যাগ করে অপরের ধর্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। পরধর্ম গ্রহণ করা ভীতিপ্রদ, অনিষ্টজনক এবং সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগ প্রসঙ্গে বলছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য নিজের নিজের আদর্শ গ্রহণ করে তা-ই জীবনে পরিণত করার চেষ্টা করা। অন্যের আদর্শ গ্রহণ করে সেই অনুসারে চরিত্রগঠনের চেষ্টা করা অপেক্ষা নিজের আদর্শে কৃতকার্য হওয়া নিশ্চিত উপায়। স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে কেউই ছোট নন। নিজ নিজ অধিকারে প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ, কেউই ন্যূন নন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকারে শ্রেষ্ঠ কিন্তু একজনের কর্তব্য অপরের কর্তব্য নয়।

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ।। ৩৬

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন) বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি বংশজাত, হে কৃষ্ণ) অথ (তবে) কেন (কার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (চালিত হয়ে) অয়ং পুরুষঃ (এই মানুষ) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) বলাৎ (বলপূর্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিযুক্ত হয়ে) পাপং (পাপকর্ম) চরতি (আচরণ করে)?

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন : হে কৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপকর্ম আচরণে প্রবৃত্ত হয়?

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, তুমি কৃপা করে আমার মায়ের বংশে অর্থাৎ বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হয়েছ। তুমি আমায় ভালবাস। তোমার ওপর আমার দাবি আছে। তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও, মানুষ কেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পাপ কাজ করে? কে তাকে পাপ কাজ করতে বাধ্য করায়? তুমি যদি এর কারণটা খুলে না বল তবে তো আমি এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও চেষ্টাই করব না।

সাধারণতঃ আমরা এরকমই ভেবে থাকি। ভগবানই যদি সবকিছু করেন তবে পাপটাও তিনিই করছেন। সুতরাং শাস্তিটা তাঁরই পাওয়ার কথা। না, এটা ঠিক নয়। ঠাকুরের ভাষায় : যতক্ষণ 'আমি কর্তা' এই বোধ আছে ততক্ষণ পাপ-পুণ্যের ভেদ থাকবেই। আর ততক্ষণ পাপ ও পুণ্য দুই-ই আমি করছি। আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীন ইচ্ছা আছে। আবার শাস্ত্রে কী সুন্দর একটা কথা আছে : ভুল তো আমরাই করি। আবার ভুল করি বলেই চোখের জল ফেলি। ভগবানের শরণাগত হই। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি : 'হে প্রভু, তুমি আমায় রক্ষা কর। আর যেন ভুল, অন্যায় না করি।' ভুল কাজই আমাদের প্রার্থনা করতে শেখায়। তাঁর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য যদি আমি সত্যি-সত্যিই অনুতপ্ত হই । এই অনুতাপের আগুনে আমরা যতই জ্বলে - পুড়ে মরি ততই আমরা তাঁকে জড়িয়ে ধরি।

তাই অর্জুনের প্রশ্ন : স্বধর্মপালনই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, স্বীয় প্রকৃতি অনুযায়ী স্বধর্ম পালন করাই সহজ ও স্বাভাবিক। তবে মানুষ স্বধর্ম ত্যাগ করে, স্বীয় প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে, কেন পাপকর্মে লিপ্ত হয়? কে তার স্বাভাবিক প্রেরণা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক তাকে পাপকর্মে নিযুক্ত করে?

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্না বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ।।৩৭

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) এষঃ কামঃ (এই কাম) এষঃ ক্রোধ (এই ক্রোধ) রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণ থেকে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়, যাকে তৃপ্ত করা যায় না) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) ইহ (সংসারে) এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি (একে শত্রু বলে জানবে)।

শ্রীভগবান বললেন, এই কাম ও ক্রোধ রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। কাম এবং ক্রোধ দুষ্পূরণীয় উগ্র। সংসারে একে শত্রু বলেই জেনো। এই কাম-ক্রোধই মানুষকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করে পাপকর্মে লিপ্ত করে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই পাপের মূলে রয়েছে কামনা (কাম) এবং ক্রোধ। এরা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। আত্মোন্নতির পথে প্রধান বাধা হল ছয় রিপু - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। কাম অর্থাৎ কামনা - বাসনা, যে-কোনওপ্রকার ভোগবাসনা। বাসনার শেষ নেই। বাসনা সবসময় খাই-খাই করছে। কোনও খাবারেই সে তৃপ্ত নয়। অনেক সময় হয়তো খুব মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে, কিন্তু মিষ্টি খাওয়াটা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। তা সত্ত্বেও তো আমরা ভাবি, এই বারটা খাই, আর কখনও খাব না। না, তা হয় না। বাসনা দিয়ে বাসনার আগুনকে নেভানো যায় না। বরঞ্চ তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। এই কামনা যখনই বাধা পায় তখনই তা ক্রোধে পরিণত হয়। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাজ করলেই আমাদের ক্রোধ জন্মায়। এরা দুই নয়, এক। যেখানে কাম সেখানেই ক্রোধের সম্ভাবনা। আবার এই বাসনা যখন কোনও নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়, তখন তা লোভে পরিণত হয়। বাসনার জন্যই অনিত্য বস্তুকে আমাদের নিত্য বলে মনে হয়। ফলে প্রকৃত নিত্য বস্তুর খবর আমরা পাই না। এরই নাম মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়া। এই অজ্ঞানতাটাই যখন 'আমি ধনী', 'আমি জ্ঞানী'—এই আকার নেয় তখন তা মদ। আর এই অহংকারের ফলেই আমি অপরকে আমার থেকে ধনী বা আমার থেকে জ্ঞানী ভাবতে পারি না। এই ঈর্ষাই মাৎসর্য। দেখা যাচ্ছে, এই সব রিপুগুলির মূলে আছে কাম। রিপুগুলি কামেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র।

তাই অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, রজোগুণজাত কাম ও ক্রোধই মানুষকে পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে। এই কাম-ক্রোধই সব অনর্থের মূল। মানুষের প্রধান শত্রু। মোক্ষলাভের অন্তরায়। সুতরাং সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে দূর করতে হবে। তবেই কামনা-বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ।। ৩৮

যথা (যেমন) বহ্নি (অগ্নি) ধূমেন আব্রিয়তে (ধূমের দ্বারা আবৃত হয়) যথা আদর্শঃ মলেন চ (যেমন দর্পণ ধুলোর দ্বারা আবৃত হয়) যথা গর্ভঃ উল্বেন (যেমন গর্ভ জরায়ু দ্বারা) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা তেন (তার দ্বারা অর্থাৎ সেইরূপ কাম-দ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি) আবৃতম (আবৃত হয়)।

যেমন ধূমের দ্বারা বহ্নি, ধুলোর দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, ঠিক সেইরকম কামনা বাসনার দ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে।

কামনা-বাসনাই যে আমাদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে তা বোঝাতে এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বিষয়-বাসনা আমাদের বিবেক-জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে। কীভাবে? যেমন আগুন ধোঁয়া দিয়ে চাপা থাকে, আয়না ধুলোয় ঢাকা থাকে, গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে। আমরা যেন অন্ধ হয়ে আছি। বাসনা আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই আমরা ভাল জিনিস ছেড়ে খারাপকেই গ্রহণ করছি। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে। শাশ্বত আনন্দকে ছেড়ে যা ক্ষণস্থায়ী, যা দুদিনের, সেই সুখভোগেই আমরা মত্ত। ফলে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। বিষয়-বাসনা থাকলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। আত্মজ্ঞান স্বপ্রকাশ হয়েও কামনাবাসনা দ্বারা চিত্ত আচ্ছাদিত থাকলে, আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায় না,—যেমন অগ্নি ধোঁয়া দ্বারা আবৃত থাকে কিংবা আয়না যদি ধুলোয় ঢাকা থাকে। মলিন চিত্ত আত্মার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। তাই কাম ও ভোগবাসনা মানুষের শত্রু এবং তা আত্মজ্ঞানের প্রকাশকে একেবারে বিনষ্ট করে দেয়।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ।। ৩৯

কৌন্তেয় (অর্জুন) জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (জ্ঞানীর চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (কামরূপ) দুষ্পূরেণ চ (দুষ্পূরণীয়, যাকে তৃপ্ত করা যায় না) অনলেন (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞান আবৃত থাকে)।

হে অর্জুন, এই কাম জ্ঞানীদের চিরশত্রু। এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অগ্নির দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে।

কামনা-বাসনাই আমাদের সকলকে বন্দী করে রেখেছে। আমরা কেউ মুক্ত নই। যেন সিংহকে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে। বের হবে কী করে? খাঁচার দরজা খুলে দিতে হবে। তেমনি কে আমাকে মুক্ত করবে? আমিই আমাকে মুক্ত করব। কীভাবে? বলছেন, আমাদের যে কামনা-বাসনার আগুন জ্বলছে তাকে নেভাতে হবে। কিন্তু এটি খুব সহজসাধ্য নয়। কারণ ভোগের দ্বারা কখনো কামনা-বাসনার নিবৃত্তি হয় না। ধরা যাক, কারোর মনে একটা কাপড়ের বাসনা উঠেছে। তা বেশ, একটা কাপড় দিলাম। দেওয়ামাত্রই মনের উৎসাহ বেড়ে গেল। তখন বলবে, না, এ কাপড় নয়। সিল্কের কাপড় চাই। সিল্কের কাপড় পেলে মন আর একটা কিছু চেয়ে বসে। আসলে বাসনার কোনও শেষ

নেই। তাই একে বলছে 'দুষ্পূরেণ অনলেন'। অর্থাৎ বাসনার আগুনকে কখনোই নেভানো যায় না। বাসনার সম্বন্ধে বলা হয় : 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।' অর্থাৎ কাম্যবস্তুর ভোগের দ্বারা কামনাকে কখনও শান্ত করা যায় না। বরং ক্রমাগত তা বেড়েই চলে। আগুনে যত ঘি ঢালা হয় আগুন ততই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। কামনা-বাসনা থাকতে জ্ঞানের উদয় হয় না। আবার জ্ঞান না হলে মুক্তিলাভ হয় না।

জ্ঞান আমাদের বাইরে নয়। ভেতরেই রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হল বিষয়বাসনা জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে। এই বাসনাকে শত্রু বলে জানতে হবে। এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, আমার একজন শত্রু আছে—'নিত্যবৈরী'। সে সবসময় আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সে আমার শত্রুতাই করে যাবে। সুতরাং কামই জ্ঞানী ব্যক্তির চিরশত্রু। জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগ করেও সুখ পান না। কারণ এই ভোগের পরিণাম যে দুঃখের, তা-তিনি জানেন। আবার বিচার-বুদ্ধিহীন অবিবেকী ব্যক্তিরা বাসনাকেই মিত্র বলে মনে করে। পরিণামে অশেষ দুঃখভোগ করে। তাহলে উপায় কী? ত্যাগই হচ্ছে একমাত্র উপায়। 'নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' এছাড়া মুক্তির আর কোনও পথ নেই।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ।। ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি) অস্য (এর অর্থাৎ কামের) অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (আশ্রয় বলে কথিত হয়) এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (এদের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃত্য (বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করে) দেহিনম্ (দেহাভিমানী জীবকে) বিমোহয়তি (বিভ্রান্ত করে)।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এসব কামের আশ্রয় বলে কথিত হয়। কাম এদেরকে অবলম্বন করে বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছন্ন রেখে জীবকে বিভ্রান্ত করে।

শত্রুর আশ্রয়স্থল যদি জানা যায় তবে তাকে অনায়াসে জয় করা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কামনা-বাসনারূপ শত্রুর আশ্রয় কোথায়? ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনটিই কামনার আশ্রয়। এদের কাজে লাগিয়েই আমরা আমাদের বাসনা চরিতার্থ করি। বেদান্তসার শাস্ত্রে আছে, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তির নাম মন, অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, চিত্ত হচ্ছে যেন স্বচ্ছ হ্রদ। রূপরসাদির আঘাতে তাতে যে তরঙ্গ উঠছে, তারই নাম মন। এজন্যই মনের স্বরূপ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক। কামনা, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে জীবকে বিষয়ে লিপ্ত করে, তার বিবেকবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, ফলে মানুষের অন্তরে আত্মজ্ঞানের স্ফূর্তি হতে পারে না।

কাম ইন্দ্রিয়কে অধিকার করে মনকে আক্রমণ করে। যে-বিষয়ে ইন্দ্রিয় অনুরক্ত হয় মন বারংবার তারই চিন্তা করে এবং বহুবিধ সুখের কল্পনা করে। ফলে ঐ বিষয়ের প্রতি এক তীব্র আসক্তি জন্মে। বুদ্ধি তীব্র কামের আসক্তিতে অভিভূত হয়ে, ঐ বিষয়কেই শ্রেয় বলে নিশ্চয় করে। বুদ্ধি কোনও বিষয়কে শ্রেয় বলে নিশ্চয় করে দিলে তা লাভ করার জন্য চিত্তে যে সঙ্কল্প উপস্থিত হয় তা কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে মানুষকে বিষয়ভোগ কর্মে প্রবৃত্ত করে।

এইভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আশ্রয় করে কামনা-বাসনা আমাদের তাড়া করে বেড়ায়, একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত ছুটিয়ে নিয়ে চলে। বিষয়ে লিপ্ত করে আমাদের মোহগ্রস্ত করে। ফলে আমাদের বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। নিত্যকে ছেড়ে অনিত্যকে সত্য বলে মনে করি। আমরা যেন যাদুকরের হাতের পুতুল। কে আমাদের যাদু করল? কামনা-বাসনা। আমাদের ভেতরে জ্ঞানসূর্য রয়েছে। বাসনার মেঘ তাকে ঢেকে রেখেছে। জ্ঞান তাই চাপা পড়ে আছে। ফলে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়েছি। প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে গিয়ে দেহ ও ইন্দ্রিয়সুখকেই সর্বস্ব বলে মনে করছি। ইন্দ্রিয়-সুখভোগেই আমরা মত্ত হয়ে আছি, ফলে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয় না, সদসৎ বিচারবুদ্ধি লোপ পায়।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্‌মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ।। ৪১

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তস্মাৎ (সেহেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়সকলকে সংযত করে) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশকারী) পাপ্‌মানম্ (পাপরূপ) এনং হি (একে অর্থাৎ এই কামকে) প্রজহি (পরিত্যাগ কর)।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সেজন্যই তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করে জ্ঞান - বিজ্ঞানের নাশকারী পাপরূপ এই কামকে পরিত্যাগ কর।

কাম অর্থাৎ বাসনা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে জীব মোহগ্রস্ত হয়। তাই সকলের আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে সাবধান করে বলছেন:'তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য', তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে কড়া হাতে শাসন কর। গোড়াতেই লাগাম টেনে ধরে সংযত কর। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল তো স্বভাবতই বহির্মুখী। এদের মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। তবেই এই ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের সহায় হবে। আর মনের তো কথাই নেই। মন তো নয়, যেন মত্ত করী। পাগলা হাতি। কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই, হয়তো মাহুতকেই মেরে ফেলল। বাসনাকে জয় করতে হলে একে আশ্রয়চ্যুত করতে হবে। অর্থাৎ মনকে বশে আনতে হবে। সেই-সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করতে হবে। ফলে পাপরূপ যে আবরণ আমাদের জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে সেই আবরণ দূর হয়ে যাবে। কামনা-বাসনাকেই এখানে পাপ বলা

হয়েছে। এই পাপকে সমূলে বিনাশ করতে হবে। বাসনাই সব অনর্থের মূল। জ্ঞানবিজ্ঞানকে নষ্ট করে আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনে। জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। আমার স্বরূপজ্ঞান। শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ শুনে আত্মার সম্বন্ধে যে পরোক্ষ বোধ জন্মায় তাই জ্ঞান। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। নিদিধ্যাসন বা ধ্যানের ভেতর দিয়ে যখন আমি আমার স্বরূপকে বোধে বোধ করি তাই বিজ্ঞান। প্রত্যক্ষ অনুভূতিই হল বিজ্ঞান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের পথে বাসনাই প্রধান অন্তরায়। তাকে ত্যাগ কর। 'প্রজহি' – পুরোপুরি ত্যাগ কর। একটুও যেন না থাকে। তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আমার আয়ত্তে। এরা আর আমার শত্রু নয়। পরম বন্ধু।

বাস্তবিক, ধর্মটা আর কী? নিজেকে বশ করা। সংযত হওয়ার চেষ্টা করা। যে-কোনও ব্যাপারে সংযমই হল সৌন্দর্য। আমাদের সকলের মধ্যেই শক্তি আছে। তাকে নির্দিষ্ট-পথে চালনা করার জন্যেই সংযমের প্রয়োজন। যেমন, উদ্দাম গতিতে ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে চলেছি। ঘোড়া আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা অবশ্যই একটা শক্তির প্রকাশ। আবার ঘোড়াটা তার ইচ্ছামত যেতে চাইছে। কিন্তু আমি লাগাম ধরে আছি। এখানে আরও বেশি শক্তির প্রকাশ। শক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত। কারণ, শক্তিটা আমার বশে। ইচ্ছা করলে ঘোড়াকে আমি যে-কোনও পথে চালনা করতে পারি। তেমনি ইন্দ্রিয় ও মন পুরোপুরি বশে এলে আমার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ হবে। আমি নতুন ধরনের মানুষ হব। লোকে আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ।। ৪২

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) পরাণি (স্থূল দেহ থেকে শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (বলা হয়) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ) মনসঃ তু (মন থেকেও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠ) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) বুদ্ধেঃ পরতঃ (বুদ্ধিরও উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা)।

স্থূল দেহ থেকে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, এবং মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আবার যিনি বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা। তিনিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব,পরমাত্মা তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন : স্থূল দেহ থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। কারণ ইন্দ্রিয় ছাড়া আমাদের এই শরীর কোনও কাজই করতে পারে না। আবার ইন্দ্রিয়কে চালায় কে?— মন। সুতরাং মন ইন্দ্রিয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয় মনেরই দাস। কিন্তু মনই সব নয়। অনেক সময় আমরা ঠিক বুঝতে পারি না কোনটা আমাদের করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়। মনের চেয়েও শক্তিশালী হল বুদ্ধি। বুদ্ধিই মনের চালক। বুদ্ধিই বলে দেয়—এটা কর, আর ওটা কর না। বুদ্ধির চেয়ে বড় কে? আমাদের আত্মা।

'আমি' দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ দেহ, মন, বুদ্ধির অতীত; নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। বেদান্তমতে এক আত্মাই সকলের মধ্যে রয়েছেন। তিনি আছেন বলে সব কিছু আছে। আসলে তিনিই এদের সবাইকে চালাচ্ছেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে চাইছেন, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির দাস হয়ো না। কারণ এদের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। চোখ, কান, নাক—এরা কি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে? না, তা পারে না। তাই এদের শরীরের সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার। আবার মন ছাড়াও ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করতে পারে না। সেই মন আবার বুদ্ধির অধীন। সুতরাং এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এদের সবাইকে ধরে আছেন আত্মা। আত্মা স্বতন্ত্র। কোনও কিছুর অধীন নন। তিনি সাক্ষী, দ্রষ্টা। সেই আত্মাকে ধরে থাকতে হবে। একটা জাহাজ নোঙর ফেলা আছে। নোঙর থেকে আলাদা হলে কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। অথচ এত বড় জাহাজ। কত তার শক্তি! কিন্তু খুঁটি থেকে সরে গেলেই অসহায়। নিজে কিছুই করতে পারে না। আত্মা যেন ঐ নোঙর। যতক্ষণ আত্মাকে ধরে আছি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত। আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বোচ্চ। আত্মার চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

পরমাত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি বলছেন: 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। (কঠোপনিষদ্) অর্থাৎ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হতে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। আবার বলা হয়েছে, 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। (কেনোপনিষদ্) অর্থাৎ এই আত্মা শ্রবণের শ্রবণ, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ। যিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকলের অন্তরব্যাপী, তিনিই আত্মা।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ।। ৪৩

মহাবাহো (হে অর্জুন) আত্মনা (শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানম্ (মনকে) সংস্তভ্য (সমাহিত করে) বুদ্ধেঃ পরম্ (বুদ্ধির অতীত পরমাত্মাকে) এবং (এইরূপে) বুদ্ধ্বা (জেনে) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদম্ (দুর্নিবার) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর)।

হে অর্জুন, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করে, বুদ্ধির অতীত পরমাত্মাকে জেনে, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে বিনাশ কর।

আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। আমি অজর, অমর, নিত্যমুক্ত আত্মা। আমার জন্মও হয়নি, মৃত্যুও হবে না। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ কোনওকিছুই আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কেবল 'আমিই' আছি। 'আমি' বলতে এখানে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অতীত পরমাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়, এই আত্মতত্ত্বকে বোধে বোধ করতে হবে।

কামনা-বাসনার লেশমাত্র থাকলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। কামনা-বাসনাই বন্ধনের কারণ। নির্বাসনা হলেই মুক্তি। বাসনা যেন দমকা হাওয়া। আমাদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তবে উপায় কী? ইন্দ্রিয়সংযম ও মনকে বশে আনা। কামজয় করতে হলে ইন্দ্রিয় ও মনকে পুরোপুরি নিজের বশে রাখতে হবে। বাসনাই শত্রু। তাকে ভয়ঙ্কর শত্রু জেনে ইন্দ্রিয়গুলির মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। মনকে আলেয়ার পেছনে ছুটতে দেওয়া চলবে না। শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে তার রাশ টেনে, লক্ষ্যের দিকে চালনা করতে হবে। চঞ্চল মন সবসময়ই কিছু-না-কিছু চাইছে। চাইবে না কেন? নিশ্চয়ই চাইবে। ভগবানকে চাইবে। ভগবানকে পেলে মনে হবে আমার আর কিছু দরকার নেই। আমি পূর্ণকাম। আপ্তকাম। একটুও আসক্তি থাকলে হবে না। সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে সুচে সুতো পরানো যায় না। মন পুরোপুরি অনাসক্ত হলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। শুদ্ধ মনে যা ওঠে, সে তো তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মন যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা-ই। তা-ই আবার শুদ্ধ আত্মা। কেননা তিনি বই আর কিছুই শুদ্ধ নয়।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ করে আমাদের সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন। বলছেন : 'তোমাদের নিজেদেরই নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনতে হবে। বাসনা ত্যাগ করা অতি দুরূহ কাজ। কিন্তু দুঃসাধ্য নয়। বিবেকবৈরাগ্যকে সাথী করে তোমরা নিশ্চয়ই বাসনাকে জয় করতে পারবে। আর তখনই তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হবে। কামনা এমন সূক্ষ্মভাবে মানুষের অন্তঃকরণে অবস্থিত থাকে যে, তাকে অনেকস্থলে বুঝতেই পারা যায় না। এজন্য এই দুর্বিজ্ঞেয় সূক্ষ্মরূপী দুর্জয় শত্রুকে সমূলে বধ করতে হলে, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে জেনে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নেই।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **কর্মযোগ-**নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে নিষ্কাম কর্মের কথা সূত্রাকারে বলা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে তারই বিস্তার। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান কর্মের মহিমা বর্ণনা করেছেন। তাই এর নাম কর্মযোগ। আমাদের সব কর্মের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগিয়ে তোলা। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা। নিষ্কাম কর্ম তারই বিজ্ঞানসম্মত উপায়। ঈশ্বরে সর্বকর্ম ও ফল অর্পণ করে অনাসক্তভাবে কাজ করার নাম কর্মযোগ। শাস্ত্রবিহিত, আশ্রমবিহিত,

নিত্যনৈমিত্তিক এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে কাজই আমাদের সামনে আসুক না কেন, নিষ্কামভাবে করাই কর্মের কৌশল। কর্ম না করে থাকা যায় না, অতএব অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাই কর্তব্য। যেহেতু কামনা-বাসনাই সকল অনর্থের মূল, তাই ইন্দ্রিয়সকল সংযমপূর্বক আত্মনিষ্ঠ হয়ে, পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত করে, নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগ প্রসঙ্গে বলছেন, কর্মযোগ কী? কর্মরহস্য অবগত হওয়া। আমরা দেখছি সমুদয় জগৎ কর্ম করছে। কিসের জন্য?—মুক্তির জন্য, স্বাধীনতা লাভের জন্য। পরমাণু হতে মহোচ্চ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা, সমুদয় বিষয়ে স্বাধীনতা মানুষ চাইছে। সর্বদাই মুক্তিলাভ করতে এবং বন্ধন থেকে পালাবার জন্যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চেষ্টা করছে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ সকলেই বন্ধন হতে পালাবার চেষ্টা করছে। সমস্ত জগৎটাকে এই কেন্দ্রানুগা ও কেন্দ্রাতিগা শক্তিদ্বয়ের ক্রীড়াভূমি বলা যেতে পারে। কর্মযোগ আমাদের কাজের রহস্য, কর্মের প্রণালী বলে দেয়। কর্মযোগ কী বলে? কর্মযোগ বলে, তুমি নিরন্তর কর্ম কর কিন্তু কর্মে আসক্তি ত্যাগ কর। কোনও বিষয়ের নাম ও রূপের সঙ্গে আপনাকে জড়িও না। মনকে স্বাধীন করে রাখ। যা কিছু দেখছ দুঃখ-কষ্ট সমস্তই জগতের অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারমাত্র, দারিদ্র, ধন ও সুখ সাময়িকমাত্র, ওসব আমাদের স্বভাবগত একেবারেই নয়। আমাদের স্বরূপ দুঃখের অথবা সুখের অথবা প্রত্যক্ষ বা কল্পনার একেবারে অতীত প্রদেশে। তবু আমাদের সর্বদাই কাজ করে যেতে হবে। 'আসক্তি হতে দুঃখ আসে, কর্ম হতে নয়।...আর "আমি আমার" ভাবই দুঃখের জনক'।

অতএব সমুদয়ই (কর্ম ও কর্মের ফল) ঈশ্বরে সমর্পণ কর। এই সংসাররূপ ভয়ানক অগ্নিময় কটাহে, যেখানে কর্তব্যরূপ অগ্নি সকলকে ঝলসে দিচ্ছে, সেখানে এই ঈশ্বরার্পণরূপ অমৃতপাত্র পান করে সুখী হও।

গীতার মূলভাবটি এইঃ নিরন্তর কর্ম কর, কিন্তু তাতে আসক্ত হয়ো না। অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ। কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা বা সৎকর্মদ্বারা মুক্তিলাভ করবার একটি পথবিশেষ। কর্মযোগীর কোনওপ্রকার ধর্মমত অবলম্বন করবার প্রয়োজন নেই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিংবা আত্মবিষয়ে অনুধ্যান করুন বা না করুন, অথবা কোনওপ্রকার দার্শনিক বিচার করুন বা না করুন, কিছুতেই এসে যায় না।

যিনি অর্থ বা অন্য কোনওরূপ অভিসন্ধিশূন্য হয়ে কাজ করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে কর্ম করেন। অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্যের অর্থ অপরকে সাহায্য করা, জগতের উপকার করা। কেন আমরা জগতের উপকার করব? আপাতত বোধ হয় যে, আমরা জগতের উপকার করছি, বাস্তবিক কিন্তু আমরা নিজেরাই উপকৃত হয়ে থাকি।

আমাদের সর্বদাই জগতের উপকার করবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এই যেন আমাদের কার্যপ্রবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামক অভিসন্ধি হয়।

কর্মযোগের অর্থ কর্মের কৌশল—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কর্মানুষ্ঠান। কর্ম কী করে করতে হয় জানতে হবে, তবেই তা থেকে শ্রেষ্ঠ ফললাভ হবে। সমুদয় কর্মের উদ্দেশ্য—মনের ভিতর পূর্ব হতে যে শক্তি রয়েছে, তাকে প্রকাশ করা। আত্মার (জীবাত্মার) জাগরণ। প্রত্যেক মানুষের ভিতর ঐ শক্তি রয়েছে এবং জ্ঞানও রয়েছে। এসব বিভিন্ন কর্ম যেন—ঐ শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্য, ঐ দৈত্যকে জাগরিত করবার জন্য আঘাতস্বরূপ।

সংসারী লোক শুদ্ধ হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল লাভ, লোকসান, সুখ, দুঃখ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে, আর কিছু চায় না। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম—অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে, সে নিজের উপকারের জন্য, পরোপকারের জন্য নয়। সর্বভূতে হরির সেবা—শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হরির সেবা যদি কেউ করে, আর যদি সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা করছে তাদের কাছে থেকে উলটে কোনও উপকার চায় না—এরূপভাবে যদি সেবা করে, তাহলে তার যথার্থ নিষ্কাম কর্ম, অনাসক্ত কর্ম করা হয়। এরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ হয়। এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ।

তাই বলছি, যে অনাসক্ত হয়ে এরূপ কর্ম করে—দয়া, দান প্রভৃতি করে, সে নিজেরই কল্যাণ করে। পরের উপকার, পরের মঙ্গল, সেসব ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র, সূর্য, বাপ-মা, ফল-ফুল, শস্য, জল প্রভৃতি জীবের রক্ষার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ, তা তাঁরই দয়া—নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য তিনিই দিয়েছেন। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোনও না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

অতএব কর্মযোগের উপসংহারে আমাদের মনে রাখতে হবে—কর্মযোগ একটা পথ, উদ্দেশ্য নয়। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। নিষ্কাম কর্ম একটা উপায়—ঈশ্বর লাভের উপায়। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়। মলিন মনে ঈশ্বর দর্শন হয় না। তাই সকল কর্ম যদি নিষ্কামরূপে সম্পন্ন হয় তবে সবই কর্ম আধ্যাত্মিক। সেই কর্মই আমাকে ঈশ্বরের নিকটে এগিয়ে নিয়ে যাবে, অপরদিকে মনের মলিনতা ক্রমশ দূর হয়। চিত্তের মলিনতা যখন সম্পূর্ণ দূর হয় তখন জ্ঞানের প্রকাশ হয়। জ্ঞানলাভ বা ঈশ্বরলাভ বাইরের কোন জিনিস নয়, আমার মধ্যেই রয়েছে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান বা ঈশ্বর। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর বা জ্ঞান লাভ হয়। আবার জ্ঞান বা ঈশ্বরের প্রকাশ হলেই মানুষ পূর্ণ [illegible]সক্ত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমাদের সকলের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ করব কী করে? কর্মের দ্বারা। কীরকম কর্ম? নিষ্কাম কর্ম। বিচারপূর্বক নিষ্কাম কর্ম করলেই চিত্তশুদ্ধি এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান আমাদের বাইরে থেকে অর্জন করতে হয় না। জ্ঞান আমার স্বরূপ। আমার ভিতরে রয়েছে। শুধু প্রকাশের অপেক্ষায়। সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্যই জ্ঞান লাভ করা। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শীগণের নিকট জ্ঞান লাভ হয়। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়।

অজ্ঞান হতেই সংশয়ের জন্ম। যারা অজ্ঞানী তারা কর্ম করবার সময় প্রতি পদে সংশয়-সন্দেহ দ্বারা পীড়িত থাকে। আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় না থাকাতে সে দেহকে আত্মা মনে করে, দেহের সুখ ও ভোগে নিমজ্জিত থাকে। ফলে শোক-দুঃখে অধীর হয়, নানা বাসনা দ্বারা বিচলিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কোনটা সঠিক কর্তব্য তা স্থির করতে পারে না। এই সংশয়কে বিনাশ করতে হলে জ্ঞানলাভ দরকার। মানুষের বিবেকজ্ঞান জাগ্রত হলে তখন তার সমস্ত সন্দেহ দূর হবে, তখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারবে, তার প্রকৃত কর্তব্য কর্ম কী। জ্ঞানলাভ হলেই মানুষ ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করতে পারে। বুদ্ধিকে কামনাবাসনা দ্বারা চালিত না করে পরমাত্মায় স্থির করার নামই যোগ। এরূপ যিনি যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ বুদ্ধি ঈশ্বরে যুক্ত করে কর্ম করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানযোগী এবং কর্মযোগীও।

পৃথিবীর বিষয়ভোগ দুই ভাবে দুই দল মানুষ করে থাকেন। এক দল মানুষ পৃথিবীর বিষয়কে 'শ্রেয়' হিসাবে গ্রহণ করেন। আর এক দল বিষয়কে 'প্রেয়' হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথম-দলের মানুষরা অন্তরে ধীরে ধীরে সংযম-অগ্নি সৃষ্টি করে এবং ইন্দ্রিয় ও

তার বিষয়সকলকে ঐ সংযম-অগ্নিতে আহুতি দেন। এঁরা আত্মবিষয়কে শ্রেয় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং জীবনে আত্মজ্ঞানের বিকাশ ঘটান। অপর দল জগতে ভোগের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়ে অর্পণ করেন এবং ইন্দ্রিয়-অগ্নি আরও বৃদ্ধি করেন এবং জীবনকে দিন দিন স্বার্থপরতা ও অপরাজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে তোলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তার দেখা হয়েছিল, নাম ইঙ্গারসোল—তিনি ছিলেন খুব যুক্তিবাদী এবং সুবক্তা। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোনও প্রয়োজন নেই। পরলোক নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই। তাঁর মত বোঝাবার জন্য তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছিলেন—'জগৎ যেন একটি কমলালেবু, আমাদের সামনে রয়েছে। লেবুটির সবটুকু রস আমরা বের করে নিতে চাই।'

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত, আমার নিকট জগৎ একটি কমলালেবু-রূপে রয়েছে, আমিও তার সবটুকু রস বের করে নিতে চাই। তবে আমাদের মধ্যে প্রভেদ আছে-সেটি হলো – আপনি ফলটি নিংড়ে লোভে তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে খেতে চাইছেন। আপনি মনে করেন জগতে এসে খেতে ও পরতে পারলেই যথেষ্ট এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানতে পারলেই জীবন সার্থক। আর আমি, আমার কোনও তাড়াতাড়ি নেই। জগতের প্রতিটি রসবিন্দু আস্বাদনের ভিতর দিয়ে জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করতে চাই। প্রাণের স্বরূপ কী তা জানতে চাই। আমি আমার অন্তরাত্মাকে জানব। এবং যখন জানব আমি অমর, নিত্য, শাশ্বত; আমার মৃত্যু নেই তখন জগৎ ভোগ করতে কোনও তাড়াতাড়ি থাকবে না। তাই আমার অনুসন্ধান হলো জগতের সকল আনন্দের পেছনে যে আনন্দের উৎস রয়েছে সেই উৎসকে জানা। সেই চির নিত্য আনন্দই আমার অন্তরাত্মা। আমার স্বরূপই হলো আনন্দস্বরূপ।'

ধর্ম সম্পর্কে ইঙ্গারসোলের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, তাঁর মধ্যে সততা ছিল। এইজন্যেই স্বামীজী তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। স্বামীজী পরে বলেছিলেন, 'একজন ভণ্ডের চেয়ে নাস্তিক ঢের ভাল। ইঙ্গারসোল বুঝেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ত্রুটি ও গোঁড়ামিটি কোথায় রয়েছে। স্বামীজীর সংস্পর্শে তিনি তাঁর কর্মচিন্তা পরিবর্তন করেছিলেন। এসময় তিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন, যদি ৫০ বছর আগে আপনি এ দেশে এই ধর্মশিক্ষা প্রচার করতেন, তাহলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হতো। আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো অথবা পাথর মেরে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো।

এই অধ্যায়ে অর্জুনের কাছে ভগবান নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলছেন : অবতার তিনি। 'অবতার বারে বার'। তাঁকে বারবার আসতে হয়েছে। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ভগবান সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হন। তাঁর এই জন্মলীলা ও কর্মলীলা যিনি উপলব্ধি

করতে পারেন, তিনি মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : অর্জুন, আমি সূর্যকে যে যোগধর্মের উপদেশ দিয়েছিলাম তা আমি তোমাকে এখন বলছি। ভগবান বিশেষ কর্মের নিমিত্ত, বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হন। জীব কর্মের অধীন, ভগবান কর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীন। জীব অজ্ঞ বলে পূর্বজন্মের কথা জানা নেই। ভগবান সর্বজ্ঞ তাই অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁর কাছে জানা।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) অহম্ (আমি) ইমম্ (এই) অব্যয়ম্ যোগং (অব্যয় অর্থাৎ অক্ষয় ফলদায়ক যোগ) বিবস্বতে (সূর্যকে) প্রোক্তবান্ (বলেছিলাম) বিবস্বান্ (সূর্য) মনবে (সূর্য তাঁর পুত্র মনুকে) প্রাহ (বলেছিলেন) মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলেছিলেন)।

শ্রীভগবান বললেন – এই অব্যয়যোগ আমি পুরাকালে সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য আবার তাঁর পুত্র মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগের কথা বলেছিলেন।

এতক্ষণ যে কর্মযোগের কথা বলা হল, তার লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান। অর্থাৎ যার দ্বারা আমার মুক্তি হবে। আমাদের শাস্ত্রে উপায় আর উপেয়র কথা আছে। উপেয় মানে আমি যা পেতে চাই। অর্থাৎ আমার লক্ষ্য। উপায় মানে যার সাহায্যে পেতে চাই। অর্থাৎ আমার পথ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমাদের সকলের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ করব কী করে? কর্মের দ্বারা। কীরকম কর্ম? নিষ্কাম কর্ম। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে, লোককল্যাণের জন্য আমি কাজ করব। একেই বলে কর্মযোগ। এর ফলে কী হবে? আমার চিত্তশুদ্ধি হবে। সব মলিনতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে। শাস্ত্র বলছেন, জ্ঞান আমাদের বাইরে থেকে অর্জন করতে হয় না। জ্ঞান আমার স্বরূপ। শঙ্করাচার্য 'আত্মবোধ-এ বলছেন : 'আত্মা তু সততং প্রাপ্তোঽপি অপ্রাপ্তবৎ ভবতি অবিদ্যায়া। তন্নাশে প্রাপ্তবৎ ভাতি স্বকণ্ঠাভরণম্ যথা।' আমার গলার হারটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ দেখলাম সেটা আমার গলাতেই আছে। তার মানে কি এই যে, হারটি আগে ছিল না, এখন পেলাম? না, হারটি বরাবরই আমার গলায় ছিল। কিন্তু আমি জানতাম না। ঠিক তেমনি জ্ঞান আমার ভেতরেই আছে। চিত্তের অশুদ্ধি, মলিনতাই জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। মেঘটা সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যাবে। চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান আপনা-আপনিই ফুটে ওঠে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। এই জ্ঞান কিন্তু বই-পড়া জ্ঞান নয়। এ সত্য, নিত্য, সনাতন। এই জ্ঞানকেই আমরা ব্রহ্ম বলি। জ্ঞান অবিনাশী। কোনও ক্ষয় নেই – অপরিবর্তনীয়, অক্ষয়। অব্যয়ফলপ্রদ

বলে এ জ্ঞানযোগকে অব্যয় বলা হয়েছে।

'ইমং যোগং' বলতে আগের অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানমিশ্র কর্মযোগকেই বোঝানো হয়েছে। এতে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ঘটেছে। এই যোগের ফল অব্যয়। তাই এই যোগও অব্যয়। কারণ মোক্ষই এই যোগের ফল। কল্পে কল্পে এই যোগ প্রচারিত হয়েছিল। এখানে সেই পরম্পরা দেওয়া হয়েছে। বিবস্বান্ (সূর্য) হতে যে বংশের উৎপত্তি, তাকেই সূর্যবংশ বলে। এই বিবস্বান্ হতে ৫৮তম অধস্তন পুরুষ হলেন শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : হে অর্জুন, এই যে যোগধর্মের কথা ব্যাখ্যা করলাম তা নূতন নয়, পুরাকাল হতে এটি প্রচলিত আছে, অতি প্রাচীন। সৃষ্টির শুরুতে এই অব্যয়-যোগের কথা আমি সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য নিজ-পুত্র মনুকে এবং মনু আবার তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। প্রশ্ন হল, শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ সূর্যকে বেছে নিলেন কেন? অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রও তো রয়েছে। সূর্য হলেন ক্ষত্রিয়কুলের প্রধান। সাহসী, বীর। এই অব্যয়যোগ সূর্যের আয়ত্তে থাকলে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল এই যোগের সাহায্যে ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একে অপরকে রক্ষা করলে সমগ্র সমাজ-সংসারে ঠিকভাবে চলতে থাকে। এইভাবেই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। বাস্তবিক এ-জগতে কত কিছু ঘটে। তার কতটুকু আমরা বই পড়ে শিখি? দেখেই তো শিখি। আমি আপনাকে দেখে শিখি। আপনি আবার আমাকে দেখে শেখেন। এভাবেই জ্ঞানের প্রসার হয়।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ।। ২

পরন্তপ (হে অর্জুন) এবং (এরূপে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পরম্পরাক্রমে আগত) ইমং (এই যোগ) রাজা-ঋষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (অবগত ছিলেন) ইহ (এই জগতে) সঃ (সেই) যোগঃ (যোগ) মহতা (দীর্ঘ) কালেন (কালবশে) নষ্টঃ (নষ্ট হয়েছে)।

হে অর্জুন, এইরূপে পরম্পরাক্রমে আগত এই যোগ রাজর্ষিগণ (ঋষিতুল্য ব্যক্তিগণ) অবগত ছিলেন। ইহলোকে এই যোগ কালপ্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন: পরম্পরাক্রমে আগত এই অব্যয়যোগ রাজর্ষিরাও জানতে পেরেছিলেন। রাজর্ষি অর্থাৎ রাজা ও ঋষি দুই-ই একসঙ্গে। ক্ষত্রিয়দের রাজর্ষি বলা হচ্ছে। মনু, ইক্ষ্বাকু, সূর্য - এঁরা সকলেই রাজর্ষি বলে পূজিত হতেন। একদিকে রাজা আর একদিকে জ্ঞানী। যে-সকল ক্ষত্রিয় রাজা জ্ঞানী ও কর্মী, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে রাজ্য পালন করতেন, তাঁরাই রাজর্ষি। যেমন জনক রাজা, তাঁরা জ্ঞানী হয়েও নিষ্কাম কর্ম করেছিলেন। সেজন্য সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা করত, সম্মান জানাত। সমীহ করে চলত।

পিতা থেকে পুত্র, পুত্র আবার তার পুত্রকে, এভাবে বংশপরম্পরায় এই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে। এই কাজে পিতা পুত্রকে বেছে নিতেন কেন? কারণ পুত্রই পিতার সবচেয়ে প্রিয়। পিতার গুণ পুত্রেই সবচেয়ে বেশি থাকার কথা। তাই ছেলেকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালক্রমে এই মহামূল্যবান অব্যয়যোগ নষ্ট হল। অর্থাৎ বিকৃত হল। কেমন করে? বাবা হয়তো স্নেহান্ধ। অধিকারী বিচার না করেই অযোগ্য, দুর্বল পুত্রকে এই বিদ্যা শেখালেন। পুত্র অযোগ্য তাই সে এই গুহ্যবিদ্যা আয়ত্ত করতে পারল না। বিকৃত করে ফেলল। ফলে সময়ের প্রভাবে তা ধীরে ধীরে লোপ পেল। পুত্র উপযুক্ত না হলে পিতা এই জ্ঞান তাঁর যোগ্যতম শিষ্যকে শেখাবেন। আমাদের শাস্ত্রে অধিকারী বিচার আছে। আমরা তো সবাই সমান আধার নই। তাই সব উপদেশ সবার জন্য খাটে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনকে যে-কথা আলাদাভাবে বলতেন তা হয়তো রাখালকে বলতেন না। আবার রাখালকে যা বলছেন তা হয়তো নরেনকে বলতেন না। অধিকারী বিচার না করে যে-কোনও ব্যক্তিকে এই গুহ্যতত্ত্ব বললে সে তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। বরং অপব্যবহার করবে। ফলে ধীরে ধীরে এই জ্ঞানের প্রভাব কমে আসবে। এইভাবেই একসময়ে তা নষ্ট হয়ে যায়। কালের প্রভাবে প্রত্যেক ধর্মেরই বিলোপ বা পরিবর্তন ঘটে।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'পরন্তপ' বলে সম্বোধন করছেন। 'পরন্তপ' – যিনি শত্রুকে দমন করেছেন। শত্রু বাইরে নেই, আমাদের ভেতরেই আছে। কাম, ক্রোধরূপ শত্রুকে যিনি শৌর্য, বীর্য তেজ ও বিবেকবৈরাগ্যের সাহায্যে সমূলে বিনাশ করেন তিনিই পরন্তপ। এককথায় বলতে গেলে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই পরন্তপ।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ।। ৩

ত্বং (তুমি) মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত এবং সখা হও) ইতি (সেজন্য) অয়ং (এই) সঃ (সেই) পুরাতনঃ যোগঃ এব (পুরাতন যোগই) অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) তে (তোমাকে) প্রোক্তঃ (বলা হলো) হি (যেহেতু) এতৎ (এটা) উত্তমম্ (উত্তম) রহস্যম্ (রহস্য, গুহ্যতত্ত্ব)।

যেহেতু তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, সেজন্যই সেই পুরাতন যোগই আজ তোমাকে পুনরায় বললাম। কারণ এটি অতি উত্তম গুহ্যতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে এই যোগধর্ম আমি সূর্যকে বলেছিলাম। কিন্তু কালের প্রভাবে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন, নিত্য, সনাতন সেই যোগধর্মই এখন তোমাকে বললাম। তুমি জিতেন্দ্রিয়। সুতরাং তুমিই এই জ্ঞানের যোগ্য অধিকারী। আবার তুমি আমার ভক্ত। আমাকে ভালবাস। আমার শরণাগত। আমার ওপরে নির্ভর করে আছ। শুধু ভক্তই নও, তুমি আমার সখা, বন্ধুও। বন্ধুর কাছে কোনও সংকোচ, দ্বিধা থাকে না। প্রকৃত বন্ধুর কাছে কোনও কিছু গোপন করা চলে না। তাই এতদিন যা

অজ্ঞাত ছিল তা আজ তোমার কাছে বলেছি।

তারপরে জ্ঞানের মহিমা বোঝাবার জন্য অর্জুনকে সাবধান করে বলছেন, এই অব্যয়যোগ-ধর্ম সকলের জন্য নয়। এটি অত্যন্ত গুহ্যবিদ্যা। জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। জ্ঞানের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ হল ব্রহ্মজ্ঞান। যোগধর্ম বলতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানকেই বোঝানো হয়েছে। অনধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ। মুণ্ডকোপনিষদে আছে : 'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম, গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি' – একসময় ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন : 'তোমরা আমাকে গোপনে রক্ষা কর। নয়তো আমি আর শুভফলদায়ক থাকব না।' অর্থাৎ কোনও অযোগ্য ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিলে সেই জ্ঞান যেন বলবে: 'আমি ফলপ্রসূ হব না। আমি তোমার কোনও উপকারে আসব না।' সুতরাং অনধিকারীর জীবনে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। বরং তা বিকৃত আকার ধারণ করে।

অর্জুন উবাচ
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ।। ৪

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন) ভবতঃ (আপনার) জন্ম (জন্ম) অপরং (পরবর্তী) বিবস্বতঃ (সূর্যের) জন্ম (জন্ম) পরং (পূর্ববর্তী) এতৎ (এটা) কথম্ (কীভাবে) বিজানীয়াং (জানব) ত্বম্ (আপনি) আদৌ (আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির শুরুতে) প্রোক্তবান্ ইতি (একথা সূর্যকে বলেছিলেন)।

অর্জুন বললেন—সূর্যের জন্ম আপনার জন্মের বহু পূর্বে হয়েছিল এবং আপনার জন্ম তার অনেক পরে। সুতরাং আপনি যে সৃষ্টির শুরুতেই এই যোগ সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন তা কীভাবে বুঝব?

ধর্মতত্ত্বের মধ্যে 'অবতারলীলা' বোঝা বেশ কঠিন ব্যাপার। ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান আমাদেরই মতো রক্তমাংসের দেহধারণ করে 'চৌদ্দপোয়া' মানুষ হয়ে জগতে আসেন এবং জীব উদ্ধার করেন—এ জ্ঞান স্বয়ং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ছাড়া হয় না। পুরাণে আছে দণ্ডকারণ্যে সহস্র সহস্র মুনি-ঋষি ছিলেন। তাঁরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে ভরদ্বাজ ইত্যাদি কয়েকজন মাত্র ঋষিই রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন এবং পূজা করেছিলেন। আর বাকি সকলে তাঁকে দশরথের বেটা বলেই জানতেন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থেকেও অর্জুন তাঁকে অবতার বা ভগবান বলে বুঝতে পারেন নি। অর্জুন ভাবছেন, শ্রীকৃষ্ণ তো আমার সখা। বড়জোর আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় হবে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই সূর্যকে এই যোগধর্মের উপদেশ দিয়েছিলাম।' অর্জুন ভাবছেন, এ কী করে হয়? সূর্যের জন্ম হয়েছিল সৃষ্টির আরম্ভকালে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু আগে। আর শ্রীকৃষ্ণ তো এই সেদিন বসুদেবগৃহে জন্ম নিলেন। এ কি বিশ্বাস করা যায়? আসলে অর্জুন তাঁকে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করলেও মাঝে মাঝে তা ভুলে যেতেন। কখনও কখনও বন্ধু বলে মনে করতেন। আবার শ্রীভগবানও আত্মগোপন করে কুরুক্ষেত্রের বহু আগে থেকেই তাঁর প্রিয় ভক্তদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। এই আত্মগোপনই লীলার কৌশল। ঐশ্বর্য প্রকাশে লীলাপুষ্টি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে কৃপা করে 'দিব্যচক্ষু' দিলেন তখনই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখতে পেলেন। তার আগে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহধারণ করলে রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই আছে। মনে হয়, আমাদেরই মতো। রাম সীতার শোকে কেঁদেছিলেন। ... অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হল।... ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু ঈশ্বরকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে সাধনের প্রয়োজন। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না। তিনি কৃপা করে ধরা দিলেই তাঁকে লোক চিনতে পারে।'

এখানে হয়তো শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের অবতার, হয় অর্জুন তা ভুলে গিয়েছিলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিকট অবতারতত্ত্ব জানার জন্যই এই প্রশ্ন করেছেন।

শ্রীভগবানুবাদ
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ।। ৫

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) পরন্তপ অর্জুন (হে শত্রুনাশকারী অর্জুন) মে (আমার) তব চ (ও তোমার) বহূনি জন্মানি (বহু জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হয়েছে) অহং (আমি) তানি সর্বাণি (সেই সকল) বেদ (জানি) ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (জান না)।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন – হে অর্জুন, আমার এবং তোমার উভয়েরই বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেসকল জানি, কিন্তু তুমি তা জান না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। 'তব চ অর্জুন' – তুমিও বহুবার এর আগে জন্মেছ। তবে তোমার আমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : এর আগে আমি কতবার জন্মেছি, কোন জন্মে আমি কী করেছি-এ সবই আমি জানি। অর্থাৎ সব জন্মের কথা আমার মনে আছে। শুধু তাই নয়, তোমারও সব জন্মের কথা আমি জানি। কিন্তু অর্জুন, তুমি তা জান না। কারণ তুমি মায়ার জালে বদ্ধ। মায়ার জন্যই তুমি নিজেকে দেহ মনে করছ। অজ্ঞানতার জন্য ভাবছ দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে তোমারও মৃত্যু হবে। ধর্ম-অধর্ম, রোগ-শোক, মায়া-মোহ – ইত্যাদি তোমার ভেতরের জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে। এই অজ্ঞানতার জন্যই তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে আছ।

তারপর বলছেন, আমার জ্ঞান তোমার জ্ঞানের মতো নয়। আমি দেশ, কাল,

পাত্রের ঊর্ধ্বে। জ্ঞানস্বরূপ। আমি সর্বজ্ঞ। আমি জানি যে, আমার জন্মও হয়নি, মৃত্যুও হবে না। জন্ম-মৃত্যু দেহের। আমার নয়। আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। আমি অবিনাশী, অজর, অমর। আমি দেহ নই, আত্মা – এই জ্ঞানে আমি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এক কথায়, আমি মায়াধীশ। মায়ার অধীন নই। আমার স্বরূপকে আমি জেনেছি। স্বরূপজ্ঞান হলে তার কখনও বেতালে পা পড়ে না। স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়ে যায় না।

অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা। তাই স্বেচ্ছায় তিনি অর্জুনের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করছেন। অবতার তিনি। 'অবতার বারে বার'। তাঁকে বারবার আসতে হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : অর্জুন, আমি সূর্যকে যে যোগধর্মের উপদেশ দিয়েছিলাম তা এ জন্মে নয়, বহু পূর্বে অন্য কোনও জন্মে। জীব যেমন নিজের কর্মফলবশত বারংবার জন্মগ্রহণ করে, ভগবানের জন্ম সেইরূপ নয়। ভগবান বিশেষ কর্মের নিমিত্ত, বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হন। জীব কর্মাধীন, ভগবান কর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীন। জীব অজ্ঞ বলে পূর্বজন্মের কথা জানা নেই। ভগবান সর্বজ্ঞ, তাই অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁর কাছে জানা।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।। ৬

(আমি) অজঃ (জন্মরহিত) অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বর) সন্ অপি (হয়েও) ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ সন্ অপি (সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও) স্বাম্ প্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করে) আত্মমায়য়া (নিজ মায়া দ্বারা) সম্ভবামি (জন্মগ্রহণ করি)।

আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজ মায়াশক্তি দ্বারা জন্মগ্রহণ করি বা অবতীর্ণ হই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অবতারতত্ত্ব বুঝিয়ে বলছেন। বলছেন, 'আমার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। আমি অব্যয়। সকলের ঈশ্বর। সবকিছু আমার থেকেই এসেছে। আমার মায়া দ্বারা আমি স্বেচ্ছায় বারবার জন্মগ্রহণ করি। অর্থাৎ যেন দেহধারণ করি।' ব্রহ্ম বা স্বয়ং ঈশ্বরই অবতাররূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। পুরাণে আছে 'মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।' নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, মায়ার আশ্রয় নিয়ে সগুণ হয়েছেন। নিজের মায়াকে অবলম্বন করে অবতার হয়েছেন। অবতারকে দেখা মানেই ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন। বেদান্তমতে, ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক ব্রহ্ম বা ঈশ্বর রয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি সর্বব্যাপী। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। 'সর্বভূতান্তরাত্মা' – সকলের অন্তরাত্মা তিনি। অথচ ব্যাবহারিক জগতে আমরা 'বহু' দেখি। এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশমাত্র, সকল জীবই নামরূপের সীমার

মধ্যে অসীমের আত্মপ্রকাশ। কত রকমের মানুষ – কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ। এই বিশেষ গুণগুলিকে বলা হয় উপাধি। কিন্তু ব্রহ্ম তো 'নিরুপাধিক' – তাঁর কোনও উপাধি নেই। তাঁর ওপর এই উপাধিসকল আরোপ করা হয়েছে। ফলে এক ব্রহ্ম 'বহু' হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছেন। উপাধির কাজই হচ্ছে অখণ্ড বস্তুকে খণ্ড করা। কারণ খণ্ড না হলে যে ব্যবহার চলে না। সমুদ্রের জল ব্যবহার করতে হলে কলসীতে রাখতে হয়। নইলে ব্যবহার করা যায় না। শাস্ত্র বলছেন, এই উপাধিই হচ্ছে মায়া। যিনি নিত্য শুদ্ধ অসীম পরব্রহ্ম, তিনিই আবার তাঁর সৃজনীশক্তি মায়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হন। মায়ার জন্যই 'এক'কে 'বহু' দেখছি। মায়ার জন্যই বুঝতে পারছি না, আমরাও সেই ব্রহ্ম। শাস্ত্রে মায়ার সম্বন্ধে বলছে 'অঘটনঘটনপটীয়সী', 'অনির্বচনীয়' ইত্যাদি। মায়ার কোনও ব্যাখ্যা চলে না। কেন এল তা বলা যায় না। আছে, এই পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় : কামকাঞ্চনই মায়া। অর্থাৎ ভোগবিলাস, কামনা-বাসনা এ সবই মায়ার ফল। এই ফলকেই তিনি মায়া বলছেন। না হলে মায়াকে বুঝব কেমন করে? মায়ার কাজ মানুষকে ভুলিয়ে রাখা। কার মায়া? যিনি মায়াতে নিজে মুগ্ধ নন তাঁরই মায়া। তিনিই স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং ভগবানই নিজের মায়াকে আশ্রয় করে মানুষদেহ ধারণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতারতত্ত্ব অতি সহজভাবে বোঝাচ্ছেন, সচ্চিদানন্দ যেন অখণ্ড সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে। তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার মূর্তির দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে স্তব করছে, ঠাকুর তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার, আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে তোমাকেই বাক্যমনের অতীত বলেছে।

ভগবানের এই দেহধারণের কারণ কী? এর উত্তরে শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বলছেন, 'স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া'। অর্থাৎ অবতারপুরুষের নিজের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন না থাকলেও ভক্তকে কৃপা করার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লোককল্যাণের জন্যই তাঁদের আবির্ভাব – 'লোকসংগ্রহার্থম্'। করুণায় বিগলিত হয়েই তাঁদের দেহধারণ। 'অহেতুকী করুণা', এ করুণার কোনও কারণ নেই। অবতারের তো এজন্যেই আসা। ভক্তের ভালবাসার জন্য সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চৌদ্দপোয়া হয়ে লীলা করতে আসেন। ভক্তেরা তাঁকে চান। ভক্তেরা একা একা খেলবেন কী করে, আর একজন যদি না থাকে? তাই ভগবানের আসা। ভগবান কখনও ধরা দেবেন, কখনও দেবেন না। এই তাঁর লুকোচুরি খেলা। ভগবান লুকোচ্ছেন। ভক্ত তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই খুঁজে বেড়ানোর মধ্যে আনন্দ আছে। তাতে যদি কাঁদতেও হয়, তবুও আনন্দ। কারণ

কান্নার পরেই হাসি। এই খেলা হবে না, যদি তিনি নিজে ছোট হয়ে না আসেন। শাস্ত্রে সুন্দর সুন্দর সব কথা আছে। বলছেন : 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ । জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ।।' আমি কৃষ্ণরূপে ছোট হয়ে এসেছি। আর সকলের মত আমারও অসুখ করে, খিদে পায়। মা আমাকে শাসন করে। মাঝে মাঝে মারে, আদর করে। নইলে তো তোমরা আমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারবে না। আমার লীলায় সাহায্য করতে পারবে না। এ সবই আমি করি লোককল্যাণের জন্য। যা দেখে, যা শুনে, যা অনুসরণ করে মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়ে ওঠে। আবার বলছেন, মনে রেখো, এই অখিল বিশ্বে কেবল 'আমি'ই আছি। আমিই সর্বভূতে বিরাজ করছি। অখিলাত্মা। ইচ্ছে করলেই আমি আমার স্বরূপে লীন হয়ে যেতে পারি।

ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি যেন ছোট শিশু। কতভাবেই না সে লীলা করে। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। তাই তো বলা হয় 'মর্তলীলা মনোহরা।' ভাগ্যবান যারা তারা বুঝে নেয়, চিনে নেয়, ভাগ নেয়। তাঁর কাছে আবদার করে, জোর খাটায়। বলে আমারও প্রাপ্য আছে, আমাকেও এই আনন্দের ভাগ দিতে হবে। আবার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান কত কি না করে! ভক্ত- ভগবানের মধুর সম্পর্ক। ভগবানের কাছে ভক্তের কোনও সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই। ভগবানের মতো আপনজনও তার আর কেউ নেই । আবার ভক্তকে পেয়ে ভগবান কী খুশি! তাঁর আর আনন্দ ধরে না। ভগবান নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য ব্যগ্র। ভক্তের ভালবাসার জালে তিনি চিরকালের জন্য বাঁধা পড়েন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।। ৭

ভারত (হে অর্জুন) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধর্মস্য (ধর্মের) গ্লানিঃ (পতন) অধর্মস্য (অধর্মের) অভ্যুত্থানম্ (উত্থান) ভবতি (হয়) তদা (তখনই) অহম্ (আমি) আত্মানং (নিজেকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি)।

হে অর্জুন, যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি অর্থাৎ অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই।

ভগবান কীভাবে নরদেহ ধারণ করে জগতে অবতীর্ণ হন তা পূর্বে বলেছেন। এখন তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন সম্বন্ধে বলছেন। বাস্তবিক, সর্বশক্তিমান ভগবানের জীবজগতের কল্যাণের জন্য নরদেহ ধারণ করে আবির্ভূত হওয়া আধ্যাত্মিক জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখি, মাঝে মাঝে এমন একটা সময় আসে যখন সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। মানুষ পথ হারায়। মানুষ যখন চার যোগের পথ (জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ) ভুলে যায়

কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা প্রেয়, কোনটা শ্রেয়। তখনই ধর্মের গ্লানি আসে। সত্যের শক্তিতে, ধর্মের শক্তিতে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। অধর্মের প্রতি, অন্যায়ের প্রতি মানুষ একটা দুর্বার টান অনুভব করে। একটা আত্মবিস্মৃতি এসে মানবসমাজকে গ্রাস করে। এরকম যখন হয়, মানুষ যখন নিজের শক্তিতে আর নির্ভর করতে পারে না, তখন ভগবান স্বয়ং আসেন মানুষকে পথ দেখাতে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'ধর্মের যখন গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই '' অহম্ আত্মানম্ সৃজামি'' – আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করি।' ধর্ম বলতে এখানে বেদবিহিত ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে। এই ধর্মকে আশ্রয় করেই মানুষ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ – দুই-ই লাভ করে। প্রবৃত্তি (বিধি) ও নিবৃত্তি (নিষেধ) হল ধর্মের মূল সত্তা। এখানে কয়েকরকমের ধর্মের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আশ্রম ধর্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। আবার ভগবৎ-ভক্তি, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, সম্মান জানানো – এও ধর্ম। কালের প্রভাবে জগৎ যখন পাপের ভারে পূর্ণ হয়, তখন ভগবান দয়াপরবশ হয়ে যেন নিজ কর্তব্যবোধে জগতে অবতীর্ণ হন। অবতার ভগবানেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ। জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞান যে-ভাবে কাজ করে অবতারও সেইভাবে কর্ম করেন —মানবজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মানবসমাজের নৈতিক পরিবর্তনের জন্য।

হিন্দুদের বিশ্বাস, এভাবেই ভগবান এসেছেন বারবার যুগের প্রয়োজনে। আপাতদৃষ্টিতে আমাদেরই মতো তিনি চলেন, ফেরেন। শোক-তাপ, ব্যাধি-যন্ত্রণা সহ্য করেন। সবকিছুই তাঁদের সাধারণ মানুষের মতো। কিন্তু তবুও সবকিছুই যেন অসাধারণ। তাঁদের সবকিছুই লৌকিক, আবার তার মধ্যে অনেক কিছুই আছে অলৌকিক। কেন তাঁরা সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন? কারণ, তা নাহলে আমরা তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, অবতার হলেন সূর্যোদয়ের সময়কার সূর্য। ভোরের সূর্যের দিকে আমরা তাকাতে পারি। কিন্তু মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে তাকাতে পারি না। অবতার মানুষের কাছে একটু নরমভাব ধরে আসেন। শক্তি ঢেকে আসেন । আমাদের জন্য, আমাদের প্রয়োজনেই তাঁর আসা। তাই তো আমাদের মধ্যে আমাদের মতো করেই থাকেন। আমাদের সকলকে কাছে টেনে নেন। আমরা বুঝতেও পারি না – কে তিনি, কী তাঁর স্বরূপ। তার পর হঠাৎ একদিন চলে যান, তখন আমরা চমকে উঠি। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করি, তিনি আমাদের এমন কিছু দিয়ে গেছেন, যা আমাদের ছিল না। আমাদের মধ্যে প্রেম ছিল না, তিনি প্রেম দিয়ে গেছেন। পবিত্রতা কী ভুলে গেছিলাম, তিনি তা দেখিয়েছেন। ত্যাগ-বৈরাগ্য, ভক্তি, বিবেক এসব আমরা বইতে পড়েছিলাম। তিনি কিন্তু আমাদের সেসব শিখিয়েছেন। নিজের জীবনে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এককথায় তিনিই হলেন জীবন্ত ধর্ম। ধর্মের প্রতি আমাদের আস্থা, বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যই তাঁর যুগে যুগে এই শরীর

ধারণ করে আসা, ধর্মের বাস্তবরূপ দেখিয়ে দিয়ে যাওয়া।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।। ৮

সাধূনাং (সাধুগণের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য, অধর্ম থেকে রক্ষা) দুষ্কৃতাং (দুষ্টদের) বিনাশায় (বিনাশের জন্য) ধর্ম-সংস্থাপন-অর্থায় চ (ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য) যুগে যুগে (প্রতিযুগে) সম্ভবামি (আমি অবতীর্ণ হই)।

সাধুদের পাপ ও অজ্ঞান থেকে পরিত্রাণ, দুষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ পাপীদের বিনাশ করা ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অর্থাৎ নরদেহ ধারণ করি।

বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সাধুসন্ত ও মহাপুরুষরা থাকা সত্ত্বেও কালের প্রভাবে জগতে ধর্মের গ্লানি হয়। দুর্বৃত্তের উৎপীড়নে সমাজে অধর্মের সৃষ্টি হয়। বহু লোক ভয়ে বা লোভে দুর্বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই ধর্মের গ্লানি দূর করতে ভগবান মানুষের শরীর ধারণ করে এই ধরাধামে নেমে আসেন। এখন প্রশ্ন হল, তিনি এসে কী করেন? দুষ্কৃতদের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ এবং নীতি ধর্মের সংস্থাপন। সাধুদের রক্ষা, দুষ্ট পাপীদের বিনাশ এবং ধর্মকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাঁর দেহধারণ। সাধু কে? যিনি বেদবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, আর স্বধর্মে রত। ধর্ম মানে সত্য, যাকে ধরে আমি চলতে চেষ্টা করছি । সাধুর ধর্ম হচ্ছে ক্ষমা, অহিংসা, সর্বভূতে প্রেম এবং সবসময় পরোপকারের চেষ্টা করা। মিথ্যা, অন্যায় এবং অপরের অনিষ্ট চিন্তা তিনি কখনোই করেন না। সব অবস্থাতে তিনি সত্যকে ধরে থাকেন। প্রাণ গেলেও নিজের ধর্ম থেকে এক চুলও সরে আসেন না। সাধু হলেন ত্যাগীর বাদশা। আর অসাধু কারা? যারা ইন্দ্রিয় ভোগ-সুখে মত্ত। জীবনের উদ্দেশ্য কী তা তারা জানে না। তাই যে-কোনও উপায়েই তারা তাদের ভোগের লালসাকে চরিতার্থ করে। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এ-সবের কোনও গুরুত্বই নেই তাদের জীবনে। যখন যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায়। এককথায়, যারা বেদনিষিদ্ধ কর্ম করে তারাই দুষ্কৃতি বা অসাধু। এদের অত্যাচারে সমাজ-সংসার বিপর্যস্ত হয়। আর তখন অত্যাচারীকে বিনাশ করে সাধুকে রক্ষা করতেই অবতার আমাদের মধ্যে নেমে আসেন। ঈশ্বর এইভাবে দুষ্ট ব্যক্তিদের দমন করেন বলে তাঁকে যেন আমরা নিষ্ঠুর মনে না করি। শ্রীদেবীভাগবতে আছে, মা সন্তানকে আদর করেন। আবার প্রয়োজনে শাসনও করেন। কিন্তু শাসন করেন বলে কি মা সন্তানকে ভালবাসেন না? নাকি মার ভালবাসায় কোথাও ছেদ পড়ে ? ঠিক তেমনি গুণ-দোষের নিয়ন্তা ঈশ্বরকেও কখনোই অকরুণ বলা যায় না।

অবতারের আসার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা। 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে' - শুধু ধর্মগ্রন্থে কিছু হয় না, জীবনের আদর্শের প্রয়োজন। অবতার একটা আদর্শ জীবন দেখিয়ে যান। ধর্মভাব জগতে প্রচার করেন। তাঁদের দেখে

আমরা শিখি-ত্যাগ কাকে বলে, প্রেম কাকে বলে, সহিষ্ণুতা কাকে বলে, সরলতা কাকে বলে, ঈশ্বর নির্ভরতা কাকে বলে । এগুলিই ধর্মের সার কথা। পূজা, পার্বণ, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ইত্যাদি ধর্মের সহায়ক বটে, কিন্তু ধর্মের মর্ম হচ্ছে প্রেম, পবিত্রতা,জ্ঞান, সংযম, ক্ষমা, উদারতা, ত্যাগ। অবতার এসে এগুলি নিজ জীবনে আচরণ করে দেখান। তাঁর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লোক ধর্মপথ অনুসরণ করে। এভাবেই ভগবান জগতে ধর্মসংস্থাপন করেন। তাই বলা হয় অবতার পুরুষের মুক্তি নেই । আমরা সাধারণ মানুষ জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছি। বারবার ধরে আসছি আর যাচ্ছি। আমরা একদিন না একদিন এই চক্রের বাইরে যাব। আর তখনই আমরা মুক্ত হব। কিন্তু যখনই জগতে ধর্মের বিপর্যয় ঘটবে তখনই অবতারকে আসতে হবে। কারণ তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যুগ যুগ ধরে এই তো হয়ে আসছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ - এঁদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁদের আবির্ভাব হচ্ছে যখন ভারতবর্ষ ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ডুবতে যাচ্ছে, ধর্মের গ্লানিতে পূর্ণ এবং দুর্বৃত্তদের ধর্মবিরুদ্ধ কাজে সমাজ অন্ধকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় প্রচার ও স্বীয় জীবনে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, প্রকৃত নীতি - ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও দুরাচারদের দমন করে, সমাজে সাধু সৎ ব্যক্তিদের প্রাধান্য এবং তাঁদের জীবনকে ঈশ্বরলাভের পথে মোড় ফেরালেন। তাই ভগবান জগতের সকলের অবগত হওয়ার জন্য বলছেন, তিনি যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করে জগতে আসেন এবং তিনি শুভকর্ম, বিবেক-বৈরাগ্য, ত্যাগ-তপস্যা, জ্ঞান-ভক্তি, প্রেম ও ঈশ্বরপরায়ণতার যুগোপযোগী আদর্শ জীবন দেখিয়ে ধর্মসংস্থাপন করেন। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে এক অপূর্ব প্রণামমন্ত্র রচনা করলেন—'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে, অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ'—হে শ্রীরামকৃষ্ণ! তোমাকে প্রণাম, তুমি এসেছিলে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে, কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। পরন্তু প্রত্যেক ধর্মের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ এবং অবতারবরিষ্ঠায়, পরম ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশস্বরূপ! হে রামকৃষ্ণ! তোমাকে আমার প্রণাম জানাই।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ।। ৯

অর্জুন (হে অর্জুন) মে (আমার) এবং (এই প্রকার) দিব্যম্ (দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক) জন্ম (জন্ম) কর্ম চ (এবং কর্ম) যঃ তত্ত্বতঃ (যিনি স্বরূপত অর্থাৎ যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন) দেহং (দেহ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ন এতি (প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ আর জন্ম হয় না)।

হে অর্জুন, যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও অলৌকিক কর্ম স্বরূপত জানেন, তিনি

দেহত্যাগ করে পুনরায় আর সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি চিরমুক্ত হয়ে আমাকেই লাভ করেন।

অবতারের সব কাজেরই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে—জীবের প্রতি করুণা। তাই তিনি মানুষদেহ ধারণ করে নেমে আসেন। পূর্বজন্মের কর্মফল ক্ষয় করতে তাঁর জন্ম নয়। সাধারণ মানুষ প্রারব্ধের বশে জন্মগ্রহণ করে। পূর্বজন্মের অপূর্ণ বাসনা ভোগ করার জন্যই মানুষকে বারবার আসতে হয়। অবতারের দেহধারন কিন্তু সেরকম ঘটনা নয়। লোককল্যাণের জন্য মায়ার অধীশ্বর হয়েও তিনি জন্মগ্রহণ করেন । লোককল্যাণকে যদি বাসনা বলে ধরা যায় তবে তিনি তা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছেন। নইলে তাঁর স্থূলদেহ ধারণের কোনও সার্থকতাই থাকে না। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'আমি সব করছি, আবার কিছুই আমি করছি না।' অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি সব করছেন, কিন্তু কোনও কর্মেই তিনি লিপ্ত হচ্ছেন না। কর্তৃত্ববুদ্ধি নিয়ে তিনি কোনও কাজ করেন না। অকর্তা, সাক্ষী, দ্রষ্টা তিনি । এই জন্যই বলা হয় অবতার – পুরুষের জন্ম ও কর্ম দুই-ই অলৌকিক, দিব্য।

অবতার যখন মানুষের রূপ ধরে আসেন তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করেন। একটি গানে আছে : 'কে তুমি ধরায় এসে পাগলবেশে হরি হয়ে বলছ হরি।' আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি আমাদেরই মতো। জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক ইত্যাদি তাঁর জীবনেও দেখা যায়। প্রশ্ন ওঠে অবতার যদি মানুষের ধর্মই স্বীকার করে নেন তবে মানুষ আর অবতারে পার্থক্য কী? তফাত হল অবতার ইচ্ছা করলেই তাঁর চোখের বাঁধন খুলে ফেলতে পারেন। মানুষ পারে না। মানুষ বন্ধনের মধ্যেই ছটফট করে। অবতারও অজ্ঞানকে আশ্রয় করে আসেন । তাঁর দৃষ্টিও সাধারণ মানুষের মতো মায়ায় কতকটা আচ্ছন্ন থাকে। তবে সেই মায়ার অধীশ্বর তিনি নিজেই । তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই মায়াকে সরিয়ে দিতে পারেন। সেজন্যই তো তিনি মায়াধীশ। অজ্ঞানের জন্য সাধারণ মানুষ কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়ে। তারা বাধ্য হয়ে যা ভোগ করে , অবতারপুরুষরা স্বেচ্ছায় তা বরণ করে নেন লোককল্যাণের জন্য।

অবতারপুরুষের জীবনে দেবভাব ও মানবভাব দুয়েরই মিলন ঘটে। এ দুটি ভাবই তাঁর স্বাভাবিক। নিছক কল্পনা বা ভান নয়। দেহ ধরে এলেই দণ্ড ভোগ করতে হয়— 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।' ভক্তির আতিশয্যে আমরা সাধারণ মানুষরা মনে করি অবতারের মানবভাব কপটতা, ছলনা। সীতার জন্য যখন রামচন্দ্র কাঁদছেন সে কি কপটতা? অভিনয় মাত্র? যদি তা হত তবে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত। তিনি পুরুষোত্তম হতে পারতেন না । অবতারের প্রতিটি ব্যবহারই সত্য। কখনও মায়াগ্রস্ত হয়ে কাঁদছেন, কখনও আবার রাজরাজেশ্বররূপে যে যা চাইছে তা দিতেই ব্যস্ত। তাই অবতারকে ঈশ্বররূপে দেখতে হয়, আবার মানবরূপেও দেখতে হয়।

স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে অবতারের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, অবতারের মানবভাব নিখুঁত মানবভাব। অভিনয় নয়। অভিনেতা কখনও ভুলে যায় না তার আসল রূপ । অবতার কখনও কখনও নিজের স্বরূপকে ভুলে যান নিখুঁত অভিনয় করার জন্যে। দুঃখে কাঁদেন, সুখে হাসেন, কিন্তু তাঁর স্বরূপ অক্ষুণ্ণ। তিনি যদি নিজ স্বরূপে লীন হয়ে থাকতেন তবে তাঁকে অবতার না বলে ঈশ্বর বলা উচিত হত। অবতরণ মানে নীচে নেমে আসা। নেমে এসে তিনি যেন সেতুরূপে কাজ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, বাচ খেলেন। মানুষের ইহকাল পরকাল, নিত্য-অনিত্য, সীমা ও অসীমের ভিতর দিয়ে ইচ্ছামতো তিনি একবার এদিক, একবার ওদিকে যেতে পারেন। ইচ্ছে করলে আমাদেরও নিয়ে যেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এই অবতারতত্ত্ব বোঝা বড় কঠিন। তিনি ধরা দিলে বোঝা যায়, নচেৎ নয়। ভগবান নিজেই বলছেন—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা' অর্থাৎ আমি জন্মশূন্য হয়েও, অব্যয় অবিনশ্বর হয়েও, ভূতসকলের ঈশ্বর হয়ে নিজ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নিজমায়া-অবলম্বনে জন্মগ্রহণ করি বা অবতীর্ণ হই।

অবতার মানবরূপে আসেন – একথা হয়তো আমরা কখনও কখনও বুঝতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি অবতারের সত্যস্বরূপকে জেনেছেন, বুঝেছেন তাঁর আর জন্ম হয় না। তাহলে তিনি কোথায় যান? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'মামেতি' – আমার মধ্যে মিলিত হয়ে যান। আমাতে গলে যান, ডুবে যান। অর্থাৎ তিনি আমার মধ্যে মিশে যান। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আর তাঁকে ঘুরপাক খেতে হয় না। তিনি মুক্ত হয়ে যান।

অজ্ঞ লোকেরা ভগবানের এই দিব্যজন্ম ও কর্মের তত্ত্ব যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা হয় অবতারকে সামান্য মানুষ জ্ঞান করে, তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, অথবা অবতারের জীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনা আরোপ করে তাঁকে অতিমানবে রূপান্তরিত করে। কিন্তু যাঁরা যথার্থদর্শী, যাঁরা অবতারের দিব্য জন্ম ও কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন তাঁরা অবতারের জীবন অনুসরণপূর্বক নিজেরাও সেই ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁরা অজ্ঞান অতিক্রম করে ভগবানের দিব্যজীবন লাভ করেন। সংসারে নিষ্কাম দিব্যকর্ম সম্পাদনপূর্বক ভগবানকে প্রাপ্ত হন। তাঁরা আর সংসারে ফিরে আসেন না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যিশুখ্রীস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন সম্পর্কে যাঁরা যথার্থ বুঝেছিলেন এবং ঈশ্বর বলে তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা নিজেদের জীবনে দিব্য আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভ করেছিলেন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ।। ১০

বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত) মন্ময়াঃ (মদগত চিত্ত, আমাতে সমাহিত চিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে আশ্রয় করে) জ্ঞানতপসা পূতাঃ (জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব) আগতাঃ (লাভ করেন)।

বিষয়-অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করে আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার শরণাগত হয়ে জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্রচিত্ত হয়ে অনেকেই আমার পরমানন্দ স্বরূপ (ব্রহ্মভাব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব) উপলব্ধি করে মোক্ষ লাভ করেন।

বর্তমান শ্লোক ও এর আগের শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন : 'যিনি আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব ঠিক ঠিক জানেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন।' তাঁরা তিনটি জিনিসকে অতিক্রম করেন। সেগুলি হলো—রাগ, ভয়, ক্রোধ। বীত শব্দের অর্থ বর্জিত। 'বীতরাগঃ'– –তখন তাঁর বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হয়। রাগ অর্থাৎ বিষয়ে অনুরাগ। বীতরাগ মানে যাঁর কোনও কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে একটা কথা আছে: 'আপনার যদি একটার প্রতি আকর্ষণ থাকে তবে আর একটার প্রতি বিকর্ষণ থাকবে । একটাকে আপনি ভালবাসেন, আর একটাকে বাসেন না। একটা থাকলে আর একটা এসেই যায়। তারপর বলছেন, ভয় অর্থাৎ প্রাপ্তবিষয় নাশের আশঙ্কা। তিনি 'বীতভয়ঃ'— কোনও কিছুকে ভয় করেন না। আমাদের ভয়ের মূলে আছে দুই বোধ। শাস্ত্র বলেন 'দ্বিতীয়াৎ বিভেতি'। আমি আমার থেকে আলাদা কোনও বস্তুকে ভয় পেতে পারি। যেমন আমার হয়তো অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে। তা যে-কোনও মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। পাছে বিষয়সম্পত্তি হারাই সে ভয় সবসময় আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। ভগবান এখানে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণগুলি সব বলছেন । ক্রোধ অর্থাৎ বিষয়প্রাপ্তিতে বাধাজনিত রোষ। তিনি 'বীতক্রোধঃ', কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোনও ক্রোধ নেই, হিংসা নেই। এরূপ ব্যক্তি 'মন্ময়া', মদ্গত চিত্ত হয়ে আছেন। আমাকে ছাড়া তিনি কিছু চেনেন না, জানেন না, বোঝেন না। কেবলমাত্র আমাকেই তিনি ভালবাসেন। এ অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মতো। সূর্যমুখী ফুল সবসময় সূর্যের দিকে চেয়ে আছে। ভক্তও ঠিক তাই । সবসময় ঈশ্বরমুখী হয়ে আছেন। আরও বলছেন, 'মাম্ উপাশ্রিতাঃ' – আমার উপর তিনি নির্ভর করে আছেন। আমাকে আশ্রয় করে আছেন। তাঁর দেহ-মন-প্রাণ আমাতেই সমর্পিত। ভক্তের ভাবটি হচ্ছে: তিনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আমার আর ভাবনা কী? আমি কেন চিন্তা করতে যাব? তিনিই আমায় দেখবেন।

এরকম ভক্তেরা ভগবানের অলৌকিক জন্ম ও কর্মের রহস্যকে স্বরূপত জানেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কারণ ভগবানের লীলাকথা ভাসা-ভাসা শুনলেই হয় না। এটি ধ্যানের বিষয়। শ্রীভগবান জন্মরহিত (অজ), অব্যয়, অব্যক্ত হয়েও কীভাবে নিজ মায়াকে আশ্রয় করে দেহধারণ করেন – এ তত্ত্বকে বোঝা

মুখের কথা নয়। আবার নিষ্ক্রিয়, অকর্তা হয়েও তিনি কীভাবে লোককল্যাণের জন্য কাজ করেন সেকথা বোঝা সত্যিই কঠিন। যে ব্যক্তি এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন তাঁর চিত্তের সব মলিনতা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। এই জ্ঞানরূপ তপস্যার ফলে মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য তপস্যা চাই। জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য তপস্যার উপর জোর দিয়েছেন। কারণ কাম, ক্রোধ ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি মনের আবেগকে জ্ঞানের আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই হলো জ্ঞানের তপস্যা। এই তপস্যায় ব্যক্তির মন শুদ্ধ হয়। তিনি পবিত্র হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তখন 'মদ্ভাবম্ আগতা' আমার ভাবকে, আমার স্বরূপকে লাভ করে তিনি আমার মতোই হয়ে গেছেন। ভগবানের স্বরূপকে (নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত) ঠিক ঠিক জানলে ভক্ত ভগবানের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। ভক্তই ভগবান হয়ে যান। তপস্যার দ্বারা মানুষ যদি চিত্তের কামনাবাসনা ত্যাগ করে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে, তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন, তখন তিনি ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা পবিত্র হয়ে পরম আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।। ১১

পার্থ (হে অর্জুন) যে (যারা) যথা (যে ভাবে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করে) অহম্ (আমি) তান্ (তাদের) তথা এব (সেভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করি, অর্থাৎ ফলদান করি) মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম (আমারই) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে)।

হে অর্জুন, যারা আমাকে যেভাবে (সকাম বা নিষ্কাম, সগুণ বা নির্গুণ) উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি অর্থাৎ তার প্রার্থনা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি। মানুষ সর্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করে। অর্থাৎ তারা যে-পথই (ধর্মমার্গই) অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে পৌঁছুতে পারে—আমিই সর্বভাবময়।

প্রশ্ন হচ্ছে—'যে-সকল নিষ্কাম ব্যক্তি জ্ঞানরূপ তপস্যার ফলে পবিত্রতা লাভ করেছেন অর্থাৎ যাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, কেবলমাত্র তাঁরাই তোমাকে (শ্রীভগবানকে) লাভ করে। আর অন্য সকলের (অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিদের) কাছে তুমি তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর না। তবে তো তোমারও পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে।'—অর্জুনের মনে পাছে এই সন্দেহ জাগে তা দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যে যথেতি' অর্থাৎ যে যেভাবে আমাকে পেতে চায়, আমি তার কাছে সেভাবেই ধরা দিই। কেউ হয়তো আমাকে 'কালী' বলে ডাকে। আমি তার কাছে 'কালীরূপে' প্রকাশিত হই। আবার কেউ আমাকে 'শিবরূপে' পেতে চায়। তার কাছে আমি 'শিবরূপে' ধরা দিই। আবার যে-সব ব্যক্তিরা ফল কামনা করে আমাকে ডাকে আমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। যারা বেদবিহিত কর্ম করে মোক্ষ

লাভ করতে চায় তাদের আমি জ্ঞান দান করি। যারা জ্ঞানী, মুমুক্ষু ও সন্ন্যাসী তাদের মোক্ষলাভে সাহায্য করি। আর পীড়িত ব্যক্তিদের দুঃখ-কষ্টকে আমি হরণ করে নিই। অর্থাৎ যে যেভাবে আমাকে পেতে ইচ্ছা করে, আমি তাদের কাছে সেভাবেই হাজির হই। কিন্তু যে যা চায় না, আমি তাকে তা দিই না। মায়া-মোহ দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আমি কোনও কাজ করি না।

প্রশ্ন হল, কীভাবে তাঁকে পাব? উপায় অনেক। যার যেমন রুচি, যার যেমন সাধ্য, সে সেভাবেই ভগবানকে ডাকুক। তাতেই হবে। আপনি ধনী, আপনি হয়তো কতরকমের নৈবেদ্য সাজিয়ে ঈশ্বরের পুজো করছেন। আমি গরিব, আমার অত কিছু দেবার সামর্থ্য নেই, তাই ভগবানকে শুধু জল দিয়েছি। আন্তরিক হলে তিনি সবার পুজোই গ্রহণ করেন। ভগবান তো আমাদের মন দেখেন। কে কী দিল তা দেখেন না। তিনি লক্ষ করেন, কীভাবে দিল। ভালবেসে দিল তো? মনপ্রাণ সব উজাড় করে দিল তো? তাঁকে পাবার কোনও একটা কঠিন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তাঁর কাছে পৌঁছুবার পথ অনন্ত।

এই শ্লোকটিতে প্রকৃত হিন্দুধর্ম বা বেদান্তধর্মের বাস্তব রূপ প্রকটিত হয়েছে। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'—শ্লোকটির জীবন্ত ভাষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নিজ জীবনে বিভিন্ন ধর্ম, মার্গ, মতবাদ ও সাধনপ্রণালী অবলম্বনে সিদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে সত্য প্রত্যক্ষ করে বলছেন—সব ধর্মই ভগবানলাভ করবার বা একত্বে পৌঁছাবার বিভিন্ন পথ। অমৃতসাগরে যাবার পথ অনন্ত। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর কাছে যাবার পথও অনন্ত। যিনি নিজে অনন্ত, তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় না তাঁকে এই একটি পথেই পাওয়া যায়। তাহলে তো তাঁকে অনেক ছোট করে ফেললাম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিখ্যাত কথা : 'যত মত তত পথ'—এটিই বেদান্তধর্মের মর্মবাণী। বাস্তবিক এমন কথা বলার শুধু তিনিই অধিকারী। অন্যেরা যখন বলে তখন তা কথার কথা মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথা বলেছেন নিজ উপলব্ধি থেকে। কোনও রকম সাধনাকে তিনি বাদ দেননি। সবরকমের মত ও পথ দিয়ে তিনি গেছেন। একেবারে অ থেকে শুরু করে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত। শেষে গিয়ে তিনি সেই এক লক্ষ্যেই পৌঁছে দেখালেন—'যত মত তত পথ'—'সব ধর্মই সত্য'—'মত পথ'—'অনন্ত মত, অনন্ত পথ'। এ বাণী তাঁর অপরোক্ষানুভূতি-প্রসূত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোকবর্তিকা—যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র অবয়ব ও আশয়টা বুঝতে সমর্থ হবে।...ঋষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি নিজের জীবন দ্বারা তা দেখিয়ে গেলেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদমাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বধর্মের প্রতীক।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : অর্জুন, যে যে-পথই অনুসরণ করুক না কেন শেষ পর্যন্ত সে আমার কাছেই আসবে। তারা সবাই আমাকেই চাইছে। সত্য এক। যদিও মুনি-ঋষিরা তাঁকে নানা ভাবে বলে থাকেন – 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সুতরাং সব

পথের গন্তব্যস্থল আমিই। আমি অন্তর্যামী, কে কীভাবে আমার শরণাপন্ন হয় তা আমি জানি, সেই অনুসারে সে আমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। অতএব যে- পথেই তুমি উপাসনা কর না কেন, সর্বতোভাবে সরল হৃদয়ে আমার শরণাপন্ন হও, তাহলেই আমাকে তুমি লাভ করবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ভারতের সনাতন ধর্মের সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব অর্থাৎ ধর্মজগতে সমন্বয়ের উপরে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় প্রথম বক্তৃতায় গীতার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেছিলেন—যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে এসেছে আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গর্ববোধ করি। এই প্রসঙ্গে শিবের স্তোত্র আবৃত্তি করেন তিনি বলেন—'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।'— বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে আপন আপন জলরাশি নিয়ে মিলিত হয়, তেমনি, হে ভগবান! নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশত সরল ও কুটিল নানা পথে যারা চলেছে, তুমিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতএব, পৃথিবীর ইতিহাসে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত পবিত্র সমাবেশসমূহের মধ্যে এই ধর্মমহাসমাবেশ অন্যতম। এই মহাসম্মেলন গীতার সেই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে—শ্রীকৃষ্ণের সেই মহান বাণীটিই ঘোষণা করছে—'যে যথা মাং...'—যে যেভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথেই চলে। আমাকেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন উপচারে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা ও সেবা করে থাকে।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।। ১২

ইহ (এই জগতে) কর্মণাং (কর্মসমূহের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনা করে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাকারী মানুষেরা) দেবতাঃ (দেবতাদের) যজন্তে (ভজনা করে) হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (এ মনুষ্যলোকে) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রহ) কর্মজা (কর্মজনিত) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধিলাভ বা ফললাভ) ভবতি (হয়)।

এই মনুষ্যলোকে যারা কর্মের ফল তাড়াতাড়ি লাভ করতে চায় তারা দেবতাদের পূজা করে। কারণ এভাবেই সকাম কর্মে শীঘ্র কর্মফল লাভ হয়।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, তুমিই সকলের নিয়ন্তা। সব দেবদেবীর তো তুমিই অধীশ্বর। তবে তোমাকে ভজনা না করে, লোকে কেন অন্য দেবদেবীর ভজনা করে? অর্জুনের এই সংশয় দূর করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : মানুষ ভোগবাসনায় ডুবে আছে। তাদের বাসনার শেষ নেই । একটার পর একটা বাসনা। পুত্রৈষণা, পুত্রের জন্য বাসনা।

বিত্তৈষণা, ধনদৌলত লাভের বাসনা। এই সকল বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য সকামভাবে লোকে নানা দেবতাদের পুজো করে। দেবতারা প্রসন্ন হয়ে অভীষ্ট ফল দান করেন। ইহলোকে (অর্থাৎ মনুষ্যলোকে)সকাম কর্মের ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। কারণ মনুষ্যলোকেই একমাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা যায়, অন্য লোকে নয়। কিন্তু এসকল ফল মোক্ষের তুলনায় অতি তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী যা আপাতসুখকর ও সহজপ্রাপ্য লোকে তাই চায়। সকাম কর্মের ফল ক্ষণস্থায়ী; আপাতসুখকর কিন্তু সহজসাধ্য, আশু ফলপ্রদ। যেহেতু সকাম কর্মের ফল সহজসাধ্য ও শীঘ্র লাভ করা যায় তাই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের প্রতি বেশি আগ্রহী। কিন্তু যখন মানুষ বুঝবে যে, প্রকৃত ধর্মের সত্যটি হল—এই সব নানা দেব-দেবী সেই এক ও অভিন্ন ঈশ্বরীয় সত্যের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র তখন সেই পরমেশ্বরকে লাভ করার জন্য বিচারপূর্বক নিষ্কাম কর্মের প্রতি আগ্রহী হবে।

নিষ্কাম কর্মের ফল মহৎ। কেবল তখনই শুদ্ধ ধর্মচেতনা জাগ্রত হয়। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে ক্রমে লোকে আমাকে লাভ করে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা মুখের কথা নয়। নিষ্কাম কর্মযোগীকে দীর্ঘকাল অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভোগবাসনায় মত্ত জীব সহজে কামনা ত্যাগ করতে পারে না। ফলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সুতরাং ভগবানকেও পায় না। সকামভাবে নানা কর্মে লিপ্ত হলে দেবতারা নির্বাণ বা মুক্তি দিতে পারেন না। একমাত্র পরমেশ্বরই (অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই) মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন। ভগবান নিজেই বলছেন, 'আমি কাজ করি, তবু অনাসক্ত থাকি'। তাই ভগবান অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম করার জন্য অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্‌ ।। ১৩

ময়া (আমার দ্বারা) গুণ-কর্ম- বিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং (চার বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হয়েছে) তস্য কর্তারম্‌ অপি (তার কর্তা হলেও) মাম্‌ (আমাকে) অব্যয়ম্‌ (অব্যয়, অবিকারী) অকর্তারং (অকর্তা) বিদ্ধি (জানবে)।

গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারবর্ণের সৃষ্টি করেছি। এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাকে অবিকারী ও অকর্তা বলে জানবে।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে, মনুষ্যলোকে সকাম কর্মের ফল তাড়াতাড়ি লাভ হয়। কারণ মনুষ্যলোকেই বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্মে অধিকার আছে। অন্য লোকে নেই। এই নিয়মের কারণ কী তা বোঝাতেই বর্তমান শ্লোক।

মানুষের প্রকৃতি আলাদা আলাদা। রুচি ভিন্ন ভিন্ন। সবাই এক ছাঁচে গড়া নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, প্রকৃতিভেদে (অর্থাৎ গুণভেদে) বর্ণভেদ বা কর্মভেদ, এ ব্যবস্থা আমিই

করেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি। গুণ – অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বপ্রধান – ব্রাহ্মণের কর্ম – শম, দম, তপস্যা, অধ্যাপনা। যার সত্ত্বগুণ খুব প্রবল নয় অথচ রজোগুণ প্রধান, সেই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় জাতির কর্ম—ন্যায়নীতি ও লোকরক্ষার জন্য সংগ্রাম। আবার যার মধ্যে রজোগুণ প্রধান হলেও তমোগুণও কিছুটা রয়েছে, তার জন্য বৈশ্য জাতির কর্ম—কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য। সবশেষে, যার মধ্যে রজোগুণ প্রবল নয় অথচ তমোগুণ প্রধান, তার জন্য শূদ্র জাতির কর্ম—শুশ্রূষা অর্থাৎ শিষ্যের কাজ, অপর তিন বর্ণের কাজে সহযোগিতা। এইভাবে প্রাচীনকালে বর্ণভেদ ও কর্মভেদ গুণ অনুসারে করা হত, বংশ অনুসারে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্ষত্রিয় সন্তান বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তিকালে, সম্ভবত পৌরাণিক যুগে বর্ণভেদ বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। এই বংশানুগত শ্রেণীবিভাগই জাতিভেদ নামে প্রচলিত। কিন্তু বর্ণভেদ প্রকৃতিগত এবং জাতিভেদ বংশানুগত। তাই বর্ণভেদ অনুযায়ী শাস্ত্র বলে, যদি কেউ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে সত্ত্বগুণের অধিকারী না হয় তবে সে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হবে না। আবার কেউ শূদ্রকুলে জন্মে যদি সত্ত্বগুণের অধিকারী হয়, তবে তাঁকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলে গণ্য করতে হবে। তাই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—চার বর্ণের মানুষদের পালনীয় ধর্ম। ফলে সকল বর্ণের মানুষের পক্ষে বিদ্যাবান, ধর্মজ্ঞ ও আত্মজ্ঞানী হওয়ার অধিকার আছে। বাস্তবিক জাতিভেদ নেই। ঋগ্বেদ-সংহিতার পুরুষসূক্তের দ্বাদশ ঋকে রয়েছে—'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্‌ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্‌ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।।' অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হলেন বাহু, বৈশ্য তাঁর ঊরু এবং পদ হতে শূদ্রের জন্ম হলো। মহাভারতের 'শান্তিপর্বে' ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সংবাদে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে পিতামহ ভীষ্মদেব বলছেন—'অযজন্নিহ সত্রৈস্তে তৈস্তৈঃ কামৈঃ সমাহিতাঃ। সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ।।'—অর্থাৎ একমাত্র ব্রাহ্মণ হতেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিন বর্ণের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের) উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য এই তিন বর্ণের স্বভাবতই সমুদয় যজ্ঞে অধিকার আছে। একই পরিবারের সন্তানগুলি যে-কোনও বর্ণেরই হতে পারে। একজন সেনাবিভাগে যেতে পারে, একজন ব্যবসায়ে নামতে পারে, একজন কৃষিতে, একজন বা শ্রমসাধ্য কাজে। এইভাবে দেখা যায়, লোকে নিজ নিজ মানসিক প্রবণতা বা গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন কর্ম বা কাজ বা বৃত্তি গ্রহণ করে।

ভগবান বলছেন, যে প্রকৃতিদ্বারা এই চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রকৃতি আমারই, আমিই সেই প্রকৃতির প্রভু, কাজেই প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য আমারই কার্য, অথচ আমি প্রকৃতির কর্মে নির্লিপ্ত, নিশ্চল, নির্বিকার। আমিই ক্ষর আবার আমিই অক্ষর। ক্ষররূপে আমি প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জগতের সৃষ্টিকার্য করি আবার অক্ষররূপে প্রকৃতির কার্যে আমি নির্লিপ্ত, সাক্ষী ও দ্রষ্টামাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'তস্য কর্তারমপি'— এই চার বর্ণের সৃষ্টির কর্তা হয়েও 'মাং বিদ্ধি অকর্তারম্ অব্যয়ম'— আমাকে অবিকারী, অব্যয়, অকর্তা বলেই জেনো। আমার ইচ্ছেতেই সব হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুই করিনি। হিন্দুমতে, ভগবান কিছু করেন না। তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী, নিষ্ক্রিয়। যেমন, প্রদীপের আলো। সেই আলোতে কেউ ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, আবার কেউ চুরি করছে। আলো কিন্তু ভাল-মন্দ কোনটার জন্যই দায়ী নয়। তাই বলছেন, ঈশ্বর অকর্তা। অথচ তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। আবার তিনি অব্যয়। তাঁর ক্ষয় নেই, বৃদ্ধিও নেই। তিনি অজ, অমর, নিত্য, সনাতন।

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ।। ১৪

কর্মাণি (কর্মসকল) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত করে না) কর্মফলে (কর্মফলে) ন মে স্পৃহা (আমার কোনও স্পৃহা নেই) ইতি (এইরূপ) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্মভি (কর্মের দ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না)।

কোনও কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না, কর্মফলেও আমার স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা নেই। যিনি আমাকে এইভাবে (অকর্তা ও অনাসক্ত) জানেন তিনি কর্ম দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না। (অর্থাৎ ভগবানকে স্বরূপত জানলে সমস্ত কর্মবন্ধনের ক্ষয় হয় এবং মানুষ চিরমুক্ত হয়ে যায়।)

ভগবানের স্বরূপ কী? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি'—আমাকে কোনও কর্ম স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বর আছেন বলেই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই করছেন না। ব্যবহারিক অর্থে তিনিই কর্তা, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁর কর্তৃত্ববোধ নেই। স্বরূপত তিনি অকর্তা, দ্রষ্টা, সাক্ষী। ঈশ্বর যেন চুম্বক। চুম্বক থাকলেই লোহার টুকরোগুলো নড়াচড়া করে। তেমনি ঈশ্বর আছেন বলেই জগতে কত কী ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। শুধু চেয়ে আছেন। চেয়ে চেয়ে দেখছেন। তিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ তাঁর অহংবুদ্ধি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : 'এক লিখে তারপর শূন্য বসাও। যত শূন্য দেবে অঙ্ক তত বাড়বে। কিন্তু এক সংখ্যাটাকে মুছে ফেললে সবই শূন্য। ঈশ্বরই সেই এক। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়।'

তারপর বলছেন, 'ন মে কর্মফলে স্পৃহা' —আমার কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা নেই। ঈশ্বরের কোনও অভাববোধ নেই। তিনি পূর্ণকাম, আপ্তকাম। কোনও কামনা-বাসনা নেই। সাধারণ মানুষ আমরা। আমাদের তো কামনা-বাসনার অন্ত নেই। টাকা চাই, যশ চাই, সন্তান চাই, স্বাস্থ্য চাই, আরও কত কী। সবসময় একটা অভাববোধ আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। আমরা যা কিছু করি, খাই, বেড়াই, খেলা করি, বই পড়ি, অফিসে যাই, কথা বলি, সবকিছুর পেছনে একটা বাসনা আছে। শাস্ত্র মুক্তির কথা বলে। তা হল এই

বাসনা থেকে মুক্তি। শ্রীমাসারদাদেবী বলতেন, 'যদি ভগবানের কাছে কিছু চাইতেই হয় তাহলে ''নির্বাসনা চাইবে'' আমার কোন কামনা- বাসনা যেন না থাকে। আমি কিছু চাই না। যেমন, কঠোপনিষদে নচিকেতার চরিত্র। যমরাজ তাঁকে খুব লোভ দেখাচ্ছেন : 'এই দেবো, সেই দেবো, তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবো, সেখানে কত কী ভোগের জিনিস রয়েছে। নচিকেতা সব শুনেটুনে বলছেন 'তবৈব'- ওসব তোমারই থাকুক। আমার দরকার নেই।

ভগবানই আদর্শ কর্মযোগী। নিরহঙ্কার, কর্তৃত্বাভিমানরহিত অর্থাৎ কর্ম করেও তিনি অকর্তা। তিনি স্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টিকর্মের দ্বারা লিপ্ত নন। তাঁর 'আমি কর্তা' বোধ নেই। কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা নেই। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জগৎ রচনা করেননি। ভগবানের স্বরূপ যে জেনেছে, তাঁর নিষ্কাম কর্মের রহস্য যে বুঝেছে সেই যথার্থ কর্মযোগী। মানুষ স্বরূপত ঈশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপ জানার অর্থ নিজের স্বরূপকেই জানা। আমি আত্মা। আমি নিষ্ক্রিয়, সাক্ষীস্বরূপ। এইভাবে নিজেকে জেনে যিনি কাজ করেন তিনি আর কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। তাঁর সকল বাসনার বীজ নির্মূল হয়ে যায়। এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানলে তাঁর মুক্তি হয়।

গীতায় শ্রীভগবান এইভাবে আমাদের আসক্তি ত্যাগের শিক্ষা দিচ্ছেন। কর্মের আসক্তি থেকেই মানুষের সবরকম সমস্যা আসে—মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের কীভাবে কর্ম করতে হয়, সেই সম্পর্কে বলছেন, 'সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা—সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক! কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। ঠিক যেন বড় মানুষের বাড়ির দাসী, সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। তেল মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু।'

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ।। ১৫

এবং (এরূপ) জ্ঞাত্বা (জেনে) পূর্বৈঃ (প্রাচীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মোক্ষাভিলাষিগণ কর্তৃকও) কর্ম কৃতং (নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে) তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্বৈঃ (প্রাচীনগণ-কর্তৃক) পূর্বতরং (পূর্বে) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত) কর্ম এব (কর্মই) কুরু (অনুষ্ঠান কর)।

'আমি অকর্তা ও অভোক্তা, কর্মফলে নিঃস্পৃহ'—এভাবে আমাকে (পরমাত্মারূপে) জেনে (জনকাদি) পূর্ববর্তী মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম করে গেছেন। অতএব

পূর্বতন সাধকগণ যেভাবে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেছেন, তুমিও সেইভাবে নিষ্কাম কর্ম কর (কর্মত্যাগ করো না)।

কর্ম করেই মানব মুক্তি লাভ করবে। সেই কর্ম শাস্ত্রীয় নিষ্কাম কর্ম, লোককল্যাণ কর্ম। 'মুমুক্ষু' কথাটির অর্থ মুক্তিকামী। কিসের থেকে মুক্তি? অজ্ঞানতার বন্ধন, বিষয়ের আসক্তি থেকে মুক্তি। বন্ধন মানে অহংতা আর মমতা। 'অহংতা' অর্থাৎ অহংবুদ্ধি—'আমি আমি' বোধ। আর 'মমতা' হল 'আমার আমার' বোধ। আর মুক্তির অর্থ আত্মজ্ঞান লাভ। আমার স্বরূপ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। আমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এই জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি যেভাবে কর্মত্যাগের কথা বলছ, তা উচিত নয়। আমাদের অতীত থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা (যদু, জনকাদি রাজাগণ) যা বলে গেছেন, যা করে গেছেন, তাঁরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তা-ই আমরা অনুসরণ করব। জনকাদি মুমুক্ষু রাজর্ষিরা ঈশ্বরের স্বরূপ জেনেছিলেন। মানুষই স্বরূপত ঈশ্বর। 'আমি অকর্তা, কর্মফলে আমার কোনও আসক্তি নেই'—এই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। এই তত্ত্বকে জেনে তাঁরা নিষ্কামভাবে স্বধর্মোচিত কর্ম করে গেছেন। তুমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। যে কারণে প্রাচীন মনীষীরা কর্ম করেছেন, সেই একই কারণে তোমাকেও কর্ম করতে হবে। তাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করবে। শঙ্করাচার্য বলছেন, তোমার যদি আত্মজ্ঞান না হয়ে থাকে তবে আত্মশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম কর—'অনাত্মজ্ঞস্তু তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং'। আর যদি আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে তবে লোককল্যাণার্থে কর্ম কর—'তত্ত্ববিৎ'। 'লোকসংগ্রহার্থং'। অতএব কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাস তোমার কর্তব্য নয়—স্বধর্মোচিত নিষ্কাম কর্মই একমাত্র পথ এবং তাতেই আসবে আধ্যাত্মিক মুক্তি।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ।। ১৬

কিং কর্ম (কর্ম কী) কিম্ অকর্ম (অকর্মই বা কর্মহীনতা বা কী) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (পণ্ডিতরাও) মোহিতাঃ (পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হয়েছেন) তৎ (সেই হেতু) তে (তোমাকে) কর্ম (কর্ম ও অকর্ম উভয়ই) প্রবক্ষ্যামি (উপদেশ করছি) যৎ জ্ঞাত্বা (যা জেনে) অশুভাৎ (অশুভ থেকে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে)।

কর্ম কী, অকর্মই (অর্থাৎ কর্মহীনতাই) বা কী এবিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হন। অতএব কর্ম (কর্ম ও অকর্ম) কী তা তোমাকে প্রকৃষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যা জানলে তুমি অশুভ (সংসার বন্ধন) থেকে মুক্ত হবে।

কর্ম ও অকর্ম এই দুটি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও ফল বিচার করে জ্ঞানী কর্ম করাকেই শ্রেয়

হিসাবে গ্রহণ করেন। অকর্ম করা অর্থাৎ অনার্য, অকীর্তি, অস্বর্গের পথ চলা। কর্মের পথ শ্রেয়। যে কর্ম করলে জীবের সংসার-পাশ মোচন হয়, শাস্ত্র তাই অনুষ্ঠান করতে বলে। ভগবান এখানে সেই উপদেশই দিচ্ছেন—কর্ম কী আর অকর্মই বা কী? একটি কর্তব্য কর্ম, অপরটি অকর্তব্য কর্ম। সে – বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন। তাঁকে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে বলছেন। বাস্তবিক কর্ম ও অকর্ম – এ বড় গোলমেলে ব্যাপার। এ নিয়ে যে কত তর্কবিতর্ক! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা। ভগবানের চেয়ে বড় বন্ধু আর কে আছে। তিনি অর্জুনকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলছেন, কর্ম কাকে বলে, আর অকর্মই বা কাকে বলে, সে ব্যাপারে পণ্ডিতরাও ভুল করেন। 'তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি'— আমি তোমাকে কর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে বলব। তা জেনে তুমি যত অমঙ্গল, যত অশুভ, যা কিছু অনিষ্টকর তার থেকে মুক্তিলাভ করবে। তুমি কর্মের মধ্যে থাকলেও পদ্মপত্র যেমন জলে ভেজে না, তুমিও তেমনি মুক্ত থাকবে।

কর্ম মানে শাস্ত্রবিহিত কর্ম, আসক্তিশূন্য কর্ম। আমি কর্তা, আমিই কর্ম করব, এরূপ অহং-এর দ্বারা মনে একটা ঝোঁক উঠল, কর্ম করে ফেললাম। সেটা কর্ম নয়,অকর্ম, অকর্তব্য কর্ম বা অজ্ঞানীর কর্ম। কর্ম করতে হবে শাস্ত্রের বিধান মেনে। শাস্ত্র তিনটে জিনিসের ওপর জোর দিয়েছেন – সত্য, অহিংসা ও অস্তেয়। সত্যই ভগবান। কাজ করব সত্যকে ধরে থেকে, অর্থাৎ কর্তব্য-কর্ম করব সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে। অবশ্যই সত্যপালন করতে গিয়ে কারোর ক্ষতি বা অনিষ্ট করলে চলবে না। কর্মের উদ্দেশ্য ও কর্মের উপায় দুই-ই সৎ হতে হবে। সত্যকে অনুসরণ করে শাস্ত্র-অনুমোদিত কর্মই প্রকৃত কর্ম। আবার 'অহিংসা'র অর্থ হল সকলের প্রতি প্রেম। কাউকে হিংসা না করা। আর 'অস্তেয়' হল চুরি না করা, অপরের ধনে লোভ না করা – 'মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্' (ঈশ ১/১)।

আমরা অনেক সময় ভাবি 'ওনার অনেক ধন আছে, লুট করে গরিবদের বিলিয়ে দিই।' না, তা হবে না। উপায়টা সৎ হতে হবে। আবার হয়তো সত্য কথা বলছি কিন্তু উদ্দেশ্যটা অসৎ। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কর্ম করছি। তা হলেও হবে না। দেবতাদের উদ্দেশে, ঈশ্বরের উদ্দেশে, লোককল্যাণের উদ্দেশে শ্রুতি-স্মৃতি নির্দেশিত কর্ম করতে হবে। পাগলে তো কত কী বলে, কত কী করে। সেগুলিকে নিশ্চয়ই কর্ম বলা চলে না।

আর অকর্ম কী? কর্মত্যাগ বা কর্মহীনতা অর্থাৎ অকর্তব্য-কর্ম, তমোগুণীর কর্ম। আমরা কর্ম করি তো বাসনার জন্য, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করি, উপায়ও সবসময় সৎ থাকে না। আমার মনেও অহংকার রয়েছে, কিন্তু আমি মনে করছি আমি নির্লিপ্ত, সকল বাসনা মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছি —পূর্ণকাম। তবে আর আমার কর্মের প্রয়োজন কী? সব কর্ম ত্যাগ করে আমি তখন কর্ম থেকে দূরে সরে আছি। এই কর্মসন্ন্যাসের নামই অকর্ম।

প্রকৃত কর্মসন্ন্যাস হলো—অহংবুদ্ধি না রেখে, আসক্তিশূন্য হয়ে, লোককল্যাণের

জন্য যা কিছু করা। এটিও কিন্তু অকর্ম। বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ- এঁরা সকলেই কর্মবীর। তাঁদের কর্মই অকর্ম। কারণ তাঁদের অন্তরে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা'এই বোধ নেই। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের যন্ত্র ভেবে লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে গেছেন।

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।। ১৭

কর্মণঃ অপি (শাস্ত্রবিহিত কর্মের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যম্ (বুঝতে হবে) বিকর্মণঃ চ (এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের তত্ত্ব)বোদ্ধব্যম্ (বুঝতে হবে) অকর্মণঃ চ (এবং কর্মশূন্যতার তত্ত্ব) বোদ্ধব্যম্ (বুঝতে হবে) হি (কারণ) কর্মণঃ (কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (জটিল, দুর্জ্ঞেয়)।

শাস্ত্রবিহিত কর্মের, বিকর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের এবং অকর্ম তত্ত্ব অর্থাৎ কর্মশূন্যতা কী তা বোঝা আবশ্যক। কারণ কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্মের গতি গহন অরণ্যের ন্যায় দুর্জ্ঞেয় ও দুর্গম।

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম এই তিনটি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও ফল আলোচনা করে কেবল হাত- পা অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় নাড়ানোই 'কর্ম', আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা 'অকর্ম'- একথা বলা চলে না। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের ভেদ অতি দুরূহ। অতএব কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া দরকার। অকর্মের থেকে কর্ম শ্রেষ্ঠ, বিকর্মের থেকে অকর্ম কিছুটা ভাল কারণ বিকর্ম মানুষকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়। বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম করার থেকে কর্ম না করা অকর্ম কিছুটা ভাল। আবার বিকর্ম দ্বারা মানুষ মনে আঘাত পেয়ে সৎ কর্মের দিকে ফিরে যায়। যেমন জ্ঞানী মহারাজা পরীক্ষিতের বিকর্ম হতে ভাগবত গ্রন্থের সৃষ্টি বা অধিকারী অর্জুনের অকর্ম বা বিষাদ হতে এই গীতা গ্রন্থের সৃষ্টি। তাই কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের ভেদ অতি দুরূহ গহনা গতি।

আমরা তো আবোলতাবোল কত কী বলি। অকারণ কত হাত পা ছুড়ি। সেগুলিকে কর্ম বলে না। কর্মের অনুষ্ঠান কীভাবে হচ্ছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মের উপায়ের উপর বেশি লক্ষ রাখতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্মই কর্ম (৪/১৬)। আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মই বিকর্ম বা অন্যায় কর্ম। যে কাজ অনুচিত, অন্যায়, অসৎ— তাই বিকর্ম। যেমন মিথ্যা কথা বলা, প্রাণহানি ঘটানো, পরের লুট করা, নিজের বাহাদুরী দেখাতে অন্যায় কাজ করা, এ সবই বিকর্ম। আবার কর্মসন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ হল অকর্ম। কর্ম বন্ধনের কারণ। একথা জেনে অনেকে কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকেন। তাকে কর্মসন্ন্যাস বলে না। চুপ করে বসে থাকলেও প্রকৃতির ক্রিয়া চলতে থাকে। হাত-পা ব্যবহার না করলেও মন কাজ করে চলে। লোভ, হিংসা, কাম, ক্রোধের হাজার তরঙ্গ উঠছে মনে। বস্তুতঃ শরীর দিয়ে কাজ

করলেও আমাদের মনই আসল।

সুতরাং হাত-পায়ের কাজ বন্ধ করাকেই অকর্ম বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে 'আমি করছি'—এই অহং অভিমান না রেখে, অনাসক্ত হয়ে ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে যা কিছু করা হয় তাই অকর্ম। কেননা সেই কর্ম মানুষকে বদ্ধ করে না। আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়। এই হল প্রকৃত কর্মসন্ন্যাস বা অকর্ম। তাই সাধারণ অজ্ঞানী ব্যক্তি বাহ্য- ইন্দ্রিয় কর্ম না করাকেই অকর্ম দেখে কিন্তু জ্ঞানী কর্মের আসক্তি কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব সংকল্প মুক্ত হওয়াকেই অকর্ম দেখেন।

জীব অহংকারবশত নিজেকে কর্তা, ভ্রমবশত মনে করে—'আমিই কর্ম করছি, আমিই কর্মের ফলভোগ করব'। এইভাবে কর্মজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অহংকার হতেই কামনা-বাসনার উৎপত্তি হয়। কামনা সংকল্পে পরিণত হয়। সংকল্পই কর্মেন্দ্রিয়কে চালিত করে, মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। এই কর্মের ফলে কর্মীর চিত্তে কতকগুলি বৃত্তি পড়ে এবং বাহ্যিক জগতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। দেখা যায়, কর্মের তিনটি ধাপ—(ক) চিত্তের কর্তৃত্বাভিমান, কামনা এবং তৎপ্রসূত সংকল্প (খ) কর্মেন্দ্রিয়ের চালনা এবং (গ) কর্মফলভোগ। এদের মধ্যে চিত্তের অহংকার ও কামনাই কর্মের মুখ্য অংশ। এই মুখ্য অংশের উপর নির্ভর করে কর্মের উপায় ও কর্মফল। কামনা-বাসনা যদি অসৎ হয়, উপায়ও অসৎ হয় এবং কর্ম তখন অশাস্ত্রীয়, নিষিদ্ধ বা অন্যায় কর্ম হয়ে থাকে। তাই ভগবান বলছেন, অহংকার ও কামনা ত্যাগই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। অন্তরের অহং ও কামনা- বাসনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। তাই শুধু কর্মেন্দ্রিয়ের নিরোধ অর্থাৎ গুটিয়ে নিলেই কর্মত্যাগ হয় না। কামনা-বাসনা ও অহংকারশূন্য হয়ে যে কর্ম করা যায়, তাই প্রকৃত অকর্মের তুল্য। বিষয় থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকাই মুক্তিলাভের উপায়।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।। ১৮

যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মে) অকর্ম (কর্মের অভাব) অকর্মণি চ (এবং অকর্মে অর্থাৎ কর্মের অভাবের মধ্যেও) কর্ম (কর্ম) পশ্যেৎ (দেখেন) সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মানুষের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (বিবেকী বা প্রাজ্ঞ) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত) (এবং) কৃৎস্ন-কর্মকৃৎ (সকল কর্মের অনুষ্ঠাতা)।

যিনি (দেহ-ইন্দ্রিয়াদির) কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মের মধ্যে (দেহ-ইন্দ্রিয়ের কর্মহীনতার মধ্যে) কর্ম দেখেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনিই যোগী এবং সকল কর্মের অনুষ্ঠাতা।

এখানে ভগবান কর্মের এক উচ্চমার্গের তত্ত্ব বলছেন। জ্ঞানী কোন দৃষ্টিতে বা কর্মের পশ্চাতে কি আদর্শ রেখে কর্ম করবেন সেই কথাই বলা হচ্ছে। পূর্বে কর্ম, অকর্ম

ও বিকর্ম বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে জ্ঞানী যোগযুক্ত হয়ে যে প্রকার কৌশলে সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত কর্ম সম্পন্ন করবেন সেই শিক্ষাই ভগবান দিচ্ছেন। কারণ সাধারণ মানুষ কর্মের তত্ত্ব ঠিক বুঝতে পারে না। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার ভ্রম হয়। বালিতে ঝিনুক চকচক করলে রুপোর খণ্ড বলে মনে হয়। তেমনি জগতে সাধারণ অজ্ঞানী মানুষ প্রকৃত সৎ কর্মকে অকর্ম মনে করে এবং প্রকৃত ইন্দ্রিয়াদি কর্ম বা কর্ম না করা অকর্মকে, প্রকৃত কর্ম বলে মনে করে। এ যেন উলটা পুরাণ। এ-ই হল সংসারের স্বভাব। বর্তমান শ্লোকে এই উভয় প্রকার ভ্রান্তি দূর করা হয়েছে।

দৃষ্টিভেদে সংসারে দুই প্রকার কর্মী—তত্ত্বজ্ঞানী বা কর্মযোগী ও সাধারণ কর্মী বা অজ্ঞানী। তাঁদের উভয়ের পৃথক দৃষ্টি। জ্ঞানিগণ কর্মকে একভাবে দেখেন এবং অজ্ঞানিগণ কর্মকে আর একভাবে দেখেন। সাধারণ অজ্ঞানী ব্যক্তি, আত্মা ও দেহকে এক দেখে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি কর্মকে সঠিক কর্ম, আত্মার কর্ম বলে মনে করে, এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদির কর্ম না করাকে অকর্ম বলে মনে করে। কিন্তু জ্ঞানী আত্মা ও দেহকে আলাদা দেখেন, তাই আত্মাকে নির্লিপ্ত দ্রষ্টা ও সাক্ষী মনে করে দেহ-ইন্দ্রিয়াদির কর্মে অকর্ম দেখেন এবং আত্মাকে নির্লিপ্ত, শুদ্ধ চৈতন্য, অকর্ম জেনে তাঁতে কর্মের প্রবাহ সৃষ্টি করেন। জ্ঞানীর দৃষ্টি—কর্মে (দেহ-ইন্দ্রিয় বাহ্য কর্ম) অকর্ম (সম্পূর্ণ অহংশূন্যতা, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব শূন্য অবস্থায়) দর্শন। এবং অকর্মে (দেহ-ইন্দ্রিয়াদির বাহ্যিক কর্মহীনতায়) কর্ম (অন্তরে আত্মচিন্তা ও সর্বভূতের মঙ্গল চিন্তার কর্ম) দর্শন করা।

অতএব যিনি বাইরে প্রচণ্ড কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তে প্রশান্তি, বিশ্রাম অনুভব করেন, আবার বাহ্য কোনও কর্ম না করেও অন্তরে যাঁর আত্মচিন্তারূপ প্রচণ্ড কর্মের প্রবাহ অনুভূত হয়, তিনি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও কর্মযোগী। এখানে জ্ঞানী-ব্যক্তি যখন বাহ্যিক কর্ম করেন তখন অহংশূন্য বা নির্লিপ্ত হয়ে কামনা-বাসনা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করেন। ফলে বাইরে প্রবল কর্ম করলেও অন্তরে তিনি বিশ্রামলাভ করে অর্থাৎ চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত, চিরশান্তি অর্থাৎ পরমাত্মায় অবস্থান করেন। জ্ঞানীর চোখে বাহ্যিক কর্ম হলো প্রকৃত নিষ্কামকর্ম বা অকর্ম অর্থাৎ কর্মে অভাব অনুভব। কিন্তু সাধারণের চোখে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় কর্মসকল কর্মই। ফলে একথা প্রমাণ হলো যে, সাধারণের চোখে যা কর্ম বলে মনে হয়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা অকর্ম। জ্ঞানী এখানে **কর্মে অকর্ম দর্শন** করছেন। যেমন শ্রীমা সারদাদেবী সংসারের সমস্ত কর্মের মধ্যে ডুবে রয়েছেন কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ জনক রাজার কথা বলছেন যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আবার জ্ঞানী ব্যক্তি যখন বাহ্যিক কর্ম করছেন না কিন্তু অন্তরে তিনি তখন আত্মচিন্তায় ডুবে রয়েছেন। অন্তরে এক প্রবল কর্মের প্রবাহ অনুভব করছেন। এই আত্মচিন্তায় তিনি ডুবে থেকে জগতের মঙ্গল করছেন। ফলে সাধারণ অজ্ঞানী কর্মীর চোখে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি

যেন কোনও কর্ম করছেন না। জ্ঞানী এরূপে কর্মত্যাগ করে অবস্থান করছেন অর্থাৎ অকর্ম করছেন। অর্থাৎ সাধারণ কর্মীর চোখে জ্ঞানীর ঐ আত্মচিন্তারূপ কর্ম হলো অকর্ম অর্থাৎ তিনি কর্ম ত্যাগ করেছেন। সাধারণের চোখে যা অকর্ম কিন্তু জ্ঞানীর চোখে সেটিই প্রকৃত কর্ম। জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে **অকর্মে কর্ম দর্শন** করছেন। এঁরাই হলেন মানুষের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান কর্মী। এঁরা পরিদৃশ্যমান জগতে (কর্মে) ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। আত্মাতে (অকর্মে) সমস্ত জগতের স্ফুরণ (কর্ম) দেখতে পান। তিনি শ্রেষ্ঠ কর্মী বা মহা কর্মযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ বছর ধরে ঐরূপ অন্তরে প্রবল কর্মের-প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন যা সারা বিশ্বের আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কর্ম করছেন না, অকর্ম করছেন।

আরো সহজ করে বলা যায়—সংসারে দুটি মার্গ—প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। দুটি মার্গেই গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয় ব্যক্তি কর্মী বা ত্যাগীরূপে আধ্যাত্মিক জীবন পালন করে পরা জ্ঞান ও শ্রেয় লাভ করে। কিন্তু যারা জগৎকে ভোগের বস্তু মনে করে তারা অপরা জ্ঞান ও প্রেয় লাভকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অতএব প্রেয় লাভের পক্ষের মানুষ যে সকল ক্রিয়াকে কর্ম মনে করে, শ্রেয় লাভের মানুষ সেই সবকে অকর্ম মনে করে। আর শ্রেয় লাভের মানুষের সকল ক্রিয়া, প্রেয় লাভের মানুষের কাছে অকর্ম বলে মনে হলেও শ্রেয় লাভের ব্যক্তি তাদের সেই সকল ক্রিয়াতে প্রকৃত কর্মই দেখে—এবং এই শ্রেয় লাভের ব্যক্তিরা জগতে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও কর্মী।

প্রশ্ন হল, কর্ম কে করে? আমরা পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু) সাহায্যে কাজ করি। বাক্-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কথা বলি, হাত দিয়ে ধরি, পা দিয়ে চলি ইত্যাদি। এইসকল ইন্দ্রিয়কে চালায় কে? প্রকৃতি। আত্মা কিন্তু দেহ-মন-ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা। আত্মা আছে বলেই কর্মেন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে। কিন্তু আত্মা নিজে কিছু করছেন না। রথীর নির্দেশে সারথি রথ চালায়। কিন্তু রথী চুপ করে বসে থাকেন। এও ঠিক তাই। অথচ আমরা মনে করি, 'আমিই সব করছি'। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ট্রেনে চলেছি। ট্রেন হয়তো সত্তর মাইল বেগে ছুটছে। লাইনের ধারে যত গাছপালা, ঘড়বাড়ি সব যেন উলটোদিকে চলেছে। মনে হয় আমিই স্থির হয়ে বসে আছি। আর ঘরবাড়ি গাছপালাগুলোই ছুটছে (অকর্মে কর্মভ্রম)। পক্ষান্তরে, ট্রেন থেকে অনেক দূরের কোনও গতিশীল বস্তুকে স্থির বলে মনে হয় (কর্মে অকর্মভ্রম)।

একই ভাবে, আত্মা নিষ্ক্রিয় হলেও দেহ-ইন্দ্রিয়ের কর্ম আত্মাতে আরোপ করে মনে করি, আত্মাই সব করছেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মায় কোনও কর্ম নেই। একথা যিনি বোঝেন, তিনি বুদ্ধিমান। কর্ম করেও তিনি জানেন, তিনি কিছুই করছেন না, ইন্দ্রিয়গুলি যে যার কর্ম করছে। একথা জেনে তিনি কৃতকর্মের ফলও ভোগ করেন না। অর্থাৎ যাঁর কর্তৃত্ব-অভিমান নেই তিনি কর্মে অকর্মই (অর্থাৎ আত্মার কর্মহীনতা) দেখেন। তাঁর কর্ম বন্ধনের

কারণ হয় না। এই হল প্রকৃত কর্মতত্ত্ব। আবার তর্কের খাতিরে বলা যায়, এহেন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মও (যেমন প্রাণীহত্যা) করেন, তাতেও তিনি ফলের ভাগী হন না। অর্থাৎ 'আমি করছি'—এই অভিমান না থাকলে বিকর্মও অকর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য আত্মজ্ঞান যিনি লাভ করেছেন তাঁর মনে হিংসার কোনও স্থান নেই, তাঁর দ্বারা কখনোই অন্যায় কর্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম হয় না। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির কখনও বেতালে পা পড়ে না।

তারপর বলছেন, সাধারণের চোখে যা অকর্ম, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে তাও কর্ম। কর্মকে বন্ধনের কারণ মনে করে অনেকেই কর্তব্যকর্ম করে না; হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। ভাবে, 'আমি বেশ সুখে আছি', 'আমি বন্ধনমুক্ত'। বস্তুত, তখনও আমাদের মন কাজ করে চলে । প্রকৃতিই মনকে বাধ্য করায়। আসলে 'আমি কাজ করছি' যেমন অভিমান, তেমনি 'আমি করছি না' ভাবাটাও অভিমান। যতদিন 'আমি ব্রহ্ম' এই বোধ না হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্তা' এই বোধ থাকবেই । আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকাটাই 'অকর্ম' নয়। এটা আমাদের বোঝা দরকার। এ শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। ঘোর তামসিকতা। এতে জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আরও পিছিয়ে পড়তে হয়। বস্তুত 'আমি' বোধ যদি থাকে কর্মত্যাগ করলেও কর্মের বন্ধন কাটে না। কেননা, কর্ম বন্ধনের কারণ নয়। অহংবুদ্ধিই বন্ধনের কারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ অকর্মও প্রকৃতপক্ষে কর্মই । আসলে অজ্ঞানই কর্ম, জ্ঞানই অকর্ম। জ্ঞানলাভ করে যা কিছু করা হয় তাই অকর্ম। আর অজ্ঞানতা থাকতে কর্মত্যাগ করা দুষ্কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

যিনি এভাবে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের তত্ত্ব বুঝেছেন তিনিই বুদ্ধিমান। তিনিই প্রকৃত কর্মযোগী। তিনি জানেন, তিনি প্রবৃত্তির কর্তাও নন, নিবৃত্তির কর্তাও নন। তিনি যোগযুক্ত। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব কাজ করছেন। তিনি নিরহঙ্কারী। নির্লিপ্ত। তাই কর্মত্যাগে তাঁর প্রয়োজন নেই । শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম-অকর্মের তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বলতে চাইছেন, 'অর্জুন, তুমি অহংবুদ্ধি ত্যাগ করে, ঈশ্বরবুদ্ধিতে আমাতে সব ফল অর্পণ করে যুদ্ধ কর। এর দ্বারা তোমার কোনও বন্ধন হবে না।'

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ।। ১৯

যস্য (যাঁর) সর্বে (সকল) সমারম্ভাঃ (কর্মপ্রচেষ্টা) কাম-সঙ্কল্প-বর্জিতাঃ (ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমানরহিত) বুধাঃ (জ্ঞানীগণ) জ্ঞান -অগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণং (জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা যাঁর কর্ম দগ্ধ হয়েছে) তম্ (তাঁকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন) ।

যাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা ,ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান-বর্জিত, অর্থাৎ যাঁর (শুভ-অশুভ

সকল) কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকেই জ্ঞানীগণ পণ্ডিত বলে থাকেন।

প্রকৃত জ্ঞানী বা কর্মযোগীর লক্ষণ বলা হচ্ছে। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তৃত্বাভিমান নেই। তাই কর্মফলে স্পৃহা নেই অর্থাৎ তাঁকে কর্ম স্পর্শ করতে পারে না। পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে (১৯-২৪) সেকথাই বিশদভাবে বলা হয়েছে। কারণ সংসারে সঙ্কল্পই মানুষের জন্মজন্মান্তর ভোগরূপ সংসারপাশের বীজস্বরূপ এবং তার সঙ্গে ফলতৃষ্ণা। কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলতৃষ্ণা—জ্ঞানী এই দুই বিষয় ত্যাগ করেন।

'সমারম্ভাঃ' অর্থ যা সম্যক্ আরম্ভ করা হয় অর্থাৎ কর্মসমূহ। 'কাম'-এর অর্থ ফলতৃষ্ণা। আর 'সঙ্কল্প'র অর্থ 'আমি করছি ও এই ফল পেতে হবে'—এই অভিমান। 'আমি কর্ম করছি' এই কর্তৃত্বাভিমান এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা এ দুটিই বন্ধনের কারণ। 'কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ' - যে কর্ম ফলতৃষ্ণা ও সঙ্কল্প থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে কাজ করেন না। কোনও স্বার্থবুদ্ধি নেই তাঁর। তিনি কাজ করেন লোককল্যাণ বা ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে। আর যদি তিনি কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন, তখন তার যা কিছু চেষ্টা তা কেবল জীবনধারণের জন্য। ঈশ্বরের বুদ্ধিতে তাঁরা প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম করেন।

তারপর বলছেন 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা'। 'জ্ঞান-এর অর্থ আত্মজ্ঞান। বই-পড়া বিদ্যা জ্ঞান নয়। স্বরূপজ্ঞান হলে ভাল - মন্দ সব কর্মফলই সেই জ্ঞানের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুখ বা দুঃখ কোনও ফলই ভোগ করতে হয় না। মন্দ কর্ম যেমন বন্ধন, ভাল কর্মও তেমনি বন্ধন। আপনি হয়তো গরিবদের জন্য হাসপাতাল করে দিচ্ছেন, স্কুল - কলেজ করে দিচ্ছেন, রাস্তা করেছেন, জলের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এইসব ভাল কাজও যদি আপনি ফললাভের আশায় করে থাকেন, নাম-যশ বা স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা আপনার থেকে থাকে, তাহলে সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। ভাল কাজ করে হয়তো স্বর্গে যাবেন। কিন্তু আবার ফিরে আসতে হবে। মুক্তি হবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'সোনার শিকলও শিকল'। জ্ঞানকে এখানে অগ্নি বলা হয়েছে। জ্ঞান হলে কী হয়? জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত সব কামনা - বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কামনা - বাসনাই সব কর্মের বীজ। এই বীজ থেকেই পরে মহীরুহ। ব্রহ্মজ্ঞান হলে 'আমি' (অহংতা) 'আমার' (মমতা) মলিনতা নিঃশেষে মুছে যায়। তখন সব কর্মই অকর্ম হয়ে যায়। এই হল জ্ঞানের অপার মহিমা। এ তত্ত্ব যিনি বোধে বোধ করেছেন তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তাঁর কাছে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই ব্রহ্মময়। তিনি সমদর্শী হয়ে থাকেন।

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ।। ২০

সঃ (তিনি) কর্ম-ফল-আসঙ্গং (কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) নিত্যতৃপ্তঃ (সদাতুষ্ট অর্থাৎ নিত্য আত্মতৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (নিরালম্ব অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-

বস্তু রক্ষায় চেষ্টাশূন্য) (হয়ে) কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যকরূপে প্রবৃত্ত হলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুমাত্রই) ন করোতি (করেন না)।

যিনি কর্ম ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করেছেন, যিনি সদা আপনাতেই তৃপ্ত, যিনি অপ্রাপ্ত-বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-বস্তুর রক্ষণে চেষ্টাশূন্য, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও কিছু করেন না—কর্তৃত্বাভিমানশূন্য অর্থাৎ তাঁর 'আমি করছি'— এই বোধ নেই।

জ্ঞানের আগুনে সব সঞ্চিত কর্মের (অর্থাৎ অতীত কর্ম যা এখনও ফল দিতে শুরু করেনি) ফল ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগামী (ভবিষ্যৎ) কর্মেরও আর উৎপত্তি হয় না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এখন আমি যেসব কর্ম করছি তার ফল তো ভোগ করতে হবে? এই কর্মগুলি তো সঞ্চিত বা আগামী কোনও কর্মের মধ্যেই পড়ে না।

উত্তরে ভগবান বলছেন, কর্মে আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ 'আমি কর্তা' বোধ এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, দেহে কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে কাজ করলে, সেই কাজ বন্ধনের কারণ হয় না। অতএব, সেইসকল কাজ তখন অকর্মই হয়ে যায়। 'নিত্যতৃপ্তঃ'—যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর সকল কামনা-বাসনা জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি সদা তৃপ্ত—আত্মরতি। 'নিরাশ্রয়ঃ'—আশ্রয় অর্থ দেহ-ইন্দ্রিয়াদি, 'নিরাশ্রয়' অর্থাৎ যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। অর্থাৎ যাঁর 'আমি কর্তা' এই অভিমান নেই। তাঁর যা সম্পদ আছে তা রক্ষা করতে তিনি চেষ্টা করেন না। আবার যে সম্পদ নেই তা পাওয়ার আশাও করেন না। তাঁর কোনও আশ্রয় বা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। আমরা তো কত কী চাই! টাকাপয়সা, বন্ধু - বান্ধব, নাম-যশ, স্বর্গলাভ। সবসময় কোনও না কোন অবলম্বন খুঁজছি। কিন্তু যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের মধ্যে সকলকে দেখেন। আবার সকলের মধ্যেও নিজেকে দেখেন। অন্যের সুখেই তাঁর সুখ। অন্যের দুঃখেই তাঁর দুঃখ। 'কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি' - তিনি কাজে হয়তো ডুবে আছেন, অনলসভাবে কাজ করে চলেছেন, কিন্তু কোনও স্বার্থবুদ্ধি নেই সেখানে। এত কাজ করেও তিনি কিছু করছেন না—'নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ'। একথা শুনতে ধাঁধার মতো লাগে। আসলে তাঁর আমিত্ব নেই। বিনিময়ে তিনি কিছু চান না। তিনি কাজ করেন ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হিসেবে। নিজের জন্য নয়। লোকহিতার্থং, ঈশ্বরার্থং।

এঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী বা কর্মযোগী। কর্ম ও কর্মফলে তাঁদের কোনও আসক্তি নেই। তাই তাঁরা নিত্যতৃপ্ত। একমাত্র কামনা লোকহিতার্থং বা ঈশ্বরার্থং কর্ম করা। বাইরের বস্তুতে তাঁদের কোনও কামনা নেই। আনন্দের উৎস তাঁদের অন্তরে রয়েছে—তাই নিত্যতৃপ্ত, চির আনন্দময়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যেমন বলছেন, দুঃখ বলে কী বস্তু জানি না, আমার হৃদয়ে সর্বদা একটা আনন্দের ঘট বিরাজ করছে। তিনি কোনও আশ্রয়ের উপর নির্ভরশীল নন। ভগবানই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। ভগবানের ইচ্ছা পূরণই তাঁর জীবনের একমাত্র

লক্ষ্য। ভগবানের কাছে তাঁর প্রার্থনা—যেন তিনি ভগবানের যোগ্য সেবক হয়ে উঠতে পারেন।

এই প্রকার কর্মী আমাদের সাধারণের দৃষ্টিতে সংসারের কর্মে প্রবৃত্ত থাকলেও যথার্থভাবে তিনি কোনও কর্ম করেন না। তিনি কর্তা হয়েও অকর্তা। বাইরে তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা থাকলেও অন্তরে তিনি পরম শান্ত, নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। ফলে তাঁর সকল কর্ম অকর্মের তুল্য। তাঁর কর্ম সর্বদা মানবজাতির কল্যাণ আনে। তাই সমগ্র মানবজাতিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করছেন নিষ্কাম কর্মবীর হতে এবং মানবের প্রাপ্য গৌরব অর্জন করতে।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।। ২১

নিরাশীঃ (যিনি কামনাশূন্য) যত-চিত্ত-আত্মা (যাঁর অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত) ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ (যিনি সকল প্রকার দান ও বিলাসবস্তুত্যাগী) কেবলং (কেবলমাত্র) শারীরং কর্ম (দেহরক্ষার উপযোগী কর্ম অথবা শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক কর্ম) কুর্বন্ (করেন) কিল্বিষম্ (পাপ বা বন্ধন) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না)।

যিনি কামনাশূন্য, যাঁর চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি কোনওপ্রকার দান-বিলাসবস্তু গ্রহণ করেন না, এহেন ব্যক্তি কেবল শরীর-উপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করেন অথবা শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক কর্ম করেন। ঐরূপ কর্মে তিনি বন্ধনের অথবা পাপের ভাগী হন না।

'নিরাশীঃ'—যাঁর হৃদয় থেকে 'আশীঃ' অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়েছে। যিনি সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছেন। সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি যদি দেহরক্ষার জন্য ভিক্ষাদি কর্ম করেন তাতে তাঁর কোনও অকল্যাণ হবে না। যেহেতু তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টাই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এবং দেহরক্ষাও ভগবান লাভের জন্য। তাঁর অন্য কোনও বাসনা নেই। আসলে বাসনাই আমাদের দুঃখের মূল। আমরা যখনই কিছু আশা করি তখনই দুঃখ পাই। আমাদের সব আশা তো পূরণ হয় না। যিনি বলতে পারেন—'আমি কিছু চাই না, কিছু আশা করি না, কিছু প্রয়োজন নেই আমার'—তিনি বীর। চিত্তের একাগ্রতা ও আত্মনিষ্ঠার দ্বারা তিনি এ বীর্য লাভ করেছেন। তিনি 'যত - চিত্তাত্মা'। 'চিত্ত' অর্থ অন্তঃকরণ। আর 'আত্মা'র অর্থ এখানে দেহ-ইন্দ্রিয়। 'যতচিত্তাত্মা' অর্থাৎ যাঁর দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত। ধর্ম বলতে এককথায় এই আত্মসংযমকেই বোঝায়। সংযমই সৌন্দর্য। আমাদের মনটা তো সারাক্ষণ ছটফট করছে। এটা চাইছে, ওটা চাইছে। এই মনটাকে সংযত করতে হবে। আত্মায় সমাহিত করতে হবে। যিনি বাসনামুক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সংযতচিত্ত তিনি কোনও দান, উপহার বা বিলাসবস্তু গ্রহণ করেন না - 'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ'। কোনও কিছু অর্থাৎ ভোগের উপকরণের প্রয়োজন নেই তাঁর। 'শারীরং কর্ম'- কেবলমাত্র

শরীর রক্ষার্থে কর্ম করেন। তিনি জানেন তিনি শরীর থেকে আলাদা, দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত এক সত্তা। তিনি নিত্য-মুক্ত আত্মা। তাঁর কোন বাসনা নেই। আবার 'আমি করছি'—এই কর্তৃত্বাভিমান বোধও নেই। এই ভাবে যিনি কাজ করেন, তাঁকে কোনও পাপ, কোনও মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। ভগবান বোঝাতে চাইছেন, জ্ঞানী ব্যক্তির বস্তুর প্রতি কোনও মমত্ববোধ বা ভোগের লালসা নেই। জ্ঞানাগ্নিতে তাঁর কর্মের বীজ দগ্ধ হয়েছে, বিনা বাধায় তিনি মুক্তি লাভ করেন।

আচার্য শঙ্করের মতে, 'শারীরং কর্ম' অর্থ শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক ভিক্ষাদি কর্ম--কৌপীন-আচ্ছাদন গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু একথা কেবল সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মযোগী জ্ঞানী পুরুষদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বারবার পরার্থে কল্যাণমূলক কাজ করার উপদেশ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে 'শরীর' শব্দের এই অর্থ খাটে না। জীবের প্রারব্ধভোগার্থ শরীরের দ্বারা কর্ম করতে হয়। তবে সাধারণ লোকের কর্মের প্রেরণা চিত্তের কামনা-বাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান থেকে এসে থাকে। কিন্তু জ্ঞানী কর্মীর কর্মের প্রেরণা আসে ঈশ্বরের সেবার নিমিত্ত ও পরার্থে কল্যাণের উদ্দেশ্যে। তিনি কেবল ভগবৎ ইচ্ছা পূরণের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কর্ম করেন। তিনি সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে কর্ম করেন। এরূপ কর্মে জ্ঞানী সংসারবন্ধন প্রাপ্ত হন না, বা তাঁকে কোনও পাপপুণ্যের ফলভোগ করতে হয় না।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ।। ২২

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ (প্রার্থনা ও উদ্যম ছাড়াই যা লাভ হয় অর্থাৎ অযাচিত প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট) দ্বন্দ্ব-অতীতঃ (শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত) বিমৎসরঃ (মাৎসর্য অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা বর্জিত) সিদ্ধৌ (সিদ্ধিতে, সফলতায়) অসিদ্ধৌ চ (ও অসিদ্ধিতে, বিফলতায়) সমঃ (সমত্ববুদ্ধি, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন) কৃত্বা অপি (এরূপ কর্ম করেও) ন নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না)।

যিনি অযাচিতভাবে যা পান তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি শীত-উষ্ণাদি ও রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাবের অতীত, মাৎসর্যবর্জিত এবং কর্মের সফলতা ও বিফলতাতে যিনি সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম করেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকা। কারও কাছে কিছু না চাওয়া—অজগরবৃত্তি। অযাচিতভাবে যা আসবে, তাতেই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে জীবন-যাপন করা। ঈশ্বর তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করে অর্থাৎ কোনও প্রার্থনা বা উদ্যম ছাড়াই যা লাভ হয় তাই 'যদৃচ্ছালাভ'। যদৃচ্ছালাভকেই যিনি যথেষ্ট মনে করেন তিনি 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ'। অবশ্য একথা সন্ন্যাসীদের বেলাতেই খাটে। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজকজীবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি কোনও মুদ্রা গ্রহণ করবেন

না ও কোনও সঞ্চয় করবেন না। রাস্তায় যা জুটবে তাই গ্রহণ করবেন, শরীর রক্ষার জন্য। কিন্তু এভাব সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

কিছু আশা করি না। কিছু চাই না। যা জোটে, যা পাই তাতেই সন্তুষ্ট—এই ভাব সাধারণ মানুষের সহজে আসে না। সাধারণ মানুষ সর্বদাই বিবিধ ভোগোপকরণের প্রার্থনা করে থাকে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলতেন, 'সন্তোষের সমান ধন নেই ও সহ্যের সমান গুণ নেই'। কিন্তু আমরা তো কত কী চাই! এ যেন আগুনে ঘি ঢালা—আগুন বেড়েই চলে। তেমনি একটা বাসনা পূর্ণ হলেই আরেকটা বাসনা, তারপর আরও একটা। এভাবে বাসনার আগুন বেড়েই চলে। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না কখনও। সবসময় অসন্তোষ। এইরকম হওয়া উচিত ছিল, হল না তো। ছাত্ররা পরীক্ষা দেয়। আশা করে কত নম্বর পাবে। না পেলে মন ভেঙে যায়। মা-বাবা তিরস্কার করেন। এই আশাই আমাদের সব দুঃখের মূলে। তাই শাস্ত্র সাবধান করে দিচ্ছেন 'আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখং।' যিনি বুদ্ধিমান, যুক্ত কর্মী তিনি যথাপ্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থেকে তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে যান।

তারপর বলছেন 'দ্বন্দ্বাতীতঃ'—কোনওপ্রকার দ্বন্দ্বভাব দ্বারা বিচলিত নন, তিনি সকল প্রকার দ্বন্দ্বের উপরে অবস্থিত অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বেষ—এই সকল দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তিনি। দুই-ই তাঁর কাছে সমান। তিনি জানেন, সুখ আর দুঃখ টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। যার দুঃখ আছে, তার সুখও আছে। আবার যার সুখ আছে, তার দুঃখও আছে। একটা থাকলে আর একটা আসে। দুটো আলাদা জিনিস নয়। সুখের অভাবই দুঃখ। 'বিমৎসরঃ'—বিগত মৎসর। 'মাৎসর্য' অর্থ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। আপনার অনেক ধন-সম্পদ আছে, আমার কিছু নেই। আপনি খুব ভাল পোশাক পরেছেন, আমারটা অতি সাধারণ। তার জন্য কি আমি আপনাকে হিংসা করব? না, আমার যা আছে, আমি তাতেই সন্তুষ্ট, অসূয়াশূন্য। 'সমঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ--সাফল্য ও বিফলতায় সমদৃষ্টি। আমি চেষ্টা করছি। প্রাণপণ চেষ্টা করছি, একটুও ফাঁকি দিচ্ছি না। তবু সফল হলাম না। কিন্তু ফল ভাল বা মন্দ, যাই হোক না কেন, আমি অবিচল। দুটোর জন্য প্রস্তুত আছি। সফল হলেও ভাল, না হলেও ভাল। আমি নিষ্কামভাবে কর্ম করছি। এইভাবে কর্ম করে জ্ঞানী ব্যক্তি কর্মফলে আবদ্ধ হন না। মানবিক বিকাশের এটি অতি উচ্চ অবস্থা। এই রকম মনই ধীর ব্যক্তি লাভ করে থাকেন। আগের শ্লোকগুলিতে জ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করে যা বলা হয়েছে তা-ই আরও বিস্তারিতভাবে এখানে বলা হল।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ।। ২৩

গত-সঙ্গস্য (ফলে আসক্তিশূন্য) মুক্তস্য (আমি ও আমার অভিমানমুক্ত) জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ (আত্মজ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির) যজ্ঞায় (যজ্ঞের নিমিত্ত, ঈশ্বরার্থ) আচরতঃ (কর্ম অনুষ্ঠানকারীর) সমগ্রং (সমগ্র) কর্ম (কর্ম) প্রবিলীয়তে (সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়)।

যিনি কর্মফলে আসক্তিশূন্য, মুক্ত অর্থাৎ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিমানশূন্য এবং যাঁর চিত্ত আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যিনি একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম করেন, তাঁর কর্মসকল ফলসহিত বিনষ্ট হয়ে থাকে তাঁকে আবদ্ধ করে না।

'মুক্ত' কে? যাঁর ফলভোগে বাসনা নেই। যাঁর 'আমি' 'আমার' বোধ নেই। অর্থাৎ 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা'--এই অভিমান থেকে যিনি মুক্ত। 'জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ'—'জ্ঞান' অর্থ আত্মজ্ঞান। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা —এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত। বাতাসহীন স্থানে নির্বাত দীপশিখার মতো। হেলছে দুলছে না। 'তৈলধারাবৎ' নিরবচ্ছিন্ন, অবিচলচিত্ত। আত্মজ্ঞানে যিনি নোঙর ফেলে রেখেছেন।

প্রারব্ধবশে অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে যাই করা হয় তাই যজ্ঞ। ঈশ্বর-আরাধনার্থ কর্মমাত্রকেই যজ্ঞ বলা হয়। আবার ঈশ্বরে ফল অর্পণ করে, লোকহিতার্থ যে নিষ্কাম কর্ম করা হয়, তাও যজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে, কর্মযোগীর সব কর্মই যজ্ঞস্বরূপ। তাঁর চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কর্ম ফল-সহ বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর মুক্ত শুদ্ধ আত্মার উপর কর্মের কোনও বন্ধনরেখা পড়ে না।

কর্ম শব্দটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কর্ম সকলে করে। তাঁর নাম গুণগান করা - এও কর্ম। সোঽহংবাদীদের ''আমিই সেই''—এই চিন্তাও কর্ম। নিঃশ্বাস ফেলা—এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নেই। তাই, কর্ম করবে কিন্তু ফল ঈশ্বরে অর্পণ করবে।' ঈশ্বরকে ভালোবাসি আমি। তাঁর কাজ করছি । প্রাণ ঢেলে সেই কাজ করব। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সেই কাজ খুবই সামান্য। কিন্তু আমার কাছে অসামান্য। কারণ তার মাধ্যমে আমি ঈশ্বরের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি। এই হল হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি। এই ভাবে দেখলে আমাদের সমগ্র জীবনটা পালটে যায়। শুধু ব্যক্তিগত জীবন নয়, সমগ্র জাতির জীবন। কাজ ঈশ্বরের। কাজের ফলও ঈশ্বরের । 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী'। এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কাজ করলে 'সমগ্রং কর্ম প্রবিলীয়তে'। 'অগ্র' শব্দের অর্থ হল ফল; ফলের সঙ্গে যুক্ত যে কর্ম তা-ই 'সমগ্র কর্ম'। অর্থাৎ এহেন যোগীর কর্ম ও কর্মফল দগ্ধ হয়ে সমূলে লয় হয়। কর্মের সংস্কার পর্যন্ত তাঁকে স্পর্শ করে না।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ।। ২৪

(কারণ ব্রহ্মবিৎ) অর্পণং (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) (রূপে দেখেন) হবিঃ (যজ্ঞের ঘৃত) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে দেখেন) ব্রহ্ম-অগ্নৌ (হোমাগ্নিকে ব্রহ্মরূপে দেখেন) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতার দ্বারা) হুতম্ (হোম করা হচ্ছে) (যিনি এভাবে দেখেন) তেন (সেই) ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লব্ধ হন)।

ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ দেখেন—যজ্ঞের অর্পণ পাত্র ও যজ্ঞকার্য ব্রহ্ম, যজ্ঞে অর্পিত ঘৃতও ব্রহ্ম, হোমের অগ্নিও ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন কর্তা তিনিও ব্রহ্ম, হোমরূপ যে কর্ম তাও ব্রহ্ম। এরূপ জ্ঞানে যিনি তাঁর সব কিছু ব্রহ্মে অর্পণ করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

নিষ্কাম যোগী বা যাঁর চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এরূপ পুরুষের কর্ম কোনও ফল দিতে সক্ষম হয় না কেন? কেন তার সব কর্ম ও কর্মফল দুই-ই লয় হয়ে যায়? এই শ্লোকে তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানী পুরুষ যজ্ঞরূপে যে কর্ম করেন তা সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানীর সমস্ত কর্মই ব্রহ্মকর্ম। তিনি সংসারে যে কর্ম করেন তা যজ্ঞরূপে ঈশ্বরের পূজারূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই যজ্ঞ মানসিক বা বাহ্যিক উভয়ই। 'ব্রহ্মার্পণং'—'অর্পণং' অর্থাৎ অর্পণ করে যে পাত্র দ্বারা যজ্ঞের আগুনে হবি বা ঘৃত আহুতি দেওয়া হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের চোখে এই যজ্ঞপাত্র ও যজ্ঞের হবি (ঘৃত) উভয়ই ব্রহ্ম। অর্থাৎ যে বস্তুকে লোকে 'অর্পণ' বলে মনে করে তা-ই ব্রহ্মবিদের কাছে ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'—কর্মে যাঁর একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান আছে। তিনিই ব্রহ্মবিৎ। তিনি কর্ম করলেও সেই কর্মের ফল ব্রহ্মই —'ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্' যজ্ঞকর্তা এই কর্মে একমাত্র ব্রহ্মই লাভ করেন। তাঁর ক্রিয়া, কর্ম, যজ্ঞ—সবকিছুর গতি ব্রহ্ম অর্থাৎ তাঁর সেই কর্মের ফলও ব্রহ্মেই লয় হয়। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ লোককল্যাণের জন্য যেসব কাজ করেন সেই কাজের ফল ব্রহ্মজ্ঞানে মিশে যায়।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত হলো—জগতে সমস্তই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নয়। জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞানী সর্ব বস্তুতে ব্রহ্ম অনুভব করেন। যিনি অনন্ত, অদ্বৈত, শুদ্ধ চৈতন্য স্বভাব, তিনিই জগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন। বিষয়, কর্ম, বিষয়ী (কর্তা), সবকিছুই হলো কেবল এক অনন্ত ব্রহ্ম—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে সবকিছুই ব্রহ্মময় হয়ে যায়। বর্তমান শ্লোকে এই কথাই বোঝানো হয়েছে। সংসারে নর-নারী যা-কিছু কর্ম করে থাকেন সে সমস্তই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবের অহংবুদ্ধি তখন সম্পূর্ণ দূর হয়। তিনি পূর্ণ একত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন উপাস্য-উপাসক, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সব এক; কর্তা - কর্ম -কারণ (অর্থাৎ যজ্ঞের হোতা-যজ্ঞকর্ম-যজ্ঞপাত্র) ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি থাকে না। তাঁর চোখে তখন সবই ব্রহ্ম। একেই বলে ব্রহ্মদৃষ্টি। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ভবতারিণী মন্দিরে সব চৈতন্যময় দেখছেন—'চিন্ময় কোশাকুশি, চিন্ময় মন্দির, চিন্ময়ী দেবী'। এই অবস্থায় জ্ঞানী যজ্ঞ করলেও যজ্ঞের কোনও পৃথক ফল হয় না। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হয়ে থাকে।

এই জ্ঞান তখনই হয়—যখন মানুষ বুঝতে পারে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম, দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, এই জগতে যে ক্রিয়াশক্তি চলছে তা ব্রহ্মেরই শক্তি, যে কর্ম সম্পন্ন হচ্ছে তাও ব্রহ্মেরই কর্ম। তিনি নিজেকেও ব্রহ্ম বলে অনুভব করেন। সমস্তই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই যখন এই অনুভূতি হয় তখন জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিদ্ হন।

প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞানীর সকল কর্মই যজ্ঞ। তিনি যে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করেন, কথা বলেন, চলাফেরা করেন, আহার গ্রহণ করেন সবই ঈশ্বরের উদ্দেশে। ঈশ্বরার্থ কর্ম যজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভাবে যিনি কাজ করেন, তাঁর আবার বন্ধন কী? তাঁর সারা জীবনটাই যজ্ঞ। বৈদিক যুগে যজ্ঞই ছিল ঋষিদের ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান অঙ্গ। বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান শাস্ত্রে রয়েছে—পূজা-অর্চনাদিও যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, নামযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ইত্যাদি। রামপ্রসাদ বলছেন—'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাকে।' তিনি তখন সকল কর্মে, সকল বস্তুতে ব্রহ্মকেই দেখেন। তাঁর সব কাজই তখন ব্রহ্মকর্ম হয়ে যায়। লৌকিক ধর্ম-কর্ম বলে আর কিছুই থাকে না। অনেকেই গীতার এই মন্ত্রটি প্রার্থনা করে খাদ্য গ্রহণ করেন। বাস্তবিক এ এক মহা-সত্য, বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত অদ্বৈত সত্য—যা ভারতে বহু যুগ পূর্বে মহাবিশ্বসম্বন্ধে আবিষ্কৃত হয়েছিল। একে বলে আত্মা বা ব্রহ্ম, অনন্ত চৈতন্য, যা এক ও অদ্বিতীয়।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ।। ২৫

অপরে (অন্যান্য) যোগিনঃ (যোগীগণ অর্থাৎ কর্মযোগীগণ) দৈবম্ (ইন্দ্রবরুণাদি দেবতার পূজারূপ) যজ্ঞম্ এব (যজ্ঞই) পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন) অপরে (অন্য কেউ কেউ অর্থাৎ জ্ঞানীরা) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞদ্বারাই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে) উপজুহ্বতি (আহুতি দেন)।

অন্যান্য যোগীগণ (কর্মযোগীগণ) দৈবযজ্ঞ অর্থাৎ দেবতার পূজা করেন। অপর কেউ কেউ অর্থাৎ জ্ঞানীরা যজ্ঞকে অবলম্বন করে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে নিজেকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে আহুতি দেন। অর্থাৎ নিজের সঙ্গে ব্রহ্মের অভিন্নতা উপলব্ধি করেন।

আমরা যা কিছু দেখি সবই ব্রহ্ম। এই জ্ঞানই সব যজ্ঞের চূড়ান্ত ফল। এই শ্লোক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী আটটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধিকারীভেদে জ্ঞানলাভের উপায় বলেছেন। দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ সাধনপ্রণালী বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে অন্যান্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই যে শ্রেষ্ঠ সেকথা বলা হয়েছে। জ্ঞানী মুক্তপুরুষ যজ্ঞরূপে অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম করেন তা বন্ধনের কারণ হয় না।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যজ্ঞই ঈশ্বরের আরাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল। যাগযজ্ঞ করা ব্রাহ্মণদের নিত্য কর্তব্য বলে মনে করা হত। পরে যজ্ঞ শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক হয়। চতুর্বর্ণের আশ্রমবিহিত কর্মও যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে জ্ঞানমার্গের প্রভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ গৌণ হল। ব্রহ্মচিন্তাই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ পথ বলে বিবেচিত হল। তখন থেকে যজ্ঞের স্বরূপও পরিবর্তিত হল। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হল ব্রহ্মচিন্তা। একেই জ্ঞানযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। পরে ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিমার্গের প্রচার হল। তখন থেকে পুরাণাদি শাস্ত্রে জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞ প্রাধান্য পায়। বস্তুত ভারতীয় ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞ শব্দের তাৎপর্য বিস্তার লাভ করেছে। গীতায় যজ্ঞের এই সবগুলি স্তরই স্বীকার করা হয়েছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে অনাসক্তভাবে শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত যজ্ঞ করতে বলা হয়েছে। তাহলে সব যজ্ঞই মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ হতে পারে।

বর্তমানে শ্লোকে অধিকারিভেদে দুটি প্রধান যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। কর্মযোগীরা দৈবযজ্ঞ করেন। অর্থাৎ ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি কোনও বিশেষ দেবতার উদ্দেশে তাঁরা যজ্ঞ করেন। মনে কোনও বিশেষ কামনা আছে। ধন, মান, স্বাস্থ্য, সন্তান, স্বর্গ ইত্যাদি লাভের আশা আছে। তাই কোনও বিশেষ দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর যজ্ঞ করেন। আবার কেউ কেউ যজ্ঞ করে নিজেকেই ঈশ্বরের পাদপদ্মে উৎসর্গ করেন। এই প্রকার যজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞ—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সাধক তাঁর সমস্ত কর্ম, সমস্ত জীবন আহুতি প্রদান করেন। এই যজ্ঞ নিষ্কাম যজ্ঞ। আমি কিছুই চাই না, আমি আমাকেই উৎসর্গ করছি। সব কর্ম ও কর্মফল তাঁরা ঈশ্বরে অর্পণ করেন। এইভাবে, জ্ঞানযোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে নিজেকে অর্থাৎ নিজের আত্মাকে আহুতি দেন। জীবাত্মাকে এই ভাবে পরমাত্মাতে আহুতি দেওয়া বা লয় করাই জ্ঞানযজ্ঞ। জীব ব্রহ্মে মিশে একাকার হয়ে যায়। যোগী নিজের সঙ্গে ব্রহ্মের অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক, আলাদা নয়—এ সত্য তিনি বোধে বোধ করেন। তাঁর চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয়।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ।। ২৬

অন্যে (অন্য কোনও কোনও যোগী) শ্রোত্র-আদীনি (কর্ণাদি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকলকে) সংযম-অগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) অন্যে (অপর কোনও কোনও যোগী) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)।

অন্য কোনও কোনও যোগী চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সংযমরূপ-অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করেন। অপর কোনও কোনও যোগী শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সমূহের গ্রহণকে হোম বলে মনে করেন।

এখানে যোগী সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি প্রদান করেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার- পূর্বক যোগীরা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্) সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় (যথাক্রমে রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ) থেকে নিবৃত্ত করে সংযমরূপ অগ্নিতে উৎসর্গ করেন। ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি বস্তুর ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকেই সংযম বলেছেন। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবত বহির্মুখী। সংযমের আগুনে তাঁরা সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে দাহ করেন। অর্থাৎ নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা তাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেন। এ যেন বেগবান নদীর স্বাভাবিক গতিকে ফিরিয়ে উৎসমুখে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এও এক প্রকার যজ্ঞ – সংযম যজ্ঞ। স্বামী বিবেকানন্দকে একবার চিকিৎসকরা নির্দেশ দিয়েছেন একুশদিন জল খেতে পারবেন না। স্বামীজী বলছেন, 'ওষুধ খাওয়ার দিন প্রাতে ''আর জল পান করব না'' বলে দৃঢ় সঙ্কল্প করব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কন্ঠের নীচে নামে।' করেছিলেনও ঠিক তাই। এ-ই হল সংযম। এক কথায় ধর্ম বলতে এই আত্মসংযমকেই বোঝায়।

আবার এক দল আছে, এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ভোগপ্রবণ। তারা মনে করে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে সংযম যেমন অগ্নি, বিষয়ী লোকের কাছে ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি অগ্নি। কোথায় কী আছে তারা সব গ্রাস করতে চায়। ইন্দ্রিয়গুলি যেন হাঁ করে আছে । চোখ বলে দেখি, কান বলে শুনি, জিভ বলে খাই, পা বলে যাই। এই ভাবে ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব বিষয়ের দিকে ছুটছে। আর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করছে।

কিন্তু কোনও কোনও যোগী আবার বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণে তিনি অনাসক্ত থাকেন। শ্রীধর স্বামীর মতে, ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকল আহুতি দেওয়ার অর্থ হল, অনাসক্ত হয়ে শাস্ত্রবিহিত বিষয় গ্রহণ করা। একেই ইন্দ্রিয়যজ্ঞ বলা হয়েছে। যাঁদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত হয়েছে তাঁদের পক্ষে বিষয়ের আকর্ষণী শক্তি ইন্দ্রিয়সংযমের অগ্নিতে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাধকের চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। নির্লিপ্ত যোগীরা এ যজ্ঞ করেন। এখানে ইন্দ্রিয়যজ্ঞ সাধককে বিষয়ভোগে প্রবর্তিত করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ইন্দ্রিয়ের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া।' 'আমি' যখন যাবে না, তখন থাক শালা 'দাস-আমি' হয়ে।

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ।। ২৭

অপরে (অন্য কোনও যোগী) সর্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়-কর্মাণি (ইন্দ্রিয়ের কর্ম) প্রাণ-কর্মাণি চ (ও প্রাণাদি বায়ুর কর্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদ্বারা উদ্দীপিত) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ-যোগাগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)।

অন্য কোনও যোগী সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর কর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্দীপিত আত্মসংযমরূপ অর্থাৎ সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণের সমস্ত কর্ম নিরোধ করে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন।

পূর্বে দৈবযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান শ্লোকে ও পূর্ববর্তী শ্লোকে জ্ঞানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে অগ্নি মনে করে তাতে বিষয় আহুতি দিতে হয়। পরে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযমাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অর্থাৎ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিবৃত্ত করে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করতে হয়। সব শেষে, আত্মবিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম হলে ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সব কর্ম সেই আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি বস্তুর ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকেই প্রকৃত সংযম বলেছেন। এই হল জ্ঞানযজ্ঞের শেষ ধাপ—ব্রহ্মাগ্নিতে জীবাত্মার আহুতি।

'ইন্দ্রিয়কর্মাণি'—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শ। আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু) কাজ হল কথা বলা, গ্রহণ করা, চলাফেরা করা, জনন-প্রক্রিয়া এবং মল-মূত্র ত্যাগ। এই দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়কর্ম বলা যায়। 'প্রাণকর্মাণি' বলতে বোঝায় পঞ্চ প্রাণবায়ুর (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান) কর্ম। শ্বাস গ্রহণ, নিঃশ্বাস ত্যাগ, খাদ্যবস্তুর পরিপাক করা, খাদ্যরসকে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি হল পঞ্চপ্রাণের কর্ম। ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণকর্মকে আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। আত্মায় মনকে একাগ্র করার নাম আত্মসংযম যোগ। এই যোগ অভ্যাস করে যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন তা যোগাগ্নি। জ্ঞানলাভ না হলে এই অগ্নি জ্বলে না। এ আগুন জ্ঞানের আগুন। জ্ঞানীর হৃদয়ে সবসময় এই অগ্নি জ্বলছে । আমি জেনে নিয়েছি আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ। সেই জ্ঞানের আগুনে ইন্দ্রিয়ের যত কামনা-বাসনা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদি প্রাণের যত ক্রিয়া সব আহুতি দিয়েছি আমি, দিয়ে আত্মারাম হয়ে বসে আছি। এর নাম আত্মসংযমযোগ বা সমাধিযজ্ঞ। আমি যেন একটা যজ্ঞ করছি। এই যজ্ঞে ঘি, কাঠ প্রভৃতি উপকরণের দরকার নেই। আমি নিজেকে নিজে আহুতি দিয়েছি। এখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্মে অনাসক্ত হয়ে আমি আত্মানন্দে মগ্ন হয়ে আছি।

উচ্চমানের চরিত্র এই কর্মের ফলে গড়ে ওঠে। বাহ্যযজ্ঞ ছেড়ে আমাদেরকে আন্তরযজ্ঞে মোড় ফিরাতে হবে। তার ফলে ঈশ্বর যে আমাদের অন্তরে সদা বর্তমান তাঁর অভিব্যক্তির সহায়ক হবে। ভক্তিশাস্ত্র একে 'মানস পূজা' বলে। দেবতার সমস্ত পূজা হৃদয়ে করা। এর উদ্দেশ্য আমাদের মনের চঞ্চলতার গতিকে উচ্চস্তরের অভিমুখী করা। শরীরের মধ্যে আমাদের যা কিছু ঘটছে তাকেই আধ্যাত্মিকতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। তাই ভগবান এই জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলছেন।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।। ২৮

(কেউ কেউ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞনিষ্ঠ) (কেউ বা) তপোযজ্ঞাঃ (চান্দ্রায়ণাদি তপোযজ্ঞপরায়ণ) (কেউ বা) যোগযজ্ঞাঃ (চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ বা সমাধিপরায়ণ) তথা অপরে (আবার কোনও কোনও) যতয়ঃ (যতীরা, যত্নশীল যোগীরা) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রতা) স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থনির্ণয়রূপ যজ্ঞপরায়ণ)।

কেউ কেউ দ্রব্যদান করে যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধনারূপ তপস্যা ও যজ্ঞ করেন, কেউ বা যোগানুষ্ঠানরূপ যজ্ঞ করেন, অন্য কোনও দৃঢ়ব্রত যত্নশীল যোগী বেদ-অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করেন, আবার কেউ বা বেদার্থ-নির্ণয়রূপ যজ্ঞসম্পাদন করেন।

শাস্ত্রের নিয়ম মেনে দেবতাদের উদ্দেশে সোনা, অর্থ, গাভী ইত্যাদি দ্রব্য দান করে যাঁরা যজ্ঞ করেন তাঁদের 'দ্রব্যযজ্ঞাঃ' বলা হয়েছে। স্মৃতিবিহিত পূর্ত ও দত্ত কর্মের অনুষ্ঠানই দ্রব্যযজ্ঞ। সরোবর, কুয়ো, পুকুর ইত্যাদি খনন, মন্দির স্থাপন, অন্নদান, অশ্রবদন প্রভৃতি হল পূর্ত কর্ম। আর আশ্রিতকে রক্ষা করা, সর্বভূতে অহিংসা এবং অন্যান্য দান হল দত্ত কর্ম। বৈদিক (শ্রুতিবিহিত) যজ্ঞে যজ্ঞের অঙ্গরূপে যেসব দান করা হয় তাও দ্রব্যযজ্ঞ। আবার ভক্ত ভগবানকে যখন সকামভাবে উপাসনা করে, বলে, 'তোমাকে সোনার মুকুট পরাব, রুপোর নূপুর গড়িয়ে দেব' প্রভৃতিকেও দ্রব্যযজ্ঞ বলা হয়। কৃচ্ছ্রসাধন, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, পঞ্চতপা ইত্যাদি যজ্ঞ যাঁরা করেন তাঁরা হলেন 'তপোযজ্ঞাঃ' অর্থাৎ তপস্বী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীশ্রীমাসারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর পঞ্চতপা করেছেন। চারদিকে চারটে অগ্নিকুণ্ড আর মাথার উপর প্রখর সূর্য। তার মাঝে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা বসে তপস্যা করছেন। একমাসব্যাপী তপস্যা। তাঁর সমস্ত শরীর পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। আবার, 'যোগযজ্ঞাঃ' বলতে যে-সকল যোগী অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করেন তাঁদের—বোঝানো হয়েছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগসাধনার অঙ্গ। 'স্বাধ্যায়' বলতে বোঝায় শাস্ত্র অধ্যয়ন, বেদপাঠ । স্ব + অধ্যায় = স্বাধ্যায়। বেদই হচ্ছে আমাদের 'স্ব'। আপনি আমি আমরা সবাই বেদ। বেদই আমাদের আত্মা । সেই আত্মাকে জানা, আত্মাকে অধ্যয়ন করা, বেদপাঠ করা—এর নাম স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়কে যাঁরা যজ্ঞ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁরাই 'স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ'। আবার শাস্ত্রের মর্মার্থ গ্রহণ যাঁদের যজ্ঞ তাঁরা 'জ্ঞানযজ্ঞাঃ'— এঁরা সকলেই যতি অর্থাৎ যত্নশীল যোগী। এবং 'সংশিতব্রতাঃ', দৃঢ়ব্রতা। যতি হলেন তিনি, যিনি কঠিন কর্ম করতে অভ্যস্ত। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কঠিন কর্ম করছেন, কৃচ্ছ্রসাধন করছেন, কঠোরতা পালন করছেন। যোগী ব্রতে দৃঢ়সংকল্প হলে

তাঁর কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ দূর হয়ে যায়। তিনি সংসারের ভোগসুখ বিসর্জন দিয়ে কঠোর সংযমব্রত অবলম্বন করেন। এই চারপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীই হলেন 'সংশিতব্রতাঃ', অর্থাৎ যিনি সম্যক-সংযমী, মন সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।। ২৯

তথা (আবার) অপরে (অন্যান্য যোগী) অপানে (অপান-বায়ুতে) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) (ও) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপানবায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) (এবং) প্রাণ-অপান-গতী (প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিকে) রুদ্ধ্বা (রোধ করে) প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়ে থাকেন)।

আবার অন্যান্য যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু (পূরক প্রাণায়াম) এবং প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দিয়ে (রেচক নামক প্রাণায়াম) প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি রোধপূর্বক কুম্ভক প্রাণায়াম করেন।

দেহের ভেতর থেকে যে বায়ু মুখ ও নাসিকাপথে বাইরে আসে তা প্রাণবায়ু (অর্থাৎ নিঃশ্বাস)। আর যে বায়ু বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করে তা অপানবায়ু (অর্থাৎ প্রশ্বাস)। বায়ু বলতে বাতাস নয়, শক্তি। হৃদয় থেকে যে শক্তিপ্রবাহ ঊর্ধ্বগামী হয় তাকে বলে প্রাণ। আর যা অধোগামী হয় তাকে বলে অপান। এদের দ্বারাই দেহ ক্রিয়াশীল হয়।

এই শ্লোকে প্রাণায়াম যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। 'প্রাণায়াম'-এর অর্থ প্রাণবায়ুর নিরোধ (প্রাণ= প্রাণবায়ু, আয়াম্ =নিরোধ)। প্রাণায়াম তিন প্রকার—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। কোনও কোনও যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন। শ্বাসগ্রহণের দ্বারা অপানবায়ুকে শরীরে প্রবেশ করালে আপনিই প্রাণবায়ুর গতি রোধ হয়। অর্থাৎ প্রাণবায়ু বাইরে আসতে পারে না। তাকেই বলা হয়েছে 'অপানে প্রাণের আহুতি।' এর দ্বারা অন্তর বায়ুতে পূর্ণ হয় বলে এর নাম 'পূরক' প্রাণায়াম।

পূরকের বিপরীত হল রেচক। নিঃশ্বাসের দ্বারা প্রাণবায়ুকে দেহের বাইরে ত্যাগ করলে অপানবায়ুর গতিরোধ হয়। অর্থাৎ বাইরের বায়ু ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। একেইবলা হয়েছে 'প্রাণে অপানের আহুতি।' এর দ্বারা অন্তর বায়ুশূন্য হয়। এর নাম রেচক প্রাণায়াম।

আবার কোনও কোনও যোগী প্রাণ ও অপান উভয়ের গতিরোধ করে বায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করে কুম্ভক প্রাণায়াম করেন। যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম করার পদ্ধতি বিশদভাবে বলা আছে। কেবলমাত্র সিদ্ধগুরুর কাছেই প্রাণায়াম শেখা উচিত।

বস্তুত প্রাণশক্তির সংযমই প্রাণায়াম। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ প্রাণায়ামের একটি উপায় মাত্র। আমরা প্রাণশক্তিকে ধরতে পারছি না। কিন্তু প্রাণ ও অপান বায়ুকে সংযত করে (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে) তার পিছনে যে শক্তি আছে তার উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছি।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ।। ৩০

অপরে (অন্যান্য যোগী) নিয়ত-আহারাঃ (আহারে সংযত অর্থাৎ মিতাহারী হয়ে) প্রাণান্ (প্রাণ নামক বায়ুবিশেষকে) প্রাণেষু (প্রাণবায়ুসমূহে) জুহ্বতি (হোম করেন) এতে (এই) সর্বে (সকল) যজ্ঞবিদঃ অপি (যজ্ঞবিদ্‌গণও) যজ্ঞ- ক্ষপিতকল্মষাঃ (যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন)।

অপর কোনও কোনও যোগী আহার-সংযম করে প্রাণ নামক বায়ু-বিশেষকে প্রাণবায়ু-সমূহে হোম করেন। অর্থাৎ যে-যে প্রাণবায়ু জয় করেন সেই-সেই প্রাণবায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন। এঁরা সকলেই যজ্ঞবিদ্ এবং তাঁরা যজ্ঞের দ্বারা নিষ্পাপ হন।

'নিয়তাহারাঃ' নিয়ত অর্থাৎ পরিমিত আহার যাঁরা করেন। যোগশাস্ত্র-মতে উদরের দু-ভাগ অন্ন ও একভাগ জল দিয়ে পূর্ণ করে, চতুর্থ ভাগ বায়ু-চলাচলের জন্য খালি রাখতে হয়। মনঃসংযমের জন্য যোগশাস্ত্র পরিমিত আহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মিতাহারী হয়ে কোনও কোনও যোগী প্রাণ-নামক বায়ুবিশেষকে প্রাণবায়ুসমূহে আহুতি দেন। অর্থাৎ যে-প্রাণবায়ুকে তিনি বশীভূত করেন সেই বায়ুতে অন্যান্য প্রাণবায়ুর আহুতি দেন। সেই সকল প্রাণবায়ু যেন সেই বশীভূত বায়ুর মধ্যে লয় হয়। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রাণের অধীন। এই কারণে প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হলে এবং আহারসঙ্কোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ দুর্বল হলে, তারা স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে অসমর্থ হয়ে প্রাণ-সমূহে বিলীন হয়।

এই সকল যজ্ঞসমূহকে যিনি জানেন, তিনি 'যজ্ঞবিদ্'। শুধু যজ্ঞের বিষয় বা নিয়ম জানেন তা নয়। তাঁরা ঐ সকল যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হয়ে, দৃঢ়ব্রত হয়ে, ঐ সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা প্রকৃত যজ্ঞবিদ্ বলে খ্যাত এবং তাঁদের সকল পাপ যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়। বিষয়ভোগের তৃষ্ণা, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়-ভোগাভিলাষ—এই সব পাপের কারণ। কাজেই যাঁরা যজ্ঞরূপে সর্বস্ব ভগবানে অর্পণ করেন, ইন্দ্রিয়সুখকে তুচ্ছ করেন, তাঁদের আর পাপ নেই।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ।। ৩১

যজ্ঞ-শিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ (অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন যাঁরা ভোজন করেন) সনাতনং (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মপদ) যান্তি (লাভ করেন অর্থাৎ জানেন) কুরু-সত্তম (হে কুরুশ্রেষ্ঠ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞহীন ব্যক্তির) অয়ং (এই) লোকঃ (জগৎ) ন অস্তি (নেই) অন্যঃ (অন্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদি লোক) কুতঃ (কোথায়) (অর্থাৎ কী করে সম্ভব)।

যাঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে-কোনওপ্রকার যজ্ঞই অনুষ্ঠান করে না, তার ইহলোকই নেই অর্থাৎ ইহলোকেই সুখ নেই, ব্রহ্মাদি পরলোকে তো দূরের কথা।

আগের শ্লোকগুলিতে শ্রীভগবান অর্জুনকে জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ নানা যজ্ঞের কথা বলেছেন। কেউ দ্রব্যদান করেন, কেউ তপস্যা করেন, কেউ প্রাণায়াম করেন, কেউ যোগসাধনা করেন, আবার কেউ শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করে যজ্ঞ করেন। ঐ সকল যজ্ঞের তত্ত্ব অবগত হয়ে শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যজ্ঞের দ্বারা তাঁদের পাপ ক্ষয় হয়। যজ্ঞের পর অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশেষ তাঁরা যথাবিধি গ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁরা সকলেই যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন, তাই তত্ত্ব জেনে যজ্ঞ করাই পরমপদ লাভের উপায়। এই সকল যজ্ঞের একটিও না করে পরমতত্ত্বকে জানা যায় না। এহেন ব্যক্তিদের ইহকাল ও পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। এ জীবনে তাঁদের জাগতিক উন্নতির অর্থাৎ অভ্যুদয়ের কোনও আশা নেই। মৃত্যুর পরও তাঁরা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন না। নিঃশ্রেয়স্ লাভ তো অনেক দূরের কথা।

যজ্ঞই সংসারের নিয়ম। আমাদের সারা জীবনটাই নীরব যজ্ঞ। আমরা যে দেখি, শুনি, খাই, কথা বলি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করি—এসবই যজ্ঞ। ঠিক ঠিক ঈশ্বরের উদ্দেশে করা হলে সব কাজই যজ্ঞ। আর এতেই সুখ, শান্তি ও আনন্দ। কর্মী মনে করেন, তিনি যজ্ঞকর্তা নন, ভগবানই সমস্ত যজ্ঞের কর্তা ও ভোক্তা। তাঁর 'অহং বুদ্ধি' লোপ পায়। তাঁর সমস্ত কর্ম ও ফল ভগবানে সমর্পিত।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ।। ৩২

ব্রহ্মণঃ (বেদরূপ ব্রহ্মের) মুখে (মুখে) এবং (এইরূপে) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (ব্যাখ্যাত হয়েছে) তান্ সর্বান্ (সেই সকল যজ্ঞকে) কর্মজান্ (কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মজাত) বিদ্ধি (জেনো) এবং (এইরূপে) জ্ঞাত্বা (জেনে) বিমোক্ষ্যসে (তুমি মুক্তিলাভ করবে)।

বেদরূপ ব্রহ্মে এইরকম বহুবিধ যজ্ঞের বিধান আছে। কিন্তু এ সকলই কর্মজাত অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক—এই তিনপ্রকার কর্ম থেকে এসেছে বলে জেনো। একথা জেনে তুমি মুক্তিলাভ করবে।

জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ—একথাই শ্রীভগবান এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। যে কাজ ঈশ্বরের উদ্দেশে করা হয় তাকেই 'যজ্ঞ' বলা যায়। সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞে নিজেকে প্রকাশ করছেন। বিশ্বের সকল কর্মই পরমেশ্বরের উদ্দেশে অর্পিত যজ্ঞস্বরূপ হতে পারে।

'ব্রহ্মণঃ মুখে'—এখানে ব্রহ্ম মানে বেদ। আমাদের কাছে বেদ বই নয়। বেদ মানে জ্ঞান। বেদ কথাটি বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে। বিদ্ মানে জানা। গুরু থেকে শিষ্যে, পিতা থেকে পুত্রে পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান চলে আসছে। এ লিখিত জ্ঞান নয়। শুনে শেখা। তাই বেদকে বলে শ্রুতি। 'বিততাঃ ব্রহ্মণঃ মুখে'—বেদে বিস্তার করে বলা আছে। নানাবিধ যজ্ঞের কথা বলা আছে। এর মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞ ছাড়া আর সবই কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ সকাম কর্মের মধ্যে পড়ে। কারণ সব যজ্ঞই 'আমি কর্তা'—এই বুদ্ধিতে করা হয়। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে করা হয়। একমাত্র জ্ঞানযজ্ঞই 'আত্মা অকর্তা' এই বোধে প্রতিষ্ঠিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কর্মজান্ তান্ বিদ্ধি'—এই সমস্ত যজ্ঞ কর্মজাত। অর্থাৎ সকাম। আমরা তো কতভাবে যজ্ঞ করি। হাত দিয়ে যজ্ঞ করি—কায়িক। মনে মনে চিন্তা করি, প্রার্থনা করি— মানসিক। আবার কথা দিয়ে যজ্ঞের মন্ত্র পড়ি—বাচনিক। এর দ্বারা মুক্তি হয় না। কর্ম করলে ফল হয়। ভাল কর্ম করলে ভাল ফল। আর মন্দ কর্ম করলে মন্দ ফল। সেই ফল ভোগ করার জন্য আবার আমাদের দেহধারণ করতে হয়। এইভাবে জন্মমৃত্যুর চক্রে আমরা ঘুরপাক খাই। তাহলে মুক্তি কীভাবে হয়? জ্ঞানের দ্বারা। এই সকল যজ্ঞ বাক্য, মন ও দেহের কর্ম। কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয়। আমিই সেই উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার জন্য চাই নিষ্কাম-কর্ম, যা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করে, এই জ্ঞানে পৌঁছে দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, কর্ম কীকরে করতে হয় তা জানতে হবে। তবেই তা হতে শ্রেষ্ঠ ফললাভ হবে। আমাদের জানতে হবে যে, সমুদয় কর্মের উদ্দেশ্য—মনের ভিতর পূর্ব থেকে যে- শক্তি নিহিত রয়েছে, তা প্রকাশ করা—জীবাত্মার জাগরণ করা। গীতার মূল সূত্র—নিরন্তর কর্ম কর এবং অনাসক্ত হও, তবেই তুমি মুক্তি লাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে। ভগবান বলছেন, যা কিছু কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর, সমুদয়ই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করে শান্তভাবে অবস্থান কর।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।। ৩৩

পরন্তপ (হে শত্রুদমন) দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ থেকে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) পার্থ (হে অর্জুন) অখিলং (ফলসহ, নিরবশেষ) সর্বম্ (সকল) কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম) জ্ঞানে (ব্রহ্মজ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত হয়)।

হে পরন্তপ, দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়। কারণ ফলসহ সকল যজ্ঞাদি কর্ম নিঃশেষে আত্মজ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়।

আমরা অনেক সময় দেখি যজ্ঞের বিরাট আয়োজন। একমণ ঘি পোড়ানো হবে, এত সোনা দেওয়া হবে। এগুলি হচ্ছে দ্রব্যময় যজ্ঞ। আমরা ভাবি ভগবানকে আমরা উপহার দিচ্ছি। সোনার মুকুট তৈরি করে দিলাম, গলায় হার পরিয়ে দিলাম, পায়ের নূপুর গড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ঈশ্বর চান প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা। তাতেই তিনি তৃপ্ত। তাই শ্রীভগবান বলছেন, দ্রব্যযজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ বড়। দ্রব্যযজ্ঞ হতে স্বর্গাদি লাভ হতে পারে কিন্তু তাতে মোক্ষপদ লাভ হবে না। তবে দ্রব্যযজ্ঞ দিয়ে শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে নিষ্কাম কর্ম আসবে এবং সমস্ত কর্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হবে। জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানযজ্ঞের অর্থ ব্রহ্মচিন্তা, আত্মচিন্তা। জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের কৈবল্য বা মুক্তিলাভ হয়। কোন জ্ঞান?--আত্মজ্ঞান, আমাদের স্বরূপজ্ঞান। 'কৈবল্য' মানে কেবল। অর্থাৎ আমি একা। সংসারে আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু নেই। দুই বোধই অজ্ঞানতা। আমি-তুমি, অস্মদ্-যুস্মদ্, এই ভেদবুদ্ধি অজ্ঞান থেকে হয়। এক জ্ঞানই জ্ঞান। এই চরাচর বিশ্বে এক 'আমি'ই অর্থাৎ আত্মাই বিরাজ করছি। এই অপরোক্ষ অনুভূতিই জ্ঞান।

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, আত্মজ্ঞান লাভ। নিষ্কাম কর্ম সেই উদ্দেশ্য লাভের উপায়। আমরা তো কাজ না করে থাকতে পারি না। কেউ শরীর দিয়ে কাজ করছি। কেউ মনে মনে কাজ করছি, চিন্তা করছি। আবার কেউ বা কথা দিয়ে কাজ করছি। কথা দিয়েও কাজ করা যায়। আমি হয়তো এমন কথা বললাম আপনার মনে হল এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। আবার কারোর কথা শুনে মৃতপ্রায় মানুষও বেঁচে ওঠে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছেন, 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামবে না।' এইভাবে ছোট-বড় কত কাজই না আমরা করি। ফলে অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করলে সব কাজই পূজা। সব কাজই যজ্ঞ।

অবশ্য অনাসক্ত হয়ে কাজ করা সহজ নয়, ভারী কঠিন। সবসময় আমরা বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখব। সবসময় চিন্তা করব, কাজটা ঈশ্বরের উদ্দেশে করছি তো? ফলের আকাঙ্ক্ষা করছি না তো? ঈশ্বরের উদ্দেশে না হলে সেই কাজ আপাতদৃষ্টিতে যত পবিত্রই হোক না কেন তা বন্ধনের কারণ হবে। একই কাজ ভগবানের জন্য করলে পূজা, নিজের জন্য করলে কাজ। আবার সেই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যটাও স্থির রাখতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, ঈশ্বরলাভ। কাজের মধ্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলি। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, কাজটা উদ্দেশ্য নয়, উপায়। জ্ঞানলাভের উপায়। নিষ্কাম কর্মের

দ্বারা আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হয়। 'আমি' 'আমার' বোধই মলিনতা। সেই মলিনতা দূর হলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মজ্ঞান আপনা-আপনি ফুটে ওঠে। 'সর্বকর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'—সব কাজই পূজা। এই বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কাজ করলে সব কাজই শেষে জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। দ্রব্যযজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞ ধীরে ধীরে মানুষের চিত্তশুদ্ধি করে। তাঁকে আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী করে তোলে। নিষ্কাম কর্ম, তপস্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, উপাসনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে 'পরন্তপ' বলে সম্বোধন করছেন। তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 'পরন্তপ' কথাটির অর্থ শত্রুকে যে পীড়ন করে। বলতে চাইছেন, 'হে অর্জুন তুমি বীর, শত্রুকে বারবার জয় করেছ। কাজেই তোমার ভেতরের শত্রু অর্থাৎ রাগ, হিংসা, লোভ, অভিমান প্রভৃতি সব দুর্বলতাকে জয় করতে পারবে, এতে আর আশ্চর্য কী?

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।। ৩৪

(যে যে বিধি দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়)—তৎ (সেই ব্রহ্মজ্ঞান) প্রণিপাতেন (দণ্ডবৎ প্রণামদ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (বারবার আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা দ্বারা) সেবয়া (গুরু-সেবা দ্বারা) বিদ্ধি (অবগত হও) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী) তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (ব্রহ্মজ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করবেন)।

গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম, জ্ঞান বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং গুরুসেবা দ্বারা সেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে। এই তিনটি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন। তবেই জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করবেন।

এখানে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়ের কথা বলা হয়েছে। শ্রীভগবান বলছেন, আত্মাকে জানাই জীবনের উদ্দেশ্য। তোমার স্বরূপকে তুমি জান। কীভাবে তাঁকে জানা যায়? তত্ত্বদর্শী গুরুর কাছ থেকে। শিষ্য গুরুকে খুব ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবে। আমাদের শাস্ত্রে কী সুন্দর সব কথা বলা আছে! শিষ্য যখন গুরুগৃহে যাচ্ছে তখন সে খালি হাতে যাবে না। শ্রদ্ধা ও বিনয়ের প্রতীকরূপে 'সমিধপাণি' নিয়ে অর্থাৎ যজ্ঞের কাঠ হাতে নিয়ে শিষ্য গুরুর কাছে যাবে। তারপর বলছেন 'পরিপ্রশ্নেন'— গুরুকে বারবার আত্মবিষয়ে প্রশ্ন করবে। শিষ্যের হয়তো অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে। অনেককিছুই সে ভালভাবে বুঝতে পারছে না। বারবার জিজ্ঞাসা করে, ভাল করে বুঝে নেবে। প্রশ্নগুলি কী ধরনের হবে? অবশ্যই ধর্মসংক্রান্ত। শংকরানন্দ সরস্বতী একটি শ্লোকে এ সম্বন্ধে বলছেন :

'কথং বন্ধ কথং মোক্ষো বিদ্যাবিদে চ কে উভে।
ক আত্মা কঃ পরাত্মা তয়োরৈক্যং কথং বদ ।।

অর্থাৎ বন্ধন কী? মুক্তি কী? বিদ্যা ও অবিদ্যা কাকে বলে? জীবাত্মা ও পরমাত্মা কে? এবং জীবাত্মা কীভাবে পরমাত্মায় লীন হয়?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তখন শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করে। গুরুও নানাভাবে তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন। তারপর বলছেন, 'সেবয়া'—গুরুসেবার দ্বারা। এসবের সাহায্যেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। যেভাবেই হোক, গুরুর সেবা কর। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে কাউকে হয়তো বলছেন : 'আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবে?' গুরু কৃপা করে শিষ্যের সেবা চেয়ে নিচ্ছেন। শিষ্য হয়তো লাজুক। শিষ্যের হয়তো ইচ্ছা করছে সে গুরুর সেবা করে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছে না। তাই গুরু নিজে থেকেই শিষ্যের সেবা গ্রহণ করছেন। শিষ্য যদি আন্তরিকতার সাথে এসব মেনে চলে, তখন গুরু তাকে 'উপদেক্ষ্যন্তি', আত্মতত্ত্ব বুঝিয়ে বলেন। যিনি এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন কেবলমাত্র তিনিই উপদেশ দিতে পারেন। যাঁরা শাস্ত্রের শব্দার্থ জানেন কিন্তু মর্মার্থকে উপলব্ধি করতে পারেননি তাঁদের উপদেশে কোনও ফল হয় না। এ যেন এক অন্ধ ব্যক্তির আর এক অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলা। তাই এখানে 'জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ' কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে বোধে বোধ করেছেন এমন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শিষ্যকে উপদেশ দিলে শিষ্যের জীবনের মোড় ফিরে যায়। শিষ্য তখন আত্মজ্ঞানলাভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ভগবান তিনটি উপায়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন গুরু ও শিষ্যের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যঃ প্রণিপাতেন—শিষ্য গুরুকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করবে, পরিপ্রশ্নেন—শিষ্য গুরুর নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে আত্মবিষয়ে বার বার প্রশ্ন করবে এবং তা শ্রবণ করে ধারণা করার চেষ্টা করবে, তারপর সেবয়া—শিষ্য একান্ত ভক্তিভাব নিয়ে গুরুর সেবা করবে এবং তাঁর কৃপা পাবার চেষ্টা করবে।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ।। ৩৫

পাণ্ডব (হে অর্জুন) যৎ (যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জেনে অর্থাৎ লাভ করে) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এই প্রকার) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হবে না) যেন (যে জ্ঞানলাভের ফলে) অশেষেণ (চরাচর ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত) ভূতানি (ভূতসকলকে) আত্মনি (নিজের আত্মাতে) অথ (অনন্তর) ময়ি (আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরের মধ্যে) দ্রক্ষ্যসি (দেখবে)।

হে অর্জুন, এই জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না। কারণ এই জ্ঞানলাভ হলে তুমি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত চরাচর ভূতসকলকে তোমার নিজ আত্মাতে এবং অনন্তর আমাতে দেখতে পাবে।

আত্মজ্ঞান লাভ হলে কী হয়? বাইরে থেকে হয়তো কোনও পরিবর্তনই চোখে পড়ে না। কিন্তু যাঁর আত্মজ্ঞান হয়, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পালটে যায়। তাঁর 'দুই' বোধ চিরতরে ঘুচে যায়। তিনি শুধু এক দেখতে পান। এক ব্রহ্মকে দেখতে পান। 'ব্রহ্মময়ং জগৎ'। বিশ্বচরাচর জুড়ে কেবল তিনিই রয়েছেন—এই বোধে তিনি তখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন। এই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, ইট, কাঠ, পাথর—সবের মধ্যে তিনি নিজেকে দেখেন। বেদান্তমতে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা।' একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। আর সবই মিথ্যা। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সাধক নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যান। সাধক তখন সবকিছুর সাথে একত্ব বোধ করেন। অজ্ঞানতার মেঘ কেটে যায়। জ্ঞানসূর্য উদিত হয়। সাধক নিজেই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁর মায়া, মোহ সমূলে বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে আর বেচালে পা পড়ে না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বলছেন : 'তুমি যদি আত্মতত্ত্বকে বোধে বোধ কর তাহলে মায়া, মোহ তোমার আর কিছুই করতে পারবে না।' আসলে অর্জুন যুদ্ধ করতেই এসেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। তিনি বললেন, 'আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের বধ করে সিংহাসনে বসতে চাই না। তার চেয়ে আমি বরং ভিক্ষা করে খাব।' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'অর্জুন, একে বৈরাগ্য বলে না। তুমি এখনও অজ্ঞানতার জালে বদ্ধ। মায়া, মোহ কাটিয়ে তুমি আত্মজ্ঞানলাভে ব্রতী হও। তাহলে তুমি দেখবে, তুমি দেহ-মনের অতীত এক সত্তা। তুমিই পরমাত্মা। সকলের মধ্যে আত্মারূপে তুমিই বিরাজ করছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি ও আমি এক ও অভিন্ন। আসলে স্বরূপে তো আমরা সবাই এক। কে কাকে মারবে? দুই দেখছ তাই হিংসা, দ্বেষ। এ অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার জন্যই দয়া-মায়া। তোমার স্বজনপ্রীতি কৃত্রিম। এ শুধু মুখোশ। 'এক' জ্ঞান হলে প্রেম-প্রীতি। সহজাত। আমরা এক, মানবজাতি এক—এর বিকল্প নেই।

বেদান্ত বলে তোমার ভেদবুদ্ধি যদি একটুও থাকে, তবে সেই ভেদবুদ্ধিই তোমাকে ধ্বংস করবে। ভেদভাবটি সত্য নয়। সত্য হলো আমরা এক। স্থূলভাবে আমরা বস্তুতে বস্তুতে ভেদ দেখে থাকি। প্রত্যেকটি বস্তু অন্য বস্তু থেকে পৃথক। কিন্তু এর পেছনে যে সত্য রয়েছে তা একত্ব। একম্ এব অদ্বিতীয়ম্—এক ব্রহ্ম যার দ্বিতীয় নেই। সেই এক রয়েছে বহুর, তথা বিশ্বের পেছনে। এই জ্ঞানই প্রয়োজন। এই জ্ঞান হলে আমরা মহাশক্তি অর্জন করব। আর দুর্বলতা নয়, সঙ্কীর্ণ ভাব নয়, ভেদ-ভাব নয়, মৃত্যুভয়ও থাকবে না। পরম সত্যকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—এই জগতে পৃথকের মনোভাব একেবারেই নেই। আমরা এক। সকল জীবন এক।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।। ৩৬

চেৎ (যদি) সর্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপীদের থেকেও) পাপকৃত্তমঃ অসি (পাপিষ্ঠ হও) তথাপি সর্বং বৃজিনং (সকল পাপসমুদ্র) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ ভেলায় চড়েই) সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হবে)।

যদি তুমি সকল পাপীদের থেকে অধিক পাপী হও তবুও তুমি এই জ্ঞানরূপ ভেলায় চড়ে পাপসমুদ্র অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করছেন। জ্ঞানই মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। বলছেন, অর্জুন, তুমি যদি সবচেয়ে বড় পাপী হও, তাহলেও তোমার কোনও ভয় নেই। 'সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ'—জগতে যতরকমের পাপ কাজ আছে তুমি হয়তো সেগুলি সব করে বসে আছ। এত পাপ যে, পাপের সমুদ্র হয়ে গেছে। কিন্তু জ্ঞানের ভেলায় চেপে তুমি অনায়াসেই এই সমুদ্র পার হয়ে যাবে। পাপমুক্ত হবে।

জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, যা আমার স্বরূপ। আমাদের সকলেরই প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে 'আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা'। কোনও মলিনতা, কোনও কালিমা আমার শুদ্ধস্বরূপকে স্পর্শ করতে পারে না। আত্মায় পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ এ-সবের কোনও স্থান নেই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে, মানুষ ভুল করে, অন্যায় করে। যেগুলিকে আমরা পাপ কাজ বলি, অনেক সময় তাতেও হয়তো লিপ্ত হয়। কিন্তু সেটা তার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কখনোই স্থায়ী অবস্থা নয়। আচমকা এসে গেছে। আবার দুদিন পরে চলেও যাবে। আরোপিত মাত্র। একটা ঘরে হয়তো হঠাৎ দুর্গন্ধ এসে পড়ল। সেজন্য কি দুর্গন্ধটা ঘরের একটা চিরকালের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল? নিশ্চয়ই নয়। দুর্গন্ধ এসেছে। কেন এসেছে জানি না। একটু পরেই আবার চলে যাবে। এ নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আসলে আমাদের শুদ্ধস্বরূপের উপর একটা আবরণ পড়েছে। সেই আবরণ একদিন না একদিন উঠবেই। আমি যদি চেষ্টা না করি তাহলেও উঠবে। তবে একটু দেরি হতে পারে। তার জন্য হয়তো আমাকে একটু বেশি কষ্ট পেতে হবে। আর চেষ্টা করলে তাড়াতাড়ি আবরণ সরে যাবে। কারণ সেটাই তো আমার স্বরূপ। সেই স্বরূপে আমি একদিন পৌঁছাবই। স্বামীজী বলছেন : পাপ কথাটা আমি বলতেও চাই না। মানুষকে পাপী বলাই পাপ। পাপের বদলে বলব ভুল। মানুষ পাপ করে না, ভুল করে। কিন্তু ভুল তো মানুষেরই ধর্ম। আরও বলছেন, দেওয়াল কখনো মিথ্যেকথা বলে না, গরু কখনো চুরি করে না। মানুষই ভুল করে। আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। যাঁকে তুমি ঋষি বলছ অতীতে তিনি অতি সাধারণ ছিলেন, আবার যাকে তুমি পাপী বলছ সে-ই ভবিষ্যতে ঋষি হয়ে যাবে। মানুষই পারে তার জীবনকে পালটে দিতে। পাপীদের নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই কিন্তু লক্ষ্যটি স্থির করতে হবে। লক্ষ্য হলো আত্মজ্ঞান। জ্ঞান-লাভের আগ্রহ একবার মনে আসলেই ভগবান সহায় হন।

আমাদের সকলেরই লক্ষ্য হল দেবতা হওয়া। হওয়াই বা বলছি কেন? আমরা তো সবাই দেবতাই আছি। তবে সেই দেবতা এখন আমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ যেন সেই দেবতার ঘুম ভেঙে গেল। অজ্ঞানতার আবরণ সরে গেল। 'প্রকৃত আমি'কে চিনতে পারলাম। আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আমি নতুন ধরনের মানুষ হলাম। অসৎ ছিলাম, সৎ হলাম। নিষ্ঠুর ছিলাম, প্রেমিক হলাম। ঘোর স্বার্থপর ছিলাম। এখন পরের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই না। আসলে আত্মজ্ঞান লাভ হলে আর কী হয়? 'আমি'টা বড় হয়ে যায়। যে আমি সকলের 'আমি', সেই 'আমি' হয়। অর্থাৎ আমার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-সত্তা প্রকট হয়। ছোট 'আমি', বড় 'আমি' হয়ে যায়। জীবাত্মা পরমাত্মায় দেখা যায়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ।। ৩৭

অর্জুন (হে অর্জুন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) যথা (যেমন) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে) তথা (সেরূপ) জ্ঞানাগ্নি (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্বকর্মাণি (প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া সকল কর্ম) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত অর্থাৎ নষ্ট) কুরুতে (করে)।

হে অর্জুন, প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে তেমনি আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া সর্বকর্মই অর্থাৎ শুভাশুভ সমস্ত কর্মফল ভস্মীভূত করে থাকে।

জ্ঞানের ভেলায় চড়ে অনায়াসেই পাপসমুদ্রকে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু তাতে কি পাপের নাশ হয়? পাছে আমাদের মনে এরূপ সন্দেহ জাগে তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। বলছেন, কাঠের স্তূপে আগুন লাগলে কাঠের স্তূপ পুড়ে নিঃশেষে ছাই হয়ে যায়। ঠিক তেমনি জ্ঞানাগ্নি প্রারব্ধ কর্ম ছাড়া পাপ-পুণ্য রূপ সকল কর্মকেই ভস্মীভূত করে। আসলে কর্মের একটা বীজ আছে। তা হল অজ্ঞানতা। জ্ঞানের আগুন কর্মের বীজকে ধ্বংস করে। কর্ম করলেই তার ফল হবে। ভাল কাজ করলে ভাল ফল হবে, খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল। কিন্তু দুটোই তো বন্ধন। একমাত্র আত্মজ্ঞানেই সমস্ত কর্মফল ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করতে হয়।

আমাদের তিন রকমের কর্মের কথা বলা হয়েছে। সঞ্চিত কর্ম বা ভবিষ্যৎ কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম আর ক্রিয়মাণ কর্ম। আমি ইহজন্মে এবং গত জন্মগুলোতে ভাল-মন্দ অনেক কাজ করেছি। সেই কাজের ফল সমস্ত জমা হয়ে আছে। 'প্রারব্ধ' কর্ম হচ্ছে সেই কাজ যা ফল দিতে শুরু করেছে। আর এখনও যেসব কাজ ফল দেওয়া শুরু করেনি, ভবিষ্যতে করবে—সেই কাজগুলিকে বলা হচ্ছে 'সঞ্চিত' কর্ম। আর 'ক্রিয়মাণ' কর্ম হলো জ্ঞানলাভের আগে পর্যন্ত এই জন্মে আমি যা কিছু করব। জ্ঞান হলে 'সঞ্চিত' এবং 'ক্রিয়মাণ' কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু 'প্রারব্ধ'টা থেকে যায়। 'প্রারব্ধ' কর্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। সেইজন্য জ্ঞানলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর ত্যাগ হয় না। যতদিন না 'প্রারব্ধ' ভোগ শেষ হয়, ততদিন শরীর থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, একটা চাকাকে কিছুদূর ঠেলে ছেড়ে দিলাম। এখন আর ঠেলছি না, কিন্তু চাকাটা তবুও কিছুদূর পর্যন্ত চলবে। তেমনি, জ্ঞানলাভ করলেও যতদিন না 'প্রারব্ধ' কর্মের ভোগ শেষ হয়, ততদিন শরীরটা থাকে। একে বলে 'জীবন্মুক্ত' অবস্থা। 'জীবন এব মুক্তঃ'—জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত।

শঙ্করাচার্য একটি উদাহরণের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একজন লক্ষ্য অভিমুখে একটি তীর ছুড়েছে। তার পিঠে তূণে অনেক তীর রাখা আছে। এবার সে পরের তীরটি ছোড়বার জন্য ধনুকে তীর যোজনা করেছে। হঠাৎ তার মনে বৈরাগ্য জাগল। তখন তার হাত থেকে তীর ধনুক পড়ে গেল। পিঠে যে তূণ বাধা ছিল তাও সে ফেলে দিল। কিন্তু যে তীর ছোড়া হয়ে গেছে তাকে কিন্তু আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এর ফল তাকে ভোগ করতেই হবে। ছুড়ে ফেলা তীরই হল প্রারব্ধ কর্ম। যে তীর ধনুকে যোজনা করা হয়েছে তা আগামী বা ভবিষ্যৎ কর্ম। আর তূণে জমে থাকা তীর হল সঞ্চিত কর্ম। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হলে জ্ঞানীব্যক্তির মনের অক্কট-বক্কটের গ্রন্থিগুলি দূর হয়ে যায়। তিনি সব সংশয়ের পারে চলে যান। তাঁর পাপ-পুণ্য সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।। ৩৮

ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের মতো) পবিত্রম্ (পবিত্র) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নেই) তৎ (সেই পরম জ্ঞান) যোগসংসিদ্ধঃ কর্মযোগসিদ্ধ পুরুষ) কালেন (যথাকালে) আত্মনি (আত্মাতে) স্বয়ং বিন্দতি (নিজেই অনুভব করেন)।

এই লোকে জ্ঞানের মতো পবিত্র বস্তু আর কিছুই নেই। নিষ্কাম কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ সেই ব্রহ্মজ্ঞান যথাকালে নিজ আত্মাতে অনুভব করেন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

এখানেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন করে চলেছেন। জ্ঞানের মতো চিত্তশুদ্ধিকর বস্তু ইহ জগতে আর নেই। তাই চাই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করা—এক অপূর্ব ধারণা। ভারতবর্ষ জ্ঞানের উপাসনা করে। আমরা আর কোনও কিছুর উপাসনা করি না। আমাদের দেব-দেবী সব কিছুই জ্ঞানের প্রতীক। আমি যাঁর উপাসনা করছি তিনি আমার মধ্যেই বিরাজ করছেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জ্ঞানের মতো পবিত্র জিনিস এ-

সংসারে আর কিছুই নেই । জ্ঞানকে আগুনের সাথে তুলনা করা হয়। জ্ঞানাগ্নি মনের সমস্ত মলিনতা, কালিমা, অজ্ঞানতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আমাদের যে নানা অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালানো হয় তা হল জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে জানা। বস্তুত ভারতবর্ষের দুটো রূপ। একটা তার বহিরঙ্গ রূপ। সেই ভারত পরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে বদলে যাচ্ছে। আর একটি তার অন্তরঙ্গ রূপ। সেই ভারতবর্ষ বলে, এই জগৎ- সংসার সত্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সত্য নয়। এর বাইরে আরও কিছু আছে, তা-ই একমাত্র সত্য। আমাদের জীবনের লক্ষ্য হল সেই সত্যকে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ হলে সমস্ত ভেদ-দৃষ্টি দূর হয় এবং তখন ঋষি দেখেন একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজ করছেন।

এখানে শ্রীভগবান সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় নির্দেশ করছেন। আমাদের লক্ষ্য হল মুক্তি। জ্ঞান ছাড়া মুক্তিলাভ করা যায় না। আমরা ভক্তিযোগ, কর্মযোগ যে-পথ ধরেই চলি না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের জ্ঞানলাভ করতেই হবে। এখনই হয়তো আমি জ্ঞানে পৌঁছতে পারছি না। তবে কি আমি থেমে যাব? এই মুহূর্তে আমার কাছে পথেরই মহিমা বেশি। অধিকাংশ লোকের জন্যই পথ হল কর্ম। কাজ করলেই তার ফল হবে । ফল হলেই বন্ধন হবে। তবে জেনেশুনে আমি কাজ করতে যাব কেন? কেননা কাজ না করে আমরা কেউ থাকতে পারি না। আমি হয়তো হাতে কাজ করছি না। কিন্তু মনে মনে কারও প্রশংসা করছি বা নিন্দা করছি। এও তো কাজ। সুতরাং কাজের মাধ্যমেই কাজের বন্ধনকে কাটাতে হবে। কি রকম কাজ? নিষ্কাম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করা। এখন প্রশ্ন হল, ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করার মানে কী? মনে করুন, একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আমি তার তদারকি করছি। যেহেতু ফলের আশা করে কাজ করছি না, তবে কী ফল উৎপন্ন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। বাড়িটা অবশ্যই হবে । কিন্তু বাড়িটা আমার মনে থাকবে না। অর্থাৎ বাড়িটার প্রতি আমার কোনও আসক্তি থাকবে না । বাড়িটা যদি না থাকে তাহলেও কিছু আসে যায় না। একেই বলে কর্মযোগ। যিনি নিষ্কাম কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর চিত্তের সব মলিনতা কেটে গেছে। যথাসময়ে তাঁর হৃদয়ে জ্ঞান আপনা-আপনিই প্রকাশ পাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার চেষ্টা করো।' চেষ্টার উপর জোর দিচ্ছেন। তাঁর কৃপার জন্য চেষ্টা করতে বলছেন। ঈশ্বর আমাদের বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন। পুরুষকার দিয়েছেন। তা কাজে লাগিয়ে আমাদের কর্মবন্ধন কাটাতে হবে। কাজেই পুরুষকার অবশ্যই চাই । পুরুষকারের সাহায্যে আমি চিত্তশুদ্ধি লাভ করব। তারপরে দৈবকৃপায় যথাসময়ে জ্ঞানসূর্য উদিত হবে। আগে আত্মকৃপা। তবে তো দৈবকৃপা হবে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৩৯

শ্রদ্ধাবান্ (ঈশ্বর, গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসী) তৎপরঃ (অনলস জ্ঞাননিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয় (জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) লভতে (লাভ করেন) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করে) অচিরেণ (শীঘ্রই) পরাং (পরম) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।

গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরম শান্তির অধিকারী হন।

শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ জ্ঞানের সাধন ও ইন্দ্রিয় সংযম—এই তিনটি হলো জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনা। এখন প্রশ্ন হল, আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী কে?—যিনি শ্রদ্ধাবান, ব্রহ্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' - শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ যাঁর শ্রদ্ধা আছে। কিসে শ্রদ্ধা ? বেদান্তবাক্য অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাসই হল শ্রদ্ধা। স্বামীজী অবশ্য এর সঙ্গে আত্মবিশ্বাসকে যোগ করেছেন। বেদান্ত ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই হল আত্মবিশ্বাস। কারণ বেদান্ত ও গুরু সেই আত্মার কথাই বলেন। সেই আত্মাতে নিষ্ঠাই হল আত্মবিশ্বাস। অর্থাৎ নিজের 'বৃহৎ আমি'র উপরে বিশ্বাস। আমি পারব। কেন পারব না? আমার গুরু আছেন, শাস্ত্র আছেন। এঁদের কথামতো চললে আমি একদিন নিশ্চয়ই আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। শাস্ত্র তো বলছেন সবার জন্য মুক্তি। মুক্তি তো দু-একজন মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে চললে আমি নিশ্চয়ই সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব—মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই । স্বামীজী যেমন বলছেন: যদি একজন বুদ্ধ হতে পারেন তবে আমরা সবাই বুদ্ধ হতে পারব। কঠোপনিষদে নচিকেতার চরিত্রে সেই শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। নচিকেতার পিতা 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে যা-কিছু সম্পত্তি আছে সব দান করতে হয়। এই যজ্ঞের দ্বারা জগতের সব ঐশ্বর্য লাভ করা যায়। কিন্তু বালক নচিকেতা দেখল, বাবা ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেবার জন্য কতকগুলি গরু নিয়ে যাচ্ছেন, যা রুগ্ণ বৃদ্ধ, মৃতপ্রায় বটে। তাই দেখে নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হল। কারণ শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। সে মনে করল, যজ্ঞ যদি করতেই হয় তবে শাস্ত্রের বিধান মেনে করতে হবে। সে তখন তার বাবাকে সতর্ক করে দিল এবং বলল, তোমার সম্পত্তির মধ্যে আমিও পড়ি। তুমি আমাকে কার কাছে দান করছ? বাবা এ প্রশ্নের উত্তর না দিলে বারবার নচিকেতা একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। শেষে তার পিতা উত্তর দিলেন, 'যমের কাছে'। অর্থাৎ বাবা খুব বিরক্ত হয়েছেন। নচিকেতা তখন যমালয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। বাবার কথায় নচিকেতা খুবই দুঃখ পেল। আবার একই সঙ্গে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসও জেগে উঠল। সে তখন ভাবতে লাগল : অনেকের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে আমি প্রথম। আবার কখনও কখনও মধ্যম। কিন্তু আমি তো কখনোই অধম নই। তবে কেন বাবা আমাকে যমালয়ে পাঠাচ্ছেন ? এই আত্মবিশ্বাসই হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি। সত্য, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থপরতার

সঙ্গে গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ও আত্মবিশ্বাসই হলো প্রকৃত শ্রদ্ধা।

আবার কেবলমাত্র শ্রদ্ধাবান হলেই চলবে না। আত্মাতে মনকে সমাহিত করার জন্য একনিষ্ঠ সাধনা চাই। একেই বলছেন 'তৎপরঃ'। আবার শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠ সাধনা থাকলেও আত্মসংযম ছাড়া জ্ঞানলাভ করা যায় না। তাই এখানে 'সংযতেন্দ্রিয়ঃ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যে-সকল ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী তাঁরাই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ হলে মানুষ অপার আনন্দ ও শান্তি অনুভব করে। আত্মার অনুভূতিতে দৈহিক স্তর থেকে আধ্যাত্মিক স্তর পর্যন্ত শান্তি নেমে আসে। আত্মার স্পর্শে এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।

এই অধ্যায়ের ৩৪ নং শ্লোকে গুরুপদে প্রণাম, আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও গুরুসেবা ইত্যাদি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। এ হল জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধন। কেননা এখানে কপটতা বা ছলনার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই শ্লোকে জ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলা হল। তা হল শ্রদ্ধা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও আত্মসংযম । এগুলি অবশ্য অকৃত্রিম হওয়া চাই।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ।। ৪০

অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন, নির্বোধ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) চ সংশয়াত্মা (ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কখনোই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না) সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং (এই) লোকঃ (লোক বা সংসার) ন অস্তি (নেই) ন পরঃ চ (পরলোকও নেই) ন সুখম্ (সুখও নেই)।

অজ্ঞ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল বা ঐহিক সুখ কিছুই নেই।

যারা আত্মজ্ঞানলাভের অধিকারী নয় তাদের দুরবস্থার কথা এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আলোচনা করছেন। এরা কারা? 'অজ্ঞঃ' – যারা শাস্ত্রজ্ঞান ও গুরুর সৎ উপদেশ লাভ করেনি। 'অশ্রদ্দধানঃ'—শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি। অর্থাৎ যাদের শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস নেই । যারা সৎ উপদেশ পেয়েও তা বিশ্বাস করে না। সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তোলে না। 'সংশয়াত্মা' অর্থাৎ যার সকল বিষয়েই সংশয়। এটা ঠিক, না ওটা ঠিক—এই চিন্তায় যে দোদুল্যমান। এমন ব্যক্তিরা কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। এদের জীবন ব্যর্থ। প্রকৃত আনন্দের খবর এরা পায় না। বেঁচে থেকেও এরা মৃতের সামিল। অজ্ঞান, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা—এই তিনরকমের লোকই বিনষ্ট হয়। এদের মধ্যে আবার 'সংশয়াত্মা' অর্থাৎ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিই নিকৃষ্ট। এরূপ ব্যক্তির ইহকাল, পরকাল বা ঐহিক সুখ কিছুই নেই। যে ব্যক্তি 'অজ্ঞ', আগামী দিনে সে হয়তো জ্ঞানলাভ করতে পারে, যে আজ শ্রদ্ধাহীন সেও আগামী দিনে শ্রদ্ধালাভ করতে পারে। কিন্তু যে

ব্যক্তি সমস্ত কথা জেনে-শুনেও সংশয়গ্রস্ত, তার সংশয় দূর হওয়া অতি কঠিন। কারণ কোনও একটি আদর্শকে দৃঢ়ভাবে না ধরলে, তাতে অচল অটল বিশ্বাস না থাকলে, ইহজীবনেও সাফল্য লাভ করা যায় না। এভাবে কোনও মহৎ কাজ হয় না। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির জীবনে কোনও স্থির লক্ষ্য নেই। সবসময় মনে সন্দেহ। নিজের উপরে আস্থা নেই। আত্মবিশ্বাস না থাকায় তার কোনও ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয় না। ফলে সে অশান্তিতে দিন কাটাতে থাকে। ইহলোক বা পরলোক কোথাও সে সুখ পায় না।

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।। ৪১

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) যোগসংন্যস্তকর্মাণং (পরমার্থদর্শনরূপ যোগদ্বারা ধর্মাধর্মরূপ সমস্ত কর্মফল যিনি ঈশ্বরে অর্পণ করেছেন) জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ (আত্মজ্ঞানলাভে যাঁর সকল সংশয় ছিন্ন হয়েছে এরূপ) আত্মবন্তং (আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে); কর্মাণি (কর্মসকল) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করতে পারে না)।

হে অর্জুন, নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যাঁর কর্মফল ঈশ্বরে অর্পিত হয়েছে, আত্মজ্ঞানলাভের ফলে যাঁর সকল সংশয় ছিন্ন হয়েছে, এমন আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না।

এই অধ্যায়ের শেষ দুটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান-কর্মের সমন্বয় করেছেন। বলছেন: 'যোগসংন্যস্তকর্মাণং'—নিষ্কামভাবে কাজ কর, সমস্ত কর্মফল তুমি ঈশ্বরে অর্পণ কর। কাজ ছাড়া তো আমরা কেউ ক্ষণকাল থাকতে পারি না। আবার কাজ করলে কাজের ফল অবশ্যম্ভাবী। তাই বলছেন, কাজ কর, কিন্তু নিজের স্বার্থের জন্য নয়। 'ঈশ্বরার্থং, লোকহিতার্থং'—ঈশ্বরের জন্য, লোককল্যাণের জন্য কর্ম কর। সে কাজ ভালোও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। কিন্তু আমি কোনও ফলেরই আকাঙ্ক্ষা করি না। ভালো হলেও তাঁর। মন্দও হলেও তাঁর। কারণ আমি যেসব কর্ম করি, তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে করি। আমার কথা, আমার কাজ, আমার চিন্তা, আমার দেহ-মন—এ সবই আমি তোমাকে (ঈশ্বরকে) দিলাম। আমি ভাল কি মন্দ জানি না। আমি যেমন তুমি সেভাবেই আমাকে গ্রহণ কর। প্রকৃত ভক্ত এভাবেই নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দেয়। কর্মফলের প্রতি কোনও টান সে অনুভব করে না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী একবার গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন। পথে একজন ব্রাহ্মণকে একটি ফল দিলেন। দিয়ে তিনি বললেন, বাবা, এই ফলটা তোমায় দিলাম। আবার এই ফলদানের যে ফল, তাও তোমায় দিলাম।

ভগবান বলছেন, 'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্'—আত্মজ্ঞানলাভে যাঁর সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে গেছে। আমাদের মনে তো কতরকমের সংশয়। একের পর এক সংশয়। আমি কে?

দেহ না আত্মা? আত্মা কর্তা না অকর্তা? এরূপ নানা সংশয় আমাদের মনকে অশান্ত করে তোলে। একমাত্র জ্ঞানলাভ হলেই সংশয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তখন বোধ হয় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কেবল 'আমি'ই আছি। 'আত্মবন্তং'—আত্মজ্ঞ, আত্মবান। আমি নিজের জায়গায় অর্থাৎ স্বভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এতদিন যে-'আমি'কে বাইরে খুঁজছিলাম এখন তাঁকে ভিতরে পেয়েছি। নিজের মধ্যে, আমি নিজেকেই খুঁজে পেয়েছি। আমি জেনেছি আমার প্রকৃত পরিচয়। আমি আত্মবান হয়ে যে কাজই করি না কেন, তা আর আমার বন্ধনের কারণ হবে না। শাস্ত্র বলে, আমি যদি স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে কাজ করি তবে তা অবশ্যই বন্ধন। সেই একই কাজ যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে করি তবে তা আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। এখানে জ্ঞান,কর্ম, ভক্তির সমন্বয়ে যোগধর্মের কথা বলা হয়েছে। এই যোগধর্ম সম্পূর্ণই গীতার নিজস্ব।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ।। ৪২

ভারত (হে অর্জুন) তস্মাৎ (সেজন্য) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞান-সম্ভূতং (অজ্ঞানজনিত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থ) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞান-অসিনা (জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করে) যোগম্ (নিষ্কাম কর্মযোগ) আতিষ্ঠ (অবলম্বন কর) উত্তিষ্ঠ (ও যুদ্ধের জন্য ওঠ)।

অতএব, হে অর্জুন, অজ্ঞানতাজনিত তোমার হৃদয়স্থ এই সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করে নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর এবং ওঠ যুদ্ধ কর।

অর্জুন যুদ্ধ করতেই এসেছিলেন। হঠাৎ অর্জুনের মনে নানা সংশয় দেখা দিল। অর্জুন ভাবতে লাগলেন, আত্মীয়-স্বজনদের বধ করে কি শেষ পর্যন্ত পাপের ভাগী হব? না, তা আমি পারব না। ওদের হত্যা করে ওদেরই রক্তে রাঙানো সিংহাসনে আমি বসতে চাই না। তার চেয়ে আমি বরং ভিক্ষা করে খাব। আমি যুদ্ধ করব না। এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, শোক, মোহ ও সংশয়রূপ ঝড়ের দাপটে তুমি পথ হারিয়ে ফেলছ। তুমি তোমার কর্তব্য থেকে পিছিয়ে যাচ্ছ। কোনটা করা উচিত আর কোনটা উচিত নয়—এ বিচারবুদ্ধি তুমি হারিয়ে ফেলেছ। এই অবস্থার জন্য দায়ী তোমার অজ্ঞতা। অজ্ঞানতার মায়াজালে তুমি বদ্ধ। এর জন্য তোমার মনে যে দুর্বলতা ও সংশয় দেখা দিয়েছে, আত্মজ্ঞানের অসি দিয়ে তা ছিন্ন কর। এসব দুর্বলতাকে জ্ঞানের খড়্গ দিয়ে কচকচ করে কেটে ফেল। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁর দেহাত্মবোধ চিরতরে ঘুচে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের মধ্যে তিনি নিজেকেই দেখেন। তিনি এক বৈ দুই জানেন না। তিনি তখন সকল দ্বন্দ্বের পারে চলে যান। শোক, দুঃখ কোনও কিছুই তখন তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : শ্রদ্ধা, আত্মসংযম ও একনিষ্ঠার সাহায্যেই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। হে অর্জুন, আমার কথায় তোমার শ্রদ্ধা আছে। তোমার আত্মসংযম ও নিষ্ঠা আছে। অতএব তুমি তোমার সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ কর। নিষ্কাম কর্মযোগকে অবলম্বন করে নিজ কর্তব্য পালনে ব্রতী হও।

অর্জুন যুদ্ধ করবেন না বলে বসেই পড়েছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : তুমি ওঠ, ধর্মরক্ষার্থে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হও। আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় জ্ঞানের অসি দ্বারা হৃদয়ের সংশয়কে ছেদন কর। জ্ঞানের প্রকাশ হলেই আমরা বুঝতে পারব প্রকৃত কর্তব্য কী, তখন স্বধর্ম পালন করতে কোনও দ্বিধা থাকবে না। ভগবান তাই অর্জুনকে বলছেন, অতএব তুমি জ্ঞানলাভপূর্বক নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর, এবং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। এই তেজঃপূর্ণ বাণী উপনিষদও আদেশ করছে—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। স্বামী বিবেকানন্দ সোজা ভাষায় বলছেন—'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থেমো না।'

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **জ্ঞানযোগ** নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় জ্ঞান-কর্মের সমন্বয়। শ্রীভগবানের অবতারতত্ত্বও এ অধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। এছাড়া চতুর্বর্ণের উৎপত্তি, কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের বিশ্লেষণ, জ্ঞান এবং জ্ঞানলাভের উপায়, বৈদিক যাগযজ্ঞের মূল তাৎপর্য ও তার বিভিন্ন সাধনপ্রণালী, অধিকারিবিচার, কর্মভেদ ইত্যাদি নানাবিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সুস্পষ্ট উপদেশ—নিষ্কাম কর্ম করে আত্মজ্ঞানে পৌঁছানো যায়। 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। কর্ম, যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান এগুলি পরস্পরের পরিপূরক। অন্তে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ শ্রীভগবানের জ্ঞানরূপ পরমপ্রাপ্তিতে পৌঁছানো যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁদের পার্ষদদের সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য—লোককল্যাণসাধন। এই নিষ্কাম কর্মপথে মানুষ শ্রেয়োলাভ করতে পারবে—এইটি দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের জীবন।

এই অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোকটি (যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে...) স্বামী বিবেকানন্দ

আমেরিকায় ধর্মমহাসভায় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ব ধর্মের প্রতিনিধিদের সামনে উদ্ধৃত করেন কারণ সমগ্র সনাতন ধর্মের মহান ধর্মসমন্বয় ভাবটি গীতার এই মন্ত্রটিতে প্রকাশ পেয়েছে। ভগবান বলছেন হে অর্জুন! জগতে যারা যেখানে, যেভাবে আমার ভজনা অর্থাৎ শ্রদ্ধা, আরাধনা ও সেবা, যেরূপে অর্থাৎ সকাম, নিষ্কাম, সগুণ বা নির্গুণ, সরূপে বা অরূপে প্রার্থনা করেন, আমি তাদের সকলকে সেভাবেই প্রার্থিত ফলপ্রদান করি।

তবে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের জন্য একনিষ্ঠ সাধন চাই। জ্ঞানের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধনের সুন্দর উপমা দিয়েছেন। আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে চাই এক বহিরঙ্গ সাধন-–অর্থাৎ গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম, আত্ম-অনাত্ম বিষয়ক নানা প্রশ্ন এবং সেবা, তবেই গুরু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করবেন। দুই—অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ সাধন ও আত্মসংযম। ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী, গুরু ও বেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধাবান তিনি। একনিষ্ঠ ব্রহ্মসাধনে তৎপর, তাঁর সমস্ত কর্ম ব্রহ্মরূপ কর্মে অনুষ্ঠিত এবং ব্রহ্ম চিন্তায় একাগ্র। আত্মসংযম অর্থাৎ যিনি সব ইন্দ্রিয় বশীভূত করেছেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই পরম শান্তি লাভ হয়।

ভগবান সাবধান করে বলছেন, অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়গ্রস্ত ব্যক্তির বিনাশ হয়। সংশয়গ্রস্ত লোকের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। যে অজ্ঞ সে আগামী দিনে জ্ঞান লাভ করতে পারবে অথবা যে শ্রদ্ধাহীন তার আগামীকাল শ্রদ্ধা জন্মাতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সমস্ত কথা জেনে শুনেও সংশয়গ্রস্ত তার সংশয় দূর হওয়া কঠিন। সংসারে সংশয়াকুল লোকের পক্ষে জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। সে ইহলোকে সুখ শান্তি পাবে না এবং পরলোকে তো দূরের কথা! অতএব সংশয় ছিন্ন করে, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কর এবং স্বধর্ম পালন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

ভগবান পূর্ব অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রশংসা অর্থাৎ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ করেছেন, আবার নিষ্কাম কর্মযোগের প্রশংসা করে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করতে বলছেন। জ্ঞানীর পক্ষে যেমন কর্মত্যাগের প্রশংসা করেছেন, আবার কর্মযোগীর পক্ষে তেমন নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেছেন। তাই অর্জুনের মনে সংশয়—কর্মত্যাগ করে জ্ঞানযোগের অনুশীলন করা উচিত অথবা নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা উচিত—কোনটি শ্রেয় ও উপযোগী। অতএব, হে ভগবান, কর্মসন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগের মধ্যে যেটি শ্রেয় সেটি আমাকে নিশ্চিত করে বলুন।

কর্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মত্যাগ নয়, কর্মের ফলত্যাগ ও আসক্তি ত্যাগ। ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করলে সন্ন্যাসেরই ফল লাভ হয়। কর্মে আসক্তি-ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা হয়। যিনি কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ ও আসক্তি শূন্য তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। যোগযুক্ত জ্ঞানী অনাসক্তভাবে সমস্ত কর্ম করেন। সেই ব্যক্তির কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়। স্বভাবের বশে আমাদের কোনও না কোনও কর্ম করতেই হবে এবং স্বধর্ম অনুষ্ঠান করাই জীবনের কর্তব্য। অতএব কর্ম যখন বাদ দেওয়া যাবে না, তখন সব কর্মই ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করলে তাতে কর্মও সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হবে এবং ছোট-বড় সকল কর্মই চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ বা ভগবৎপ্রাপ্তির পথে সাহায্য করবে। প্রথমে নিষ্কাম কর্মযোগে সিদ্ধ না হলে কর্মসন্ন্যাস হয় না।

ভগবান পরিষ্কার করে বলছেন—জ্ঞানমার্গের সাধন বা কর্মসন্ন্যাস এবং নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনের লক্ষ্য এক। উভয়েরই ফল এক। এই দুই পথেই সাধক সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে লাভ করে পরম শান্তি লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যাঁদের অন্তরে অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে, তাঁদের হৃদয়ে পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বজীবে সমদর্শী ও সদা মুক্ত হয়ে জগতের কল্যাণ করেন।

ভগবান বলছেন মুক্তি এই জীবনেই অনুভব করতে হবে। সর্বভূতের হিতে রত থাকা ও হিংসাশূন্য হওয়াই বহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্মরূপ নির্বাণলাভ করা। তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পান। নিজ অন্তরেই সমগ্র সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন। অন্তরাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে ব্রহ্মই হয়ে যান। অতএব এই অধ্যায়ের প্রকৃত শিক্ষা—কর্মে আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। যোগযুক্ত পুরুষ অনাসক্তভাবে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম করে পরম শান্তি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ।। ১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বললেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) কর্মণাম্ (কর্মসমূহের, সকল কর্মের) সন্ন্যাসং (সম্যক্ ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কর্মযোগ, কর্মের অনুষ্ঠান) শংসসি (প্রশংসা করছেন, উপদেশ করছেন) এতয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে) যৎ (যেটি) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়, মুক্তিদায়ক) তৎ (সে) একং (একটি) মে (আমাকে) সুনিশ্চিতং (নিশ্চিতরূপে) ব্রূহি (বলুন)।

হে কৃষ্ণ, আপনি পূর্বে কর্মসন্ন্যাসের কথা বলেছেন, এখন আবার কর্মযোগের অনুষ্ঠানের কথাও বলছেন। এ দুয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় তা আমাকে সুনিশ্চিত করে বল।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে অনেকবার জ্ঞানেরও প্রশংসা করেছেন। জ্ঞানের মহিমা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ' (৪ / ৩৮), 'যিনি আত্মরতি, আত্মচিন্তায় যিনি ডুবে আছেন, তাঁর কোনও কর্ম নেই' (৩ / ১৭), 'সমুদয় কর্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়' (৪ / ৩৩) ইত্যাদি। এতে মনে হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি সব কর্ম ত্যাগ করে জ্ঞানের চর্চা করতে বলছেন। কিন্তু আবার চতুর্থ অধ্যায়ের ৪২নং শ্লোকে স্পষ্টই কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন —'জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর।' অর্জুন বিভ্রান্ত। একইসঙ্গে কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ কীভাবে সম্ভব? দুটি পথ তো পরস্পর বিপরীত। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, কর্মত্যাগ করে জ্ঞানযোগের পথ অথবা কর্মযোগের পথ— এর মধ্যে কোনটি শ্রেয় তা আমাকে সুনিশ্চিত করে বলুন।

বস্তুত জ্ঞান না কর্ম, কর্মসন্ন্যাস না নিষ্কাম কর্মযোগ—এই বিরোধ চিরকালের। জ্ঞান-কর্ম সমন্বয়ের মূল আপত্তিটা কোথায়? উত্তর হল, আত্মজ্ঞান লাভ হলে সকল কামনা-বাসনার বীজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর বাসনাই যদি না থাকে তবে কর্মের

প্রয়োজন কী ? কর্ম তো মায়ার কাজ। নির্গুণ মায়ামুক্ত ব্রহ্মে কর্মের স্থান কোথায়? গতি ও স্থিতি কি একসঙ্গে থাকতে পারে? আলো ও অন্ধকারের কি সহাবস্থান সম্ভব ? এর উত্তরে পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কর্মের আদর্শ দেখিয়েছেন। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্মের আহ্বান করেছেন। লোকহিতার্থে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম করা উচিত কি না এ নিয়ে এত আলোচনা কেন ? যতদিন শরীর থাকবে ততদিন সবাইকেই কোনও না কোনও কাজ করতে হবে। এ তো স্বতঃসিদ্ধ। এর উপর গীতাকার এত কথা বলেছেন কেন? এর উত্তরে বলা যায়, গীতা উপদেশের আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে অত্যধিক দর্শনের চর্চা হয়েছিল। মন যে সসীম সে-বিষয়ে সব দার্শনিকরাই একমত ছিলেন। নাম-রূপ, দেশ-কাল ও কার্য-কারণের গণ্ডীর বাইরে মনের যাওয়ার শক্তি নেই। সসীম মন কখনও অসীম ব্রহ্মকে ধরতে পারবে না। অতএব সব কাজ ত্যাগ (অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাস) করে, চুপচাপ মনকে স্থির করে বসে থাক।—এই হল সত্যলাভের একমাত্র উপায়। এ-কথাই প্রচার করা হল। এর ফলে কী হল ? যাঁরা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়, বিষয়ে যাঁদের তীব্র বৈরাগ্য, তাঁরা সব কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাস মানে সম্যক্ ন্যাস, ন্যাস্ অর্থ ত্যাগ। বিবেক-বৈরাগ্য, শম-দমাদি সহায় করে, গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্য শ্রবণ তাঁরা মনন-ধ্যান রূপ জ্ঞানমার্গকে অবলম্বন করলেন। যথাকালে আত্মজ্ঞানও লাভ করলেন। আচার্য শঙ্কর সন্ন্যাসীর সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো,
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ।।

—অর্থাৎ যিনি সবসময় বেদান্তবাক্য শ্রবণ-মনন করেন, কৌপীনমাত্র অবলম্বন করে ভিক্ষান্নেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং যিনি শোক-দুঃখকে জয় করেছেন— তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এরূপ সন্ন্যাসীরা তীব্র বৈরাগ্যের অধিকারী। তাঁরা ব্রহ্মচর্য জীবন হতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। বাকি সকলকেই চারটে ক্রম পালন করতে হয়—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সবশেষে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ।

কিন্তু জ্ঞানমার্গের প্রকৃত অধিকারী সংখ্যায় অতি অল্প।—জড়বাদী, বৈরাগ্যহীন সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র বাইরের কাজ ছাড়ল, কেউ বা নামমাত্র সন্ন্যাসী হল—এদের কথা ভেবেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হরিদ্বারে সাধু দেখে এলাম, স্বাধ্যায় নেই, সাধনভজন নেই, ঘটি মাজছে তো মাজছেই।'

সাধারণের এই বিপরীত বুদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্যই কর্ম করা উচিত কি না এ-বিষয়ে

এত তর্কের প্রয়োজন হয়েছিল। সন্ন্যাস অত্যন্ত কঠিন আদর্শ। মুষ্টিমেয় লোকই এ পথে যেতে পারে। তার মানে এই নয়, ধর্ম মুষ্টিমেয়ের জন্য । ধর্ম সকলের জন্য । সংসারে থেকেও ধর্মজীবন যাপন করা যায়, অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ গার্হস্থ্য কর্মযোগ সম্বন্ধে বলছেন—'কেল্লার ভেতর থেকে যুদ্ধ করা।' সেইজন্যই প্রকৃত কর্ম কী, নিষ্কাম কর্মযোগই বা কী এবং যথার্থ কর্মরহিত অবস্থা কাকে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এগুলি বোঝাবার এত চেষ্টা করেছেন। আধুনিক কালেও স্বামী বিবেকানন্দ এই নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শেই সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের (রামকৃষ্ণ মঠ) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ।। ২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন) সন্ন্যাসঃ (কর্মত্যাগ) চ (এবং) কর্মযোগঃ (কর্মযোগ, কর্মের অনুষ্ঠান) উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তিদায়ক) তু (কিন্তু) তয়োঃ (তাদের মধ্যে) কর্মসন্ন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্মযোগঃ (নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান) বিশিষ্যতে (উৎকৃষ্টতর)।

শ্রীভগবান বললেন, সন্ন্যাস (অর্থাৎ কর্মত্যাগ) ও কর্মযোগ উভয়ই মোক্ষলাভের উপায়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানই) শ্রেয়।

কর্মসন্ন্যাস না কর্মযোগ — অর্জুনের এই সংশয়ের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 'নিঃশ্রেয়সকরৌ উভৌ'— দুটি পথই নিঃশ্রেয়স্ এনে দিতে পারে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ । বলা হয়, ধর্মের দুটো উদ্দেশ্য । অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স্। 'অভ্যুদয়' অর্থাৎ জাগতিক উন্নতি —আমার নাম-যশ হবে, বিষয় -সম্পত্তি বাড়বে, সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা হবে। আর নিঃশ্রেয়স্ হল আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ ধাপ। 'নিঃ' মানে 'না'। 'শ্রেয়স্' মানে 'আরও বড়'। 'নিঃশ্রেয়স্' অর্থাৎ 'যার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।' অর্থাৎ মোক্ষ, আত্মজ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই ।

জ্ঞানপথের সাধকরা কিন্তু কর্মযোগকে মোক্ষলাভের উপায় বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে একমাত্র কর্মত্যাগই (অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাসই) মোক্ষ এনে দিতে পারে। সন্ন্যাস ছাড়া জ্ঞান হয় না, মুক্তি হয় না—এই তাঁদের প্রচলিত মত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, কর্মসন্ন্যাসের চেয়ে নিষ্কাম কর্মযোগই শ্রেয়। সব কর্ম ত্যাগ করে শুধু সাধন-ভজন, স্বাধ্যায় নিয়ে থাকতে পারেন কজন? পূর্বজন্মের সংস্কার-বশে যাঁদের মনে তীব্র বৈরাগ্য, বিষয় -বাসনার লেশমাত্র যাঁদের নেই, শুদ্ধ আধার, তাঁরাই কেবল কর্মত্যাগের অধিকারী। কর্মসন্ন্যাসই হোক বা কর্মযোগই হোক, মূল কথা হল স্বার্থত্যাগ, অনাসক্তি।

তা না হলে আমি কাজ ছেড়ে চুপচাপ বসে আছি অথচ মনে বিষয়াসক্তি রয়েছে, সে তো আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হলে তবেই কর্মত্যাগের অধিকার জন্মায়।

কর্ম বন্ধনের কারণ নয়। ফলে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগই ত্যাগ। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগই ত্যাগ। এ দুই-ই যিনি ত্যাগ করতে পেরেছেন তিনি-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যে শুধু কর্মত্যাগ করে বসে আছে, সে নয়। 'আমি'কে মুছে ফেলতে হবে সম্পূর্ণভাবে। সেই জায়গায় 'তুমি', ঈশ্বর। আমার জন্য আমি কিছু চাই না—সব তোমার উদ্দেশে, ঈশ্বরের উদ্দেশে।

এই যুগে স্বামী বিবেকানন্দ গীতার এই নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শই সন্ন্যাসীদের জন্য বেশি করে প্রচার করলেন। নিষ্কামভাবে অপরের কল্যাণ করতে পারলে নিজেরই কল্যাণ। নিষ্কাম কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান লাভ। স্বামীজী বলছেন, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'--জীব 'জীব' নয়, শিব। নরনারায়ণ । শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন এই কথা । স্বামীজী সেই কথা জগতে প্রচার করলেন। বললেন : এই হচ্ছে যুগধর্ম। নতুন কথা নয়। একথা আমাদের দেশে ছিল— 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'ব্রহ্মময়ং জগৎ', 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ নতুন করে সেই কথা জগৎকে শোনালেন। 'সন্ন্যাস' মানে কর্মবিমুখতা নয়, জগৎবিমুখতা নয়—জগৎকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে গ্রহণ। ঈশ্বরই (বা ব্রহ্মই) জীব ও জগৎরূপে সম্মুখে প্রকাশিত। চারপাশে যাঁদের দেখছ তাঁরা ঈশ্বরেরই নানা মূর্তি। সেই বহুরূপী বহুনামধারী ঈশ্বরের জন্য কাজ কর। অবিরাম কাজ কর। কিন্তু নিজের জন্য নয়। ঈশ্বরের জন্য।

স্বামীজী এই নিষ্কাম কর্মের আদর্শেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। বললেন: সন্ন্যাসীদের আদর্শ, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ। নিষ্কামভাবে জগতের কল্যাণ করলে নিজের মুক্তি হয়। বললেন : 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যাঁরা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যান – 'বৃথা এব তস্য জীবনং'। 'পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্র-বিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ – বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।' রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসীগণ এই সেবাব্রতেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কীভাবে সর্বোচ্চ সত্যকে সমাজে বাস্তব রূপ দেওয়া যায়, সব কিছু করেও সেই আদর্শকে ধরে রাখা যায়, রামকৃষ্ণ মিশন সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রথম প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা যখন উত্তরাখণ্ডে রোগীদের সেবা করতেন, অন্য সাধুরা তাঁদের নিন্দা করতেন। তাঁদের নাম হয়ে গিয়েছিল 'ভাঙ্গী সাধু'। ভাঙ্গী অর্থাৎ

মেথর। তাঁরা দেখেছেন, এই সাধুরা রোগীদের মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করেন। মেথরের কাজ তো সেটা। সাধু হয়েও মেথরের কাজ করছেন। তাই 'ভাঙ্গী সাধু'। একবার বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী শান্তানন্দকে বলেছিলেন, 'আপনারা সাধু হয়েও এসব মায়ার রাজ্যের কাজ করছেন কেন? সাধু শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করবেন। মহাবাক্যের ধ্যান করবেন।' উত্তরে শান্তানন্দজী বলেছিলেন, 'আমরা তো মহাবাক্যেরই ধ্যান করি। আপনারা ''অহং ব্রহ্মাস্মি''র (আমিই ব্রহ্ম) ধ্যান করেন। আর মানুষের সেবা করতে গিয়ে আমরা করি ''তত্ত্বমসি''র (তুমিই সেই অর্থাৎ ''তুমিই ব্রহ্ম'') ধ্যান। মানুষের মধ্যে আমরা সেই ব্রহ্মকেই দেখার চেষ্টা করি।'

এই হল নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। ঈশ্বরলাভ করার আগে পর্যন্ত 'যা করছি সব তাঁরই কাজ'—এই বোধটা জোর করে এনে কাজ করে যেতে হবে। একটুও বিশ্রাম চলবে না। ফাঁকি চলবে না। এইভাবে ক্রমশ আমার স্বার্থবুদ্ধি চলে যাবে। আমি সম্পূর্ণ পবিত্র হব। যখন আমার সব মলিনতা এইভাবে মুছে যাবে, তখনই আমার সিদ্ধিলাভ হবে। ঈশ্বরলাভ হবে। ঈশ্বরলাভের পরে কি আমি কাজ করা ছেড়ে দেব? না। তখনও আমি কাজ করে যাব। ঈশ্বরলাভের আগে পর্যন্ত আমায় বারবার নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হত—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—জীবই ব্রহ্ম। যত মূর্তি চারপাশে দেখছি সব তাঁরই মূর্তি। সিদ্ধিলাভের পরে আমি সত্যিই সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করব, আমার ইষ্টদেবতাকে সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করব। আমার প্রিয়তম ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার টানে আমি তখনও তাঁর উদ্দেশে অবিরাম কাজ করে যাব। এইরকম নিষ্কামভাবে যে কাজ করে যেতে পারে সে-ই যথার্থ সন্ন্যাসী।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ।। ৩

মহাবাহো (হে মহাবীর) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী (কর্ম করেও সদা সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ (জানবে) হি (যেহেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত) বন্ধাৎ (সংসার-বন্ধন থেকে) সুখং (সুখে, অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করেন)।

হে মহাবাহো, যিনি কাউকে দ্বেষ করেন না, কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁকে নিত্যসন্ন্যাসী বলে জেনো। কারণ রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বমুক্ত ব্যক্তি সংসার-বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন।

সত্যিকারের সন্ন্যাসী কে? যাঁর কোনও কিছুর প্রতি বিশেষ অনুরাগ নেই। আবার কোনও কিছুর প্রতি বিরাগও নেই। অনুরাগ আর বিরাগ—একটা থাকলে আর একটা থাকবেই। তিনি সুখের আশা করেন না। দুঃখেও বিচলিত হন না। গেরুয়া পরুন বা নাই পরুন, সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা নাই করুন, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। নতুন করে তাঁকে সন্ন্যাস

নিতে হয় না। জন্ম-সন্ন্যাসী তিনি। হয়তো সংসারে আছেন। কিন্তু সংসারের ধুলোকাদা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তাঁর মধ্যে সংসার নেই। তিনি কাজ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশে। সংসারে থেকেও তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সংসার ছেড়ে সব কাজ ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হয় না।

আবার তিনি সমদর্শী। সকলের প্রতি তাঁর ভালবাসা। এই নয় যে কারোর প্রতি বেশি ভালবাসা, কারোর প্রতি কম। সমান ভালবাসা। আমাদের তো বিপরীত। একজনকে ভাল লাগে। কেন ভাললাগে জানি না। আবার আর একজনকে মোটেই সহ্য করতে পারি না। কেন পারি না তাও জানি না। যিনি নিত্যসন্ন্যাসী তিনি সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। তাঁর প্রিয়তমকে দেখেন। সবাই তাঁর আপনজন। এই হচ্ছে আমাদের শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা। সকলের প্রতি সমান ভালবাসা। এই যে সমদর্শিতা – এ মুক্তির লক্ষণ।

তিনি 'নির্দ্বন্দ্বঃ', তাঁর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। এ আমার বন্ধু, এ আমার শত্রু, এই বোধ নেই। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, শীত-উষ্ণ—এই দুই ভাব নেই। তিনি কখনও খুব ভাল, কখনও খামখেয়ালী তা নন। সদা প্রসন্ন। এত খুশি, এত প্রসন্নতা, এত ভালোলাগা কীসের জন্য? কৈবল্য – কেবল 'আমি'ই আছি। আর কেউ নেই। স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারোর উপর আমি নির্ভর করি না। তাই এত আনন্দ। আমি আমাতেই আনন্দে ভরপুর। এ আনন্দ আমার স্বভাবসিদ্ধ। নিত্য।

তাঁর কী গতি হয়? 'সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে'—অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন। আমাদের তো জীবনের আদর্শ মুক্তিলাভ করা। আত্মজ্ঞান লাভ করা। জীবনটা তো একটা বন্ধন! কতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে আমাদের? সবাই যেন আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছে। বন্ধন মানে আসক্তি। একটা জিনিসের প্রতি, কোনও বিশেষ জায়গার প্রতি বা বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি আসক্তি। কতরকমের বন্ধন! যিনি নিত্যসন্ন্যাসী তাঁর সমস্ত বন্ধন খুলে যায়। তাঁকে চেষ্টা করতে হয় না। কষ্ট করতে হয় না। অনায়াসে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

অতএব হে অর্জুন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ হলেও যা সকলের উপযোগী সেই নিষ্কাম কর্মযোগই তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কারণ অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হলে সন্ন্যাস পথে কোনও ফল লাভ হয় না, পরন্তু হানি হয়ে থাকে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ।। ৪

বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিরা) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগকে) পৃথক্ (ভিন্ন, পরস্পর বিরুদ্ধ) প্রবদন্তি (বলেন) পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ, জ্ঞানীগণ) ন (বলেন না) একম্ অপি (এই উভয়ের একটিও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করলে) উভয়োঃ

(উভয়ের) ফলম্ (ফল) বিন্দতে (লাভ হয়)।

অজ্ঞ ব্যক্তিরা সন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগকে পৃথকফলপ্রদ বলে থাকেন, কিন্তু জ্ঞানীরা তা বলেন না। কারণ এ দুয়ের মধ্যে একটি পথ যথাযথ অনুষ্ঠান করলে উভয়ের ফল অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।

সাংখ্য মানে কর্মসন্ন্যাস আর যোগ বলতে কর্মযোগ। দুটো পথ। কর্মসন্ন্যাস – আমি সন্ন্যাসী। কোনও কাজ করি না। জ্ঞানবিচার করি। মহাবাক্যের ধ্যান করি। এ পথ জ্ঞানের পথ। বিচারের পথ । সৎ-অসৎ বিচার । নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচার। এ পথেও মোক্ষলাভ হতে পারে, যদি বিবেক-বৈরাগ্য থাকে, আত্মসংযম থাকে। এককথায় চিত্তশুদ্ধি হতে হবে। কোনও মলিনতা নেই। মলিনতা মানে অহংবুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি। 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা' এই অহংকার। আমরা তো সব 'আমি' 'আমি' করি। এই আমিত্ব মুছে গেলেই চিত্তশুদ্ধি। তা নাহলে সারাদিন বসে আছি, কোনোও কাজ করছি না অথচ আমি সন্ন্যাসী। এ সন্ন্যাসে কোনও লাভ নেই। ওতে মন বহির্মুখী হয়। ঈশ্বরচিন্তা হয় না।

'কর্মযোগ'—এর অর্থ কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ। কীরকম কর্ম? নিঃস্বার্থ কর্ম। নিষ্কাম কর্ম। এটাই গীতার মূল বক্তব্য। শুধু অর্জুনকে নয়। সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নিষ্কাম কর্ম কর, নিঃস্বার্থ কর্ম কর। লোককল্যাণ কর।

গীতা শাস্ত্রটা কর্মযোগের শাস্ত্র। স্বামীজীও এই কর্মযোগের উপরই বেশি জোর দিতেন। বলতেন, 'তোরা পরের জন্য খাটতে খাটতে মরে যা', 'মানুষের পুজো কর', 'একমাত্র তাঁকেই আমি দেবতা বলে জানি যাঁকে মূর্খরা মানুষ বলে।' তার বহু আগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন : যত্র জীব তত্র শিব। বৈদ্যনাথধামে ট্রেন থেকে নেমে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের মধ্যে তিনি বসে পড়লেন। বললেন, 'আগে এদের খাওয়াও, পোশাক দাও, একমাথা তেল দাও । তারপরে আমি তীর্থে যাব।' এই হল নরনারায়ণসেবা। নারায়ণ আবার কোথায়? আকাশে? মন্দিরে ঐ শিলার মধ্যে? হ্যাঁ ওখানেও আছেন। কিন্তু মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। আমরা মন্দিরে পূজা করি। কত স্তব-স্তুতি করি। ফুল দিই। কিন্তু কোনও সাড়া পাই না। আর ক্ষুধার্ত মানুষ, পীড়িত মানুষ—তাকে তুমি খাবার দিচ্ছ, সেবা করছ। তার মুখে হাসি ফুটে উঠবে। তুমি যার পূজা করছ, তার মুখে তৃপ্তির ছাপ দেখতে পাবে। মানুষ নয়, ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিক্ষুকের বেশে এসেছেন। আমাকে ঠকাচ্ছেন। কিন্তু আমি জানি, তুমি স্বয়ং নারায়ণ। আমি তোমার সেবা করছি। তোমার পূজা করছি।—এই বুদ্ধিতে মানুষের সেবা করতে হবে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।'

তারপর বলছেন, 'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি'—অজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি মানুষ মনে করে কর্মসন্ন্যাস আর কর্মযোগ পৃথক। কিন্তু যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁরা একথা বলেন না। দুটি পথ আলাদা নয়। সন্ন্যাসের পথ বা যোগের পথ—যে পথেই যাও, তুমি একই ফল লাভ করবে। অর্থাৎ মুক্তিলাভ করবে। যোগের পথে, নিষ্কাম কর্ম করতে

করতে চিত্তশুদ্ধি হবে। আর সন্ন্যাসের পথে চাই বিবেক-বৈরাগ্য, আত্মসংযম, সেই সঙ্গে গুরুবাক্য ও বেদান্ত বাক্য শ্রবণ-মনন-ধ্যান। এর ফলও চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির পরেই আত্মজ্ঞানলাভ। অতএব নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কর্মযোগ বা সন্ন্যাসযোগ যে কোনও উপায়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করলে উভয়ের ফল মোক্ষলাভ সম্ভব।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ৫

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীদের দ্বারা) যৎ (যে) স্থানং (মোক্ষনামক স্থান, পদ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়) যোগৈঃ অপি (কর্মযোগীদের দ্বারা) তৎ (সেই স্থানই) গম্যতে (প্রাপ্ত হয়) যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ (জ্ঞানযোগকে ও) যোগং চ (ও নিষ্কাম কর্মযোগকে) একং (একই ফলপ্রদ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনিই) পশ্যতি (যথার্থরূপে দেখেন)।

জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসীরা যে মোক্ষপদ লাভ করেন, নিষ্কাম কর্মযোগীগণও সেই মোক্ষপদই প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও কর্মযোগ উভয়ের ফল একই—একথা যিনি জানেন তিনিই যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী।

ভগবান বলছেন, তুমি সাংখ্যের দ্বারা যে লক্ষ্যে পৌঁছবে, নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারাও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছবে। অর্থাৎ যে-পথেই যাও আগে চিত্তশুদ্ধি, পরে আত্মজ্ঞান লাভ। আমাদের মনটা এখন মলিন হয়ে রয়েছে। 'আমি, আমার' বোধ—এইজন্য মলিনতা। চিত্তের এই মলিনতা দূর হলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানলাভ বা ঈশ্বরলাভ—এ বাইরে থেকে অর্জন করতে হয় না। আমার মধ্যেই রয়েছে। স্বয়ংপ্রকাশ। উপরে একটা মলিনতার আবরণ রয়েছে। আবরণ দূর হলে আমার স্বরূপকে আমি জানতে পারব। ঈশ্বরলাভ করব।

প্রশ্ন হল, সাংখ্যে চিত্তশুদ্ধি কী করে হয়? সাধন চতুষ্টয় অর্থাৎ চার রকমের সাধনার দ্বারা। প্রথম হচ্ছে 'নিত্য-অনিত্য-বস্তু-বিবেকঃ' নিত্যকে অনিত্য থেকে আলাদা করে নিতে হবে। বালি আর চিনি মেশানো আছে। পিঁপড়ে তার মধ্যে থেকে শুধু চিনিটা নিয়ে বালিটা ছেড়ে দেয়। তেমনি সংসারে নিত্য-অনিত্য মেশানো আছে। 'নেতি নেতি' অর্থাৎ এটা নয়, এটা নয়, বিচার করে অনিত্যকে ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছেঃ 'ইহামূত্রফলভোগবিরাগঃ'—ইহলোকে বা পরলোকে আমার কোনওরকম ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই । অর্থ, স্বাস্থ্য, সন্তান, নাম-যশ কিছু চাই না। আবার মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তিও চাই না। এই হল তীব্র বৈরাগ্য। শুধু জ্ঞান চাই । স্বরূপজ্ঞান। এ ছাড়া আর কোনও বাসনা নেই। তৃতীয় হচ্ছে : 'ষট্‌সম্পদ'। শম্, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং সমাধান। এককথায় সংযম অভ্যাস। 'শম' অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। মনটাকে বহির্মুখী হতে দেব না আমি। 'দম্'— বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের দিকে

ছুটতে দেব না। 'উপরতি' মানে বাসনা-ত্যাগ। 'তিতিক্ষা' অর্থাৎ সহিষ্ণুতা। আমরা সাধারণত গরমে কষ্ট পাই, আবার শীতেও কাতর হয়ে পড়ি। যার 'তিতিক্ষা' আছে, শরীরের কষ্টে সে কখনও কাবু হয় না। 'শ্রদ্ধা' অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। গুরুবাক্যে বিশ্বাস, গুরু যে বেদান্তের কথা বলেছেন তাতে বিশ্বাস, নিজের উপর বিশ্বাস। স্বামীজী খুব জোর দিয়েছেন এই শ্রদ্ধার উপরে। বলছেন : সবচেয়ে দরকার নিজের উপর বিশ্বাস। 'সমাধান' হল সবসময়, সব অবস্থায় বুদ্ধিকে ব্রহ্মচিন্তায় লাগিয়ে রাখা। এই ষট্সম্পদ চাই। এইভাবে অভ্যাস করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। মুক্তির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা জাগে—'মুমুক্ষুত্ব'। কীরকম ব্যাকুলতা? মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। তখন যেভাবে আমি জলের দিকে ছুটে যাব, তেমনি ব্যাকুলতা নিয়ে আমাকে গুরুর কাছে ছুটে যেতে হবে। গুরু আমাকে আত্মতত্ত্ব শোনাবেন। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই আত্মা। অর্থাৎ প্রথমে 'শ্রবণ'। তারপর 'মনন'। অর্থাৎ গুরু যা বলে দিলেন তা বারবার চিন্তা করব। ধারণা করার চেষ্টা করব। ধারণাটা পাকা হলে 'নিদিধ্যাসন'—'আমি ব্রহ্ম' এই ধ্যান করতে হবে। ধ্যান খুব গভীর হলে মন-বুদ্ধি লয় হয়ে সমাধি হয়। অহংবুদ্ধি মুছে যায়। যেন নুনের পুতুল সমুদ্রের জলে মিশে গেছে। সমাধিতে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব উপলব্ধি হবে। আত্মজ্ঞান লাভ হবে।

কর্মযোগ আগে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশে কিন্তু কর্ম নয়, জ্ঞান। কিন্তু কর্মকে বাদ দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই কর্মের বাইরে যেতে হবে কী? কীভাবে? নিঃস্বার্থ কর্ম করার সময় ঠিক ঠিক নিজের পরীক্ষা হয়। নিজের অসম্পূর্ণতা নিজের কাছে ধরা পড়ে। বিষয়ের প্রতি কতটা টান আছে, স্বার্থপরতা কতটা আছে, সহ্য করার ক্ষমতা কীরকম – এসকল জানার উপায় কর্ম। আর নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই এর প্রতিকার সহজ। পরার্থে কাজ করলে মনের আঁকবাঁক ভেঙে যায়। চিত্তশুদ্ধি হয়। প্রতিটি কাজের মধ্যে নিজেকে বোঝাতে হবে—আমি কিছু করছি না। আমার যে প্রকৃত আমি, সেই 'আমি' নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা, সাক্ষী। অথবা ভাবতে হবে, যা কাজ করছি সব ঈশ্বরের। কাজ তাঁর। ফলও তাঁর। আমার কিছুই নয়। এইভাবে কাজ করলে কর্ম আমাদের বন্ধনের কারণ হবে না, মুক্তির কারণ হবে। পরের কল্যাণে দেহ-মন উৎসর্গ করলে মানুষ 'আমি'টাকে ভুলে যায়। তখন জ্ঞান আপনা-আপনি ফুটে ওঠে। একই আত্মা সর্বজীবে বিরাজমান, এ তত্ত্ব বোধে বোধ হয়।

তাই ভগবান বলছেন, 'যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি'। যিনি বুদ্ধিমান, বিচারশীল, তত্ত্বদর্শী তিনি জানেন সাংখ্য আর যোগ দুটি পথ। কিন্তু লক্ষ্য এক। তা হল চিত্তশুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান লাভ।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ।। ৬

তু (কিন্তু) মহাবাহো (হে মহাবীর) অযোগতঃ (নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ (কর্মসন্ন্যাস) দুঃখম্ (দুঃখ) আপ্তুম্ (প্রাপ্তির জন্যই হয়) যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) মুনিঃ (মননশীল, সন্ন্যাসী) (হয়ে) ন চিরেণ (অচিরে) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

হে মহাবীর, কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ কেবল দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মযোগী সন্ন্যাসী হয়ে অবিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন।

প্রশ্ন হল, সাংখ্য আর কর্মযোগ, এ দুয়েরই যখন একই লক্ষ্য, তখন সরাসরি সন্ন্যাস নিয়ে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। কর্মের তো কত ঝকমারি! এর উত্তরে ভগবান বলছেন, 'সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুম্ অযোগতঃ'—কর্মযোগ ছাড়া সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ হয়। যে নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করেনি, যার চিত্তশুদ্ধি হয়নি, সে হঠাৎ সন্ন্যাস নিয়ে বসল— হয়তো কাউকে দেখে উৎসাহিত হয়ে। হয়তো সংসারে বিরক্ত হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্রুপ করে বলছেন, 'মর্কট বৈরাগ্য'। একজন চাকরি পাচ্ছে না। গেরুয়া নিয়ে চলে গেল বেনারস। সেখানে একটা চাকরি পেল। তখন বাড়িতে লিখছে 'ভয় পেয়ো না, ভাল আছি। একটা চাকরি পেয়েছি, শীঘ্রই বাড়ি ফিরব।' অর্থাৎ কর্মযোগ ছাড়া সন্ন্যাস একটা ভানমাত্র। প্রথম থেকেই সন্ন্যাসের অধিকারী কে হতে পারে? যাঁর তীব্র বৈরাগ্য, তীব্র পুরুষকার। দিনরাত যদি কেউ ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ নিয়ে থাকতে পারে, সে তো ভাল কথা। কিন্তু তা পারে কজন? শেষে কুঁড়েমিতে পেয়ে বসে। মনে হাজার বাসনার তরঙ্গ উঠছে। কুচিন্তার হাট-বাজার বসেছে। এই মন নিয়ে ঈশ্বরচিন্তা হয় না। মনের সঙ্গে সংগ্রামই করতে হয় বেশি। এই সংগ্রাম সকলে সমানভাবে করতে পারে না। সকলের মনের শক্তি সমান নয়। কাজেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়। যন্ত্র বিগড়ে যায়।

শাস্ত্রে সন্ন্যাসীর নিয়ম কঠিন। 'স্কন্দপুরাণ'-এ কাশীখণ্ডে বলছে—'ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা। যতেশ্চত্বারি কর্মাণি নোপপদ্যতে।' আত্মধ্যান, শরীর ও মনের শুদ্ধিসাধন, ভিক্ষান্নভোজন এবং নির্জনবাস—এই চারটি কর্ম ছাড়া পঞ্চম অতিরিক্ত কোনও কর্ম নাই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছেন, পাঁচ মিনিট ধ্যান করার চেয়ে একঘণ্টা কোদাল চালানো সহজ। অর্থাৎ এক ঘণ্টা কোদাল চালালে যে পরিশ্রম হয়, পাঁচ মিনিট ধ্যান করার চেষ্টায় তার চেয়ে পরিশ্রম অনেক বেশি হয়। কারণ সেখানে লড়াইটা সূক্ষ্ম বাসনার সঙ্গে। লড়াইটা তো আর ধ্যান নয়। মনটাকে ধ্যানের উপযুক্ত করার চেষ্টা মাত্র।

কাজে কাজেই নিষ্কাম কর্ম করতেই হয়। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। মনের বিক্ষেপগুলি শান্ত হয়ে আসে। মনটাকে একবার গড়ে নিতে পারলে আর ভয় নেই। তখন তাকে ধ্যান-ভজনে লাগানো যায়। সংযত মনে বেদান্তের তত্ত্ব ধারণা করা

সহজ হয়। তাই বলছে কর্মযোগে সন্ন্যাসের বহিরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধন হল মহাবাক্যে ধ্যান—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। একইসঙ্গে কর্ম ও সাধন-ভজন দুই-ই করতে হবে। কর্ম না করে শুধু সাধনভজন করা সহজ নয়। তেমনি সাধন -ভজন ছাড়া কর্ম করলেও সহজেই অহঙ্কার অভিমান এসে জোটে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, বারোআনা মন ঈশ্বরে রেখে বাকি চার আনা মন দিয়ে কাজ করলেই হেউ-ঢেউ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাতেই প্রচুর কাজ হয়ে যায়।

একদিন বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সাধু-ব্রহ্মচারীদের বলছেন, তোরা কে কীরকম আলু কেটেছিস নিয়ে আয় তো। আমি আলুর খোসা ছাড়ানো দেখে বলে দেব কার ভাল ধ্যান হয়। ঝুড়িগুলো আনা হল। একটা ঝুড়ির আলু দেখে তিনি বললেন, এগুলো যে কেটেছে তার ঠিক ঠিক ধ্যান হয়। দেখা গেল, তিনি স্বামী শুদ্ধানন্দ। বাস্তবিকই, তিনি ছিলেন ধ্যাননিষ্ঠ। আসলে সবটাই নির্ভর করছে মনের একাগ্রতার উপর। অনেকে থাকে একটা কিছু হয়তো লিখছে। কতবার কাটছে, আর কতবার নতুন করে লিখছে। আর একজন হয়তো লিখে গেল সমানভাবে। কোথাও কাটাকুটি নেই। শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কথা শুনেছি। তিনি মায়াবতীতে ছিলেন। হিসেব রাখতেন। যত বড় হিসেবই হোক, একবারে যোগ করে বসিয়ে দিতেন। বলতেন, এবার তোমরা দেখ। তাঁর কখনও ভুল হত না। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর স্বামীজী একদিন বলছেন, 'দেখ, আজকালকার ছেলেরা যারা সব আসবে, তারা তো দিনরাত ধ্যান-ভজন নিয়ে থাকতে পারবে না, তাই এই সব সেবাকার্য প্রভৃতি খোলা।'

তাই বলছেন, 'যোগঃমুক্তঃ মুনি'—যোগযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগী। কর্মযোগের সহায়ে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে সেই মুনি অর্থাৎ আত্মমননশীল ব্যক্তি, 'অচিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি'—দ্রুত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। অনায়াসে তিনি মুক্ত হয়ে যান।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ।। ৭

যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (যিনি নিজেকে স্ববশে আনতে পেরেছেন) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (যিনি সর্বভূতের আত্মাকে নিজ আত্মারূপে দেখেন) (তিনি) কুর্বন্ অপি (কর্ম করেও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না, বদ্ধ হন না)।

যিনি নিষ্কাম কর্মযোগী, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি সর্বভূতের আত্মার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন দেখেন, তিনি কর্ম করেও কর্মে লিপ্ত হন না।

'যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা'—নিষ্কাম কর্মযোগের সাহায্যে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা যাঁর চিত্ত কলুষিত নয়। নির্মলচিত্ত। 'বিজিতাত্মা'—অর্থ যিনি নিজের

দেহকে বশে এনেছেন। এখানে আত্মা মানে দেহ। যেহেতু আমরা তো দেহ-মনের দাস তাই নিজেকে দেহ-মনের সমষ্টি বলে ভাবি। দেহের কষ্টকে নিজের কষ্ট, আর দেহের সুখকে নিজের সুখ বলে মনে করি। একইভাবে আমরা মনের খেয়ালখুশিরও অধীন। যতদিন দেহ-মন এইভাবে আমার উপর কর্তৃত্ব করে, ততদিন আমি বদ্ধ। আর দেহ-মন যখন আমার আয়ত্তে তখন আমি মুক্ত। 'জিতেন্দ্রিয়ঃ'—অর্থ যিনি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছেন, নিজের বশে এনেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলি তো সবসময় বহির্মুখী। বাইরের বিষয়ের দিকে ছুটছে। এই ইন্দ্রিয়কে যিনি সংযত করতে পেরেছেন তিনি জিতেন্দ্রিয়।

কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে ঈশ্বরার্থে বা পরার্থে কাজ করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে অর্থাৎ বাসনার নিবৃত্তি হলে দেহ-ইন্দ্রিয়ও আমাদের বশে আসে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন এগুলি হল উপাধি। আত্মার উপর আরোপিত হয়ে আত্মার স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের পাশে লাল জবাফুল রাখলে স্ফটিকটি লাল দেখায়। এও ঠিক তেমনি। দেহ-মনের উপাধি আরোপিত হয়ে একই আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন দেখাচ্ছে। স্বরূপত আত্মা সর্বব্যাপী, অখণ্ড, অভিন্ন সত্তা। দেহ-মন সম্পূর্ণ বশীভূত হলে উপাধিগুলি মুছে যায়। শুদ্ধ মনে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম বোধে বোধ হয়। ঠাকুর বলছেনঃ 'শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা এক'। শাস্ত্রে আছে (কঠ, ২/১/১৫), শুদ্ধ জলবিন্দু যেমন শুদ্ধ জলরাশিতে পড়ে একাকার হয়ে যায় তেমনি শুদ্ধ মন ব্রহ্মের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যায়। 'সর্বভূতাত্মভূতাত্মা'—সর্বভূতে তিনি তখন নিজেকেই দেখেন। 'কৈবল্য' অবস্থা—এক আমি সর্বভূতে রয়েছি। দুই-বোধ নেই। সমদর্শী। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি, সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছেন। ঘাসের উপর দিয়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হচ্ছে তাঁর বুকের উপর দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। মাঝনদীতে নৌকার মাঝিদের মধ্যে একজন আর একজনের পিঠে চড় মেরেছে। ঠাকুর চিৎকার করে উঠেছেন যন্ত্রণায়। পিঠে লাল দাগ পড়ে গেছে। যেন তাঁর পিঠেই কেউ মেরেছে।

এরকম যে মানুষ তিনি যদি লোকহিতার্থে কাজ করেন, সেই কাজের জন্য তাঁর কোনও বন্ধন হয় না। কেউ কাজ করছে, কী করছে না তা বোঝা যায় তার কর্তৃত্বাভিমান আছে কি না তা থেকে। কর্তৃত্ব-অভিমান অর্থ 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা'—এই বোধ। নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করে যাঁর অহংবুদ্ধি মুছে গেছে তিনি জানেন তিনি কিছু করছেন না। অতএব, কাজের ফল ভাল বা মন্দ যাই হোক, তা তাঁকে বদ্ধ করতে পারে না।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ।। ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ।। ৯

[কারণ] যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত, কর্মযোগী) তত্ত্ববিদ্ (তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন করে) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করে) স্পৃশন্ (স্পর্শ করে) জিঘ্রন্ (আঘ্রাণ করে) অশ্নন্ (আহার করে) গচ্ছন্ (গমন করে) স্বপন্ (নিদ্রা গিয়ে) শ্বসন্ (শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে) প্রলপন্ (কথা বলে) বিসৃজন (মলমূত্রাদি ত্যাগ করে) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ করে) উন্মিষন্ (চক্ষু উন্মীলন করে) নিমিষন্ অপি (এবং নিমীলন করে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলি) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ইতি (এই) ধারয়ন্ (ধারণা করে) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি ([আমি] করি না) ইতি মন্যেত (এরূপ মনে করেন)।

নিষ্কাম কর্মযোগে যুক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, কথা বলা, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ প্রভৃতি কাজ করেও মনে করেন ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে, আমি কিছুই করছি না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম করেও 'আমি কর্তা, ভোক্তা' —এই বোধ নেই বলে তাঁর কর্ম-বন্ধন হয় না।

আগের শ্লোকটিকে বিস্তার করে এই দুটি শ্লোকে বলা হয়েছে। 'তত্ত্ববিৎ' - যিনি কর্মযোগ অভ্যাস করে কর্মের রহস্য জেনেছেন। 'প্রকৃতিই কর্ম করে, আত্মা অকর্তা'— কর্মের এই তত্ত্ব তিনি বোধে বোধ করেছেন। কর্ম তাঁর আর বন্ধনের কারণ হয় না, মুক্তির কারণ হয়। কর্মযোগের এই তত্ত্বই গীতার মূল তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের বাণী। এই অবস্থায় পৌঁছলে মানুষের কী অনুভূতি হয় এখানে সেকথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, ঘ্রাণ নিই, আহার করি —এগুলি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ। আবার চলাফেরা করি, হাত দিয়ে গ্রহণ করি, কথা বলি ইত্যাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কাজ। শ্বাস, উন্মেষ, নিমেষ—এসব প্রাণাদি বায়ুর কাজ। এবং স্বপ্ন দেখাটা মনের কাজ। এই ক্রিয়াগুলির দ্বারা দেহ-মনের সবরকম কর্মকেই বোঝানো হয়েছে। আর যারা এই কাজগুলি করছে সেই ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ হল প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার পরিণাম। প্রকৃতিই এদের কর্ম করায়। কিন্তু আত্মা প্রকৃতি থেকে ভিন্ন—নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা, সাক্ষী। প্রকৃতির কর্ম আত্মাকে লিপ্ত করতে পারে না। অথচ আত্মা আছে বলেই প্রকৃতির কাজ চলছে। এই তত্ত্ব জেনে কর্মযোগী সব কাজ করেও জানেন, তিনি কিছুই করছেন না। তাঁর কর্তৃত্বাভিমান মুছে গেছে। তিনি জানেন ইন্দ্রিয়রাই ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তিনি অকর্তা। তিনি হয়তো অনেক কিছু করছেন। আমরা দেখছি তিনি কাজে ডুবে আছেন। কিন্তু আসলে তিনি কিছু করছেন না।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ব্যাসদেবের কাহিনী। গোপীরা যমুনা পার হতে পারছেন না। যমুনায় খুব জল। কী করবেন ভাবছেন। এমন সময় ব্যাসদেব এলেন সেখানে। গোপীরা তাঁকে বললেন : একটা উপায় করে দিন, আমরা যমুনা পার হতে পারছি না। ব্যাসদেব তাঁদের বললেন, সে হবে এখন। আগে আমাকে কিছু খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। গোপীরা ব্যাসদেবকে দুধ, ক্ষীর, ননী ইত্যাদি যা তাঁদের কাছে ছিল দিলেন। ব্যাসদেব সব খেলেন। খেয়ে মুখ মুছে যমুনাকে বললেন, 'আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে যমুনা তুমি দুভাগ হয়ে যাও। আর যমুনা সঙ্গে সঙ্গে দুভাগ হয়ে গেল। গোপীরা তো অবাক। আমাদের সামনেই খেলেন, অথচ বলছেন, কিছু খাইনি। আর যমুনাও তাঁর কথা শুনল। এর কারণ হচ্ছে : ব্যাসদেব ঠিক ঠিক জানেন তিনি আত্মা। আত্মা কিছু করেন না। তাঁর দেহ খেয়েছে কিন্তু তিনি কিছুই খাননি।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।। ১০

যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে, পরমেশ্বরে) আধায় (কর্ম অর্পণ করে) সঙ্গং (কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) কর্মাণি (কর্মসকল) করোতি (করেন) সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলের দ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপ ও পুণ্য দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।

জল যেমন পদ্মপত্রকে ভেজাতে পারে না, তেমনি যিনি সব কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেন এবং কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন তাঁকে পাপ (বা পুণ্য) স্পর্শ করতে পারে না।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যিনি তত্ত্ববিৎ, কর্মযোগের তত্ত্ব যিনি জানেন তাঁকে কোনও কর্মফল স্পর্শ করতে পারে না। তাহলে যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি অথচ কর্মযোগ অভ্যাস করছেন, তিনি কি কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বেন? উত্তরে বলছেন, 'ব্রহ্মণি আধায়'— ব্রহ্মে সব কর্ম অর্পণ করে অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করেন। ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে, কর্মফলের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে যিনি কাজ করেন তাঁকে কোনও পাপ স্পর্শ করতে পারে না, পদ্মপাতা জলে থাকলেও জল যেমন কখনও পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা ঠিক সেইভাবে সংসারে কর্ম করব। অনাসক্ত হয়ে কাজ করলে, কাজটা যাই হোক না কেন, সেটা তখন আর বন্ধনের কারণ হয় না। তখন সেটা কর্মযোগ হয়ে যায়, ঈশ্বরলাভের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। জপ-ধ্যান, পূজা-উপাসনার থেকে সেই কাজ একটুও কম নয়—যদি ঠিক ঠিক অনাসক্ত হয়ে কাজ করা যায়।

ভগবান বলছেন—'সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ'—সঙ্গ মানে আসক্তি, অর্থাৎ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, অনাসক্ত হয়ে কাজ করেন। আমিত্ব নেই সেখানে। 'আমি কর্তা'—এই বোধ নেই। প্রভুর কাজ প্রভু করিয়ে নিচ্ছেন। তিনি যেমন বলাচ্ছেন তেমন

বলছি, যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এইটা বারবার অভ্যাস করতে হয়। মনে মনে সবসময় বলতে হয়, 'আমি দাস, তুমি প্রভু', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান।'—এই হল ভক্তিপথে কর্মযোগ – সাধন।

আর জ্ঞানপথে গেলে ভাবতে হয়— আমি নিষ্ক্রিয়, উদাসীন আত্মা। আমি কিছু করি না। অজ্ঞান ব্যক্তি মনে করে, 'আমিই কর্তা'। অজ্ঞানীর কর্ম 'অহং' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর জ্ঞানী অহং-অভিমান ত্যাগ করে কর্ম ও কর্মফল দুই-ই ব্রহ্মে অর্পণ করেন। তাঁর কর্ম ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। খেয়াল রাখতে হবে, ভক্তিপথই হোক বা জ্ঞানপথই হোক, 'আমি অকর্তা'— এই বোধ দুটোতেই আসছে।

অবশ্য অনাসক্ত হয়ে কর্মযোগ অভ্যাস করা খুব সহজ নয়। আমাদের অহংবুদ্ধি সহজে যেতে চায় না। ভাবছি হয়তো নিজের জন্য ফল কামনা করছি না। কিন্তু কোথা থেকে বাসনা এসে যায়। সব গোলমাল হয়ে যায় তখন। লোকের ভাল করার জন্য কাজ শুরু করলাম, মন্দই করে ফেলি অনেক সময়।একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করলাম, নিঃস্বার্থভাবেই শুরু করলাম। শেষে দেখা যায় উদ্দেশ্যটা ভুলে গেছি। নিজের স্বার্থই দেখছি শুধু। অন্যের ভাল-মন্দ আমাকে উদ্বিগ্ন করছে না। সেইজন্য বলে কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। কোনদিকে নিয়ে চলেছে জানতে দেয় না। একেবারে অনাসক্ত হওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ 'অশ্বত্থ গাছের ফেঁকড়ি।' অশ্বত্থ গাছের ডাল কেটে দেওয়া হল। কিছুদিন পর দেখা যাবে, আবার সেখান থেকে একটা ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। অহংকারও ঠিক তাই । খুব বিচার করে 'আমি'কে সরিয়ে দিয়েছি। মনে মনে ভাবছি, অহংকার নেই। আবার একটু পরেই দেখা যাবে, কোথা থেকে অহংকার এসে জুটেছে।

তাহলে কী করব? কোনও কাজ করব না?—তা নয়। কাজ না করে আমি থাকতে পারব না। যথাসাধ্য লোকের সেবা করার চেষ্টা করব। কিন্তু বিচারবুদ্ধি সবসময় জাগ্রত রাখব। সবসময় চিন্তা করব, এই কাজটা ঈশ্বরের উদ্দেশে করছি তো? অনাসক্ত হয়ে করতে পারছি তো? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—সব ফল যেন তাঁতে অর্পণ করতে পারি। এই ভাবে নিরন্তর অভ্যাসের ফলে মানুষ যথার্থ নিষ্কাম হয়। অহংবুদ্ধি মুছে যায়। চিত্তশুদ্ধি হয়।

তখন কী হয়? কাজ করেও কাজের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কাজের তো একটা ফল আছে । সে ফল ভালই হোক বা মন্দই হোক তা তাঁকে ভোগ করতে হয় না। 'পদ্মপত্রমিব অম্ভসা'—জল যেমন পদ্মপাতাকে ভেজাতে পারে না, তেমনি কাজের ফল তাঁকে লিপ্ত করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ।' তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে কাঁঠালের আঠা আর হাতে লাগে না। তেল মানে বিচার শক্তি। অর্থাৎ 'আমি কিছু করছি না'—এই বোধ। সবসময় যাঁর এই বোধ জাগ্রত রয়েছে, সংসারের ধুলোকাদা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ।। ১১

যোগিনঃ (নিষ্কাম কর্মযোগীগণ) সঙ্গং (কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) কেবলৈঃ (কেবল অর্থাৎ মমত্ব-বুদ্ধিশূন্য হয়ে) কায়েন (শরীর দ্বারা) মনসা (মন দ্বারা) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) কর্ম (কর্ম) কুর্বন্তি (করেন)।

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে মমত্বভাবশূন্য হয়ে শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। তিনি নিজে কিছু করেন না, ইন্দ্রিয়গুলি তাঁর হয়ে কাজ করে।

শ্লোকের পর শ্লোক সেই একই প্রসঙ্গ চলছে—কর্মযোগ। অর্জুনের দৃষ্টি মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তিনি বলছেন, তিনি যুদ্ধ করবেন না। কাজ করবেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ একই কথা নানাভাবে বলে বোঝাচ্ছেন। তবুও অর্জুন বুঝতে পারছেন না। অর্জুন এখানে সমগ্র মানবজাতির প্রতীক।

অজ্ঞানতাই মায়া। অজ্ঞানতা অর্থাৎ 'আমি-আমার' বোধ। এই অজ্ঞানতার দ্বারাই আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে আছি। মনে করছি সব কাজ আমিই করছি। এই 'আমি'কে কেন্দ্র করেই সংসার। আমি ভাল খাব, ভাল থাকব, ভাল পরব—এই সংসার। সংসার আর কোথায়? সংসার আমার মনে । শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' এই 'আমি-আমার' বোধ থেকেই বাসনা। বাসনা থেকেই বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা। আর তা থেকেই বন্ধন।

এখানে 'কেবল' শব্দটির অর্থ মমত্ববুদ্ধিশূন্য। অর্থাৎ 'আমার' বোধ নেই । আমি ঈশ্বরের জন্য কর্ম করছি। এর ফলও ঈশ্বরের । এই বুদ্ধির দ্বারা যে ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয় তাকেই 'কেবল' ইন্দ্রিয় বলা যায়। দেহটাই তো আমাদের বন্ধন। যিনি কর্মযোগ অভ্যাস করছেন, তিনি দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে, দেহ-মন-বুদ্ধির সাহায্যে নিষ্কাম কর্ম করেন। অর্থাৎ তাঁর দেহটা আছে। দেহ-মন অবিরাম কাজও করে চলেছে। অলস নন তিনি। কিন্তু সেই দেহে আর 'আমি' বুদ্ধি নেই। তিনি যে কাজ করেন তার ফল চিত্তশুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়। এইভাবে কাজ করলে কোনওপ্রকার বন্ধনের কারণ হয় না।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, যে-কোনও ভাল কাজ করতে গেলেই নিজেকে ভুলতে হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে মেতে আছেন। আমরা বলি আত্মহারা হয়ে গেছেন। কথাটা খুব ভেবে বলি না। আত্মহারা হয়ে গেছেন অর্থাৎ নিজেকে ভুলে গেছেন। নিজেকে ভুলে যান বলেই তিনি কত কিছু আবিষ্কার করেন। মানুষ নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না। যতই সে নিজেকে ভুলতে পারে, নিজেকে অন্যের মধ্যে বিস্তারিত করে দিতে

পারে, আত্মহারা হতে পারে, ততই সে শক্তি পায়। যতক্ষণ 'আমি', ততক্ষণ দুঃখ। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। যখন সে এই 'আমি'কে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে পারে, তখনই তার সব দুঃখের শেষ হয়। কর্ম হোক, ভক্তি হোক, জ্ঞান হোক সব পথের লক্ষ্য এই 'আমি'কে মুছে ফেলা। তাই জীবনের প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি কাজে এটা অভ্যাস করতে হয়। আমি কিছু না। ঈশ্বরই সব। 'আমি'র জায়গায় 'তুমি' অর্থাৎ 'ঈশ্বর'।

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ।। ১২

যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) নৈষ্ঠিকীম্ (আত্যন্তিক) শান্তিম্ (মোক্ষরূপ শান্তি) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) অযুক্তঃ (সকাম ব্যক্তি) কামকারেণ (কামনাবশত) ফলে (কর্মফলে) সক্তঃ (আসক্ত হয়ে) নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন)।

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে সর্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরাশান্তি লাভ করেন। কিন্তু সকাম ব্যক্তি কর্মফলে আসক্তিবশত সংসারে আবদ্ধ হন।

একই কর্ম কীভাবে বন্ধন ও মুক্তির কারণ হয়, সেকথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। কাজ আমাদের বদ্ধ করে না। ফলের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আমার বাসনার হাতেই আমি বন্দী। যে কাজ নিজের জন্য কোরে মানুষ বদ্ধ হয়, সেই কাজই ঈশ্বরার্থে বা পরার্থে করে মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, এমন একদিন আসবে যেদিন লোকে পরার্থে এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে লক্ষ জপের বেশী মনে করবে।

'যুক্তঃ' অর্থ কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, ঈশ্বরলাভ করা। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগী হওয়া। কর্মফলে অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে বা লোককল্যাণের জন্য কাজ করছেন তিনি। কাজ নয়, পূজা। সেবা। সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য। স্বামীজী বলছেন, 'দরিদ্রদেব ভব, মূর্খদেব ভব, আচার্যদেব ভব।' বলছেন, তুমি তোমার পিতা, মাতা বা গুরুকে যে -চোখে দেখ, সেই চোখেই দরিদ্র, মূর্খ, আর্তকেও দেখ। দেখে তাদের সেবা করে ধন্য হয়ে যাও । যিনি যোগযুক্ত তিনি এইভাবে কাজ করেন। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন। এইরকম যে নিষ্কাম যোগী তিনি কী লাভ করেন? 'শান্তিম্ আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্' – নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ঈশ্বরনিষ্ঠার ফলস্বরূপ যে আত্যন্তিকী শান্তি বা মোক্ষ তা তিনি লাভ করেন।

আর 'অযুক্তঃ' কে? যিনি সকাম কর্ম করেন। ভগবানের উদ্দেশে না করে নিজের বাসনা পূরণের জন্য কাজ করেন। তিনি হয়তো ভাল কাজই করছেন। দরিদ্রকে অর্থদান করছেন, স্কুল করছেন, হাসপাতাল করছেন। কিন্তু নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে মনে।

এই ফলের আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে বদ্ধ করে। তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন না। পরা শান্তি লাভ করতে পারেন না।

প্রশ্ন হল, মুক্তিলাভই যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে শাস্ত্র এত সকাম কর্মের কথা বলে কেন? কর্মকাণ্ডে তো ঝুড়ি ঝুড়ি সকাম কর্মের কথা আছে। বাসনা পূরণের জন্য যাগযজ্ঞ, এটা সেটা, আরও কত কী! মিছিমিছি এত সময় নষ্ট করা কেন? কীকরে চিত্তশুদ্ধি হবে, আত্মজ্ঞান লাভ হবে, তা তো সরাসরি বলে দিলেই হয়। গুরু বলবেন, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' —'শ্বেতকেতু, তুমিই সেই'। অর্থাৎ তুমিই ব্রহ্ম। এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে এত কর্মের কথা কেন ? উত্তর হল, যদি তোমরা যাগযজ্ঞ না কর, কর্ম না কর, তাহলে গুরুবাক্যের মর্ম বুঝবে না। আগে যাগযজ্ঞ করে স্বর্গলাভ কর, ধনসম্পদ লাভ কর, এক লোক থেকে আর এক লোকে যাতায়াত কর। শেষে বিরক্তি আসবে। বলবেঃ 'আমি এসব ভোগসুখ, মান-যশ কিছু চাই না। এসব মিথ্যা, অনিত্য।' তখন তোমার বৈরাগ্য জাগবে। বিবেক-বৈরাগ্য জাগলে তবেই তুমি জ্ঞানলাভের অধিকারী হবে। তা নাহলে আমি পান্তাভাতই খেতে পাইনি জীবনে, আর তুমি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছ আমি যেন লুচি-পোলাও না খাই। এ সব বাণী, বড় বড় কথা । চোখে ধুলো দেওয়া। না, এতে কোনও কাজ হয় না। মনে ভোগবাসনাই বন্ধনের কারণ। মানুষ কামনা ও ভোগবাসনার বশবর্তী হয়ে বারংবার বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং সংসারে যাতায়াত করে। অথচ নিষ্কাম-কর্মযোগীর বন্ধনের আশঙ্কা নেই।

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ।। ১৩

বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা (মনের দ্বারা, বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা) সর্বকর্মাণি (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ সকল কর্ম) সংন্যস্য (ত্যাগ করে) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বার যুক্ত দেহে) ন কুর্বন্ (নিজে কিছু না করে কর্তৃত্বাভিমান না করে) ন কারয়ন্ এব (অন্যকে কিছু না করিয়ে) সুখং (প্রসন্নচিত্তে) আস্তে (অবস্থান করেন)।

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (কর্মযোগী) মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নয়টি দ্বারযুক্ত এই দেহপুরে সুখে বাস করেন। কর্তৃত্বাভিমান নেই বলে তিনি নিজে কিছু করেন না, অন্যকে দিয়েও কিছু করান না।

'বশী' অর্থ যিনি নিজেকে বশ করেছেন। অর্থাৎ যিনি নিজের মনকে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পেরেছেন। শুদ্ধচিত্ত। জিতেন্দ্রিয়। বুদ্ধদেব বলতেন, যে নিজেকে জয় করেছে সে-ই সত্যিকারের বীর। অন্যকে জয় করা খুব সোজা। কিন্তু যে নিজের লোভ, হিংসা, ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি বশে আনতে পেরেছে সে-ই প্রকৃত বীর। তাঁকেই এখানে 'বশী' বলা হয়েছে।

তিনি কী করেন ? 'সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য'—সমস্ত কর্ম ও কর্মফল মনে মনে ত্যাগ করেন। সন্ন্যাস মানে ত্যাগ। মনের ত্যাগই ত্যাগ। আমি নিঃস্ব, জামা নেই, জুতো নেই, অথচ মনে ভোগবাসনা আছে, তাকে ত্যাগ বলা যায় না। তাহলে তো রাস্তার ভিখারি, ভাঙা টিনটার উপরও যার তীব্র আকর্ষণ, সে-ই সবচেয়ে বড় ত্যাগী, সবচেয়ে বড় সন্ন্যাসী। তাই বলছেন, মনের ত্যাগ। অর্থাৎ কাজ করেও তাঁর 'আমি কর্তা'— এই বোধ নেহ। ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই। নিষ্কাম। তিনি নয়টি দ্বারবিশিষ্ট এই দেহে সুখে অর্থাৎ নির্লিপ্তভাবে বাস করেন। দেহ, ইন্দ্রিয় যে-যার কাজ করছে। আমি এর সঙ্গে জড়িত নই। দেহের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলছি না আমি। এই হল নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

এই শরীরটা যেন একটা বাসগৃহ। এর নয়টি দরজা জানলা। দুটো চোখ, দুটো কান, দুটো নাসারন্ধ্র, মুখ, উপস্থ ও পায়ু। এই দেহে যিনি বাস করেন তিনি দেহী। অর্থাৎ আত্মা। আমিই সেই আত্মা । আমি যেন একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। নিজের ঘর নয়। এর সাথে আমার স্থায়ী কোনও সম্পর্ক নেই। এ ঘরটা আমি নই। আমি এখানে বাস করছি। সাময়িকভাবে বাস করছি। আমাদের তো দেহের প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ। দেহটাকেই সব মনে করছি। দেহের কোথাও একটু লাগলে মনে করি আমার লেগেছে। প্রকৃতপক্ষে আমি আর দেহ এক নই। নিজেকে দেহ ভাবতে নেই। দেহের সুখ-দুঃখ ক্ষণিক, অনিত্য। আমি যে জামাটা পড়েছি সেটা কি আমি? না, তা তো নয়। দেহটাও ঠিক এই জামার মতো। সত্যিই তো। এ দেহ কতদিনের জন্য? একদিন না একদিন খসে পড়বে। তাই গীতায় বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি দেহ থেকে ভিন্ন। তোমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এই দেহ তোমার নয়। এ ঘরবাড়ি তোমার নয়। তুমি এখানে বেড়াতে এসেছ। এর সঙ্গে তোমার কোনও বন্ধন নেই । তুমি স্বতন্ত্র, দেহী, আত্মা। এই অনুভূতি যাঁর হয়েছে তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ চিরস্থায়ী।

দেহী অকর্তা। তিনি নিজে কিছু করেন না। অন্যকেও কাজের প্রেরণা দেন না—'নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্।' কিন্তু তিনি আছেন বলেই সব কিছু ঘটছে। আকাশে যেমন সূর্য। সূর্যের আলোয় আমি ভাল কাজ করতে পারি। সেই ভাল কাজের যে পুরস্কার তা কি সূর্য দাবি করবে? অথবা মন্দ কাজও করতে পারি। তার যে শাস্তি তাও কি সূর্যের উপর চাপাব? না, সূর্য কিছু করছে না। সে সাক্ষী। নির্লিপ্ত, দ্রষ্টা। কিন্তু সূর্যের আলো ছাড়া আমি ভাল কাজও করতে পারি না, মন্দ কাজও করতে পারি না।

তাই যোগী দেহ হতে আত্মা স্বতন্ত্র—এই জ্ঞান করে প্রবাসীর ন্যায় দেহে বাস করেন। দেহের বিকার বা পতনে তিনি বিষণ্ণ হন না। কিন্তু বিষয়ী 'দেহই আমি'—এই অজ্ঞান-দোষে থাকায় আত্মার স্বরূপ অনুভব করতে পারে না। ভোগবাসনায় ডুবে থাকে কিন্তু জীবনমুক্তির শান্তি লাভ করতে পারে না।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ।। ১৪

প্রভুঃ (ঈশ্বর, আত্মা) লোকস্য (লোকের, জীবের) কর্তৃত্বং (কর্তৃত্ব) ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না) কর্মাণি ন (কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না) ন কর্মফল-সংযোগং (কর্মফলে সম্বন্ধও সৃষ্টি করেন না) তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অবিদ্যারূপা প্রকৃতি বা মায়া) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়)।

ঈশ্বর অর্থাৎ আত্মা জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল-সম্বন্ধ কিছুই সৃষ্টি করেন না। কিন্তু অবিদ্যারূপ মায়াশক্তিই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়।

হিন্দুমতে, ব্রহ্ম বা আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, সাক্ষী, দ্রষ্টা। তাহলে এই জীবজগৎ কীকরে হল? বলছেন, মায়ার প্রভাবে। মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। জল আর জলের হিমশক্তি। ব্রহ্মই সবকিছুর উৎস। এই জগৎটা ব্রহ্মের মধ্যেই ছিল। বীজাকারে ছিল। যেমন বটগাছের বীজ। সেই বীজ থেকে পরে প্রকাণ্ড মহীরুহ।

হিন্দুমতে, সৃষ্টি নেই। প্রকাশ। তাঁর মায়াশক্তিতে এ জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে। অব্যক্ত ব্যক্ত হয়েছে। যেমন মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা তার শরীরের ভেতর থেকে জাল বার করছে। আবার তার মধ্যেই গুটিয়ে নিচ্ছে। বিলোম আর অনুলোম। বিলোম--যখন ব্রহ্ম মায়াশক্তি যুক্ত হয়ে নিজেকে জগৎরূপে ব্যক্ত করছেন। আর অনুলোম—যখন জগৎকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছেন। মায়াশক্তি অব্যক্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছে।

মহানির্বাণতন্ত্রে (১৪/ ১১৩) আছে 'মায়য়া কল্পিতং জগৎ'—এই দৃশ্যমান জগৎ মায়ার দ্বারা কল্পিত। মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ। এই তিন গুণের ক্রিয়ায় সমস্ত জগৎ-সংসার চলছে। জগতের কর্মপ্রবাহ বয়ে চলেছে। স্বামীজী উদাহরণ দিচ্ছেন : সিনেমার পরদার উপর ছবি পড়ছে। কত কী ঘটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সবকিছুর পেছনে একটা অপরিবর্তনীয় বস্তু আছে—পরদা। পরদা অর্থাৎ 'অধিষ্ঠান' আছে বলেই ছবি দেখতে পাচ্ছি। তেমনি এই জগৎ-সংসারে কত কী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছুর পেছনে একটা অপরিবর্তনীয় বস্তু আছে। তাঁকেই আমরা ব্রহ্ম বলছি, ঈশ্বর বলছি। তিনিই অধিষ্ঠান। তিনিই 'নিত্য'। তিনি আছেন বলেই সব আছে। নিত্য আছে বলেই লীলা আছে। কিন্তু তিনি নিজে কিছু করছেন না।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব-অভিমান তিনি সৃষ্টি করেন না। প্রকৃতি বা মায়ার জন্যই জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। ঈশ্বর (ব্রহ্ম) অকর্তা। জীবকে তিনি কর্মের প্রেরণা দেন না। প্রকৃতিই জীবকে কর্ম করায়। তিনি চোরকে বলেন না, চুরি করে নিয়ে এস। আবার একথাও বলেন না, ওই লোকটি খেতে পাচ্ছে না, ওকে খাবার দিয়ে এস। অথচ তিনি আছেন বলেই সবকিছু হচ্ছে। আবার কর্ম করলে তার একটা ফল

হবেই । আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই । এই আগুনে হাত দেওয়া আর হাত পুড়ে যাওয়া—কর্ম আর কর্মফল, কোন কিছুর জন্যই ঈশ্বর দায়ী নন। চুরি করা বা আগুনে হাত দেওয়ার ইচ্ছাটা প্রকৃতি বা মায়ার ব্যাপার। 'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—প্রকৃতিই স্বভাবরূপে প্রবর্তিত হয়ে আমাকে কাজ করতে বাধ্য করায়। পূর্বজন্মের কর্মফল সংস্কার হয়ে আমাকে কর্মের প্রেরণা দেয়। আবার এই কর্মই নতুন নতুন কর্মের সংস্কার গড়ে তোলে। এই সংস্কারই আমার স্বভাব। অনাদিকাল থেকে এই যে কর্মপ্রবাহ চলছে, এ প্রকৃতিরই লীলা। প্রলয়কালেও এই কর্মবীজ সংস্কাররূপে থাকে। সৃষ্টিকালে তা-ই আবার স্বভাবরূপে প্রবর্তিত হয়। নতুন কোনও কর্মের সৃষ্টি হয় না।

ভগবান অর্জুনকে স্পষ্ট করে বলছেন, প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল। অবিদ্যা মায়া বা প্রকৃতিই জীবের পূর্ব-কর্মের সংস্কারের অনুরূপ নতুন কর্মের সৃষ্টি করে। চৈতন্যের সঙ্গে কর্মের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। চৈতন্য অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং কর্মের উৎপাদক নয়, প্রেরকও নয়, জীবের কর্মবন্ধনের কারণও নয়, ফলদাতাও নয় আবার ফলভোক্তাও নয়। অথচ চৈতন্যই প্রকৃতির অধিষ্ঠান, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ইনিই বিদ্যমান এবং আত্মাই সকলের প্রভু।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।। ১৫

বিভুঃ (সর্বব্যাপী আত্মা, পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কারও) পাপং (পাপ) সুকৃতং চ (এবং পুণ্যও) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) অজ্ঞানেন (অজ্ঞান বা অবিদ্যার দ্বারা) জ্ঞানম্(জ্ঞান, বিবেক) আবৃতং (আবৃত, আচ্ছন্ন থাকে) তেন (সেই হেতু) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হয়)।

সর্বব্যাপী আত্মা কারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলে জীব মোহগ্রস্ত হয়।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন বলেই সবকিছু হচ্ছে। তাহলে আমাদের কর্ম ও কর্মফলের জন্য প্রকৃতি বা স্বভাবকে কেন দায়ী করা হচ্ছে? উত্তরে বলছেন, আমরা যে কাজ করি, একটা বাসনা নিয়ে করি। কিছু পাওয়ার আশায় করি। এর কারণ অজ্ঞানতা, অবিদ্যা। 'আমি, আমার' বোধই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা আমাদের জ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছে। কে যেন আমাদের চোখ বন্ধ করে রেখেছে। শাস্ত্র বলেন, কে তোমার চোখ বন্ধ করতে গেছে? তুমি নিজেই নিজের চোখের উপরে হাত দিয়ে বলছ, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না।' কাঁধে গামছা রেখে বলছ 'গামছা খুঁজে পাচ্ছি না।' এই অজ্ঞানতা আমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে —'তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' তাই নিজের স্বরূপ ভুলে ভগবানের উপর দোষ চাপাচ্ছি। আয়নার উপর ধুলো পড়ে আছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে

কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। এই ধুলোটাই অজ্ঞানতা, মায়া। এর প্রভাবে সমস্ত বুদ্ধি ওলটপালট হয়ে গেছে। কে যেন যাদু করে রেখেছে আমাদের । ভাবতে পারা যায় না। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কাজ করে ফেলল যে, সারাজীবন হায় হায় করতে হল। তাই মায়াকে বলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। যা ঘটার নয়, তাই ঘটে গেল। আর যা ঘটবার কথা ছিল, তা ঘটল না।

তাই বলছেন, ঈশ্বর দায়ী নন। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, আলো-অন্ধকার, জন্ম-মৃত্যু—এ জগতের ধর্ম। দুই নিয়ে জগৎ। কিন্তু ঈশ্বর (ব্রহ্ম) নিরপেক্ষ। যেমন প্রদীপের আলো জ্বলছে। সেই আলোতে কেউ ভাগবত পড়ছে, কেউ দলিল জাল করছে। কিন্তু প্রদীপ নির্বিকার। অথচ আলো ছাড়া ভাগবতও পড়া যাবে না, দলিলও জাল করা যাবে না। ঈশ্বরও ঠিক তাই । তিনি ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। কিন্তু তিনি নির্বিকার। তিনি কারও পাপের ফলও ভোগ করেন না, পুণ্যের ফলও দাবি করেন না।

অবিদ্যা বা মায়ার দুটো শক্তি—আবরণী আর বিক্ষেপী। যেমন, আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে। হঠাৎ একটা মেঘ এসে ঢেকে দিল । চাঁদ আর দেখা যাচ্ছে না। মায়াও তেমনি আবরণ করে রাখে। কাকে? আমার স্বরূপজ্ঞানকে। আমার ভিতর যিনি অন্তর্যামী আছেন তাঁকে । যেমন, অন্ধকারে একটা দড়ি পড়ে আছে। অন্ধকারের জন্য দড়ি বলে বুঝতে পারছি না —আবরণী শক্তি। দড়িটাকে সাপ বলে ভুল করছি —বিক্ষেপী শক্তি। তার ফলে আমি চিৎকার করছি —লাঠি আন, আলো আন, সাবধান। এই যে ভয়, উত্তেজনা, চিৎকার —এগুলি হল বিক্ষেপ। এই মায়াই ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছে। সেইজন্য অনিত্য জগৎকে সত্য বলে মনে হচ্ছে। শেষে আলো আসে। অর্থাৎ জ্ঞান আসে । তখন দেখা যায়, সাপ নয় দড়ি। জগৎ বলে কিছু নেই । এক ব্রহ্মই আছে। আয়নার উপর থেকে ময়লাটা সরে গেছে। নিজেকে (অর্থাৎ আমার স্বরূপকে) সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একেবারে ঝলমল করছে। অতএব আত্মারূপ পরমেশ্বরে কর্তৃত্বারোপ করলে অবিদ্যার জালে বা ভ্রমে পতিত হয়, তখন ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের উদয় হয় এবং আমাদের অন্তরেই যে সনাতন আত্মজ্ঞান নিহিত রয়েছে তা জানতে পারি না। তাই ভগবান বলছেন, সর্বব্যাপী সাক্ষী পরমেশ্বরে কর্তৃত্বারোপ করা উচিত নয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ।। ১৬

তু (কিন্তু) আত্মনঃ (আত্মার) জ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) যেষাং (যাঁদের) তৎ (সেই) অজ্ঞানং (অনাদি অজ্ঞান, মোহ) নাশিতম্ (নষ্ট হয়েছে) তেষাং (তাঁদের) তৎ (সেই) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্যের মতো অজ্ঞান -অন্ধকার নাশ করে) পরম্ (আত্মতত্ত্বকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)।

যাঁদের আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তাঁদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যের মতো পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে দেয়।

অজ্ঞানতা অবিদ্যার জন্যই মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। অজ্ঞানতা যায় কি কীকরে? —জ্ঞানের দ্বারা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : 'নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। ... এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন এই নিশ্চয়বুদ্ধির নাম জ্ঞান।' উপনিষদের মূল বক্তব্য হল : এক আত্মাই সর্বভূতে বিরাজ করছেন। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। এছাড়া আর কিছু নেই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছেঃ'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'—এক দেবতাই সকলের মধ্যে রয়েছেন। অথচ আমরা কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে বহু দেখি। এর কারণ মায়া। মায়ার জন্য বুঝতে পারছি না যে, আমরাও সেই আত্মা। আমাদের লক্ষ্য হল জ্ঞানের খড়্গ দিয়ে সেই মায়াজালকে কেটে ফেলা। মায়ার পারে যাওয়া।

হিন্দুরা মুক্তিপিপাসু। কিন্তু জ্ঞান না হলে মুক্তি নেই। শঙ্করাচার্য বলছেনঃ 'কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্। জ্ঞানবিহীনে সর্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।' লোকে গঙ্গাসাগরে যায়। কতরকম ব্রত পালন করে। দানধ্যান করে। এর ফলে সবরকম পুণ্যই হয়তো হয়। কিন্তু জ্ঞান না হলে শত জন্মেও মুক্তি হয় না। মুক্তি কী? অজ্ঞানতার নাশ। এখন আমি 'অজ্ঞান'। অর্থাৎ আমিই যে ব্রহ্ম সেটা ভুলে গেছি। এর ফলে বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে ভাল-মন্দ নানারকম কাজ করে যাচ্ছি। আর সেই কর্মফল ভোগ করার জন্য বারবার আমাকে জন্মাতে হচ্ছে। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বারবার যাতায়াত করে চলেছি। সংসারে থেকেই তো ঠেকে শিখেছি-এর কোনোটাই নিত্য নয়। এই আছে, এই নেই। সুতরাং এই যাতায়াত বন্ধ করতে হবে। এটা সম্ভব হয় একমাত্র জ্ঞান হলে। কারণ একমাত্র জ্ঞানই পারে কর্মবীজ ধ্বংস করতে। আমি আত্মহত্যা করলাম তাতেই কি আমার মুক্তি হয়ে যাবে? না, আবার আমি জন্মাব। কারণ কর্মবীজটা রয়ে গেছে। 'অহং'- বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানতাই হল কর্মবীজ।

এই 'আমি'টাই হল চিত্তের ময়লা। ময়লাটাই জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। আকাশে সকালবেলা সূর্য উঠলে আলো ঝলমল করে ওঠে। রাতের অন্ধকার মুহূর্তেই কোথায় পালিয়ে যায়। ঠিক তেমনি স্বরূপজ্ঞান হলে আমার ভেতরের জ্ঞানসূর্য জ্বলজ্বল করে ওঠে। জ্ঞানের আগুনে অজ্ঞানতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

শ্রুতি বলছেন : জ্ঞান বাইরে নয়, আমারই ভিতরে। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সে। অজ্ঞানতার জন্য তুমি নিজেকে দেহ বলে মনে করছ। কিন্তু আসলে তুমি ব্রহ্ম। অজ্ঞানতার আবরণকে সরিয়ে ফেল। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বের কর —'খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে'।

একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, জ্ঞান দুভাবে প্রকাশিত হয়—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, জীবই ব্রহ্ম —এখানে সর্ববস্তুতে পরমাত্মার আভাস

থাকলেও এটা পরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাধন ও অনুভূতির, ভিতর দিয়েই মহাবাক্য, যথা—'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সেই অপরোক্ষ জ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই জীব ব্রহ্মদর্শন করে থাকে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ।। ১৭

তৎবুদ্ধয়ঃ (যাঁদের বুদ্ধি আত্মাতে নিবিষ্ট) তৎ-আত্মানঃ (ব্রহ্মে যাঁদের আত্মভাব) তৎ-নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মে স্থিত) তৎ-পরায়ণাঃ (তিনিই যাঁদের পরমগতি) জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ (আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে) (সেসব সাধকরা) অপুনঃ-আবৃত্তিং (ন-পুনরাবৃত্তিং) গচ্ছন্তি (অপুনর্জন্ম বা মোক্ষ লাভ করেন)।

যাঁদের বুদ্ধি আত্মাতে নিবিষ্ট, ব্রহ্মে যাঁদের আত্মভাব, যাঁরা ব্রহ্মে স্থিত, ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যাঁদের সমস্ত পাপ-পুণ্য ধুয়ে গেছে—তাঁরা মোক্ষলাভ করেন। তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

আমরা সবাই বলি, 'আমিই আমার ভাগ্যবিধাতা'। কীরকম মানুষ হব আমি? আমি কারোর হুকুমের দাস নই। নিজে একটা ছক বেঁধে নিলাম— এইরকম মানুষ হব। একথা আমার-আপনার সকলের বেলাতেই খাটে। যদি আমার ইচ্ছা থাকে, মনোবল থাকে, দৃঢ়তা থাকে—তাহলে আমিও পারব। এখানে আদর্শ মানুষের লক্ষণ বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। 'তৎ-বুদ্ধয়ঃ'—যাঁর বুদ্ধি পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধি ব্রহ্মে বাঁধা পড়ে আছে। যেমন নৌকা নোঙর করা আছে একজায়গায়। এখন ঝড়ই হোক আর তুফানই হোক নৌকা ঐ জায়গা ছেড়ে এক পাও নড়বে না। তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধি ব্রহ্মের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। কখনোই এদিক-ওদিক যাবে না।

তারপর বলছেন : 'তৎ-আত্মানঃ'—পরব্রহ্মকে যিনি আত্মা বলে মনে করেন। আমার আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে আছে। বেদান্ত বলছেন, 'তুমিই ব্রহ্ম', একথাটা তুমি মনে রেখো। এই চেতনা যেন তোমার মধ্যে সবসময় থাকে। মনে কর, তুমি রাজার ছেলে। তুমি হয়তো রাস্তার একটি ছেলের সাথে খেলছ। কিন্তু এই চেতনা তোমার মনে সবসময় রয়েছে—'আমি রাজার ছেলে। আমি যে-সে নই।' কাউকে বলবার দরকার নেই। কিন্তু তুমি জান, তুমি রাজার ছেলে। ঠিক তেমনি আমি নিশ্চিতরূপে জানি আমি ব্রহ্ম। ব্রহ্মাত্মভাব--আমি ব্রহ্ম থেকে আলাদা নই। এই বোধ আমার মনে সবসময়ের জন্য জেগে আছে। 'তৎ-নিষ্ঠাঃ'—নিষ্ঠা অর্থাৎ লেগে থাকা। ব্রহ্মের সাথে যুক্ত, লিপ্ত। তাঁর মধ্যে আমি ডুবে আছি। আমার মন সবসময় ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে রয়েছে। ব্রহ্মকেই আঁকড়ে আছি আমি। যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের কাপড়ের আঁচল ধরে থাকে। ছাড়বে না। মনে ভাবে ছাড়লেই মা চলে যাবে। মাকে বন্দি করে রেখে দিয়েছে। ঠিক তেমনি ব্রহ্মকে

পেয়ে গেছি। আর ছাড়ছি না। বারবার ফাঁকি দিচ্ছ। আর ফাঁকি দিতে পারবে না। জাপটে ধরে আছি। পালাতে পারবে না। 'তৎ-পরায়ণাঃ'—তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমার পরমগতি। তাঁকে ছাড়া আমি কাউকে চিনি না, জানি না। চিনতেও চাই না। তিনি ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার। আমার মন-প্রাণ সব ব্রহ্মের চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে আছে। এখানে 'তৎ' বলতে পরব্রহ্মকেই বোঝানো হয়েছে।

এমন যে ব্যক্তি তাঁর কী হয়? তাঁকে আর এ সংসারে ফিরে আসতে হয় না,—'গচ্ছন্তি অপুনরাবৃত্তিং'। পুনরাবৃত্তিং মানে পুনরায় ফিরে আসা। আমরা বারবার আসি, বারবার যাই। জন্মালেই মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পরই আবার জন্ম। এ দুয়ের মধ্যে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। কবে এই আনাগোনা শেষ হবে? জ্ঞান হলে। নিজের প্রকৃত পরিচয় জানলে। কী সেই পরিচয়? আমি দেহ নই। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। আমি সব পেয়ে গেছি। আমার আর নতুন করে পাবার কিছু নেই। পূর্ণকাম, আপ্তকাম। আবার কেন ফিরে আসব এই সংসারে? 'জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ'—জ্ঞান মনের সব মলিনতা, কালিমাকে নিঃশেষে ধুয়ে ফেলেছে। কালিমা কী?—বাসনা। অজ্ঞানতার জন্যই বাসনা। আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই। বাসনার কি অন্ত আছে আমাদের? বাসনাকে দূর করতে হবে। মনের দরজায় 'প্রবেশ নিষেধ' লিখে রাখতে হবে। জ্ঞান দিয়ে মনটাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলেছি। চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার বিনষ্ট হয়েছে। তখন আমাকে আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে যাতায়াত করতে হবে না। আমি এখন সব বন্ধন থেকে মুক্ত।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ।। ১৮

পণ্ডিতাঃ এব (পণ্ডিত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা) বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে (বিদ্বান ও বিনয়ী) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে) গবি (গরুতে) হস্তিনি (হাতিতে) শুনি চ (ও কুকুরে) শ্বপাকে চ (ও চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী)।

বিদ্বান ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডাল—এদের সকলের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বা পণ্ডিতরা সমদর্শী হন।

আগের শ্লোকে বলেছেন, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, মৃত্যুর পর তিনি আর এই সংসারে ফিরে আসেন না। সেই পুরুষ কীরকম লোকব্যবহার করেন-সেই সমদর্শীর কথা এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

বিদ্বান ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর এবং চণ্ডাল—এদের সবাইকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সমান চোখে দেখেন। এদের মধ্যে কোনও ভেদ তাঁরা করতে পারেন না।

মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি স্বচ্ছ। মায়া তাঁকে আর মুগ্ধ করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প

বলছেনঃ হরি একজনের নাম। তাঁকে সবাই 'হরে' বলে ডাকে। সে বহুরূপী সেজে একজনকে ভয় দেখাতে গিয়েছে। বহুরূপীর সাজে তাকে দেখে প্রথমটা লোকটি হয়তো একটু ভয় পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ হরিকে চিনতে পেরেছে। চেঁচিয়ে উঠেছে : ও তো আমাদের 'হরে' রে। 'হরে' এখন যতই ভয় দেখাক সে আর ভয় পাবে না। কারণ সে যে হরিকে চিনে ফেলেছে।

তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মায়ার স্বরূপ জেনেছেন। তাই মায়ার সংসার আর তাঁকে বাঁধতে পারে না। সংসারে কোনও কিছুর প্রতি তাঁর কোনও টান নেই। আবার বিরক্তিও নেই। পরম সাম্য অবস্থায় পৌঁছেছেন তিনি। সমস্ত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি—এসবের ভেদ তাঁর চোখে দূর হয়ে গেছে। দ্বন্দ্বাতীত তিনি। 'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪/৪/২৩)

নিজের আত্মাকেই তিনি সবার মধ্যে দেখতে পান। বিশ্বসংসারের সাথে এক হয়ে গেছেন তিনি। তিনি পাপী ও পুণ্যাত্মার মধ্যে কোনও তফাত করতে পারেন না। বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণকে তিনি যে-চোখে দেখেন—গরু, কুকুর, হাতি ও চণ্ডালকেও সেই চোখেই দেখেন। সর্বত্রই তাঁর সমদৃষ্টি।

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সাধুর কথা বলেছেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন একটি সাধু এল। দেখতে পাগলের মতো। নোংরা জামাকাপড়। কুকুরের সাথে বসে খাচ্ছে। পরে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে সে স্তব পাঠ করল। সমস্ত মন্দিরটা যেন গমগম করে উঠল। ঠাকুর দেখতে পেলেন মা প্রসন্ন হয়েছেন। হৃদয়কে ডেকে বললেন ওরে হৃদে, এ যে-সে পাগল নয়। এ জ্ঞানী, মুক্তপুরুষ। শুনেই হৃদয় তাকে দেখতে ছুটল। সাধু তখন মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ও তার পিছু পিছু যাচ্ছে। আর বলছে : কী করে জ্ঞান হবে বলে দিন। লোকটি ফিরেও তাকাচ্ছে না, হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে সে বলল : যখন ঐ গঙ্গার জল আর নর্দমার জল এক বলে বুঝবি, তখনই জ্ঞান হবে। অর্থাৎ যখন সমদর্শন হবে। রামপ্রসাদ বলছেন,'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি?' যার জ্ঞান হয়েছে, সে 'দিব্যঘরে' শুয়ে আছে। দুটি একেবারে বিপরীত বস্তুকে সে সমান চোখে দেখে। সমস্ত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে। এই হচ্ছে জ্ঞানের লক্ষণ। কোন নিয়ম তার জন্য নেই। সমদৃষ্টি আইন করে হয় না। বিবেক, বৈরাগ্য ও তপস্যার বলে মানুষ সর্বভূতে নিজেকে দেখে। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—এ সমস্ত দুই বোধ তার চিরতরে ঘুচে যায়। তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সুপ্ত ব্রহ্মশক্তি জেগে ওঠে। সে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যান। এখানে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেই পণ্ডিত বলা হয়েছে। এসব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা কোনও বাঁধা-ধরা নিয়মের বশ নন। নিয়মই তাঁর বশ। এঁরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। সমাজের আদর্শ। আমরা এঁদেরকেই শ্রদ্ধা করব। ভালবাসব। পুজো করব। সর্বোপরি এঁদের মতো আদর্শ মানুষ হবার চেষ্টা করব। ব্রহ্মকে জেনে

আমরাও ব্রহ্মজ্ঞ হব—এই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। তাই জ্ঞানের বিচার বা নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য মনের অজ্ঞানতা দূর করা এবং সমদর্শী হয়ে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত তিনি সবকিছু ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখেন—সব চৈতন্যময়—ব্রহ্মময়—অদ্বৈতভাব—তিনিই প্রকৃত সমদর্শী।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ।। ১৯

যেষাং (যাঁদের) মনঃ (মন) সাম্যে স্থিতং (সমভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত) ইহ এব (এই জীবনেই) তৈঃ (তাঁদের দ্বারা) সর্গঃ (সংসার বা সৃষ্টি) জিতঃ (বিজিত) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমং (সর্বত্র এক) নির্দোষং (দোষ-গুণ-বর্জিত) তস্মাৎ (সেহেতু) তে (তাঁরা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতাঃ (অবস্থিত)।

যাঁদের মন সমভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা এই জীবনেই সংসার জয় করেন। ব্রহ্ম সর্বত্র এক ও অভিন্ন এবং দোষগুণরহিত। তাই সমদর্শী পুরুষরা ব্রহ্মেই অবস্থিত।

কারা এ জীবনেই এই সংসারকে জয় করেন ? কারা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে যান?—সমদর্শী পুরুষরা। অর্থাৎ যাঁদের মন নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। সংসার অর্থাৎ দ্বৈত-বুদ্ধি। আর এই দুই-বোধ আসে অজ্ঞান থেকে । সংসার জয় করা অর্থাৎ দ্বৈত-বুদ্ধিকে জয় করা।

নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচিন্তা একদিনে হয় না। অভ্যাস করতে হয়। আমাদের মন, ইন্দ্রিয় স্বভাবতই বহির্মুখী। তাই বারবার চেষ্টা করে বাইরের বস্তু থেকে মনকে তুলে আনতে হবে। প্রথম প্রথম এটা করতে কষ্ট হয়। মনে নানারকমের তরঙ্গ ওঠে। কিন্তু চেষ্টা করে যেতে হয়, মনে যাতে একটা তরঙ্গ থাকে । একটাই চিন্তা। ব্রহ্মচিন্তা। পরমাত্মার চিন্তা। কঠিন, তবু চেষ্টা করে যেতে হয়।

বেদান্তসার গ্রন্থে আছে : 'অদ্বিতীয় বস্তু' হচ্ছে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তাঁর চিন্তায় মনটাকে আমি ডুবিয়ে দিতে চাইছি। হয়তো দু মিনিট মনটা স্থির রইল। আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আমি ব্রহ্মচিন্তা করছি। কিন্তু তাতেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে যাচ্ছে। ধ্যান করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচিন্তা হবে। তখন শুধু একটা তরঙ্গ আছে মনে। একটাই বৃত্তি 'ব্রহ্মাকারাবৃত্তি'। ধ্যানের এই গভীর অবস্থা হল সবিকল্প সমাধি। আরও এগোলে এই বৃত্তিও থাকে না। ব্রহ্মে লয় হয়। যেন নুন জলে মেশানো হয়েছে। নুনের আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই । শুধু জলই থাকে। ঠিক তেমনি মনের সব বৃত্তি তখন ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে। কেবল ব্রহ্মই আছেন। এ হল নির্বিকল্প সমাধি। সাধক তখন ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। 'ব্রহ্মবেদো ব্রহ্মৈব ভবতি।'

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই জগৎটাকে বর্জন করেন না। জগৎকে তিনি ব্রহ্মরূপে দেখেন।

জগৎ তাঁর কাছে তখন সত্য। সবকিছুর মধ্যে তিনি এক ব্রহ্মকেই দেখেন। তাঁর কাছে এক বই দুই কিছু নেই। 'ব্রহ্মময়ং জগৎ।' ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ব্রহ্মের কোনও উপাধি বা গুণ নেই। নিরাকার, অপরিবর্তনীয়। দোষগুণরহিত। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য -এসব গুণ ব্রহ্মের নয়। প্রকৃতিজাত। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মকে জেনেছেন। বোধে বোধ করেছেন। তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। সকলের মধ্যে তিনি তখন নিজেকে দেখেন। আবার নিজের মধ্যে সবাইকে দেখেন। কীকরে তিনি অন্যকে ঘৃণা করবেন? নিজেকে কী আমি ঘৃণা করতে পারি? নিজেকে কী কখনও আঘাত করি? কারণ আমিই সর্বভূতে আছি। ঘৃণ্যতম যে পাপী তার মধ্যেও আমি। আবার আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে সেও আমি। কাজেই সবাইকে আমি ভালোবাসি। এটা কোনও পরিকল্পনা করে করা নয়। আসলে ভালো না বেসে আমি তখন পারি না। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই সবাইকে সমান চোখে দেখেন। তাঁর দৃষ্টি সাধারণ মানুষের মতো নাম-রূপের রাজ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নাম -রূপের পারে যে ব্রহ্ম বা আত্মা আছেন তিনি তাঁকেই দেখেন ।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের একটি ঘটনা। মা বলছেন : ঠাকুরকে পুজো দিয়েছি মিষ্টি, সন্দেশ। তার উপরে পিঁপড়ে ধরেছে। আমি মিষ্টি থেকে পিঁপড়েটাকেও ছাড়াতে পারছি না। দেখছি সবই যে ঠাকুর। পটেও ঠাকুর, পিঁপড়েতেও ঠাকুর।—এই হচ্ছে অদ্বৈতবোধ। কোনও মানুষ যখন এই তত্ত্বকে বোধে বোধ করেন একমাত্র তখনই তিনি সমদর্শী হন। তখন তাঁর কাছে মানুষও ব্রহ্ম। আবার পোকামাকড়ও ব্রহ্ম। জীবিত অবস্থাতেই তিনি এই সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যান। প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বৈত, নিত্য, নির্বিকার এবং সর্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।। ২০

ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে স্থিত) স্থির-বুদ্ধিঃ (নিশ্চলবুদ্ধি) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ) প্রিয়ং (প্রিয় বস্তু) প্রাপ্য (লাভ করে) ন প্রহৃষ্যেৎ (উৎফুল্ল হন না) অপ্রিয়ম্ চ প্রাপ্য (অপ্রিয় বস্তুলাভেও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ও একমাত্র ব্রহ্মেই স্থিত। অতএব তিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে খুব উল্লসিত হন না। অপ্রিয় বস্তুলাভেও উদ্বিগ্ন হন না।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে কী অবস্থা হয়, এখানে সেকথাই বলছেন। আগের আগের শ্লোকে বলেছেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সকলকে সমান চোখে দেখেন। কারণ জগতের সবকিছুর মধ্যে তিনি ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করেন। সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন।

সাধক কখন এ অবস্থা লাভ করেন? অজ্ঞানতার নাশ হলে। তখন সংসারের কোনও

কিছুর প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। আবার কোনও কিছুতে তাঁর দ্বেষও নেই। কারণ তাঁর যে দুই-বোধই নেই। দুই থাকলেই রাগ-দ্বেষ, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। তিনি জানেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তখন 'কেবল'। তাঁর সব পাশ মুক্ত হয়ে গেছে। সমস্ত বন্ধন দূর হয়ে গেছে। কোনও কিছুর প্রতি তাঁর কোনও আসক্তি বা মোহ নেই—'অসংমূঢ়ঃ'। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর মনে আর কোনও সংশয় থাকে না। বাস্তবিক, আমি আমার থেকে দূরের কোন বস্তুকে অবিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু আমি কি আমাকে সন্দেহ করতে পারি? জ্ঞান হলে তিনি আর দূরে নন। আমারই মধ্যে। শাস্ত্র বলছেন, 'করামলকবৎ'। আমার হাতে একটা আমলকী আছে। যতক্ষণ সেটা পাইনি ততক্ষণ আমার মনে নানারকম প্রশ্ন ছিল। পাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। পাবার পর আর কোনও প্রশ্ন নেই। আমি এখন স্থির, শান্ত। সমস্ত জগৎ যদি এক হয়ে বলে—তোমার কাছে কোনও আমলকী নেই, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি জানি, আমার কাছে আছে। আমি এখন সব সন্দেহ থেকে মুক্ত। নিঃসন্দিগ্ধ। আমার যে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়েছে। নিজের ভেতরে আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছি। আমার বুদ্ধি এখন আর এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায় না। বাতাসহীন স্থানে প্রদীপশিখার মতো ব্রহ্মে স্থির হয়ে বসে আছে। আমার দেহ, মন, প্রাণ সব ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে। ব্রহ্মই যেন শরীর নিয়ে চলেছে।

এহেন ব্যক্তির জীবনে দুয়ের কোনও স্থান নেই। তাই তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এসব কোনও বোধও নেই। প্রিয় বা অপ্রিয় কোনও কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি যে নিজের মধ্যে নিজেই ডুবে আছেন। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বয়ে চলেছে তাঁর জীবনে। তাই প্রিয় বস্তু পেলেও তিনি আনন্দিত হচ্ছেন না। আবার কেউ অপ্রিয় বস্তু দিলেও ব্যথিত হচ্ছেন না। আনন্দ আর বেদনা দিন আর রাত্রির মতো পরপর জীবনে এসে থাকে। আমি যখন আনন্দ চাই, তখন আমি আসলে দুঃখকেও আমন্ত্রণ জানাই—আমার ইচ্ছা থাকুক বা না-ই থাকুক। কারণ শুধু আনন্দ পাব, দুঃখ আসবে না—এ অবাস্তব, অসম্ভব। এই জন্যই হিন্দু আচার্যরা বলেন, আদর্শ হল সুখ-দুঃখ উভয়কেই অতিক্রম করে যাওয়া। তাঁরা মনে করেন, একটি অবস্থা আছে—যেখানে সুখ ও দুঃখের হয় কোনও অর্থই নেই, নয়তো একই অর্থ।

এর মানে এই নয় যে, সেখানে পৌঁছুলে আমার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাবে। সুখ-দুঃখ কোনওটাই আমি বুঝতে পারব না। না, তা নয়। আমার অনুভব-শক্তি ঠিকই থাকবে। কিন্তু মনকে আমি এমনভাবে গড়ে তুলব যে, সুখ-দুঃখ কোনওটাই আমাকে প্রভাবিত করবে না। আমি জেনে নিয়েছি, জীবন মানেই ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন, নিন্দা-প্রশংসা, আনন্দ-বেদনা। আমি জানি এগুলি অনিবার্য। তাই এসবের জন্য আমার মনের শক্তিকে আমি আর বিঘ্নিত হতে দিই না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তিনি বৃন্দাবনে আছেন। তপস্যা করছেন। শীতকাল। একদিন একজন

শেঠ একটা কম্বল দিয়ে গেল তাঁর কাছে। তিনি দেখলেন, কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর আর একজন এসে তাঁকে কিছু না বলেই সেটা নিয়ে পালাল। তাতেও তাঁর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সবেতেই নির্বিকার।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন : যাঁরা দেহটাকেই আত্মা বলে মনে করেন, তাঁরা প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুলাভে আনন্দ বা দুঃখ পান। আর যাঁরা জানেন যে, তাঁরা এই দেহ নন, ব্রহ্ম, তাঁদের চোখে প্রিয়-অপ্রিয় সবই ব্রহ্ম। ভালো জিনিসও ব্রহ্ম। আবার মন্দ জিনিসও ব্রহ্ম। তাই সবেতেই অবিচলিত তাঁরা!

এটা বাস্তব যে, দুঃখ-কষ্ট জীবনে আসবেই। একে মেনে নিতেই হবে। দেখতে হবে কীভাবে এর সম্মুখীন হওয়া যায়। হিন্দু আচার্যরা বলেন, দুঃখ-কষ্টকে স্থিরভাবে গ্রহণ করো। তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। সাক্ষীস্বরূপ হও। কীরকম সাক্ষী? যেন মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ফুটবল দেখছ। দু-দলই তোমার অপরিচিত কিংবা সমান পরিচিত। দুই পক্ষই গোল করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তোমার মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই। তুমি নিরাসক্তভাবে দেখছ। তাই, একমাত্র তুমিই ঠিক ঠিক খেলাটা উপভোগ করছ। কেউ আঘাত করেছে বলে দুঃখ পাব না, সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু প্রশংসা, সম্পদ, প্রাচুর্য-–এসবের জন্য কি আমি খুশি হব না ? হিন্দু আচার্যরা বলেন : না। সুখের দ্বারা যদি তুমি প্রভাবিত হও, তাহলে দুঃখও তোমাকে প্রভাবিত করবে। হয় তুমি তাদের প্রভু হও, নয় তো তারা তোমার প্রভু হবে। এ দুয়ের মাঝে তৃতীয় কোনও রাস্তা নেই। কাজেই, সুখ-দুঃখ উভয়ের প্রতিই তোমাকে উদাসীন হতে হবে। অনাসক্ত হতে হবে। এমন ব্যক্তিই আমাদের জীবনের আদর্শ। আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। সুতরাং সমদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিগণ নিরন্তর ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্ম-যোগ-যুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ।। ২১

বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্য বিষয়সমূহে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্ত) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) সঃ (সেই যোগী) আত্মনি যৎ সুখম্ (আত্মায় যে সুখ আছে) তৎ (সেই সুখ) বিন্দতি (লাভ করেন) সঃ অক্ষয়ং সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)।

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত, ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত পুরুষ আত্মায় যে আনন্দ আছে তা লাভ করেন। এবং তিনি অক্ষয় আনন্দ ভোগ করেন।

শ্রীভগবান এখানে ব্রাহ্মীস্থিতি কীভাবে লাভ করা যায় তার উপায় বলছেন। 'বাহ্যস্পর্শেষু' অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে যিনি অনাসক্ত। এমন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন। বাইরের কোনও জিনিসের প্রতি তাঁর কোনও আসক্তি নেই। ইন্দ্রিয়গুলি তাঁর বশে। 'ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা'—যাঁর আত্মা ব্রহ্মে

লীন হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংযত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন এবং সেই মনকে বুদ্ধিতে আর বুদ্ধিকে ব্রহ্মে সমাহিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয় সচ্চিদানন্দ। সৎ-চিৎ-আনন্দ। 'সৎ' অর্থাৎ তিনি আছেন। 'চিৎ' মানে তিনি জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ। 'আনন্দ' অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ তিনি। এই হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কিন্তু এই জগতের সব আনন্দের উৎসও তিনি। 'রসো বৈ সঃ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭), রসস্বরূপ তিনি। আনন্দঘন। উপনিষদে দেখি, ভৃগু ধ্যানে বসে ব্রহ্মের স্বরূপ আবিষ্কার করছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ কী? 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩ /৬)—ব্রহ্ম হচ্ছেন আনন্দস্বরূপ। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'— আনন্দ থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি'—সবকিছু আনন্দেই বেঁচে আছে। আবার যখন তাদের বিনাশ হবে, আনন্দেই তারা মিশে যাবে—'আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' জগতের সব আনন্দ ব্রহ্ম থেকেই আসে। রসগোল্লা খেলে আমি আনন্দ পাই। ফুটবল খেলেও আনন্দ পাই। সব আনন্দের উৎস তো তিনি। কিন্তু যখন রসগোল্লা খাচ্ছি বা ফুটবল খেলছি কেবল তখনই আনন্দ পাচ্ছি। বড়জোর কিছুক্ষণ পর্যন্ত রেশ চলল। একটু পরেই সেই আনন্দ শেষ হয়ে যাবে। এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। একটা বিশেষ সময়, একটা বিশেষ বস্তুর অপেক্ষা করছে। জাগতিক সব আনন্দই তাই। কোনও না কোনওকিছুর উপর নির্ভর করে আছে। আপেক্ষিক। একমাত্র ব্রহ্মানন্দই কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখে না। নিরপেক্ষ।

মন ও ইন্দ্রিয় রাজ্যের-বাইরে গেলে এই নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেয়েছেন বিষয়সুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ। ইন্দ্রিয়সুখ তখন তাঁর আলুনি বলে মনে হয়। তাঁকে আর আকৃষ্ট করতে পারেনা। 'আনন্দ একরসম্'—তাঁর জীবনে আনন্দধারা বয়ে চলেছে। কোনও ছেদ নেই। নিরবচ্ছিন্ন। কাউকে সেই আনন্দের কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। সাধক তখন নিজের মধ্যে আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার করেন। সেই আনন্দে তিনি সবসময় বুঁদ হয়ে আছেন—আত্মরতি। তিনি তখন নিশ্চিতরূপে জানেন তাঁর আত্মাই ব্রহ্ম। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জেনে আনন্দে বিভোর হয়ে গেছেন তিনি। অক্ষয় সুখের অধিকারী হয়েছেন। এই আনন্দ নিত্য, শাশ্বত। আনন্দের মূর্তবিগ্রহ তিনি। ভগবান এই পরম অবস্থা লাভের কথাই বলছেন—বাহ্য বিষয়চিন্তা বর্জিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হওয়ার অবস্থাই ব্রহ্মযোগ। এই অবস্থায় অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখও নির্মূল হয় এবং যোগী কেবল পরম আনন্দই অনুভব করেন। এইরূপ অবস্থা যিনি লাভ করেছেন অর্থাৎ ঈশ্বরে যাঁর মনপ্রাণ অন্তরাত্মা গত হয়েছে তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ।। ২২

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) সংস্পর্শজাঃ যে হি ভোগাঃ (ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে উৎপন্ন যে সুখ) তে (সেসব) দুঃখ-যোনয়ঃ এব (দুঃখেরই কারণ হয়) (এবং) আদি অন্তবন্তঃ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল অর্থাৎ নেহাত অনিত্য) তেষু (ঐ সব ক্ষণিক বিষয়ানন্দে) বুধঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিরা) ন রমতে (প্রীত হন না)।

হে অর্জুন, রূপ-রসাদি বিষয় থেকে উৎপন্ন যে সুখ তা দুঃখেরই কারণ হয়। এগুলির শুরু ও শেষ আছে। অতএব ক্ষণস্থায়ী। সেজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐসব ক্ষণিক বিষয়ানন্দে প্রীতিলাভ করেন না।

সাধারণ মানুষ ভোগসুখেই মত্ত। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই বহির্মুখী। বাইরের দিকেই তাদের গতি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি কীকরে জাগতিক সুখকে চিরকাল ধরে রাখা যায়। রূপ-রসাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখকে নিত্য বলে মনে করে তার পিছনে ছুটছি। আর মৃত্যুর কবলে পড়ছি। তাই শ্রুতি আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন—যেও না, ও পথে যেও না। কিন্তু আমাদের কানে সেই সতর্কবাণী পৌঁছোয় কি? আবার শুনেও বিশ্বাস করি না। ভাবি, এখানে তো বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছি। তবে এসব ছাড়ব কেন? মৃত্যু যখন অবধারিত তখন যতক্ষণ পারি ভোগ করে নিই।

কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, বিষয়সুখ কখনোই স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না। এ দু-দিনের । এই আছে, এই নেই। আবার মন ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি কোন কাজ করতে পারে না। মন তাই স্বাভাবিকভাবেই বাইরের বস্তুর দিকে ছুটে যাচ্ছে। এর ফলে মনে হাজার রকমের তরঙ্গ উঠছে। সবসময়ই সে চঞ্চল, অশান্ত। দুর্নিবার তার গতি। আসলে মন যে অবাধ্য । এটা চাই, ওটা চাই । চাওয়ার আর তার অন্ত নেই। মনের অবস্থা বোঝাতে একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হয়। মন যেন একটি হ্রদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ —এই বিষয়গুলি যেন ঢিল। ইন্দ্রিয়গুলি মনরূপ হ্রদে ক্রমাগত বিষয়ের ঢিল ছুঁড়ছে। তাই মনে অজস্র তরঙ্গ উঠছে। আত্মা এই হ্রদের নীচে আছে। হ্রদের জল অশান্ত থাকায় আত্মাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে উপায় কী? হ্রদকে তরঙ্গবিহীন করতে হবে। তা করতে হলে প্রথমেই ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করতে হবে।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের মনরূপ হ্রদ নিস্তরঙ্গ, শান্ত। কিন্তু অশান্ত মনকে শান্ত করতে হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে মেরে ফেললে চলবে না। অথবা ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ করলেও হবে না। বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তি দূর করতে হবে। এই আসক্তি অর্থাৎ বাসনাই আমাদের প্রধান শত্রু। বাসনা না থাকলে বাইরে হাজার বিষয় থাকলেও আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তবে বাসনাকে নিবৃত্ত করব কীভাবে? মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে

অন্তর্মুখী করতে হবে। অর্থাৎ আমি চোখ দিয়ে কেবল ঈশ্বরীয় রূপ দেখব। কান দিয়ে তাঁর কথাই শুনব। হাত দিয়ে তাঁরই সেবা করব। মুখে তাঁর নামগুণগান গাইব। আর পা দিয়ে সেখানে যাব যেখানে হরিকথা হচ্ছে। এভাবে না হয় ইন্দ্রিয়কে বশে আনা গেল। কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে কীভাবে? মনের সব চিন্তা, সব বৃত্তিরও মোড় ঘুরিয়ে দেব। বিষয় থেকে ঘুরিয়ে ঈশ্বরমুখী করে দেব। মনকে বিষয় থেকে তুলে এনে আত্মায় সমাহিত করব। বাইরের কাজটাকে পালটাতে হবে না। যে মন দিয়ে কাজ করছি তার গতি উলটো দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : ঈশ্বরে অনুরাগই বিষয়ে বিরাগ।

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়জাত সুখে প্রীতি অনুভব করে, কিন্তু 'বুধঃ' অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি, আত্মতত্ত্বকে বোধে বোধ করেছেন। তাই দুদিনের ভোগ-সুখ তাঁকে আর আকৃষ্ট করতে পারে না। তিনি দুঃখময় সংসারে প্রবেশ করেন না। নিজের অন্তরে অপার আনন্দের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। সেই আত্মানন্দ সাগরে ডুবে আছেন তিনি।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩

যঃ (যিনি, জ্ঞানী পুরুষ) শরীর-বিমোক্ষণাৎ (শরীরত্যাগের) প্রাক্ (পূর্বে) কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং (বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগ-জাত কাম ও ক্রোধ থেকে উদ্ভূত) বেগম্ (বেগ) ইহ এব (এই জীবনেই অর্থাৎ এই দেহেই) সোঢ়ুং (সহ্য করতে) শক্নোতি (সমর্থ হন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) সঃ (তিনি) সুখী (আনন্দময়) নরঃ (পুরুষ)।

যিনি শরীরত্যাগের পূর্বে এই সংসারে থেকেই কাম ও ক্রোধের বেগকে প্রতিরোধ করতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সুখী পুরুষ।

আত্মজ্ঞানলাভের পথে প্রধান অন্তরায় কাম এবং ক্রোধ। বিষয়-চিন্তাই সব অনর্থের মূল। প্রথমে বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ। বিষয়ের মধ্যে থাকা। বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করা। ক্রমশ বিষয়কে ভালো লাগে। পাওয়ার ইচ্ছা জাগে মনে—কামনা। আবার কামনা-প্রাপ্তির পথে যে বাধা তার প্রতি ক্রোধ। বিষয়ের দিকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হওয়াই লোভ। কামনা-বাসনাই আমাদের অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করে রাখে। ফলে নিত্যবস্তু লাভের ইচ্ছা জাগে না। এরই নাম মোহ, অজ্ঞান বা মায়া। এই অজ্ঞানতাই যখন অহংকারে (অর্থাৎ 'আমি ধনী, আমি জ্ঞানী') পরিণত হয়, তা হল মদ। অহংকার থেকে ঈর্ষা। এই ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতার নামই মাৎসর্য।

বস্তুতঃ কাম ও ক্রোধ আলাদা নয়। একরূপে যা কাম আর এক রূপে তাই ক্রোধ। সব রিপুর মূলে আছে কামনা। কাম না থাকলে কোনও রিপুরই অস্তিত্ব নেই। রিপুগুলি কামনারই বিভিন্ন স্তর। কাম-ক্রোধকে পথের কাঁটা জেনে ত্যাগ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ জীবনেই কাম-ক্রোধকে নিজের বশে এনেছেন তিনিই প্রকৃত যোগী। তিনি জিতেন্দ্রিয়।

'প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ'—মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংযত জীবন যাপন করতে হবে। কামনা-বাসনা মহা অনিষ্টকারী শত্রু। আমরা যেন ভুলেও না ভাবি, আমি কামজয় করে ফেলেছি। কামনা আর আমাকে কিছু করতে পারবে না। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে কোনও অবস্থাতেই আমার ঘাড়ে চেপে না বসে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাসনার আগুন যে-ব্যক্তিকে দগ্ধ করতে পারেনি সংসারে তিনি যথার্থই সুখী। এ জীবনেই তিনি পরাশক্তি লাভ করেন। তাই জীবিত অবস্থায় সংসারে অবস্থান করে যিনি কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারেন তিনিই প্রকৃত যোগী এবং তিনিই প্রকৃত নিত্য সুখের অধিকারী।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

যঃ (যিনি) অন্তঃ সুখঃ (আত্মাতেই সুখী) অন্তঃ আরামঃ (আত্মাতেই বা ক্রীড়াযুক্ত) তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তঃ-জ্যোতিঃ এব (আত্মাই যাঁর জ্যোতি) সঃ (সেই) যোগী (যোগী) ব্রহ্ম-ভূতঃ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে) ব্রহ্ম-নির্বাণম্ অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন)।

যাঁর আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম ও শান্তি, আত্মাতেই জ্যোতি, সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে এ জীবনেই ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন।

যিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত তিনি এ জীবনেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। স্বরূপানুভূতি কীরূপ? উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন, 'অন্তঃসুখঃ'। 'অন্ত' বলতে আত্মাকে বোঝানো হয়েছে। 'অন্তঃসুখঃ' অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁর সুখ। মন বাহ্য বিষয় সুখ থেকে সরে এসে অন্তরাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। অন্তরে আনন্দের খনি আছে। তিনি সেই আনন্দখনির খবর পেয়েছেন। সেই আনন্দে তিনি ভরপুর হয়ে আছেন। তারপরে বলছেন 'অন্তরারামঃ'—আত্মাতেই যাঁর আরাম। এ এমন একটা অবস্থা যে, আমি সবসময় অন্তরে অনুভব করছি। আরাম অর্থাৎ তৃপ্তি। বাইরের কোনও বস্তুতে আমি সুখ অনুভব করি না। নিজের মধ্যেই নিজে সুখী। আত্মতৃপ্ত আমি। 'অন্তঃজ্যোতিঃ', আত্মাই যাঁর জ্যোতি। অর্থাৎ আমি নিজের মধ্যেই সব দেখতে পাচ্ছি। এরজন্য বাইরের আলোর দরকার হয় না। আমার নিজের ভেতরেই আলো আছে। বাস্তবিক বেদান্ত তো শুধু ঐকথাই বলে। 'যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' বাইরে কিছু নেই । সবকিছু তো আমারই ভেতরে। অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজী একটা কবিতা লিখে পাঠাচ্ছেন। বলছেন, 'আমি পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায় ঘুরে বেড়িয়েছি, মন্দিরে মসজিদে আর গির্জায় গেছি, বেদ বাইবেল কোরান সব শাস্ত্র পড়েছি, কত তীর্থস্থানে গেছি আমি—তোমাকে পাব বলে। বাইরে তোমাকে খুঁজেছি, পাইনি। তোমার কণ্ঠস্বর আমি শুনেছি, কিন্তু কোথায় তুমি বুঝতে পারিনি। শেষে আমি একদিন আবিষ্কার করলাম : তুমি আমারই হৃদয়ে, আমার

মধ্যে থেকেই আমায় ডাকছ।'

এমন যে ব্যক্তি যিনি নিজের মধ্যে সবকিছু পেয়েছেন 'সঃ যোগী'। তিনিই যোগী। 'আপ্তকামঃ' সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ করেছেন তিনি। ভূমাকে লাভ করে তিনি ভূমা হয়ে গেছেন। তাই বাকি সবকিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ। 'ব্রহ্ম-ভূতঃ' তিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন। ব্রহ্মকে জেনে তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। কিন্তু সমস্যা হল : জীব তো স্বরূপত ব্রহ্ম। চিরকাল ব্রহ্মই ছিলাম। তবে এখন আবার ব্রহ্ম হলাম কীকরে? বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (৪/৪/৬): 'ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি।' অর্থাৎ আমি সবসময়েই ব্রহ্ম একথা সত্য। তবে মায়ার প্রভাবে আমি তা এতদিন ভুলে ছিলাম। এখন মায়ার আবরণ দূর হয়েছে। তাই আমি আমার সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারছি। এরূপ যোগী-পুরুষরা ব্রহ্মেই নির্বাণ লাভ করেন—'ব্রহ্মনির্বাণম্ অধিগচ্ছতি'। নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তি। ব্রহ্মেই মুক্তিলাভ করেন তিনি। এ জীবনেই তিনি ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পান। নিজ অন্তরেই সমগ্র সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন। অন্তরাত্মা ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে ব্রহ্মই হয়ে যান।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ।। ২৫

ক্ষীণ-কল্মষাঃ(পাপাদি দোষহীন)ছিন্ন-দ্বৈধাঃ(সংশয়শূন্য) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত) সর্বভূতহিতে (সকল জীবের কল্যাণে) রতাঃ(নিযুক্ত) ঋষয়ঃ (ঋষিরা) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মনির্বাণ, মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন)।

যাঁরা নিষ্কাম কর্মদ্বারা সমস্ত পাপমুক্ত, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত এবং সকল প্রাণীর কল্যাণে রত, সেই ঋষিরা এ-জীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।

নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রশংসা করে এখানে শ্রীভগবান বলছেনঃ যে-সকল ঋষি নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত ও সকল প্রাণীর কল্যাণে রত তাঁরাই এ-জীবনে মুক্তিলাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। আমাদের মনটা এখন মলিন হয়ে আছে। 'আমি' 'আমার' বোধই মলিনতা। সকাম কর্ম করলে মলিনতা বাড়ে। আর নিষ্কাম কর্ম করলে মলিনতা কমে। মলিনতার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না। নিষ্কামভাবে কাজ করতে করতে মনের মলিনতা ক্রমশ দূর হয়। এভাবেই একদিন সব মলিনতা, পাপ, কালিমা ধুয়ে-মুছে যায়। আমি তখন নিষ্পাপ—'ক্ষীণকল্মষাঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি।'

'ছিন্নদ্বৈধাঃ'—কোনও দ্বিধা নেই । শ্রবণ ও মননের দ্বারা যাঁর সকল সন্দেহ দূর

হয়েছে। সংশয়শূন্য তিনি। প্রথমে 'শ্রবণ'। সবার আগে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে গিয়ে আত্মতত্ত্ব শুনতে হবে। আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করে গুরু আমাকে বলে দেবেন : তুমিই সেই ব্রহ্ম—'তত্ত্বমসি'। এবার মনন। অর্থাৎ গুরু আমাকে যা বলে দিয়েছেন তা চিন্তা করব। ব্রহ্মকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। বাইরের জগৎটাকে প্রথমে বিচার করে দেখলাম, সেটা অনিত্য। সেটা ত্যাগ করলাম। এবার আমি অন্তঃপুরে এসেছি। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজছি। আমার হাতিয়ার ঐ 'নেতি নেতি' বিচার। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। এভাবে প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমার একটা পাকা ধারণা হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এখন পর্যন্ত আমি বুদ্ধি দিয়ে তত্ত্বটাকে ধরেছি। উপলব্ধি হয়নি। এবার আমাকে 'নিদিধ্যাসন' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম'— এই ধ্যান করতে হবে। অভ্যাসের দ্বারা হয়তো মনকে বশে এনেছি। নিজেকে আমি নিজের মুঠোর মধ্যে ধরেছি — 'যতাত্মানঃ'। এবার সেই সংযত মনকে ব্রহ্মে সমাহিত করছি। ধ্যান গভীর হলে আমার মন, বুদ্ধি সব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। আমি ব্রহ্ম হয়ে যাই । আমার দ্বৈতবুদ্ধি তখন ঘুচে যায়। এ-অবস্থায় আমি যা-কিছু করি তাতেই লোকের মঙ্গল হয়। এমন নয় যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা খুব ভেবেচিন্তে অপরের কল্যাণ করেন। কল্যাণ না করে তাঁরা থাকতে পারেন না—'সর্বভূতহিতে রতাঃ'। যাঁদের জীবনে এসব লক্ষণ দেখা যায় তাঁরাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি।

ভগবান এখানে সকল সংশয় দূর করে বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দ্বারা সংসারের নিষ্কাম অর্থাৎ কল্যাণ কর্ম হয়ে থাকে। সাধারণ প্রচলিত ধারণা যে, জ্ঞানীর সমস্ত কর্মই শেষ হয়, তা নয়। ব্রহ্মনির্বাণ তখনই সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে যখন তিনি আপনাকে উজাড় করে সমগ্র জগতের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত করেন। সমদর্শী ঋষিগণই মানুষের প্রকৃত হিতসাধনে সমর্থ। অতএব সমদর্শী জ্ঞানীই সর্বভূতের হিত অর্থাৎ জগতের মঙ্গলসাধনে রত হন। গীতা আমাদের সামনে কর্মের এই মহান আদর্শটিই তুলে ধরেছেন—সকলের হিতের জন্য, সকলের সুখের জন্য কর্ম কর।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ।। ২৬

কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং (কাম, ক্রোধ হতে মুক্ত) যত-চেতসাম্ (সংযতচিত্ত) বিদিত-আত্মনাম্ (আত্মজ্ঞ) যতীনাং (যতিদের, সন্ন্যাসীদের) অভিতঃ (উভয়ত, দেহত্যাগের পূর্বে ও পরে) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ মোক্ষ) বর্ততে (লাভ করেন)।

কাম-ক্রোধ থেকে মুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসীরা জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে, উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ কারেন।

এখনও সেই একই প্রসঙ্গ চলছে। ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষলাভ । শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'কামক্রোধবিযুক্তানাং'—কাম ও ক্রোধ থেকে যাঁরা মুক্ত। যাঁর মনে বাসনার লেশমাত্র

নেই। শিকড়সুদ্ধ বাসনাকে মন থেকে তুলে ফেলে দিয়েছেন। যে কামনা থেকে মুক্ত, সে ক্রোধ থেকেও মুক্ত। 'যতচেতসাম্'—সংযতচিত্ত। 'যত' অর্থাৎ সংযত, নিজেকে জয় করা। বুদ্ধদেব বলতেন : যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন তিনি তো বীর। মন সবসময়ই এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। চঞ্চল, অশান্ত। এই মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন তিনি যথার্থই সংযমী পুরুষ। তিনি ব্রহ্মনির্বাণে অবস্থান করছেন অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভব করেন। এক ব্রহ্মচৈতন্য আমাদের অন্তরে আত্মারূপে বিরাজ করছেন এবং বাইরেও সেই ব্রহ্মচৈতন্য আত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁর আত্মা ও পরমাত্মায় একত্ব বুদ্ধি জন্মায়। তিনি অনুভব করেন, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই তিনি বাস করছেন। এই অনুভূতি হলে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সঙ্গে অবিরাম ঐক্যবোধ আমাদের প্রকৃতিগত হবে এবং আমরা প্রকৃত নিষ্কাম কল্যাণকর্মের মূল প্রেরণা লাভ করব। তখন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, প্রশাসন, রাজনীতি অথবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থেকেও চব্বিশ ঘণ্টা ব্রহ্মেই অবস্থান করব। অতএব ইহলোকে অর্থাৎ এখানে এখনই জীবনকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করতে হবে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। কেউ কাউকে কিছু করে দেয় না। নিজেকেই নিজে তৈরি করতে হয়। আমার ভাগ্যকে আমিই গড়ে তুলব। মুক্তিলাভই আমার জীবনের লক্ষ্য। এ কাজ আমাকেই করতে হবে। 'বিদিত- আত্মনাম্'—যিনি আত্মাকে জেনেছেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি। আত্মাকে জানা মানে নিজেকে জানা। নিজের স্বরূপকে বোধে বোধ করা। যোগসাধনের দ্বারা যাঁর জীবনে এসব গুণ ফুটে উঠেছে তিনিই যতি। এখানে যতি বলতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের বোঝানো হয়েছে। এর আগে বলেছেন, এমন ব্যক্তিরা এ-জীবনেই মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। এঁরা জীবন্মুক্ত পুরুষ। এই শ্লোকে বলছেন, জীবন্মুক্ত পুরুষরা মৃত্যুর পরে আর এই সংসারে ফিরে আসেন না। আর দেহধারণ করেন না। অর্থাৎ তাঁরা বিদেহমুক্তিও লাভ করেন।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ।। ২৭

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ।। ২৮

বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ) বহিঃ (মন থেকে সরিয়ে দিয়ে) কৃত্বা (করে) চক্ষুঃ চ (চক্ষু) ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (দুই ভ্রূ-র মধ্যে স্থাপন করে) নাসা-অভ্যন্তর চারিণৌ (নাকের মধ্যে বিচরণশীল) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ (সমান) কৃত্বা (স্থির করে) যত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে) বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে) মোক্ষ-পরায়ণঃ (মোক্ষকামী) যঃ

(যে) মুনিঃ (মুনি) সঃ সদা মুক্তঃ এব (তিনি সবসময়ই মুক্ত)।

বাহ্য স্পর্শ, রূপ-রস ইত্যাদি বিষয়চিন্তা ত্যাগ করে এবং চোখকে দুই ভ্রূ-র মধ্যে স্থির করে, প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সমান করে তাদের নাসামধ্যে রেখে, যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করে মোক্ষপরায়ণ ও ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধশূন্য হন, সেই মুনি সবসময়ই মুক্ত।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধ্যানের কথা বলছেন। ধ্যান করব কেন? মনকে সংযত করে বশে আনার জন্য । আমাদের লক্ষ্য তো আত্মজ্ঞান লাভ। ধ্যানের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করা। ধ্যান হচ্ছে জ্ঞানযোগের অন্তরঙ্গ সাধন। এর আগে নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান আপনিই ফুটে ওঠে। নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানপথের বহিরঙ্গ সাধন। এই দুটি শ্লোকে কীভাবে ধ্যান করব সেকথাই বলছেন।

'বাহ্যান্ স্পর্শান্'—বাইরের যা-কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করতে পারি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল। 'বহিঃ কৃত্বা'—সরিয়ে ফেলা। মনকে বাহ্য বিষয় হতে প্রত্যাহার করে ধ্যেয় অর্থাৎ আত্মবস্তুতে একান্ত সমাহিত করাই ধ্যান। বাইরের বস্তু বাইরেই থাকুক। মনে আমি তাদের কোনও স্থান দেব না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তো সব বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়েই বাইরের জগৎ আমার মনে প্রবেশ করছে। মনে তাই হাজার রকমের তরঙ্গ উঠছে। মনকে অশান্ত করে তুলছে। তাই মন থেকে বাইরের বিষয়সকলকে পুরোপুরি সরিয়ে ফেলেছি। 'চক্ষুশ্চৈব ভ্রুবোঃ অন্তরে'—চোখকে দুই ভ্রূ-র মধ্যে স্থির করে। কেননা চোখ আমাদের সবসময়ই বাইরে ছুটছে। বাইরের শোভা দেখতেই মত্ত। মনকে খুব করে বোঝালাম বাইরের দিকে তাকাবো না। তার অর্থ কি এই, আমি চোখ বন্ধ করে চলব?—না। সবকিছুর ভিতর ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা করব। আসলে মনই যত গণ্ডগোল বাধায়। তাই চোখকে আমি বাইরের জগৎ থেকে তুলে নিয়ে আসব। তারপর চোখকে দুই ভ্রূ-র মাঝে স্থির করে রাখব। আমাদের যেসব ধ্যানমূর্তি আছে তাতে চোখ অর্ধনিমীলিত। অন্তর্মুখ। এভাবেই মন শান্ত হয়ে আসবে। তারপরে বলছেন 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা'—প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতিকে সমান করে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ করে রেখেছি আমি। অর্থাৎ কুম্ভক অভ্যাস করতে হবে। কুম্ভক অর্থাৎ আমি যদি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখি তবে আমার শরীরটা ফুলে উঠবে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে সংযত করা। অন্তর্মুখ করা। সবকিছু থেকে আমি আমার মনকে টেনে নিয়ে আসছি। জগৎ নেই আমার কাছে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি এ জগৎ থেকে। 'যতেন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ'—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি আমার বশে। জিতেন্দ্রিয়। 'বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ'—মন থেকে সব ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে আমি মুছে ফেলেছি। এবার আমি কী করব? এখানেই কথাটা বলছেন। 'মোক্ষ-পরায়ণঃ'—আমি মুক্তিলাভ করতে

চাইছি। এছাড়া আমি আর কিছু চাই না। মুক্তিকামী। যে ব্যক্তি এভাবে চিন্তা করেন তিনিই মুনি। তিনি সর্বদাই মুক্ত — 'সঃ সদা মুক্তঃ এব'। জীবন্মুক্ত পুরুষ তিনি।

স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান সম্বন্ধে বলছেন: ধ্যানের দ্বারাই অন্তর্জগতের বিকাশ অর্থাৎ দেবত্বের বিকাশ সম্ভব। ধ্যান হচ্ছে একটা বিশেষ অবস্থা। ধ্যান কর! ধ্যানই সর্বোচ্চ সাধনা। আধ্যাত্মিক জীবনের একেবারে কাছাকাছি আসা—যখন মন থাকে ধ্যানস্থ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এ এমন এক বিশেষ মুহূর্ত যখন আমরা কোনওভাবেই বস্তুজগতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকি না—আত্মা তখন একেবারেই আত্মগত, সবরকমের জড়ত্ব থেকে মুক্ত—আত্মার সঙ্গে এ এক অভাবনীয় সান্নিধ্যের অনুভূতি।

এই শ্লোকটিতে যম, নিয়ম, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির আভাস দেওয়া হল। শ্রীভগবান পরবর্তী অধ্যায়ে (ধ্যানযোগে) এ-বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ।। ২৯

(মুক্ত যোগীপুরুষ) মাং (আমাকে) যজ্ঞ-তপসাং ভোক্তারম্ (যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা) সর্বলোক-মহেশ্বরং (সর্বলোকের মহেশ্বর) সর্বভূতানাং সুহৃদং (সকল ভূতের অন্তরঙ্গ সুহৃদ) জ্ঞাত্বা (জেনে) শান্তিম্ ঋচ্ছতি (শান্তিলাভ করেন)।

মুক্ত যোগীপুরুষ আমাকে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানকে) যজ্ঞ ও তপস্যার ফলভোক্তা, সর্বলোকের পরমেশ্বর ও সকলের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ জেনে পরম শান্তি (মুক্তি) লাভ করেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় করেছেন। আগের শ্লোকে জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা বলেছেন। এখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন : এই অবস্থা (জীবন্মুক্তি) লাভ হলে তুমি দেখবে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূত তোমার মধ্যেই অবস্থিত। ব্রহ্মরূপে তুমিই সর্বত্র রয়েছো। তখন তোমার অহ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে লয় পাবে। তুমি ব্রহ্ম হয়ে যাবে। সকলকে তুমি সমান চোখে দেখবে। সকলের মধ্যে আমাকেই শ্রীভগবানকে দেখবে। আমার বিশ্বরূপ তোমার হৃদয়ে ফুটে উঠবে। আমার বিশ্বকর্মে তোমার অধিকার জন্মাবে। তুমি আরও জানবে, আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ফলভোক্তা। আমিই সর্বলোকের মহেশ্বর। অর্থাৎ পরমেশ্বর। 'সর্বভূতানাং সুহৃদং'—সকলেই আমার সুহৃদ। কারোও সাথে আমার বিরোধ নেই। এমন নয় যে কাউকে আমি খুব ভালোবাসি, আবার কাউকে একদমই পছন্দ করি না। সকলের প্রতি আমার সমান দৃষ্টিভঙ্গী। সকলেই আমার বন্ধু। আমি সকলকেই ভালবাসি। তারপরে বলছেন 'জ্ঞাত্বা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি'। যে আমাকে এভাবে জানে, আমারই কৃপায় সে পরাশান্তি লাভ করে, মুক্ত হয়ে যায়।

বস্তুত পরাজ্ঞান আর পরাভক্তি একই, আলাদা নয়। জ্ঞানী সর্বভূতে নিজেকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) দেখেন। আর ভক্ত সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। তাই যিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠও বটেন। সেই জগৎপতি মহেশ্বরকে দেখব। জানব। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করব। এই হল আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এটাই অদ্বৈতবোধ এবং এই জীবনেই আমার মধ্যে বিকাশ সম্ভব, এটাই

জীবন্মুক্তি ভাব এবং এই জীবনেই আমাকে লাভ করতে হবে এইরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সাধনা চাই।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **সন্ন্যাসযোগ** নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে প্রধানত কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের তুলনা করা হয়েছে। কর্ম-সন্ন্যাস কর্মত্যাগ গীতার উপদেশ নয়। বরং স্বধর্মপালন ও কর্মফলত্যাগই গীতার উপদেশ। তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্য, বেদান্তবিচার এবং সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হলে কর্মত্যাগের অধিকারী হওয়া যায় না। জ্ঞানের সাধন কঠিন অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বিচার হতে ঐহিক ও আমুত্রিক ফল ভোগে বৈরাগ্য জন্মে, শম (অন্তর-ইন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সংযম), উপরতি (বিষয়ভোগ থেকে ইন্দ্রিয় পরিহার), তিতিক্ষা (সর্বাবস্থায় সহ্য ও সংযম অভ্যাস), শ্রদ্ধা (শাস্ত্র ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধা) ও সমাধান (মনের একাগ্রতা সাধন)—এই সকল ষট্‌সম্পত্তির সাধন ও সর্বকর্মসন্ন্যাসাদিপূর্বক যে মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা জন্মায়—তাকেই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি বলা হয়। এরপর গুরুর নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যের—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ব্রহ্মানুভূতি ও জীবনমুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ভগবান তাই এখানে কর্মত্যাগের উপদেশ দেননি। কর্মফল ত্যাগ করে কর্মযোগী বা নিত্যসন্ন্যাসী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। যতক্ষণ মানুষ দেহাশ্রয়ী এবং প্রারব্ধ-সংস্কার দ্বারা চালিত ততক্ষণ কর্মত্যাগ অসম্ভব। ভগবান বলছেন, ক্ষণমাত্র কর্ম না করে মানুষ অবস্থান করতে পারে না। তাই স্বধর্মে থেকে নিষ্কাম কর্ম করাই উচিত। কর্ম তখন আর বন্ধনের কারণ হয় না। কর্মের ফলে আসক্তিই বন্ধনের কারণ হয়। ফল ত্যাগ অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। কর্মযোগী ও কর্মসন্ন্যাসী উভয় পথেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব।

জ্ঞানযোগে যোগী আত্মদর্শী হন এবং কর্মযোগী ভক্ত সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন। একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অপরজন ভক্তশ্রেষ্ঠ। সেই পরমেশ্বর স্বয়ং সকল জীবের সুহৃদ—এটি ভগবানের অপূর্ব আশ্বাসের বাণী। ভগবান অন্তরঙ্গ, তিনি আমাদের সঙ্গে অভিন্ন, তিনি দূরে নয়, তিনি এখানেই, আমাদের সকলের অতি নিকটে। ভগবান যেমন সর্বলোকের নিয়ন্তা, স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা তেমনি তিনি সর্বভূতের সুহৃদ—এই ভাব জেনে আমাদের সর্বভূতের সঙ্গে সুহৃদের মতো ব্যবহার করে সকলের হিত সাধনরূপ, কল্যাণকর্মে নিযুক্ত থাকতে হবে তবেই আমরা পরম শান্তি লাভ করব। যিনি সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি বিদ্বান ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর এবং চণ্ডাল—এদের সবাইকে সমান চোখে দেখেন। এদের মধ্যে কোনও ভেদ তাঁরা করতে পারেন না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মা বলছেন : আমজাদ যেমন আমার সন্তান শরৎও তেমন আমার সন্তান। আমজাদ এক ডাকাত এবং শরৎ মহারাজ এক ঋষি। দুজনেই তাঁর সন্তান। দুলে, বাগদি, পাখি পশু সবাইকে তিনি সন্তানরূপে দেখতেন। তিনি বলছেন : একদিন ঠাকুরকে পুজো দিয়েছি মিষ্টি, সন্দেশ। তার উপরে পিঁপড়ে ধরেছে। আমি মিষ্টি থেকে পিঁপড়েটাকেও ছাড়াতে পারছি না। দেখছি সবই যে ঠাকুর। পটেও ঠাকুর, পিঁপড়েতেও ঠাকুর।—এই হচ্ছে অদ্বৈতবোধ। কোনও মানুষ যখন এই তত্ত্বকে বোধে বোধ করেন একমাত্র তখনই তিনি সমদর্শী হন। তখন তাঁর কাছে মানুষও ব্রহ্ম। আবার পোকামাকড়ও ব্রহ্ম। জীবিত অবস্থাতেই তিনি এই সংসার-সমুদ্রের পারে চলে যান। প্রকৃতির খেলার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বৈত, নিত্য, নির্বিকার এবং সর্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবান এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগ সম্পর্কিত যোগ সাধনার কথা অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করছেন। শুরুতে ভগবান প্রকৃত সন্ন্যাসী কে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুদ্ধচিত্তে আত্ম-তত্ত্বের ধ্যান ব্যতীত কেবল কর্ম সন্ন্যাসের দ্বারা মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এখানে কর্মসন্ন্যাসী ও কর্মযোগী উভয়কেই ধ্যানযোগের শিক্ষা দিয়েছেন। উভয় পথেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব। কর্মযোগী ও কর্মসন্ন্যাসী উভয় যোগী ধ্যানযোগ অভ্যাস করে সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি অর্থাৎ সমদর্শী—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবান বলছেন—'যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ' অর্থাৎ সর্বত্র সর্বভূতে এক পরমাত্মা দর্শন যিনি করেন তিনি যোগারূঢ়।

ধ্যানযোগের অনুশীলনের লক্ষ্য চিত্তের চঞ্চলতা দূর করা এবং অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ ঘটিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে সমদর্শী হওয়া। পূর্ব অধ্যায়ের কর্মসন্ন্যাসের প্রসঙ্গ থেকেই বলছেন, যাঁর ভিতরে কামনাবাসনা রয়েছে, কিন্তু বাইরে কর্মত্যাগী, তিনি যোগীও নন এবং সন্ন্যাসীও নন।

যেহেতু অর্জুনের মনে একটা শঙ্কা থেকে যায়—জ্ঞানের পথ অবলম্বন করলে যদি কর্মত্যাগ হয় তাহলে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ এবং কর্মের পথ হীন। কিন্তু জ্ঞানপথ অর্থাৎ বিচারপথ অবলম্বন করে ব্রহ্মবিদ্যালাভ সকলের জন্য নয়। তার জন্য বিশেষ অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। ফলে প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম পরিত্যাজ্য হলেও যোগীর নয়।

তাই ভগবান ধ্যানযোগে পরিষ্কার করে শুরুতে বলছেন, যোগযুক্ত যোগী অনাসক্তভাবে সমস্ত কর্ম করেন। তিনি কর্ম ত্যাগ করেন না, কর্মফল ত্যাগ করেন। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক স্বধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কর্মসম্পাদন করেন, তিনি একাধারে যোগী ও কর্মসন্ন্যাসী।

কিন্তু যিনি বর্ণাশ্রম কর্ম ত্যাগ করেন তিনি যোগীও নয় এবং সন্ন্যাসীও নন। সন্ন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ—এই তিনি যোগই এক এবং তিনেরই মূলকথা সঙ্কল্পত্যাগ। এখানে যোগ বলতে ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ দুই-ই বোঝাচ্ছে। কর্মযোগ হলো ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন—সোঽহংবাদীদের ''আমিই সেই ব্রহ্ম' এই চিন্তা করাও কর্ম। কর্ম ত্যাগ করবার জো নেই। তাই ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করলে কোনও সাধনাতেই সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব অনাসক্ত হয়ে সকল কর্তব্য কর্ম করবেন এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি সহায়ে যোগী মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে ব্রহ্মচিন্তায় অর্থাৎ পরমাত্মায় সমাহিত করে যোগারূঢ় হবেন। যোগারূঢ় ব্যক্তির সকল কর্মত্যাগ অর্থাৎ সম্যকরূপে ইন্দ্রিয় বিষয়-আসক্তি ত্যাগ হয়। যোগারূঢ় ব্যক্তির মন সমাধিযুক্ত হয়। ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা বশীভূত শুদ্ধ মনেই আত্মসমাধি লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গে বলছেন, সব কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।...মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। সুতোয় এতটুকু ফেঁসো থাকলে তা ছুঁচের ভিতর যায় না। তেমনি মনে সামান্য বাসনা থাকলেও তা ঈশ্বরের পাদপদ্ম-ধ্যানে মগ্ন হতে পারে না। বিষয়াসক্ত মনই জীবনে বন্ধনের কারণ। মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁর দর্শন হয়। শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা—শুদ্ধ আত্মাও তা।

অতএব সন্ন্যাস ও যোগ (জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ) উভয়ের মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ আসক্তিশূন্য বা সঙ্কল্পশূন্য হয়ে কর্ম করা। ভগবান বলছেন—তোমাকেই সাধন করতে হবে এবং এই জীবনে আত্মানুভূতি লাভ করতে হবে। তোমার কর্মের জন্য তুমিই দায়ী। তুমি যদি নিজেকে উন্নত কর—তুমিই তোমার বন্ধু, আর তুমি যদি নিজেকে দুর্বল কর—তখন তুমি তোমার শত্রু। মনে দুর্বলতা আসলেই বিষয়ে আসক্তি আসবে। অতএব মনকে একাগ্রভাবে আত্মাতে স্থির করতে হবে। চঞ্চল ও অস্থির মনকে যত্নপূর্বক নিয়মিত করে আত্মার বশে আনতে হবে।

আত্মাতেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দলাভ করে। আত্মজ্ঞানের আনন্দ অপেক্ষা জগতে সুখকর আর কিছুই নাই। আনন্দময় ব্রহ্মে যাঁর চিত্ত লীন হয় তিনি পরম সুখ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়, তিনি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন এবং তিনিই প্রকৃত সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশত সর্বজীবকে ভালবাসেন এবং সর্বভূতের হিত সাধনে তিনি রত হন। প্রকৃত যোগী নিজ আত্মার সঙ্গে সর্বভূতস্থ আত্মার এবং পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব বা অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। তখন তিনি সর্বভূতের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করেন।

সর্বভূতে যোগী কিভাবে একত্ব দর্শন করেন সেই কথা ভগবান বলছেন—'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।'

যোগী সর্বভূতে একই আত্মার অবস্থিতি অনুভব করে নিজের অন্তরে ও বাইরে আত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। তিনি নিজের ও অপরের মধ্যে কোন বৈষম্য দর্শন করেন না। সর্বভূতের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করেন। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুভূতির কথা বলছেন—আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যাথায় ব্যাথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের দেহে যন্ত্রণা অনুভব করছেন অপরের কষ্ট দেখে। শ্রীমা সারদাদেবী সন্তানহারা এক জননীকে দেখে আকুল হয়ে কাঁদছেন।

কিন্তু এই অবস্থা লাভ সহজে হয় না। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত দুস্কর। সেই মনকে কিরূপে বশে আনতে হবে। ভগবান বলছেন মনকে বশে আনার একমাত্র পথ হচ্ছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। নিয়মিত সংযম অভ্যাস করে মনকে একাগ্র করা এবং সেইসঙ্গে বিষয়ে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি দ্বারা মনকে শুদ্ধ ও অন্তর্মুখী করা। এইরূপ শুদ্ধ, একাগ্র, দৃঢ় মন আত্মা-উপলব্ধির সামর্থ্য হয়। তাই এই অধ্যায়ের নাম 'অভ্যাসযোগ'।

অর্জুনের আর একটি প্রশ্ন ছিল অপূর্ব। যোগে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি ভ্রষ্ট হয়ে সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হন তবে তাঁর কি গতি হয়? ভগবান উত্তরে বলছেন—যিনি শুভ কার্যে নিযুক্ত তাঁর কখনও দুর্গতি হতে পারে না। শুভ চেষ্টার ফল কখনও বিফল হয় না। ঐরূপ ব্যক্তি পরজন্মে শুভবাসনা নিয়ে 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে' শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্যযুক্ত পবিত্র গৃহে জন্মলাভ করে পুনরায় শুদ্ধ ও সদিচ্ছাপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হন।

শেষে ভগবান বলছেন, হে অর্জুন! তুমি যোগী হও, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতহিতে রত হও এবং শ্রদ্ধাবান হয়ে আমার আরাধনা, ভজনা ও সেবা কর, তবেই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হবে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও সন্ন্যাসযোগ সাধনায় যোগী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সর্বভূতহিতে রত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হন। অনন্যা ভক্তির মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও ত্যাগ সমস্তই আছে। অতএব সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা ভগবানে সমর্পণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবানের ভজনা ও সেবা করেন তিনিই ভগবানের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ততম এবং তিনিই ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীভগবানুবাচ
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ।। ১

শ্রীভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন) যঃ (যিনি) কর্মফলং (কর্মের ফল) অনাশ্রিতঃ

(আশ্রয় না করে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে) কার্যং কর্ম (আশ্রমোচিত কর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম কর্তব্যকর্ম) করোতি (করেন) সঃ (তিনি) সন্ন্যাসী (সন্ন্যাসী) যোগী চ (এবং যোগী) (কেবল) নিরগ্নিঃ (অগ্নিহীন, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মত্যাগী) ন (নয়) চ অক্রিয়ঃ (সর্ববিধ কর্মত্যাগীও) ন (নয়)।

যিনি কর্মফলের আশা না রেখে নিষ্কামভাবে নিজ কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। কেবল নিরগ্নি (অর্থাৎ যিনি শ্রুতিবিহিত যাগযজ্ঞ ত্যাগ করেছেন) ও অক্রিয় (অর্থাৎ সর্বকর্মত্যাগী) ব্যক্তিই যে সন্ন্যাসী বা যোগী হবেন তা নয়।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ তিনটি শ্লোকে যে ধ্যানযোগের বিষয়ে সূত্রাকারে বলা হয়েছে তারই বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ। নিষ্কাম কর্ম ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন। ধ্যানযোগে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সাধককে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে (অগ্নিহোত্রাদি) নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করে যেতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে এই কর্মযোগেরই প্রশংসা করা হয়েছে।

কে সন্ন্যাসী? কে যোগী? কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে, যে কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে, সে-ই সন্ন্যাসী, সে-ই যোগী। শ্রীভগবান বলছেন, 'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং' – কর্মফল আশ্রয় না করে অর্থাৎ কর্মফলের অপেক্ষা না রেখে, 'কার্যং কর্ম করোতি যঃ'- –নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ও কর্তব্য কর্ম যিনি যথাযথভাবে করেন, যেখানে 'ক্ষুদ্র আমি' বা 'কাঁচা আমি'র ভাব থাকে না। 'বৃহৎ আমি' বা 'পাকা আমি' নিয়ে কর্ম করেন—তিনি কর্মযোগী হয়েও সন্ন্যাসী। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কী? নিত্যকর্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা-উপাসনা ইত্যাদি। আর নৈমিত্তিক কর্ম অর্থ শ্রাদ্ধাদি। এ ছাড়াও গৃহস্থের জন্য শাস্ত্রে পঞ্চযজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে (৩/১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এগুলিও নিত্য করণীয় – ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ। নিষ্কাম কর্মযোগী ফলকামনা না করে এইসব কর্তব্য কর্ম পালন করেন। নিজের জন্য নয়। ঈশ্বরের উদ্দেশে। সব কর্ম ও কর্মফল তিনি ঈশ্বরের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিঃশর্তে।

'যোগ' মানে কী? 'চিত্তগত বিক্ষেপ-অভাবঃ'। চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ বা সমাধি। আমাদের চিত্তে নানারকম বিক্ষেপ থাকে। কখনও আনন্দে থাকি, কখনও দুঃখে। দুটোই বিক্ষেপ—সুখ, দুঃখ দুটোই। চিত্তটা যেন একটা বড় হ্রদ। তাতে অবিরাম তরঙ্গ উঠছে—ছোট, বড়। 'যোগ' মানে হচ্ছে সেই হ্রদকে তরঙ্গশূন্য করা। অর্থাৎ চিত্তে বিক্ষেপ নেই কোনও। যাঁর মন এইরকম শান্ত, নিস্তরঙ্গ তিনিই প্রকৃত যোগী। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি অষ্ট যোগাঙ্গের সাধন করে চিত্তের চঞ্চলতা নিবৃত্ত হয়। আবার ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিষ্কামভাবে কাজ করতে করতে বিষয়াসক্তি দূর হয়। বৈরাগ্যের উদয় হয়। চিত্তের বিক্ষেপ আপনা-আপনি শান্ত হয়ে আসে। সমস্ত মনটা তখন ঈশ্বরমুখী হয়। এই হচ্ছে 'যোগ'। যোগসাধন না করেও নিষ্কাম কর্মী হন প্রকৃত যোগী।

নিষ্কাম কর্মযোগী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকেন। বিড়ালছানা যেমন মায়ের উপর নির্ভর করে। মা কখনও তাকে বাবুর বিছানায় রাখছে। কখনও ছাইয়ের গাদায়। বিড়ালছানা কিন্তু নিশ্চিন্ত। এরকম যে মানুষ তাঁর অহংবুদ্ধি নেই, কর্তৃত্বাভিমান নেই, ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। সন্ন্যাস গ্রহণ না করেও তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।

এই শ্লোকে 'নিরগ্নিঃ' ও 'অক্রিয়ঃ' এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শাস্ত্রে বিধান আছে, সংসারাশ্রমে তিনটি অগ্নি সবসময় জ্বলবে—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি। গৃহস্থ এই তিনটি অগ্নির দেখাশুনা করবেন। এ তাঁর নিত্যকর্তব্যের মধ্যে পড়ে। না করলে প্রত্যবায় অর্থাৎ ত্রুটি হবে। এছাড়াও শাস্ত্রে নানা যাগযজ্ঞের কথা আছে বাসনা চরিতার্থ করার জন্য। সন্ন্যাসী কিন্তু এইসব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তাই তিনি 'নিরগ্নিঃ'। আর 'অক্রিয়ঃ' অর্থ যিনি শুধু নিরগ্নিই নন, তপঃ, দান, পূর্তকর্ম এককথায় সব কর্তব্যকর্মই যিনি ত্যাগ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখা যায়, পিতৃবিয়োগ হয়েছে। কিন্তু তিনি শ্রাদ্ধ করতে পারছেন না। করতে গিয়ে হাত দিয়ে জল গলে যাচ্ছে। গলিত কর্ম। তাঁর কোনও কর্তব্যকর্ম নেই। শাস্ত্রে আছে, নিরগ্নি না হলে সন্ন্যাস হয় না। আবার নিষ্ক্রিয় না হলে যোগী হওয়া যায় না। নিষ্কাম কর্মযোগীর মধ্যে এসব বাইরের লক্ষণ নেই। কিন্তু তাঁর মধ্যে ত্যাগও আছে যোগও আছে। তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় করণীয় সব কর্ম সম্পাদন করেন। তাই তিনি সন্ন্যাসীও বটেন, যোগীও বটেন। এই রকম যোগীরা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ ও প্রকৃত নির্বাসনা লাভ করেছেন। তাঁরা বলেন, 'আমি এই জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করেছি। আমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেছি। আমার আর অন্য কোনও কিছুর উপর নির্ভরতা নেই, জানারও নেই।' এঁরাই সমদর্শী ও মহৎ ব্যক্তি। এঁদের অন্তরে যদি কোনও বাসনা ওঠে তা হলো—মানুষকে সেবা করার বাসনা, মানুষের জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তোলার বাসনা।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।। ২

পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র) (শাস্ত্র) যৎ (যাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস) প্রাহুঃ (বলেন) তং (তাকে) যোগং (কর্মযোগ) বিদ্ধি (জানবে) হি (কারণ) অসংন্যস্ত-সংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হলে) কঃ চন (কেউই) যোগী (কর্মযোগী) ন ভবতি (হতে পারে না)।

হে পাণ্ডুপুত্র! শাস্ত্র যাকে সন্ন্যাস বলে, তাকেই যোগ বলে জেনো। কেননা সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারেন না।

সন্ন্যাস অর্থাৎ সম্যক্ ত্যাগ। বেছে বেছে ত্যাগ নয়। শুধু বাইরের ত্যাগ নয়। মনেরও ত্যাগ। মনের সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগ। গায়ে ছাই মেখে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করলেই সন্ন্যাসী হয় না। সুতোয় এতটুকু আঁশ থাকলে হবে না, তাহলে সুচ দিয়ে গলবে না। অর্থাৎ বাসনার লেশমাত্র থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি, শাল গায়ে দেওয়ার সাধ হয়েছে। ভাবছেন, একটা শাল হলে তো মন্দ হয় না। মথুরবাবু জেনেছেন। একটা দামী শাল এনে দিয়েছেন ঠাকুরকে। ঠাকুর খুব খুশি। গায়ে জড়িয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন : 'অ্যাঁ এ-ই শাল? আমি কি শালের দাস?' শালের উপর পা দিয়ে মাড়াচ্ছেন, থুথু ফেলছেন।

এই হল ত্যাগ। শরীরের ত্যাগ। আবার মনেরও ত্যাগ। কেবল কর্মত্যাগই নয়। কামনা-ত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ। নিষ্কাম কর্মযোগীও ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন। তাই কর্মযোগীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর প্রভেদ নেই। উভয়ের লক্ষ্য বাসনা ত্যাগ। মানুষের বাসনা অন্তহীন, একটা বাসনা পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাসনার সৃষ্টি হয়। তাই সঙ্কল্প ত্যাগ না করলে কেউ যোগী হতে পারবেন না।

অবার মনোবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ মনের বিক্ষেপ শান্ত করার ক্ষমতাই যোগীর প্রধান লক্ষণ। মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগসূত্র'-এর প্রথমেই বলছেন 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। এই চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা ধ্যানযোগেরও মূলকথা সঙ্কল্পত্যাগ, ফলকামনা ত্যাগ। 'অসন্ন্যস্ত সঙ্কল্পঃ'—কর্মফলের সঙ্কল্প অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা যার যায়নি, একটু-আধটু হলেও আছে, তার চিত্ত সমাহিত হয় না। সে যোগী হতে পারে না। কারণ সঙ্কল্পই চিত্তবিক্ষেপের কারণ। সঙ্কল্প থেকেই বাসনা এবং বাসনা থেকেই নানাবিধ সকাম-কর্ম এবং মোহগ্রস্ত অবস্থার উদ্ভব। চিত্তবৃত্তিগুলি চিন্তার তরঙ্গ মাত্র। বাসনার তরঙ্গ। একটার পর একটা বাসনা। এই তরঙ্গের নিরোধই চিত্তশুদ্ধি। নিজের জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করলে রজঃ ও তমোগুণের ক্ষয় হয়। চিত্ত সত্ত্বপ্রধান হয়। চিত্তশুদ্ধি হয় ও সঙ্কল্প ত্যাগ হয় অর্থাৎ সঙ্কল্প নিয়ন্ত্রিত ও সংযত হয়ে থাকে। তাই নিষ্কামকর্ম দ্বারা আসক্তি ত্যাগ পূর্বক ঈশ্বরে চিত্তনিরোধ করবার অভ্যাসই প্রকৃত সাধন।

সুতরাং সন্ন্যাস, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ – এই তিনই এক। তিনেরই মূলকথা সঙ্কল্পত্যাগ অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ। এই হল ভারতের বাণী। গীতায় এই যোগের কথা বলা হয়েছে। এখানে যোগ বলতে ধ্যানযোগ ও কর্মযোগ দুই বোঝানো হয়েছে। উভয়ের মধ্যে প্রকৃত ভেদ কিছুই নাই। বস্তুত ধ্যানযোগ কর্মযোগেরই অঙ্গ এবং কর্মযোগও ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ।। ৩

যোগম্ (ধ্যানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরূঢ় হতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির পক্ষে) কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) কারণম্ উচ্যতে (কারণ বলা হয়) যোগারূঢ়স্য (ধ্যানযোগে আরূঢ় হলে) তস্য এব (তাঁরই) শমঃ (সর্বকর্ম নিবৃত্তি) কারণম্ (কারণ, সাধন) উচ্যতে (উক্ত হয়)।

ধ্যানযোগে আরোহণ করতে ইচ্ছুক মুনির পক্ষে নিষ্কাম কর্মযোগইসিদ্ধিলাভের কারণ। জ্ঞান-যোগারূঢ় (ধ্যাননিষ্ঠ)ব্যক্তির পক্ষে কর্মনিবৃত্তিকে (সিদ্ধিলাভের) কারণ বলা হয়।

যিনি যোগী হতে চান, ধ্যানযোগে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, তাঁকে 'আরুরুক্ষোঃ' বলা হয়েছে অর্থাৎ আরোহণের অভিলাষী। তাঁর সাধন কী? নিষ্কাম কর্মযোগ। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন, কখনই কর্মত্যাগ করেন না। কাজ করেন কিন্তু তিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি যা করেন সব ঈশ্বরের উদ্দেশে। তাঁকে আবার মুনি বলা হয়েছে। তিনি তো সাধক। ফলকামনাত্যাগী সাধকই মুনি। তিনি যোগে আরূঢ় হতে চান। 'যোগ' যেন একটা ভেলা। সেই ভেলায় চেপে তিনি জীবন- সমুদ্র, সংসার-সমুদ্র পার হয়ে যাবেন। যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাঁর লক্ষ্য। তাই নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাস করছেন তিনি। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে নিষ্কাম কর্ম করে যেতে হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে চিত্তের সব বিক্ষেপ শান্ত হয়ে যায়। বাসনার লয় হয়। অহংবুদ্ধির নাশ হয়। বিষয়সুখে তীব্র বৈরাগ্য জাগে। এই তীব্র বৈরাগ্যই যোগ। তিনি তখন যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বলা যায়। যোগ আর ত্যাগ আলাদা জিনিস নয়। যোগ মানেই সবকিছু ত্যাগ। নিজের জন্য তাঁর আর কর্মের প্রয়োজন নেই । কোনও কর্তব্যকর্মও নেই। তাঁর সব কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। তখন যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর মন সহজেই সমাধিলাভ করে । তিনি যোগারূঢ় হন, অর্থাৎ যোগে উপনীত হন। ধ্যাননিষ্ঠ, যোগে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কর্মনিবৃত্তি হয় অর্থাৎ তিনি সব কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। যোগীর হৃদয় তখন শান্ত ও স্থির, আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। তিনি তখন স্থিতধী বা আত্মকাম,তখন তাঁর ঈশ্বরলাভ হয়েছে।

তখন কী হয়? সমস্ত চিত্তবৃত্তির লয় হয়। তিনি তখন অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু বোধে বোধ করেন। সেই অবস্থায় কী অনভূতি হয় তা মুখে বলা যায় না। 'মূক আস্বাদনবৎ' মূক ব্যক্তি যেমন কোনও কিছুর স্বাদ বুঝিয়ে বলতে পারে না, এও ঠিক তাই। যাঁর হয়েছে তিনিই শুধু বুঝতে পারেন। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ।। ৪

যদা হি (যখন) সর্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী (সর্ববিধ সঙ্কল্পত্যাগী সাধক) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) কর্মসু চ ন (কর্মেও আসক্ত হন না) তদা (তখনই) (তাঁকে) যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (বলা হয়)।

যখন সাধক সর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করায় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ এবং কর্মের প্রতি অনাসক্ত হন, তখন তিনি যোগারূঢ় বলে উক্ত হন।

সাধক যখন যোগে সিদ্ধ হয়ে যোগারূঢ় হন তখন তাঁর লক্ষণ কী? জগৎ যে অনিত্য একথা তিনি বুঝেছেন। ব্রহ্ম সত্য, নাম-রূপের জগৎ তাঁর উপর কল্পিত- মাত্র—এই তত্ত্ব তাঁর হৃদয়ে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর মন আর অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের পেছনে ছোটে না। তিনি আত্মতৃপ্ত। তাঁর অভাববোধ নেই। কোনও কিছুর প্রয়োজনও নেই তাঁর। নিত্য-নৈমিত্তিক, সকাম বা নিষিদ্ধ কোনও কর্মেই তাঁর আসক্তি নেই। কারণ তাঁর সব বাসনা দূর হয়েছে। আমরা তো কাজ করি লোভে পড়ে। বাসনায় তাড়িত হয়ে। 'অমুক কাজটা করতে হবে', 'অমুক কাজ করলে অমুক ফল হবে'—এরকম সংকল্প তাঁর মনে ওঠে না।

মহাভারতে আছে—'কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে। ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি।'—হে কাম, আমি তোমার উৎপত্তির কারণ অবগত আছি, তুমি সঙ্কল্প হতে উৎপন্ন হয়ে থাক। সুতরাং আর তোমার সঙ্কল্প করব না। তা হলেই তুমি আর উৎপন্ন হতে পারবে না।

সংকল্প থেকেই কামনা। সঙ্কল্প ত্যাগ হলেই কামনার শান্তি। কামনাবাসনাই চিত্তের বিক্ষেপ তৈরি করে। যতক্ষণ চিত্তের বিক্ষেপ ততক্ষণ মুক্তি নাই। চিত্তের শান্তি মোক্ষের পক্ষে একান্তই কাম্য এবং চিত্তের এই শান্তি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারাই লাভ হয়। সর্বসঙ্কল্প যিনি ত্যাগ করেছেন, বিষয়সুখে ও কর্মে যিনি অনাসক্ত তিনিই যোগারূঢ়। তাঁকে আবার সন্ন্যাসী বলা হয়েছে। কারণ কামনা-ত্যাগই সন্ন্যাসীর প্রধান লক্ষণ। মানুষের পক্ষেই এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব।

যোগারূঢ় ব্যক্তি কী করেন? সমাধির পর প্রায়ই তাঁর শরীর ত্যাগ হয়ে যায়। বাসনা থাকে না বলে শরীরটা আপনা-আপনি খসে পড়ে। কেউ কেউ আবার সমাধি অবস্থা থেকে নেমে আসেন। তাঁরা লোককল্যাণের জন্য কাজ করেন। সংকল্প ত্যাগ মানে ফলের কামনা ত্যাগ, কর্মত্যাগ নয়। যোগারূঢ় ব্যক্তিই যথার্থ কর্মযোগী। যোগে আরোহণ করার আগে তিনি কর্মযোগ অভ্যাস করেছেন। নিষ্কাম কর্ম করেছেন সাধনার অঙ্গ হিসেবে। যোগে সিদ্ধ হয়ে এখন তিনি সর্বভূতে নিজেকেই দেখেন। অথবা সবার মধ্যে তাঁর প্রিয়তমকে দেখেন। তাই তাঁর সর্বভূতে প্রেম। সেই ভালবাসার টানে তিনি পরার্থে অবিরাম কাজ করে যান। তাঁর জীবনটাই হয়ে যায় ধর্ম। তিনি যা করেন তা প্রভুরই কাজ। যা উচ্চারণ করেন সব তাঁরই মন্ত্র। যা-কিছু শোনেন সব তাঁরই বাণী। তাঁর সব কাজই তখন উপাসনা হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।। ৫

আত্মনা (নিজেই নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকেই) (সংসাররূপ সাগর থেকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করবে) আত্মানম্ (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ

(দুর্বল বা অধোগামী করবে না) হি (কারণ) আত্মা এব (আত্মাই, মনই) আত্মনঃ (আত্মার অর্থাৎ নিজের) বন্ধুঃ (বন্ধু, মুক্তির সহায়) আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (নিজের) রিপুঃ (শত্রু)।

মানুষ বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা নিজেই নিজের আত্মাকে (জীবাত্মাকে) সংসার থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু নিজেকে অধোগামী করবে না। কেননা আমিই আমার বন্ধু এবং আমিই আমার শত্রু।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে, যোগের প্রধান লক্ষণ বাসনাত্যাগ ও অনাসক্তি। এখানে ও পরের শ্লোকে যোগের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল আত্মার উদ্ধার । এখানে আত্মা বলতে জীবাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষকারের দ্বারা নিজেই নিজের জীবাত্মাকে উদ্ধার করব। আমিই ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাব।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে অর্থাৎ নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে। এই সংসার-সমুদ্রে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ। তুমিই তোমার ত্রাণ কর্তা। নিজে যদি নিজেকে উদ্ধার না কর, কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমাদের সহজাত প্রবণতা নিজের দুঃখকষ্টের জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো এবং অপরকে দায়ী করা। আমি নিজে কোনও কিছুর জন্যই দায়ী নই। এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে হবে। নিজের কর্মের ফল নিজের ঘাড়েই নিতে হবে। নিজেই নিজেকে উদ্ধার করব এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত গুরুও বলেন, 'আমি তো আছি কিন্তু তুমি অন্তত এক- পা এগিয়ে এসো।' সেই 'এক-পা' কিন্তু আমাকেই এগোতে হবে। সেটুকুও যদি আমি এগিয়ে না যাই তাহলে হবে না।

স্বামীজী বলছেন : তুমি রসায়নটা ভাল করে জানতে চাও। ঘরে বসে তুমি চেঁচাচ্ছ, হে রসায়নবিদ্যা, আমার কাছে তুমি ধরা দাও। আর নিজে কিছু করছ না। তাহলেই কি রসায়নবিদ্যা জেনে যাবে? কিছু জানতে পারবে না, যদি তুমি পড়াশুনা না কর, ল্যাবরেটরিতে গবেষণা না কর। আমরা হয়তো বলব, কে পথ দেখাবে? আমাদের চেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে পথপ্রদর্শকের অভাব হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি, গুরু আপনা-আপনি আসছে। তেমনি আমরা যদি আন্তরিক চেষ্টা করি, গুরু আপনা-আপনি এসে যাবেন। সেজন্য বলছেন: দ্বিতীয় কেউ নেই। তুমিই তোমার ভাগ্যনিয়ন্তা। গুরু আছেন। কিন্তু গুরুও কিছু করতে পারেন না, যদি আমি নিজে চেষ্টা না করি। গুরু কী করেন? তিনি আমাকে পথ চিনিয়ে দেন। কিন্তু সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে তো আমাকেই হবে। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা করেও আমি হয়তো পথ গুলিয়ে ফেললাম। কিংবা কোনও বিপদে পড়লাম। তখন গুরু আমাকে সাহায্য করেন। কিন্তু নিজের চেষ্টা সবসময় দরকার।

তাই ভগবান বলছেন : 'নাত্মানমবসাদয়েৎ'—আত্মাকে কখনও অবসন্ন কোরো না অর্থাৎ তুমি নিজেকে কখনও অবসন্ন কোরো না। নিজেকে দুর্বল, অক্ষম, হীন ভেব না। শাস্ত্রে একেই আত্মহনন বলছে। যে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে সে ক্ষুদ্রই হয়ে যায়। বিশ্বাস কর নিজেকে । তুমিও পার । একজন যদি পেরে থাকে তবে কেন তুমি পারবে না? তুমি কম কিসে? যে শক্তি বুদ্ধের মধ্যে রয়েছে সে শক্তি তোমার মধ্যেও রয়েছে। সেকথা বিশ্বাস কর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : যে শালা নিজেকে পাপী বলে, সে পাপীই হয়ে যায়। কেউ পাপী নয়। আজকে হয়তো ভুল করছে । অন্যায় করছে। কিন্তু যে-কোনওদিন, যে-কোনও মুহূর্তে সে নিজেকে শুধরে নিতে পারে। কার জীবনে কখন যে শুভ মুহূর্ত আসে তা কে বলতে পারে? কাজেই নিজেকে দুর্বল ভাবতে নেই। অক্ষম ভাবতে নেই।

তারপর বলছেন, 'আত্মৈব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মৈব রিপুঃ আত্মনঃ'—কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু অর্থাৎ তুমিই তোমার বন্ধু, তুমিই তোমার শত্রু। বিশ্বাস কর, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তিকে তুমি কাজে লাগাও। তাহলে 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানম্' - নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে। আর তখনই তুমি তোমার বন্ধু। আবার যদি তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র, দুর্বল, অবসন্ন মনে কর তাহলে তুমিই তোমার শত্রু। অন্য কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারে না। কেউ তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। আমি যদি নিজেকে দুর্বল মনে করি, আমি যদি অসংযত হই, উচ্ছৃঙ্খল হই, তাহলে আমিই আমার শত্রু।

শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন : হ্যাঁ, বাইরেও তোমার শত্রু থাকতে পারে। কিন্তু সেই শত্রু তুমিই তৈরি করেছ। তোমার আচরণ, তোমার ব্যবহারেই সেই শত্রু সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবিক, আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলাম তখন তো কেউ আমার বন্ধুও ছিল না, কেউ আমার শত্রুও ছিল না। পরে কেউ কেউ আমার বন্ধু হল, কেউ কেউ আমার শত্রু হল। তা নিশ্চয় আমারই জন্য হয়েছে। কাজেই আমি আমার বন্ধু। আবার আমিই আমার শত্রু। হিন্দুরা আত্মনির্ভরশীল। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমার কর্মের জন্য আমিই দায়ী। আমরা বলি, মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। নিজের সমস্ত কুসংস্কার পুরুষকারবলে দূর করতে পারে। শেষে দেখে, তার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। ভাগ্যের উপর নির্ভরতা নয়। আমার ভাগ্য আমারই হাতে। স্বামীজী বলছেন : যারা কাপুরুষ,বোকা, তারাই ভাগ্যের কথা বলে। কিন্তু যারা বলবান, সাহসী, তারা বলে আমার ভাগ্য আমি নিজেই গড়ে তুলব।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ।। ৬

যেন (যে) আত্মনা (আত্মার দ্বারা অর্থাৎ বিবেকযুক্ত মন দ্বারা) আত্মা এব (আত্মা

দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) জিতঃ (বশীভূত) সঃ আত্মা (সেই আত্মা অর্থাৎ সেই মন) তস্য (সেই) আত্মনঃ (জীবাত্মার) বন্ধুঃ (মিত্র) তু (কিন্তু) অনাত্মনঃ (অনাত্মার অর্থাৎ অজিতাত্মার) আত্মা এব (আত্মাই, অসংযত মনই) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) শত্রুত্বে (শত্রুতায়) বর্তেত (প্রবৃত্ত হয়)।

যে বিবেকযুক্ত মন দ্বারা দেহ-ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে, সেই সংযত মনই জীবের বন্ধু। আবার (জীবের) অসংযত মনই শত্রুর মতো অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবান বলছেন, আমিই আমার বন্ধু , আবার আমিই আমার শত্রু। তাহলে প্রশ্ন: কখন আমি আমার শত্রু? আবার কখনই বা আমি আমার বন্ধু? এখানে সেকথাই বলা হয়েছে। যে আত্মা আত্মাকে জয় করেছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বাহ্য-শত্রুর ন্যায় আত্মার শত্রু। অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে বশে আনতে পারে, তখন সে নিজের বন্ধু হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন সে নিজেকে জয় করতে পারে না, নিজের মনকে বশে আনতে পারে না, তখন সে নিজের অনিষ্টকারী এবং বাইরের শত্রুর মতো হয়ে ওঠে। তাই যখন আমি নিজে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে শিখব তখন আমার প্রকৃত চরিত্র গঠিত হবে এবং আমিই আমার বন্ধু হয়ে উঠব।

আমার মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তিকে যদি আমি কাজে লাগাতে পারি, আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়, তাহলে নিজেকে আমি উদ্ধার করতে পারব, তখন আমি আমার বন্ধু। আর যদি আমি নিজেকে ক্ষুদ্র, দুর্বল, অবসন্ন মনে করি, আত্মবিশ্বাস হারাই—তাহলে আমিই আমার শত্রু। অন্য কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না, আবার অন্য কেউ আমার ক্ষতি করতে পারে না। আমি যদি নিজেকে দুর্বল মনে করি, অসংযত হই, উচ্ছৃঙ্খল হই—তাহলে আমিই আমার শত্রু। আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন : হ্যাঁ, বাইরেও তোমার শত্রু থাকতে পারে, কিন্তু সেই শত্রু তুমিই তৈরি করেছ; তোমার আচরণ, তোমার ব্যবহারেই সেই শত্রু সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবিক, আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছিলাম তখন তো কেউ আমার বন্ধু ছিল না, কেউ আমার শত্রুও ছিল না। পরে যে কেউ-কেউ আমার বন্ধু হল, কেউ-কেউ শত্রু হল—সে নিশ্চয়ই আমার জন্যই হয়েছে। কাজেই আমি আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু। আমার কর্মের জন্য আমিই দায়ী।

আমাদের সকলের মধ্যে এক আত্মা (পরমাত্মা) আছেন। সেই আত্মা শান্ত, নির্বিকার, নির্গুণ, নিরাকার। সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমাদের মন মায়ায় আচ্ছন্ন। তাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি না। মনকে বিষয় থেকে তুলে এনে আত্মায় সমাহিত করতে হবে। তখনই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝতে পারব। আত্মতত্ত্ব বোধে বোধ হলে জানব যে, আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। আমি ইন্দ্রিয়ের দাস নই। আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। সমস্ত কাম্যবস্তু আমি লাভ করেছি। আমি পূর্ণকাম, আপ্তকাম।

ভূমাকে লাভ করে আমি ভূমা হয়ে গেছি। দুদিনের ভোগ-সুখ এখন আর আমাকে মুগ্ধ করতে পারে না। নিজের মধ্যে আমি আনন্দের উৎস আবিষ্কার করেছি। সেই আনন্দে ডুবে আছি সবসময়।

বস্তুত বিষয়াসক্ত মনই জীবের বন্ধনের কারণ এবং বাসনামুক্ত মনই মোক্ষের কারণ। 'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: মানুষ মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। বিষয় মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। দুদিনের ইন্দ্রিয় সুখকেই মানুষ তখন সত্য বলে মনে করে। নিত্য বস্তুকে ছেড়ে অনিত্য বস্তুর পেছনে ছোটে। নিজেকে দেহ বলে মনে করে। এই দেহের বাইরে অন্য কোনও কিছুর অস্তিত্বকে তারা কল্পনাও করতে পারে না। আত্মা, ব্রহ্ম এসব তারা বিশ্বাস করে না। এমন মানুষ নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনে।

মন শুদ্ধ হলে ভগবানের দর্শন হয়। শুদ্ধ মন গুরুর কাজ করে। মানুষকে ভগবন্মুখী করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন: 'মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁর দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, আবার শুদ্ধ আত্মাও তাই। শেষে মনই গুরু হয়।'

বাসনামুক্ত সংযত মন জীবের পরম বন্ধু। আবার বাসনা-জড়িত মনই দুর্জয় শত্রু। শুদ্ধ মন জীবকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করে। আবার বাসনাযুক্ত মন জীবকে সংসারে বদ্ধ করে। তাই বলা হয়— 'বাসনাযুক্ত জীব, বাসনামুক্ত শিব।'

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ।। ৭

জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তির) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু (শীত ও উষ্ণে এবং সুখে ও দুঃখে) তথা (এবং) মান-অপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (অবিচলিত থাকেন)।

জিতেন্দ্রিয় এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি সর্ব অবস্থায় পরমাত্মায় অবিচলিত ও সমাহিত থাকেন।

'জিতাত্মনঃ'—যিনি আত্মাকে জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি নিজের অন্তরের শক্তিসমূহকে জয় করেছেন তিনি জিতেন্দ্রিয় । শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়সকল তাঁর বশে। আত্ম-সংযমের দ্বারা তিনি নিজেকে জয় করেছেন, এমন ব্যক্তির মন প্রশান্ত। কোনও বিক্ষেপ নেই। শান্ত, স্থির । তিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না। সুখেও তাঁর কোনও স্পৃহা নেই। সংসারের কোনও কিছুর প্রতি তাঁর কোনও রাগ বা আকর্ষণ নেই । আবার কোনও কিছুর প্রতি বিকর্ষণও নেই । ভাল-মন্দ,ধর্ম-অধর্ম, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান—এগুলি

পরস্পরবিরোধী বস্তু। একটিকে নিলে আর একটিকেও নিতে হবে। দুই-ই ভগবৎ পথের বাধা। একথা জেনে তিনি উভয়কে ত্যাগ করেছেন । সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত তিনি। সব দ্বৈতবুদ্ধি তাঁর লোপ পেয়েছে। তিনি সুখকে যেমন আনন্দে গ্রহণ করেন, দুঃখকেও সমানভাবেই গ্রহণ করেন । তাই সুখে তিনি উল্লসিত হন না। আবার দুঃখেও মুষড়ে পড়েন না। কারণ সুখ-দুঃখ তাঁর কাছে আলাদা কিছু নয়। একই টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। কেউ তাঁকে সম্মান করলেও তাঁর মাথা ঘুরে যায় না, আবার অপমান করলেও তিনি অসন্তুষ্ট হন না। সবেতেই শান্ত, স্থির । নির্বিকার দ্রষ্টা যেন।

এমন ব্যক্তির মন পরমাত্মায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, সমাহিত। যতক্ষণ আমার কাছে দুই বোধ আছে ততক্ষণ ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান বোধও আছে। আমি দুটোকেই জয় করেছি। কেবল আমিই আছি। আমার আর কেউ নেই। আমার কাছে এ জগৎ নেই। আছে শুধু আমার পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাতে আমি ডুবে আছি। তাঁর সাথে মিলেমিশে আমি একাকার হয়ে আছি। পরিবর্তনশীল বাহ্যজগতের মধ্যে থেকেও আমি অচঞ্চল প্রশান্তি অনুভব করছি। পরম সত্তাকে উপলব্ধি করছি।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।। ৮

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞানলাভে তৃপ্তচিত্ত) কূটস্থঃ (নির্বিকার) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (মাটি, পাথর ও সোনাতে সমদর্শী) যোগী (যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি (ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যোগারূঢ় এ- প্রকার) উচ্যতে (বলা হয়)।

যিনি শাস্ত্রোপদেশলব্ধ জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত, যিনি রূপরসাদি দ্বন্দ্ব বিষয়ে নির্বিকারচিত্ত জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মাটি, পাথর ও সোনায় সমদর্শী, সেই যোগীকে যোগারূঢ় বলা হয়।

আমাদের শাস্ত্র আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেয়। শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সেই আত্মতত্ত্বকে বোঝার নাম জ্ঞান। আর বিজ্ঞান হল বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি। মনন ও বিচারের দ্বারা আত্মতত্ত্বকে বোধে বোধ অর্থাৎ উপলব্ধি করাই হল বিজ্ঞান। 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা'—জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা যাঁর মন তৃপ্ত। মন তো অনেক জিনিস নিয়েই খুশি থাকতে পারে। টাকা পয়সা অনেক হয়েছে, তা নিয়ে পরিতৃপ্ত, বিদ্যা-বুদ্ধি, মান-সম্মান এসব নিয়েও মন তৃপ্ত। তবে আমরা জ্ঞানের সন্ধান করি কেন? কেন ঈশ্বরলাভ করতে এত ব্যস্ত হই? আনন্দ পাব বলে। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। তাঁকে পেলে আমি আনন্দময় হয়ে যাব। আনন্দে আমার মন ভরে যাবে। তারপরে বলছেন: 'কূটস্থঃ'—কোনওরকম বিকার নেই, নির্বিকারচিত্ত। হয়তো চারিদিকে গণ্ডগোল, ঝগড়াঝাঁটি এসব

হচ্ছে। বাইরে গোলমাল, আবার ঘরেও গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু সবেতেই আমি নির্বিকার। নিশ্চল হয়ে বসে আছি। একটা পাহাড়ের চূড়া, তার শীর্ষে আমি চুপ করে বসে আছি। নড়ছি না। এদিক-ওদিক ছুটছি না। শ্রীরামকৃষ্ণ জাহাজের মাস্তুলের পাখির কথা বলেছেন। সব ঘুরে-ফিরে শেষকালে ভাবল: 'না, মাস্তুলই আমার নিজের স্থান। সেখান থেকে এক পাও আমি নড়ব না।' এ-ও ঠিক তাই। আমি স্বস্থানে বসে আছি। অর্থাৎ নিজের মধ্যে ডুবে আছি। বুঝেছি, বাইরে কিছু নেই, সব নিজেরই ভিতরে। বাস্তবিক, গীতাশাস্ত্র কত মূল্যবান। শাস্ত্রের সব জটিল সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে সহজ করে তুলে ধরেছেন। এ যেন ভগবান স্বয়ং এসে বলছেন, 'আমাকে খুঁজছ? এই তো আমি, তোমারই মধ্যে।' তারপরে বলছেন—'বিজিতেন্দ্রিয়ঃ': সব ইন্দ্রিয়কে (কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়) জয় করেছেন যিনি। জয় করেছেন মানে? আমরা তো ইন্দ্রিয়ের দাস। চোখ বারবার এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে। কোথায় কী হচ্ছে তা জানার কী কৌতূহল। আসলে আমাদের শত্রু তো এরাই। আমি এই শত্রুদের জয় করেছি। ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছি।

এরকম যে ব্যক্তি তাঁকেই বলা হয় যোগী। যোগ মানে মিলন। আমার সাথে আপনার মিলন। আমি আর আপনি আলাদা নই, এক। 'যুক্ত ইতি উচ্যতে'—এই যোগীপুরুষকেই যোগারূঢ় বলা হয়। অর্থাৎ এরকম ব্যক্তি ব্রহ্মের সাথে যুক্ত, যোগস্থ। যোগে আমি ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে গেছি। আমার কাছে যে ভিখারি সেই আবার রাজা। আমি এক রূপে খাদ্য খাচ্ছি, আবার আর এক রূপে দিচ্ছি। সমদর্শী আমি। আমার চোখে সব সমান। আমার কোনও বিষয়ভোগে আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার কাছে একখণ্ড মাটি বা একটুকরো পাথর যা, সোনাও তাই। সব এক—'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ'।

যিনি প্রকৃত ত্যাগী, সন্ন্যাসী বা জ্ঞানী, তাঁর কাছে টাকা-মাটি বা মাটি, পাথর ও সোনা সবই সমান। কিন্তু যিনি সংসারী, যাঁর স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় রয়েছে, যাঁর কর্তব্যকর্ম রয়েছে, তাঁর অর্থের প্রয়োজনও আছে। কত প্রাণী তাঁর উপর নির্ভর করে আছে। তিনি নিশ্চয়ই বেশি অর্থোপার্জন করবেন—কিন্তু সদুপায়ে করবেন। সংসারে আমার কর্তব্যকর্ম আছে অথচ আমি মুখে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলছি—এটা প্রকৃত ধর্ম নয়। এটা তামসিক ভাব। কিন্তু অর্থের মোহ, বিষয়ের মোহ যেন আমাকে গ্রাস করতে না পারে, সেটি আমার বিচার। কথা হচ্ছে, অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়। তাদের আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার। তাই ঈশ্বরের প্রতি, ত্যাগের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ তৈরি করতে হবে। তবেই আমি মোহ ত্যাগ করতে পারব সদুপায়ে সম্পদ উপার্জন করে সৎভাবে তা সংসারে ব্যবহার করব। সংসারের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব। তখন আমার মধ্যে প্রকৃত অনাসক্ত ভাব আসবে। শেষে সংসারের প্রতি কর্তব্য শেষ হলে, আমার সমস্ত মন আমি ঈশ্বরে অর্পণ করে যোগী, জ্ঞানী বা ত্যাগী হতে পারব।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ।। ৯

সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষী ও বন্ধুতে) সাধুষু (সাধুতে) পাপেষু অপি চ (এবং পাপীতে) সম- বুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন)।

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষী, বন্ধু, ধার্মিক ও অধার্মিকের প্রতি যিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন তিনিই যোগারূঢ় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

যিনি যোগী তিনি কীরকম মানুষ হবেন? তিনি সমদর্শী। সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষী, বন্ধু, সাধু ও অসাধু সকলের প্রতি তাঁর সমবুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতেই সকলকে তিনি সমান দেখেন। প্রশ্ন হল এঁরা কারা? তার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা আছে।

নিজের প্রতি উপকারের আশা না রেখে যে অন্যের উপকার করে—সে সুহৃৎ। যে নিজ উপকারের আশা রেখে অন্যের উপকার করে—সে মিত্র। আবার নিজের উপকার না হলেও যে অন্যের অপকার করে সে অরি। যে মানুষের ভালোও করে না, খারাপও করে না—সে উদাসীন। দুজন ঝগড়া করছে, মারামারি করছে। যে এদের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়—সে মধ্যস্থ। আবার অন্য লোক আমার ক্ষতি করতে পারে, এই ভেবে আমি আগেই তাকে আঘাত করলাম —এটা বিদ্বেষী। হয়তো একজনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে বা সে আমার আত্মীয়, তাই আমি তার উপকার করছি—এ হল বন্ধু । আর সাধু কে? যে শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, ধার্মিক ব্যক্তি। ঠিক বিপরীত হল অসাধু বা অধার্মিক। অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত কাজ যে করে না, সে-ই অসাধু।

যোগীপুরুষ এদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। যোগীর নিকট শত্রু মিত্র সমতুল্য, অর্থাৎ মিত্রের প্রতি অনুরাগে তিনি আসক্ত হন না, আবার শত্রুকে ঘৃণাও করেন না। সকলের মধ্যে তিনি ব্রহ্মকে দেখেন—'একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। সিংহ যেমন গুহায় লুকিয়ে থাকে তেমনি আমাদের হৃদয়গুহায় পরমাত্মা বা ব্রহ্ম লুকিয়ে আছেন। তাই যোগীর দৃষ্টিতে সবাই সমান। কেউ তাঁর পর নয়। আসলে সব রূপ তো তাঁরই অর্থাৎ ঈশ্বরের রূপ - 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।' ঈশ্বরই জীব জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই যোগী সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ।। ১০

যোগী (ধ্যানযোগী) সততম্ (সবসময়) রহসি (নির্জনে) স্থিতঃ (থেকে) একাকী (একা, নিঃসঙ্গ) যত-চিত্ত-আত্মা (দেহ ও মনকে সংযত করে) নিরাশীঃ (কামনাশূন্য)

অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য হয়ে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করে) আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জীত (সমাহিত করেন)।

যোগীপুরুষ একাকী অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে নির্জনে থেকে দেহ-মন সংযত করে কামনাশূন্য ও অপরিগ্রহ হয়ে চিত্তকে পরমাত্মায় সমাহিত করেন।

পূর্বের শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন কয়েকটি শ্লোকে কীভাবে যোগে আরূঢ় হতে হয়, কীকরে যোগাভ্যাস করতে হয় ভগবান সেই উপদেশ দিচ্ছেন।

যোগী একাকী নির্জনে স্থির হয়ে, সংযত দেহে এবং সংযত চিত্তে, মনের সকল কামনা শূন্য হয়ে এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয়-সংগ্রহ করার সকল আশা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর মনঃসংযোগের অভ্যাস করবেন। উদ্দেশ্য হল, চিত্তকে একাগ্র করা। আত্মায় সমাহিত হওয়া। যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এর জন্য কোলাহল থেকে দূরে থাকতে হয়। নির্জনে একা বাস করতে হয়। 'যতচিত্তাত্মা'— যাঁর দেহ ও মন সংযত, শান্ত। এখানে আত্মা মানে দেহ। 'নিরাশীঃ'—যাঁর 'আশীঃ' অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা দূর হয়েছে। অর্থাৎ বৈরাগ্যবান। দেহ-ইন্দ্রিয় সংযত না হলে বাসনা যায় না। এই দেহকে আশ্রয় করেই তো আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নাম-যশ, ক্ষমতা, ধন-ঐশ্বর্য, ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, আরও কত কী। বাসনার লেশমাত্র থাকলে মন একাগ্র হয় না। জল স্থির না হলে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মন স্থির না হলে ভগবানের প্রকাশ হয় না। যোগী মনের বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—ধ্যান করবে মনে, বনে ও কোণে। ঈশ্বরচিন্তা লোকে যত টের না পায়, ততই ভাল। তিনি একটি উপমা দিচ্ছেন—'ওদেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। কেউ কেউ নেউলের ল্যাজে ইঁট বেধে দেয়। তখন ইঁটের জোরে গর্ত থেকে নেউল বেরিয়ে পড়ে। বিষয়চিন্তা তেমনি যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।' মনকে বাসনামুক্ত করতে না পারলে যোগস্থ হওয়া সম্ভব নয়। তাই যম-নিয়ম-অভ্যাস করতে হয়। এককথায় বলতে গেলে-সংযম অভ্যাস। 'যম' হচ্ছে অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ। অস্তেয় অর্থ চুরি না করা। আর অপরিগ্রহ মানে জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কিছু গ্রহণ না করা। আবার 'নিয়ম' হচ্ছে তপঃ, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ আর ঈশ্বর প্রণিধান। তপঃ অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন-চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। স্বাধ্যায় অর্থ শাস্ত্রপাঠ। শৌচ হল দেহ-মনের শুচিতা। আর ঈশ্বর প্রণিধান মানে ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ।

এইভাবে সংযম অভ্যাস করে দেহ-মনকে বশে আনতে হয়। বিষয়ে দোষ দর্শন করে বৈরাগ্যবান হতে হয়। রসগোল্লা খাচ্ছি, না খেয়ে পারছি না। কিন্তু খেলে ডায়বিটিজ

হতে পারে—এই বিচারের নাম দোষদর্শন। এ বিচার সবসময় করতে হবে। তারপর স্থির আসনে বসে যোগী মনকে আত্মায় স্থাপন করবেন। 'যুঞ্জীত'—সমাহিত, যোগী নিজের মধ্যে নিজে ডুবে যাবেন। নিরন্তর অর্থাৎ অন্তর বা ছেদ নেই। যেমন একজন একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে তেল ঢালছে। 'তৈলধারাবৎ'—ছেদ নেই কোনও, নিরবচ্ছিন্ন। মনটা আত্মচিন্তায় তন্ময় হয়ে আছে। খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়, একটা অখণ্ড বৃত্তি—তদাকারাকারিত।

আমাদের কী হয়? একবার হয়তো মনটা বসল, আবার ছুটে চলে গেল। আবার ধরে এনে তাকে আত্মচিন্তায় লাগানো। এই যে অখণ্ড বৃত্তি, ওটা অভ্যাসের দ্বারা হয়। একদিনে হয় না। চলতে-ফিরতে সবসময় অভ্যাস করতে হয়। তাহলে সহজে হয়ে যায়। যখন যেখানে থাকি, যে-অবস্থায় থাকি এইটা মনে রাখতে হবে – আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি আত্মা। আমার সঙ্গে কেউ হয়তো দেখা করতে এসেছে, কথা বলছে, অপরিচিত। আমি মনে মনে বলব—'এ আমারই আর একটা রূপ। আমি শ্রোতা, আমিই বক্তা। দুই নেই।' এইরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি নয়, একটা প্রত্যয়, একটা দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

তাই ভগবান বলছেন, এইভাবে যোগীকে সর্বদাই নিজের মন এবং অন্তর্জগতের শক্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় গাইতেন—'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। মন, তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।' অর্থাৎ আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছি। সেখানে আমি এবং জগন্মাতা ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। এই হলো মনের উচ্চতম অবস্থা।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ।। ১১

শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরম্ (নিশ্চল, দৃঢ়ভাবে) ন অতি-উচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়) ন অতি-নীচং (অতি নিচুও নয়) চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্ (প্রথমে কুশ, তার উপরে ব্যাঘ্রচর্ম, তারও উপর বস্ত্রদ্বারা রচিত) আত্মনঃ (আত্মার, নিজের) আসনম্ (আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (প্রতিষ্ঠা করে)।

পবিত্র স্থানে (যোগী তাঁর) নিজ আসন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবেন। এই আসন যেন খুব উঁচু বা খুব নিচু না হয়। প্রথমে কুশাসন, তার উপরে মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম এবং সবার উপরে বস্ত্র এইভাবে আসন প্রস্তুত করতে হয়।

যোগাভ্যাসের জন্য আসন কীরকম হবে পরপর দুটি শ্লোকে সেকথাই বলা হয়েছে।

যোগী কোথায় বসে ধ্যান করবেন? ধ্যানের জায়গাটা কীরকম হবে? বলছেন, 'শুচৌ দেশে'—পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিতে হবে। 'স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ'—নিজের জন্য একটি দৃঢ় আসন রচনা করতে হবে। ধুয়ে-মুছে, লেপে শুদ্ধ করে সেখানে একটা আসন পাততে হবে। আগেই বলেছেন, 'রহসি', নির্জনে একাকী ধ্যান করতে হবে। আমরা তো অনেক সময় ধ্যান করি দল বেঁধে। তা নয়, একলা। যোগী ধ্যান করবে 'মনে বনে কোণে'। আসন যেন সমতল স্থানে পাতা হয়। খুব উঁচুও হবে না, আবার নিচুও হবে না। আর কিসের উপর যোগী বসবেন? 'চৈলাজিনকুশোত্তরম্'—'চৈল মানে বস্ত্র আর 'অজিন' মানে ব্যাঘ্রচর্ম বা মৃগচর্ম। অর্থাৎ প্রথমে কুশাসন, তার উপরে একটা মৃগচর্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম এবং সবার উপরে একটা নরম কাপড় পাতা থাকবে। এই আসনে স্থিরভাবে বসে যোগী যোগ অভ্যাস করবেন। কখনও অন্যের আসনে বসবেন না। আবার নিজের আসনেও কাউকে বসতে দেবেন না। এই হচ্ছে বিধি।

মৃত মৃগ বা বাঘের চামড়ার আসনই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু তাকে আমি নিজেই মেরে ফেলেছি বা আর অন্য কেউ মেরেছে এইরকম কোনও প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করা যাবে না। এতে হিংসালেশ হয়। অন্য কোনও কারণে একটা হরিণ বা বাঘ মারা গেছে, কেবল সেই চামড়াই ব্যবহার করা যাবে। অপবিত্র স্থান থেকেও হিংসার দ্বারা সংগৃহীত আসন যোগীর মনে বিক্ষেপ আনবে। পবিত্র স্থানে ও পবিত্র আসনে চিত্তের প্রশান্তি আসে। শুদ্ধ শান্ত একাগ্র মনই সমাধিলাভের উপযোগী।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ।। ১২

তত্র (সেই) আসনে (আসনে) উপবিশ্য (বসে) যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ (অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য সংযত করে) মনঃ (মনকে) একাগ্রং (একাগ্র) কৃত্বা (করে) আত্মবিশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) যোগম্ (ধ্যানযোগ) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করবেন)।

যোগী সেই আসনে উপবেশন করে, মনকে একাগ্র করে, ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াগুলিকে সংযত করবেন অর্থাৎ তিনি জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় হয়ে চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করবেন।

কীভাবে ধ্যান করতে হবে? আসনে কীভাবে বসতে হবে? মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কীভাবে সংযত করতে হবে? যোগ অভ্যাস করে কী ফল লাভ হবে? শ্রীভগবান এইসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে (১২-১৫)।

আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী। সেগুলিকে বাইরে থেকে গুটিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যাহার করতে হবে। 'যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ'—'যতচিত্তঃ' অর্থ আমরা

চিত্তকে আমি সংযত করেছি। বাইরের বস্তু থেকে টেনে এনে আত্মচিন্তায় লাগাতে চেষ্টা করছি। একে বলা হচ্ছে 'ধারণা'। প্রথম প্রথম এটা করতে কষ্ট হয়। হয়তো দু-মিনিট মনটা ব্রহ্মে স্থির রইল আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। আবার হয়তো কিছুক্ষণ স্থির রইল। কিন্তু কঠিন হলেও নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হয়। ব্রহ্মচিন্তা করছি, কিন্তু মাঝে মাঝে ছেদ পড়ছে—এই অবস্থাটার নাম ধ্যান। ধ্যান গভীর হলে সমাধি। তখন মনে একটামাত্র তরঙ্গ থাকে, একটা বৃত্তি—'ব্রহ্মাকারা বৃত্তি'। এ কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি নয়। সবিকল্প বা 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধি। 'যত-ইন্দ্রিয়ঃ'—সব ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি জয় করেছি। চোখ, কান, হাত, পা—এগুলি আর বাইরের দিকে ছুটছে না। আমি কিছু দেখছি না, কিছু শুনছি না, কোনও কথা বলছি না। অনেকে আছেন জপ করছেন, ধ্যান করছেন, তারই মধ্যে আবার ইশারায় কথা বলছেন। না, তা চলবে না। 'যতক্রিয়ঃ'—আমার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত, কোনও বিষয়ক্রিয়ায় লিপ্ত নয়। শরীরকে কোনও কারণেই আমি বিক্ষিপ্ত করছি না। সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রেখেছি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে দেখি, স্বামীজী ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ পঞ্চবটীতে ধ্যান করছেন। গিরিশবাবু কিছুক্ষণ পর দেখেন স্বামীজীর গায়ে একটা কালো কম্বল জড়ানো। আসলে কম্বল নয়। স্বামীজীর সর্বাঙ্গে মশা। কিন্তু তিনি স্থির, অটল। একটুও নড়ছেন না। আমাদের তো আসনে বসলেই গা চুলকাচ্ছে, কাশি আসছে, মশা কামড়াচ্ছে—কত ক্রিয়াকলাপ। তারপর বলছেন, 'তত্র একাগ্রং মনঃ কৃত্বা'— মনকে একাগ্র করে, স্থির হয়ে আসনে বসে, যোগ অভ্যাস করতে হবে। মনটাকে আমি মুঠোর মধ্যে আটকে রেখেছি। আত্মায় তাকে বসিয়ে রেখেছি।

ভগবান বুদ্ধদেব এই ধ্যান প্রসঙ্গে বলছেন :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ।।

অর্থাৎ 'এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক, অস্থি মাংস সব নষ্ট হয়ে যাক। বহুকল্পদুর্লভ আত্মজ্ঞান যতক্ষণ লাভ না হচ্ছে আমি এই আসন ছেড়ে উঠব না।'—এইরকম দৃঢ় সঙ্কল্প চাই।

এখন প্রশ্ন হল, আমি ধ্যান করব কেন? 'আত্মবিশুদ্ধয়ে'—চিত্তশুদ্ধির জন্য। নিজের মনকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছি আমি। চিত্তশুদ্ধি যদি হয় তো সবই হয়ে গেল। আয়নার উপর ধুলো পড়ে আছে। সেটাকে যদি মুছে ফেলতে পারি নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাব। তেমনি চিত্তশুদ্ধি হলে সেই শুদ্ধ চিত্তে আমার স্বরূপ প্রকাশ পাবে। আত্মজ্ঞান লাভ করব আমি।

এতক্ষণ যা আলোচিত হল তা যদি এককথায় বোঝানো যায়, তা হল সংযম। সংযম

মানে আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ। এই সংযম অভ্যাস করতে হবে। বাক্‌সংযম, মনের সংযম, চিন্তার সংযম, রসনার সংযম, ব্যবহারের সংযম, জীবনযাত্রার সংযম। দরকার হলে নিজেকে পীড়ন করতে হবে। এই সংযম অভ্যাস করার শক্তিটা কোথা থেকে আসবে? আমার ভেতর থেকে । এ শক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না। নিজের ভেতরেই তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। একাজ আমাকেই করতে হবে। ঈশ্বর আমার মধ্যেই বিরাজ করছেন, কিছু প্রতিবন্ধক থাকায় তিনি ব্যক্ত হতে পারছেন না। নিজেকেই এই বাধাগুলি দূর করতে হবে, তাহলেই ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত হবেন। ধর্ম বা শাস্ত্র সম্বন্ধে যা-ই বলা হোক-এটাই ধর্মের মূল কথা।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ।। ১৩

কায়-শিরঃ-গ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গ্রীবা) সমং (সরল) অচলং (নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (ধারণ করে) স্থিরঃ (স্থির হয়ে) স্বং (স্বীয়) নাসিকা -অগ্রং (নাসিকার অগ্রভাগে) সংপ্রেক্ষ্য (দৃষ্টি রেখে) দিশঃ চ (ও দিকসমূহ) ন অবলোকয়ন্ (দৃষ্টিপাত না করে)।

(যোগী) শরীরের মেরুদণ্ড, মস্তক ও গ্রীবাকে সোজা ও নিশ্চলভাবে রেখে, নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করে, অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে অবস্থান করে।

যোগাভ্যাসের সময় আসনে কীভাবে বসতে হবে সেকথা এখন বলছেন। যোগাসনে বসার একটা আলাদা ভঙ্গি আছে। আসনে বসে দেহকে সোজা রাখতে হবে। 'সমং কায়-শিরঃ-গ্রীবং'—মেরুদণ্ড, মস্তক আর গ্রীবা একটা সরলরেখায় থাকবে। 'অচলং'--নড়ছে না। পাহাড়ের মতো অচল। কেউ যেন একটা পাহাড়কে বসিয়ে রেখে গেছে। 'ধারয়ন্ স্থিরঃ'—স্থিরভাবে শরীরটাকে ধরে রেখেছি। শরীরটা যেন বাঁধা আছে সেখানে। আর দৃষ্টি কোনদিকে? বলছেন, 'নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য' —অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি স্থির আছে নাসিকাগ্রে। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে কে আছে বা কে নেই, আমি কিছু দেখছি না। 'দিশঃ চ ন অবলোকয়ন্' অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে। অর্থাৎ বাইরের কিছু দেখছি না। ধ্যানের বিষয় বাইরে নয়, তাই অন্তরে দেখছি। ধ্যানের বিষয় আত্মা। মনের একাগ্রতা যাতে বাড়ে সেইজন্যই দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির । বুদ্ধদেবকে যেমন দেখি, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি। ধ্যান করছেন। যখন হাঁটতেন তখনও নাকি তাঁর দৃষ্টি পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে থাকত । এদিক-ওদিক তাকাতেন না।

এই যে যোগাসনে বসার একটা বিশেষ ভঙ্গি, এর উদ্দেশ্য কী? মনকে সংযত করা। সংযত মনে আত্মচিন্তা করা। এই সংযমটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার। প্রথমে একটা সংকল্প করে নিয়ে আরম্ভ করতে হয়। অনেকে আছেন প্রতি রবিবার উপবাস করেন। অথবা বাক্‌সংযম করেন। ঐদিন কথা বলেন না। গান্ধীজী রবিবার মৌন থাকতেন। কথা

বলতেন না। এইরকম প্রথম প্রথম করে নিতে হয়। একটা নিয়মে নিজেকে বেঁধে রাখতে হয়। তারপরে আপনা-আপনি সব এসে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধ্যানের সময় ও আসন সম্বন্ধে বলছেন—প্রত্যুষে ও শেষরাতে ধ্যান করা ভাল এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়। পদ্মাসনে (সাধারণভাবে) বসে, বাম করতলের উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ রেখে, উভয় হস্ত বক্ষে ধারণ করে, চোখ বুজে সাকার ধ্যান করতে হয়। আবার ঐ আসনেই বসে, বাম ও দক্ষিণ করপৃষ্ঠ বাম ও দক্ষিণ জানুর উপর রেখে, প্রত্যেক হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ যোগ করে, অপর অঙ্গুলিগুলি সোজা রেখে, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রেখে নিরাকার ধ্যান করতে হয়।

তবে শ্রীরামকৃষ্ণ একটা কথা বলতেনঃ সুখাসনে। অর্থাৎ যে-আসনে বসে তুমি আরাম বোধ করছ সেইভাবে বসো। আসলে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে ধর্মজীবনটাকে তিনি অনেক সহজ করে দিয়ে গেছেন। তা নাহলে এভাবেই বসতে হবে, শরীর ও মাথা সোজা থাকবে, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি থাকবে—এতকিছু করতে গেলে মনটা হয়তো তাতেই পড়ে থাকবে। শেষে দেখব আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ। আমি মনকে সংযত করতে পারিনি। তাই প্রথম প্রথম কিছুদিন করে নিতে হয়। কিন্তু একবার যদি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা হয়, বইয়ে পড়েছি বলে নয়, কেউ বলেছে বলে নয়, একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা, তখনই সুখাসন। ওরকম হাত-পা বেঁধে বসা নয়। যেখানে বসে আমি আরাম পাচ্ছি, আমার মন ঈশ্বরচিন্তায় ভরপুর হয়ে আছে, সেখানে বসেই তাঁর চিন্তা করব। তাঁকে ভালবাসব। এতদিন আমি তাঁকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম। খুঁজছিলাম তাঁকে। হঠাৎ যেন তিনি পেছন থেকে এসে ধরা দিলেন—'এই তো আমি! কোথায় খুঁজছ আমাকে ?' তখন দেখি যাঁকে খুঁজছি তিনি বাইরে নন, আমারই মধ্যে। এখন আমি সব নিয়মের ঊর্ধ্বে।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।। ১৪

প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) বিগতভীঃ (যেখানে ভয়ের কোনও কারণ নেই) ব্রহ্মচারী-ব্রতে (ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবাদিতে) স্থিতঃ (অবস্থিত, প্রতিষ্ঠিত) মৎ-চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎ-পরঃ (মৎপরায়ণ) মনঃ (মন) সংযম্য (সংযত করে) যুক্তঃ (সমাহিতভাবে) আসীত (অবস্থান করবেন)।

প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক, ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত, মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ যোগী, মন একাগ্র করে, নিত্য ধ্যান অভ্যাস করবেন।

কীভাবে যোগাভ্যাস করতে হয় সেকথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে চলেছেন। ভগবৎচিত্ত, ভগবৎ পরায়ণ না হলে যোগে যুক্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্যই এর প্রধান সাধন।

'প্রশান্ত-আত্মা'—যাঁর মন শান্ত, স্থির। কোনও বিক্ষেপ নেই সেখানে। মন নিয়েই তো আমাদের লড়াই। সেই মনটাকে স্থির করে রেখেছি। বিগতভীঃ—সমস্ত ভয় যাঁর মন থেকে মুছে গেছে। 'ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ'—যিনি ব্রহ্মচর্যে স্থিত। স্থিত মানে প্রতিষ্ঠিত। তার মানে ব্রহ্মচর্যে আমি স্থির হয়ে আছি। শিকড় গেড়েছি, নোঙর ফেলেছি সেখানে। ব্রহ্মচর্য কী ? গুরুসেবা ও সংযম অভ্যাস। কারোর কাছ থেকে শেখা নয়। মনে মনে আমি একটা সংকল্প করেছি—আমি ব্রহ্মচারী হব। সংযম অভ্যাস করব। ব্রহ্মচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া আর অন্য কোনও চিন্তা করব না। 'মনঃ সংযম্য' এইভাবে মনকে বেঁধে রাখতে হবে।' 'মৎচিত্তঃ—মদ্গতচিত্ত, ঈশ্বরগতচিত্ত। 'মৎ' মানে আমাতে। এখানে আমি মানে ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। মৎচিত্ত মানে যাঁর মন ঈশ্বরে ডুবে গেছে। ভগবান বলছেন, যোগী এমন ধ্যান করছেন যে, তাঁর সমস্ত মনটা আমাতে লীন হয়ে গেছে। ভাগ্যবান যাঁরা তাঁরাই পারে মনকে এভাবে ঈশ্বরে ডুবিয়ে দিতে। তিনি আমার পর নন। তাঁর সঙ্গে আমি মিশে যেতে চাইছি।

তারপর বলছেন, 'যুক্ত আসীত মৎপরঃ'। 'যোগ' মানে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। আলাদা নই আমি। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি। 'মৎপরঃ'—আমিই (ঈশ্বরই) যাঁর একমাত্র প্রিয়। অর্থাৎ ঈশ্বরই আমার প্রিয়, আমার আরাধ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (১/৪/৮) : 'এই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়তর, এই আত্মা সমস্ত বস্তু থেকে প্রিয়তম।' মন যেন একটা পাখি। আর আত্মা বা ঈশ্বর একটা গাছ। মন-পাখি ওই গাছের ডালে স্থির হয়ে বসে আছে। নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছি আমি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিচ্ছেন। সকল সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব। এটাই মানবজীবনের পরম প্রাপ্তি। ঈশ্বরই সকল জীবের অন্তরাত্মা। এই জীবনে, এই শরীরে সেই আত্মতত্ত্ব অনুভব করতে হবে। আত্মতত্ত্বের শিক্ষা গুরু থেকে শিষ্যে—এই ধারাই বয়ে আসছে ভারতবর্ষে। যেমন হিমালয় থেকে গঙ্গার ধারা নেমে আসছে। সমস্ত ভারতের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ। তেমনি এই গুরু-শিষ্য ধারা। একটা প্রস্রবণ যেন। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বয়ে চলেছে । এই শিক্ষাই আমাদের সম্বল।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ।। ১৫

এবং (এইভাবে) যোগী (যোগী) সদা (নিরন্তর) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) আত্মানং (নিজেকে, মনকে) যুঞ্জন্ (সমাহিত করে) মৎসংস্থাম্ (আমাতে স্থিত) নির্বাণ-পরমাং (পরম নির্বাণরূপ) শান্তিং (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

এইভাবে মনকে সর্বদা পরমাত্মায় সমাহিত করে সংযতচিত্ত যোগী নির্বাণরূপ পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

'যুঞ্জন্ এবং সদাত্মানং'—মনকে সবসময় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখতে হবে। 'যোগ' কথাটার অর্থই তো তাই। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছি আমি। মনটাকে আত্মাতে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি। 'নিয়তমানসঃ'—'নিয়ত' কথাটার দুটো অর্থ আছে। 'নিয়ত' মানে সবসময়। আবার 'নিয়ত' মানে সংযত। নি-যম্ ধাতু। অর্থাৎ আমার মন শান্ত। কোনও চঞ্চলতা নেই । মনটা কোথায় রাখা আছে? 'মৎসংস্থাম্'—আমাতে স্থিত অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে আমি জেনেছি। আমি আমাকে পেয়ে গেছি। 'নির্বাণ'ই সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ মোক্ষপদ। সেই অবস্থা লাভ হলে সব বাসনার লয় হয়। মানুষ পরম শান্তি লাভ করে—'নির্বাণ-পরমাং শান্তিং অধিগচ্ছতি।' ভগবান বলছেন, আমাতে (ভগবান পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে) যিনি চিত্ত সমাহিত করেন তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

আগের শ্লোকগুলিতে বারবার এই সংযমের কথা বলা হয়েছে। একই জিনিস বারবার শুনলে মনে একটা দাগ পড়ে যায়। এই যে অভ্যাসযোগ, এর সবটাই মনের ব্যাপার। 'মন'টাকে কোনওরকমে বেঁধে রাখা, সংযত করা। মন দিয়ে মনকে আবদ্ধ করা। স্বামীজী বলতেন : 'আমার হাতে যদি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থাকত তবে আমি প্রথমে ধ্যান করতে শেখাতাম। বাস্তবিক, যদি আমার মন চঞ্চল থাকে, মনের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে সামনে বই খোলা রয়েছে অথচ আমি কিছুই পড়ছি না। আবোল-তাবোল চিন্তা করছি। তাই স্বামীজী ধ্যানের উপর এত জোর দিয়েছেন। ধ্যান অভ্যাস করতে করতে মন আপনা-আপনি শান্ত হয়। সেই শান্ত মন তখন যে-কোনও কাজে লাগানো যায়। শান্ত, শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের স্বরূপ বোধে বোধ হয়। আবার যোগ মানে অতিমাত্রায় কৃচ্ছ্রতাসাধনও নয়, অথবা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির স্রোতে ভেসে যাওয়াও নয়, অর্থাৎ মধ্যপন্থা বা মধ্যবর্তী পথ। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, শান্ত ও সমাহিত মন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগ সম্পর্কে বলছেন—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে—সর্বদাই আত্মস্থ। তিনি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে পরমাত্মাতে স্থির করা করেন। তাই যোগী প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির-আসনে অনন্যমন হয়ে ধ্যান করেন। তখন এভাবে মনকে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ ও শান্ত করে ব্রহ্মে সমাহিত করেন। তাঁর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, তিনি মোক্ষ অর্থাৎ পরম-নির্বাণ লাভ করেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ।। ১৬

অর্জুন (হে অর্জুন) অতি-অশ্নতঃ (অতিভোজনকারীর) তু (কিন্তু) যোগঃ (যোগ, ধ্যান) ন অস্তি (হয় না) একান্তম্ ন-অশ্নতঃ (একেবারে অনাহারীরও) ন (হয় না) অতি-স্বপ্নশীলস্য চ (ও অত্যন্ত নিদ্রালুর) ন (হয় না) জাগ্রতঃ এব চ (এবং অতি জাগরণশীলেরও) ন (হয় না)।

হে অর্জুন, যিনি অত্যধিক আহার করেন আবার যিনি একেবারেই অনাহারী, তাঁদের কারোরই যোগ হয় না। যিনি অত্যন্ত ঘুমোন বা একেবারেই যাঁর ঘুম হয় না, তাঁদেরও যোগসমাধি হয় না।

শ্রীভগবান এতক্ষণ (১০-১৫ শ্লোকে) কীভাবে যোগ অভ্যাস করতে হয় সেকথা বলেছেন। এখানে পরপর দুটি শ্লোকে যোগীর আচরণ কীরকম হওয়া উচিত তার উপদেশ দিচ্ছেন। বলছেন: 'অতি-অশ্নতঃ'—অতিরিক্ত যে খায়। অশন্ মানে খাওয়া। আবার 'ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ'—একেবারে খায় না—এও ঠিক নয়। একজন খুব বেশি খায়, আর একজন মোটেই খায় না—এরকম মানুষ কখনও যোগী হতে পারে না। যোগী পাকস্থলীর দুভাগ খাদ্যের দ্বারা, একভাগ জলের দ্বারা, আর বাদবাকি একভাগ বায়ু-চলাচলের জন্য খালি রাখেন। তারপরে বলছেন: 'ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য'—স্বপ্ন অর্থাৎ ঘুম। যারা অতিরিক্ত ঘুমোয় তাদেরও যোগ হয় না। অনেকে এমন থাকে যে, ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। সকালে ঘুমোচ্ছে, দুপুরে ঘুমোচ্ছে, রাতেও ঘুমোচ্ছে। বেশি ঘুমোনোও ঠিক নয়। আবার 'জাগ্রতঃ ন এব চ'—সবসময় জেগে থাকা, মোটেই না ঘুমানো, এও খারাপ। যারা সবসময় ঘুমোয় বা কখনোই ঘুমোয় না, এদের কারোরই যোগ অভ্যাস হয় না। আসলে মধ্যপন্থা মেনে চলা উচিত। দুটোর মাঝামাঝি যে অবস্থা তাই আমাদের পথ।

যোগীর সব কাজের মধ্যে সংযমের ছাপ থাকে। যোগীর জীবন হবে সংযত। মনে হতে পারে, এত কথা না বলে এককথায় বলে দিলেই তো হত, 'তুমি সংযত হও।' আসলে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য শ্রীভগবান একই কথা নানাভাবে বলেছেন। এ উপদেশ শুধু অর্জুনের জন্য নয়। আমাদের সকলের জীবনে খাটে। যোগী হতে হলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিজেকে সংযত করতে হবে। যোগীর সকল কাজ হবে পরিমিত ও সংযত।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ।। ১৭

যুক্ত-আহার-বিহারস্য (পরিমিত আহার ও বিহারকারীর) কর্মসু (কর্মসমূহে) যুক্ত-চেষ্টস্য (নিয়মিত চেষ্টাকারীর) যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণকারীর) যোগঃ (যোগ অর্থাৎ ধ্যান) দুঃখ-হা (সংসারদুঃখনাশক) ভবতি (হয়)।

যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং সকল কাজকর্মের চেষ্টা নিয়মিত, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত (কালে ও পরিমাণে নির্দিষ্ট), ধ্যানই তাঁর সংসার-দুঃখনাশ করে।

যোগীর আহার, বিহার, কর্ম, নিদ্রা, জাগরণ সবই পরিমিত ও নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্'—অতিরিক্ত কোনওকিছুই ভালো নয়। সব কাজকর্মের ভিতর একটা সমতা থাকা চায়। বলছেন : 'যুক্ত-আহার-বিহারস্য'— আহার ও বিহার দুই-ই সংযত কর। যুক্ত মানে মাপা, পরিমাণমতো। বলছেন না যে, খাবে না বা ঘুমোবে না। সবই করবে, কিন্তু মাপমতো করবে। খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম সবই পরিমিত হওয়া চাই। কোনওকিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। 'যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু'—আবার কাজকর্মও পরিমিত ও নিয়মিত হবে। হয়তো আমি কোনও কাজ করছি। তারজন্য চেষ্টা করতে হয়। পরিশ্রম করতে হয়। আমি এতটাই পরিশ্রম করব যতটা আমার শরীর নেবে। আসলে সাধ্যের অতিরিক্ত কোনওকিছুই করা উচিত নয়। তারপর বলছেন: 'যুক্তস্বপ্নাববোধস্য'—তোমার ঘুমানো এবং জেগে থাকা দুই-ই ঠিক ঠিক হওয়া চাই। কোনওকিছুরই অনিয়ম ভালো নয়। যখন তখন ঘুমিয়ে পড়া অথবা জেগে থাকা দুই-ই খারাপ।

অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধন যেমন ভালো নয়, তেমনি আবার অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগও ভালো নয়। মধ্যপথই অনুসরণীয়, বুদ্ধদেব যে-পথকে বলছেন—মধ্যপন্থা। স্বাভাবিক জীবন অর্থাৎ শরীর সুস্থ রাখতে গেলে সবই যথাযথ হওয়া উচিত। শরীর যদি ভালো না থাকে তবে ঈশ্বরের নাম করতে পারা যায় না। আবার হয়তো ধ্যান করতে বসলাম, খুব ঘুম পেয়ে গেল। ধ্যান আর হল না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : খাওয়া, ঘুম, বেড়ানো, কাজ করা—প্রভৃতি সব কাজই নিয়ম করে করতে হয়। এ ছাড়াও রোজ কিছুটা সময় আমি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ব। বেশি না করতে পারি, খানিকটা পড়ব। কিন্তু নিয়ম করে পড়ব। আবার রোজ নির্দিষ্ট সময়ে আমি যোগ অভ্যাসও করব। যাতে মন আমার বশে আসে। আসলে আমাদের জীবনটা তো এলোমেলো। তাই যদি নিয়ম মেনে চলি তাহলে শরীর ভালো থাকবে, মনও ভালো থাকবে। আমি পড়াশুনা করতে পারব, অনেক কাজও করতে পারব। আবার অনেক ধ্যান-জপ অর্থাৎ যোগ অভ্যাসও করতে পারব। এই যোগের দ্বারা কী হবে? আমার সব দুঃখ দূর হবে—'যোগঃ ভবতি দুঃখহা'— শরীরের দুঃখ, মনের দুঃখ দুই-ই হরণ করে নেবে। আমি পরমানন্দে দিন কাটাব। আধ্যাত্মিক জীবন গড়তে গেলে ভগবানের এই উপদেশগুলি আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ।। ১৮

যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষভাবে সংযত) চিত্তম্ (মন) আত্মনি-এব (আত্মাতেই)

অবতিষ্ঠতে (অবস্থিত হয়) তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ (সকল কামনা থেকে) নিঃস্পৃহঃ (নিবৃত্ত ব্যক্তি) যুক্তঃ (সমাহিত) ইতি (এইরূপ) উচ্যতে (উক্ত হন)।

যখন যোগীর চিত্ত সংযত এবং সকল কাম্যবিষয়ে স্পৃহাশূন্য তখন তাঁর মন বাহ্য বিষয় থেকে উপরত হয়ে আত্মাতেই একান্তভাবে অবস্থান করে। তখনই ঐ যোগীপুরুষকে যোগসিদ্ধ (আত্ম-সমাহিত) বলা হয়ে থাকে।

কখন যোগিপুরুষকে যোগসিদ্ধ বলা যায়? এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন: যোগীপুরুষ প্রথমে তাঁর মনকে বাইরের বিষয় খেকে তুলে আনেন, তারপর সেই মনকে আত্মায় সমাহিত করেন। তখনই তিনি যোগসিদ্ধ হন। সত্যিই গীতাশাস্ত্র সবদিক থেকে অনন্য। এর তুলনা হয় না। আমাদের কেমন ধীরে ধীরে লক্ষের দিকে নিয়ে যচ্ছেন।

মনটা আমার কেমন হবে? বলছেন: 'বিনিয়তং'—বিশেষভাবে সংযত। মন আমার হাতের মুঠোয়। সেই মনকে আমি কোথায় রাখব? 'আত্মনি অবতিষ্ঠতি' আত্মাতে রেখে দিয়েছি। মন আর এখন এলোপাথারি ঘুরে বেড়ায় না। তার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেখানেই স্থির হয়ে বসে আছে সে। মনকে আমি আমার মধ্যে [অর্থাৎ আত্মাতে] বেঁধে রেখেছি। মন তুই আমার কাছে থাক। আর কোথাও যাস না। এ যেন ফুলের উপর মৌমাছি বসেছে। আত্মা যেন একটা ফুল। মন সেই ফুলে অর্থাৎ আত্মাতে বসে আছে। তারপরে বলছেন: 'নিস্পৃহঃ'—কোনও স্পৃহা নেই। কোনও কিছুর প্রতি লোভ নেই। কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই। কিছু চাই না আমি। শ্রীশ্রীমা বলতেন : যদি ভগবানের কাছে কিছু চাইতেই হয় তাহলে বলবে, আমাকে নির্বাসনা দাও। কী চাইব? কেন চাইব? তাঁর কাছে পড়ে আছি। যা দরকার তিনি দেবেন। 'সর্ব-কামেভ্যঃ'—কামনা-বাসনার প্রতি আমার কোনও মোহ নেই। সকল বস্তু থেকে আমি উদাসীন। সব তো অনিত্য, ক্ষণিক। এসব নিয়ে আমি কী করব? নচিকেতা যেমন বলছেন, 'তবৈব'—তোমারই থাকুক। যম নচিকেতাকে অনেক প্রলোভন দেখাচ্ছেন—তুমি স্বর্গে যাবে, অনন্ত জীবন লাভ করবে, ভোগ-সুখ পাবে, তোমার সমৃদ্ধি হবে। তখন নচিকেতা বলছেন:'তবৈব'। আসলে সবকিছু থেকে আমার মন সরে এসেছে। সেই মনকে আমি ঈশ্বরের পায়ে সঁপে দিয়েছি। 'যুক্ত ইতি উচ্যতে তদা'—ঈশ্বরের সাথে আমি যুক্ত হয়ে আছি। আত্মসমাহিত। তাঁর সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আমি ডুবে আছি। ঈশ্বরের মধ্যে আমি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছি।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ।। ১৯

যথা (যেমন) দীপঃ (প্রদীপ) নিবাতস্থঃ (বায়ুশূন্যস্থানে) ন ইঙ্গতে (কম্পিত হয় না) আত্মনঃ (আত্মার, অন্তঃকরণের) যোগম্ (নিরোধ) যুঞ্জতঃ (অভ্যাসকারী) যোগিনঃ (যোগীর) যতচিত্তস্য (সংযতচিত্তের) সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (জানবে)।

বাতাসহীন স্থানে প্রদীপের শিখা যেমন কাঁপে না, চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাসকারী আত্মযুক্ত যোগীর সংযত মনও সর্বদা সেইরূপ স্থির থাকে।

শ্রীভগবান যোগীদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি যোগী, যোগ অভ্যাস করছ। তোমার মন কীরকম থাকবে? তুলনা দিয়ে বলছেন, বাতাসহীন স্থানে প্রদীপ শিখার মতো। হয়তো এমন একটা জায়গায় প্রদীপ আছে যেখানে বাতাস নেই। সেখানে প্রদীপের শিখা হেলছে না, দুলছে না। একেবারে স্থির। আমাদের মনও ঐ প্রদীপের শিখার মতো। বিষয়ের আকর্ষণে ভোগবাসনার দ্বারা চঞ্চল হয়ে উঠে। কামনা দূরীভূত এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হলে মন ঈশ্বরের পাদপদ্মে স্থির হয়। তখন আমার মনে কোনও প্রলোভন নেই। তাই আমার মনে চঞ্চলতাও নেই। আমি যে চঞ্চল হব, ছটফট করব তার অবকাশই নেই কারণ মন তখন আত্মায় নিবিষ্ট রয়েছে।

তারপরে ভগবান বলছেন 'যতচিত্তস্য যোগিনঃ'—যাঁরা যোগী, যাঁদের মন সংযত হয়েছে। যোগী অভ্যাসের দ্বারা মনকে বশে এনেছেন। তাঁর মন নিজের মধ্যেই স্থির হয়ে আছে। 'আত্মনঃ যোগম্ যুঞ্জতঃ'—তাঁর মন ঈশ্বরের পাদপদ্মে যুক্ত। মনটা সেখানে পড়ে আছে। 'যোগ' কথাটার মানে হচ্ছে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যোগ। আমি ঈশ্বরের চিন্তা করছি। সেখানে ডুবে আছি। ভগবান তিনি আমার কাছে এসেছেন। আমি তাঁতে এমনই ডুবে আছি, মজে আছি যে, ছাড়তে চাইছি না। তিনি আমাকে কিনে নিয়েছেন। তাঁর ভালবাসায় আমি বাঁধা পড়ে গেছি।

গোটা অধ্যায়টাতে শুধু সংযম আর যোগের কথাই বলা হয়েছে। এই হল ধর্মের মূল কথা। তাই প্রতিটি মানুষেরই চিত্তসংযম প্রয়োজন, অন্তত কিছুটা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দৈনন্দিন স্বাভাবিক কর্মজীবনও সুন্দর গড়ে উঠবে। নিজের চিত্ত সংযত না হলে যোগ হয় না। যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে একাকার হয়ে যাওয়া। সংযত একদিনে হয় না। অভ্যাস করতে হয়। পারব না, আমার দ্বারা হবে না—এসব ভাবতে নেই। অভ্যাস করলে আপনা-আপনিই আত্মোপলব্ধির সামর্থ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ।। ২০

যত্র (যে অবস্থায়) যোগ-সেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং (যোগ অভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (উপরত, নিষ্ক্রিয় হয়) যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা এব (শুদ্ধ মন দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্ট হয়)।

যে অবস্থায় যোগ-অভ্যাস দ্বারা যোগী সম্পূর্ণরূপে চিত্ত বৃত্তিশূন্য করে শান্তভাবে অবস্থান করেন এবং যে অবস্থায় শুদ্ধ মন অর্থাৎ আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন যোগী আত্মাতেই অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাতেই পরিতুষ্ট হন (তাকেই যোগ বলে জেনো)।

এখনও সেই একই প্রসঙ্গ চলছে—মনকে সংযত করা। কীভাবে মনকে বশে আনতে হয়? 'যোগসেবয়া'— যোগ অভ্যাসের দ্বারা। যোগ যেন একটা নেশা। অনেকে আছেন যোগ অভ্যাস না করলে তাঁদের ভালো লাগে না। একদিন যদি ধ্যানজপ করতে তাঁরা ভুলে যান বা কম করেন, তাতে তাঁদের মন খারাপ হয়ে যায়। যোগ অভ্যাসের দ্বারা মন শান্ত হয়—'চিত্তম্ নিরুদ্ধম্'। আমার মন এখন শান্ত, স্থির। এদিক-ওদিক আর ছুটে বেড়ায় না, পুরোপুরিই আমার বশে। অনেক সময় দেখা যায় যোগী ধ্যানে স্থির হয়ে আছেন। নিঃশ্বাস পড়ছে না, চোখের পলকও পড়ছে না। অথচ মৃত নয়। নিস্পন্দ। আত্মনিমগ্ন—নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছেন। মন তখন আর বিক্ষিপ্ত নয়। কোনও তরঙ্গ নেই মনে। বৃত্তিশূন্য—'উপরমতে'। নিষ্ক্রিয়। এমনকী 'আমি চিন্তা করছি না'—এই বোধও আমার নেই।

মনের এরূপ অবস্থায় 'আত্মনি আত্মানং পশ্যন্'—আত্মাতে আমার নিজের স্বরূপকে দেখছি। অর্থাৎ আপন প্রত্যগাত্মায়, পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করছি। প্রত্যক্ষ করছি অর্থাৎ কেবল এক পরমাত্মার উপলব্ধি করছি। সত্যিই কি আমি আমাকে দেখছি? হ্যাঁ, তবে বাইরের আবরণ অর্থাৎ আমার স্থূল দেহকে দেখছি না, শুদ্ধ মনের সাহায্যে নিজের মধ্যে আমি নিজেকে দেখছি। আমার চিন্ময় সত্তাকে অনুভব করছি। তখন কী হয়? আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই—'আত্মনি তুষ্যতি এব'। নিজের মধ্যে আনন্দ অনুভব করি। আনন্দ কেন? কারণ আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমার নিজের স্বরূপ। সুতরাং আমার স্বরূপের অন্য নাম হচ্ছে আনন্দ। সেই আনন্দস্বরূপকে আমি জেনেছি, দেখেছি, তাই আমি আনন্দে ডুবে আছি।

আমরা যোগের কথা এত পড়ছি কেন? আমি আমাকে জানতে চাই বলে। আমি কেবল আত্মাকেই দেখতে চাই। অন্য সব কিছু মুছে গেছে আমার জীবন থেকে। আর কিছু নেই এ-সংসারে। আমি একা। আমি আমার সাথে আছি। আমাতে ডুবে আছি। যত কথা এখানে হচ্ছে তার একটাই সুর—যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে সংযত করো। বারবার করে বলছেন, তুমি লড়াই করো। তুমি পারবে নিজেকে বশে আনতে। তোমার আহার, নিদ্রা, সব কাজকর্মকে সংযত করে ফেলো। তাতেই তুমি আনন্দলাভ করবে। তৃপ্তি পাবে। নিজেকে জয় করতে পারলে যে তৃপ্তি, আনন্দ ও সন্তোষ তার তুলনা হয় না। ভগবান অত্যন্ত সহজ ভাবে বলছেন, বাইরের বিষয়গুলি থেকে মন গুটিয়ে নিলে আমাদের মন শূন্য হয়ে যাচ্ছে না, পরন্তু আমরা তখন নিজের ভিতর অনন্ত দিব্যসত্তা পরমাত্মার প্রাপ্তির পরম আনন্দে ডুবে যাব।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ।। ২১

যত্র (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধি গ্রাহ্যম্ (কেবল শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) আত্যন্তিকম্ (অত্যন্ত) যৎ (যে) সুখম্ (আনন্দ) তৎ (তা) বেত্তি (জানেন বা অনুভব করেন) যত্র চ স্থিতঃ (যে অবস্থায় স্থিত হয়ে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপ থেকে) ন এব চলতি (বিচলিত হন না) (সে অবস্থাকেই যোগ বলে জানবে)।

যে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু শুদ্ধ মনের গোচর যে নিরতিশয় আনন্দ তা অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিত হলে যোগী আত্মস্বরূপ থেকে বিচলিত হন না (তাকে যোগ বলে জানবে)।

প্রকৃত যোগীর চরিত্রই আমাদের জীবনের আদর্শ। তিনি যোগ অভ্যাস করেন কি না তা হয়তো বুঝি না। কিন্তু তাঁকে দেখে আমরা আনন্দ পাই। আসলে আনন্দের ঘনীভূত রূপ তিনি। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। তাঁর মন সর্বদা ঈশ্বরে লিপ্ত হয়ে আছে, ডুবে আছে। বাস্তবিক, ধর্ম তো এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম কী? আমি একটা আদর্শকে বেছে নিয়েছি। নাম দিয়েছি ঈশ্বর। তাঁকে আমি ঈশ্বর বলতেও পারি, আবার নাও পারি। আমার তাঁকে খুব ভালো লাগে। তাই তিনি আমার ঈশ্বর, আমার আদর্শ। আমি তাঁকে ধরে এগোতে চাই। তিনি কীরকম জীবন যাপন করেন আমি সেগুলি মনে মনে কল্পনা করি।

বলছেন, 'যত্র এব'—যে অবস্থাতে, 'অয়ং'—এই যোগী অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। 'সুখম্ আত্যন্তিকং'—অপার আনন্দ। এই আনন্দের কোনও শেষ নেই। শাশ্বত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। ঈশ্বরলাভের আনন্দের কাছে জাগতিক আনন্দ সামান্য বলে মনে হয়। জাগতিক সব আনন্দের সঙ্গে দুঃখ মেশানো থাকে, তাই সেই আনন্দ ক্ষণিক। একমাত্র ঈশ্বরলাভের আনন্দই চিরস্থায়ী। ঠাকুর বলছেন : ব্রহ্মানন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আলুনি বলে মনে হয়। যে একবার মিছরির পানা খেয়েছে, চিটেগুড় তার আর ভালো লাগে না। এই আনন্দ অতীন্দ্রিয়। চোখ, কান, হাত বা কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঈশ্বরলাভের আনন্দকে অনুভব করা যায় না—ইন্দ্রিয়াতীত। তবে বুদ্ধি দিয়ে আমি এই আনন্দকে উপভোগ করতে পারি—'বুদ্ধিগ্রাহ্যম্'। কীরকম বুদ্ধি?—শুদ্ধ বুদ্ধি। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা একই। শুদ্ধ বুদ্ধি তাঁরই আছে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, যিনি পবিত্র হয়েছেন। পবিত্রতার দিকে আমাদের যেন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। প্রথমে আমরা হাত-মুখ ধুই। অর্থাৎ দেহশুদ্ধি করি। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি—মনের শুদ্ধতা। মনটাকে তো আর আমি বাইরে এনে ধুতে পারছি না। তবে কী করব? আমি ঈশ্বরের নাম করব। ঈশ্বরের নাম এমনই জিনিস যা মনের সব মলিনতাকে দূর করে দেবে। তখন মন আর কোনও অনুচিত চিন্তা করতে পারে না। মনের এমন অবস্থায় আমি অপার আনন্দ লাভ করি। এ অবস্থায় আমার মন স্থিত হয়েছে। 'তত্ত্বতঃ ন চলতি'—'তৎ' অর্থাৎ ঈশ্বর, পরমাত্মা। ঈশ্বরকে আর কী বলে বোঝাব ? 'তৎ'—সেই, এ

পর্যন্তই বলতে পারি। ঈশ্বরের থেকে এক পাও নড়বো না। পরমাত্মা বা ঈশ্বর যিনি তাঁকে আমি আমার মধ্যেই পেয়েছি। তাঁকে আমি ছুঁয়ে আছি, ধরে আছি। ছাড়ব না। বন্দি করে রেখেছি তাঁকে । তিনি আমার কাছে বাঁধা পড়ে গেছেন।

আমরা কেন হন্যে হন্যে ঘুরি? কই ঈশ্বরকে তো দেখতে পাচ্ছি না? তবুও কেন এত মাতামাতি করি?—অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন। তিনি আনন্দস্বরূপ। তাঁর কথা ভাবলেই আনন্দ পাই। আর যখন তাঁকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাই তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। যাঁর উপলব্ধি হয়েছে কেবল তিনি-ই তা বোঝেন। এ আনন্দ কাউকে বলে বোঝানো যায় না। এত সুখ, এত আনন্দ! আর কোনও আনন্দই এর কাছে পৌঁছাতে পারে না। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই, যাঁরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁদের মুখে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি। কী একটা আনন্দে যেন তাঁরা ডুবে আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা অনেক পটভূমিকায় দেখি। একদিনের সঙ্গে আর একদিনের চিত্র পুরোপুরি মেলে না। কিন্তু একটা চিত্র রোজ দেখতে পাই,আর সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় পুরুষ। আনন্দঘন তিনি। আনন্দের হাট খুলে বসে আছেন। নিজে আনন্দ করছেন। আবার অন্যের মধ্যে সেই আনন্দ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ। তাঁর কাছে গেলে আনন্দ পাব, এটাই স্বাভাবিক। আনন্দের জন্যই তো তাঁকে পেতে চাই। সত্যিই এ আনন্দের কোনও শেষ নেই।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ।। ২২

যং চ (এবং যে আনন্দের অবস্থা) লব্ধ্বা (লাভ করে) অপরং (অপর) লাভং (লাভ) ততঃ (তার থেকে) অধিকং (অধিক আনন্দ) ন মন্যতে (মনে হয় না) যস্মিন্ (যাতে) স্থিতঃ (অবস্থিত হয়ে) গুরুণা (গুরু, দুঃসহ) দুঃখেন অপি (দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)।

যাঁকে অর্থাৎ যে আনন্দ-অবস্থা লাভ করে যোগিপুরুষ অন্য কোনও লাভকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না এবং যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহা দুঃখেও তিনি বিচলিত হন না তাকেই যোগাবস্থা বলে জানবে।

'যং লব্ধ্বা', যাঁকে পেলে অর্থাৎ আত্মাকে পেলে। আত্মাকে জানলে মনে হয় সব পেয়ে গেছি। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তুকে আমি লাভ করেছি। জানা মানেই পাওয়া। ব্রহ্মকে জানা মানেই ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া । ব্রহ্ম অর্থাৎ যা সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। যাঁকে পেলে আর কিছু পাওয়ার দরকার হয় না। ব্রহ্মই ভূমা। সেই ভূমাকে, আত্মাকে আমি জেনেছি। শ্রুতি বলছেন, 'ভূমৈব সুখম'—ভূমাই সুখ। 'নাল্পে সুখম্ অস্তি'—আমি কোনও অল্প জিনিস চাই না। মিছরি পেলে কে আর চিটেগুড় খেতে

চায়? মানুষ যা নিয়ে সবসময় আছে তা হল বিষয়ানন্দ। বিষয়ানন্দ চিটেগুড়। ব্রহ্মকে জানলে বিষয়ানন্দের কোটিগুণ আনন্দ অনুভূত হয়—শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। আনন্দের উৎস আমার মধ্যেই রয়েছে। তা আমি জেনেছি। সেই আনন্দে আমি ডুবে আছি—আত্মরতি। আমার আনন্দ জগতের কোনও কিছুর উপর নির্ভর করে না। কারোর অপেক্ষা রাখে না— 'অনপেক্ষ'। আমি আপ্তকাম, পূর্ণকাম। 'শান্ত নিরিন্ধন ইব অনলঃ'। ইন্ধন বা কাঠ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আগুন খুব জ্বলছে। অর্থাৎ যতক্ষণ আমার কামনা-বাসনা আছে, ততক্ষণ তার জ্বালায় আমি জ্বলছি। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বাসনা নষ্ট হয়ে যায়, তখন আমি শান্ত। আর কিছু চাই না আমি।

আত্মজ্ঞানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি সংসারে থাকেন সম্রাটের মতো। বাইরে হয়তো তিনি নিঃস্ব কিন্তু তাঁর হাবভাব, চালচলন দেখে মনে হয় তিনি যেন সম্রাট। আমরা সবাই জগতের বশ। কাম-কাঞ্চনের বশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যে ধনী ব্যক্তি তিনিও তাই । জগতের বশ নন একমাত্র তিনি, যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন। 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাং পিঞ্জরাদিব কেশরী'—পিঞ্জরমুক্ত সিংহের মতো তিনি জগৎ-জাল ছিন্ন করে বেড়িয়ে পড়েছেন। 'অভীঃ' তিনি এ জগতের কাউকে বা কোনওকিছুকে ভয় করেন না।

'যস্মিন্ স্থিতঃ'—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। মুঠোর মধ্যে সেই পরম জ্ঞানকে আমি শক্ত করে ধরে রেখেছি, যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়। আমি রাজা। সিংহাসনে বসে আছি। আমি ব্রহ্মকে জেনেছি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত। মহাদুঃখও আমার মনকে বিচলিত করতে পারে না। 'ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যত বড় আঘাতই আসুক না কেন আর আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। দুঃখ আসবেই । রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, দারিদ্র, দুর্ঘটনা—এসব দুঃখের হাত থেকে কারোও রেহাই নেই। কিন্তু আমি এমন আনন্দের সন্ধান পেয়েছি যে, কঠিন দুঃখও আমাকে আর টলাতে পারবে না। এতটুকুও বিচলিত হব না আমি। যাঁর জন্য এ সংসারে আসা, সেই ঈশ্বরকে আমি পেয়েছি। আর আমার কী-ই বা পাওয়ার আছে? এছাড়া আর সবকিছুই যে ধাপ্পা।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ।। ২৩

তং (সেই) দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং (দুঃখ-সংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই বিয়োগরূপ অবস্থাকে) যোগ-সংজ্ঞিতম্(সমাধি বা যোগাবস্থা) বিদ্যাৎ (জানবে) অনির্বিণ্ণচেতসা (নির্বেদশূন্য চিত্তে) সঃ (সেই) যোগঃ (যোগাভ্যাস) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (সাধন করা কর্তব্য)।

এই অবস্থাকে যোগ বলে জানবে। এ অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। নির্বেদশূন্য

অর্থাৎ অবিষণ্ণ চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে এই যোগ অভ্যাস করা কর্তব্য।

প্রকৃত যোগ কখন হয়? চিত্তের সব বৃত্তি যখন নিঃশেষে আত্মায় সমাহিত হয়। অন্তর্জগৎ আর বাইরের জগৎ —এ দুয়ের সংঘাতেই আমাদের সুখ-দুঃখের অনুভব হয়। বাইরের জগৎটা নিজের নিয়মে চলে, তার উপর আমাদের কোনও অধিকার নেই। কাজেই অন্তর্জগৎটাকে বশে আনতে হবে। এই অন্তর্জগৎকে বশে আনার অর্থাৎ মনটাকে আয়ত্তে আনার মূল চাবিকাঠি হল ধ্যান। অন্তরে অসীম আনন্দের উৎস রয়েছে, এ আনন্দ চিরন্তন—অপরিবর্তনীয়। 'যোগ' হল সেখানে পৌঁছবার দ্বার। সমাধি অর্থাৎ যোগাবস্থায় সকল দুঃখের বিয়োগ বা অবসান হয়। 'দুঃখসংযোগবিয়োগং'—দুঃখের সঙ্গে সংযোগ 'দুঃখসংযোগ', তার সঙ্গে [অর্থাৎ দুঃখসংযোগের সঙ্গে] বিয়োগই 'দুঃখসংযোগবিয়োগ'। অর্থাৎ যে অবস্থার সঙ্গে দুঃখের সংযোগ হওয়ামাত্রই দুঃখের নাশ হয়, যন্ত্রণার বিনাশ হয়, তাকেই 'যোগ' বলে। এ অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না। এ হল 'আত্যন্তিক সুখ'-এর অবস্থা। এখানে দুঃখ বলতে বিষয়সুখকেও বোঝানো হয়েছে। কারণ এ সুখ অনিত্য। অবিমিশ্র সুখ বা অবিমিশ্র দুঃখ বলে কিছু নেই। সুখ আর দুঃখ মিশে আছে। সুখের অভাবই দুঃখ।

'অনির্বিণ্ণচেতসা'—নির্বেদশূন্য চিত্তে। নির্বেদ মানে নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা হতাশা। যাঁর নৈরাশ্য নেই তিনি-ই 'অনির্বিণ্ণ'। 'আমার তো এতদিনেও সিদ্ধিলাভ হল না; আমাকে দিয়ে বুঝি হবে না'—এই ধরনের অনুতাপই নির্বেদ। এই রকম হতাশ হলে চলবে না। বরং বলতে হবে, এই জন্মেই হোক বা পরজন্মে আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধ হব। এই ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়ে যোগ অভ্যাস করা উচিত। কেমন করে অভ্যাস করব? যত্ন সহকারে, অধ্যবসায় সহকারে— 'নিশ্চয়েন।' দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এই যোগ অভ্যাস করতে হবে। এ যেন কুশ ঘাসের ডগা দিয়ে সমুদ্র থেকে বিন্দু বিন্দু করে জল তোলা। এইভাবে নির্বেদশূন্য হয়ে অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ হয়। অর্থাৎ প্রথমে পুরুষকার, পরে দৈবকৃপা আপনি আসে। বাস্তবিক যোগ সাধনায় কঠোর পরিশ্রম করলে তবেই আমরা সিদ্ধ হতে পারব।

পুরুষকার কী? ঈশ্বর আমাদের অন্তরে প্রত্যেককেই কিছুটা শক্তি দিয়েছেন। সেই শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার যখন আমরা করি তখনই তিনি কৃপা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটা সুন্দর উদাহরণ দিতেন। একটা গরু মাঠের মধ্যে একটা খুঁটিতে বাঁধা আছে। দড়িটা খানিকটা লম্বা। হয়তো চল্লিশ হাত। ঐ চল্লিশ হাতের মধ্যে গরুটা দশ হাত দূরে ঘুরতে পারে, আবার চল্লিশ হাতের মধ্যেও ঘুরতে পারে। কিন্তু তার বাইরে যে বিরাট মাঠ সেখানে সে যেতে পারে না। ঐ যে চল্লিশ হাত জায়গা—ঐটুকু পুরুষকারের এলাকা। তার বাইরে যে বিরাট মাঠ, সেটা দৈব-অনুগ্রহের এলাকা। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ঐ চল্লিশ হাতের মধ্যে। ঐ শক্তিটুকু যদি আমরা পুরো ব্যবহার করি তখন ঈশ্বর এসে ঐ দড়ি কেটে দেন। গোটা মাঠটাতে তখন আমি চড়ে বেড়াতে পারি। আমি তখন ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে গেছি। আনন্দস্বরূপ হয়ে গেছি। তাই ভগবান আমাদের আহ্বান করছেন—এই যোগ অধ্যবসায় সহকারে অনুসরণ করো এবং এই জীবনেই কিছু ফল লাভ করো।

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ।। ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।। ২৫

সঙ্কল্প-প্রভবান্ (সঙ্কল্পজাত) সর্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) অশেষতঃ ত্যক্ত্বা (নিঃশেষে ত্যাগ করে) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়-গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সমস্ত বিষয় থেকে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করে) ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (বিষয় থেকে বিরতি অভ্যাস করবে) মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা (মনকে আত্মাতে স্থাপন করে) কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ (অন্য কিছু চিন্তা করবে না)।

সংকল্পজাত কামনাসমূহকে নিঃশেষে ত্যাগ করে, কেবল মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে, ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনের ক্রিয়াকে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করবে। তারপর এই নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে সমাহিত করে সর্বপ্রকার অপর চিন্তা হতে বিরত হবে।

এ দুটি শ্লোকে সমাধিযোগ অভ্যাসের প্রক্রিয়া বলা হয়েছে। 'সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ সর্বান্'—সংকল্প থেকে যেসব কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়েছে। মনের ভেতরে কত বাসনা জাগছে প্রতি মুহূর্তে। আজ ওখানে যাব, কাল ওইটে খাব—বাসনার আর শেষ নেই। একটা বাসনাকে চরিতার্থ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাসনা এসে হাজির। বলে, আমি আছি। 'অশেষতঃ ত্যক্ত্বা'—সমস্ত কামনা-বাসনাকে নিঃশেষে ত্যাগ কর। গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। বলতে চাইছেন:—এতটুকু বাসনাও যদি থাকে তবে তার থেকে আরও শত শত বাসনার সৃষ্টি হয়। তাই বাসনাকে নিঃশেষে নির্মূল করতে হবে। তারপরে বলছেন, 'মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ' অর্থাৎ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত বিষয় থেকে তুলে আন।

আসলে আমাদের মনই সব। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। মন ছাড়া কোনও ইন্দ্রিয় কাজ করতে পারে না। আমার হয়তো চোখ খোলা আছে, আপাতদৃষ্টিতে আমি কিছু দেখছি। কিন্তু আমার মন সেখানে নেই। তাহলে তাকিয়ে থেকেও আমি কিছুই দেখতে পাব না। আবার মনই বিচার করতে পারে। এ সংসারে কত কিছু আকর্ষণীয় জিনিস রয়েছে। কিন্তু

তা সামান্য, মিথ্যা, অনিত্য। এই আছে এই নেই। যা নিত্য, যা শাশ্বত আমি তাই চাই। এভাবে বিচার করে করে মনকে বিষয় থেকে তুলে আনব। তখন অন্য ইন্দ্রিয়গুলি আপনিই আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

আমাদের দেহটা যেন একটা ঘর। আর ইন্দ্রিয়গুলি হল সেখানকার দরজা- জানলা। বাইরের বিষয়গুলি সেই দরজা-জানলা দিয়ে উঁকি মারছে। আর আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে যেন দু-হাত দিয়ে ডাকছে। চোখকে বলছে 'দেখ, দেখ'। কানকে বলছে 'শোন, শোন'। পা কে বলছে 'এসো এসো'। মনের সাহায্যে এই চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে আসব। পুরোপুরি আমার বশে নিয়ে আসব—'বিনিয়ম্য'। অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি আমার পায়ের তলায় এনে ফেলব।

তারপর কী করব? চেষ্টা করে করে আমি হয়তো কামনা-বাসনা থেকে মনকে তুলে এনেছি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ধৈর্যসহকারে, বুদ্ধির দ্বারা সেই মনকে আমি ধীরে ধীরে অন্তর্মুখ করার চেষ্টা করব —'বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া'। আসলে আমাদের মনের মধ্যে অসংখ্য বৃত্তি আছে। নানা চিন্তার স্রোত বইছে। চিন্তাগুলি যেন এক-একটা ঢেউ। ঢেউ যেন উঠেই চলেছে। এই ঢেউয়ের ওপর আমার কোনও প্রভাব নেই। আমি এই ঢেউগুলোকে মুছে ফেলার চেষ্টা করব। একটা ঢেউও যেন না থাকে । এরই নাম চিত্তবৃত্তি নিরোধ। কীভাবে করব?—বুদ্ধির সাহায্যে । বুদ্ধিই নিত্য-অনিত্য বিচার করে মনকে সৎপথে চালনা করে। মনকে বহির্মুখী হতে দেয় না। ভেতরের দিকে তাকাতে শেখায়। এ হয়তো একদিনে হয় না। তাই বলছেন, 'শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ'—ধীরে ধীরে আমি মনকে বেঁধে ফেলব, অর্থাৎ সংযত করব। হয়তো একবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না কিন্তু তাতে ধৈর্য হারালে চলবে না। আমি জিতবই। এই রোক থাকা চাই। এভাবে মন বৃত্তিশূন্য হলে সেই মনকে আত্মাতে সমাহিত করব। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রধান হচ্ছে মন। আবার মন আত্মার অধীন। মনটাকে আত্মার কাছে সমর্পণ করব—'মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা'। আমি এখন আমাতে ডুবে আছি। ভেতরের দিকে তাকিয়ে আত্মারাম হয়ে আছি। কচ্ছপ যেমন তার দেহটাকে ভেতরে গুটিয়ে নেয়, প্রকৃত যোগীও সেইরকম সব ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে আত্মাতে ডুবিয়ে দেন। ব্যস, এইবার তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন। তখন তিনি ধীর, স্থির, শান্ত। জগতের কোনো কিছুই তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর দেহ-মন-প্রাণ সব আত্মাতে লয় পেয়েছে। তিনি আত্মস্বরূপ হয়ে গেছেন। এ অবস্থার অপর কোনও চিন্তা- ভাবনাই তাঁর নেই।

আগে ১০ নং ও ১২ নং শ্লোকে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোক দুটিতে প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধির উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি হল একই জিনিসের স্তর ভেদ। একটা প্রচলিত উপমা দিয়ে এ অবস্থাকে বোঝানো যায়। আমাদের মনটা যেন একটা পুকুর। সেই পুকুরে আমি একটা

বিষয়ের ঢিল ছুঁড়লাম। ঢিলটা পুকুরে একটা তরঙ্গ তুলল। তুলে নিচে চলে গেল। সেটা সংস্কার হয়ে জমা রইল। যদি কোনওভাবে ঐ ঢিলটা নড়ে তবে পুকুরে আবার তরঙ্গ উঠবে। কারণ সংস্কারের ঢিলটা তো মনের মধ্যেই রয়েছে। এইভাবে নানা বিষয়ের সংযোগে মনের মধ্যে অজস্র ঢেউ উঠছে। অনিয়ন্ত্রিত ঢেউ। এই ঢেউকে তো থামানো যায় না। তবে এর থেকে বেরোবার উপায় কী?—ধ্যান। আমি দিনের শেষে চোখ বুজে বসলাম, আর ধ্যান হয়ে গেল? না, তা হয় না। ধাপে ধাপে এগোতে হবে। সবার আগে প্রত্যাহার। সেটা কী? মনের মধ্যে অসংখ্য অনিয়ন্ত্রিত ঢেউ আছে। সেগুলিকে আমি মুছে দেবার চেষ্টা করছি। যখন একটা ঢেউও আর নেই তখন প্রত্যাহার। এর পরে ধারণা। একটা ঢেউও না রেখে আমি আমার পছন্দমতো একটা ঢেউ সৃষ্টি করব। আর ধ্যান হচ্ছে সেই ঢেউটাকেই আমি ধরে রাখার চেষ্টা করব। এই চেষ্টাটাই ধ্যান।

ধরা যাক শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় আকারিত একটা ঢেউ আমি সৃষ্টি করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ অর্থাৎ সেই ঢেউটা আমার মনে ভেসে উঠছে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই হল ধারণার অবস্থা। চেষ্টা করতে করতে দেখা গেল আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখছি। ঢেউটা কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু তা আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। এর নাম ধ্যান। আর সমাধি অবস্থায় শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের মুখই দেখছি। আর কিছু নেই। 'আমি'-ও নেই। ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা, এক হয়ে গেছে—সবিকল্প সমাধি। আরও এগোলে মনে আর কোনও তরঙ্গই নেই। নিস্তরঙ্গ। যা আছে তাই আছে। তখন নির্বিকল্প সমাধি। আধ্যাত্মিক পথের এই হল চরম অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে ধ্যান ও সমাধিই হল যোগের মূলকথা। আসলে ধ্যান হচ্ছে মনটাকে বশীভূত করা। মনটা তো আমাদের কাছে রহস্য। তাকে আমরা ধরতে পারি না। যদি ধরতে পারি তবে অনন্ত শক্তি পাই। সেই শক্তি দিয়ে আমি আমার অহংকারের বন্ধন কাটিয়ে উঠি। ধর্মরাজ্যে এগিয়ে যেতে থাকি। এক সময় আমি শেষ লক্ষ্যে পৌঁছাই।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।। ২৬

চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল অস্থির মন) যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যে-যে বিষয়ের দিকে ছুটে বেড়ায়) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় থেকে) এতৎ নিয়ম্য (এই মনকে প্রত্যাহার করে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (স্থির করবে)।

চঞ্চল অস্থির মন যে-যে বিষয়ের দিকে ছুটে যায়, সেই-সেই বিষয় থেকে মনকে সংযত করে, তুলে নিয়ে এসে আত্মাতেই স্থির করবে অর্থাৎ আত্মার বশে আনবে।

মন স্বভাবত চঞ্চল । নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অস্থির মনকে আমি আমার নাগালের মধ্যে নিয়ে আসব। তাই বলছেন : 'যতঃ যতঃ নিশ্চরতি'—এই চঞ্চল মন যে-

যে বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কোন দিকে যে যাবে, তার তো ঠিক নেই। সেই অস্থির মনকে 'ততঃ ততঃ'—সেই-সেই বিষয় থেকে, 'নিয়ম্য'—নিরুদ্ধ বা সংযত করে টেনে নিয়ে আসব। অনেক চেষ্টা করে, অনেক ধস্তাধস্তি করে হয়তো সেই মনকে টেনে নিয়ে এলাম। এনে কোথায় রাখব? 'আত্মনি এব'—আত্মায়, আমার নিজের কাছে। আত্মা--যিনি আমার মধ্যে সর্বদা বিরাজ করছেন। আত্মা যেন হাসছেন আর দেখছেন—কে জেতে শেষ পর্যন্ত। অনেক লাফালাফি হল। অনেক দৌড়াদৌড়ি হল। শেষকালে তিনিই জিতলেন। কারণ তিনিই তো আমি। সেটাই তো ভরসা। তিনি যদি আমি না হতাম তাহলে ভরসা ছিল না। এতদিন পর্যন্ত আসল 'আমি'-কে চিনতাম না, জানতাম না। আগে এই শরীরকে, এই মনটাকেই 'আমি' বলে মনে করতাম। কিন্তু শরীর-মনের ঊর্ধ্বে যে-'আমি' তিনিই প্রকৃত 'আমি'। এই 'আমি' সকলের মধ্যেই রয়েছে। সকলকে চালাচ্ছে। এই 'আমি'ই জগতের আমি। প্রকৃত 'আমি'ই আমার আত্মা। আমার স্বরূপ।

শেষ পর্যন্ত আমার প্রকৃত 'আমি'র কাছেই আমি নতি স্বীকার করেছি—'বশং নয়েৎ'। অন্য কারও কাছে বশ নয়। আমি আমার কাছে 'বশী' হয়ে আত্মসমর্পণ করতে পেরে খুশি। এতদিন বুঝতে পারিনি যে, 'আমি'ই আমাকে চালাচ্ছিলাম। এখন বুঝেছি আমিই আমার প্রভু। আমিই আমার মালিক। এই ত্রিভুবনের আমিই কর্তা। বিশ্বচরাচর আমারই মধ্যে। এভাবেই মন বৃহৎ 'আমি' অর্থাৎ আত্মাতে লীন হয়। যোগীপুরুষরা স্থির হয়ে প্রথমে মনের গতিবিধি লক্ষ করেন। তারপর সেই অশান্ত, চঞ্চল মনকে বিষয় থেকে তুলে এনে, আত্মার ধ্যানে ডুবিয়ে দেন। মনকে কড়া হাতে শাসন করতে হয়। নাহলে সুযোগ পেলেই সে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়। একবার আত্মানন্দের স্বাদ পেলে মন আপনা-আপনিই আত্মধ্যানে মগ্ন হয়। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুই নেই।

ভগবান অর্জুনকে লক্ষ করে আমাদের সকলকেই বলছেন, মনকে বশে আনা এক নিরন্তর সংগ্রাম, এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ কিন্তু এছাড়া অন্য কোনও পথ নেই, একমাত্র নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারাই মনকে বশে আনা যায়।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ।। ২৭

প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) শান্তরজসং (রজোগুণজনিত—বিক্ষেপশূন্য) অকল্মষম্ (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) এনং যোগিনং (এই যোগীকে) উত্তমং সুখম্ (উত্তম সুখ) উপৈতি হি (অবশ্যই আশ্রয় করে)।

যাঁর প্রশান্তচিত্ত, মোহাদি ক্লেশরূপ রজোবৃত্তিশূন্য হয়েছে, সকল কলুষমুক্ত—নিষ্পাপ, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত এই যোগীই পরমসুখ লাভ করেন।

প্রকৃত যোগী কীরকম হবেন? 'প্রশান্তমনসং'—যাঁর মন সম্পূর্ণরূপে শান্ত, স্থির। অনেকে আছেন ধীর, স্থির, শান্ত। কোনও চাঞ্চল্য নেই। মনে কোনও বৃত্তি নেই। শ্রেষ্ঠ চিন্তা তখনই হয়, যখন মন নিজের বশে থাকে এবং শব্দ, দৃশ্য, স্পর্শ, সুখ, দুঃখ—এইসব আর মনকে বিব্রত করতে পারে না। এমন যোগীর মধ্যে তিনটি গুণই থাকে। কিন্তু সেই তিন গুণের মধ্যে একটা সমতা থাকে। গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি এই তিনটি গুণ আছে। যার মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য—সে সাত্ত্বিক। ধীর, স্থির । কিন্তু অলস নয়। তার ভেতরে প্রচণ্ড শক্তি আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে সে বশে রেখেছে। দরকার হলে কাজে লাগাবে। আবার যার মধ্যে রজোগুণ বেশি—সে রাজসিক।সে কখনও স্থির থাকতে পারে না। চঞ্চল, ছটফটে। কথা বলছে তো বলছেই। কী বলছে তার মাথামুণ্ডু নেই। তার মধ্যেও শক্তি আছে। কিন্তু শক্তির অপব্যবহার করছে সে। আবার তমোগুণী যে, সে অলস। ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই। সে কারও ভালো করতে পারে না। মন্দ করতে চায়। প্রকৃত যোগী যিনি তিনি রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত। এই সব বিক্ষেপী শক্তিগুলিকে তিনি মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছেন। 'শান্তরজসং'—তাঁর মধ্যে রজোগুণ আছে। অনন্ত শক্তি। কিন্তু সে শক্তির অপব্যবহার নেই, পুরোপুরি তাঁর আয়ত্তে। আবার তমোগুণজনিত তন্দ্রা, অলসতা প্রভৃতি মন্দ দোষ থেকেও তিনি মুক্ত। এমন অবস্থায় তাঁর মনে কোনও বিক্ষেপ নেই। প্রশান্ত তিনি । নিষ্পাপ। তিনি কখনও কারও মনে আঘাত করেন না। এমন কোনও কথা বলেন না যাতে কেউ কষ্ট পায়। এইরকম মানুষ পরম সুখ উপলব্ধি করেন। ব্রহ্মানন্দ-সাগরে তিনি ভেসে বেড়ান। এমন যোগী এ-জীবনেই সমাধি-সুখ লাভ করেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ।। ২৮

এবম্ (এভাবে) আত্মানং (নিজের মনকে) সদা (সবসময়) যুঞ্জন্ (আত্মাতে যুক্ত করে) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগিপুরুষ) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ) অত্যন্তং (নিরতিশয়) সুখম্ (সুখ অর্থাৎ আনন্দ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)।

এভাবে সর্বদা মনকে আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে, নিষ্পাপ কলুষতা-মুক্ত যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ নিরতিশয় পরমসুখ অনুভব করেন।

এখানেও সেই আগের প্রসঙ্গই চলছে। মনকে সংযত করা। এই মনকে নিয়েই তো সমস্যা। কিন্তু চেষ্টা করলে মনকেও বশে আনা সম্ভব—একথা আগে বারবার আলোচনা করা হয়েছে। বলছেন, মনকে সবসময় আত্মার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। একটা সময় মনকে শান্ত রাখলাম। আর অন্যসময় বললাম, 'যা বিষয় ভোগ কর।' না, তা হবে না। প্রশ্ন হল মনকে কোথায় জুড়ে দেব? আত্মার সাথে, সত্যের সাথে। এই আমার আদর্শ। সেই আদর্শ থেকে আমি এক-পাও সরে আসব না। তাহলে কী হবে? আমার মনের যত

কালিমা আছে সব চলে যাবে। আমি মলিনতা থেকে মুক্ত হব। নিষ্পাপ হয়ে যাব— 'বিগতকল্মষঃ'।

এরপরে আসছে সেই আসল কথা। আমাদের কী সুন্দর ধাপে ধাপে চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, এমন যোগী অনায়াসেই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। 'ব্রহ্মসংস্পর্শম্'—তিনি ব্রহ্মের সান্নিধ্য পেয়েছেন। সেখানে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। ব্রহ্মকে জেনেছেন। জেনে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। 'ব্রহ্মবেদো ব্রহ্মৈব ভবতি'। তিনি পরম সুখী। জাগতিক সব আনন্দই তাঁর কাছে তুচ্ছ। ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে অপর কোনও আনন্দের তুলনা চলে না। আবার এই আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। এই আনন্দের স্বাদ যে- পেয়েছে কেবল সে-ই বোঝে। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে—ব্রহ্মের সংস্পর্শে, ঈশ্বরের সংস্পর্শে যোগী-পুরুষ অপরিসীম আনন্দ ও পরাশান্তি লাভ করেন। তিনি এই জীবনে অসীম সুখ অনুভব করেন। যাঁদের এই ঈশ্বর অনুভব হয়েছে তাঁরা সকলেই বলে গেছেন এই অনন্ত আনন্দের কথা। ঈশ্বরানুভূতি হলে যোগী শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে অসীম আনন্দ, সুখ ও আত্যন্তিক শান্তি অনুভব করেন।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।। ২৯

যোগযুক্তাত্মা (যোগে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ) সর্বত্র (সর্বত্র) সমদর্শনঃ (সমদর্শী হয়ে) আত্মানং (নিজেকে, আত্মাকে) সর্বভূতস্থং (সর্বভূতে অবস্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং সর্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)।

যোগযুক্ত পুরুষ সমদর্শী হয়ে নিজেকে সর্বভূতের আত্মায় এবং সর্বভূতকে নিজের আত্মায় অভিন্নরূপে দর্শন করেন।

বিশ্বসংসারে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই 'ভূত'। 'সর্বভূতস্থম্ আত্মানং'—সবকিছুর মধ্যে যিনি নিজের আত্মাকে দেখেন। সর্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করেন —একদর্শী তাঁর মধ্যে কোনও দুই বোধ নেই। আবার সর্বভূতানি চ আত্মনি' – নিজের আত্মায় সবাইকে দেখেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা-কিছু আছে সব তাঁর ভিতরেই রয়েছে। বাইরে কিছু নেই। তিনি কে?—যোগী। 'যোগযুক্ত-আত্মা'—যোগের দ্বারা তাঁর চিত্ত আত্মায় যুক্ত হয়ে আছে। সমাহিতচিত্ত। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করেছেন তিনি। তাই তিনি 'সমদর্শনঃ'- –যাঁর দর্শন সর্বত্র সম অর্থাৎ সমান, সমদর্শী। সবার প্রতি, সবকিছুর প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি। আপন-পর নেই। ভাল-মন্দ নেই। কোনওরকম ভেদবুদ্ধি নেই তাঁর মধ্যে। বেদান্তদর্শনে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে মনুষ্যজীবনে সমদর্শী হওয়া। যোগের দ্বারা চিত্ত সমাহিত হলে মানুষ সমদর্শী হন। তখন তিনি সমদৃষ্টিতে নিজের আত্মাকে সর্বজীবে এবং সর্বজীবের

মধ্যে নিজের আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। সর্বত্র এক অনন্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন— সেখানে উচ্চ বা নীচ বা অন্য কোনওরকম পার্থক্য থাকে না।

তিনি জানেন, এ জগৎ মনের সৃষ্টি। 'মায়য়া কল্পিতং জগৎ'—মায়ার সাহায্যে মনের দ্বারা কল্পিত। ব্রহ্মের উপর আরোপিত। নাম-রূপের তরঙ্গ মাত্র। মনের লয় হলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হলে জগতেরও লয় হয়। তখন এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। অন্ধকারে আমরা দড়িকে সাপ বলে ভুল করি। অর্থাৎ দড়ির উপর সাপ আরোপ করি। যখন ভুল বুঝতে পারি, তখন সাপ অদৃশ্য হয়। দড়িকে দড়ি বলে চিনতে পারি। তেমনি সমাধিমান যোগীপুরুষ সবকিছুর মধ্যে এক ব্রহ্মকে দেখেন । তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আর জগতের বৈচিত্র দেখতে পান না। তিনি জগৎকে আর জগৎরূপে দেখেন না, ব্রহ্মরূপে দেখেন। 'জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ'—জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়—এ সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। সর্বভূতে যে এক নিত্যবস্তু আছে তা তিনি জেনেছেন। শ্রুতিতে আছে, 'এক দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি, একদিন বিশ্রাম করছেন। উঠে দেখেন একঘর ভক্ত। সকলকে নমস্কার করছেন। তাঁরা আপত্তি জানালেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে এক নারায়ণকে দেখছি। কাঁচের আলমারিতে যেমন পুতুল সাজানো থাকে, তেমনি তোমাদের মধ্যে তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান যুগে এই সাম্যদৃষ্টির শিক্ষা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। জাতি, ধর্ম, ধনী ও দরিদ্রের ভেদ, মানুষে-মানুষে পার্থক্য অর্থাৎ এই হীন-দৃষ্টি ত্যাগ করে বেদান্তের সাম্যদৃষ্টি গ্রহণ করলে সমাজে সকলের কাছে তা আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে সর্বক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন আনবে।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।। ৩০

যঃ (যিনি) মাং (আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) সর্বত্র (সর্বত্র) পশ্যতি (দেখেন) ময়ি চ (এবং আমাতে) সর্বং (সমস্ত পদার্থ, জগৎপ্রপঞ্চ) পশ্যতি (দেখেন) অহং (আমি) তস্য (তাঁর) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (এবং তিনিও) মে (আমার কাছে) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না)।

যিনি আমাকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) সর্বভূতে এবং আমার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আমি কখনও তাঁর কাছে অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে তিনি পৃথক হন না এবং ঈশ্বরও তাঁর থেকে পৃথক হন না।

আগের শ্লোকে যোগীর আত্মদর্শনের কথা বলা হয়েছে। সর্বভূতে তিনি নিজেকে দেখছেন। আমার আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা—এ উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। বর্তমান শ্লোকে

যোগীর ঈশ্বর-দর্শনের কথা বলা হয়েছে। সর্বভূতে তিনি ঈশ্বরকে দেখছেন। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই মায়াকে আশ্রয় করে সগুণ ঈশ্বর হয়েছেন। তিনিই এই জগৎ-প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ। তাঁর কত নাম, কত রূপ! তিনি কেবল নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম নন। সর্বলোকের মহেশ্বর। জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান। পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি যে এক পরপর দুটি শ্লোকে সেকথাই বোঝানো হয়েছে।

গীতায় যোগী কেবল আত্মারাম নন। শ্রেষ্ঠ ভক্তও তিনি। সবার মধ্যে সবকিছুর মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয়তমকে দেখতে পান—'যঃ মাং পশ্যতি সর্বত্র'। সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং সকল জীবকে ঈশ্বরের মধ্যে দর্শন করেন। যোগী ও ঈশ্বর কখনই একে অপর থেকে পৃথক হন না। সর্বদাই তাঁরা একাত্ম ও যুক্ত হয়ে আছেন। ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যও ভগবান তাঁর কাছে অদৃশ্য হন না। ঈশ্বরকে এই সর্বত্র দেখা—এই হল শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ। কেউ মনে করে ঈশ্বর শুধু মন্দিরে আছেন। কেউ মনে করে ওই আকাশে। তাঁদের চেয়ে কম অজ্ঞ যাঁরা তাঁরা মনে করেন, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভক্ত যিনি, ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে দেখেন, আবার বাইরেও দেখেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'। এই যোগী ও ভক্ত সংসারে শত-কার্যে ব্যাপৃত থাকলেও ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক থাকে। ভগবান তাঁর হৃদয়ে সদা উপস্থিত থেকে তাঁকে চালিত করেন।

আবার যোগী দেখেন ঈশ্বরই সব হয়েছেন। এ জগৎ-সংসার তাঁর মধ্যেই রয়েছে—'সর্বং চ ময়ি পশ্যতি'। শিখ-গুরু নানক একবার মক্কায় গেছেন। সেখানে মুসলমানদের উপাসনার স্থান আছে। মুসলমানরা তাকে কাবা বলে। সেখানে একটা কালো পাথর আছে। নানক একদিন সেদিকে পা দিয়ে শুয়ে আছেন। সবাই দেখে খুব বিরক্ত। একজন বলছেন, 'কি হে! তুমি যে আল্লার দিকে পা দিয়ে শুয়ে আছ। তোমার তো নরকে যেতে হবে।' নানক উত্তর দিলেন : 'ভাই, দয়া করে যেদিকে আল্লা নেই সেদিকে আমার পা দুখানা ঘুরিয়ে দাও।' অর্থাৎ কোথায় ভগবান নেই? সর্বত্র তিনি রয়েছেন। যে আন্তরিকভাবে চায় সে-ই তাঁর দেখা পায়।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ।। ৩১

যঃ (যিনি) সর্বভূত-স্থিতং (সর্বভূতে স্থিত) মাং (আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) একত্বম্ আস্থিতঃ (জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করে) ভজতি (ভজনা করেন) সর্বথা (সকল অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থেকেও) সঃ (সেই) যোগী (যোগিপুরুষ) ময়ি (আমাতেই) বর্ততে (থাকেন)।

যিনি সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আমাকে নিজ আত্মার সঙ্গে অভেদজ্ঞানে ভজনা করেন, সেই

যোগী যে-অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন।

শ্রীভগবান এখানে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করেছেন। বলছেন, 'সর্বভূতস্থিতং মাং'—সকল ভূতের অধিষ্ঠান আমাকে, 'যঃ একত্বম্ আস্থিতঃ ভজতি'—যিনি নিজের সঙ্গে ভগবানকে অভেদজ্ঞানে উপাসনা করেন। সবার মধ্যে এক আত্মা—এই আত্মার সঙ্গে একত্বে তিনি প্রতিষ্ঠিত। সর্বভূতে এক নারায়ণ—একথা জেনে তিনি নারায়ণজ্ঞানে সবার সেবা করেন। এই সেবাই তাঁর পূজা। তিনি হয়তো মন্দিরে বসে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছেন না। কিন্তু ভগবানের সচল বিগ্রহের সেবা করছেন। সর্বভূতে তাঁর প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা।

এই সমদর্শিতাই যোগের একেবারে শ্রেষ্ঠ অবস্থা । জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক—এই অদ্বৈত অনুভূতি তাঁর হয়েছে। ঘটাকাশ আর পটাকাশ। ঘটের ভিতরে ও বাইরে একই আকাশ। কিন্তু ঘটটা যেন দুটো আকাশকে আলাদা করে রেখেছে। ঘটটা ভেঙে গেলে যেই আকাশ সেই আকাশ। ঘটাকাশ জীবাত্মার প্রতীক। ঘটটা যেন জীবের দেহ। সর্বব্যাপী পরমাত্মা জীবাত্মারূপে ঘটে-ঘটে নিজেকে প্রকাশ করেছেন —'ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের অন্তরে এক সমন্বয়সূত্ররূপে বিরাজ করছেন। তিনিই সর্বজীবের অধিষ্ঠান-চৈতন্য, জীবের নিয়ন্তা ও প্রভুরূপে অবস্থিত। দেহ-অভিমান দূর হলে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হলে যোগীপুরুষ নিজ আত্মার সঙ্গে সর্বভূতস্থ আত্মার এবং পরমাত্মার সঙ্গে এই একত্ব বা অভিন্নতা উপলব্ধি করেন।

তখন কী হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সর্বথা বর্তমানঃ অপি'—যে-কোনও অবস্থায় থাকুক না কেন 'স যোগী ময়ি বর্ততে'—সে যে-কর্মই করুক না কেন, সকল কর্মের অবস্থার মধ্যে সবসময় আমার মধ্যেই সে অবস্থান করে। সে হয়তো নির্জন গিরিগুহায় আছে অথবা সংসারে, কিন্তু সকল অবস্থায় সে আমাতেই যুক্ত হয়ে আছে। কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। সে নিত্যযুক্ত। নিত্যমুক্ত।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ।। ৩২

অর্জুন (হে অর্জুন) যঃ (যিনি) আত্মা-ঔপম্যেন (নিজের সঙ্গে তুলনা করে) সর্বত্র (সকল জীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখ [সকল বস্তুকেই]) সমং (সমভাবে) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (সেই) যোগী (যোগী) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (এই আমার মত)।

হে অর্জুন, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে অভিন্ন তুলনা করে সর্বভূতের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করেন, তিনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

আগের শ্লোকেরই ব্যাখ্যা বর্তমান শ্লোকে চলছে। 'আত্মা-ঔপম্যেন'—আমি নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে যেরকম অনুভব করি, অন্যদের সুখ দুঃখে সেইরকম অনুভব করব।

আত্ম-উপমা, নিজের সঙ্গে তুলনা করে অর্থাৎ নিজের সঙ্গে অভেদ মনে করে, অপরের সুখ-দুঃখকে তিনি নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করেন। অপরের সুখে সুখী এবং অপরের দুঃখে দুঃখী। সকলের প্রতি ভালবাসা, ভালবেসে ধন্য হয়ে যাওয়া—এই হল সব ধর্মের মূল কথা। নিজেকে যেমন ভালবাসি তেমনি অপরকেও ভালবাসতে হবে। কিন্তু কেন আমি অপরকে ভালবাসব? শত্রুকেই বা কেন ভালবাসতে যাব? কারণ আমি আমার আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে ভালবাসি বলে। আমার আত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। সমাধিমান যোগিপুরুষ সকলের মধ্যে এক আত্মাকে দেখেন, সারা বিশ্বের সঙ্গে তিনি একাত্মতা বোধ করেন। তাঁর প্রেম বিশ্বপ্রেম।

ভগবানের এই বাণীটি শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের সঙ্গে অপূর্ব মিল রয়েছে। শ্রীমা সারদা দেবী বিশ্বজননী। সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর কোলে স্থান দিয়েছেন। দৈনিন্দিন ব্যবহারিক কর্মে সকল জীবের আত্মার সঙ্গে তিনি এক অনুভব করতেন। ডাকাত, দুলে-বাগদি থেকে শুরু করে গৃহী, সন্ন্যাসী ও পাশ্চাত্যের সকল সন্তানকে সেইসঙ্গে জীবজন্তুকেও তিনি কোলে স্থান দিয়ে সর্বজীবে এক আত্মা দর্শন করতেন। একটি বেড়ালকে মারছে দেখে শ্রীমা বলছেন—ওর মধ্যেও আমি আছি, সকল পাখী-পশুর মধ্যেও তিনি এক দেখছেন ও তাদের কষ্টে শ্রীমা সাড়া দিচ্ছেন। সকল জীব—মানুষ, পশু-পাখী তাঁর সন্তান, জন্মজন্মান্তরের মা তিনি, আত্মার সম্পর্ক। তাই সকলের দুঃখ তাঁর দুঃখ এবং সকলের সুখ তাঁর সুখ। তিনি বলছেন, কেউ তোমার পর নয়, জগৎ তোমার, সকলকে ভালবাসতে হয়। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে তিনি সমভাব, অথচ অপরের দুঃখে তিনি কাঁদছেন এবং অপরের সুখে তিনি আনন্দিত হচ্ছেন। জগতের দুঃখে তিনি কাতর হয়ে দিনরাত প্রার্থনা, সাধনা করছেন ও কঠিন তপস্যা—আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে সূর্য উদয়-অস্ত পর্যন্ত তপস্যা করছেন। নরদেহ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জপ ও প্রার্থনা করছেন কিসে তাঁর সন্তানদের কল্যাণ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক গুরুভাইকে বলছেন, 'হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।' আর একদিন বেলুড় মঠে স্বামীজী রাত দুটোর সময় উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ঘুম ভেঙে গেছে। বাইরে এসে স্বামীজীকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী বললেন : 'বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল আর ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয়, কোনও জায়গায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে।' আশ্চর্য! পরদিন সকালের খবরের কাগজে দেখা গেল, ফিজির কাছে একটা দ্বীপে অগ্নুৎপাত হয়ে বহু লোক মারা গেছেন। অগ্নুৎপাত হয়েছে

ঠিক সেই সময়টায়—যে-সময় কিসের যেন আঘাতে স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই একাত্মতা বোধ যাঁর হয়েছে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

আসলে এক ছাড়া দুই নেই। আমি আপনি এক। আমরা সবাই এক। সবার সুখে সুখী। সবার দুঃখে দুঃখী। যতক্ষণ অন্যের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখের সামান্য তফাতও রয়েছে, ততক্ষণ আমার আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি। আত্মজ্ঞান হলে জগতের সবার সুখ-দুঃখ যোগীর হৃদয়কে নাড়া দেয়। তখন অপরের দুঃখ ঘোচাতেই সে ব্যস্ত। এই কারণেই গৌতমবুদ্ধ গৃহত্যাগী হয়েছেন, শ্রীচৈতন্য হয়েছেন সন্ন্যাসী।

এই অভিন্নতাবোধ এবং সমত্বভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। এই তত্ত্ব যদি আমাদের মাথায় ও হৃদয়ে কিছুটা প্রবেশ করে তবে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে এবং সমাজে অসাধারণ পরিবর্তন আসবে। বেদান্তের এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদের ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজের প্রতিটি কর্মের পশ্চাতে রাখতে হবে। তবেই আমরা এই জীবনে এবং এখানে স্বর্গ রচনা করতে সক্ষম হব।

অর্জুন উবাচ
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ।। ৩৩

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বললেন) মধুসূদন (হে কৃষ্ণ) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) সাম্যেন (সমত্বরূপ, সম্যগ্‌দর্শনরূপ) অয়ং (এই) যঃ (যে) যোগঃ (যোগ) প্রোক্তঃ (বলা হল) চঞ্চলত্বাৎ ([মনের] চঞ্চলতাবশত) এতস্য (এর) স্থিরাম্ (স্থির,অচল) স্থিতিম্ (স্থিতি) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখছি না)।

অর্জুন বললেন, হে মধুসূদন, তুমি এই যে সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের কথা ব্যাখ্যা করলে, মন যা চঞ্চল তাতে এই ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ বুঝিয়েছেন সমদর্শিতা কাকে বলে। এবার অর্জুন একটু প্রতিবাদ করছেন। বলছেন, 'যঃ অয়ং যোগঃ ত্বয়া প্রোক্তঃ'—তুমি 'যোগ'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করলে, যোগের যা সংজ্ঞা দিলে তার অর্থ হল সাম্য, সমতা। আমরা সবাই এক—এই তো তোমার বক্তব্য? তারপর বলছেন, 'চঞ্চলত্বাৎ'—আমার মন চঞ্চল। আমাদের সবার মনই চঞ্চল। তাই 'স্থিরাম্ স্থিতিং অহং ন পশ্যামি'—এই যোগের অচলা স্থিতি আমি দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ চঞ্চল মনে এই যোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। কীকরে মন স্থির হবে, শান্ত হবে, কীভাবে মানুষ সমদৃষ্টি লাভ করবে—তা তো আমি বুঝতে পারছি না। তুমি যা বলছ, সমতা, সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু সেটা কার পক্ষে সম্ভব ? যাঁর মন শান্ত, সংযত, স্থির, নিস্তরঙ্গ। কেবল তাঁর পক্ষেই এই সমদর্শন যোগে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। কিন্তু আমার এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, এই অসাধারণ যোগদৃষ্টি লাভ করার মতো

উপযুক্ত স্থৈর্য এবং একাগ্রতা আমার নেই। বাস্তবিক আমরা কেউ সহজে মনকে একাগ্র করতে পারি না। মনের ঐ নিশ্চলতা, স্থিরতা ও দৃঢ়তা আমাদের নাগালের বাইরে।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ।। ৩৪

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) হি (যেহেতু) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতই মন চঞ্চল) প্রমাথি ([ইন্দ্রিয়ের] বিক্ষেপকারী) বলবৎ (শক্তিশালী) দৃঢ়ম্ (দৃঢ়) অহং তস্য নিগ্রহং (আমি তার নিরোধ) বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) সুদুষ্করং মন্যে (দুঃসাধ্য বলে মনে করি)।

হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষেপকারী এবং বলবান ও দৃঢ়। সেহেতু আমি মনে করি, বায়ুকে আবদ্ধ করে রাখা যেরূপ দুঃসাধ্য মনকে বশে আনাও সেরূপ কঠিন।

এই মন, এ অত্যন্ত চঞ্চল, একে দমন করা বড় কষ্ট। যেমন বাতাসকে কেউ দমন করতে পারে না, আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারে না, মনটাও হচ্ছে তাই। বিচার করে এই মনকে আয়ত্তে আনা অত্যন্ত কঠিন। তাই অর্জুন আমাদের সকলের মনের সংশয়ের কথা বলছেন: হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যে সমত্বযোগের কথা এতক্ষণ বললেন, তা নিঃসন্দেহে ভাল; কিন্তু সেটা তো সকলের জন্য নয়। যাঁর মন চঞ্চল, অস্থির তাঁর পক্ষে তো এ যোগ অভ্যাস করা সম্ভব নয়। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, অধিকাংশ লোকেরই তো মন চঞ্চল। তুমি কি তা জান না? 'প্রমাথি'—এই মনই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিক্ষিপ্ত করে। খেপিয়ে দেয়। মাতিয়ে তোলে। মন অত্যন্ত শক্তিশালী। মন আমাকে যেখানে-সেখানে নিয়ে ফেলে। যেন মত্ত হাতী। সবসময় ছুটছে। স্বামীজী রাজযোগের ভূমিকায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলছেন, আমাদের মন যেন একটা বাঁদর । বাঁদর এমনিতেই চঞ্চল, কখনও স্থির হয়ে বসে না। সেই বাঁদরকে কে যেন মদ খাইয়ে দিয়েছে। তাতে আবার তাকে একটা কাঁকড়াবিছে কামড়েছে। বিষের জ্বালায় সে ছটফট করছে। এই অবস্থায় তাকে ভূতে পেয়েছে। এই হল আমাদের মনের অবস্থা। এই মনকে বশে আনতে হবে। সংযত করতে হবে। এ বড় শক্ত কাজ। অর্জুন ভাবছেন, এ কি সত্যিই সম্ভব? বাতাসকে কি কেউ হাত দিয়ে ধরতে পারে? দড়ি দিয়ে বাঁধতে পারে?—না, পারে না। আমাদের মনও ঐরকম।

চিত্তের সমত্ববুদ্ধি ও শান্তভাব অর্জনই যোগের মূল কথা এবং সেইজন্য মনের সংযম একান্ত আবশ্যক। অতএব অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, বাতাসকে যেমন ধরে রাখা যায় না, আমাদের মনকেও তেমনি বশে আনা যায় না। মনকে বশে আনা মোটেই সহজ কাজ নয়। অত্যন্ত দুরূহ। সুতরাং চিত্তের নিরোধপূর্বক যোগের সাধন কীভাবে সম্ভব?

শ্রীভগবানুবাচ
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ।। ৩৫

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) মহাবাহো (হে মহাবীর) মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (মন দুর্নিরোধ ও চঞ্চল) অসংশয়ং (এতে কোনও সংশয় নেই) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) অভ্যাসেন (অভ্যাসের দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (ও বৈরাগ্যের দ্বারা) [ঐ মন] গৃহ্যতে (বশে আসে)।

শ্রীভগবান বললেন, হে মহাবাহো, মন যে অত্যন্ত চঞ্চল এবং মনকে বশে আনা যে অতি কঠিন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশে আনা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি যা বলছ সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এই মনকে বশীভূত করা সত্যিই কঠিন। আমাদের মন ভয়ানক দুষ্টু। অত্যন্ত চঞ্চল। সবসময় ছুটে বেড়াচ্ছে। এ সবই ঠিক, আমি মানছি। কিন্তু তুমি যে বলছ মনকে কিছুতেই বশে আনা যায় না—একথা ঠিক নয়। তবে এ অতি কঠিন কাজ। কিন্তু অসম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল, কী উপায়ে মনকে সংযত করা যায়?—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা।

অভ্যাস অর্থাৎ মনকে একাগ্র করা। একই চিন্তা বা কাজের পুনঃপুন অনুশীলন করা। মনকে সংযত ও একাগ্র করতে হলে এই অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজন। মনের স্বাভাবিক গতি বহির্মুখী অর্থাৎ আমাদের মন বাইরের বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে চায়। মনের বহির্মুখী গতিকে মোড় ফিরিয়ে অন্তর্মুখ করতে অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু তা একদিনে হয় না। নিয়মিত অভ্যাস করতে হয়। আমি হয়তো মনকে ধরার চেষ্টা করছি। কখনও কখনও হেরেও যাচ্ছি। সংস্কারের ফলে মনে ভাল চিন্তা আসবে, আবার মন্দ চিন্তাও আসবে। জন্মজন্মান্তরের অশুভ সংস্কার আমি একজন্মে কাটানোর চেষ্টা করছি। কাজেই এসব হবে। কিন্তু তা বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। চেষ্টা করতে করতে একদিন দেখব মন আমার আয়ত্তে। তখন আমি মনের দাস নই। মনই আমার দাস। এ অবস্থায় আমি মনকে যেভাবে চালাব, মনও সেভাবেই চলবে।

একটা আত্মবিশ্বাস আমাদের অবশ্যই থাকা চাই। তুমি যদি বল, কোনও কাজ তোমার পক্ষে করা অসম্ভব, তাহলে সে কাজ তুমি কোনওদিনই করতে পারবে না। তাই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে একটা প্রত্যয় থাকা দরকার, 'হ্যাঁ, আমি এটা অবশ্যই করতে পারি।' একমাত্র তখনই সাফল্য জীবনে আসবে। অসাধ্য বলে কিছু নেই। আমরা সফল হবই, জয় আমাদের হবেই—এইরূপ একটা দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের অবশ্যই থাকা চাই। মনকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি এবং আত্ম-উপলব্ধির সামর্থ্য আমার মনের মধ্যেই সুপ্ত

আছে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের মনে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। মনের এই শক্তির উপর আস্থা চাই। প্রশিক্ষণ দিয়ে মনকে শক্তিশালী, একাগ্র ও স্থির করতে হবে।

আবার শুধু অভ্যাস করলেই চলবে না। সঙ্গে বৈরাগ্যকেও রাখতে হবে। বিষয়ে নিঃস্পৃহতা বা অনাসক্তির নাম বৈরাগ্য। বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের নাম অনুরাগ। বিষয়ের আসক্তিতে বৈরাগ্য আসলে মনঃসংযম সম্ভব। তখন অভ্যাসের দ্বারা মন একাগ্র হল, অর্থাৎ খুব শক্তিশালী হয়ে গেল। তখন হয়তো নানারকম বিভূতি এল। যা চাইছি তা সামনে চলে এল। তাই বৈরাগ্য যদি না থাকে তবে আমি একজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক হলাম। কিন্তু দুষ্টু লোক হলাম। মনের এই শক্তিকে আমি ভোগের কাজে লাগালাম। ভোগ মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। আমার মনের শক্তি আবার কমে গেল। আমি যেমন ছিলাম, তেমন হলাম। অথবা তার থেকেও নীচে নেমে গেলাম। এইজন্যেই বৈরাগ্য চাই। অভ্যাস করে আমি মনকে শক্তিশালী করব। কিন্তু আমার লক্ষ্য যেন সবসময় ঠিক থাকে। লক্ষ্যটা কী? ভগবান লাভ। সুতরাং এই শক্তিশালী মনকে আমি ভগবান লাভের জন্যই ব্যবহার করব। এ বৈরাগ্য ছাড়া সম্ভব নয়। বৈরাগ্য মানে কী? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন : ঈশ্বরে অনুরাগ, বিষয়ে বিরাগ । আর কোনও কিছু বৈরাগ্য নয়। কোনও বড় বড় কথা কিছু বলছেন না। একটা কথার মধ্যেই সব আছে—ঈশ্বরকে ভালবাসা। তাহলে বিষয়ে বিরক্তি আপনা-আপনিই আসবে। বৈরাগ্য অর্থাৎ ত্যাগ। ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ। ঘর-বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়ানোই কেবলমাত্র ত্যাগ নয়। প্রচলিত দৃষ্টিটা ত্যাগ করতে হবে। আমরা তো ইট, পাথর, গাছপালা, মানুষ কত কী দেখি। স্বামীজী বলছেন : আসলে তুমি ভগবান ছাড়া আর কিছু দেখছ না। এখন যা দেখছ সেটা ভুল দেখছ। ভগবানকেই মানুষ, টেবিল, দেওয়াল ইত্যাদি ভাবছ। কিন্তু এগুলি টেবিল, দেওয়াল নয়, আসলে ভগবান। এই মিথ্যা-দৃষ্টি ত্যাগ করতে হবে। সত্য-দৃষ্টি লাভ করতে হবে। আসল ত্যাগ তো সেখানেই। ভগবানকে ভালবাসতে বাসতে এই দৃষ্টিটা পালটে যায়। তখন সর্বভূতে আমার ইষ্ট আছেন এই বোধ জাগে। কাজেই সহজ উপায় হল ভালবাসা।

সুতরাং ভগবানলাভ করতে হলে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দুই-ই চাই। যেমন, যারা সার্কাসে খেলা দেখায় তাদের মন কীরকম একাগ্র। কিন্তু তারা কি সবাই ভগবানকে পেয়ে গেছে?—না। কারণ তাদের অভ্যাস আছে, বৈরাগ্য নেই। মনের শক্তিকে তারা জাগতিক কাজে লাগিয়েছে। তাই বলছেন, ধর্মজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্য থাকতে হবে। অভ্যাসের সাথে যদি তীব্র বৈরাগ্য থাকে তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। একদিন না একদিন লক্ষ্যে পৌঁছোবই।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ।। ৩৬

অসংযত-আত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা) যোগঃ (যোগসিদ্ধি) দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি মে মতিঃ (এই আমার মত) তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (সংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা) উপায়তঃ (বিহিত উপায়ে) [যোগ] অবাপ্তুং শক্যঃ (লাভ হতে পারে)।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যার মন সংযত হয়নি তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য—এই আমার অভিমত। কিন্তু যাঁর চিত্ত সংযত, এরূপ ব্যক্তি বিহিত উপায় অবলম্বন করে সতত চেষ্টা করলে, যোগে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন।

'অসংযত-আত্মনা'—যার মন সংযত নয়। অর্থাৎ যার নিজের তথা মনের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই তার দ্বারা যোগ হওয়া সম্ভব নয়—'যোগঃ দুষ্প্রাপঃ'। মনকে যে বশে আনতে পারেনি সে কখনও যোগী হতে পারে না। ভগবান স্বয়ং বলছেন, এই আমার অভিমত—'ইতি মে মতিঃ'। শ্রীকৃষ্ণ এখানে একটি কথাই বারবার বলতে চাইছেন—সংযম। আত্মসংযম। নিজেকে সংযত করা অর্থাৎ নিজেকে তথা মনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। সকলকে শিক্ষা দেব, কিন্তু নিজে মানব না, তা হয় না। তাই বলছেন, 'বশ্য আত্মনা'—যাঁর চিত্ত বশীভূত অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যাঁর মন বশীভূত হয়েছে, সেই মনের দ্বারা যোগ লাভ সম্ভব। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পুনঃপুন চেষ্টা করে মনকে বশে আনতে হবে। 'উপায়তঃ'—যথাবিহিত উপায়ে, অর্থাৎ শাস্ত্র অনুযায়ী অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পথ নির্ণয় করে। শাস্ত্রই আমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। শাস্ত্র কোনও কৃত্রিম উপায়ের কথা বলছেন না। যা করলে মন আমার কথামতো চলবে তা-ই বলে দিচ্ছেন। তা হল—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। মনকে আয়ত্তে আনার এই হল গোপন কৌশল। একথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আগেও বলেছেন, এখনও বলছেন। যাঁরা এভাবে মনকে জয় করতে পেরেছেন তাঁরাই প্রকৃত যোগী।

অর্জুন উবাচ
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ।। ৩৭

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন) কৃষ্ণ (হে ভগবান) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাসহকারে যোগসাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাৎ (যোগ থেকে) চলিত-মানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত হয়ে) যোগ-সংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য (যোগসিদ্ধি লাভ না করে) কাং গতিং গচ্ছতি (কোন গতি প্রাপ্ত হন?)।

অর্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগ অভ্যাস শুরু করেন, কিন্তু যত্ন না থাকার জন্য যোগভ্রষ্ট হন, এমন ব্যক্তি যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না। তাহলে তিনি কী প্রকার গতি লাভ করেন?

আগের আগের শ্লোকে ভগবান যোগসিদ্ধির কথা বলেছেন। এখানে অর্জুন জানতে

চাইছেন, কেউ যোগ থেকে বিচ্যুত হলে তাঁর কী গতি হয়। বলছেন, 'শ্রদ্ধয়া উপেতঃ'-–শ্রদ্ধার সঙ্গে যিনি যোগ অভ্যাস আরম্ভ করেছিলেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি যোগ অভ্যাস করে আসছেন। কিন্তু আত্মসংযমের অভাব, যত্ন বা নিষ্ঠা না থাকার জন্য পড়ে গেলেন অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট হলেন। শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথেই তিনি যোগ শুরু করেছিলেন। প্রথমে হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাসের জন্য কিছুটা পথও এগিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মিত যোগ অভ্যাস না করার জন্য মনকে বশে আনতে পারলেন না। একটু আলস্য অর্থাৎ গা-ছাড়া ভাব আসার ফলে মন দুর্বল হতে লাগল। মনের চঞ্চলতা বেড়ে গেল, নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে লাগল। তখন তিনি যোগ থেকে সরে এলেন। সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলেন না। আমাদের সকলেরই এমন অভিজ্ঞতা আছে। ছোটবেলায় আমরা সবাই রুটিন তৈরি করি। ভোর পাঁচটায় উঠব। হাত-মুখ ধোব। এতটার সময় পড়তে বসব। এতক্ষণ পড়ব। এই সময়ে খেলব ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা নিজে- নিজেই এই সংকল্প করে থাকি। কিছুদিন করলাম। তারপর আর সেই অভ্যাস ধরে রাখতে পারলাম না। এও ঠিক তাই। এর ফল কী হল? পরে তিনি মৃত্যুশয্যায় পড়লেন, আর যোগ অভ্যাস করতে পারলেন না। 'অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং'—যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। যোগ অভ্যাসের যে ফল তিনি তা পেলেন না। অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতে পারলেন না। তাই অর্জুন জানতে চাইলেন, হে কৃষ্ণ! এই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কী গতি হয়?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ।। ৩৮

মহাবাহো (হে মহাবাহো, কৃষ্ণ) ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ় (ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ থেকে বিচ্যুত) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়-বিভ্রষ্টঃ (উভয় পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে) ছিন্ন-অভ্রম্-ইব (ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায়) ন নশ্যতি কচ্চিৎ (কি নষ্ট হন না)?

হে মহাবাহো কৃষ্ণ! তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মোক্ষ থেকে বঞ্চিত হনএবং কাম্যকর্ম ত্যাগ করায় স্বর্গাদি ভোগসুখ থেকেও বঞ্চিত হন। অতএব ভোগ ও মোক্ষ উভয় পথ থেকেই ভ্রষ্ট হয়ে তিনি ছিন্ন মেঘখণ্ডের মতো কি আশ্রয়হীন হয়ে বিনষ্ট হয়ে যান?

যোগীপুরুষ যোগের পথ ধরেই চলছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরলাভ। ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবেন এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু সংযম অভ্যাসের যত্ন না থাকার দরুন সফল হলেন না। পথভ্রষ্ট হলেন। ফলে তিনি তাঁর আদর্শ থেকে সরে এলেন – 'ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়'। এমন ব্যক্তির কোনও আশ্রয় নেই। নিরাশ্রয়। এর ফলে তাঁর কী হল? 'উভয়বিভ্রষ্টঃ'—উভয় পথ থেকে ভ্রষ্ট হলেন। যোগিপুরুষ তাঁর সব কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন। স্বর্গলাভের কামনাও তাঁর নেই। ফলে স্বর্গসুখ ভোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত। আবার কত

সাধনা, কত উপাসনাই না করেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য, কিন্তু যোগভ্রষ্ট হওয়ার ফলে মুক্তিলাভও হল না। অর্থাৎ তাঁর একূল-ওকূল দুকূল গেল—'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ'। এ অবস্থায় সংসারের পথেও চলতে পারছেন না। আবার সংসার ছেড়ে ব্রহ্মের পথেও যেতে পারছেন না। উভয় সঙ্কট। অর্জুন এখানে একটা সুন্দর উপমা দিয়েছেন। বলছেন, আকাশে প্রকাণ্ড মেঘ। কিন্তু ঝড়ে সেই মেঘ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির অবস্থাও কী সেইরকম নয়? জাগতিক সুখ অথবা মুক্তি—দুই-ই তিনি হারিয়েছেন। অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, এমন ব্যক্তি ছিন্নমেঘের মতো নষ্ট হন না কী? তাঁর ভবিষ্যৎ কী?

এখানে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'মহাবাহো' বলছেন। ভগবান ভক্তকে সমস্ত বাধা- বিপদ থেকে রক্ষা করেন। ভক্ত যাতে কোনও কষ্ট না পায়, তার জন্য তিনি সদা ব্যস্ত। ভক্তকে তিনি বুক দিয়ে আগলে রাখেন। ভক্তের চোখে জল দেখলে তাঁর প্রাণ ছটফট করতে থাকে। সেই জল মোছবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। 'মহাবাহো' বলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ।। ৩৯

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) মে এতৎ সংশয়ম্ (আমার এই সন্দেহ) অশেষতঃ (নিঃশেষে) ছেত্তুম অর্হসি (ছেদন করতে তুমিই যোগ্য) হি (যেহেতু) তৎ-অন্যঃ (তুমি ছাড়া) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (এই সংশয়ের নিবর্তক) ন উপপদ্যতে (আর কেউ নেই)।

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষে ছিন্ন করতে পার। কারণ তুমি ছাড়া আর কেউই এ সংশয় দূর করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কি শেষ পর্যন্ত ছিন্ন মেঘের মতো আশ্রয়হীন হয়ে নষ্ট হয়ে যায়? তাঁর বাঁচবার কি আর অন্য কোনও পথ নেই? এসব নানা সন্দেহ অর্জুনের মনে জেগেছিল। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন : আমার সব সংশয় তুমি একেবারে দূর করে দাও। আমার সব সমস্যার কথা আমি তোমার সামনে তুলে ধরলাম। তুমি ছাড়া এই সংশয়ের সমাধান আর কেউ করতে পারবে না, এ আমি নিশ্চিতরূপে জানি।

অর্জুন ভাবছেন, শ্রীকৃষ্ণের মতো সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান জগদ্‌গুরু আমি আর কোথায় পাব? তিনি অন্তর্যামী। আমি বলার আগেই তিনি আমার মনের কথা জানতে পারেন। আমার কিসে ভালো হবে, মঙ্গল হবে তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মতো আপনজন আমার আর কেউ নেই। তিনিই আমার জীবনের সব। একাধারে মা, বাবা, ভাই, বন্ধু—আপনার চেয়েও আপন তিনি। এ সংসারে তাঁর মতো কেউ আমায় ভালোবাসে না। ভগবানকে এমন আপনার বোধ হলে তবে তিনি ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেন।

শ্রীভগবানুবাচ
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ।। ৪০

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) পার্থ (হে অর্জুন) তস্য (তাঁর) ইহ এব (এই লোকে) বিনাশঃ ন বিদ্যতে (বিনাশ নেই) অমুত্র এব ন (পরলোকেও নেই) হি (যেহেতু) হে তাত (হে বৎস) কল্যাণকৃৎ (শুভকর্মকারী) কশ্চিৎ (কেউই) দুর্গতিং ন গচ্ছতি (দুর্গতি প্রাপ্ত হন না)।

শ্রীভগবান বললেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনষ্ট হন না। কারণ, হে বৎস, যে অপরের কল্যাণ করে, কল্যাণকারী ব্যক্তির কখনো দুর্গতি হয় না।

অর্জুন ভাবছেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তো নিরাশ্রয়। আকাশে যেমন ছিন্ন মেঘ ভেসে বেড়ায় সেও ঠিক তেমনি লক্ষ্যহীন। ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও তার কোনও স্থান নেই। এসব কথা ভেবে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কী গতি হয়? উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন, স্বর্গে অথবা মর্তে কোথাও তার বিনাশ নেই। একথা সত্য যে, সে স্বেচ্ছায় কর্ম বা উপাসনা ত্যাগ করেছে। করা উচিত নয়, তবু করেছে। তাই মৃত্যুর পর পিতৃলোক বা দেবলোকে সে যেতে পারবে না। আবার যোগে সিদ্ধিলাভ না হওয়ায় তার মুক্তিও হবে না। আবার জন্মাতে হবে। কিন্তু তাই বলে তার কোনও দুর্গতি হয় না। যদি সেই ব্যক্তি জীবনে একটিও ভাল কাজ করে থাকে তাহলে তার কখনো ক্ষতি হতে পারে না। তবে সেই কাজ অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত হওয়া চাই। গীতায় কর্মের প্রশংসা--কর্ম যে কত মহৎ তা নানাভাবে বোঝানো হয়েছে। তাই শ্রীভগবান বলছেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুর আগে যদি একজন লোকেরও কল্যাণ করে তবে তার সদ্গতি হয়। তাকে তো নরকে যেতে হয়ই না, বরং তার ইহকাল ও পরকাল দুই-ই রক্ষা পায়। ভগবান পরম আশ্বাস দিয়ে অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন, আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি—যিনি কল্যাণ বা মঙ্গল বা শুভ কর্ম করেন তাঁর কখনোই দুর্গতি হয় না। ঐ ব্যক্তির কখনও অধোগতি হয় না। এই জন্মে শুভকর্মে প্রবৃত্তি ও সদিচ্ছার জন্য তাঁর চিত্তে সুসংস্কার জন্মায় এবং এই সুসংস্কার পরবর্তী কালে তাঁকে আরও শুভতর কর্মে নিয়োজিত করে। তাঁর শুভ চেষ্টা কখনও বিফল হয় না।

এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুর ভূমিকা নিয়েছেন। তাই তিনি অর্জুনকে ভ্রাতা, সখা ইত্যাদি বলছেন না, শিষ্যের মতো 'তাত' সম্বোধন করছেন। আদর করে 'বাছা', 'বৎস' বলে ডাকছেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ।। ৪১

যোগভ্রষ্টঃ (যোগচ্যুত ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যাত্মাদের) লোকান্ (প্রাপ্য লোক) প্রাপ্য (লাভ করে) শাশ্বতীঃ (বহু) সমাঃ (বছর) উষিত্বা (সেখানে বাস করে) শুচীনাং (সদাচারসম্পন্ন) শ্রীমতাং (ধনীর) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন)।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মা অর্থাৎ পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিদের প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে যান। সেখানে বহু বছর অতিবাহিত করেন। তারপর সদাচারসম্পন্ন কোনও ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

শুভ কর্মকারী পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রাপ্য যেমন ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক, পিতৃলোক ইত্যাদি লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়ে সেখানে বহু বছর অতিবাহিত করে পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ হয়তো যোগ অভ্যাস করছেন। ধ্যান ধারণা করছেন। সৎভাবে জীবন যাপন করছেন। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। পথ বিভ্রম হল। যে পথে যাচ্ছিলেন তার থেকে অন্য পথে চলে গেলেন। একসময় যোগসাধনায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ পদস্খলন হল। অথবা কোনও যোগীর হয়তো অল্পবয়সেই মৃত্যু হল। কিন্তু মৃত্যুর সময় ভোগ করার ইচ্ছা জাগল। শাস্ত্রে এঁদেরই যোগভ্রষ্ট বলে। মৃত্যুর পরে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কী গতি হয়? এই শ্লোকে ভগবান সেকথাই বলেছেন।

তিনি হয়তো যোগসিদ্ধির লক্ষ্য যে মুক্তি, তা লাভ করতে পারেননি সত্য, কিন্তু তিনি যতটুকু শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধনা করেছেন, তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হন। সাধনার ফল কখনও নষ্ট হয় না। ঐ যোগ অভ্যাসের ফলে মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মলোকে যান। সেখানে বহু বছর অতিবাহিত করেন। এই জগতে ভোগ স্থূলশরীরে হয়ে থাকে কিন্তু পরলোকে সূক্ষ্মশরীরে ভোগ হয়। স্থূলশরীরের আয়ু সীমিত ও নির্দিষ্ট কিন্তু সূক্ষ্মশরীরের পরমায়ু অনেক বেশি। সেই সূক্ষ্মশরীরের ভিতরে আবার আছে কারণশরীর। সেটি অতিসূক্ষ্মতম। মৃত্যুর পর স্থূলশরীর ছেড়ে এই দুই শরীর একত্র সূক্ষ্ম ও কারণশরীররূপে বেরিয়ে যায়। পরলোকে সেই সূক্ষ্মশরীরে পুণ্যভোগ শেষ হলে তিনি আবার পৃথিবীতে নেমে আসেন। এসে কোথায় জন্মান? পবিত্র, ধনীর গৃহে। ধনী হলেও তাঁর বাবা, মা, বাড়ির পরিজনরা ধার্মিক, ঋষিতুল্য হন। বিদ্যা, বিনয়, ঐশ্বর্য প্রভৃতি বিভূতিযুক্ত গৃহে জন্মায়। আসলে অনুকূল পরিবেশেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মান।

শাস্ত্র বলছেন, আপনি যদি পথ চলেন তবে দু-একবার হোঁচট খেতেই পারেন। অর্থাৎ জীবনে চলতে গেলে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। কী এসে যায় তাতে? নিজেকে সামলে নিতে হবে। কিন্তু না জন্মালে নিজেকে শোধরাবেন কী করে ? তাই যোগভ্রষ্ট পুরুষকে দেহধারণ করে আবার এ সংসারে ফিরে আসতে হয়। যদি এ জন্মে আমাদের কোন কর্ম অসমাপ্ত থাকে তখন পরজন্মে উপযুক্ত পরিবেশে ঐ কর্মটুকু সম্পন্ন করার

জন্য জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই হল পুনর্জন্মের ধারণা।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ।। ৪২

অথবা (অথবা) ধীমতাং (জ্ঞানবান্) যোগিনাম্ এব (যোগীদেরই) কুলে (বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন) ঈদৃশম্ (এরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) লোকে (ইহলোকে) এতৎ হি (এটিই) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ)।

অথবা, যোগভ্রষ্ট পুরুষ কেবল জ্ঞানী যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জগতে এরূপ জন্ম অতি দুর্লভ।

যোগের অভ্যাস করে যাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি তাঁরা জীবনে শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য ও কল্যাণগুণের অধিকারী হয়েছেন। সেইসব যোগী (জ্ঞানী ও কর্মযোগী) যদি যোগভ্রষ্ট হন তাহলেও তাঁদের ঐ সব কর্ম বিনষ্ট হয় না। হয়তো কোনও যোগীর অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়েছে কিন্তু মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে ত্যাগ, বৈরাগ্যের তীব্র আগুন জ্বলছিল। তাই মৃত্যুর সময় কোনও বিষয়চিন্তা তাঁর কাছে ঘেষতে পারেনি। কিন্তু অসময়ে শরীর চলে যাবার দরুন তিনি সিদ্ধিলাভও করতে পারেননি। মৃত্যুর পর এই যোগী কোথায় যান? এই শ্লোকে শ্রীভগবান তার উত্তর দিচ্ছেন। বলছেন, মৃত্যুর পর তিনি দরিদ্র, জ্ঞানী যোগীদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন একটা পরিবারে আসেন যেখানে সবাই যোগ অভ্যাস করেন। ঈশ্বরচিন্তা করেন। ধ্যান-ধারণায় মগ্ন। বাবা, মা বাড়ির পরিজনরা সকলেই একসুরে গাঁথা। ঈশ্বর ছাড়া তাঁরা কিছু বোঝেন না। কিছু জানেন না। বাড়ির পরিবেশই তাঁকে প্রেরণা জুগিয়ে চলে। বলে, 'হাঁ, ঈশ্বরের নাম করবে বৈকি। জীবনের লক্ষ্য তো ঈশ্বরকে জানা। তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা। তাঁর সাথে এক হয়ে যাওয়া। এককথায় ঈশ্বর হয়ে যাওয়া।' সত্যিই এ জগতে এরকম পরিবার খুবই দুর্লভ। এই প্রকার জন্ম মোক্ষের অনুকূল, তাই অতিশয় দুর্লভ।

আসলে আমাদের লক্ষ্য হল মুক্তি। আবার জ্ঞান না হলে মুক্তি লাভ করা যায় না। শরীর ছাড়া তো জ্ঞানলাভ হয় না। তাই যোগিপুরুষের অসময়ে শরীর চলে গেলেও তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়। কিন্তু তিনি এমন পরিবারে আসবেন যে পরিবার তাঁকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেবে। নানাভাবে সাহায্য করবে। ফলে তিনি শীঘ্রই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন। পূর্বের যোগ অভ্যাসের প্রবণতা একবার শুরু করলে সেই প্রবণতা আমাকে পরজন্মে ঐ যোগ অভ্যাসের দিকেই নিয়ে যাবে।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ।। ৪৩

কুরুনন্দন (হে কুরুপুত্র) তত্র (সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকম্ (পূর্বদেহজাত) তং বুদ্ধিসংযোগং (সেই মোক্ষবিষয়া বুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন) ততঃ চ (তারপর) ভূয়ঃ (পুনরায়) সংসিদ্ধৌ যততে (মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করেন)।

হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এই জন্মে মোক্ষ— বিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন এবং মুক্তিলাভের জন্য পুনরায় যত্ন করেন।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ অনুকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। আগের জন্মে তাঁর যে গুণ ছিল সেগুলি এ জন্মেও থাকে। সেগুলিকে তিনি কাজে লাগান। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তিনি মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধি লাভ করেন— 'বুদ্ধিসংযোগং লভতে'। বুদ্ধি কাকে বলে? ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য—এসব বিচার করাকেই বুদ্ধি বলে। যে বুদ্ধির দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি তা-ই প্রকৃত বুদ্ধি। এই-সৎ বুদ্ধি আমার চোখ খুলে দেবে। আমাকে বলে দেবে, এইটে করো, এইটে কোরো না। এই জ্ঞান-বুদ্ধি একদিনে হয় না। এ পূর্বজন্মের সংস্কার। শরীরটা আমি এই জন্মে লাভ করেছি। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্থূল দেহের নাশ হয়েছে। কিন্তু আগের আগের জন্মে আমি যা কাজ করেছি, সেই কাজের ফল আমার মনেই সঞ্চিত আছে। এ-ই সংস্কার। আমরা সবাই কিছু না কিছু কাজ করি, তা ভালোই হোক বা খারাপই হোক। কিন্তু কোনও কাজই আমরা নিজের ইচ্ছেমতো করতে পারি না। অবশ হয়ে করি। পূর্বজন্মের সংস্কারই আমাদের কাজ করতে বাধ্য করায়। পূর্বজন্মের সংস্কারজাত বুদ্ধি এখন এইজন্মে আমাকে প্রভাবিত করবে।

এখন প্রশ্ন হল, যোগভ্রষ্ট পুরুষকে কি আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হয়? অর্থাৎ প্রবর্তক থেকে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : 'না। আগের জন্মে তিনি যতটা সাধন করেছেন, এজন্মে তার পর থেকেই করবেন।' ধরা যাক কোনও একজন ব্যক্তি কলকাতা থেকে ট্রেনে কাশী যাচ্ছেন। পথে বৈদ্যনাথ দর্শন করার জন্য নেমেছেন। এরপর কাশী যেতে গেলে তাঁকে কি কলকাতায় ফিরে আসতে হবে? বৈদ্যনাথধাম থেকেই তিনি সোজা রওনা হবেন। ঠিক তেমনি, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞানলাভের জন্য পুনরায় প্রথম থেকে সাধন করতে হয় না। যা করা আছে তারপর থেকেই তিনি শুরু করেন। ক্রমে তিনি মুক্তির দিকে এগিয়ে যান।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'কুরুনন্দন' বলে সম্বোধন করেছেন। মহারাজ কুরু ভারতবর্ষের অতি পুণ্যবান ও চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তাই অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তুমি যোগভ্রষ্ট। কিন্তু তুমিও চেষ্টা করলেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে।

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ।। ৪৪

সঃ (তিনি অর্থাৎ সেই যোগী) অবশঃ হি অপি (অবশ হয়েই যেন) তেন (সেই) পূর্ব-অভ্যাসেন এব (পূর্ব অভ্যাসের দ্বারাই) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন) যোগস্য (যোগের স্বরূপ) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জানতে ইচ্ছুক হয়েই) শব্দব্রহ্ম (বেদকে অর্থাৎ বেদোক্ত কর্মফলকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন)।

তিনি অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্বজন্মের যোগ অভ্যাসজনিত শুভ সংস্কারের ফলে যেন অবশ হয়েই যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। এইভাবে কেবল যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, যোগ সম্বন্ধে স্বরূপ জানতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বৈদিক কর্মফলের (অর্থাৎ স্বর্গাদির) চেয়ে অধিক ফল লাভ করেন (সুতরাং যোগীপুরুষের তো কথাই নেই)।

'পূর্ব-অভ্যাসেন'—পূর্বজন্মের অভ্যাসবশত অর্থাৎ পূর্বজন্মের যোগ অভ্যাসের সংস্কারবশত। আমাদের প্রত্যেক জন্মের শুভ ও অশুভ কর্মফল সংস্কার হয়ে সঞ্চিত থাকে। এই সংস্কারই প্রারব্ধ। আবার প্রারব্ধই পরজন্মে আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে। ছোট ছোটো ছেলেমেয়েদের অন্নপ্রাশন হয়। বাবা-মায়েরা তাদের সামনে টাকা, মাটি, বই, কলম এসব রাখেন। সন্তানের কোনদিকে ঝোঁক তা পরীক্ষা করার জন্য। তারা বই বা কলমে হাত দিলে বাবা-মা বেজায় খুশি। ছেলে বা মেয়ে বিদ্বান হবে। আবার টাকা-পয়সায় হাত দিলেও খুশি। যাক সন্তানটি গরিব হবে না। বিশেষ বস্তুর প্রতি শিশুর এই ঝোঁককে পূর্বজন্মের সংস্কার বলে মনে করা হয়। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে হয়তো ভবিষ্যতে তার মধ্যে এই গুণের বিকাশ ঘটবে।

অর্জুনের মনে সংশয় জেগেছে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগিকুলে জন্মালে তাঁর পরিবেশ যোগের অনুকূল হতে পারে। কিন্তু ধনীর গৃহে জন্মালে তো তাঁর বিষয়াসক্ত হওয়ার সম্ভবনা। এই সংশয় দূর করার জন্য শ্রীভগবান বলছেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। ভোগের বিষয় সামনে এলেও তাঁর মধ্যে ভোগের ইচ্ছে জাগে না। 'জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য'—যিনি যোগমার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বা যিনি হয়তো যোগের স্বরূপ জানতে আগ্রহী হয়েছেন। তাঁর পূর্বজন্মের এই সংস্কারগুলিও তাঁকে পরের জন্মে অজ্ঞাতসারেই অনুপ্রাণিত করবে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ঐরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি শীঘ্রই একজন জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধানকারী ও অন্বেষক হয়ে ওঠেন এবং যোগাভ্যাসে যত্নপর হন।

তারপর বলছেন, 'শব্দব্রহ্ম অতিবর্ততে'—যোগভ্রষ্ট পুরুষ বৈদিক কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন। এখানে 'শব্দব্রহ্ম' মানে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ। আবার বেদ বলতে বৈদিক কর্মকে বোঝানো হয়েছে। বেদে যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি নানা সকাম কর্মের কথা আছে। পুত্র চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, ধন চাই, স্বর্গ চাই। তাই কর্মকাণ্ড। কিন্তু এইসব সকাম কর্ম যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। অর্জুন স্বয়ং তার সাক্ষী। তিনি যুদ্ধ করতে এসেছেন। যুদ্ধে শত্রুকে জয় করে ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন। তা না করে বিষয়সুখ জলাঞ্জলি

দিয়ে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়েছেন। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে তাঁর মধ্যে পূর্বজন্মের সংস্কার জেগে উঠেছে। তাই সাম্রাজ্যসুখও তাঁকে টলাতে পারছে না। তাঁর জ্ঞানচিন্তাকে অভিভূত করতে পারছে না।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ।। ৪৫

তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ ([পূর্বজন্মকৃত] যত্ন অপেক্ষা) যতমানঃ (অধিকতর যত্ন করে) সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হয়ে) যোগী (যোগীপুরুষ) অনেক-জন্ম- সংসিদ্ধঃ (বহুজন্মের সাধনার ফলে) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (শ্রেষ্ঠগতি) যাতি (লাভ করেন)।

কিন্তু যে যোগী পূর্বজন্মের যত্ন অপেক্ষা অধিক যত্নপূর্বক যোগঅভ্যাস করেন তিনি নিষ্পাপ হন এবং অনেক জন্ম-অর্জিত সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে পরমগতি লাভ করেন।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি এই জন্মে কীভাবে সিদ্ধিলাভ করেন সেকথাই এখানে বলা হয়েছে। যে একবার ভুল করে ফেলেছে, হোঁচট খেয়েছে, সে যেন না মনে করে 'আমার আর কিছু হবে না।' নিজেকে অক্ষম মনে করা, অধম মনে করা—এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু নেই। স্বামীজী বলতেন, নিজেকে পাপী মনে করাই পাপ। মানুষ ভুল করে, আবার মানুষই পারে সেই ভুল শুধরে নিতে। ঈশ্বরের দিকে এগোতে গেলে প্রয়োজন এক গতিশীল আধ্যাত্মিক জীবন। বদ্ধ, গতিহীন জীবন হলে হবে না। চায়: উচ্চতর নৈতিক এবং চারিত্রিক নীতিকে ভিত্তি করে সৎ জীবনযাপন করা এবং ঈশ্বরকে ভালবেসে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

তাই বলছেন, 'প্রযত্নাৎ যতমানঃ'—খুব যত্নের সঙ্গে অর্থাৎ প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে যিনি যোগ অভ্যাস করেন। তিনি 'সংশুদ্ধকিল্বিষঃ'—তাঁর মনের যত পাপ, যত কালিমা সব মুছে যায়। পূর্বজন্মের সব ভুলভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। বুদ্ধি নির্মল হয়। তিনি নিষ্পাপ হয়ে যান। তখন কী হয়? তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগে। তিনি আরও যত্নবান হন। আগের চেয়ে আরও বেশি সাধন-ভজন করেন। 'অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ'—জন্মজন্মান্তরের যোগাভ্যাসের ফলে সঞ্চিত যে শুভ সংস্কার তা নিয়েই তিনি জন্মেছেন। সেই পুণ্যফলে তিনি এজন্মেই সিদ্ধিলাভ করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। 'পরাং গতিং যাতি'—জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি মুক্ত হয়ে যান।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ।। ৪৬

যোগী (যোগীপুরুষ) তপস্বিভ্যঃ (তপস্বীদের থেকে) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি (জ্ঞানীদের থেকেও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) কর্মিভ্যঃ চ (সকাম কর্মকারিদের থেকেও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) (এই আমার) মতঃ (মত) অর্জুন (হে অর্জুন) তস্মাৎ (সেইজন্য) (তুমি) যোগী ভব (যোগী হও)।

যোগী তপস্বীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কর্মীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ—এই আমার মত। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

শ্রীভগবান যোগীদের সবার উপরে স্থান দিচ্ছেন। যোগী অর্থাৎ যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সর্বভূতহিতে রত আছেন। সেই যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তপস্বী বলতে যাঁরা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা করেন—তাঁদের বোঝানো হয়েছে। ধর্ম বলতে তাঁরা আচার-অনুষ্ঠানকেই বোঝান। শাস্ত্রের তত্ত্ব তাঁরা জানেন না। আবার যোগী জ্ঞানীদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী অর্থাৎ শব্দজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী। তাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন কিন্তু শাস্ত্রের তত্ত্ব উপলব্ধি করেননি। তাঁদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। আমরা জ্ঞানের বুলি আওড়ে যাচ্ছি কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের নিজের নয়। পরের ধার করা। আবার যাগ-যজ্ঞ, পূর্তকার্য ইত্যাদি সকাম কর্ম যাঁরা করেন তাঁদের থেকেও যোগী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি শুধু যোগ অভ্যাসই করেন না, সর্বভূতহিতে রত। লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে তিনি নিষ্কামভাবে কাজ করেন। সব বাসনাকে তিনি জয় করেছেন। তাঁর মন স্বস্থানে অর্থাৎ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁর অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়েছে। তপস্বী বা কর্মী আত্মজ্ঞান থেকে এখনও অনেক দূরে। আবার যিনি পরোক্ষ জ্ঞানী, তিনি এখনও পরমতত্ত্ব আস্বাদন করেননি। এঁদের সবার থেকে যোগী শ্রেষ্ঠ। অর্জুন স্বয়ং যোগভ্রষ্ট মহাযোগী। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যোগনিষ্ঠ হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন।

একমাত্র যোগীই কামনা করেন ভগবানের সঙ্গে একান্ত মিলন। এই মিলনের মধ্যে সমস্তই আছে—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও, তুমি জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা ভগবানের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত হয়ে তোমার কর্ম সম্পাদন কর। তবেই তুমি শ্রেষ্ঠ যোগী হবে। তোমার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় ঘটবে। সেটিই হবে পূর্ণাঙ্গ সাধনা। এই যোগের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে নিবিড়তম পূর্ণ মিলন স্থাপন হবে।

বাস্তবিক আমরা সবাই যোগী হতে পারি। ভগবান যেন আমাকেই বলছেন—'তুমি একজন যোগী'। একজন গৃহবধূও যোগী। কারণ ব্যাবহারিক জীবনে চারটি যোগ—কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং ধ্যান—এর যে-কোনও একটি যোগ আমাদের অবশ্যই অভ্যাস করতে হয়। তাই আমরা সবাই যোগী হতে পারি। যোগী মনে করলে তবেই আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকাশ করতে সক্ষম হব। জীবনের সকল কর্মই আধ্যাত্মিক কর্ম এবং ঈশ্বরের কাজ। কাজের ভাল-মন্দ নেই, শুধু কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজটি করছি সেটাই বিচার্য। গীতার যোগ সকলের জন্য, এমনকী খেটে-খাওয়া নরনারীদের জন্যও। জীবনের দায়িত্বগুলি যেন সঠিকভাবে আমরা পালন করি—এটাই উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ এই

অভ্যাসকে বলছেন 'ব্যাবহারিক বেদান্ত'। অতএব হে জীব, যোগী হও।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ।। ৪৭

যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) মদ্গতেন (মদ্গত) অন্তরাত্মনা (চিত্তদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিদের মধ্যেও) যুক্ততমঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) (এই)মে (আমার) মতঃ (মত, সিদ্ধান্ত)।

যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মদ্গতচিত্তে আমার ভজনা করেন, যাঁর অন্তরাত্মা আমাতেই সমাহিত, তিনিই আমার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত—অর্থাৎ তিনিই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগীদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ যোগী কে? সেকথা বলেই এই অধ্যায় শেষ করা হয়েছে। শ্রীভগবান বলছেন, যত যোগী আছে তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রদ্ধাবান, মদ্গতচিত্ত, যাঁদের দেহ-মন-প্রাণ সব আমাতেই অর্পিত তাঁরাই 'যুক্ততমঃ'। আমার সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মা যুক্ত হয়ে আছে। এক হয়ে আছে। তাঁরাই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাঁরা কেবল আমাকেই ভালবাসে। আমাকেই চায়। শ্রদ্ধার সঙ্গে আমারই আরাধনা ও ভজনা করে। যোগীদের মধ্যে এঁরাই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য যোগী বলতে এখানে রুদ্র, আদিত্য, বসু প্রভৃতি দেবতাদের ভক্তকে বোঝানো হয়েছে।

ভগবান এখানে বলছেন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী এবং কে ভগবানের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে মিলিত। হে অর্জুন! তুমি যোগী হও, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতহিতে রত হও এবং আমার ভজনা কর অর্থাৎ আমাকে শ্রদ্ধা, আরাধনা, ও আমার সেবাকর্ম কর, তবেই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হবে। যোগ শব্দের অর্থ ভগবানের সঙ্গে মিলন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও সন্ন্যাসযোগ সাধনায় যোগী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সর্বভূতহিতে রত হন এবং ভগবানের উপাসনাতেই শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ অধিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়ে ঈশ্বরের সগুণভাব বা নির্গুণভাবে ভজনা ও সেবা করেন অর্থাৎ সর্বদা ভগবানের আরাধনা করেন, সেই মদ্ভক্ত বা ঈশ্বরভক্তই যুক্ততম, ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত, সেই যোগযুক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ।

'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং'—এইরূপ যোগীর মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও ত্যাগ সমস্তই আছে। অতএব সকল যোগীর মধ্যে যিনি তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা ভগবানে সমর্পণ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবানের ভজনা ও সেবা করেন, তিনিই ভগবানের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ততম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও শ্রেষ্ঠ যোগী। এইরূপ ভক্তিই অনন্যা ভক্তি। এইরূপ যোগীর সমস্ত মন প্রাণ ঈশ্বরে নিবিষ্ট।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকে প্রকৃত সন্ন্যাসী কে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর অষ্টাঙ্গ যোগ, যোগসাধনের উপায় প্রভৃতির বর্ণনা আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগী এবং কর্মসন্ন্যাসী—উভয়ের জন্যই ধ্যানযোগের উপদেশ দিয়েছেন। কারণ ধ্যানযোগের সাহায্যেই চঞ্চল মনকে বশে আনা যায়। আত্মায় সমাহিত করা যায়। সকল যোগের চরম লক্ষ্য আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন। ভগবান ধ্যানযোগ প্রসঙ্গে শুরু করছেন—'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং'—অর্থাৎ কর্মই মানুষের জীবনের উন্নতির প্রধান ও একমাত্র উপায়। কর্মফল আশা না করে, নিষ্কাম কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম। নিষ্কাম কর্ম যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত কর্মযোগী এবং প্রকৃত কর্মসন্ন্যাসী।

একমাত্র কর্মের দ্বারা মানুষ তার তমোগুণ নাশ করে, উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে, আবার কর্মের দ্বারাই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণে কর্ম হয়। তবে একমাত্র সৎকর্ম, শাস্ত্রীয় নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মন যতই শুদ্ধ, সংযত, প্রশান্ত ও সমদর্শী হয় ততই যোগী ঈশ্বরদর্শন বা আত্মজ্ঞানলাভের পথে এগিয়ে যায়। নিষ্কাম কর্মে মন শুদ্ধ হলে তখন ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ অভ্যাস সম্ভব। ভগবান তাই বলছেন, নিষ্কাম কর্ম, ধ্যান ও জ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপের বিচার অত্যন্ত যত্নসহকারে অভ্যাস করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ অর্থাৎ অহং, কর্তা, ভোক্তা, ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। মনকে তবেই বশে আনা সম্ভব। মন শুদ্ধ, সংযত, প্রশান্ত ও সমদর্শী হলেই ঈশ্বরদর্শন বা আত্মদর্শন সম্ভব। অতএব **'নিত্য অভ্যাস করা'**, **'শ্রদ্ধাবান ও যত্নশীল হওয়া'** এবং **'অহং ও আসক্তি ত্যাগ'করা**—এই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানবজীবনের উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি।

এখানে দুটি বিষয় একটু পরিষ্কার জানা চাই। প্রথমত যোগের উদ্দেশ্য—চিত্তবৃত্তির নিরোধ। চিত্তের সাধারণত পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা আছে, যেমন—

ক্ষিপ্ত—রাগ, দ্বেষ দ্বারা মন বশীভূত হয়ে কামনার দ্বারা বিষয়ে ধাবিত হয়।

মূঢ়—এই অবস্থায় চিত্ত তমোগুণের অধীন হয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

বিক্ষিপ্ত—চিত্ত সর্বদা বিষয়াসক্ত থেকে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একাগ্র—এক চিন্তায় চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তির নাম একাগ্রতা। এখানে সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্তে ঈশ্বরচিন্তা হয়।

নিরুদ্ধ—এই অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়ে যায়। তখন ঈশ্বর-চিন্তায় সমাধি হয়।

দ্বিতীয়ত যোগের নিত্য অভ্যাস। যত্নশীলতা ও বৈরাগ্য অনুশীলনের জন্য যোগের অষ্টাঙ্গ মার্গের বিষয় জানা চাই। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি দ্বারা যমের অনুশীলন।

অহিংসা—হিংসার অভাবই অহিংসা। অর্থাৎ সমস্ত জীবজগৎকে ভালবাসা। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কারও ক্লেশ উৎপাদন না করাই অহিংসা।

সত্য—সর্বদা সত্য ব্যবহার ও সত্য কথা বলা। কোনওরূপ স্বার্থের জন্য অসতের পক্ষ অবলম্বন না করা। সত্যকে ভালবাসা ও অধর্মের প্রতিরোধ করা।

অস্তেয়—কায়, মন ও বাক্যে অপরের দ্রব্যের প্রতি নিঃস্পৃহ থাকা। পরদ্রব্য গ্রহণ না করা।

ব্রহ্মচর্য—পবিত্র জীবন-যাপন ও ব্রহ্মচর্য পালন।

অপরিগ্রহ—নিজের ভোগের জন্য কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ না করা। অপরের কাছে চিত-হাত না করা ও দাসত্ব না করা।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম অনুশীলন করা।

শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচই চিত্তের প্রশান্ত ও নির্মলভাব রক্ষা করে। খাদ্য, বাস ও ব্যবহার পবিত্রতার সঙ্গে রক্ষা করতে হয়।

সন্তোষ—ভোগবিষয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া এবং অধিক লাভ ও লোভ না করা।

তপস্যা—ঈশ্বরচিন্তায়, কথায় ও কর্মে মনকে সর্বদা নিয়োজিত করা এবং এর জন্য উপরের নিয়মগুলি অনুশীলন করা।

স্বাধ্যায়—সৎ গ্রন্থ, শাস্ত্র নিত্য অধ্যয়ন এবং সৎ চিন্তায় (জপ ও তপস্যায়) মনকে নিয়োজিত রাখা।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ফলাকাঙ্ক্ষা না করে অর্থাৎ নির্বাসনা হয়ে ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা বা তাঁর শরণাগত হওয়া।

আসন—সুখ ও আনন্দের সঙ্গে পদ্মাসনে বা সুখাসনে, এক আসনে, স্থিরভাবে বসে ঈশ্বরচিন্তা করা।

প্রাণায়াম—সুখ ও আনন্দের সঙ্গে শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে ঈশ্বরচিন্তা করা।

প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক চিত্তকে ঈশ্বরচিন্তায় আকৃষ্ট করা বা পূর্ণ করা।

ধারণা—হৃৎপদ্মে চিত্তকে স্থির করা অথবা কোনও ইষ্টমূর্তিতে চিত্ত স্থির করা।

ধ্যান—যাতে চিত্তের ধারণা করা হয়, সেই ধ্যেয় অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুতে নিবিষ্ট বা আকারিত চিত্তবৃত্তি যখন এক প্রবাহে প্রবাহিত হতে থাকে তাই ধ্যান।

সমাধি—চিত্তে যখন একমাত্র ইষ্ট চিন্তা ছাড়া আর বিজাতীয় প্রত্যয় উঠতে পারে না, শুধু সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ অবাধে চলতে থাকে তখন সমাধি হয়। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অর্থাৎ যে-অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর সম্যক জ্ঞান থাকে। চিত্তবৃত্তি সম্যক লয় হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—যে-অবস্থায় চিত্তবৃত্তি একেবারে তিরোহিত হয় এবং মানসিক তরঙ্গ বা ক্রিয়ারও বিরাম অর্থাৎ লুপ্ত হয়। আত্মা নিজ-স্বরূপে নিজ-মহিমায় অবস্থান করে। তখন অনুভব হয় আত্মাই এক, নিত্য, অমর, অবিনশ্বর, চৈতন্যঘন সত্তা-স্বরূপ। এই দুই সমাধিকে আবার সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়। যখন সবিকল্পভূমিতে আছি, তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই তিনটের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি যখন হয়, তখন এই তিনটে এক হয়ে যায়। সবিকল্পভূমিতে যে বৃত্তি অর্থাৎ দর্শন হয়, সেই চিত্তবৃত্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে লীন হয়ে যায় নির্বিকল্প ভূমিতে।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

ভগবান এখানে তাঁর সমগ্র স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃতস্বরূপ তত্ত্ব। ঈশ্বর সগুণ আবার নির্গুণ, ব্যক্ত আবার অব্যক্ত। তিনি সনাতন পরম অব্যয় এবং তিনি জীবভূত পরাপ্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত। জগতের সমস্ত বস্তু ভগবৎ-সত্তায় সত্তাবান। বিজ্ঞানসহ ঈশ্বরের ঐ স্বরূপ অবগত হলে এ সংসারে অন্য কিছু আর জানার থাকে না।

সহস্র সহস্র মানুষ তাঁকে জানার চেষ্টা করে। যেমন আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী কিন্তু খুব অল্প ব্যক্তিই তাঁর স্বরূপ জানতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই সেই পরমাত্মাতেই নিহিত রয়েছে অর্থাৎ তিনিই সবকিছুর অন্তরাত্মারূপে রয়েছেন। তিনিই সর্বভূতের জীবন এবং সর্বভূতের সনাতন বীজ। তিনিই তিনগুণের দ্বারা জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন অথচ নিজে এই তিনগুণের অধীন নন। তিনি মায়াধীশ তাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে দৈবী মায়া অতিক্রম করা সম্ভব। যাঁরা তাঁর শরণাগত তাঁদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। পরমেশ্বর জীবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব জানেন কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। ঈশ্বরের দৈবী মায়ায় বশীভূত হয়ে রয়েছে সকল জীব। যাঁরা দৃঢ়সংকল্প হয়ে ঈশ্বরের ভজনা করেন তাঁরা জরা-মৃত্যু থেকে নিস্তার পেয়ে সেই পরমব্রহ্মকে লাভ করেন। ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে তাঁর শরণাপন্ন হতে হবে, তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে হবে। শরণাগত ভক্তের কাছে তিনি তাঁর সমগ্র রূপ প্রকাশ করেন। অতএব এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞান এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ অনুভবের উপায় অর্থাৎ বিজ্ঞান—প্রধানত এই দুই বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, বনের বেদান্তকে ব্যবহারিক জীবনে আনতে হবে অর্থাৎ বেদান্ত সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান হওয়া চাই সেই জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রতি কর্মে প্রতিফলিত করতে হবে সেটিই হবে বিজ্ঞান। জ্ঞানের সাধন করতে হলে তিনটি জিনিস মনে রাখতে হবে—জ্ঞানের প্রতি

শ্রদ্ধা, জ্ঞানের প্রতি একনিষ্ঠতা ও ইন্দ্রিয় সংযম—এই তিনটি হলো পবিত্র জ্ঞান অর্জনের অন্তরঙ্গ সাধন।

শ্রীভগবানুবাচ
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ।। ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন)—পার্থ (হে অর্জুন) ময়ি (আমাতে) আসক্ত-মনাঃ (নিবিষ্টচিত্ত) মৎ-আশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হয়ে) যোগং যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত হয়ে অর্থাৎ যোগ অভ্যাস করে) সমগ্রং (সর্ববিভূতিসম্পন্ন পূর্ণস্বরূপে, সগুণ ও নির্গুণরূপে) মাম্ (আমাকে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়ে) যথা (যেরূপে) জ্ঞাস্যসি (জানতে পারবে) তৎ (তা) শৃণু (শোন)।

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ, তুমি আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর এবং একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে যোগাভ্যাস করলে তুমি যেরূপে আমার সর্ববিভূতিসম্পন্ন পূর্ণ স্বরূপ, সগুণ ও নির্গুণ রূপ জানতে পারবে, তা শোন।

প্রশ্ন হচ্ছে : ভক্ত ভগবানকে কি করে জানবেন বা বুঝবেন? তিনি হয়ত খুব ভগবানের অনুরাগী হতে পারেন, কিন্তু শুধু অনুরাগের মধ্য দিয়েই কি তিনি ভগবানকে জেনে ফেলবেন? এই অধ্যায়ে ভগবানের স্বরূপ কী এবং কেমন করে তাঁর সাধনা করতে হয় তা-ই বিশদভাবে বলা হয়েছে। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের অর্থ শরণাগত হওয়া বা আত্মসমর্পণ করা। ভক্ত যখন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন তখনই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ জানতে পারেন। ভগবৎ-কৃপা একমাত্র শরণাগত ভক্তের উপরেই বর্ষিত হয়।

'সমগ্রং মাম্'—ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ ভাব, তাঁর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অবস্থা কিংবা বিশ্বরূপ—এই সমস্তই বোঝায়। শরণাগত ভক্তের কাছে ভগবানের কোনও রূপ অজ্ঞাত থাকে না। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের স্বরূপ, সকল বিভূতি ও সকল ঐশ্বর্য সহ ভগবানকে জানতে পারেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কিভাবে সম্পূর্ণরূপে তাঁকে জানা যাবে, সেকথাই তিনি বলবেন। 'অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু'—আমাকে নিঃসংশয়ে এবং পূর্ণরূপে কিভাবে জানতে পারবে, সেই কথাই আমার কাছে শোনো।'

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ।। ২

অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সাথে অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভূতিসহ) ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) অশেষতঃ (নিঃশেষে) বক্ষ্যামি (বলব) যৎ জ্ঞাত্বা (যা জানলে অর্থাৎ নিজ অনুভূতির দ্বারা যা লাভ করলে) ইহ (এখানে) ভূয়ঃ (আর) অন্যৎ (অন্য কিছু) জ্ঞাতব্যম্

(জানার বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে না)।

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ আমার স্বরূপবিষয়ক সমগ্র জ্ঞান বিশেষরূপে বলছি, যা জানলে এ সংসারে অন্য কিছু আর জানার থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন : আমি তোমাকে সাধ্য-সাধনের কথা বলছি। এ এমন জ্ঞান যা জানলে আর কিছুই জানবার থাকে না। কোন মূল তত্ত্বকে জানা জ্ঞান, আর মূলতত্ত্বের বিশেষরূপে অপরোক্ষ অনুভূতি হল বিজ্ঞান। জ্ঞান হল সাধারণ তত্ত্বজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হল সাক্ষাৎ অনুভূতি। ঈশ্বর সম্পর্কে নিবিড় প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিজ্ঞান এবং ঈশ্বরকে বোঝা বা ঈশ্বর সম্পর্কে জানা হল জ্ঞান। এই বিশ্বসংসার পরম ভগবানের প্রকাশ এবং সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানের অনুভূতিই বিজ্ঞান।

'যৎ জ্ঞাত্বা'—যা জানলে, 'ইহ'—এই জগতে, 'ভূয়োঽন্যৎ'—আর অন্য কিছু, 'জ্ঞাতব্যম্'—জানার 'ন অবশিষ্যতে'—বাকি থাকে না। পরম সত্যের মধ্যে জগতের সকল সত্য এসে যায়। ঈশ্বর পরম সত্য, সমগ্র সত্য। সেই পরমাত্মাকে জানলে তাঁর প্রকৃতি, জগৎ এবং কর্ম সকলেরই জ্ঞান হবে। তখন জানবার আর কিছুই বাকি থাকবে না, কারণ জগতের আর সকল জ্ঞান সেই পরম জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত।

ভগবান তাঁর স্বরূপ প্রকাশের কথা বলে অর্জুনকে পূর্ণ জ্ঞান দেবার আশ্বাস দিলেন। এই পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র পূর্ণ শরণাগত ভক্তই লাভ করতে পারে। কিভাবে সেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় সেই সম্পর্কে ভগবান জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভেদ দেখিয়ে বলছেন—পরমেশ্বকে জানার নাম - 'জ্ঞান'। আবার জ্ঞান-বিচার করে তাঁকে জানার নাম—'বিজ্ঞান'। এই বিজ্ঞান লাভ করলে আর কিছু জানার থাকে না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ।। ৩

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ (কোনও একজন হয়ত) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধিলাভের জন্য অর্থাৎ আমার স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য) যততি (যত্ন করেন)। যততাম্ (যত্নশীল) সিদ্ধানাম্ অপি (সিদ্ধপুরুষদের মধ্যেও) কশ্চিৎ (সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানতে পারেন)।

সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কেউ কেউ (অর্থাৎ দু একজনই) আমার স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করেন। আবার যত্নশীল সিদ্ধপুরুষদের মধ্যেও দুএকজনই আমার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন। (কারণ ব্রহ্মজ্ঞান অতিশয় দুর্লভ)।

হাজার-হাজার লোকের মধ্যে দু একজন হয়ত জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে হয়ত মাত্র একজন সফলকাম হয়। জ্ঞানলাভ, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ এমনি শক্ত ব্যাপার। এই সংসারে জীবগণের মধ্যে মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী। অথচ অধিকাংশ মানুষই

ইন্দ্রিয়সুখ লাভের নিমিত্ত সর্বদা ব্যস্ত। জগতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান ছাড়া অতিরিক্ত যে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে তা ধারণাই করা যায় না। অতি অল্প সংখ্যক মানুষ, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে,মাত্র দু-একজন ভগবৎ-জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করেন। যাঁরা এইরূপ যত্নশীল, ঈশ্বরলাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ভগবানের তত্ত্ব জানতে পারেন। এঁদের মধ্যে অর্থাৎ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পর ক্বচিৎ দু-একজন ভগবানের সমগ্র ভাব, ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ ভাব, তাঁর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অবস্থা কিংবা সর্ববিভূতিসম্পন্ন পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। ভক্তের এই অবস্থাটি হল পূর্ণ অবস্থা। অর্থাৎ এককথায়—একত্ব, সত্তার চরম ও পরম একত্ব বা অদ্বৈতানুভূতি।

বহু পুণ্যফলে জীব মনুষ্যত্ব লাভ করে। আবার বহু পুণ্য করলে তবে মুক্তিকামী হয়। আর বহু তপস্যার ফলে মুক্তিকামী মুক্তিলাভ করে। আধ্যাত্মিক জীবনে এইরূপ দেখা যায়, সকলেই হয়তো একসঙ্গে শুরু করেছেন, কিন্তু সামর্থ্য সকলের সমান নয়। কারও কারও একটু বেশি সময় লাগতে পারে। মূল সত্য হল—সকলেই কোন না কোন সময়ে আত্মজ্ঞান লাভের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে, কারণ সেটিই তার প্রকৃত স্বরূপ। আমাদের সকলের ভিতর সেই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছবার যোগ্যতা আছে।

ভগবান এখানে দুটি জ্ঞানের কথা পরিষ্কার করে বলছেন। একটি হলো পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলভ্য জাগতিক জ্ঞান। অন্যটি হল ইন্দ্রিয়াতীত অপরোক্ষ জ্ঞান। আমাদের দুই জ্ঞান গ্রহণ করতে হয়। শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করলে হবে না। ইন্দ্রিয়াতীত পারমার্থিক সত্যের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানও লাভ করতে হবে। ভগবান এই দুই সত্যকে বলছেন—পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। এই দুই সত্যের জ্ঞান থাকলে আমরা সাধারণ সত্য থেকে পরম সত্যের দিকে এগিয়ে যাব। অপরা বা বাহ্য প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করে যখন বুঝব এই জ্ঞান অনিত্য তখন নিত্য পরম জ্ঞান অর্থাৎ পরা প্রকৃতির জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হব। মুণ্ডকোপনিষদ-এ মহান ঋষি তাঁর শিষ্যকে এই দুই জ্ঞান লাভের কথা বলছেন।

শিষ্য শৌনক আচার্য অঙ্গিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান, কোন বিষয় জানলে এই সমস্ত বিশেষরূপে জানা যায়? 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।' ঋষি অঙ্গিরা উত্তরে বললেন, 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে'— 'পরা চ এব অপরা চ' অর্থাৎ দুইটি বিদ্যা জানবার আছে—একটি পরা বিদ্যা, অপরটি অপরা বিদ্যা।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।। ৪

ভূমিঃ (ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ অর্থাৎ অগ্নি) বায়ুঃ

(বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন) বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) অহঙ্কারঃ এব চ (ও অহঙ্কার) ইতি (এই) মে (আমার) অষ্টধা ভিন্না (অষ্টভাগে বিভক্ত) ইয়ং (এই) প্রকৃতি (ঐশ্বরী মায়াশক্তি)।

পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট ভাগে আমার ঐশ্বরী মায়াশক্তি বিভক্ত।

ভগবান এখানে অপরা প্রকৃতির বর্ণনা করছেন। বস্তুত এটি সৃষ্টি তত্ত্ব। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আট ভাগে ঈশ্বরের ঐশ্বরী মায়াশক্তি বিভক্ত। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—পরমেশ্বরের অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি। ভগবান তাঁর অষ্টবিধ প্রকৃতির স্থূলরূপ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চমহাভূতের পঞ্চ সূক্ষ্মাবস্থারূপ তন্মাত্র গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটিকে লক্ষণা দ্বারা উল্লেখ করছেন।

সাংখ্যমতে প্রকৃতিই ক্রিয়াশীলা এবং প্রকৃতির পরিণামই সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান ও প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ জ্ঞান হলে সর্বদুঃখের নিবৃত্তি ঘটে। এই প্রকৃতি চব্বিশটি অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি। যথা (১) মূল প্রকৃতি—প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রৈগুণ্য বিষয়া। এটিই জগতের মূল উপাদান। (২) মহত্তত্ত্ব—সৃষ্টি শুরু হলে মূল প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি আর বুদ্ধির পরিণাম অহঙ্কার। এটিই জীবের সমষ্টি বুদ্ধি। (৩) অহঙ্কার—মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার। আমি ভাব। আমি জ্ঞানই অহঙ্কার। (৪) মন—অহঙ্কারের পরিণাম এবং ইহা জ্ঞান ও কর্ম ইন্দ্রিয়ের চালক সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ। (৫- ৯) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ। (১০-১৪) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। (১৫-১৯) পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র। (২০-২৪) পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্। এবং (২৫) পঞ্চবিংশ তত্ত্বটি হল পুরুষ।

সাংখ্যমতে ১৬টি বিকার তত্ত্ব অর্থাৎ রূপ আছে। যেমন—পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন। আটটি প্রকৃতি তত্ত্ব—পঞ্চতন্মাত্র, অহংকার, মহৎ এবং অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি।

কিন্তু বেদান্তমতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। এক শুদ্ধচৈতন্য বিচিত্র জগৎরূপে প্রকাশিত। বস্তুত আমরা ভ্রমবশত বহু নামরূপের জগৎ দেখছি, বাস্তবিক একচৈতন্য বিরাজমান। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো ব্রহ্মের বিবর্তরূপ এই জগৎ দেখছি। কিন্তু ব্রহ্ম ও শক্তি—অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মতো এক , অতএব জগৎ ব্রহ্মের শক্তির প্রকাশ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমিই সমস্ত পার্থিব বস্তুরূপে প্রকাশিত আবার শুদ্ধ চৈতন্যরূপেও আমি সবকিছুর মধ্যেই রয়েছি।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ।। ৫

মহাবাহো (হে মহাবীর) ইয়ম্ (এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকৃতি) অপরা (অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট জড়) তু (কিন্তু) ইতঃ (এর থেকে) অন্যাং (পৃথক্) জীবভূতাং (জীবরূপ অর্থাৎ চেতনস্বরূপ) মে (আমার) পরাম্ (শ্রেষ্ঠ) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (জ্ঞান) যয়া (যার দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎপ্রপঞ্চ) ধার্যতে (ধৃত রয়েছে)।

হে মহাবাহো, এই পূর্বোক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি হল আমার অপরা প্রকৃতি কিন্তু এর থেকে আলাদা জীবরূপ অর্থাৎ চেতনস্বরূপ আমার পরা প্রকৃতিকে জান। এই প্রকৃতি থেকে জীবের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি এই জগৎ প্রপঞ্চকে ধারণ করে আছে।

দুই রকমের প্রকৃতি—চেতন ও অচেতন অর্থাৎ পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। চেতন প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, জীবচৈতন্য ও শুদ্ধ। অচেতন প্রকৃতি জড়, নিকৃষ্ট ও ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব জীব ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি রয়েছে তাই পরা প্রকৃতি। ঐ চিৎশক্তি বা চেতন প্রকৃতি অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করে থাকে। জীবচৈতন্য জানতে পারলে পরমাত্মাকে জানা হয়। 'আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট হয়ে নাম-রূপ (জগৎ) প্রকাশ করি।' চেতন প্রকৃতিই (পরা) অচেতন প্রকৃতির (অপরার) আধার। জড় প্রকৃতির চিন্তা করলে জীব জড় হয়। চেতন প্রকৃতির চিন্তা করলে জীব মুক্ত হয়।

জগৎ—নাম ও রূপ নিয়ে বিচিত্র। এই বৈচিত্রের মধ্যে এক, অখণ্ড চৈতন্যসত্তা রয়েছে। সেই এক চৈতন্যসত্তা বহুরূপে প্রকাশিত। ঐ এক চৈতন্যসত্তা পশ্চাতে না থাকলে নামরূপের খেলা চলতে পারে না। আমরা দুই জগতে বাস করে থাকি—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়াতীত অপরোক্ষ জ্ঞান। অপরা জ্ঞান এবং পরা জ্ঞান। ঐহিক জ্ঞান এবং পারমার্থিক জ্ঞান। জড়বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

আধুনিক যুগের মানুষের কাছে এটিই গীতার মর্মবাণী—জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানও জানা চাই। নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা জানতে না পারলে দুঃখের অবসান হবে না। নিজের অন্তরের দেবত্বের বিকাশের দ্বারাই ঈশ্বরলাভ সম্ভব অর্থাৎ যিনি নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করেন, একমাত্র তিনিই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন।

চিৎ এবং জড় একই সত্যের দুটি দিক। ভগবান বলছেন: আমার দুই প্রকৃতি—পরা এবং অপরা। চৈতন্যকে ব্রহ্ম বলা হয়—পূর্ণ সত্য, অনন্ত ও অবিনাশী—সমস্ত বিশ্বের একমাত্র উৎসস্থল। তবে একমাত্র মানুষ উন্নত হলে ধীরে ধীরে ঐ চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে। তাই বেদান্ত বলে বিবর্তন অর্থাৎ ক্রমবিকাশ ও চৈতন্যের প্রকাশ। চৈতন্য সদা অপরিবর্তিত কিন্তু বাইরের নাম ও রূপের বিবর্তন। বেদান্ত ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা দেয় এবং বলে, চৈতন্যের অভিব্যক্তির ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ-এইরূপ মানবে রূপান্তরিত হয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—জড় তোমার দাস, তুমি জড়ের দাস নও। তোমার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। তুমি ইচ্ছা করলে সেই পরমসত্য ব্রহ্মকে জানতে পার।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।। ৬

সর্বাণি (সকল,জড় ও চেতন) ভূতানি (সর্বভূতে) এতদ্-যোনীনি (এই উভয় প্রকৃতি থেকে জাত) ইতি উপধারয় (একথা ধারণা কর) অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয়ঃ (এবং প্রলয়ের কারণ)।

আমার এই পরা ও অপরা উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সর্বভূত উৎপন্ন হয়েছে—একথা ধারণা কর। সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ।

পরমেশ্বরের দুরকম প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে—পরা ও অপরা। এই দুই প্রকৃতি থেকে জড় ও চৈতন্যের সমাবেশে সব কিছুরই উদ্ভব। শুধু উদ্ভব নয়, বিনাশও। ঈশ্বরই এই দু'য়ের অর্থাৎ সৃষ্টি ও বিনাশের কারণ। জীবের চৈতন্যাংশ পরা প্রকৃতি এবং জড়াংশ অপরা প্রকৃতি। বাস্তবিক অপরা প্রকৃতির কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এর সত্তা হলো প্রাতিভাসিক নামরূপের খেলা। এক চৈতন্য জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করে নাম ও রূপ দ্বারা প্রকটিত হয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণ অহং সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্' আমি, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, আমার দ্বিবিধ প্রকৃতির মাধ্যমে এই জগতের কারণস্বরূপ।

যেহেতু পরা ও অপরা ঈশ্বরের প্রকৃতি তাই ভগবান বলছেন, আমিই এই নাম-রূপাত্মক জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান। যে প্রকৃতি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা আমারই প্রকৃতি, আমার থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি ও প্রকৃতির দ্বারা নাম-রূপের লীলাবিস্তার। ঈশ্বর ও পরা প্রকৃতি একই চৈতন্যসত্তা, তিনিই জীবাত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজ করছেন এবং ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি নাম-রূপাত্মক বিচিত্র জগৎ-রূপে প্রকাশিত। ভগবান তাঁর চৈতন্য শক্তির সৃষ্টি সংকল্প, সৃজনী শক্তি এবং অনন্ত চিৎশক্তি যা দেশকালের অতীত হয়েও দেশকালের মধ্যে নেমে এসে সৃষ্টি করছেন, আবার সৃষ্টির অবসানে সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। তবে বেদান্তে সৃষ্টি বা creation-এর কথা নেই। বেদান্ত বলে 'ঈশ্বর বিশ্বকে প্রকাশ করে তার ভিতরে আত্মারূপে, আমিরূপে, তুমিরূপে, চেতনরূপে বিরাজ করেন। 'তৎসৃষ্টা তদেব অনুপ্রাবিশৎ'। তিনি সমস্ত চেতন ও অচেতন অর্থাৎ জড়বস্তুর মধ্যেও এক চৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন। তবে জড় থেকে জীবকোষে উন্নীত হলে তখন চৈতন্যের প্রকাশ বোঝা যায়।

তাই ভগবান বলছেন, তিনি সর্বভূতের অন্তরে চৈতন্যরূপে নিত্য বিরাজিত, প্রকাশিত। জীবকোষের আরম্ভ থেকেই পরা প্রকৃতির প্রকাশ শুরু হল। ক্রমবিকাশ হল অপরা প্রকৃতিতে নিহিত পরা প্রকৃতির মুক্তি। অর্থাৎ নিম্ন প্রকৃতির বন্ধন থেকে উচ্চতর প্রকৃতিতে প্রকাশিত হওয়া। বেদান্ত বলে উচ্চতর অবস্থা হল আত্মজ্ঞান লাভ বা মুক্তি। সাধারণ একটি জীবকোষ অ্যামিবার মধ্যে যে ক্ষীণ চৈতন্য প্রকাশিত হয়েছিল সেই চৈতন্যই

ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে বুদ্ধ-চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হল। এখানেই বেদান্ত মানবজীবনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে—আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ। জীব চৈতন্যের গণ্ডি ভেঙে স্বস্বরূপে বিশুদ্ধ চৈতন্য সমুদ্ররূপে নিজ সত্তাকে প্রকাশ করার জন্য সংগ্রাম। বেদান্ত বলে সৎস্বরূপ-জ্ঞানস্বরূপ- আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যকে উপলব্ধি করা অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্য সর্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বপ্রকাশ। কিন্তু অপরা প্রকৃতি মায়ার দ্বারা আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন ও আবদ্ধ তাই বেদান্তের বিবর্তনের একটিই লক্ষ্য—কিভাবে এই শুদ্ধ পরা চৈতন্যকে অপরা জড়জগতের কবল থেকে মুক্ত করা যায়।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।। ৭

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) মত্তঃ (আমার থেকে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছুই নাই) সূত্রে মনিগণাঃ ইব (সূত্রে মণিসমূহের ন্যায়) ইদং (এই দৃশ্যমান) সর্বম্ (সকল জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতং (আশ্রিত আছে)।

হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-তত্ত্ব অন্য কিছু নেই। সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় এই দৃশ্যমান জগৎ আমাতেই আশ্রিত আছে।

অর্জুনকে সম্বোধন করে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন : আমিই জগতের প্রভব ও প্রলয়, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা স্বতন্ত্র বস্তু কিছু নেই। আমাকে বাদ দিয়ে কিছুই থাকতে পারে না। আমি যেমন সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্তা, তেমনি জগতের স্থিতিও আমার উপর নির্ভর করছে। যেন সব মণি এক সূত্রে গাঁথা, তাই সব কিছুরই অস্তিত্ব নির্ভর করছে আমার ওপর। আমার পরা প্রকৃতি এই জগৎ-প্রপঞ্চকে ধারণ ও গ্রথিত করে রেখেছে। পরা প্রকৃতি সূত্র এবং মণিগণ সদৃশ জগৎ-প্রপঞ্চ অপরা প্রকৃতি।

পরমাত্মাকে বাদ দিয়ে কোন বস্তুরই স্বাধীন সত্তা নেই। পরমাত্মা আছেন বলেই জগৎ আছে। মণিমালা কোথা থেকে এল? ভগবান হলেন সূত্র আর জগৎ মণিমালা। ভগবানকে বাদ দিয়ে জগৎ নেই। এই জগতের মধ্যে যে সংহতি, ঐক্য, প্রেম, সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ এক চৈতন্য পরমাত্মাই সকল বস্তুর মধ্যে অনুস্যূত থেকে ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে ধারণ করে আছে। সেই আধ্যাত্মিক সত্তাই সকল বস্তুর মূল সত্তা। তাই প্রত্যেক বস্তুর একটি মূল সত্তা রয়েছে এবং একটি ব্যাবহারিক সত্তা রয়েছে। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর বিচার করতে হয়।

বেদান্তের অপূর্ব শিক্ষা, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং'—এই দৃশ্যমান বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে আমি অনুস্যূত রয়েছি। তাই একটি মানুষের বাইরের বৈশিষ্ট্য বা উপাধি যেমন রয়েছে, তেমনই আবার তার একটি দিব্য অন্তরাত্মা রয়েছে। এই ঐশ্বরিক সত্তাকে নানা নামে

অভিহিত করা হয়—জীবাত্মা, সূত্রাত্মা, অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, যিনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু পৃথিবীর ভিতরে আছেন, অথচ পৃথিবী যাঁকে জানে না, পৃথিবী যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থেকে পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই শাশ্বত আত্মা।

একমাত্র অন্তর্নিহিত এই সত্তাই অবিনাশী। পৃথিবীর বাকি সব কিছুই নশ্বর। যিনি নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে জানতে পারেন তিনি বিশ্বের সবকিছুর মধ্যে সেই সত্তাকে অনুভব করেন। তিনি বলেন, হে পরম ঈশ্বর, তুমিই নারী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই দণ্ড হাতে চলেছ জীর্ণদেহে বৃদ্ধ—এই বিশ্বে তুমিই নানারূপে প্রকাশিত রয়েছ।

ঋষিদের উপলব্ধ এই সত্য চির নতুন, তিনকালেই তা সত্য। এই সত্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় এবং বিশ্বজনীন। মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে এই ঋষিগণ এই সত্য বর্ণনা করেছেন। এই সত্যকে বলা হয় সনাতন ধর্ম, চিরকালের ধর্ম।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ।। ৮

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) অহম্ (আমি) অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ (রস) শশি-সূর্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্যে) প্রভা (জ্যোতিঃ, কিরণ) সর্ববেদেষু (চার বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার) খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ) নৃষু (মানুষের মধ্যে) পৌরুষম্ (পুরুষকার) অস্মি (হই)।

হে কৌন্তেয়, জলমধ্যে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্যে আমি জ্যোতি, বেদসমূহে ওঙ্কার, আকাশে শব্দ এবং মানুষের মধ্যে আমি পৌরুষরূপে বিদ্যমান আছি।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। ভগবান অর্জুনকে অর্থাৎ আমাদের সকলকে জগতের সর্ব বস্তুতে পরমাত্মদৃষ্টি করতে বলছেন। ঈশোপনিষৎ এই কথাই বলছেন—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং'—জগতের সমস্ত বস্তুতে পরমেশ্বরের বাস বা পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করবে অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ববস্তুতে নিহিত রয়েছেন। তিনি জলের মধ্যে রস, চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে জ্যোতি, বেদের সার প্রণব (ওঁ)। আকাশের শব্দ তিনি, তিনিই পুরুষের পৌরুষ। এখানে ভগবান অর্জুনকে দেখাচ্ছেন পরমাত্মা সর্বত্র সব বস্তুতে কেমনভাবে অনুস্যূত রয়েছেন। ভগবৎসত্তা সর্বত্র। তিনি ছাড়া কিছুই নেই। তিনিই সব কিছুর সার। জলের সার অর্থাৎ জলের যে মূল গুণ বা শক্তি তা হচ্ছে রস, সেই রসই জলের মূল সত্তা। যদিও রসই পঞ্চ তন্মাত্রার একটি তন্মাত্রা এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় অপরা প্রকৃতি। কিন্তু এখানে রস তন্মাত্র নয়। ভগবান বলছেন তিনি রসস্বরূপ, রস সত্তার যে শক্তি, যে শক্তিতে রস তন্মাত্রা (সূক্ষ্মরূপে), জল (স্থূলরূপে) প্রকাশিত হয়েছে। সেই রসশক্তিই ভগবান। তিনি জলের মধ্যে রস রূপে অনুস্যূত রয়েছেন। এই মূল শক্তিটি আধ্যাত্মিক, জড় নয়। ভগবান

বলছেন এই রস-শক্তিই তিনি অর্থাৎ পরা প্রকৃতি। এইরূপে চন্দ্র-সূর্যের সার যে প্রভা, সেই প্রভা-শক্তিই তিনি। আকাশের মূল সত্তা শব্দ, এটি জড় অর্থাৎ অপরাপ্রকৃতির শব্দতন্মাত্র নয়, এই শব্দ আকাশতত্ত্বের মধ্যে শব্দশক্তিরূপে অনুস্যূত রয়েছে। এই শব্দ সত্তা আধ্যাত্মিক সত্তা এবং ভগবানের পরা প্রকৃতি।

ভগবান বলছেন, সর্ব বেদের মধ্যে আমিই প্রণব। মূল ধ্বনি ওঁ-কার হল ঈশ্বর। বেদ শব্দেরই সমষ্টি। তাই বেদকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। এই বৈদিক শব্দসমূহের মূল হল ওঙ্কার। এই ওঁকারই পারমার্থিক শক্তির অধিষ্ঠান। শ্রুতি বলে, সমস্ত বাক্য (বেদ) ওঙ্কার দ্বারা গ্রথিত। সর্বত্র পরমাত্মারই বিকাশ।

যে পুরুষত্ব মানুষকে উদ্যমশীল ও ক্রিয়াশীল করে রাখে আমি সেই পুরুষত্ব। পৌরুষ বা পুরুষত্ব সকল পুরুষের সাধারণ গুণ। এই গুণ সকল পুরুষের মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে। ভগবান বলছেন, এই পুরুষত্বই তিনি। এই গুণ বা ধর্ম সকল পুরুষের মধ্যে অনুস্যূত রয়েছে এবং এই পুরুষত্বই—শক্তি, শৌর্য, বীর্য ইত্যাদি ঈশ্বরের সত্তা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরা প্রকৃতি।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ।। ৯

(আমি), পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ (পবিত্র) গন্ধঃ (গন্ধ) বিভাবসৌ চ (এবং অগ্নিতে) তেজঃ অস্মি (তেজ হই) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) জীবনং (প্রাণ) চ তপস্বিষু (ও তপস্বিগণে) তপঃ অস্মি (তপস্যা হই, তপঃ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহনের সামর্থ্য হই)।

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ বা দীপ্তি, সর্বভূতে জীবন বা প্রাণ ও তপস্বিগণের মধ্যে তপঃশক্তিরূপে বিরাজ করি।

ঈশ্বরই মূল গন্ধরূপে পৃথিবীতে অনুস্যূত রয়েছে। পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধসত্তা হল ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক সত্তা। সেই সত্তাই সূক্ষ্মরূপে গন্ধতন্মাত্র এবং স্থূল পৃথিবীরূপে প্রকাশিত হয় যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়। সেইরূপ অগ্নিতে তেজ বা দীপ্তিসত্তা, সর্বভূতে জীবন ও তপস্বিগণের মধ্যে তপস্যা শক্তিরূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। এ সবই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি। জীবন এখানে প্রাণশক্তি অর্থাৎ প্রাণতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব। সর্বভূতের প্রাণশক্তিই ঈশ্বর, সেইরূপ তপস্বিগণের তপঃশক্তিও সেই পরম ঈশ্বরের পরা শক্তি।

পৃথিবীর যে মূল তত্ত্ব, তা পবিত্র, সুন্দর ও সুগন্ধ। কিন্তু তা যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তা বদলে যায়। তখন তার রূপ, রস, রঙ, গন্ধ সব বিকৃত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়। যোগিদের তপস্যার গুণে তাঁদের মধ্যে দিব্যশক্তি প্রকাশ পায়। সেই দিব্যশক্তির প্রভায় তাঁরা ঈশ্বর লাভ করেন। এই তপস্যা শক্তি বা তপঃতত্ত্ব যা মানুষকে

মহৎ বস্তু অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করে সেই তত্ত্বও স্বয়ং ঈশ্বর।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।। ১০

পার্থ (হে অর্জুন) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং (স্থাবর ও জঙ্গম সকল ভূতের) সনাতনম্ (নিত্য বা চিরন্তন) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানবে)। অহম্ (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান বা বিবেকী মানুষের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তেজস্বিনাং চ (ও তেজস্বিগণের) তেজঃ অস্মি (তেজঃশক্তি হই)।

হে পার্থ, আমাকে স্থাবর ও জঙ্গম সকল ভূতের কারণ বা বীজ বলে জানবে। আমিই বিবেকী মানুষের বিবেকরূপী বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজোস্বরূপ।

ঈশ্বর সব কিছুর উৎস। তাঁর পরা প্রকৃতিই সর্বভূতের বীজ। একটা বীজ যা থেকে সব কিছুর উদ্গম হয়েছে। বীজ গাছে পরিণত হয়ে অদৃশ্য হয়। ঈশ্বর কিন্তু নিত্য, অক্ষয়। এই পরা প্রকৃতি ঈশ্বরের সনাতন সত্তা। তিনি রূপ বদলান, কিন্তু তাঁর সত্তা অবিনশ্বর। রূপ অপরা প্রকৃতি এবং এই অপরা প্রকৃতির যোগেই ভগবানের লীলা। কিন্তু বিশ্বের সর্বভূতে বীজস্বরূপ ভগবানের পরা প্রকৃতি নিহিত রয়েছে। এই পরা প্রকৃতির ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি বা বিকাশ। এইরূপ আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ হয়। এ কেবল রূপ পরিবর্তন। তিনি তিনিই আছেন, কেবল রূপ বদলিয়েছেন। বুদ্ধিমান বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সে বুদ্ধিও কিন্তু তিনি। এই বুদ্ধি হল বিবেকী মানুষের বিবেকশক্তি। তেজস্বী ব্যক্তি তেজের পরিচয় দেয়, সেই তেজও কিন্তু তাঁর বিভূতি অর্থাৎ বীরের বীরত্বও ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি। এইভাবে ভগবান অর্থাৎ ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্র শিক্ষা দেয় কিভাবে আমরা এই ব্যক্ত-বিশ্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। ঈশ্বর শুধু পরা প্রকৃতি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নন, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছেন। তিনি ভিতরে আবার তিনিই বাইরে।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ।। ১১

ভারতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) অহং (আমি) বলবতাং (বলবানদের অর্থাৎ সাত্ত্বিক বলশালী ব্যক্তিদের) কামরাগবিবর্জিতম্ (কামনা ও আসক্তিশূন্য) বলং (সাত্ত্বিক বল) চ (এবং) ভূতেষু (প্রাণীদের মধ্যে) ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ (ধর্মের অবিরোধী অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত) কামঃ (স্ত্রী-পুত্র, বিত্ত ইত্যাদির কামনা)।

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, আমি বলবানদের অর্থাৎ সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের কামনা ও আসক্তিবর্জিত সাত্ত্বিক বল। আমিই আবার প্রাণীদের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী কামস্বরূপ অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রবিত্তাদির প্রতি শাস্ত্রসম্মত ভালবাসারূপে বিদ্যমান।

যারা বলবান, তাদের মধ্যে আমি বল, কিন্তু সেই বল কামরাগবর্জিত অর্থাৎ সাত্ত্বিক বল, যা ইন্দ্রিয়জ ভোগবাসনা ও আসক্তি থেকে মুক্ত, সেই শক্তি মানুষের কল্যাণ করে, ব্যক্তি ও সমাজকে উন্নত করে। এই ধরণের সাত্ত্বিক বলবান ব্যক্তির মধ্যে ভগবান হলেন সাত্ত্বিক বল। সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের সাত্ত্বিক বল ভগবানের পরা প্রকৃতি। ভগবানের পরা প্রকৃতি সর্বভূতের সত্তা। বলবানদের বলই সারগুণ বা সত্তা। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বলই ভগবানের পরা প্রকৃতি। এই সাত্ত্বিক বলের দ্বারা মানুষের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সাত্ত্বিক গুণের দ্বারা মানুষ ঈশ্বর লাভ করে। যে বল ধর্ম সাধনে শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করে তাই ভগবানের সত্তা। আবার বল অনেক স্থলে কামরাগের দ্বারা বিকৃত হয়ে পড়ে। সেই বল মানুষকে উৎকর্ষের পথে না নিয়ে অধঃপাতের পথে নিয়ে যায়। সেই রাগদ্বেষ-আসক্তিযুক্ত বল ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি।

বিশুদ্ধ কামনা ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পরা প্রকৃতি। কাম মানে ইচ্ছা, যা আমার নেই তা পাবার ইচ্ছা। রাগ মানে ভালবাসা, যা আছে তার প্রতি আসক্তি। এই ভালবাসা অন্ধ ভালবাসা। মোহ। এই দুই ভালবাসার কোনটাই শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ ভালবাসায় কোন দুর্বলতা বা স্বার্থের স্থান নেই। শাস্ত্রসম্মত যে ভালবাসা বিশেষত স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদির প্রতি, তা ঐশ্বরিক।

তাই সেই কাম সম্পর্কে সাধারণত সব বৈরাগ্যমূলক শাস্ত্রেই নিন্দা করে, কিন্তু গীতা এখানে বলছেন অর্থাৎ ভগবান বলছেন, প্রাণীদের মধ্যে আমি সেই কাম যা ধর্মের অবিরোধী। আমি সেই কাম যা অন্যের কল্যাণ করে। তাই কামকে বেদান্তে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে সেই কাম ধর্মবিরুদ্ধ বিকৃত অশুদ্ধ কাম নয়। ধর্মের অবিরোধী শুদ্ধ কাম। সেই কাম পরিশীলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত এবং অপরের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করে না। অপরের কল্যাণ করে। ব্যক্তি ও সমাজের উৎকর্ষসাধন করে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ।। ১২

যে চ এব (এবং যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ (রাজসিক চিত্তপরিণাম) তামসাঃ (তামসিক চিত্তপরিণাম) ভাবাঃ (ভাব আছে) তান্ (সেই সকলও) মত্তঃ এব (আমার থেকেই উৎপন্ন) ইতি বিদ্ধি (এইরূপে জেনো) তু (কিন্তু) তেষু (সেই সকলে) অহং (আমি) ন (নেই) (অর্থাৎ আমি সেই সকলের অধীন নই) তে (তারা) ময়ি (আমাতে রয়েছে অর্থাৎ আমার অধীন)।

জীবগণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসকল আমার থেকেই উৎপন্ন বলে জেনো। কিন্তু জীবের ন্যায় আমি সেই সকলের অধীন নই, বরং তারাই আমার অধীন। সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ শম-দমাদির মধ্যে, রজোগুণের প্রকাশ পায় হর্ষ ও দর্পের

মধ্যে, আর তমোগুণ প্রকাশ পায় শোক ও মোহ প্রভৃতির মধ্যে। এ সব ভাবের উৎপত্তি কিন্তু ঈশ্বর থেকে। সত্ত্ব গুণের প্রকাশ ঋষি, ব্রাহ্মণ বা চিনির মধ্যে, রজো গুণের প্রকাশ গন্ধর্ব, যক্ষ, ক্ষত্রিয় বা লঙ্কার মধ্যে, তমো গুণের প্রকাশ রাক্ষস, শূদ্র ইত্যাদি থেকে। এরা সবাই এসেছে ঈশ্বর থেকে। তিনি কিন্তু কোন জড় বস্তু অর্থাৎ অজ্ঞানের মধ্যে নেই। সর্পভ্রম জড় ও অজ্ঞান। জড়ত্ব তাঁতে আরোপিত হতে পারে যেমন রজ্জুতে সর্প আরোপিত হয়। কিন্তু যে ভাবেরই আরোপ তাঁর ওপর হোক না কেন, তিনি নির্বিকার।

ভগবান বলছেন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব—এই তিনগুণও আমার থেকে এসেছে। জগতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর উৎপত্তির উৎস আমি। আমার থেকে স্বতন্ত্র জগতে আর কোনও কারণ বা সত্তা নেই, সৃষ্টির আর কোনও উৎস নেই। প্রকাশিত জগৎ আমার সত্তার মধ্যে রয়েছে। আমিই অধিষ্ঠান চৈতন্য পরা প্রকৃতি এবং আমার ওপর নামরূপের খেলা চলছে। ঐ নামরূপ আমাতে স্থিত হলেও আমি ঐ নামরূপে স্থিত নই। নামরূপ আমার মূলস্বরূপ নয়। এই সকল প্রাতিভাসিক অপরা সত্তা।

অহং ও অজ্ঞান ক্রিয়ার দ্বারা ঐ জড় সত্তা নামরূপের সৃষ্টি। তাই জীব অহংকার ও অজ্ঞানের কারণে ঐ তিনগুণের অধীন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী, বিশ্বাতীত, তিনি নির্বিকার, শাশ্বত, নিত্য তাই তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং এই তিনগুণ তাঁরই প্রকাশ হলেও তিনি এই তিনগুণের অধীন নন। তিনি নিত্যমুক্ত। কোন কিছুর বন্ধনে তিনি আবদ্ধ নন। সবকিছু তাঁর থেকে প্রকাশিত, তিনি সব কিছুর মধ্যে,থেকেও সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ।। ১৩

এভিঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) গুণময়ৈঃ (গুণময়) ভাবৈ (ভাবের দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত) জগৎ (জগৎ, প্রাণিসমূহ) মোহিতং (মোহিত হয়ে আছে) এভ্যঃ (এইসকল ভাব থেকে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ বা অতিরিক্ত) অব্যয়ম্ (অক্ষয়, নির্বিকার, অবিনাশী) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানতে পারে না)।

এই (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে আছে। তাই মানুষ এই সকল ভাবের অতীত আমার অক্ষয়, অবিনাশী নির্বিকার স্বরূপ জানতে পারে না।

ঈশ্বর নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছে। তাই জীব ঈশ্বরকে জানতে পারে না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তেজে যেমন সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করে এই তিনগুণময় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীব জগৎকে দেখে, ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। ঈশ্বর তিনগুণের অতীত ও তিনগুণের অধিষ্ঠান। ঈশ্বর জীবের আত্মা, কিন্তু মায়ার প্রভাবে জীব অন্ধ, তাই জীবের কাছে ঈশ্বর অসৎ, জগৎ সৎ বলে মনে করে। কানের কুণ্ডল সত্য, কিন্তু স্বর্ণ সত্য নয়।

অর্জুনের সন্দেহ দূর করার জন্য ভগবান বলছেন, যদিও এই তিনগুণ ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন, তথাপি ঐ তিনগুণের ধর্ম জীবের চিত্তে ভ্রম উৎপাদন করা, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ এই তিনগুণের অধিষ্ঠান যে ঈশ্বর তাঁকে দেখতে দেয় ন। ঐ তিনগুণ মানুষের মনকে মুগ্ধ করে রাখে। তাই জীব মোহগ্রস্ত হয়ে মনে করে—এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ একমাত্র সত্য, এই সংসারই তাঁর সব সত্তা এবং এই তিনগুণের খেলা নিয়ে জীব ব্যস্ত। নিজের অন্তরে যে ঈশ্বরের চৈতন্য সত্তা দিব্য, অনন্ত, অক্ষয় আত্মা রয়েছেন তা ভুলে যায়। এই অপরা প্রকৃতির উর্ধ্বে যে শ্রেষ্ঠ পরা প্রকৃতি অব্যয় পরম সত্তা ঈশ্বর আছেন জীব তা জানতে পারে না। বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন বলে এই তিনগুণ যখন সাম্য অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে তখন জগৎ বলে কোন পৃথক সত্তা থাকে না। তিনগুণের বৈষম্য থেকে এই বৈচিত্রময় জগতের প্রকাশ আরম্ভ হয়। এই তিনগুণের পিছনে অনন্ত চৈতন্য ব্রহ্মই হল মূল সত্তা বা অধিষ্ঠান। তিনগুণের দ্বারা মোহিত জীব পরম অবিনাশী সত্যকে জানতে পারে না অথচ অক্ষয় সত্তাই আমার প্রকৃত স্বরূপ।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।। ১৪

হি (যেহেতু, কারণ) এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিক, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী) মম (আমার); মায়া (অবিদ্যা) দুরত্যয়া (দুরতিক্রম্যা) যে (যাঁরা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন) তে (তাঁরা) এতাং (এই) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (উত্তীর্ণ হন)।

কারণ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু যাঁরা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁরাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া। আমরা আমাদের পুরুষার্থ খাটাতে পারি, প্রারব্ধও খাটাতে পারি, কিন্তু একমাত্র উপায় শরণাগত হওয়া। যে শরণাগত হয় ঈশ্বর তার সহায়, প্রারব্ধও তার সহায়। শেষ পর্য্যন্ত জীবন-সংগ্রাম তার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যায়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণগুলি মোহকর। এই গুণের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে জীব ভগবানকে জানতে পারে না। এটিই মায়া। এই মায়া জীবকে মুগ্ধ করে তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে দেয় না। পরমাত্মাকে যেন লুকিয়ে রাখে যেভাবে মেঘ সূর্যকে আড়াল করে রাখে। অথচ এই মায়া ঈশ্বর হতে উৎপন্ন। ঈশ্বরেই জগতের উৎপত্তির স্থান ফলে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণগুলি ঈশ্বর হতে উৎপত্তি। এই মায়া দৈবী অর্থাৎ অলৌকিক, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

আবার ভগবান বলছেন যদিও এই মায়া দেবী, অলৌকিক এবং এই মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ তথাপি জীব যদি আমার শরণাপন্ন হয়, অন্য কিছুর উপর নির্ভর না করে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সে এই মায়াকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। অতএব মায়াবদ্ধ জীব যদি মায়ার স্রষ্টা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর ভজনা করে, তবে অনায়সেই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। ভক্তিমার্গে ভগবানের এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা করছেন : তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমাকে ভুলিও না। কখন অহঙ্কার করতে নেই, মায়ার কাছে নিজের দম্ভ প্রকাশ করতে নেই। কেউ কখনও বলতে পারে না যে, মায়া আমাকে কিছু করতে পারবে না। মায়া কৃপা করেন না বলেই, মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে থাকে। একজন চেষ্টা করছে সৎপথে থাকতে, ঈশ্বরের দিকে যেতে। কিন্তু মায়া পথ আগলে রেখেছে—তার সমস্ত চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে। আবার মায়া যখন কৃপা করেন, তখন দেখা যায় সবকিছু অনুকূল হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়ার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—ঈশ্বরের বিদ্যা অবিদ্যা মায়া দুই-ই আছে। এই বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। বিদ্যার খেলা জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য। এ সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন, কিছু জানতে দেন না। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিচ্ছেন—সচ্চিদানন্দরূপ স্ফটিক জল পান করতে হলে মায়ারূপ পানা সরিয়ে জল খেতে হয়। মায়ারূপ পানাতে (পানা-পুকুর) জল ঢাকা—যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়। জীব ও সচ্চিদানন্দের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে মায়া। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মানুষ যাতে প্রাণপণে চেষ্টা করে অবিদ্যামায়ার পরিবর্তে বিদ্যামায়ার সাধন করে এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। বিদ্যামায়ার সাধন অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছেন—একটি লোক বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তিনটি ডাকাত তার ওপর চড়াও হয়ে, তার হাত-পা বেঁধে, সর্বস্ব লুট করে নিল। ঐ তিনটি ডাকাত হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। লুটপাট করার পর একটি ডাকাত বললে, 'একে রেখে আর কী হবে? একে মেরে পালিয়ে যাই চলো।' এ হলো তমঃ। সে বললে, 'একে শেষ করে দিই।' তখন অন্য দুজনের মধ্যে একজন বললে, 'ওকে মেরা ফেলার কী দরকার? ওর সবকিছু তো আমরা আগেই লুটে নিয়েছি। বরং ওর হাত-পা বেঁধে, এখানে ফেলে রেখে সরে পড়া যাক। এ হলো রজঃ। তখন সকলে লোকটিকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ডাকাত—সত্ত্বগুণী, লোকটির কাছে ফিরে এসে বলল, 'আহা, তুমি কত যন্ত্রণা ভোগ করলে, এর জন্য সতিই দুঃখিত।' এই বলে, সে পথিকের বাঁধন খুলে দিল আর বলল, 'এবার বাড়ি চলে যাও, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।' তারপর তাকে শহরের দিকে নিয়ে গিয়ে সত্ত্বগুণী ডাকাতটি বলল,

'ঐ দেখ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ঐ দিক দিয়ে চলে যাও। তুমি এখন মুক্ত। একথা শুনে পথিক বলল, 'ভাই, তুমি আমার কত উপকার করলে। দয়া করে আমার সঙ্গে চল। আমার বাড়িতে তোমার আদর-যত্ন করব।' কিন্তু ডাকাতটি বলল, 'সে উপায় নেই। পুলিশ আমাকেও খুঁজছে, কারণ আমিও একজন ডাকাত। আমি কেবল তোমার বাড়ি দেখিয়ে দিতে পারি।' তাই এই সত্ত্বগুণী ডাকাতটি পথিককে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যটি দেখিয়ে দিয়েই চলে গেল।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ।। ১৫

(কিন্তু) দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্কৃতিকারিগণ, পাপকর্মা) মূঢ়াঃ (মোহগ্রস্ত, বিবেকশূন্য) নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া (মায়া দ্বারা) অপহৃতজ্ঞানাঃ (হতবুদ্ধি হয়ে) আসুরং (অসুরসুলভ) ভাবং (স্বভাবকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করে) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না)।

কিন্তু যারা দুষ্কৃতিকারী, পাপী, মোহগ্রস্ত, বিবেকশূন্য নরাধম, তারা মায়ার প্রভাবে হতবুদ্ধি হয়ে অসুরস্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না।

যারা ভগবানের শরণাপন্ন তারাই মায়াকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। কিন্তু মানুষ ভগবানের শরণাপন্ন হয় না। সংসারে একদল মানুষ ভোগসুখে ডুবে থাকে। তারা কারা? 'দুষ্কৃতিনো' যারা পাপকর্মে নিযুক্ত, 'মূঢ়াঃ' যারা মোহগ্রস্ত অর্থাৎ এরা নির্বোধ অথচ নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে, 'নরাধমাঃ' নরনারীদের মধ্যে এরা নিকৃষ্ট, 'মায়য়া অপহৃতজ্ঞানা' এদের বোধবুদ্ধি মায়াশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হয়েছে, 'আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ' এরা দুষ্ট আসুরিক স্বভাবকে আশ্রয় করে। তারা ভালো-মন্দ বিচার করে না। জন্মের পর জন্ম কাটিয়ে দিচ্ছে। জীবনের কী উদ্দেশ্য, তা একবারও চিন্তা করে না। সর্বদা পাপকার্যে নিরত তারা। ভগবানকে পাবার জন্য তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। ফলে শুধু দুঃখ ভোগ করে। শেষে হয়ত একদিন তাদের চোখ খুলে যায়। তখন বিবেক জাগ্রত হয় এবং ঈশ্বরের কৃপায় তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। তাদের তখন নতুন জীবন শুরু হয়। তাদের মধ্যে দৈবী সম্পদের প্রকাশ ঘটে—দয়া, প্রেম, অন্যের কল্যাণচিন্তা, পরহিতৈষণা ইত্যাদি।

সুতরাং ভগবানকে পেতে হলে সর্বাগ্রে পাপকর্ম পরিত্যাগ করে মানুষকে নীতিপরায়ণ, সুকৃতিসম্পন্ন হতে হবে। রজোগুণ ও তমোগুণের আধিক্যই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। তমোগুণের আধিক্য হলে মানুষের বিবেকবুদ্ধি লুপ্ত হয়। কোনটি সৎ, কোনটি অসৎ তা সে নির্ণয় করতে পারে না। রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে মানুষের চিত্তে অসংখ্য সংকল্প ওঠে এবং সেইসব কামনা চরিতার্থ করবার নিমিত্ত সে নানাবিধ পাপকার্যে

রত হয়। তাই সত্ত্বগুণের আশ্রয় নিতে হবে। সাত্ত্বিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক ও কর্মের সত্য নীতির অনুসন্ধান করে। সত্ত্বগুণ ভগবানের পথে নিয়ে যায় এবং এই তিনগুণের অতীত যে সম, শান্ত, নির্বিকার অবস্থা তাই লাভ করতে হবে।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ।। ১৬

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) অর্জুন (অর্জুন) চতুর্বিধাঃ (চার প্রকার) সুকৃতিনঃ (সুকৃতিসম্পন্ন, পুণ্যবান) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) আর্তঃ (রোগাদিক্লিষ্ট, বিপন্ন) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, মুমুক্ষু) অর্থ-অর্থী (ইহলোক ও পরলোকে ভোগ-সুখ প্রার্থী) জ্ঞানী চ (এবং তত্ত্বজ্ঞানী) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন)।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্তিযুক্ত, মুমুক্ষু, অর্থকামী ও তত্ত্বজ্ঞানী—এই চার প্রকারের সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন।

চার রকমের মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করে। কিন্তু যারা আসুরী প্রকৃতির, তারা ঈশ্বরের ভজনা করে না, তারা মায়ার মধ্যে থেকেই সন্তুষ্ট। কিন্তু যারা ঈশ্বরকে ভজনা করে, তারা চার ভাবের মানুষ। প্রধানত সকাম ও নিষ্কাম, এই দুই শ্রেণীর ভক্ত দেখতে পাওয়া যায়। সকাম অর্থাৎ যার কোন না কোন কামনা আছে। নিষ্কাম, যে কিছুই চায় না। সে শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসে।

আর্তঃ—বিপন্ন, অসহায় বোধ করছে, তাই ঈশ্বরের সাহায্যপ্রার্থী। সংসারে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত, শত্রু বা অন্য কোনও কারণে বিপদে পড়েছে এবং তা থেকে উদ্ধারের আশায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছে।

জিজ্ঞাসুঃ—মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তিকামী, তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক বা ভগবত্তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করে। সেও সকাম ভক্ত কিন্তু উঁচু শ্রেণীর ভক্ত। এরা ঈশ্বরতত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক হয়ে অথবা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের নিমিত্ত ঈশ্বরের ভজনা করে।

অর্থার্থী—অর্থকামী অর্থাৎ যে সম্পদ চায়। এরা সকাম ও নিম্ন শ্রেণীর ভক্ত। দেখা যায় সংসারে মানুষ ঐহিক সুখলাভ বা পারত্রিক মঙ্গললাভের আশায় অথবা কোনও প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে।

জ্ঞানী—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। কেউ কেউ কোন প্রকার উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে কেবল ঈশ্বরকে পাবার নিমিত্ত তাঁর ভজনা করে।

অতএব যারা সকাম ভক্ত তারাও ঈশ্বর চিন্তা করে ধীরে ধীরে বিদ্যামায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই চার প্রকার ভক্তের প্রত্যেকেই নমস্য, সকলেই সুকৃতিসম্পন্ন। কারণ তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রার্থী। সুতরাং কেউ বিপদে পড়ে হোক বা অন্য উদ্দেশ্যেই হোক ভগবানের শরণাপন্ন হলে বুঝতে হবে, তার চিত্ত নির্মল হয়েছে ও অহংকার কমছে

এবং তার সংস্কার তাকে সুপথে নিয়ে চলেছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী—অসাধারণ মানুষ, ভালবাসার জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসে। সে ঈশ্বরের স্বরূপ জেনেছে এবং তার সমস্ত মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত। এই ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী। সর্বোচ্চ জ্ঞান ও সর্বোচ্চ ভক্তি একই। দুজনেই ঈশ্বরকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেছে। চার ভক্তের মধ্যে এই জ্ঞানীকে ভগবান সর্বোচ্চ স্থান ও সম্মান দিয়েছেন।

এখানে ভক্তি ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ অবস্থা। ভক্ত প্রহ্লাদ, ভগবানের কাছে সে কিছু চায়নি। কেবল শুদ্ধাভক্তি, শুধু ভালবাসার জন্য ভগবানকে ভালবাসা। ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে যখন ভগবান নৃসিংহ বর দিতে চাইলেন তখন প্রহ্লাদ বললেন, আমি ব্যবসায়ী নই যে ভক্তি-ভালবাসা কেনাবেচা করব। আমার ভক্তি কামনারহিত। এর পরিবর্তে কিছুই চাই না। তাই ভগবান বলছেন, জ্ঞানী আমার প্রিয় এবং আমিও তাঁর প্রিয়।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।। ১৭

তেষাং (তাঁদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্বদা আমাতে যাঁর চিত্ত যুক্ত) একভক্তিঃ (একনিষ্ঠ) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞানী) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হন, শ্রেষ্ঠ হন) হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থম্ (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়) সঃ চ (তিনিও) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)।

তাঁদের মধ্যে অর্থাৎ এই চারপ্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত ও আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয়।

চার প্রকার ভক্তের কথা একটু আগে বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? যিনি সর্বদা আমাতে ডুবে আছেন। 'আমি' ছাড়া আর কিছু তাঁর মনে স্থান পায় না। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তের ভক্তি সকাম। কোন না কোন কামনা পূরণের নিমিত্তই ভগবানের শরণাপন্ন হন। কিন্তু জ্ঞানীর ভক্তি শুদ্ধ ও নিষ্কাম। জ্ঞানী ভগবানের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থাকেন। সংসারে কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ভগবানের সঙ্গে নিবিড় যোগ থাকে। প্রতি কর্মে ও প্রতি চিন্তায় তিনি ভগবানের সান্নিধ্যে থাকেন। 'The Practice in the Presence of God'—বইটি Brother Lawrence-এর রচিত। তিনি খুব সুন্দর করে বলছেন, ঈশ্বর- সান্নিধ্যে ঈশ্বরের সাধনা। ভগবানের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত থেকেই কর্ম ও সাধনা।

যারা কোন না কোন কামনা নিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, যখন তাদের কামনা পূরণ হয়ে যায় তখন তাদের ভগবানের প্রতি ভক্তি বেগও কমে যায়। এই ভক্ত ভগবানকে কামনা করে আবার সংসারে বিষয়েরও কামনা করে। তাই এই ভক্ত নিত্যযুক্ত নয়। বিভিন্ন বিষয়ের কামনা চরিতার্থ করতে বিভিন্ন দেব দেবীর আরাধনা করে।

পক্ষান্তরে জ্ঞানী সর্বদা ভগবানেরই উপাসনা করেন। তিনি কোন কাম্য-ফল লাভের

আশায় দেব-দেবীর ভজনা করেন না। তাঁর ভক্তির কোন ব্যতিক্রম হয় না, সর্বদা একভাবে থাকে। এইপ্রকার নিত্যযুক্ত ও একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। জ্ঞানীর ভক্তি অহেতুকী, ভগবান ছাড়া অন্য কিছু চায় না। ভগবান তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সংসারে সকলের থেকে ভগবানকে অধিক ভালবাসেন। ভগবান তাঁর আত্মা। ভগবান যেমন তাঁর প্রিয়, জ্ঞানী ভক্তও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ।। ১৮

তে (এঁরা) সর্বে এব (সকলেই) উদারাঃ (শ্রেষ্ঠ, মহান) তু (কিন্তু); জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ) আত্মা এব (আমার আত্মস্বরূপ) (এহ) মে মতম্ (আমার মত) হি (যেহেতু) সঃ (সেই) যুক্তাত্মা (সমাহিতচিত্ত, মদ্গতচিত্ত জ্ঞানী) অনুত্তমাং (সর্বোৎকৃষ্ট) গতিং (গতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করেছে)।

এঁরা অর্থাৎ এই চারপ্রকারের ভক্ত সকলেই মহান। কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, এই আমার মত। কারণ মদ্গতচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করেছে।

যে সব ভক্তের কথা বলা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই মহান্ ও সুকৃতিসম্পন্ন। তবে শ্রেষ্ঠ কে? যিনি জ্ঞানী-ভক্ত, এবং আমার আত্মস্বরূপ। যিনি জন্ম-জন্মান্তরে অনেক পুণ্য অর্জন করেছেন, তাই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর এত ভালবাসা। ঈশ্বর তাঁর সর্বস্ব। তাঁকে ছাড়া তিনি আর কাউকে জানেন না।

সাধারণ মানুষ সংসারে সুখ-ভোগ নিয়ে থাকতে চায়। সুখ লাভের চেষ্টায় তাদের সমস্ত সময়, সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। অজ্ঞান ও অহংকারের বশে নিজেকে কর্তা, ভোক্তা ও শক্তিশালী মনে করে। কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে অথবা কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য ভগবানের ভজনা করে, তখনই বুঝতে হবে তার চিত্তে পরিবর্তন এসেছে। অহংকার ও দম্ভ একটু কমছে। হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। তাই সকাম ভক্তও সুকৃতিসম্পন্ন। কিন্তু জ্ঞানীভক্ত ভগবানের আত্মা, আত্মস্বরূপ এবং ভক্ত-ভগবান অভিন্ন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।। ১৯

বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে, শেষে) জ্ঞানবান্ (তত্ত্বজ্ঞানী) মাং (আমাকে) বাসুদেবঃ সর্বম্ (বাসুদেবই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু) ইতি (এইভাবে) প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়ে ভজনা করেন) সঃ (সেইরূপ) মহাত্মা (মহাপুরুষ) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ)।

বহু জন্মের পরে জ্ঞানী আমাকে প্রাপ্ত হন এবং 'সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেব স্বয়ং'

এইভাবে জেনে আমার ভজনা করেন। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা অতি দুর্লভ।

বহু পুণ্যবলে মানব ঈশ্বরকে লাভ করেন। এক জন্মে জ্ঞানলাভ হয় না। জাদুবলে অধ্যাত্মজীবন গড়ে ওঠে না। ধৈর্যের সঙ্গে, ঐকান্তিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনকে অল্প অল্প করে গড়ে তুলতে হয়। মানুষ যেহেতু তিন গুণের অধীন, তাই ক্রমশ সৎ কর্ম ও বিচারের দ্বারা পুণ্যসঞ্চয়ের ফলে যতই তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ বাড়ে ততই তাঁর চিত্ত নির্মল হয় এবং ভগবৎমুখী হতে থাকে। চিত্ত ঈশ্বরমুখী হলে সাধক ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। ভগবানের কৃপাতে তাঁর অজ্ঞান দূর হয়ে তাঁর অন্তরে জ্ঞানের আলো প্রকাশ পায়। এই জ্ঞান লাভ হলে সাধক বিষয় ত্যাগ করে অনন্যা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকেই ভজনা করেন। তিনি অনুভব করেন, ভগবান তাঁর হৃদয়ে যেমন রয়েছেন, তেমন তিনি প্রকৃতির সর্বত্র বিদ্যমান। অন্তরে ও বাইরে তিনি সর্বদা সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। যেখানে যা কিছু দৃষ্টিতে পড়ে সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পান। জগৎ তাঁর নিকট ব্রহ্মময় হয়ে যায়। ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। যিনি এইরূপ সমদৃষ্টি লাভ করেন তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। তিনি জ্ঞানবান্ ও ভাগ্যবান্। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং তিনিও ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে অবস্থান করেন। তাই ভগবান বলছেন, 'বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে' বহু জন্মের শেষে। জন্ম জন্ম সাধনা করে একেবারে শেষ জন্মে জ্ঞানী ঐ চরম সত্য উপলব্ধি করেন। 'বাসুদেবঃ সর্বম্ ইতি' সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বাসুদেব, সমস্তই দৃশ্যমান জড়, চেতন সর্ববস্তুর মধ্যে তিনি অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। এইটি চরম উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক অনুভূতির শেষ কথা এবং এই উপলব্ধিবান মানুষ সংসারে দুর্লভ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।। ২০

তৈঃ (সেই) তৈঃ (সেই) কামৈঃ (স্ত্রীপুত্রধনাদি কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (যাঁদের বিবেকবুদ্ধি অভিভূত) তং (সেই) তং (সেই) নিয়মম্ (জপ-উপবাসাদির নিয়ম) আস্থায় (পালন করে, অনুশীলন করে) স্বয়া (নিজ) প্রকৃত্যা (প্রকৃতির দ্বারা) নিয়তাঃ (বশীভূত হয়ে) অন্যদেবতাঃ (বাসুদেব ভিন্ন অন্যদেবতার) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করেন)।

(স্ত্রী-পুত্র-ধন-স্বর্গাদি) সাংসারিক কামনা দ্বারা যাঁদের বিবেকবুদ্ধি অভিভূত হয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ (ক্ষুদ্র কলুষিত কামনা) স্বভাবের বশীভূত হয়ে জপ-উপবাসাদি নিয়ম পালনপূর্বক (বাসুদেব ভিন্ন) বিবিধ দেবতার ভজনা করেন।

অজ্ঞানী মানুষ তার নিজের প্রকৃতি বা স্বভাবের দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। আত্মস্বরূপের জ্ঞান আবৃত হয় ও মানুষ নানা কামনা-বাসনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার ছোট ছোট অনেক বাসনা পূর্ণ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কামনাপূরণই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই

সংসারের ধন, মান ও যশ লাভের নিমিত্ত সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু এক অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা সে করতে পারে না।

'প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ' তারা মনের কামনাসমূহ পূরণের জন্য বিবিধ দেবতার ভজনা করে। এই সব দেবতা প্রকৃতির নাম-রূপের মধ্যে অবস্থিত। মানুষ তার নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুযায়ী সেইরূপ দেবতার ভজনা করে। ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বা বল লাভের জন্য সেইরূপ দেবতার ভজনা করে। সেইসব দেবতার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধারের নিমিত্ত অথবা সংসারের ধন, জন, যশ, মান প্রভৃতি কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করে। 'তং তং নিয়মম্ আস্থায়' সেইসব ধর্মের নিয়ম পালন করে অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এক এক দেবতার পূজার জন্য এক এক নিয়ম। যখন সেই সব বাসনা পূর্ণ হয়, তখন সে খুব খুশি। কিন্তু সে যদি এ সব বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বর লাভের জন্যে তার সমস্ত মন ঢেলে দেয় তাহলে তার চিত্তশুদ্ধি হয়। ঈশ্বর লাভ করে তার মানব জন্ম সার্থক হয়। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

আধুনিক মানুষকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, সেই এক অনন্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মা সকলের আত্মা এবং সকলেই এই আত্মাকে সবচেয়ে ভালবাসে। জগতে অন্য সব ভালবাসা সেই পরম প্রেমেরই আংশিক প্রকাশ। ঐ পরমাত্মাই হলেন শাশ্বত আত্মা--আমাদের সকলের অন্তরাত্মা। স্বামীজী বেদান্তের ঐ কথাই বলছেন—প্রত্যেকের মধ্যে এক দেবত্ব বিরাজ করছেন, প্রত্যেকে তাই অনন্ত শক্তিমান। অতএব আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করা দৈনন্দিন কর্মের ভিতর দিয়ে। এই সত্যের উপর আমাদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর মানুষ অন্য দেবতার পূজা করতে পারে, তবে এই কথা জেনে যে সমস্ত পূজাই সেই এক ঈশ্বর বা পরমাত্মার উদ্দেশে। সমস্ত দুর্বলতা ত্যাগ করে শক্তিমান হোন এবং অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ করুন।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ।। ২১

যঃ (যে) যঃ (যে) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং (যে) যাং (যে) তনুং (দেবমূর্তি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে) অর্চিতুম্ (অর্চনা করতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য তস্য (তাঁর তাঁর, সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই সেই মূর্তিতেই) অচলাং (অচলা) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা, ভক্তি) অহম্ (আমি) বিদধামি (বিধান করি)।

যে যে (সকাম) ভক্ত যে যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করেন, সেই সেই দেবমূর্তিতে আমি তাঁদের অচলা ভক্তি প্রদান করি। (কারণ বিভিন্ন দেবদেবীর রূপ আমারই বিভূতি)।

ভক্ত ভগবানকে তার পছন্দসই মূর্তিতে পূজা করতে পারে। ভগবান সানন্দে তার পূজা গ্রহণ করে থাকেন। ভগবান এক এবং ভক্তিও এক। ভক্তি আন্তরিক হলেই হল। যে ভক্ত প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকে ভগবান তাকে হতাশ করেন না। রূপ ও পদ্ধতি বাহ্য; আসল

আন্তরিকতা। ভগবান মন দেখেন, পূজার আড়ম্বর দেখেন না।

যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে কোন বিশেষ দেব বা দেবীমূর্তি পূজা করেন, ভগবান তাঁর অন্তরে সেই শ্রদ্ধাকে আরও দৃঢ় ও স্থির করেন। কারণ সেই ভক্তের হৃদয়ে যদি সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে সে সমস্ত কিছু হারাবে। বিশ্বাস নষ্ট করতে নেই। কারণ ঈশ্বরের কাছে মানুষকে ধীরে ধীরে, বিবেকবিচার ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে হবে। কারও নিন্দা করা উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, যদি কাউকে ভাল কিছু দেখাতে পার, দেখাও, কিন্তু নিন্দা করো না। প্রত্যেককে তার আপন শ্রদ্ধায়, আপন বিশ্বাসে শক্তিশালী কর। তাহলে দেখবে পরে তার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। একদিন এই সব নানা মূর্তির উপাসনার ভিতর দিয়ে অর্থাৎ নামরূপের অতীত এক অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে।

একজন ঐরূপ এক ধর্মবিশ্বাসের নিন্দা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তাদের স্বাগত জানাও। তারা তাদের বোধশক্তি অনুযায়ী সাধন করছে। প্রত্যেক বাড়িতে ঢোকার যেমন সদর দরজা আছে, তেমনি খিড়কির দরজাও আছে। কিছু লোক ঢোকে সদর দরজা দিয়ে আর কিছু লোকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে ভালবাসে। খিড়কির দরজা দিয়েও তো বাড়িতে ঢোকা যায়। সুতরাং নিন্দা না করা একটি মহৎ ভাব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই মহৎ ভাবটি শিক্ষা দিচ্ছেন। নিন্দা করলে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। তাই ভগবান বলছেন, ভক্তের অন্তরের এই শ্রদ্ধাকে আমি দৃঢ়তর করি। ফলে একদিন ভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্য ছেড়ে ভগবানকে ভালবাসতে শিখবে।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ।। ২২

সঃ (সেই ভক্ত, উপাসক) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে) তস্য (তাঁর, সেই দেবতার) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (চেষ্টা করেন) ততঃ (এবং তাঁর (সেই দেবতার) থেকে) ময়া এব (আমার দ্বারাই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ (সেই) কামান্ (কাম্যবস্তু সকল) হি (অবশ্য) লভতে (লাভ করেন)।

সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই বিশেষ দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে যে কাম্যবস্তু লাভ করেন তার বিধান আমিই করে থাকি (কারণ আমিই একমাত্র ফলদাতা প্রভু এবং দেবতারাও আমার অংশসম্ভূত)।

ঈশ্বর এক, দুই নন। আমরা অজ্ঞ, তাই ভাবি ঈশ্বর বহু। বহু আমাদের কামনা, তাই বহু ঈশ্বর কল্পনা করে বহু আচার ও আচরণ করি। এক ঈশ্বর, তাঁর ওপর বহু নাম ও রূপ আরোপ করি। তাতে দোষ নেই যদি এক জেনে তাঁকে ভালবাসি।

ভগবান বলছেন, 'স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্যারাধনম্ ঈহতে' সেই শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্ত সেই বিশেষ দেবমূর্তির আরাধনা করেন অর্থাৎ যাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশেষ দেব-দেবীর উপাসনা করেন তাঁরা অভীষ্ট ফললাভে কৃতার্থ হন। এই অভীষ্টফল ভগবানই দিয়ে থাকেন,

কারণ সকল দেবতাই ভগবানেরই শক্তি বা বিভূতি। অতএব যদিও আমরা অজ্ঞানবশত ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারি না, কিংবা চিত্তের মলিনতাবশত বাসনাযুক্ত হয়ে অভীষ্ট ফললাভের আশায় দেবতাদের উপাসনা করি, অন্তর্যামী আমাদের সরলতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃঢ়তার জন্য পুরস্কারস্বরূপ ফল প্রদান করেন। তাই ভগবান অন্যত্র বলছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—যে যেভাবে আমার সমীপস্থ হয় আমি সেভাবেই তাকে অনুগৃহীত করি।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ।। ২৩

তু (কিন্তু) অল্পমেধসাম্ (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (তাঁদের) তৎ (সেই) ফলম্ (আরাধনালব্ধ ফল) অন্তবৎ (অন্তবিশিষ্ট, ক্ষণস্থায়ী) ভবতি (হয়) দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম্ অপি যান্তি (আমাকেই প্রাপ্ত হন)।

কিন্তু (ইন্দ্রাদি দেবতার) অল্পবুদ্ধি সেই উপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল ক্ষণস্থায়ী। দেবতার উপাসকরা স্ব স্ব দেবতাকে প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে থাকেন।

প্রকৃত ভক্ত যারা, তারা ভগবান ছাড়া আর কিছুই চায় না। অন্তত যা অনিত্য, তা তারা চায় না। তারা স্বর্গ চায় না, ধন-সম্পদ চায় না, পুত্র-কন্যা চায় না। তারা চায় আত্মজ্ঞান। ঈশ্বরানুরাগ। ঈশ্বর ছাড়া তারা আর কিছুই চায় না।

যাঁর যেমন শ্রদ্ধা, ভগবান তাঁকে তেমনই দান করে থাকেন। যে যা ভালবাসে, যা চায়, ভগবান তাকে তাই দিয়ে থাকেন। যাঁরা বিষয় আকাঙ্ক্ষা করে অন্যান্য দেবতার উপাসনা করেন তাঁদের কাম্যফল ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্য যা কিছু লাভ হয় তা অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি স্বর্গলাভ হলেও তা চিরস্থায়ী হয় না। নামরূপের উপাসকদের পুনরায় নামরূপের মধ্যে ফিরে আসতে হয়। তাঁরা দেবগণের ন্যায় সুখ, সৌভাগ্য জীবনে লাভ করতে পারেন, কিন্তু কখনও নামরূপের অতীত ভগবানকে লাভ করতে পারেন না। কিন্তু যাঁরা পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তাঁরা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানলাভ করেন। নিষ্কাম ভক্তিসহকারে ভগবানকে ভজনা করলে তিনি ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন। জ্ঞানী ভক্ত তখন ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হন। তাই ভগবান বলছেন, দেবতাদের উপাসকেরা তাঁদের উপাস্য দেবতার কাছে যান এবং আমার ভক্তেরা আমার কাছে আসেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ।। ২৪

অবুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিহীনগণ, অবিবেকিগণ) মম (আমার) অব্যয়ং (অক্ষয়, নিত্য) অনুত্তমং (সর্বোত্তম) পরং ভাবং (পরম স্বরূপকে) অজানন্তঃ (না জেনে) অব্যক্তং (অব্যক্ত, অপ্রকাশিত) মাং (আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (মনুষ্যাদি ভাবপ্রাপ্ত) মন্যতে (মনে করে)।

অবিবেকিগণ আমার অব্যয় সর্বোত্তম পরম স্বরূপ না জেনে, সর্বকারণ অর্থাৎ অব্যক্তস্বরূপ আমাকে, মনুষ্যভাবাপন্ন বলে বিবেচনা করে।

যদি ভগবান স্বয়ং মুক্তিদাতা হন, তবে জীব তাঁকে ছেড়ে কেন অন্য দেবতার আরাধনা করেন? এই সংশয় দূর করার জন্য ভগবান বলছেন, যারা বিবেকবুদ্ধিবর্জিত, তারা তাঁকে সর্বকারণের কারণ, অব্যয়, অদ্বিতীয়, নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ না জেনে প্রকাশিত সাধারণ মনুষ্যাদি জীব (মৎস্য, কূর্ম, মানুষ প্রভৃতি) মনে করে। অসীমকে সসীম, নিরাকারকে সাকার মনে করে নানা উপাসনায় ব্যাপৃত থাকে। সেইজন্য পরমেশ্বরের শরণাপন্ন না হয়ে অন্য দেবতার ভজনা করে এবং ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ করে।

তাই শাস্ত্রগ্রন্থ বার বার পড়তে হয়। পড়লে চিত্তশুদ্ধি হয়, বিবেক-বৈরাগ্য জাগ্রত হয়, নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিচার করার ক্ষমতা বাড়ে। এর ফলে যা অবান্তর, মিথ্যা, তা আর আমাদের আকৃষ্ট করতে পারবে না। তখন বুঝব ঈশ্বরই আমাদের সর্বস্ব। তাঁকে ছাড়া আর কিছু আমরা চাই না।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ।। ২৫

অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকায়) সর্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ ন (প্রকাশিত হই না)। (সেইজন্য) মূঢ়ঃ (মোহান্ধ, মূঢ়) অয়ং লোকঃ (এই লোকসকল) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) (অর্থাৎ আমি যে জন্ম-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তা) ন অভিজানাতি (জানতে পারে না)।

(ত্রিগুণাত্মিকা) যোগমায়ায় আবৃত থাকায় আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। সেইজন্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকেরা জন্মমৃত্যুরহিত আমার প্রকৃত অব্যয় স্বরূপ জানতে পারে না।

অজ্ঞ মূঢ় লোকেরা ভগবানকে জানতে পারে না। তাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন। ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করে যেমন প্রকাশিত সৃষ্টির মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করেন, তেমন আবার তিনি এই সবকিছুর অতীত অজ, অব্যয় এবং অব্যক্ত অপ্রকাশ। ত্রিগুণাত্মিকা যোগমায়া দ্বারা ভগবান তাঁর স্বরূপ আবৃত রাখেন। তাই জীব তাঁকে জানতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার । সাধারণ লোক তাঁকে দেখে চিনতে ও বুঝতে পারে না। ভাবে, তিনি তাদেরই একজন। অর্জুনও তাঁকে চিনতে বা বুঝতে পারেন নি। তাঁকে জানবার বা বুঝবার উপায় কী? উপায়—অনুরাগ। ভক্তের অনুরাগে তিনি যদি

বিগলিত হন, তাহলে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে জানবার বা বুঝবার কোন উপায় নেই। অর্জুনের প্রতি তাঁর অশেষ কৃপা, তাই তাঁর কাছে এই সত্য শ্রীভগবান প্রকাশ করছেন। সূর্য যেমন মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সাধারণ মানুষের মনও তেমনই ঈশ্বর সম্বন্ধে মোহাচ্ছন্ন থাকে। ঈশ্বর-দর্শনের একমাত্র উপায়— নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তা ও ব্যাকুলতা। 'আমি শুধু তোমাকে চাই, আর কাউকে চাই না'—এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ।। ২৬

অর্জুন (হে অর্জুন) অহং (আমি) সমতীতানি (অতীত) চ বর্তমানানি (ও বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (ভূতসকলকে) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) মাং (আমাকে) কঃ চন (কেউই) ন বেদ (জানতে পারে না)।

হে অর্জুন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের সমস্ত ভূতবর্গকে (অর্থাৎ সকল প্রাণীকেই) আমি জানি, কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপ কেউ জানতে পারে না।

ভগবান বলছেন, তিনি ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব জানেন। কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। সংশয় হচ্ছে ভগবান যদি তাঁর শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা নিজের স্বরূপ আবৃত রাখেন তাহলে কেউ তাঁকে জানতে পারবে না। কিন্তু ভগবান বলছেন, মায়া দ্বারা অজ্ঞ, মূঢ় ব্যক্তিদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল অর্জুনের প্রতি। তাই ধীরে ধীরে ভগবান তাঁর স্বরূপ অর্জুনের কাছে প্রকাশ করছেন। ভগবান মায়ার অধীন নন, মায়া ভগবানের শক্তি, ভগবানেরই আশ্রিত। তাই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভগবানের নিকট কিছু অজ্ঞাত নয়। ভগবান কৃপা করে তাঁর অনন্ত অসীম সত্তাকে জীবের কাছে যতটুকু প্রকাশ করেন জীব ততটুকু জানতে পারে। তাই ভগবান বলছেন 'মাং তু বেদ ন কশ্চন'—আমাকে কেউ জানে না অর্থাৎ যারা অল্পজ্ঞ, মূঢ় ব্যক্তি। কিন্তু যিনি জ্ঞানলাভ করেছেন, যিনি আমার শরণাগত ভক্ত তিনি আমাকে জানতে পারেন।

জীব মায়ায় আচ্ছন্ন। কি করে এই মায়ার আবরণ দূর করা যায়? বিবেক-বৈরাগ্য, ভগবানে শরণাগতি এবং অহরহ ঈশ্বরীয় চিন্তা—এর দ্বারাই মায়া-মোহ দূর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় অহং-এর জায়গায় তুঁহুকে বসাতে হবে। ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা—এই জেনে জীবন যাপন কর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'টাকা-পয়সার জন্যে মানুষ ঘটি ঘটি কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে কই?' দরকার, ভগবৎ-প্রেমে ডুবে যাওয়া।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ।। ২৭

ভারত (হে অর্জুন) পরন্তপ (হে শত্রুবিনাশকারী) সর্গে (সৃষ্টিকালে) ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে উৎপন্ন) দ্বন্দ্বমোহেন (দ্বন্দ্বজাত মোহের দ্বারা) সর্বভূতানি (সকল প্রাণী) সম্মোহং যান্তি (মোহগ্রস্ত হয়)।

হে শত্রুবিনাশক অর্জুন, উৎপত্তিকালেই অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ থেকে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং এই দ্বন্দ্বজাত মোহদ্বারা সকল প্রাণী অভিভূত হয়।

শ্রীভগবান অর্জুনকে 'ভারত' বলে সম্বোধন করেছেন। পরে 'পরন্তপ' বলেও সম্বোধন করেছেন। এ দুই সম্বোধন উদ্দেশ্যমূলক। 'ভারত' বলে সম্বোধন করে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি 'ভরত' বংশের সন্তান। তাঁর আচরণ যেন সর্বদা বংশের মর্যাদা রক্ষা করে চলে। তাঁকে 'পরন্তপ' বলেও সম্বোধন করেছেন। 'পরন্তপ' কথার অর্থ যিনি শত্রুকে দমন করতে সক্ষম, অর্থাৎ বীর।

আমাদের মনের দুটি অবস্থা লক্ষ্য করি—ইচ্ছা ও দ্বেষ। স্থূল দেহের উৎপত্তির সঙ্গে-সঙ্গে কখনও 'ইচ্ছা' আবার কখনও 'দ্বেষ' আমাদের পেয়ে বসে। মনের মত জিনিস পেলে 'খুশি', তার বিপরীত যদি পাই, তাহলে 'বিরাগ' অর্থাৎ 'দ্বেষ'। 'সুখ-দুঃখ' অথবা 'শীত-উষ্ণ' এ দুই বিপরীত জিনিসের হাতের পুতুল যেন আমরা। এ এক অসহায় অবস্থা। আমরা সব 'সম্মোহিত', যাদুকরের খেলার বস্তু।

শ্রীভগবান কোথায় কী প্রতিবন্ধক, তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করতে গেলে 'ইচ্ছা' ও দ্বেষ' এ দুয়ের কোনটারই বশে যেন না পড়ি। এই দুই মোহে বিবেকবুদ্ধি আচ্ছন্ন হলে জীব ভগবানের স্বরূপ জানতে পারে না।এই দ্বন্দ্ব কিভাবে আসে? ভগবান বলছেন, জীব যখন জন্মলাভ করে অর্থাৎ স্থূলদেহ ধারণ করে তখনই কতগুলি অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিরাগ প্রভৃতি দ্বন্দ্বে ভাবে আচ্ছন্ন থাকে। এই দ্বন্দ্বগুলি তার পূর্বে অর্জিত কর্মফলে জাত সংস্কাররূপে চিত্তে সঞ্চিত থাকে। এই সহজাত সংস্কারগুলি তার চিত্তে মোহ উৎপন্ন করে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে দেয় না। এই সংস্কারই তার চিত্তে বিবিধ সংকল্প ও কামনার উৎপত্তি ঘটায়। এইসকল কামনা-বাসনা তার চিত্তকে বিভ্রান্ত করে। তখন সে নিজেকে কখনও সুখী আবার কখনও দুঃখী মনে করে। তার নিজের স্বরূপ অব্যয় আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ জানবার জন্য তার প্রাণে কোনও আকাঙ্ক্ষা জাগে না।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ।। ২৮

তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যবান) জনানাং (ব্যক্তিদের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (ক্ষয় হয়েছে) দ্বন্দ্ব-মোহ-নির্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বমোহশূন্য) তে (সেই সকল) দৃঢ়ব্রতাঃ (ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন)।

কিন্তু যে সকল সুকৃতকারী ব্যক্তিদের পূর্বজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হয়েছে তারা দ্বন্দ্বমোহমুক্ত হয়ে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

আমরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা। আমরা চিরকাল অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ থাকব না। এক সময়ে হয়ত একজন অনেক অন্যায় করেছে। পরে তার অনুতাপ হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সৎকর্ম, সদাচার ও পুণ্যানুষ্ঠান করছে। ফলে তার সমস্ত পাপ সংস্কার ক্ষয় হয়ে চিত্তে নির্মলতা জন্মায়। আগের মানুষ সে আর নেই। ঈশ্বর ছাড়া সে আর কিছু জানে না। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব আর তার মধ্যে নেই। সে ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবে যায়।

একমাত্র সৎকর্মের দ্বারাই তমোগুণের সংস্কার পাপ ক্ষয় হয়। তমো ও রজোগুণের আধিক্য কমে চিত্তে সত্ত্বগুণের আধিক্য হলেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তাঁরাই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি। চিত্ত শুদ্ধ হলেই জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এবং ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে পারে। অতএব সত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হলেই জন্মকালীন দ্বন্দ্বমোহ নিবৃত্ত হয়। এরূপ দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্ত ব্যক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বরের ভজনা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'Great convictions are the mothers of great deeds' অর্থাৎ দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই মহৎ কার্য সম্ভব হয়। 'Be good and do good'—ভাল হব এবং ভাল কাজ করব এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় চাই। যখনই সৎকর্ম ও সৎআচরণ করব তখনই মনের আসক্তি ও বিদ্বেষ এই অশুভ শক্তির দাপট কমে আসবে। যাঁরা এই দুই মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই দৃঢ়তা ও সংকল্প নিয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপের উপাসনা করেন এবং তাঁরাই ঈশ্বরের যথার্থ উপাসক। তাই মনকে নিয়ন্ত্রিত করে শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া আমাদের নিজেদেরই শুরু করতে হবে।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ।। ২৯

জরা-মরণ-মোক্ষায় (জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের জন্য) মাম্ (আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করে) যে (যাঁরা) যতন্তি (যত্ন করেন, সাধন করেন) তে (তাঁরা) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) কৃৎস্নং (সমগ্র) অধ্যাত্মং (অধ্যাত্মবিষয়কে) অখিলং চ (এবং সমস্ত) কর্ম (কর্ম) বিদুঃ (জানেন)।

যাঁরা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের জন্য কেবল আমাকে আশ্রয় করে সাধন করেন, তাঁরা সনাতন পরব্রহ্মকে, সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়কে (অর্থাৎ জীবাত্মারূপে প্রকাশিত সগুণ ব্রহ্মকে) ও সমুদয় কর্মতত্ত্ব জানতে পারেন।

কিসের জন্য মানুষ পরমেশ্বরের ভজনা করে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে

মুক্তিলাভের জন্যই লোকে আমার উপাসনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। যাঁরা মুক্তিলাভ বা ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনা করেন এবং সৎকর্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করেন, তাঁরা সর্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্মকে, জীবাত্মারূপে প্রকাশিত সগুণ ব্রহ্মকে এবং সকল প্রকার কর্মের তত্ত্ব জানতে পারেন। অর্থাৎ পরব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁর কাছে কিছুই অজানা থাকে না।

বাস্তবিক, যখন মানুষের মনে বৈরাগ্য আসে তখন সংসার তার কাছে তিক্ত হয়ে ওঠে। সংসার-আবর্ত থেকে মুক্তিলাভের জন্য তখন সে ঈশ্বরের শরণাগত হয়। এই শুভ মুহূর্ত যার জীবনে দ্রুত আসে সে ভাগ্যবান। আলো যেমন অন্ধকারকে ঘুচিয়ে দেয়, তার মনের অন্ধকারকেও তেমনই মুছে দেয় ঈশ্বরের কৃপারূপ সূর্য। এই সূর্য আত্মজ্ঞানের সূর্য। প্রথমে সগুণ ব্রহ্ম, পরে নির্গুণ। প্রথমে দুই, পরে এক। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তাঁর কাছে ঐহিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অজ্ঞাত কিছু থাকে না। তিনি যেমন সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে জানতে পারেন তেমন অখিল কর্মতত্ত্বও জানতে পারেন। তিনি তখন সর্বজ্ঞ।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ।। ৩০

যে চ (এবং যাঁরা) মাং (আমাকে) স-অধিভূত-অধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সঙ্গে) স-অধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে) বিদুঃ (জানেন, উপাসনা করেন) তে (সেই) যুক্ত-চেতসঃ (সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালে অপি (মৃত্যুকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানতে পারেন, স্মরণ করেন)।

যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে বিদ্যমান সমগ্রভাবে আমাকে উপাসনা করেন, সেই সকল সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে স্মরণ করেন এবং ফলত আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে সমগ্রভাব জানেন অর্থাৎ অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে তাঁকে জানেন, কখনও ভগবানকে ভোলেন না। যাঁদের মন যোগযুক্ত তাঁরা এই বিষয়গুলি বোঝেন। 'স অধিভূত অধিদৈবং অধিযজ্ঞ' যিনি প্রকৃতির নশ্বর জড়বস্তুরূপে প্রকাশিত—অপরা প্রকৃতি, যিনি প্রকৃতির দীপ্তিমান আমাদের অন্তরের চৈতন্য আত্মা ও দৈবীরূপে প্রকাশিত—পরা প্রকৃতিরূপে এবং যিনি যাগযজ্ঞাদি ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সকল কর্ম নিয়ন্ত্রণ করেন—সবই ঈশ্বরের স্বরূপ। সমস্ত বস্তু ও কর্মের পিছনে এক ও অনন্ত সত্তা বা আত্মাই রয়েছেন। ফলে যাঁরা ভগবানের এই সমগ্র স্বরূপ জানতে পারেন তাঁরা জীবনের শেষ মুহূর্তে, মৃত্যুর পূর্বেও আমাকে জানতে পারেন।

তাঁদের চিত্ত সর্বদা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ভগবানও তাঁর হৃদয়ে সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকেন। কাজেই তিনি ভগবানকে স্মরণ করতে করতে এই সংসার থেকে

মুক্তিলাভ করেন। তাই ভগবান বলছেন, এমনকি মৃত্যুর সময় সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন শিথিল হয়ে পড়ে, তখনও তাঁর ঈশ্বর-চিন্তা নিঃশ্বাসের মত স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। তা সম্ভব হয় মানুষ যদি শৈশব থেকেই ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ** নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ের নাম জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ। ভগবান এই অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুনকে বলেছিলেন, ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করে এবং তাঁকে আশ্রয় করে যোগসাধনা করলে ভগবানের সমগ্র রূপ জানা যাবে। ভগবানের সগুণ ও নির্গুণভাব, ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব জানা যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।' ক্ষুদ্র বুদ্ধির মানুষ মনে করে সে অনন্ত ঈশ্বরের সব বুঝে গেছে—এইটি গোঁড়ামি সঙ্কীর্ণভাব। গীতাতে ভগবান তাই ভক্তের সঙ্কীর্ণভাব দূর করবার জন্য তাঁর অনন্ত স্বরূপ—সাকার ও নিরাকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, পরা ও অপরা, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে ঈশ্বরকে জানতে উপদেশ করছেন। ভগবানের স্বরূপের সঙ্গে কর্ম ও জগৎসৃষ্টির তত্ত্ব অবগত হলে ভগবানকে তাঁর সমগ্ররূপে এবং শক্তিতে জানা যাবে। কিন্তু ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে ভগবানের শরণাগত হতে হবে, তাঁতে নিবিড়ভাবে চিত্ত নিযুক্ত করতে হবে। যাঁরা এভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে—সংসারবন্ধন, জরামৃত্যু হতে মুক্তিলাভপূর্বক তাঁকে একান্তভাবে পাবার নিমিত্ত যত্নশীল হন, তাঁরাই ভগবানকে জানতে সমর্থ হন। শরণাগত ভক্তের নিকট তিনি তাঁর সমগ্র রূপ প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, 'ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী, কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সে জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা খাওয়া, হেউ ঢেউ হয়ে যাওয়া যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী।' তিনি বলছেন, 'বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর (ব্রহ্ম) দর্শন করেন। চোখ চেয়েও দর্শন করেন। কখনো নিত্য থেকে লীলাতে থাকেন—কখনো লীলা হতে নিত্যতে যান।'

ভগবান তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—আমার দুই প্রকৃতি—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির সংযোগেই এ জগতের সৃষ্টি। তিনিই এই জগতের মূল কারণ। প্রকৃতি তাঁর শক্তি। প্রকৃতিই ঈশ্বরের গুণময়ী মায়া। যাঁরা একান্ত শরণাগত হয়ে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তাঁরাই এই দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন। চার প্রকার ভক্ত তাঁকে প্রার্থনা করেন—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এবং এরা সবাই ভক্ত, উদার ও সুকৃতিশালী। ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে ভক্ত সাধারণত নানা নাম-রূপে অবস্থিত দেবদেবীর উপাসনা করেন। এইসব প্রাপ্য পুণ্যফল অনিত্য ও বিনাশশীল। এইসব নাম-রূপ অর্থাৎ সাকার দেব-দেবীর স্বরূপরূপে একমাত্র অখণ্ড, অনন্ত পরম ব্রহ্মই বিরাজ করছেন। তিনিই সগুণ ও তিনিই নির্গুণ—তিনিই নামরূপধারী জীবজগৎ ও দেবদেবীরূপে প্রকাশিত। নিষ্কামভাবে তাঁর উপাসনা ও শরণাগত হলে ভগবান তাঁর অব্যয় স্বরূপ প্রকটিত করেন এবং মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞান দূর করে ভক্তকে স্বরূপের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দর্শন করেন সর্বত্রই এক পরমাত্মা ঈশ্বর বিরাজ করছেন।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত ও অধিযজ্ঞের সঙ্গে ব্রহ্মকে জানতে পারলে এবং কর্ম ও জগৎসৃষ্টির তত্ত্ব অবগত হলে ভগবানের সমস্ত রূপ ও শক্তি জানা যাবে। ব্রহ্মই পরম অক্ষর, অবিনাশী, নিত্য, যার ক্ষয় নাই, বিকার নাই—সেই অব্যক্ত অক্ষরই ব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্ম জগতে প্রত্যগাত্মারূপে অর্থাৎ প্রতি দেহে চিদাভাস অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতিকেই অধ্যাত্ম বলা হয়। ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং অধ্যাত্ম হলো জীবাত্মা। ভূতবর্গের সৃষ্টিস্থিতি কারক যজ্ঞাদিতে আহুতিরূপ ত্যাগই কর্ম। জগতে যা কিছু ক্ষর স্বভাব বা বিকারীভাব অথবা নিত্য পরিবর্তনশীল তা-ই অধিভূত, সমস্ত সূক্ষ্মাভিমানী হিরণ্যগর্ভই বা আদিপুরুষই অধিদৈব এবং সাক্ষীচৈতন্যরূপ স্বয়ং ভগবান হলেন অধিযজ্ঞ। ঈশ্বর সমস্ত যজ্ঞের প্রবর্তক এবং কর্মফলদাতা। তিনি অন্তর্যামিরূপে জীব দেহে বিরাজ করেন।

যাঁরা ভগবানের শরণাগত এবং বিশেষ করে অন্তিমকালে তাঁকে স্মরণ করেন তাঁরা তাঁকেই প্রাপ্ত হন। যাঁরা ভগবানকে নিরন্তর স্মরণ করেন তাঁদের নিকট ভগবান সহজলভ্য হন। ভগবান বলছেন যদি চিরজীবন শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন থাকে, তবেই অন্তিমকালে যখন ইন্দ্রিয়সকল বিবশ হয়ে যায়, তখন কেউ ভগবৎকথা না শোনালেও ভগবচ্চিন্তা চির-অভ্যস্ত বলে আপনা-আপনি হৃদয়ে প্রকাশ হতে থাকবে। ভগবৎ-ভক্তের সেই অচেতন অবস্থাতেও ভগবচ্চিন্তা হয় এবং ভক্ত-বৎসল ভগবান তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। শরণাগত ভগবৎ-ভক্ত ভগবানকে লাভ করে পুনর্জন্মরূপ দুঃখ আর ভোগ করেন না। ভগবানই সকল জীবের পরম গতি, তিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বান্তর্যামী। এই অধ্যায়ে

পরমপুরুষের স্বরূপ বর্ণনা, অক্ষর ব্রহ্মের তত্ত্ব, ব্রহ্মোপাসনা এবং মৃত্যুকালে যোগবলে পরমপুরুষের ধ্যান ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়কে অক্ষরব্রহ্মযোগ বলা হয়।

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ।। ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ।। ২

অন্বয় : অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন) পুরুষোত্তম (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্ (ব্রহ্ম কী) অধ্যাত্মং কিং (অধ্যাত্ম কী) কিং কর্ম (এবং কর্ম কী) অধিভূতং (অধিভূত) কিং (কাকে) প্রোক্তম্ (বলে) চ কিম্ (এবং কাকে) অধিদৈবম্ উচ্যতে (অধিদৈব বলা হয়) মধুসূদন (হে মধুসূদন) অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) অধিযজ্ঞঃ ক (অধিযজ্ঞ কে?) অত্র (এখানে এই দেহে) কথং (কী প্রকারে তিনি অবস্থিত) প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যু সময়ে) নিয়ত-আত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা) কথং (কী উপায়ে) জ্ঞেয়ঃ অসি (আপনি জ্ঞাত হন)?

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্ম কী? কর্ম কী? কাকে অধিভূত বলা হয়? এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে?

হে মধুসূদন, এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? কেনই বা তিনি অধিযজ্ঞ এবং কিরূপে তিনি অবস্থিত? মৃত্যুর সময় সংযত ব্যক্তিরা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কিরূপে তাঁকে জানতে পারেন?

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান কয়েকটি কথা বলেছেন—যারা অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অখিল কর্ম এবং ব্রহ্মের তত্ত্ব জানেন, মৃত্যুকালেও আমি তাঁদের স্মৃতিপথে উদিত হই। ঐ শব্দগুলির অর্থ অর্জুনের কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই অর্জুন শ্রীমধুসূদনকে সেই কথাগুলির অর্থ বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করেন। ভগবান না বললে কে আর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়ে বলবে? তিনি মধুসূদন। অর্থাৎ যিনি সব বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন এবং মৃত্যুকালে কিভাবে তাঁকে জানা যাবে তাও জানতে চাইলেন।

১. ব্রহ্ম কী? তিনি সগুণ, না নির্গুণ? উপাধিযুক্ত, না নিরুপাধিক?
২. অধ্যাত্ম কী? দেহকে আশ্রয় করে আছেন তিনি? ইন্দ্রিয়সকল অথবা সব?
৩. কর্ম কী? সংসারে নির্বাহের জন্যে যা করি, তাই? অথবা শাস্ত্রবিহিত যা করি, তাই? অথবা নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের জন্যে যা করি, তাই?

৪. অধিভূত কাকে বলে? দৃশ্য পশুপক্ষী অথবা পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চভূত?
৫. অধিদৈব কি? প্রাক্তন কর্মের ফল? চৈতন্যরূপে সকল ভূতের মধ্যে বিদ্যমান? নাকি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে আশ্রিত?
৬. অধিযজ্ঞ কে? যিনি দেহের মধ্যে বা বাইরে আছেন? স্বর্গে বা অন্য লোকে? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে?
৭. প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ
মৃত্যুকালে জীবের বাহ্য জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যোগযুক্ত জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা কী করে তোমাকে জানতে পারেন? যাঁরা সব সময় ঈশ্বরের চিন্তা করেন, মৃত্যুকালেও তাঁরা ঈশ্বরের চিন্তা করেন—এইটাই শ্রীভগবানের উত্তর।

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ।। ৩

শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বললেন)—পরমম্ অক্ষরং (পরম অক্ষরকে) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) স্বভাবঃ (প্রতিদেহে আত্মভাবে অবস্থানকে) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলা হয়) ভূতভাব-উদ্ভবকরঃ (ভূতগণের উৎপত্তিকর) বিসর্গঃ (বিসর্জন, যজ্ঞে দ্রব্যাদি অর্পণ) কর্ম-সংজ্ঞিতে (কর্ম নামে অভিহিত)।

উত্তরে শ্রীভগবান বললেন—পরম অক্ষর যে বস্তু তা-ই ব্রহ্ম। অর্থাৎ যাঁর ক্ষয় নেই, বিকার নেই, সেই অব্যক্ত অক্ষর বস্তুই ব্রহ্ম। স্বভাব অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম প্রতি দেহে যে আত্মভাবে অবস্থান করেন তাকেই অধ্যাত্ম বলে। ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতির যে ভাব বা বস্তু তাই ভূতভাব। সেই ভূতভাবের যে উৎপত্তি করে তাকেই ভূতভাবোদ্ভবকর বলে। ভূতসমূহের উৎপত্তিকর যে 'বিসর্গঃ', অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যে যজ্ঞ তা-ই কর্ম।

পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম—পরম অক্ষর যে সত্তা, তাঁকেই ব্রহ্ম বলা হয়। 'অক্ষর' মানে যার ক্ষয় নেই, 'বিকারও' নেই। তিনি জন্মমৃত্যুরহিত। তিনি নির্গুণ ও নিরুপাধিক। তবে তিনি সগুণ ও সোপাধিকও হতে পারেন। গুণ ও উপাধি সেক্ষেত্রে তাঁর ওপর আরোপিত।

স্বভাবো অধ্যাত্মং উচ্যতে—স্বভাবের অন্য নাম 'অধ্যাত্ম'। একেই আবার 'ভাব' বলা হয়। এই ভাব দুই প্রকার —পরা ও অপরা। এরা ভগবানে আশ্রিত। এরাই তাঁর প্রকৃতি। তাই 'অধ্যাত্ম'।

ভূত-ভাব উদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ—ভূতগণের (ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম) উৎপত্তি ও বৃদ্ধির পশ্চাতে ত্যাগ ও কর্ম চাই। কর্ম বলতে এই কর্মযজ্ঞকেই বুঝায়। তাই বলা হয়—'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি।' বিসর্গঃ—শাস্ত্রবিহিত যাগ, দান ও হোমাত্মক কর্ম যা

ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান বলছেন—যিনি অবিনশ্বর, যিনি অন্তরে-বাহিরে, ওতপ্রোতভাবে যিনি সর্বত্র বিদ্যমান তিনিই অক্ষর। যিনি উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা, যিনি সকলের মূল এবং শেষ গতি, যিনি কার্যের শুরু এবং শেষ, তিনিই অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম। এই অক্ষর চৈতন্যের স্বভাব চৈতন্যরূপে প্রত্যেক জীবদেহমধ্যে অধ্যাত্ম নামে অবস্থান করেন। যাগযজ্ঞ, হোম, দান ইত্যাদি কর্ম। ঐ কর্ম ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ।। ৪

দেহভৃতাং (দেহধারীদের মধ্যে) বর (শ্রেষ্ঠ) (হে অর্জুন) ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (বস্তু) অধিভূতং (অধিভূত) পুরুষঃ (পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত) চ অত্র (এবং এই) দেহে (শরীরে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ)।

হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, দেহাদি বিনাশশীল পদার্থই অধিভূত, পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই অধিদেবতা। এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ।

নশ্বর দেহাদি পদার্থ, ক্ষর ভাবই অধিভূত, পুরুষ অধিদৈব এবং এই দেহে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমি অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, যজ্ঞাদির প্রবর্তক ও ফলদাতা।

অর্জুনের আরও তিনটি প্রশ্ন—

১. ক্ষরো ভাবঃ অধিভূতং—কাকে অধিভূত বলা হয়? যা কিছু ভূতাদি দেহ, নশ্বর ও ক্ষয়িষ্ণু, তাকেই বলা হয় 'অধিভূত'। মানুষও অধিভূত, কারণ সে ক্ষয়শীল।
২. পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্—প্রত্যেক ভূতের মধ্যে যে চিন্ময় অন্তর্যামী-সত্তা আছে তা-ই অধিদেবতা। প্রত্যেক ভূতের মধ্যে যা কিছু আছে, ইন্দ্রিয়গণ তাকে প্রকাশ করে। তাই ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলা হয়।
৩. অত্র দেহে অহং এব অধিযজ্ঞঃ—আমিই আমার দেহের 'অধিযজ্ঞ'। কারণ আমি আমার দেহের সকল যজ্ঞকে অধিকার করে আছি। এই জগতে যা কিছু ঘটে, তা যজ্ঞবিশেষ। ব্যষ্টির ব্যাপার হোক, বা সমষ্টির ব্যাপার হোক, বা সৃষ্টির ব্যাপার হোক। যজ্ঞের উদ্দেশ্য কী? শান্তি বা আনন্দ লাভ। তুমি মনে রেখো আমাকে বাদ দিয়ে তুমি কিছুই করতে পার না। আমিই তোমার আত্মা, তোমার অধিযজ্ঞ।

অতএব ভগবান তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—উৎপত্তি-বিনাশশীল নশ্বর পদার্থই অধিভূত। হিরণ্যগর্ভ পুরুষই অধিদৈব এবং সর্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্বযজ্ঞের ফলদাতা ও সর্বযজ্ঞের দ্রষ্টারূপ বিষ্ণু ভগবানই অধিযজ্ঞ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অধিযজ্ঞ। তিনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক এবং যজ্ঞাদি কর্মের ফলদাতা।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।। ৫

অন্বয়: অন্তকালে চ (শেষ সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুকালে) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরণ্ (স্মরণ করতে করতে) কলেবরম্ (দেহ) মুক্ত্বা (ত্যাগ করে) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মৎ-ভাবং (আমার ভাব অর্থাৎ স্বরূপ) যাতি (প্রাপ্ত হন) অত্র (এতে) সংশয়ঃ (কোন সন্দেহ) ন অস্তি (নেই)।

যিনি মৃত্যুর সময়ও আমাকেই স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি আমাকেই লাভ করেন—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

অধিভূত, অধিযজ্ঞ ইত্যাদি কয়েকটি কথা শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন। এ সব কথার মধ্যে তাঁর শেষ কথা হচ্ছে 'অধিযজ্ঞ'। অধিযজ্ঞের অর্থ হচ্ছে তাঁর স্বরূপ। এই অবস্থায় তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। মৃত্যুশয্যায় কেউ তাঁকে স্মরণ করলে এই অবস্থা সে লাভ করে। 'অন্তকালে চ'—মৃত্যুর সময়। ঈশ্বরের স্মরণ-মনন অনুক্ষণ করা চাই। যে তা পারে সে মৃত্যুর সময়েও ঈশ্বরকে ভোলে না। শেষ মুহূর্তেও সে আমার চিন্তায় ডুবে থাকে। অর্থাৎ সে মুক্তি লাভ করে। নির্গুণ আত্মাকে যে সব সময় স্মরণ করে, মৃত্যুর পরেও সে নির্গুণ আত্মাতেই সমাহিত হয়।

হিন্দুধর্মে মৃত্যুর অর্থ হল আত্মার শরীর ত্যাগ করা। মৃত্যু হয় শুধু শরীরের, আত্মার নয়। তাই মৃত্যুকে দেহত্যাগ বলে। মৃত্যুতে আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে গমন করে, এক লোক থেকে অপর লোকে গমন করে। তাই 'অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্'—সেই মৃত্যুর মুহূর্তে ঐ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ অথবা বিষ্ণুকে স্মরণ করতে করতে 'মুক্ত্বা কলেবরম্' তাঁর দেহ ত্যাগ করেন। 'যঃ প্রয়াতি'—যিনি এইভাবে মৃত্যুবরণ করেন। 'স মদ্ভাবং যাতি'—তিনি আমার সত্তা লাভ করেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আমরা যা চিন্তা করি, তার প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নির্ধারিত হয়। তাই ভগবান বলছেন, যিনি অন্তিম মুহূর্তে আমার চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই আমার কাছে আসেন। 'নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ'—এতে কোনও সন্দেহ নেই। হিন্দু ধর্মে এই হচ্ছে পুনর্জন্মবাদ। তাই দেহত্যাগের সময় মানুষ ঈশ্বর চিন্তা করে, মন্ত্রোচ্চারণ করে অথবা ভজন গায়। তবে এটা আমাদের জানা প্রয়োজন যে, সারা জীবন ঈশ্বরচিন্তার অভ্যাস না করলে ঠিক শেষ সময়ে ভগবানে সমাহিত হওয়া যায় না। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, অনুরাগ না থাকলে, শেষ মুহূর্তে তাঁর চিন্তা মনে আসে না। তাই নিরন্তর অভ্যাস করে এই মনকে তৈরি করতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, মৃত্যুকে যে বাহুপাশে বাঁধতে পারে, একমাত্র তারই কাছে জগন্মাতা আসেন। পূর্ণ সত্য জানতে হলে আমাদের জীবন ও মৃত্যু দুইই চাই। যাঁরা

মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন ও সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি হবার ক্ষমতা রাখেন, একমাত্র তাঁরাই মহৎ হতে পারেন। তাই চরম মুহূর্ত যখন আসবে, যখন আমাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে, তখন যেন প্রসন্ন চিত্তে বলতে পারি—হে মৃত্যু, তুমি এসেছো। তোমাকে আমি আলিঙ্গন করি। এইরূপ নির্ভীকতা চাই। ঈশোপনিষদ-এর শেষ চারটি শ্লোকে ঋষি বলছেন—সুন্দর জীবন যাপন করে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। প্রার্থনা করছেন—'এই সূর্য ও বিশ্বের পিছনে যে পরম সত্য আবৃত আছে, তা আমার কাছে উদ্ঘাটিত হোক। আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। এখন মৃত্যু আগত। এই শরীর আগুনে ভস্মীভূত হয়ে ভৌতিক উপাদানে পরিণত হোক। হে মন, এখন তোমার শুভকর্মের কথা স্মরণ কর।' এই হল আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি।

ভগবান বলছেন যাঁরা আমাকে স্মরণ করেন তাঁরা আমাকে লাভ করেন—অর্থাৎ ঈশ্বরের যে কোন সত্তার অনুধ্যান করেই সেই অখণ্ড, অদ্বিতীয় পরমাত্মা সত্তাকে লাভ করতে হবে। আজীবন ভক্তিভরে শরণাগত হয়ে ভগবানের উপাসনা করলেই মৃত্যুকালেও তাঁকে স্মরণ করার সম্ভাবনা থাকে, নতুবা শেষ সময়ে মন বিষয়চিন্তাই করে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ।। ৬

অন্বয়: কৌন্তেয় (হে অর্জুন) অন্তে (মৃত্যুকালে) যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (ভাব) স্মরণ (স্মরণ করে) কলেবরং ত্যজতি (দেহত্যাগ করেন) সদা (সর্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত পুরুষ) তং তম্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হন)।

হে অর্জুন, যিনি যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, সবসময় সেই ভাবে চিত্ত পূর্ণ থাকায় তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, তিনি যেন সব সময় তাঁকে স্মরণ-মননের অভ্যাস করেন। তাহলে মৃত্যুর সময়েও তিনি তাঁর সত্তায় মিলিত হবেন। যে যেমন চিন্তা করে, সে মৃত্যুর পর সেই রকমই হয়। চিন্তার দ্বারা আমাদের চরিত্র রূপায়িত হয়।

সংসারে মনটাকে আমি বিষয় চিন্তায় মগ্ন করে রেখেছি অথচ আমি হাতে মালা জপছি। লোককে দেখাচ্ছি মালা জপছি কিন্তু মনে মনে অন্য চিন্তা করছি। আমি শাস্ত্র পাঠ করছি, মনে মনে স্বার্থচিন্তা করছি। আসলে মনটাই তো সব। মনটা যদি আমার ঈশ্বরের দিকে না যায়, তাঁর স্মরণ-মনন না হয় তাহলে সব বৃথা। অতএব সংসারে আসক্তি থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা যায়।

সারাজীবন যদি ঈশ্বরের স্মরণ-মনন না করা যায়, তাহলে মরবার সময়ও সংসারের কথাই মনে পড়বে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, কখনও কখনও দেখা যায় যে, একজন মৃত্যুর সময় তেজপাতা, পাঁচফোড়ন কিংবা সলতের তেল কমাতে হবে—এসব বলতে থাকে। সংসারে আসক্তি প্রবল থাকলে এরকম হয়। মৃত্যুর সময় আমরা যা চিন্তা করি, পরজন্মে আবার তা-ই হয়ে যায়।

ভাগবতে আছে, ভরতমুনি হরিণের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করলেন, পরে তিনি সেই হরিণ হয়ে জন্মালেন। তাই ভগবান এখানে বলছেন, 'যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্'—যিনি যে দেবতাকে বা যে বস্তুকে ভাবতে ভাবতে দেহত্যাগ করেন, 'তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'—তিনি সেই দেবতা বা সেই বস্তুর স্বরূপই প্রাপ্ত হন। যা তুমি চিন্তা করবে মৃত্যুকালে তা-ই হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, বাঃ, এ তো খুব সহজ ব্যাপার। সারাজীবন যা খুশি করলাম, মৃত্যুকালে যদি কোনরকমে একটু ভগবানের চিন্তা করি তাহলেই একেবারে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাব। কিন্তু তা হয় না। শেষ সময়ে ভগবানকে চিন্তা করার জন্য সমস্ত জীবন ধরে তৈরী হতে হয়। অভ্যাস করতে হয়।

একজন ভাল ইংরেজি লিখতে পারে। তা সে কি একবারেই লিখতে শিখেছে? না। তার জন্য তাকে অনেক কষ্ট করে পড়াশুনা করতে হয়েছে, ইংরেজি লেখা অভ্যাস করতে হয়েছে, তারপরে হয়েছে। গীতাতে তাই ভগবান 'অভ্যাসযোগ'-এর কথা বলেছেন। অভ্যাসকে একটা যোগ বলা হচ্ছে। অভ্যাসের ফলে মন এমন অবস্থায় পৌঁছায় তখন আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতে পারি না, চেষ্টা করলেও পারব না। সারাজীবন ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাস থাকলে শেষ সময়ে ঐ চিন্তাই মনে প্রাধান্য পাবে।

তাই শ্রীভগবান অর্জুনের কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন—তোমাকে নিশ্চিত বলছি আমার ভক্ত কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। সে আমাকে পাবে এবং আমাতেই বিলীন হবে। তাই তোমাকে সমগ্র জীবন ভগবানের চিন্তা করা অভ্যাস করতে হবে এবং তাঁর কর্ম সম্পাদন করতে হবে এবং একান্তমনে তাঁর ভজনা করতে হবে—এই মুক্তি লাভের সহজ পথ।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ।। ৭

অন্বয়: তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু কালেষু (সকল কালে অর্থাৎ সবসময়) মাম্ অনুস্মর (আমাকে চিন্তা কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর) ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে) অসংশয়ম্ নিশ্চয়ই) মাম্ এব এষ্যসি (আমাকেই প্রাপ্ত হবে)।

অতএব সবসময় আমাকেই স্মরণ কর এবং স্বধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করবে—তাতে কোন সন্দেহ নাই।

অর্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করা তাঁর ধর্ম । বর্ণাশ্রম এই ধর্মের বিধান দিয়েছে। ক্ষত্রিয় হিসেবে অর্জুন যুদ্ধ করতে বাধ্য। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ক্ষত্রিয়দের দায়িত্ব। এই কর্তব্য পালন না করলে অধর্ম হয়। এতে চিত্তের মালিন্য কাটে না, ঈশ্বরের চিন্তাও হয় না। 'আমি কর্তা' এই অভিমান মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে বারবার জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে হয়। মুক্তির পথ রুদ্ধ। ঈশ্বরলাভ নাগালের বাইরে। উপায়? উপায় ঈশ্বরীয় চিন্তা। তাই ভগবান প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে উপদেশ দিলেন— 'তুমি আমার স্বরূপ চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর (মামনুস্মর যুধ্য চ)।' এই চিন্তা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক হবে। এর সঙ্গে বর্ণধর্ম অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে হবে। ফলে চিত্তশুদ্ধি হবে। শুধু ঈশ্বরচিন্তা। ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদচিন্তা। পরিণতি—ঈশ্বরে সমাহিত হওয়া।

অর্জুন সনাতন ধর্ম অনুযায়ী প্রবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ গৃহস্থধর্মে থেকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন করার জন্য যুদ্ধরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পূর্ব থেকে তিনি যদি নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করতেন তাহলে তাঁর কর্ম ত্যাগ সম্ভব ছিল অর্থাৎ রাজ্যলাভ ও যুদ্ধে প্রবৃত্তিই হতো না। কিন্তু ক্ষাত্র ধর্মের প্রেরণায় তিনি ধর্মযুদ্ধে জয়লাভের আশায় তিনি ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। অতএব ভগবানে আত্মসমর্পণ করে সেই যুদ্ধকর্ম চরিতার্থ করতে পারলেই নিষ্কামভাব ও বৈরাগ্যলাভ সম্ভব। তাই স্বধর্ম অনুযায়ী অর্থাৎ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে শাস্ত্রমতে কর্ম করা আবশ্যক। সেইরূপ কর্ম করলে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য-লাভ হবে। তাই ভগবান অর্জুনকে 'যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও' এই বলে তাঁকে হিংসাত্মক যুদ্ধে প্রেরণা করছেন না। ভগবান তাঁর কর্তব্য স্মরণ করে দিলেন মাত্র। যুদ্ধ করতে এসে, অর্জুন স্বধর্ম-পালনে পশ্চাৎপদ হলে তিনি চিত্তশুদ্ধি ও নিষ্কামভাব অর্জন করতে পারবেন না। তাতে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তিলাভ ও জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে না। ভগবানের শরণাগত হয়ে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম পালনই চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধাভক্তি বা শুদ্ধজ্ঞান লাভের একমাত্র পথ।

ভগবানের প্রতি একান্ত ভালবাসা প্রয়োজন। ভালবাসা ছাড়া কেউ ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করতে পারে না। ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা—আসলে ভক্ত কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। ভক্ত তখন ভগবানের উদ্দেশে নিষ্কামভাবে স্বধর্ম অনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান করে। তাই অর্জুন ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধই তাঁর স্বধর্মোচিত কর্ম। তাই ভগবান তাঁকে যুদ্ধ করতে বলছেন। ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য করে সমগ্র মানবজাতিকে স্বধর্ম শাস্ত্রীয়ভাবে, নিষ্কামভাবে সর্বদা অনুষ্ঠান করতে বলছেন।

গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী—আমাকে স্মরণ কর ও জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাও। কাজদুটি পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। দুটিই একসঙ্গে চলবে। আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের সকলকেই কাজ করতে হয় জীবনে। কাজের সঙ্গে ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে। ঈশ্বরই আমাদের স্বরূপ। তাঁকে উপলব্ধি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সকলেই তাঁকে লাভ করবে।

'ময্যর্পিত মনো বুদ্ধিঃ মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্'—যাঁর মন আমাতে স্থির, যাঁর বুদ্ধি আমাতে স্থির, অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হয়েছে, আমার কাছেই পৌঁছাবেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, নিজেকে পাপী ভাবতে নেই। যে রাতদিন নিজেকে পাপী বলে চিন্তা করে সে পাপীই হয়ে যায়। মানুষকে পাপী বলাই পাপ। সে নিজেকে মনে করে, আমি ঈশ্বরের সন্তান, সেই ঈশ্বরই হয়ে যায়। সর্বদা ইতিবাচক ভাবনা। তাই ঈশ্বরের চিন্তায় কাজ ও নিজেকে ঈশ্বরের ভাবে রূপান্তরিত করতে হবে।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ।। ৮

পার্থ (হে অর্জুন) অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হয়ে) ন অন্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্ত দ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (অনুধ্যান করতে করতে) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরমপুরুষকেই) যাতি (প্রাপ্ত হন)।

হে অর্জুন, মনকে অন্য বিষয়ে যেতে না দিয়ে পুনঃপুন অভ্যাস দ্বারা মনকে স্থির করে সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষের অনুধ্যান করতে করতে সাধক তাঁকেই প্রাপ্ত হন।

কী করলে ভক্ত ভগবানকে লাভ করতে পারে? ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাসের দ্বারা। নিরন্তর অভ্যাসের মাধ্যমে। এই অভ্যাস এমন হবে যে এক মুহূর্তের জন্যেও আমি ঈশ্বরকে ভুলে থাকব না। আমি সর্বদা তদ্গতচিত্ত হয়ে থাকব অর্থাৎ তাঁর চিন্তায় ডুবে থাকব। যেমন তৈলধারা এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে ঢালা হয় নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, তেমনই আমার মন এক মুহূর্তের জন্যেও যেন তাঁকে ভুলে না থাকে। সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করার ফলে আমার মধ্যে ঐশীভাব ফুটে ওঠে। ক্রমে আমি ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যাই। এর নামই মুক্তি।

প্রথম প্রথম তো মন ঈশ্বরের দিকে ততটা যেতে চায় না। কিন্তু অভ্যাসের ফলে এমন করা যায় যে, সেই মনই আর ঈশ্বর ছেড়ে অন্য দিকে কিছুতেই যাবে না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা যদি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করতেন, ঠাকুর বিরক্ত হতেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য চিন্তা করা উচিত নয়। তিনি বলতেন এমন অভ্যাস কর যাতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ঈশ্বরচিন্তা অর্থাৎ জপ হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস যেমন আমাদের চেষ্টা করে করতে হয় না, জপটাও তখন আর চেষ্টা করে করতে হয় না। একে 'অজপা' বলে। আপনা-আপনি আমার মন ঈশ্বরের নাম করে যাচ্ছে। এরকম যদি হয় তাহলে দেখা যাবে মৃত্যুকালেও ঈশ্বরের নাম স্মরণ ছাড়া আমি আর কিছু করছি না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—nervous association, একটা বড় চিন্তা আমি এমনভাবে আয়ত্ত করেছি যে, স্বপ্নেও তার অন্যথা করতে পারছি না। করতে যাচ্ছি,

অমনি কে যেন আমাকে আটকে দিচ্ছে। সমস্ত শরীর-মন-বুদ্ধি ঐভাবে ঐ চিন্তায় একেবারে বাঁধা রয়েছে, ইংরেজিতে যাকে বলে, 'attuned' হয়ে আছে। আজকাল মনোবিজ্ঞানীরাও এটা স্বীকার করেন। তাঁরা বলছেন 'censorship' একে বিবেক বলি, সংস্কার বলি, নীতিবোধ বলি বা অন্য যে কোন শব্দই ব্যবহার করি না কেন—এই censorship-এ আছেই। মনকে কে যেন শাসাচ্ছে—খবরদার, এ করবে না, ওদিকে যাবে না। অভ্যাসের ফলে এটা সম্ভব।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Habit is the second nature. স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'second nature' না, first nature'. '...it is first nature also, and the whole nature of man; everything that we are the result of habit' আমরা যা অভ্যাস করি, তা-ই হয়ে যাই। আমাদের চরিত্রটা কী? অভ্যাসের ফল। এই জন্মে বা পূর্ব পূর্ব জন্মে আমরা যা করেছি, সে সব আমাদের মনে ছাপ ফেলে গেছে। সেই ছাপগুলির সমষ্টি হচ্ছে আমাদের চরিত্র। হয়তো আমার মনে একটা খারাপ ছাপ পড়ে আছে। আজ থেকে যদি আমি ভাল কাজ করা শুরু করি, আমার মনে ভাল ছাপ পড়তে শুরু করবে। ধীরে ধীরে সেই খারাপ ছাপ ম্লান হয়ে যাবে। অভ্যাসের ফলে এ সম্ভব। জীবনে আমরা কত রকম অভ্যাস গঠন করি—ভাল অভ্যাস, আবার মন্দ অভ্যাস। পুরনো অভ্যাস ছেড়ে দিই, কত নতুন অভ্যাস ধরি। সেইরকম ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করার অভ্যাসটাও যদি ধরা যায়। প্রথম প্রথম হয়ত ভাল লাগে না। কারও কারও প্রথম থেকেই ভাল লাগে। কারও কারও প্রথম দিকে ভাল লাগে না—কিন্তু একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, আর চেষ্টা করে ঈশ্বরের স্মরণ-মনন করতে হয় না। আপনা-আপনিই মনটা ঈশ্বরের দিকে যায়। ঈশ্বরচিন্তা করতে না পারলেই বরং তখন খারাপ লাগে। অভ্যাসের এমনই শক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এক হাতে সংসারের কাজকর্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাক। হাতের কাজ শেষ হলে দুহাত দিয়েই ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধর। সেইরূপ ঈশ্বরের অনুধ্যান ও কর্ম একসঙ্গে জোর করে অল্প অল্প শুরু করলে, ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে তা ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং ঐ ভাব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়, মন তখন সর্বদাই ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে। গীতায় ভগবান এই অভ্যাসযোগের উপর বেশি করে জোর দিয়েছেন।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।। ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।। ১০

অন্বয়: কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (সবকিছুর নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম) সর্বস্য ধাতারম্ (সকলের কর্মফলদাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ মনোবুদ্ধির অগোচর)আদিত্য বর্ণং (সূর্যের মত স্বপ্রকাশ) তমসঃ পরস্তাৎ (মোহ অন্ধকারের পারে বর্তমান) (সেই পরমপুরুষকে) প্রয়াণকালে (মৃত্যুর সময়) অচলেন মনসা (একাগ্র মনে) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত হয়ে) যোগবলেন চ (ধ্যানের অভ্যাসজনিত চিত্তস্থৈর্য দ্বারা) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রূযুগলের মধ্যে) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য (প্রাণকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করে) যঃ অনুস্মরেৎ (যিনি স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) তং দিব্যং পরমং পুরুষম্ (সেই দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)।

যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, সবকিছুর নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অচিন্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ মনোবুদ্ধির অগোচর, সূর্যের মতো স্বপ্রকাশ, মোহান্ধকারের অতীত, সকলের কর্মফলের দাতা সেই পরমপুরুষকে যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যোগের দ্বারা মনকে স্থির করে প্রাণকে দুই ভ্রূর মধ্যে ধারণ করে একাগ্র চিত্তে ধ্যান করেন, তিনিই সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে লাভ করেন।

প্রশ্ন হচ্ছে—কী করে ঈশ্বরকে জানা যায়? তিনি বাক্য-মনের অতীত। কোন্ ভাষায় কে তাঁর কথা আমাকে বুঝিয়ে বলবে, আর আমি বুঝব? তিনি বাক্যমনাতীত। এমন কোনও মাপকাঠি নেই যা দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায়। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি কবি, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের দ্রষ্টা। তিনি অনাদি। তাঁর অবিদিত এই বিশ্বে কিছুই নাই এবং থাকতে পারে না। তিনি পুরাণ, চিরন্তন পুরুষ, তিনিই সকলের আদি। সব কিছুর শাসক (অনুশাসিতা) তিনি অন্তর্যামী। সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে সকলকে চালাচ্ছেন। তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তিনি কিন্তু সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর জন্যেই সব কিছুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি আছেন বলেই আমরা আছি। তিনি সূর্যের ন্যায় জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুর কর্তা নন। কোন কিছুর কর্তৃত্ব তাঁর ওপর আরোপ করা যায় না। তিনি আছেন বলেই চন্দ্র সূর্য উঠছে, সব কিছু যথারীতি ঘটছে। এক লিখে তার পিঠে শূন্য দিলে দশ হয়, আর একটা শূন্য দিলে একশ হয়। যতই শূন্য দেওয়া যাবে, ততই অঙ্ক বাড়বে। কিন্তু যদি গোড়ার এক মুছে ফেলা হয়, তবে শুধু শূন্য থাকে। 'এক' ঈশ্বর, তিনি জীব-জগৎ সব হয়েছেন।

অন্ধকার বলে কিছু নেই। আলোর অভাবই অন্ধকার। ন্যায়মতে ভগবান অন্ধকার ও

অজ্ঞানতার ঊর্দ্ধে বিরাজ করছেন। তিনিই জ্ঞান ও চৈতন্যের মূল। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। 'প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন'—যে কোন উপায়েই হোক ঈশ্বরকে জানতে হবে। এই জানার নাম মুক্তি। এই জানাতেই শান্তি।

কী করে তাঁকে পাওয়া যায়?

'মনসা অচলেন'—মনকে বাহ্যবিষয় থেকে নিবৃত্ত করে স্থির মনে তাঁকে ধ্যান করতে হবে। বিষয়ে আসক্তি থাকলে চলবে না। যদি থাকে, তা হলে ঈশ্বরানুরাগ অসম্ভব।

'ভক্ত্যা যুক্তঃ'—ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হতে হবে। 'ভজ্' ধাতু মানে সেবা। যাঁর সেবা করছি, যা করলে তিনি খুশি হবেন। যিনি তৃষ্ণার্ত, তিনি জল পেলে খুশি হবেন। তাঁকে জল দিলে তাঁর সেবা করা হল। ভগবৎ-সেবা নিষ্কাম সেবা। আমি সেবার বিনিময়ে কিছুই চাই না। আমি সেবা করেই কৃতার্থ।

প্রকৃত ভক্ত কে ? যিনি সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখেন, মোহমুক্ত এবং স্বার্থ-বুদ্ধিহীন।

'যোগবলেন ভ্রুবঃ প্রাণম্ আবেশ্য'—যোগশক্তির দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করতে হবে। প্রাণায়াম দ্বারা ক্রমশ প্রাণবায়ুকে স্থির করে মনকে আজ্ঞাচক্রে পরমাত্মার চিন্তায় স্থির করা। যোগ মানে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। অর্থাৎ মন সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত। শুদ্ধ মন। তিন প্রকারের সংস্কার—সত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সমস্ত সংস্কার থেকে মন মুক্ত হলে ঈশ্বর লাভ হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হয়। এই মিলনের নাম যোগ।

কী উপায়ে এই মিলন ঘটানো যায়? সারা জীবন যারা যোগের অভ্যাস করেছে, মৃত্যুকালে তাদের এই মিলন ঘটে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে মনকে স্থির রেখে পরমাত্মাতে নিমজ্জিত হওয়া। হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয় জীবনে দেবত্ব বা আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ করা। স্বার্থভাব অর্থাৎ ক্ষুদ্র অহংভাবকে ত্যাগ করে বৃহত্তর আমিতে রূপান্তরিত করা। এই হল আধ্যাত্মিকতার প্রসার ও প্রকৃত অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা। আত্ম-সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে সকলের সঙ্গে আমি মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, কারণ সকলের মধ্যেই তো সেই এক আত্মাই বিরাজ করছেন। এই অনুভব হল আধ্যাত্মিক। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে এই অনুভব করতে হবে। যিনি বাড়িতে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকেন, তিনি যদি মনে রাখেন যে, তাঁর ভিতরেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন, তাহলে তিনিও গভীরভাবে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠতে পারেন।

এইভাবে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে, অবশেষে একদিন যখন মৃত্যু আসবে তখন আমাদের মন সহজেই অনন্ত ব্রহ্মে স্থির হয়ে যাবে এবং শরীরত্যাগের সময় আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের একত্ব উপলব্ধি করব।

মানুষ জীবনে তিনটি শক্তি উপলব্ধি করেন। এক 'বাহুবলম্' অর্থাৎ দৈহিক শক্তি। দুই 'বুদ্ধিবলম্' অর্থাৎ শক্তি চিন্তা, বুদ্ধির ও বিচার রূপে প্রকাশিত হয়। তিন 'আত্মবলম্'

অর্থাৎ আত্মশক্তি বা অধ্যাত্ম স্বরূপের অনুভূতি, এটি আত্মজ্ঞান থেকে হয়। এই অনুভূতি বা জ্ঞানই অনন্ত শক্তির উৎস। তাই শৈশব থেকে আমাদের জীবনে দৈহিক ও মানসিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। শৈশব থেকে এই আধ্যাত্মিক শক্তি আয়ত্ত করার অভ্যাস করলে মৃত্যুকালে তা আমাকে স্বরূপের চিন্তায় নিমজ্জিত করবে এবং সেই পরম পুরুষ বা অবিনাশী সত্য ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ সহজ হবে।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ।। ১১

অন্বয়: বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ অক্ষরং বদন্তি (যাঁকে অক্ষর পুরুষ বলেন) বীতরাগাঃ (অনাসক্ত) যতয়ঃ (যতিগণ, সন্ন্যাসীগণ) যৎ বিশন্তি (যাতে প্রবেশ করেন) যৎ ইচ্ছন্তঃ (যাঁকে পাবার জন্য) ব্রহ্মচর্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য পালন করেন) তৎ পদং (সেই পরমপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলছি)।

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁকে অক্ষর পুরুষ বলে পুজো করেন, অনাসক্ত যোগীগণ যাঁতে সমাহিত হন, যাঁকে পাবার জন্য ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য পালন ও কঠোর তপস্যা করেন, সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি।

যাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁরা ঈশ্বরকে 'অক্ষর' পুরুষ বলে জানেন। 'অক্ষর' কথার অর্থ যার ক্ষয় নেই। ঈশ্বরের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তিনিই অক্ষর, অনাদি ও অনন্ত। পণ্ডিতেরা তাঁর স্বরূপ জানেন। তাই তাঁরা তাঁকে 'অক্ষর' বলেন। যাঁরা যোগী, তাঁরা ঈশ্বরের মধ্যে লীন হয়ে যেতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বরের সত্তাতেই তাঁদের সত্তা, তাঁদের আলাদা সত্তা নেই। তাঁরা সর্বদা স্থির, নির্বিকার, কূটস্থ। তাঁরা সর্বদা 'ব্রহ্মচর্য' পালন করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপ তাঁদের স্বরূপ। ব্রহ্মের সাথে একাত্ম হওয়াই তাঁদের জীবনের লক্ষ্য। তাঁদের রাগ দ্বেষ নেই। সমভাব সকলের প্রতি। অবিচল চিত্ত। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মের সাথে অভেদ।

এই মন্ত্রটি কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রের অনুরূপ। সেখানে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন—যাবতীয় বেদ যে পদের ঘোষণা করে, সকল প্রকার তপস্যা যাঁর জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁকে পাবার জন্য সাধকগণ ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করেন আমি সংক্ষেপে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বা পদ তোমাকে বলছি—সেই পদ হল 'ওঁ'। এই ওঁ হল ব্রহ্মের সর্বোত্তম প্রতীক। যা একই সঙ্গে নির্গুণও বটে আবার সগুণও বটে। এই শব্দটি সেই পরম সত্যের প্রতীকমাত্র। সমগ্র শাস্ত্র এই ওঁ শব্দটিকে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ নাম ও প্রতীক হিসাবে ব্যবহার

করে। একেই বলা হয় শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মের সাধনা দ্বারা পরব্রহ্মের উপলব্ধি করা যায়।

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ।। ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ।। ১৩

অন্বয়: সর্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (সংযত করে) মনঃ চ (ও মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিবদ্ধ করে) আত্মানঃ (নিজের) প্রাণম্ (প্রাণকে) মূর্ধ্নি (ভ্রূযুগলের মধ্যে) আধায় (ধারণ করে) যোগধারণাম্ (আত্মসমাধিরূপ যোগে) আস্থিতঃ (স্থিত হয়ে) ওম্ ইতি ('ওম্' এই) এক-অক্ষরং (একাক্ষর) ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম) ব্যাহরন্ (উচ্চারণপূর্বক) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (স্মরণ করতে করতে) দেহম্ (দেহকে) ত্যজন্ (ত্যাগ করে) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন, প্রস্থান করেন) সঃ (তিনি) পরমাং (পরম) গতিম্ (গতি) যাতি (প্রাপ্ত হন)।

সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ করে, আত্মসমাধিরূপ যোগে স্থিত হয়ে 'ওম্' এই ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

দেহত্যাগকালে অক্ষর ব্রহ্মের প্রতীক ওঙ্কার উচ্চারণ করে কী ভাবে পরমপদ লাভ করা যায় তাই ভগবান অর্জুনকে বুঝিয়ে বলছেন। এই জীবনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়। তবে এক কথায় সংযম অভ্যাস করতে হবে। 'সর্বদ্বারাণি সংযম্য'—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়দ্বার। এই ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে আমরা রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করে থাকি। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হলে অর্থাৎ বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হলে চিত্ত আপনিই শান্ত হয়। তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে অন্তঃকরণ জিতেন্দ্রিয় হতে হবে। আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় হচ্ছে মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার। ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হচ্ছে—একটা ঘরে যেমন দরজা ও জানালা থাকে তেমনই এই ইন্দ্রিয়গুলি। দরজা জানালাগুলি বন্ধ থাকলে বাইরের জগতের সঙ্গে যেমন কোন আদান-প্রদান থাকে না, এও তাই। ভাবটা যেন আমি আমার মধ্যে ডুবে আছি। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। একে বলে মনকে 'নিরুদ্ধ' করা। আদর্শ মৃত্যু কীভাবে হয়? প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে অবরুদ্ধ করতে হবে। 'মনঃ হৃদি নিরুধ্য'—মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করা, 'মূর্ধি আধায় প্রাণম্'—প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করতে হবে। 'আস্থিতো যোগধারণাম্'—এই অবস্থায় তুমি যোগে স্থিত হয়েছ। এই অবস্থায় মনের সমস্ত শক্তিকে তুমি সম্পূর্ণভাবে সংহত করতে পেরেছ। ক্রমে

প্রাণ সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হয়। যোগশাস্ত্র অনুসারে আমাদের দেহের মেরুদণ্ডে সাতটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপদ্ম, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার।

'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন'—এই অবস্থায় নিজের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে একাক্ষর ব্রহ্ম 'ওঁ' উচ্চারণ করতে করতে, 'মাম অনুস্মরন্'—এবং সেই সঙ্গে পরমেশ্বরের অনুধ্যানে মগ্ন হয়।—এইভাবে যার মৃত্যু হয়, সে ভাগ্যবান। সে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরে বিলীন হয়। 'যঃ প্রয়াতি ত্যাজন্ দেহম্'—যিনি এইভাবে দেহত্যাগ করেন, 'স যাতি পরমাং গতিম্'—তিনি পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। যোগী এইভাবে যোগারূঢ় হয়ে দেহত্যাগ করে পরমগতি লাভ করেন। সুতরাং প্রশান্তচিত্তে দেহত্যাগ করার সামর্থ্য আমাদের সারা জীবন ধরে অর্জন করতে হয়। তার ফলে শেষ সময়ে আমরা একমনে ব্রহ্ম চিন্তা করতে পারি। একে দেবযানমার্গে গমন বলে।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ।। ১৪

পার্থ (হে পার্থ) অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্ত হয়ে একাগ্রমনে) (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন, যাবজ্জীবন) সততং (নিরন্তর) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (নিত্যযুক্ত, নিত্যসমাহিত) যোগিনঃ (যোগীর) অহং (আমি) সুলভঃ (সহজলভ্য)।

হে পার্থ, যিনি অনন্যচিত্তে সারা জীবন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যসমাহিতচিত্ত যোগীর নিকট আমি সহজলভ্য। অর্থাৎ তিনি অনায়াসে আমাকে লাভ করতে পারেন।

কী উপায়ে সহজে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়? ভগবান বলছেন, সারা জীবনব্যাপী ভগবানকে স্মরণ এবং ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করা। সারাজীবনে এই স্মরণে অভ্যস্ত না থাকলে কেউ মৃত্যুকালে ভগবানে চিত্ত সমাহিত করতে পারে না। 'অনন্যচেতাঃ সততং যে মাং স্মরতি'—যে সাধক অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট না করে মদ্গতচিত্ত হয়ে যাবজ্জীবন আমাকে স্মরণ করেন, সর্বদা আমার সহিত যুক্ত থাকেন, এরূপ নিত্যযুক্ত যোগী সহজেই আমাকে লাভ করেন। দীর্ঘ, অবিরাম অভ্যাসের ফলে এইরকম মানুষের সমগ্র জীবনটিই একটি নিরবচ্ছিন্ন যোগসাধনা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যেমন ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করেন, ভগবানও তাঁর নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

ভগবানকে পেতে গেলে ডাকতে হয়, কাঁদতে হয়। এমন কি পাগল হতে হয়। তাঁকে স্মরণ করব—'তৈলধারাবৎ'। এক মুহূর্তের জন্যেও থামব না। চোখ তাঁকে

দেখবার জন্যে, মুখ তাঁর গুণগান করার জন্যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর সেবার জন্যে। তিনি ছাড়া জীবন বৃথা, সব বৃথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তিন টান এক কর। মায়ের সন্তানের জন্যে যে টান, সতী নারীর স্বামীর জন্যে যে টান, আর কৃপণের ধনের জন্যে যে টান—এই তিন টান এক করতে হবে। তিনি ছাড়া সব শূন্য। জীবনের কী সার্থকতা তাঁকে ছাড়া? ব্যাকুলতাই ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়। ভক্তের কান্নায় ভগবান বাধ্য হন তার কাছে আসতে।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ।। ১৫

মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হয়ে) দুঃখ-আলয়ম্ (দুঃখের আলয়রূপ) অশাশ্বতং চ (এবং অনিত্য) পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না) (কারণ তাঁরা) পরমাং (পরম) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধিরূপ মোক্ষ) গতাঃ (প্রাপ্ত হয়েছেন)।

বিশুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষগণ আমাকে লাভ করে দুঃখের আলয় এই অনিত্য সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। কারণ তাঁরা আমার স্বরূপ-প্রাপ্তিরূপ পরম মোক্ষ লাভ করেছেন।

ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে সমস্ত মন ঈশ্বরের পায়ে ঢেলে দিতে হবে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু মনে স্থান পাবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'টাকার জন্যে মানুষ ঘটি ঘটি কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল কয় জন ফেলে?' যাঁরা ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়, তাঁদের অনুকরণ করতে হয়। সংসার বড় বিপজ্জনক জায়গা। কত প্রলোভন, কত বাধা-বিঘ্ন। যাদের খুব মনের জোর, তারাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। ভগবানকে লাভ করলে, ভগবানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হলে মৃত্যুর পর সাধককে আর এই সংসারে ফিরে আসতে হয় না। কারণ মানবজীবনের যে পরমলক্ষ্য সেই ভগবান লাভই তিনি করেন।

দুঃখালয়ম্—মানবজন্ম বিবিধ দুঃখের আকর। পৃথিবীতে জন্মলাভের পর মৃত্যু পর্যন্ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। শোকদুঃখ, জরাব্যাধি লেগেই রয়েছে। আমরা যাকে সুখ বলি তা দুঃখেরই নামান্তর। এই সংসার সর্বতোভাবে দুঃখেরই আলয়।

অশাশ্বতম্—মানুষের জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এই আছে এই নেই। কখন কার মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারে না। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে স্থায়ী সুখের আশা বৃথা। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু অতি কষ্টপ্রদ। তাই পুনঃপুন জন্মমৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তিলাভই জীবের পরম পুরুষার্থ। তাই ভগবান নিশ্চিতভাবে বলছেন, হে জীব, কেবল আমাকে লাভ করলে, আমার শরণাগত হলে তোমার এই দুঃখ মোচন সম্ভব। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—জীবনের উদ্দেশ্য সুখ বা দুঃখ নয়। জীবনের লক্ষ্য সুখদুঃখকে অতিক্রম করে অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভ করা। সদসৎ বিচার করলে, ঐ বিষয় নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করলে, তবেই জ্ঞান লাভ হয় এবং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রায়শই সুখ অপেক্ষা দুঃখ থেকেই বেশি জ্ঞান লাভ করা যায়। এইভাবেই আমরা সুখদুঃখের পারে চলে যাই।

মানুষের মন একবার উচ্চতর লক্ষ্যে স্থির হলে সে সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে অনন্ত আত্মাকে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে, তখন সে সুখদুঃখাদি সকল দ্বন্দ্বের অতীত। বেদান্ত তাই বলেন, জীবন যেরকম, তাকে সেভাবেই গ্রহণ কর। জীবন সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ। দুটি থেকেই জ্ঞান আহরণ কর। সুখদুঃখের মুহূর্তগুলিকে জ্ঞান ও করুণা জাগ্রত করার চেষ্টায় ব্যয় কর। সেইটিই হবে মানব ব্যক্তিত্বের যথার্থ আধ্যাত্মিক বিস্তার।

যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁরা সুখদুঃখের অতীত হয়ে অবস্থান করেন। তাঁরাই প্রকৃত মহাত্মা। তাঁদের আত্মার ব্যাপ্তি শরীরের সীমা ছাড়িয়ে, সম্প্রসারিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাত্মতা অনুভব করেন অর্থাৎ সর্বব্যাপী, অনন্ত অনুভব করেন। তিনি এই জন্মেই পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।। ১৬

অন্বয়: অর্জুন (হে অর্জুন) আব্রহ্মভুবনাৎ (পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) লোকাঃ (জীবসকল) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবর্তনশীল, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (লাভ করে) পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (হয় না)।

হে অর্জুন, পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোক থেকেই জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

কেন জীব বার বার জন্মগ্রহণ করে? শুধু জন্মগ্রহণ করে না, নানা রকমের রূপ ধারণ করে। আবার কত রকমের সুখ-দুঃখও ভোগ করে। বার বার জন্মায়, আর বার বার মরে। কর্মফল অনুসারে জীব-জন্তু, পোকা-মাকড়, আবার দেবতা হয়েও জন্মাতে পারে। কিন্তু সবই সাময়িক। কে কী হয়ে জন্মাবে তা কেউ বলতে পারে না। দেবতা হয়ে জন্মালেও দেবতা চিরকাল থাকবে না। আবার যেখান থেকে আরম্ভ করেছিল, সেখানেই ফিরে যাবে। তাই শাস্ত্র বলে, জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তি হলে আর জন্ম হবে না। জন্ম হয় কেন? ভোগের বাসনার জন্যে মানুষ বার বার জন্মায়। জন্মায়, নানারকমের কাজ করে এবং কাজের ফল—ভালো বা মন্দ—ভোগ করে। ভোগ শেষ হলে অনুতপ্ত

হয়, মুক্তির সন্ধান করে এবং বিবেক-বৈরাগ্যের সহায়ে গুরুর কৃপায় স্বরূপ দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করে। সে জানে সে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। সে আত্মা, তার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। জীবনের উদ্দেশ্য—এই আত্মজ্ঞান লাভ করা।

ব্রহ্মলোক পরলোকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান। এই জন্যে ব্রহ্মোপাসনা অথবা যোগবলে দেহত্যাগ প্রভৃতি উপায়ে যাঁরা ব্রহ্মলোক অবধি গমন করেন তাঁদেরও ভোগের শেষে সংসারে ফিরে আসতে হয়। এখানে সকলের মুক্তি হয় না। তাঁদের সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। কেবল যাঁরা একমাত্র ভগবানকে চিন্তা করে ব্রহ্মলোকে গমন ও সম্যক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম, তাঁরা মুক্তিলাভে সমর্থ হন। তাঁদের আর এ-সংসারে ফিরে আসতে হয় না। এর নাম ক্রমমুক্তি। ঈশ্বর যখন বিশ্বকে প্রকাশ করেন, তখন ক্রমবিকাশের প্রথম প্রকাশ হল বিরাট মন ব্রহ্মা। তিনিই চতুর্মুখ ব্রহ্মা। পরমায়ু শেষে তিনিও ঈশ্বরে লীন হন। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে প্রকাশিত সত্তা ব্রহ্মা থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সমস্তই জন্মমৃত্যুর অধীন।

তাই ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, ব্যক্ত জগতের অতীত সেই অক্ষর, অবিনশ্বর ব্রহ্মকে লাভ করলে তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না। ভগবদ্ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান সাধনা। একমাত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হলেই সাধক জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করেন। অন্য সকলকে সংসারে বারংবার যাতায়াত করতে হয়। এই মুক্তি এই জীবনেই লাভ করা যায়। এর নাম জীবন্মুক্তি। যিনি অনন্যমনা নিত্যযুক্ত হয়ে ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি ভগবানকে সহজেই লাভ করে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। সর্বোচ্চ মুক্তি হল আধ্যাত্মিক মুক্তি।

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ।। ১৭

অন্বয় : সহস্র-যুগ-পর্যন্তং (সহস্র-চতুর্যুগব্যাপী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ (যে) অহঃ (দিন) যুগ-সহস্র-অন্তাং (সহস্র যুগব্যাপী) রাত্রিং (রাত্রি) যে (যাঁরা) বিদুঃ (জানেন) তে (সেই) জনাঃ (যোগীগণই) অহঃ-রাত্র-বিদঃ (দিবা ও রাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব জানেন)।

(মানুষের গণনায়) সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক দিন এবং সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার এক রাত্রি, এই তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরাই দিন ও রাত্রির প্রকৃত কালের তত্ত্ব জানেন।

ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রি কী তা একমাত্র যোগীরাই জানেন। তাঁদের মতে ব্রহ্মার দিন মানে চতুর্যুগসহস্র দিন, আর রাত্রি মানে চতুর্যুগসহস্র রাত্রি। অর্থাৎ চার সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন (বার ঘণ্টা) হয়। ব্রহ্মার রাত্রিও সমপরিমাণ। এইরূপ গণনায় ব্রহ্মার আয়ু ৩৬০ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর হয় এবং এরূপ এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। চার যুগ বলতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারযুগ বোঝায়।

কালের এই পরিমাপ একমাত্র যোগীরাই বোঝেন। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মার এই দিবারাত্রির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন। তিনিই প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ। অপর যে ব্যক্তিরা অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদগণ চন্দ্রসূর্যের গতি নির্ণয় দ্বারা সময়ের পরিমাপ করেন তাঁরা অল্পদর্শী, অহোরাত্রবিৎ নন।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ।।১৮

অহঃ (ব্রহ্মার দিন) আগমে (সমাগত হলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত থেকে) সর্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ব্যক্ত পদার্থ, চরাচর ভূতসকল) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়) রাত্রি (ব্রহ্মার রাত্রি) অগমে (আগত হলে) তত্র (সেই) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব (অব্যক্ত নামক মূল কারণে) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়)।

ব্রহ্মার দিন আগত হলে অর্থাৎ ব্রহ্মার জাগরণকালে অব্যক্ত কারণ (প্রকৃতি) থেকে সকল পদার্থ উদ্ভূত ব্যক্ত হয়। আবার ব্রহ্মার রাত্রি-সমাগমে অর্থাৎ ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থায় সেই অব্যক্ত নামক মূল কারণেই সব জীবজগৎ লীন হয়।

ব্রহ্মার সুষুপ্তি অবস্থার নাম—অব্যক্ত; তিনি যখন জাগ্রত তখন তিনি ব্যক্ত। তিনি যখন জাগ্রত, তখন তাঁর চেতনা শক্তি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ তখন আমরা এই জগৎকে দেখতে পাই বা কাজে লাগাতে পারি। ব্রহ্মা যখন সুষুপ্তি অবস্থায় যাবেন, তখন সব কিছু কারণরূপে বিলীন হবে। আর জগৎ দেখতে পাব না, কাজেও লাগাতে পারব না।

ব্রহ্মার একটি দিনকে বলা হয় কল্প। রাত আর একটি কল্প। আমাদের পার্থিব হিসাবে গণনা করলে ব্রহ্মার একটি কল্প দাঁড়াবে ৪৩২ কোটি বছর। এটি হল কাল সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা। তাই এই মন্ত্রে ভগবান বলছেন, ব্রহ্মার যখন রাত্রি আসে তখন সমগ্র মহাবিশ্ব ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায়। সময়ের সীমা ব্রহ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মাকে অতিক্রম করলে সময়কেও অতিক্রম করা হয়, সসীম থেকে অসীমে যাওয়া যায়। কাল হল যার মধ্যে ক্রমবিকাশের লীলা সঙ্ঘটিত হচ্ছে, কর্ম ও প্রক্রিয়া চলছে। সময়কেই কাল বলা হয়। আমাদের কাছে কাল ও কালাতীত দুই সত্তা। ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা হচ্ছে প্রকৃতির। ঈশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত কালের প্রভাবে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা থেকে কালাতীত নিত্য অব্যক্ত পরব্রহ্ম কালের ঊর্ধ্বে রয়েছেন—তিনি এক, অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয়, নিত্য সত্য, শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্ম।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ।। ১৯

পার্থ (হে অর্জুন) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (প্রাণিসমূহ, ভূতগণ) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে) রাত্রি-আগমে (রাত্রি সমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়) অহরাগমে (দিন সমাগমে) অবশঃ (স্বীয় কর্মফলের অধীন হয়ে) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়)।

হে পার্থ, সেই প্রাণিগণই (যারা পূর্ব পূর্ব কল্পে ছিল) পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় ব্রহ্মার দিবাসমাগমে নিজ নিজ কর্মফলের অধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

এক কল্প শেষ হলে আর এক কল্প শুরু হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মার ঘুম ভেঙেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জাগ্রত হয়েছে। যা এতদিন অচেতন ছিল, তা এখন জেগেছে। পুরানো যুগ শেষ হয়েছে, নূতন যুগ শুরু হয়েছে। কল্পারম্ভে ব্রহ্মার দিবস উপস্থিত হলেই জীব জগতের প্রকাশ অর্থাৎ সৃষ্টি আরম্ভ হয়, আবার কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি আরম্ভ হলে প্রলয় হয়ে থাকে। এইরূপ বারবার হচ্ছে। সুতরাং মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবকে কল্পে কল্পেই দুঃখভোগ করতে হয়। অব্যক্ত বলতে ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা এবং ব্যক্ত বলতে তাঁর জাগরণ অবস্থা। ব্রহ্মা যখন নিদ্রিত থাকেন ভূতগ্রাম অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। আবার নিদ্রাভঙ্গে যখন জাগরণ হয় তখন জীবগণও ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়। সমুদয় জীবজগৎ এরূপ প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরছে—একবার প্রকাশ, আবার বিলয়, পুনরায় প্রকাশ, পুনরায় বিলয়। সংকোচন ও প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলছে। জীব কর্মফলের অধীন হয়ে প্রকৃতির বশে বারবার জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে জগতে যাতায়াত করে। শ্রীকৃষ্ণ 'অবশঃ' শব্দটি ব্যবহার করছেন অর্থাৎ অসহায়ভাবে, আমাদের মতামত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই। প্রকৃতির অধীন আমরা, নিতান্ত অসহায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'জন্ম ও মৃত্যু কারোর হাত নয়।' 'স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে'—সেই একই ভূতসমূহ জন্মায় এবং নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে লয় হয়ে যায়। ভূতসমূহ অবিরামভাবে ব্যক্ত হতে থাকে এবং কোটি কোটি বছর পর আবার অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায়। 'রাত্র্যাগমে'—ব্রহ্মার রাত্রিকালে, সব কর্মের অবসান। দিনের বেলায় ব্রহ্মা কর্মচঞ্চল থাকেন। সৃষ্টি চলতে থাকে।

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।। ২০

অন্বয়: তু (কিন্তু) তস্মাৎ (সেই) অব্যক্তাৎ (চরাচরের কারণ অবিদ্যারূপ অব্যক্ত থেকে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ (অন্য, স্বতন্ত্র) সনাতনঃ (নিত্য) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) যঃ ভাবঃ (যে বস্তু অর্থাৎ পরব্রহ্ম) সঃ (তিনি) সর্বেষু ভূতেষু (সমস্ত ভূত) নশ্যৎসু (নষ্ট হলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হন না)।

কিন্তু ভূতগ্রামের বীজভূত অবিদ্যারূপ সেই অব্যক্ত-প্রকৃতির অতীত আর এক অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র, ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে অক্ষর-নামক পরব্রহ্ম আছেন, তিনি ব্রহ্মা থেকে স্থাবর জঙ্গমাদি পর্যন্ত যাবতীয় ভূতগ্রাম বিনষ্ট হলেও তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন না।

পরমাত্মার স্বরূপ হল হিরণ্যগর্ভ নামক অব্যক্ত কারণেরও কারণস্বরূপ এবং শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। অভিব্যক্ত চরাচর জগতের কারণস্বরূপ অব্যক্তস্বরূপের নাশ আছে। কিন্তু পরমসত্তার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। উহা সনাতন এবং সমস্ত থেকে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গণ সেই সত্তা-স্বরূপকে ধারণা করতে পারে না, বুদ্ধি, বিচার শক্তি বা তর্ক দ্বারা তাকে কদাপি গ্রহণ করতে পারে না। সত্তার আদি নাই, অন্ত নাই, রূপ, নাম, গুণ বা অবস্থাও নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যার অতীত।।

পরম সত্তা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, চিদ্ঘন বা চিন্মাত্র। চৈতন্যসত্তা অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নয়। ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ। তা মায়িক দিক্‌কালের অতীত, এই জন্য মানুষ বুদ্ধিদ্বারা তাঁকে পৃথকভাবে ধারণা করতে পারে না। তদ্গতভাবে যোগযুক্ত হলে তাঁর চিন্ময় সত্তা প্রকাশিত হয়।

'যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি'—প্রলয়কালে জগতের সব জীব ধ্বংস হলেও যিনি বিনষ্ট হন না। শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্ম নির্বিকার তাঁর কোন পরিবর্তন নাই। সমস্ত ভূত নষ্ট হবার সময়েও তিনি বিনষ্ট হন না। সকল বৈচিত্রের পিছনে সেই পরম এক নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, শাশ্বত সত্তা রয়েছেন। পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে তিনি অপরিবর্তনীয় সত্তারূপে নিত্য বিরাজ করছেন। এই হল ঈশ্বরের শাশ্বত অবিনাশী স্বরূপ। যে ঈশ্বরের মৃত্যু হয়, তিনি ঈশ্বরই নন। সেই এক ব্রহ্ম চিরন্তন আত্মারূপে, আপনার ভিতর, আমার ভিতর রয়েছেন। আপনার ও আমার মধ্যে বিরাজিত শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা এবং বিশ্বের অন্তরালে বিরাজমান শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্ম, অভিন্ন। দুটি স্বরূপত একই বস্তু।

নূতন কল্প ও পুরাতন কল্প এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? সত্তা এক, কিন্তু রূপ বদলায়। পার্থক্য এই রূপের। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কোম্পানীর যুগে যে মুদ্রা চলেছে, ভিক্টোরিয়ার যুগে সে মুদ্রা চলবে না। এও ঠিক তাই । যা পুরাতন কল্পে চলেছে, নূতন কল্পে তা চলবে না। কিন্তু বস্তু এক।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।। ২১

অন্বয়: যঃ (যিনি) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অক্ষরঃ (অবিনাশী) ইতি (এইরূপ) উক্তঃ (কথিত হন) তং (তাঁকেই) পরমাং (শ্রেষ্ঠ) গতিম্ (গতি) আহুঃ (বলে) যং (যাঁকে, যে অক্ষরকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হয়ে) ন নিবর্তন্তে (জীবগণ ফিরে আসে না) তৎ (তা-ই) মম (আমার, বিষ্ণুর) পরমং (শ্রেষ্ঠ) ধাম (ধাম অর্থাৎ স্বরূপ)।

যাঁকে অব্যক্ত, অবিনাশী বলা হয়, যিনি জীবের শ্রেষ্ঠ গতি এবং যাঁকে লাভ করলে

অর্থাৎ জানলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, তিনিই আমার পরম ধাম, অর্থাৎ পরম গতি।

জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কী? ঈশ্বরকে পাওয়াই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তিনি অন্তরাত্মা, স্বয়ংপ্রকাশ, শুদ্ধ চৈতন্য। যা কিছু দেখি, তা তিনি। তিনিই সব হয়েছেন। তিনি বিশেষ এক ব্যক্তি বা বস্তু নন। তিনি তিনিই। তিনিই ভালো, তিনিই মন্দ। তিনি এক, কিন্তু স্বেচ্ছায় বহু হয়েছেন, নিজের মায়াশক্তি দ্বারা। তাঁকে বাদ দিয়ে জীব নেই, কিছুই নেই। তিনি থাকলে সব আছে। তিনিই আমাদের পরম ধাম। তাঁকে পেলে সব পাওয়া হলো। না পেলে কিছুই পাওয়া হল না।

প্রকৃতির অতীত, মায়ার অতীত নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করাই মনুষ্যজীবনের পরম লক্ষ্য। এই স্থান লাভ করলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। তাই প্রকৃতির মধ্যে আমরা অসহায়, মুক্ত নই। জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার মধ্যে ঘুরতে হয়। কিন্তু প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থার উপরেও আর একটি অব্যক্ত অবস্থা আছে যা শাশ্বত, সনাতন, অপরিবর্তনীয় এবং দেশকালের অতীত। ইনিই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম। কোনও বিশেষণের দ্বারা ইহাকে বিশেষিত করা যায় না, মন বা বাক্য দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না। এই অক্ষর ব্রহ্মই জীবের পরম গতি। ইনিই আমার পরমধাম অর্থাৎ পরম গতি। ইহাই আমাদের মুক্তির, চিরনিবৃত্তির স্থান। এ স্থান প্রাপ্ত হলে জীবকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ।। ২২

অন্বয়: পার্থ (হে পার্থ) ভূতানি (ভূতসকল) যস্য (যাঁর) অন্তঃস্থানি (মধ্যে অবস্থিত) যেন (যাঁর দ্বারা) ইদম্ (এই) সর্বম্ জগৎ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত হয়ে আছে) সঃ (সেই) পরঃ (পরম বা শ্রেষ্ঠ) পুরুষঃ (পুরুষ) তু (কেবল) অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্য ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (লভ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হন)।

হে পার্থ, সমস্ত জীবজগৎ যাঁর মধ্যে অবস্থিত, যাঁর দ্বারা দৃশ্যমান জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই পরমপুরুষকে কেবল অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লাভ করা যায়।

এই পরম সত্তা সগুণ এবং নির্গুণ। এক অর্থে নিরাকার বা নির্গুণ, আবার আর এক অর্থে তিনি সাকার বা সগুণ। সগুণ ঈশ্বর নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করেন, সেই সৃষ্ট বিশ্বকে ধারণ, পালন ও রক্ষা করেন। কিন্তু এই সগুণ ঈশ্বরের পিছনে রয়েছে নির্গুণ, নিরাকার, তুরীয় পরব্রহ্মস্বরূপটি। অতএব 'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ'—হে অর্জুন, ইনিই সেই পরমপুরুষ। ইনিই সকলের মাতা, পিতা ও বন্ধু। আমরা এই পরমপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছি, তাঁতেই বাস করছি, আবার অন্তিমকালে তাঁতেই আশ্রয় নেব।

কীভাবে ঈশ্বর লাভ করা যায়? সংযম অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে এনে অন্তরে ঈশ্বরের পাদপদ্মে স্থাপন করতে হবে। শুধু ঈশ্বর আছেন, আর কেউ নেই। কী ছোট, কী বড়—সব তাঁর মধ্যে, তিনিই সব। তিনি এক বিরাট অশ্বত্থ। সব নিয়ে তিনি। তাঁকে নিয়ে সব পূর্ণ। তিনি সর্বব্যাপী।

ঈশ্বরকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ পথ অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। তাই ভগবান এখানে বলছেন, অনন্যা ভক্তি থাকলে তাঁকে লাভ করা যায়। ভগবান একটু যেন অভিমানী। তিনি চান ভক্ত তাঁকে ছাড়া যেন আর কোন কিছু না ভালবাসে। ভগবান এবং ভোগসুখ, এই দুয়ের উপাসনা ভক্ত একসাথে করতে পারে না। ভগবানকে পেতে হলে আর সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। 'অনন্যা ভক্তি' চাই। অনন্যা ভক্তি অর্থাৎ একমুখী ভক্তি। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাই না—এই ভাব। ভক্ত বলছেন, ভগবান, আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি। কেন তোমাকে নির্বিচারে ভালবাসি? কেউ যদি প্রশ্ন করে তার কোন উত্তর নেই। ভালবাসি, তাই ভালবাসি—কেন ভালবাসি জানি না।

রাগ-সহ, অনুরাগ-সহ অর্থাৎ ভালবাসা-সহ যে তাঁকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁকে পায়। এখানে ভালবাসা মানে অহৈতুকী ভালবাসা। সে-ভালবাসার পিছনে কোন প্রত্যাশা নেই। বিবেকানন্দকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ভালবাসার লক্ষণ কী? স্বামীজী বললেন, নিষ্কাম ভালবাসা। যে ভালবাসার মধ্যে স্বার্থগন্ধ রয়েছে, সে-ভালবাসা নয়। আমাকে অর্থ দাও, মানযশ দাও, স্বাস্থ্য দাও—তাহলে আমি তোমাকে ভালবাসব, আগে দুহাত ভরে তোমার কাছ থেকে নেব, তারপর ভালবাসব—না, তা নয়। তাই স্বামীজী বলছেন, সে তো দোকানদারি। ভালবাসা হচ্ছে নিষ্কাম ভালবাসা, অহৈতুকী ভালবাসা—অন্য ভালবাসা ভালবাসা নয়। আমি যাঁকে ভালবাসি, নির্বিচারে ভালবাসি। সেই ভালবাসার জন্য আমি হয়তো কষ্ট পাচ্ছি তবুও ভালবাসি। ভাল না বেসে আমি পারি না। ভগবান মুখ তুলে চান বা না চান, তিনি কৃপা করুন বা না করুন—তবুও আমি তাঁকে ভাল না বেসে পারি না। এই হচ্ছে নিষ্কাম, অহৈতুকী ভক্তি। এই হল প্রকৃত অনন্যাভক্তি।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ।। ২৩

ভরতর্ষভ (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ) যত্র কালে (যে কালে অর্থাৎ যে মার্গে) প্রয়াতাঃ তু (প্রয়াণ করলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিং (মুক্তি) আবৃত্তিং চ (এবং পুনর্জন্ম) যান্তি এব (প্রাপ্ত হন) তং (সেই) কালং (কালের বিষয়ে) বক্ষ্যামি (তোমাকে বলছি)।

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, (মৃত্যুর পর) যে কালে বা মার্গে গমন করলে যোগিগণ অর্থাৎ উপাসক ও কর্মিগণ মরণান্তে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না এবং যে কালে বা মার্গে গমন করলে পুনর্জন্ম লাভ করেন, সেই বিষয় তোমাকে বলছি।

পরলোকতত্ত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার কী গতি হয়, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন। প্রয়াণকালে শরীর থেকে প্রাণ উৎক্রান্ত হবার সময়ে কোন পথে উপাসকের গতি হলে তাঁর সংসারে পুনরাবর্তন হয় এবং কোন পথে গতি হলে পুনরাবৃত্তি হয় না, ভগবান অর্জুনকে তাই বলতে চাইছেন।

যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেন, তাঁরা মুক্তপুরুষ। তাঁদের আর জন্ম হয় না। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেন না, তাঁদের আবার জন্ম হয়। এঁদের মৃত্যুকালে কার কীরকম মনের অবস্থা হয়, তা একটু জানা দরকার।

আত্মজ্ঞান লাভ হলে মুক্তি। আর জন্ম নেই। এই আত্মজ্ঞান লাভের নাম 'দহর বিদ্যা'। সূক্ষ্মবিদ্যা। এর বিপরীত যে বিদ্যা, তার নাম 'পঞ্চাগ্নি'। অর্থাৎ নানারকমের যাগ-যজ্ঞ, সকাম কর্ম। এতে নানা রকমের লোকপ্রাপ্তি হয়। স্বর্গ লাভও হয়। কিন্তু এ প্রাপ্তি অল্পকালস্থায়ী। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগসুখ হয়। তার পর আবার জন্ম। আবার মৃত্যু। আবার আনাগোনা। কতদিন এই অবস্থা? যতদিন না সমস্ত কর্মক্ষয় হয়, মন বাসনা থেকে মুক্ত হয়। বাসনা থেকে মুক্তির নাম চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি হলো আত্মজ্ঞান লাভ, আমি কে বা কী, তার জ্ঞান লাভ। আমি তখন জানতে পারি যে আমি এই জড় দেহ নই, আমি আমার চিন্ময়সত্তা, আমি অজর অমর নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। এই জ্ঞান হলে আমি ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবে যাব। আমার আর জন্মমৃত্যু থাকবে না।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ।। ২৪

অন্বয়: অগ্নিঃ (অগ্নি) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণের ছয়মাস) তত্র (সেই মার্গে, দেবযানে) প্রয়াতাঃ (প্রয়াণ করে) ব্রহ্মবিদঃ জনা (সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মলোকে) গচ্ছতি (গমন করেন)।

সগুণ ব্রহ্মের উপাসকেরা যেস্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয়মাস স্থিতি করছে, সেই দেবযান মার্গে গমন করে সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত পথ অতিক্রম করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু জীবন্মুক্ত যোগিদের প্রাণ মৃত্যুর পরে কোন লোকে যায় না, ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়।

মৃত্যুর পর মানুষ যে ঊর্ধ্বলোকে গমন করে সেই দুটি মার্গের কথা বলছেন। এদের একটি হল দেবযান বা দেবতাদের পথ। আরেকটি হল পিতৃযান বা পিতৃপুরুষদের পথ। সূর্যের উত্তর গোলার্ধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে গমনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পথদুটিকে যথাক্রমে 'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিণায়ন' বলা হয়েছে। ঋগ্বেদেও পিতৃযান ও দেবযান—এই দুটি পথের উল্লেখ আছে।

মৃত্যুর পর জীব হয় দেবযান, না হয় পিতৃযানে গমন করে। দেবযানে জীব ব্রহ্মলোকে

গমন করে।

তার পুনর্জন্ম নেই। দেবযানের বৈশিষ্ট্য—অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয়মাস। অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল ও উত্তরায়ণ অর্থাৎ যারা দেবযান, এসকল বাইরের কোন বস্তু নয়। জ্ঞানের বিভিন্ন নাম। অগ্নি অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি, জ্যোতি অর্থাৎ আত্মজ্যোতি। অহঃ অর্থাৎ আলো, জ্ঞানের আলো। শুক্ল অর্থাৎ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত মনের শুভ্রতা।

'ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্' অর্থাৎ উত্তরায়ণের ছয়মাস। বিষুব রেখা থেকে যে ছয় মাস সূর্য উত্তরদিকে গমন করেন। এই গমনকে আক্ষরিক অর্থে নিলে ভুল হবে। এই গমন ঊর্ধ্বদিকে অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে। অর্থাৎ এটি মনের ব্যাপার। জ্ঞান লাভ। ক্রমমুক্তি অর্থাৎ ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ। প্রথমে একটু উচ্চলোকে গেলেন, সেখানে কিছুকাল থাকলেন, এরপর আরও একটু উচ্চলোকে গেলেন, সেখানে কিছুকাল থাকলেন, এরপর আরও একটু উচ্চলোকে, তারপর আরও ঊর্ধ্বে—এইভাবে জন্মমৃত্যুর সংসারে ফিরে না এসে ক্রমমুক্তির মাধ্যমে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে ক্রমশ এগিয়ে চললেন। একে উত্তরায়ণ মার্গ বলা হয়।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ।। ২৫

ধূমঃ (ধূম) রাত্রিঃ (রাত্রি) তথা (এবং) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নের ছয়মাস) তত্র (সেই মার্গে, পিতৃযানে) যোগী (কর্মযোগী) চান্দ্রমসং (চন্দ্রের) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) প্রাপ্য (পেয়ে) নিবর্ততে (পুনরায় ফিরে আসেন)।

যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণের ছয়মাস ইত্যাদি স্থিতি করছে, কর্মযোগী সেই পিতৃযান মার্গে গমন করে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে সেখানে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে পুনরায় সংসারে ফিরে আসেন।

আগে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের প্রভাবে মানুষের ঊর্ধ্বগতি হয়, স্বর্গলাভ হয়, মুক্তি হয়। এখানে অজ্ঞানের প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে। এখানে কৃষ্ণপক্ষ, অন্ধকার, দক্ষিণায়ন, অজ্ঞানতা। এখানে ভোগ এবং বন্ধন। মুক্তির বিপরীত। কয়েকটি শব্দের ভাবার্থ : ধূম অর্থাৎ যা অগ্নির স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এখানে ধূম মানে মনের কামনা-বাসনা। এই কামনা-বাসনা অন্তরের জ্ঞানসূর্যকে ঢেকে রাখে। রাত্রি দিনের বিপরীত। দিনের আলোতে সবই উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। রাত্রিতে অন্ধকার সবই আচ্ছন্ন। রাত্রিতে অন্ধকার অর্থাৎ অবিদ্যা, অজ্ঞানতা। কৃষ্ণঃ—মনের মলিনতা। অন্তরে জ্ঞান বিদ্যমান, কিন্তু আচ্ছন্ন। ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্—দক্ষিণায়নের ছয় মাস। উত্তরায়ণে দিন বাড়ে, কিন্তু দক্ষিণায়নে দিন ছোট হয়। ধর্মের প্রভাবে মন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়।

দক্ষিণায়নে মন ছোট হয়, অজ্ঞানতা বাড়ে। চান্দ্রমাসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য—চন্দ্রলোকে যায়। চন্দ্র মনের প্রতীক। মনের অজ্ঞান অবস্থার নাম চন্দ্রলোক।

তাই চন্দ্রলোক পুণ্যভোগের স্থান। যাঁরা সৎকর্ম করে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁরা চন্দ্রলোকে অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করে বাসনাসূত্রযোগে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকেন। এই পুনরাবৃত্তিমার্গের নাম পিতৃযান। পিতৃযান থেকে দেবযান শ্রেষ্ঠ। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুটি পথের কথা শাস্ত্র বলছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও বলছেন। এর পেছনে সত্যটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন। এই সত্যগুলি সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ভাব যার দ্বারা আমাদের একত্ব জ্ঞান প্রকাশিত হয়। একটা জ্ঞান আর একটা অজ্ঞান। নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানের পথে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। সকামকর্মে ও অজ্ঞানের পথে এই সংসারে ভোগসুখ লাভ করা যায়। দুটি পথ আমার সামনে। মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে চালনা করার জন্য শাস্ত্র।

মহাভারতে দেখা যায় দেহত্যাগের জন্য ভীষ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করছেন। কঠিন শরশয্যায় শুয়েও তিনি বলছেন, 'সূর্যের উত্তরয়াণ শুরু হলে তবেই আমি দেহত্যাগ করব।' ভগবান পরে বলবেন যে এই মার্গ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য এই জীবনে অনন্যাভক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর লাভ করা।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ।।২৬

অন্বয়: জগতঃ (জগতের) শুক্ল-কৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়, দেববান ও পিতৃযান) এতে হি (এই দুই) গতী (গতি, মার্গ) শাশ্বতে (সনাতন অনাদি) মতে (কথিত হয়) একয়া (একটির দ্বারা, শুক্লমার্গ দ্বারা) অনাবৃত্তিং (অপুনরাবৃত্তি, মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হন) অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা, কৃষ্ণমার্গ দ্বারা) পুনঃ (আবার) আবর্ততে (প্রত্যাবর্তন করেন)।

শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান—জগতের এই দুই প্রকার মার্গই অনাদি কাল থেকে প্রসিদ্ধ। দেবযানে গতি হলে মুক্তি লাভ হয়, আর পিতৃযানে গতি হলে পুনরায় সংসারে ফিরে আসতে হয়।

পরলোকে আত্মার গমনের দুটি পথ আছে—একটির নাম দেবযান এবং অপরটির নাম পিতৃযান। এই দুটি শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রসম্মত। যাঁরা নিবৃত্তিমার্গের উপাসক জ্ঞানযোগী তাঁরাই দেবযান মার্গে গমন করেন। শাস্ত্র এই পথে গমনের সম্পর্কে বলে—উত্তরায়ণ হতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর হতে আদিত্য, আদিত্য হতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হতে বিদ্যুল্লোক এবং তারপর ব্রহ্মলোক। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গে এই ব্রহ্মলোক সম্পর্কে বর্ণনা করছেন—'একদিন দেখছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্র-সূর্য-

তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করে মন প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হল। ঐ রাজ্যের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরসমূহে মন যতই আরোহণ করতে লাগল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখতে পেলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় মন এসে উপস্থিত হল। সেখানে দেখলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থেকে খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছে। (এই লোককে শাস্ত্র বিদ্যুল্লোক বলে) উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করে মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করল, দেখলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কোন কিছুই আর নেই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করতে শঙ্কিত হয়ে বহুদূরে নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করে রয়েছেন। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম দিব্যজ্যোতিঃ ঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। বুঝলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে এঁরা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। এই লোককে শাস্ত্র ব্রহ্মলোক বলে। এখানে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক এবং নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ এই স্থানে পৌঁছায়। এই সাত ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষিকে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কল্যাণে মর্ত্যে আহ্বান করে এনেছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সকাম অগ্নিহোত্রাদি ও দানযজ্ঞাদি কর্মের পুণ্যফলে কেউ কেউ পিতৃযান মার্গে গমন করে চন্দ্রলোকাদিরূপ স্বর্গলাভ করেন এবং কর্মফল অনুযায়ী কিছু কাল অবস্থান পূর্বক বিবিধ সুখভোগ করে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্ব মন্ত্রে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মলোক থেকে মানুষকে আবার সংসারে ফিরে আসতে হয়। এখানে বলা হচ্ছে দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করে যাঁরা সাধনবলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তাঁরা মুক্ত হয়ে যান। আর যাঁরা সেইরূপ জ্ঞানলাভে অসমর্থ তাঁরা কল্পারম্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই দুটি পথ সকলের সামনে রয়েছে। জ্ঞানের পথ মুক্তির পথ। অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করলে মানুষ মুক্তি লাভ করে, আর জন্ম নিতে হয় না। যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান লাভ করছি, ততক্ষণ মুক্তি নেই, আবার জন্মাতে হবে। আত্মজ্ঞান হলে সংসারকে মিথ্যা বলে জানব, আর সংসারের কোন কিছু আমাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। সংসার মিথ্যা মায়া বলে জানব।

'একয়া যাত্যনাবৃত্তিম্'—শুধু একটা জ্ঞানের দ্বারা সংসারে আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। সেই 'একটা' হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই 'একটি' সত্য যদি জানতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি। এই এক জ্ঞানের দ্বারা সব জ্ঞান লাভ হয়ে গেল। একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের উপাসনায় এই জ্ঞান লাভ হয়। সগুণ ও নির্গুণ পরমেশ্বরের উভয় রূপ।

'অন্যয়া আবর্ততে পুনঃ'—পিতৃযানের দ্বারা কিন্তু বারবার আসতে হয়। ভোগ-বাসনা শেষ হয়নি। সংসারকে মিথ্যা বলে বুঝিনি। তাই বারবার ফিরে আসা।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ।।২৭

পার্থ (হে অর্জুন) এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়কে) জানন্ (জেনে) কশ্চন (কোনও) যোগী (উপাসক বা কর্মী) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না) তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জুন (হে পার্থ) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়ে, সর্বদা) যোগযুক্তঃ (ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, আত্মসমাহিত) ভব (হও)।

হে অর্জুন, (মোক্ষ ও সংসারেরপ্রাপক) এই মার্গদ্বয় সম্বন্ধে জেনে যোগী পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না। অতএব, হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগযুক্ত হও অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত কর।

দৈবযান বা শুক্লমার্গ মুক্তিপ্রদ। পিতৃযান বা কৃষ্ণমার্গ পুনরাবৃত্তির কারণ। দুটি পথ আমাদের সামনে—ত্যাগের পথ, আর ভোগের পথ। শাস্ত্র বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন--'যা মিথ্যা, তাকে ত্যাগ কর, যা সত্য, তাকে ধরে থাক।' শাস্ত্র বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্যম্, জগন্মিথ্যা'। যাঁরা বুদ্ধিমান, বিচারশীল, তাঁরা ব্রহ্মকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। দেহ মিথ্যা। আজ আছে, কাল নেই। তাই যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা নিত্যসত্য ব্রহ্মকে আশ্রয় করে থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই তাঁর স্বরূপ, এই সত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

যে যোগী ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে রয়েছেন, তিনি এই দুই পথের সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হয়ে অজ্ঞানে পতিত হন না অর্থাৎ বারংবার জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। তিনি ভক্তি ও জ্ঞানের পথ অবলম্বন করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য পরমেশ্বরের উপাসনা করেন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—হে অর্জুন, তুমি আমাতে সমাহিত হয়ে থাকতে চেষ্টা কর। তাহলে মৃত্যুর পর তুমি আমাতেই সমাহিত হয়ে থাকবে। তোমার আর সংসারে আসতে হবে না। সে-ই যোগী, যে সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে আছে। আবার সে-ই মুক্ত যে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ বলে জানে।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ।। ২৮

অন্বয়: বেদেষু (সর্ব বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞানুষ্ঠানে) তপঃসু (তপশ্চর্যায়) দানেষু চ (এবং দানকর্মেও) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে) ইদং (এই অর্থাৎ পূর্বের সাতটি প্রশ্নের উত্তরে কথিত) বিদিত্বা (জেনে) যোগী (যোগিপুরুষ) তৎ সর্বং (সেই সমস্ত কর্মফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) এবং আদ্যং (আদি কারণ) পরং (সর্বোৎকৃষ্ট) স্থানম্ চ (বিষ্ণুর পরমপদ, ব্রহ্মপদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)।

বেদাভ্যাসে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, তপশ্চর্যায়, দানাদি কর্মে যে পুণ্যফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগীপুরুষ এই তত্ত্ব জেনে সেই সকল ফলরাশি অতিক্রম করেন এবং আদিকারণ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদ অধ্যয়ন, শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দেশ-কাল-পাত্রবিশেষে শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী দানকর্ম, কৃচ্ছ্রসাধন, তপস্যা ইত্যাদি করে যে ফল লাভ হয় তাও অনিত্য এবং যোগীগণ এ সমস্ত ফল থেকেও মহাফল লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করে সর্বকারণের কারণস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন।

শাস্ত্র অনন্ত। তার বিধি-নিষেধ অনন্ত। মানুষের বাসনাও অনন্ত। কত যাগ-যজ্ঞ আমরা করি। দান-ধ্যানও করি। ক্লান্তি নেই। কিন্তু ঠিকমত যদি এসব অনুষ্ঠান না করতে পারি, তাহলে প্রত্যবায় হবে এবং অপরাধের শাস্তি হবে। কিন্তু এত যাগ-যজ্ঞ করে কী লাভ করছি? শাস্ত্রমতে পুণ্য অর্জন করছি। এ পুণ্যের কী ফল? হয়ত দীর্ঘ জীবন লাভ করব, সন্তান-সন্ততি হবে, আরও কত কী। হয়ত একজন দেব-দেবী হয়ে যাব। কিন্তু এই সুখ ও সম্মান কত দিনের জন্যে? এও অনিত্য। নিতান্ত নির্বোধ না হলে এই হেয় জিনিস পেয়ে কেউ খুশি হতে পারে না। প্রকৃত কাম্য বস্তু—আত্মজ্ঞান। তার জন্যেই ত্যাগ-তপস্যা, কঠোরতা, তিতিক্ষা। যে বুদ্ধিমান, সে পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদকে তুচ্ছ মনে করবে, তার একমাত্র কাম্য বস্তু—আত্মজ্ঞান। এই মনুষ্যশরীরে আমরা সর্বোচ্চ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **অক্ষরব্রহ্মযোগ** নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

গীতার মূল তত্ত্ব হল—'হে অর্জুন, তুমি সর্বদা যোগের পথ অবলম্বন করে থাক।' কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ তার অন্তরে নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে। এখানেই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। বিবেকানন্দ বলছেন—আমরা সবাই দেবতা। মানুষকে পাপী বলাই পাপ। মানুষ পাপ করে না, ভুল করে। মানুষই ভুল করে, মানুষই আবার দেবতা হয়। তবে সেই দেবতা এখন ঘুমিয়ে আছে আমাদের মধ্যে। ঘুম ভাঙাব তাঁর, নিদ্রিত দেবতাকে জাগিয়ে তুলব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সেটাই লক্ষ্য। আমাদের সমস্ত জীবন ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে কর্ম ও সাধন করার অভ্যাস করতে হবে। তবেই মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করতে করতে মানবজীবনে কাঙ্ক্ষিত পরম অনুভূতি লাভ করতে পারে। পরলৌকিক পথগুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে, 'যোগযুক্তো ভবার্জুন'—হে অর্জুন, তুমি যোগী হও এবং আধ্যাত্মিক জীবনযাপন কর। যোগীই সেই পরমকারণ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি অর্থাৎ জীবৎকালেই মুক্তি বলা হয়েছে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোন বন্ধন নেই—তিনি এখানেই এবং এখনই মুক্ত। আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের লক্ষ্য। নিত্য, অপরিবর্তনীয়, সচ্চিদানন্দ পরমসত্য উপলব্ধি করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।'

নবম অধ্যায়

রাজযোগ

রাজযোগ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা। সকল বিদ্যার রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। মানুষের যত প্রকার শিক্ষণীয় বিদ্যা আছে তন্মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ। ভগবান এখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে অতি গূঢ় তত্ত্ব রাজবিদ্যা বলছেন। গুহ্য বা গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যা। অধ্যাত্মবিদ্যা হলো সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুহ্য। আত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। ধ্যান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মানুষের চিত্তের অজ্ঞানতার পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। পরমাত্মার ধ্যানই আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল উপায়। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে আত্মজ্ঞান তত্ত্ব অতীব গুহ্যতম। এই আত্মজ্ঞান পবিত্র হতেও পবিত্রতম।

ঈশ্বরের অচিন্ত্য ঐশ্বর্যতত্ত্ব ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়। পরমাত্মার সত্তায় জগৎ প্রকাশমান বোধ হচ্ছে। তিনি না থাকলেই কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। ঈশ্বর নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে অবশ জীব সকলকে পুনঃপুন সৃজন করেন। ঈশ্বরই সর্বতোব্যাপী। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবই সব, পরমাত্মাই সব, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ—এইরূপ সম্যকজ্ঞান হলেই মুক্তি। মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে আর অন্য কোনও উপায় নেই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ বলছেন, হে অর্জুন! আমার সর্বভূত-মহেশ্বর পরমভাব না জেনে মূঢ়গণ আমার এই মনুষ্যদেহধারী রূপকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু আমি জীবের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃদ এবং আমিই জগতের প্রভাব, প্রলয়, আশ্রয়স্থান, অব্যয় বীজ। হে অর্জুন! আমি তাপ দান করি, আমি জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি, আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং আমি দৃশ্য ও অদৃশ্য চরাচর। আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু।

যারা অনন্যচিত্তে আমার শরণাপন্ন, তাদের যোগ-ক্ষেম আমি বহন করি। ভক্তির সঙ্গে প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল, উপহার আমি গ্রহণ করি। হে কৌন্তেয়, তুমি যা-কিছু করবে, যা-কিছু ভোজন করবে, যা-কিছু হোম করবে, যা দান করবে এবং যে-তপস্যা

করবে—সব কর্ম ও তার ফল আমাকে অর্পণ করো। তার দ্বারা কর্মবন্ধন হতে তুমি মুক্ত হবে। যারা আমার এরূপ ভজনা করে, আমি তাদেরই হৃদয়ে বাস করি। অতি পাপী, বৈশ্য, স্ত্রী, অশিক্ষিত, শূদ্রেরা সকলেই আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি লাভ করে। ....হে অর্জুন! তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী হও, অর্থাৎ মদ্গতচিত্ত হয়ে আমার স্মরণ-মনন কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর—এরূপে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন নিযুক্ত করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ।। ১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন)—অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিবিহীন, অসূয়াশূন্য) তে তু (তোমাকে) ইদং (এই) গুহ্যতমং (অতি গূঢ়) বিজ্ঞান-সহিতং (অনুভূতিসহ) জ্ঞানং (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রবক্ষ্যামি (বলব) যৎ (যা) জ্ঞাত্বা (জেনে) অশুভাৎ (সংসারবন্ধনরূপ অশুভ থেকে) মোক্ষ্যসে (তুমি মুক্ত হবে)।

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন, তুমি দোষদৃষ্টিহীন (আমার বাক্যে তুমি কোনও দোষ দর্শন কর না),তাই অতি গূঢ় উপলব্ধিপ্রসূত এই ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলব। যা জেনে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অপরোক্ষানুভূতিতে তুমি সংসারবন্ধনরূপ অশুভ থেকে মুক্ত হবে।

অর্জুনের মন নিষ্পাপ। রাগ-দ্বেষশূন্য। ভগবানের বাক্যে তিনি কোনও দোষ দর্শন করেন না। 'অনসূয়বে'—তোমার কোনও অসূয়া নেই, তুমি ঈর্ষা থেকে মুক্ত। তুমি মুক্ত-মনের মানুষ। মানুষের মনে যদি অসূয়া অর্থাৎ তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা থাকে, তবে তার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক সত্য প্রবেশ করতে পারে না। যাদের চিত্ত অসূয়াপূর্ণ তারা গীতার শিক্ষা বুঝতে পারবে না। কিন্তু অর্জুন অসূয়া থেকে মুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য আধার। অতএব শ্রীভগবান তাঁকে গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলবেন। এই জ্ঞান লাভ করে অর্জুন দুঃখময় সংসার থেকে মুক্তিলাভ করবেন।

এই গুহ্যতম যোগের বিশেষত্ব কী? 'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্'—এতে রয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের কথা। জ্ঞান ও অনুভূতির কথা। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে চাই অপরোক্ষ অনুভূতি। এই বিদ্যা রাজবিদ্যা অর্থাৎ সকল বিদ্যার রাজা; রাজগুহ্য-অতি গুহ্য, গুরূপদেশ ব্যতীত বোধের অগম্য যা কাল্পনিক নয়, যা অনুভূতিপ্রসূত-সেই বিদ্যা শুধু তপস্যা ও চিত্তশুদ্ধির দ্বারা লভ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান—জ্ঞান অপরের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞান বিশেষ জ্ঞান, যা নিজের অনুভূতিপ্রসূত। যা জেনে আমি অশুভ থেকে মুক্ত হব। মুক্ত বা সমস্ত কলুষ পাপমুক্ত হব। এই অধ্যায়ে ভগবান প্রথম মন্ত্রে তাই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ।। ২

ইদম্ (এই ব্রহ্মবিদ্যা) রাজবিদ্যা (সকল বিদ্যার রাজা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা) রাজ-গুহ্যম্ (অতিগুহ্য, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ ছাড়া বোধগম্য হয় না) উত্তমম্ (উত্তম) পবিত্রম্ (পবিত্র) প্রত্যক্ষ-অবগমং (সাক্ষাৎ ফলপ্রদ) ধর্ম্যং (ধর্মসঙ্গত) কর্তুম্ (অনুষ্ঠান করতে) সু-সুখম্ (সুখসাধ্য) অব্যয়ম্ চ (এবং অক্ষয় ফলপ্রদ)।

এই ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার রাজা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতিগুহ্য, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ ছাড়া এ বিদ্যা বোধগম্য হয় না। এই বিদ্যা উত্তম, পবিত্র, সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, ধর্মসঙ্গত, সহজসাধ্য ও অক্ষয়ফলযুক্ত।

সব জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান দূর হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা হল রাজবিদ্যা অর্থাৎ সকল বিদ্যার রাজা এই বিদ্যা। এই বিদ্যা রাজোচিত গভীরতাসম্পন্ন। গভীর রহস্যময় বা নিগূঢ়। অত্যন্ত গোপন। তাই এটি লাভ করতে হলে গভীরে ডুব দিতে হবে। যেমন মুক্তো পেতে গেলে সমুদ্রে ডুব দিতে হয়। এই বিদ্যা অতি পবিত্র।

হে অর্জুন, তোমার মধ্যে কোনও হিংসা নেই। তুমি চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন। তুমি বিজ্ঞানময় জ্ঞানের উপযুক্ত আধার। তাই তোমাকে এই আত্মজ্ঞান শেখাতে আমি ইচ্ছুক। এই জ্ঞান লাভ করলে সংসার-বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

সংসার-কর্মের মধ্য দিয়েই এই জ্ঞান লাভ করতে হয়। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করেই এই জ্ঞান লাভ করবেন। এই জীবনে তাঁকে এই প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে হবে।

আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রধান হেতু। কিন্তু অজ্ঞানতার জন্য আমি আমার অন্তরে যে শুদ্ধজ্ঞান রয়েছে তা অনুভব করতে পারি না। তাই ধ্যানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে হয়। চিত্তশুদ্ধি লাভ করতে পারলে অবিদ্যা দূর হয়ে যায়। তখন জ্ঞান স্বয়ং প্রকট হয় এবং চিত্তের রাগদ্বেষাদি মলিনতা আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়। এই জ্ঞান সাধককে অধর্ম হতে ত্রাণ করে, পাপ হতে উদ্ধার করে ধর্মের পথে নিয়ে যায়।

এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় স্পষ্ট এবং সহজলভ্য। ধর্ম একটা রহস্য বা জাদু নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন—জীবন, কর্ম ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গিয়ে এ জগতেই এবং এ জন্মেই আমাদের চরম অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করতে হবে। বিশ্বের সব মানুষের কাছে এই অধ্যাত্মবিদ্যার, প্রয়োজন রয়েছে। এই অধ্যাত্মজ্ঞান সহজসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ। ভগবানকে ভালবাসা সহজ ব্যাপার এবং তার ফলও অনন্ত। এই জ্ঞান লাভ করতে কোনপ্রকার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান বা কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন নেই। অনন্যভক্তির দ্বারা ঈশ্বরলাভ সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভালবাসা, অনুরাগ ও ব্যাকুলতার দ্বারা ঈশ্বর সহজলভ্য। এই জ্ঞান অব্যয়, শাশ্বত ও চিরন্তন এবং মোক্ষপ্রদ।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ।। ৩

পরন্তপ (হে অর্জুন, শত্রুতাপন) অস্য (এই) ধর্মস্য (ব্রহ্মবিদ্যারূপ ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পেয়ে) মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যুসঙ্কুল সংসারপথে) নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করে অর্থাৎ গমনাগমন করে)।

হে পরন্তপ, এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা আমাকে লাভ করতে পারে না। ফলে তারা এই মৃত্যুময় সংসারপথে বারবার গমনাগমন করে।

আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বিশেষ ফলপ্রদ। অজ্ঞতার জন্যে মানুষ এই জ্ঞানলাভের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। কেবল তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর করে আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনে প্রতিফলিত করা যায় না। আমাদের মন মলিনতায় পূর্ণ। শাস্ত্রের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই। মনে শুধু দ্বন্দ্ব। এসব মানুষ কখনও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে না। তারা বারবার জন্মায়, বারবার মরে। সংসারচক্রে ঘুরপাক খায়।

যিনি শ্রদ্ধাবান তিনিই জ্ঞানলাভ করতে পারেন। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উভয়ই চায়। দৃশ্যমান জগতের সবকিছুর অতীত এক পরম সত্তা আছেন যিনি জগতের স্রষ্টা, পালক এবং রক্ষাকর্তা। তিনি মানুষের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থিত, তিনিই ঈশ্বর। ঐ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় আসলে তবেই শ্রদ্ধা জন্মায়।

সাধারণ মানুষ মনে করে যে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সব। যা ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, মন-বুদ্ধি দ্বারা যা ধরা যায় না তার অস্তিত্ব নাই—এই অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধার ফলে মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে না। ঈশ্বরলাভ বা ঈশ্বর-উপলব্ধি না করেই আবার সংসারে ফিরে ফিরে আসে। 'মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি'—এই মৃত্যুময় সংসারের পথে বারবার ফিরে আসে।

প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির একটা দিক আছে। সেইটিকে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। 'হিতোপদেশ'-এ বলা হয়েছে 'ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'—জীবন থেকে ধর্মকে বাদ দিলে মানুষ পশুর সমান হয়ে যায়। তাই মানুষের ধর্মই হচ্ছে আত্মস্বরূপের অন্বেষণ করা। ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, এই মহান ধর্মের প্রতি যাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নেই, তারা আমাকে লাভ করতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয় দেহ ও মনের পারে এক উচ্চতর সত্তা আমাদের অন্তরে রয়েছে। সেই পরম সত্তাই হলো ঈশ্বর। ঈশ্বর যে সকলের অন্তরে প্রত্যগাত্মারূপে বিরাজমান—এই তত্ত্ব তারা অনুভব করতে পারে না। 'নিবর্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি'—সেই অজ্ঞান মানুষেরা সংসারে ফিরে ফিরে আসে। এই সংসার মৃত্যুময়, পরিবর্তনশীল এবং বিনাশশীল। অজ্ঞানীদের এই জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তনচক্রে বারবার ঘুরপাক খেতে হয়।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ।। ৪

অব্যক্তমূর্তিনা (অব্যক্তস্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ময়া (আমার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত) জগৎ (দৃশ্যমান জগৎ) ততম্ (পরিব্যাপ্ত) সর্বভূতানি (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) অহং চ (আমি কিন্তু) তেষু (তাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নই)।

আমার অব্যক্তস্বরূপে এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণীসকল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু তৎসমুদয়ে আমি অবস্থান করি না।

আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এ জ্ঞান পবিত্র। তবু মানুষ এই জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না কেন?—কারণ অজ্ঞতা, অবিশ্বাস। শুদ্ধ বুদ্ধি নেই। শাস্ত্র মানে না। ঈশ্বরও মানে না। মৃত্যুর পর নরকগামী হয়। বারবার জন্মায় ও মৃত্যুবরণ করে।

ভগবান তাঁর স্বরূপ, জীব ও জগতের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ তাই বলছেন। বলছেন, তিনিই পরম সত্তা, অব্যক্ত এবং শাশ্বত। জীব তার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরতে পারে না। তাই তিনি অব্যক্তমূর্তি। এই অব্যক্তস্বরূপে ভগবান সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন। এই জগৎ ভগবানের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভগবান জগতের অস্তিত্বের বা স্থিতির উপর নির্ভর করেন না। ভগবান স্বপ্রতিষ্ঠ, অসীম, অক্ষর। কাজেই এই ক্ষর, সসীম জগৎপ্রপঞ্চ অসীম অনন্ত ভগবানের আধার হতে পারে না।

তাই ভগবান বলছেন, আমি অব্যক্ত অথচ সর্বভূতে বিদ্যমান। আমি আছি, তাই তারা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, একের পিঠে শূন্য দিলে দশ হয়, আর একটা শূন্য দিলে একশো হয়। যতই শূন্য দেওয়া যায়, ততই অঙ্ক বাড়ে। কিন্তু এক মুছে ফেললে শুধু শূন্য থাকে। ঈশ্বরের সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই তিনি অব্যক্ত। সব কিছুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে কিন্তু তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি নিত্য। তাঁর সৃষ্টি নেই, বিনাশও নেই। তাঁর উপর নির্ভর করে সবকিছু বিদ্যমান। তিনি স্বয়ম্ভূঃ, স্বপ্রকাশ। মহান ঋষিরা এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, সমগ্র বিশ্ব শুদ্ধ, অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ব্রহ্মই এই বিশ্বের সবকিছুর অন্তরাত্মা। অতএব এই চৈতন্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

জ্ঞানী ব্যক্তিই পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। তিনি জগতে সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি—এসবের ভেদ তাঁর চোখে দূর হয়ে যায়। তাঁর সমদৃষ্টি হয়। এক আত্মাকে তিনি সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করেন। নিজের মধ্যে যে আত্মাকে দেখেন, সেই আত্মাকেই তিনি সবার মধ্যে দেখতে পান। বিশ্বসংসারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তখন তিনি পাপী এবং পুণ্যাত্মার মধ্যে কোনও তফাত করতে পারেন না। তাঁর চিন্তা, দৃষ্টি বা অবস্থানেই জগতের কল্যাণ হয়। তিনি যা-কিছু করেন তাতেই লোকের কল্যাণ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সেই অনন্ত চৈতন্যসত্তার সঙ্গে একীভূত করেছেন এবং জগতের মঙ্গলবিধানের জন্য অবতাররূপে মানবশরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তিনি বলছেন, সবকিছুই আমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই জগতে আমি অব্যক্তমূর্তি ধারণ করে আছি। অব্যক্তমূর্তি বলতে সর্বব্যাপী চৈতন্যকেই বুঝিয়েছেন। চৈতন্য রয়েছে বিচিত্র বৈচিত্রের মূলে ঐক্য রূপে। আমি এই জগতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছি। আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। সকল জীব ও বস্তু আমাতেই অবস্থান করছে। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থান করি না। আমি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সকল জীব আমাতেই অবস্থান করছে, আমাকে ছাড়া তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তারা কেউ আমাকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না বা আবদ্ধ করতে পারে না। এই হলো আমার অসীম স্বরূপ।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।। ৫

ভূতানি চ (ব্রহ্মাদি ভূতসকলও) ন মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত নয়) মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) যোগম্ (যোগ অর্থাৎ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ) পশ্য (দেখ) মম (আমার) আত্মা (আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ) ভূত-ভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূত-ভাবনঃ চ (ও ভূতগণের পালক) তথাপি আমি ভূত-স্থঃ ন (ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত নই)।

তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগ (পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ) দর্শন কর। স্বরূপত ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নয়। আবার আমি ভূতগণের ধারক ও পালক হয়েও ভূতমধ্যে অবস্থিত নই। কারণ স্বরূপত আমি নির্গুণ, নির্বিশেষ।

ঈশ্বর নির্বিকার এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম। সসীম প্রাণী তাঁকে আশ্রয় করে থাকতে পারে, কিন্তু তারা তাঁর স্বরূপে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে না। তিনি তাদের ভিতরে আছেন, আবার বাইরেও আছেন। তিনি সবার আশ্রয়, কিন্তু তিনি কারও আশ্রিত নন। তিনি সকলের উপাদান কারণ। তাঁর সত্তাতেই সবকিছু সত্তাবান। কিন্তু তার মানে এই নয় তিনি খণ্ডিত। তিনি সর্বদা পূর্ণ ও অখণ্ড। কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি, তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি ভূতভৃৎ, কারণ সবাই তাঁর উপর নির্ভর করে আছে। তিনি ভূতভাবন, কারণ তিনি সবার স্রষ্টা। তিনি অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়। স্বরূপত তিনি অদ্বিতীয়।

পূর্বের মন্ত্রে বলা হয়েছে, সমস্ত জীব ভগবানে অবস্থিত। কিন্তু অন্যভাবে তারা ভগবানে অবস্থিত নয়। কারণ স্থিতি বললেই দেশ-কাল-সম্বন্ধ বা স্থান-ব্যাপকতা বোঝায়। কিন্তু ভগবান দেশ-কাল-সম্বন্ধের অতীত, সুতরাং অব্যক্ত চিৎস্বরূপ ভগবানে দেশ-কাল-অবচ্ছিন্ন জড়প্রপঞ্চ স্থিত আছে—একথা বলা যেতে পারে না। ভগবান তাঁর যোগশক্তি অর্থাৎ মায়াশক্তিদ্বারা এই জীবজগৎকে সৃষ্টি করে সবকিছুর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেও

নিত্যমুক্ত। তিনিই সকল জীবের পালন ও পোষণ করেন, কিন্তু তবুও তিনি তাদের কারও মধ্যে বাঁধা পড়ে নেই। ঈশ্বরই একমাত্র সত্তা, যিনি এই বিশ্বের সকল জীবের পোষণ ও পালন করেন। বাস্তবিক সবই ঈশ্বরসত্তা।

তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি স্থূলদৃষ্টি পরিহার করে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখতে চেষ্টা কর। আমি বস্তুত কিছুরই আধার নই ও কোনও বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না। আমার নিত্য একরস-বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দঘন পরমার্থস্বরূপই উপাদান কারণরূপে সমস্ত ভূতকে ধারণ করে রয়েছে এবং পোষণ করছে। তাই আমি ভূতভৃৎ (পালন ও পোষণকারী) এবং ভূতভাবন (কর্তারূপে উৎপাদনকারী)। আমার স্বরূপ অসঙ্গ, অদ্বিতীয় এবং সমস্ত হতে নির্লিপ্ত।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ।। ৬

যথা সর্বত্রগঃ (যেরূপ সর্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহাবায়ু) নিত্যম্ (সদা) আকাশ-স্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত) মৎ-স্থানি (আমাতে স্থিত) ইতি উপধারয় (একথা ধারণা কর)।

সর্বত্র গমনশীল মহান ও বেগবান বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিত থাকে, সেইরূপ সকল ভূত আমাতে অবস্থিত থাকে—একথা জেনো।

আকাশ সূক্ষ্ম। বায়ু সেই আকাশে আধেয়রূপে বিদ্যমান। কিন্তু স্থূল বায়ু ও সূক্ষ্ম আকাশ একসঙ্গে মিশে যায় না কখনও। তেমনই অতিসূক্ষ্ম পরমাত্মা ও স্থূল জগৎপ্রপঞ্চ ভূত কখনও এক হয় না। ভূতসমষ্টি পরমাত্মাতে অবস্থিতি করছে কিন্তু পরমাত্মা সর্বদা নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র।

পৃথিবীর উপর কয়েকশত মাইল পর্যন্ত বায়ুর অস্তিত্ব। মুক্ত মহাকাশে বায়ুর অস্তিত্ব নেই। তাই বায়ু স্থূল নিতান্তই এক পার্থিব প্রপঞ্চ। পৃথিবীতেই বায়ুর অস্তিত্ব। আকাশ সূক্ষ্ম সর্বব্যাপী, সবকিছু ধারণ করে আছে। মহান বায়ু, সদা সর্বত্র বিচরণশীল। মহাব্যাপ্তিসম্পন্ন বায়ুকে আকাশ ধারণ করে আছে। ভগবান ঠিক সেই আকাশের মতো। যেমন বায়ু সর্বত্রগামী, প্রকৃতিতে বিশাল হয়েও তা আকাশে অবস্থান করে, তেমনি সকল জীব ভগবানেই অবস্থিত বলে জানবে। এই সত্য যথাযথভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা কর।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ।। ৭

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) সর্বভূতানি (সমস্ত ভূত) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) মামিকাম্ (আমার) প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াতে) যান্তি (বিলীন হয়) পুনঃ

(পুনরায়) কল্প-আদৌ (কল্পের আরম্ভে, সৃষ্টিকালে) তানি (সেই ভূতসকল) অহম্ (আমি) বিসৃজামি (বিবিধরূপে সৃষ্টি করি)।

হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে (অর্থাৎ কল্পের শেষে) সকল ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে ঐসকলকে পুনরায় আমি বিবিধরূপে সৃষ্টি করি।

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন ভাগে এক-এক কল্প বিভক্ত। যখন একটা কল্প শেষ হয়, তখন কে কোথায় যায়? তখন ঈশ্বরের যে অব্যক্ত প্রকৃতি, তার মধ্যে সব লীন হয়ে যায়। ব্যক্ত প্রকৃতি, এই দৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। নূতন কল্প আরম্ভ হলে আবার তারা প্রকট হয়। তারা কখনও ব্যক্ত, কখনও অব্যক্ত, কিন্তু লুপ্ত নয় কখনও। ব্যক্ত বা অব্যক্ত উভয় অবস্থাই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। এই বারংবার সৃষ্টি ও প্রলয় ঈশ্বরের দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। ঈশ্বরই প্রকৃতির জীবজগতের প্রভু। ঈশ্বরই প্রাণরূপে সব জীবন-মধ্যে বিদ্যমান। ভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁর প্রকৃতি বা মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয়, প্রলয়কালে জগতের সমস্ত পদার্থই সেই মূলকারণস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তখনও স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবান এই কারণরূপ বীজ হতে তত্ত্বসকল সংগ্রহ করে সৃষ্টিকালে পুনরায় আকাশাদি ভূতসকল রচনা করে থাকেন। কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—কোনও অবস্থা বা আচরণ ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না। ঈশ্বর সর্বদাই নির্লিপ্ত।

উপনিষদ এই প্রসঙ্গে একটি মাকড়শার উদাহরণ দিয়েছেন। একটি মাকড়শা তার নিজের ভিতর থেকেই তার জালটিকে টেনে বার করে, বাইরের কোনও কিছু থেকে নয়। আবার জালটি নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। সেইরূপ কল্প শেষ হলে জীবজগৎ ঈশ্বরের প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। একটি কল্প মানে ব্রহ্মার একটি দিন। কল্পের আরম্ভে তারা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম থেকে এই জগৎ এসেছে, ব্রহ্মেই এই জগৎ অবস্থিত এবং এই ব্রহ্মেই আবার জগৎ ফিরে যায়। ব্রহ্মের শক্তিই মহাপ্রকৃতি মহামায়া।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

স্বাম্ (স্বীয়, নিজ) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (বশীভূত করে) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রকৃতির বশে, স্বভাবের অধীনে) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) অবশং (জন্ম ও মৃত্যুর অধীন) ভূতগ্রামম্ (ভূতগণকে) পুনঃ পুনঃ (বারবার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি)।

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করে, প্রকৃতির বশীভূত জন্মমৃত্যুর অধীন অবশ ভূতগণকে পুনঃপুন সৃষ্টি করি।

সৃষ্টি সম্পর্কে ভগবান বলছেন, নিজের প্রকৃতিকে বশীভূত করে, আমি বারবার এই

বিশ্বের ভূতসমষ্টিকে ব্যক্ত করি এবং যথাসময়ে আবার টেনে নিই। এই বিষয়ে জীবজগতের কিছু বলবার নেই। কারণ তারা স্বাধীন নয়। প্রকৃতির প্রভাবে অবশ এবং অসহায়। আমার এই দেহ ধারণ করেছি এবং এই দেহ ত্যাগ করে চলে যাব, কিন্তু আমার কিছু বলার থাকবে না। সামান্য কালের জন্য আমার স্বাধীনতা। একমাত্র মানুষই কিছুটা স্বাধীন, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার বাইরে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অবশ ও অসহায় কারণ প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন সে।

যা কিছু ঘটে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতির সাহায্যে তিনি ঘটান। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ—সব ঈশ্বরের লীলা। এই লীলা প্রকৃতির সহায়ে ঈশ্বর ঘটান। তিনি নিজে নির্লিপ্ত। কিন্তু কেন ঘটান? কী তাঁর প্রয়োজন? প্রয়োজন, জগৎ যে মিথ্যা তা শেখাবার জন্যে। প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু যথাসময়ে প্রকৃতি ব্যক্ত হন এবং ঐ সঙ্গে সমস্ত ভূতও ব্যক্ত হয়। যে জগৎ মুছে গিয়েছিল, তা আবার ফুটে ওঠে। অর্থাৎ নূতন জগৎ সৃষ্টি হয়। এইভাবে জগৎ বারবার বিলীন হয় আবার ফুটে ওঠে। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা নীরব দ্রষ্টামাত্র। এই জগৎ মিথ্যা, মায়িক।

এই অসহায়, নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থা অনুভব করে আমরা যখন তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করি, তখনই আমাদের সত্যিকারের আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। তখন মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বলে—আমি মুক্তি চাই, আমি মুক্ত হতে চাই, প্রকৃতির হাতের খেলার পুতুল হয়ে আমি থাকতে চাই না। জীবজন্তু, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগুলিও প্রকৃতির হাতের পুতুল। কেবল মানুষই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে মুক্ত হতে পারে। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে যেতে পারে। সে বুঝতে পারবে আমি প্রকৃতির হাতের খেলনা নই। তাই মানুষ প্রকৃতির মায়াকে অতিক্রম করে নিজের সৎ-স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে। মায়াতীত যে অনন্ত সত্য, তার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে। বাস্তবিক, সেই অনন্ত সত্যের সঙ্গেই আমাদের প্রকৃত সম্পর্ক, এই মায়াময় জগতের সঙ্গে নয়।

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) তেষু (সেই সকল) কর্মসু (কর্মে) অসক্তম্ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ চ (এবং উদাসীনের ন্যায়, নিস্পৃহবৎ) আসীনম্ (অবস্থিত, বিদ্যমান) মাং (আমাকে) তানি (সেই সকল) কর্মাণি (কর্ম) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করতে পারে না)।

হে ধনঞ্জয়, আমি সৃষ্টিকার্য করি, কিন্তু এই সকল কর্মে আমি অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ অবস্থান করি বলে আমাকে সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না।

ভগবান তাঁর প্রকৃতির যোগে জীবজগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ করছেন কিন্তু এই সৃষ্টিবিনাশরূপ কর্মদ্বারা ভগবান মোটেই আবদ্ধ নন এবং কোনও কার্যের ফল তাঁকে ভোগ করতে হয় না। ভগবান বলছেন, হে ধনঞ্জয়, আমি এই সবই করছি—জগৎকে

অভিব্যক্ত করছি, আবার তাকে নিজের ভিতর টেনে নিচ্ছি। কিন্তু এই সব কর্ম আমাকে বাঁধতে পারে না। কারণ আমি নিত্যমুক্ত, আমি অনাসক্ত। ভগবান তাঁর নিজের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হলে আমরা অনেক বেশি কাজ করতে পারি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে আমরা মুক্ত হয়ে যাব। সাধারণত কর্ম বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে কর্ম আর কর্ম-কর্তাকে বাঁধতে পারবে না। ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে আমাদের বলছেন, আমরাও জীবনে সামান্য একটু চেষ্টা করলে সেই প্রকৃতিকে বিকশিত করতে পারি।

যাদুকর যাদু দেখান, যারা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়। যাদুকর নিজে কিন্তু মুগ্ধ হন না। ভগবান তাঁর মায়া-শক্তি দ্বারা জগতে সৃষ্টি ও ধ্বংস ঘটাচ্ছেন, যার তত্ত্ব বোঝা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা হতভম্ব। এসব কিন্তু ভগবানকে বিচলিত করে না। তিনি মায়াতীত, মায়াধীশ। তিনি উদাসীন। সংসারে কেউ সুখী, কেউ দুঃখী। এই তারতম্য ভগবানের সৃষ্টি নয়। আমাদের কর্মফল দ্বারা ভোগ হয়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।।১০

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) ময়া (আমার) অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠানের দ্বারা) প্রকৃতিঃ (ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) স-চর-অচরম্ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ) সূয়তে (প্রসব করে, সৃষ্টি করে) অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) জগৎ (এই বিশ্ব) বিপরিবর্ততে (পুনঃপুন উৎপন্ন হয়)।

হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। আমি দ্রষ্টারূপে অধিষ্ঠিত আছি বলেই এই জগৎ বারবার পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয়।

মায়ার অপর নাম প্রকৃতি। মায়া বা প্রকৃতি ঈশ্বর থেকে ভিন্ন নয়। ঈশ্বরেরই শক্তি। যেমন অগ্নি, আর তার দাহিকা শক্তি। জীব ও জগৎ ঈশ্বরেরই মহিমা। তাদের কো পৃথক সত্তা নেই। মায়ার প্রভাবে ঈশ্বরের সত্তার উপর জীব-জগৎ আরোপিত। যেমন অন্ধকারে দড়ির উপর সাপের আরোপ। প্রকৃত সাপ নেই, আছে দড়ি। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে করছি। যেমন কোনও ছেলে নানা রকমের মুখোশ পরে বিভিন্ন রকমের জন্তু সাজছে। তার বন্ধুরা দেখে ভয় পাচ্ছে। এক সত্তা, কিন্তু নাম-রূপের বৈচিত্রে বহু। 'একো দেব সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'-–এক আত্মা, বহু নাম-রূপের বৈচিত্রে বহু।

প্রকৃতি দ্বারাই জগতের সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয়, এই প্রকৃতি ভগবানেরই প্রকৃতি, তিনিই প্রকৃতির কাজকর্মের নিয়ন্তা। প্রকৃতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কোনও কর্ম করবার শক্তি নেই। ভগবান প্রকৃতির প্রকাশক, পরিপালক এবং প্রকৃতির কর্মের দ্রষ্টা। ভগবানই প্রকৃতির কর্মের অনুমোদন করেন এবং অবিনাশী সত্তারূপে প্রকৃতিকে ধারণ করে আছেন

বলেই জগতের বিবিধ পরিবর্তন ঘটছে। বেদান্তের ভাষায় ব্রহ্ম ও শক্তি এক, অভেদ। তাঁদের শিব ও শক্তি বলা হয়। এদের একটি ক্রিয়াশীল, অপরটি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তারা এক এবং অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন—সাপ চলছে, সেটি হলো শক্তি এবং সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, সেটি হলো শিব। একই সত্যের দুটি ভিন্ন দিক। নিত্য ও লীলা এক। নিত্য অর্থাৎ শাশ্বত সত্য, লীলা অর্থাৎ প্রকাশিত বিশ্ব। উভয়ই এক এবং অভিন্ন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে বলে—যিনি একাধারে নির্বিশেষ বা নিরাকার এবং বিশেষ বা সাকার, অর্থাৎ নির্গুণ-সগুণ-এর সম্মিলিত সত্তা। ব্রহ্ম এবং শক্তি অর্থাৎ মায়া এক এবং অভিন্ন।

প্রকৃতিই তার নিজের ভিতর থেকে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করে বা ব্যক্ত করে। ঈশ্বর কেবল কর্তা হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকেন। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রকৃতিই এসব কাজ করে, ঈশ্বর করেন না। প্রকৃতির দ্বারা এই জগতের পরিবর্তন ঘটে থাকে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর ও প্রকৃতি দুটি ভিন্ন বস্তু নয়। এক থেকে বহু হচ্ছে, আবার বহু একেই ফিরে যাবে। এই এক এবং বহুর ঐক্যই হলো সেই পরম ব্রহ্মের ঐক্য। অতএব এক অর্থে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, আবার সেই এক ব্রহ্মই বহু। সমস্ত জগৎচক্রের পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে এক অনন্ত পরমাত্মা।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ।। ১১

মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ, অবিবেকী ব্যক্তিগণ) ভূত-মহেশ্বরং (সর্বভূতের মহেশ্বরস্বরূপ) মম (আমার) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ভাবম্ (স্বরূপতত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জেনে) মানুষীং (মানব) তনুম্ (দেহ) আশ্রিতম্ (আশ্রিত) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।

অবিবেকী ব্যক্তিরা সর্বভূতের মহেশ্বরস্বরূপ আমার পারমার্থিক তত্ত্ব না জেনে মানব-দেহধারী বলে আমাকে অবজ্ঞা করে।

যারা মূর্খ, অবিবেকী তারা ঈশ্বরের লীলা কিছুই বুঝতে পারে না। তাঁর কত রূপ কত অভিনয়! তিনিই সব। তিনি ছোট, তিনি বিচিত্র, তিনি বড়, তিনি ভালো। তিনি মানুষের রূপ ধারণ করেন, সে শুধু মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। যেরূপই ধারণ করুন, তিনি যা তা-ই আছেন। তিনি ঈশ্বর, নির্গুণ ও নিরাকার। তিনি রূপ ধারণ করেন শুধু আমাদের শিক্ষার জন্যে। তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে এবং মানুষের মতো আচরণ করে শিক্ষা দেন কীভাবে মানুষরূপ ধারণ করেও ঈশ্বর ঈশ্বরই থাকেন। জীবনের উদ্দেশ্য—আমাদের মধ্যে যে ঐশ্বরিক সত্তা আছে, তাকে প্রকট করা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—ঈশ্বর লাভ করা। ঈশ্বর লাভ করা মানে ঈশ্বর হওয়া।

সেই অনন্ত ব্রহ্ম এক দিব্যরূপ, এক ঐশী ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে আবির্ভূত হন। তাঁকেই

অবতার বলা হয়। তাঁর বাইরের চেহারা বা রূপ দেখে তাঁর অন্তরের গভীরতা ও ঐশীশক্তির পরিমাপ করা যায় না, কারণ তাঁর ভিতরের ঐশ্বর্যের খুব সামান্যই বাইরে প্রকাশিত হয়। তাই ভগবান বলছেন, সাধারণ মানুষ শুধু বাইরের রূপটা দেখে বিভ্রান্ত হয়। বুদ্ধ, যিশু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে এই ধারণা করে সাধারণ মানুষ। তাঁদের বাইরের রূপ অতি সাধারণ।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া'—মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে অবজ্ঞা করে, আমাকে তারা বুঝতে পারে না। 'মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্'—মানবদেহধারী বলে তারা আমার সঙ্গে অন্য সাধারণ মানুষের মতো ব্যবহার করে। 'মম ভাবম্ অজানন্তঃ'—আমার ঐশীশক্তি সম্বন্ধে না জেনে। 'ভূতমহেশ্বরম্'—এই জগতের পরম ঈশ্বর। আমার দিব্য প্রকৃতি তারা ধরতে পারে না। তাই তারা আমার নিন্দা করে, আমাকে অপমান করে।

কিন্তু যাঁরা ঋষি, যাঁরা আধ্যাত্মিক মানসিকতাসম্পন্ন তাঁরা ভুল বোঝেন না। তাঁরা মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁরাই বুঝতে পারেন ঈশ্বরের অবতারকে এবং তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত থাকেন যে, তিনিই সমগ্র বিশ্বের নেপথ্যে অবিনাশী সত্তা।

দক্ষিণেশ্বরে ফুলের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ বেড়াচ্ছেন। একজন ভদ্রলোক এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে বাগানের মালী ভেবে বললেন, 'আমাকে একটা গোলাপ ফুল তুলে দিতে পার?' শ্রীরামকৃষ্ণ সযত্নে একটি ফুল তুলে তাঁর হাতে দিলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ফিরে এসে উপবিষ্ট হলেন। সেখানে ভক্তেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটিও ওই ঘরে ঢুকলেন, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের জন্যই তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাগানের ঐ মালীটিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি খুব বিব্রত হয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়, হায়! এ আমি কী করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মানুষের সেবা করতে পারা তো মস্ত ভাগ্যের কথা। এইভাবে শঙ্করাচার্য সারা ভারত পায়ে হেঁটেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে সারা ভারত হেঁটেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের মহত্ত্ব বুঝতে পারেননি। কিছু ভাগ্যবান লোক তাঁদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণও সেই ঈশ্বরাবতারের কথা বলছেন, যাঁকে চেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে আরও বেশি দুরূহ। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করে ভগবান স্বয়ং নিজ যোগমায়া দ্বারা মানবদেহ ধারণ করে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে সামান্য মানববেশে থাকলেও তিনিই সমস্ত প্রাণীর একমাত্র মহেশ্বর।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ।। ১২

মোঘ-আশাঃ (নিষ্ফলকাম, ব্যর্থ আশাযুক্ত) মোঘ-কর্মাণঃ (বিফলকর্মা) মোঘ-জ্ঞানাঃ (নিষ্ফলজ্ঞানসম্পন্ন) বিচেতসঃ (বিবেকহীন ব্যক্তিগণ) মোহিনীং (মোহকরী, বুদ্ধিভ্রংশকারী) রাক্ষসীম্ (হিংসাপ্রবণ, তামসী) আসুরীং চ (ইন্দ্রিয়ভোগ বিলাসী, রাজসী) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ এব (প্রাপ্ত হয়)।

এইসকল ব্যর্থকাম, নিষ্ফলকর্মা, নিষ্ফলজ্ঞানসম্পন্ন বিবেকহীন ব্যক্তিরা আমাকে অবজ্ঞা করে বুদ্ধিভ্রংশকারী তামসী ও রাজসী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

কোনও কোনও মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর সর্বান্তর্যামী সকলের বন্ধু ও সর্বশক্তিমান। তবু একদল মানুষ কামনা পরিপূর্ণ করার জন্য অপর নানা দেবদেবীর পূজা করাই সব মনে করে। আর একদল লোক যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস করে। আর একদল লোক শাস্ত্রপাঠ করেই তাদের মনস্কাম পূর্ণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধার ধারে না। যথাসময়ে এরা এদের ভুল বুঝতে পারে। ঈশ্বরই মানুষের একমাত্র সহায়। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা তাঁকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধরে থাকেন। তাঁরা ঈশ্বরের উদ্দেশে পূজাপাঠ, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করেন, সেইসব কর্ম তাঁদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়।

যখনই আমরা গর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য এবং স্বার্থপরতার বশীভূত হই, তখন আমরা আসুরী সম্পদের গোলাম বনে যাই। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে। বিবেকহীন, বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকেরা কাম, ক্রোধ ও দর্পবহুল আসুরী এবং রাক্ষসী প্রকৃতির অধিকারী হয়। এরা আশা করে যে, স্বীয় বলবীর্যদ্বারা অপর সকলকে বশীভূত এবং পরাজিত করে জগতে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপনপূর্বক বিবিধ সুখ ভোগ করবে। ঈশ্বরের শক্তিকে তারা বিশ্বাস করতে চায় না। ঈশ্বর যে কর্মফলদাতা তা স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু তাদের এই আশা বৃথা। এইসকল দোষে এইসকল জীব নরকে গমনপূর্বক বহু যাতনা ভোগ করে থাকে।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ।। ১৩

পার্থ (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) দৈবীং প্রকৃতিম্ (সাত্ত্বিক প্রকৃতি) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করে) অনন্য-মনসঃ (অনন্যচিত্ত হয়ে) ভূত-আদিম্ (ভূতগণের কারণ, জগৎকারণ) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জেনে) ভজন্তি (ভজনা করেন)।

কিন্তু হে পার্থ, মহাত্মারা (শম, দম, দয়া, শ্রদ্ধাদি) সাত্ত্বিক স্বভাব আশ্রয় করে আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।

এমন মানুষ অনেক আছেন যাঁরা জন্মজন্মান্তর ধরে ঈশ্বরের আরাধনা করে আসছে। এই আরাধনা বৃথা যায় না। এই আরাধনার ফলে তাঁদের মধ্যে দৈবী ভাব ফুটে ওঠে।

তাঁরা ঈশ্বরচিন্তা করে আনন্দ পান। তাঁদের মন থেকে সমস্ত মলিন চিন্তা মুছে যায়। তাঁরা শাস্ত্রপাঠ করেন, ঈশ্বরের নামগান করেন। ঈশ্বরই তাঁদের সব। ইন্দ্রিয়সুখ তাঁদের কাছে সুখ নয়। তাঁদের সুখ ঈশ্বরচিন্তায়। তাঁরা ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না, আর কিছু চানও না।

এঁরাই দৈবী-প্রকৃতিবিশিষ্ট মহাত্মা। তাঁরা উপলব্ধি করেন, আত্মা অব্যয়, অবিনাশী এবং সর্বভূতের আদিকারণ। আত্মার এই নিত্য, সনাতন, বিশ্বব্যাপী স্বরূপ অবগত হয়ে সেই সত্যবস্তুতেই তাঁরা অনন্যভাবে আসক্ত হন। সেই সত্যবস্তু ছাড়া অন্য কোনও অনিত্য পদার্থই তাঁদের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে না। একমাত্র সদানন্দময় পরমেশ্বরেই তাঁরা প্রীতি লাভ করেন এবং তাঁকেই তাঁরা অনন্যচিত্তে ভজনা করেন। এঁরা জন্মজন্মান্তর ধরে ঈশ্বরসাধনায় জীবন উৎসর্গ করে আসছেন।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ।। ১৪

(ঐ ভক্তগণ) সততং (সর্বদা) মাং (আমার) কীর্তয়ন্তঃ (কীর্তন করেন) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতন্তঃ চ (ও যত্নশীল হয়ে) ভক্ত্যা (ভক্তির সঙ্গে, ভক্তিপূর্বক) নমস্যন্তঃ (প্রণাম করেন) নিত্যযুক্তাঃ চ (সদা সমাহিত হয়ে) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)।

তাঁরা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রত হয়ে ভক্তিপূর্বক সর্বদা আমার কীর্তন এবং বন্দনা করে নিত্য সমাহিতচিত্তে প্রণতি জানিয়ে আমার উপাসনা করেন।

এইসব মহাত্মাগণ 'নিত্যযুক্তা'—তাঁরা সতত ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। সর্বদা ভগবানের নামগুণাদি কীর্তন করেন। ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন করার কী ফল? মনের সব মলিনতা দূর হয়ে যায়। তখন ঈশ্বরচিন্তা, তাঁর ভক্তসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ—এসব ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না। তাঁর নাম যেন অমৃত। তিনি প্রেমময়। তাঁর সবকিছু ভালো লাগে। তাঁর রূপচিন্তা, নামকীর্তন, স্মরণ-মনন সবই অমৃতময়। তাঁর স্বাদ যে একবার পেয়েছে, তার কি আর অন্য কিছু ভালো লাগে?

ভগবানের নামগুণগান অর্থাৎ মন্ত্রাদি উচ্চারণ, ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ, ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত—এই সকল নামকীর্তনের প্রধান উপায়। এঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বর- সাধনায় রত হন এবং সেই উদ্দেশ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শম, দমাদি সত্ত্বগুণ অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করে ঈশ্বরচিন্তায় সর্বদা রত থাকেন। গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠা এবং গুরু ও ইষ্টদেবতারূপে ভগবানকে সর্বদা ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করেন। 'নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে'—তাঁরা সদাসর্বদা ভক্তিযুক্ত হয়ে শ্রবণ, মনন, কীর্তন, প্রণাম প্রভৃতি উপায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সর্বদাই শরণাগত হয়ে ভগবানের চরণে জীবন উৎসর্গ করেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ।। ১৫

অন্যে অপি চ (এবং অন্য কেউ কেউ বা) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা) যজন্তঃ (পুজো করে) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) (কেউ) একত্বেন (অভেদভাবে) (কেউ) পৃথক্ত্বেন (বিষ্ণু-চন্দ্র-ইন্দ্র-বরুণাদি রূপে পৃথকভাবে) (কেউ বা) বিশ্বতোমুখম্ (সর্বাত্মকরূপে) বহুধা (দাস্যাদি বিবিধভাবে) (আমার) উপাসতে (উপাসনা করেন)।

কেউ কেউ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করেন। কেউ অভেদভাবে অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের অভেদ চিন্তা দ্বারা, কেউ ইন্দ্র-বরুণাদি নানা দেবতারূপে পৃথকভাবে, কেউ বা সর্ববস্তুতে অবস্থিত আমাকে সর্বাত্মকরূপে উপাসনা করেন।

এখানে ভগবান নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনিই এই জগতের স্রষ্টা। তিনিই বিধাতা, কারণ তিনিই ভালো-মন্দ সবকিছুর মূলে। তিনি সর্বব্যাপী, আবার সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তিনিই সবকিছুকে ধারণ করে আছেন। তিনি রক্ষাকর্তা, আবার তিনিই ধ্বংসকর্তা। তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে। তাঁকে জানলে সব কিছুকে জানা হয়। ভালো-মন্দ সব তাঁর মায়ার সৃষ্টি। তিনি ভালো, তিনিই মন্দ। তিনি যাদুকর। তাঁর কৃপায় মানুষের চোখ খুলে যায়। মানুষ জানতে পারে—এ জগৎ মিথ্যা কিন্তু ঈশ্বর সত্য।

ভগবানের উপাসনা কীভাবে করা হবে সেই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন, জ্ঞানযোগিগণ বিচার, মনন, ধ্যান প্রভৃতি উপায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকেন। এঁরা বিচার দ্বারা তাঁর স্বরূপের উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। এঁরা অভেদভাবে একত্বের উপাসক। তাঁরা উপলব্ধি করেন, পরমাত্মা এবং মানবদেহে অবস্থিত জীবাত্মা স্বরূপত এক এবং অভেদ। এক পরমাত্মা জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতিরূপে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। তাঁরা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি করে ভগবানের একত্বভাবের উপাসনা করেন। তাঁদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ। জ্ঞানের অনির্বচনীয় আনন্দের দ্বারা এঁরা ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানীগণ উপলব্ধি করেন ঈশ্বর এক হয়েও বহুরূপে প্রকৃতিতে প্রকাশিত, মূলত জীবই ব্রহ্ম। অসংখ্য মূর্তিতেও তাঁরা এক ভগবানকেই দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি বিশ্বতোমুখ'—যে-কোনওভাবেই তুমি আমার ভজনা করতে পার। আমি সর্বত্র বিরাজমান। শেষ পর্যন্ত সব পূজা আমার কাছেই পৌঁছায়।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ।। ১৬

অহং (আমি) ক্রতুঃ (বেদবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) যজ্ঞঃ (পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি স্মৃতিবিহিত যজ্ঞ) অহম্ (আমি) স্বধা (শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ) অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ওষধিজাত অন্ন-ব্রীহি-যবাদি অথবা রোগের ঔষধ) অহম্ (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) অহম্ (আমি)

আজ্যম্ (হোমের হবি বা ঘি) অহম্ এব (আমিই) অগ্নিঃ (হোমাগ্নি) অহম্ (আমি) হুতম্ (হোমক্রিয়া)।

আমি ক্রতু অর্থাৎ বেদবিহিত যজ্ঞ, আমি যজ্ঞ অর্থাৎ স্মৃতিবিহিত যজ্ঞ, আমি স্বধা অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের হবি, আমি অগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তবে তাঁর বহু নাম, বহু রূপ। যার যেমন পছন্দ, সেই নাম ও রূপে তাঁকে আরাধনা করতে পারে। লক্ষ্য তিনি, যদিও ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁকে আমরা পূজা করি। তিনি এক হয়েও বহু হন, ভক্তের খাতিরে। যার যেমন রুচি, তিনি সেইরকম হন।

এখানে যজ্ঞকেই সমস্ত কর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। জ্ঞানিগণ যেমন সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় দেখে থাকেন সেইরূপ প্রত্যেক কর্ম ও তার উপকরণের মধ্যেও তাঁরা ব্রহ্মকেই দেখেন। তাঁরা দেখতে পান যে, শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত সমস্ত যজ্ঞই ব্রহ্ম। যজ্ঞের অগ্নি, অন্ন, মন্ত্র, ঘৃত, হবনক্রিয়া সমস্তই ব্রহ্ম। মানুষ যজ্ঞরূপে যে সব কর্ম করে সেই কর্ম, করণ প্রভৃতি উপাদান সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই।

চতুর্থ অধ্যায়ে ২৪নং মন্ত্রে ভগবান এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।' আহুতি হলো ব্রহ্ম, যিনি আহুতি দেন, তিনিও ব্রহ্ম। অগ্নিও ব্রহ্ম। এই আহুতির যা ফল, সেই ফলও ব্রহ্ম। সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। এইটি যথার্থ সত্য। কিন্তু আমাদের ভেদবুদ্ধিতে এগুলিকে আমরা সব আলাদা দেখি। এগুলি সবই স্বরূপত এক অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যের বহুবিধ প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে অর্জুন, যা কিছু দেখছ, সবকিছুই আমি, সবকিছুই ব্রহ্ম। উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে—'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—এই ব্যক্ত বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম। 'বাসুদেব সর্বম্ ইতি'—এই বিশ্বের সবকিছুই বাসুদেব। এই হলো অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। ব্রহ্ম থেকেই সবকিছু এসেছে। অতএব, সবই স্বরূপত সেই এক। এই হলো একত্বের ধারণা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই শাশ্বত এক থেকে এসেছে, সেই একেই আবার ফিরে যাবে।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ।।১৭

অহম্ এব (আমিই) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (পিতা) মাতা (জননী) ধাতা (বিধাতা, কর্মফলদাতা ঈশ্বর) পিতামহঃ (পিতার পিতা) বেদ্যং (একমাত্র জ্ঞেয়বস্তু) পবিত্রম্ (যা পবিত্র করে অর্থাৎ পাবন) ওঙ্কারঃ (ওঁকার অর্থাৎ প্রণব) ঋক্ (ঋগ্বেদ) সাম (সামবেদ) যজুঃ চ (এবং যজুর্বেদ)।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্মফলদাতা বিধাতা, পিতামহ। আমিই একমাত্র জ্ঞেয় ও পবিত্র বস্তু। আমি ওঁকার, আমিই ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ।

ভগবান জগতের স্রষ্টা। জগৎ কত বৈচিত্র্যময়। এসব তাঁর গড়া। না, শুধু তা নয়, তিনিই এই সব হয়েছেন। কত সুন্দর, আবার কত অসুন্দর—এসব তাঁরই রূপ। তিনি স্রষ্টা, তিনিই সৃষ্টি। তিনি কার্য, তিনিই কারণ। তিনি সবকিছুর ভিতরে, আবার বাইরে। যা-কিছু ব্যক্ত বা যা-কিছু অব্যক্ত, সবই তিনি। তিনি পিতা এবং পিতার পিতা। তিনি সবকিছুর আদি, আবার সবকিছুর অন্ত। জীবনের উদ্দেশ্য ও উপায় তিনি। তাঁকে পাওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তিনি সত্য, আর সব মিথ্যা।

ভগবানই জগতের পিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনিই মাতার ন্যায় আমাদের ক্রোড়ে করে রেখেছেন, আমাদের উপর তাঁর নির্মল প্রেমের ধারা অবিরত বর্ষণ করছেন। তিনিই পিতামহ, জগতের আদি সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্তারও পিতা। তিনিই সমস্ত জ্ঞানের মূল বেদ এবং তিনিই জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই। তিনিই পবিত্র ওঙ্কার—সকল বাক্য ও চিন্তার আদি স্ফুরণ। পরম পবিত্র একাক্ষর 'ওঁ'। তিনিই ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদ। আদিতে আমাদের এই তিনটি বেদই ছিল। পরে এল চতুর্থ বেদ, অর্থাৎ অথর্ববেদ।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ।। ১৮

(আমি) গতিঃ (কর্মফল) ভর্তা (পালন কর্তা) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (প্রাণীদের শুভ-অশুভ দ্রষ্টা) নিবাসঃ (স্থিতি স্থান, আশ্রয়, বাসস্থান) শরণং (রক্ষক) সুহৃৎ (হিতকারী বন্ধু) প্রভবঃ (সৃষ্টিকর্তা) প্রলয়ঃ (প্রলয়কর্তা) স্থানং (আধার) নিধানম্ (লয়স্থান) অব্যয়ম্ (অবিনাশী, অক্ষয়) বীজম্ (কারণ)।

আমি (প্রাণিগণের) পরাগতি ও পালনকর্তা, আমি প্রভু নিয়ন্তা, আমি শুভাশুভ-দ্রষ্টা। আমিই (প্রাণীদের) বাসস্থান, রক্ষক, হিতকারী, স্রষ্টা ও প্রলয়কর্তা। আমিই একমাত্র আধার, আমিই লয়স্থান এবং আমিই অবিনাশী জগৎকারণ।

যো-সো করে ঈশ্বরলাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর লাভ করা মানে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। ঈশ্বর হওয়া। কিন্তু কী করে মানুষ ঈশ্বর হতে পারে? ত্যাগ, তপস্যা, যোগ-সাধনা, বিবেক-বৈরাগ্য, প্রেম-পবিত্রতা প্রভৃতির দ্বারা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরলাভের দ্বারাই এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়।

যেহেতু ভগবানই সকলের পরম আশ্রয়, একমাত্র গন্তব্য স্থান, একমাত্র পথ, তাই তাঁর মধ্য দিয়েই যেতে হবে এবং তাঁতেই পৌঁছে চিরশান্তি লাভ করতে হবে। ভগবানই সকলের প্রভু, তিনি সকলকে পোষণ করেন, তিনিই সকল চিন্তা, সকল কর্মের অন্তর্যামী

সাক্ষী। তিনিই সকল জীবের আবাসস্থল। তিনিই বিপদে আশ্রয়স্থল, তিনিই প্রকৃত কল্যাণকারী বন্ধু। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাঁতেই স্থিত আছে, পরিণামে তাঁতেই বিলীন হবে। ভগবানই বারংবার নিজেকে দেশ-কালে প্রকাশ করছেন, এবং রক্ষা করছেন, আবার সেই লীলাকে নিজের মধ্যে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। একমাত্র তিনিই দ্রষ্টা, নির্বিকার, অপরিবর্তনশীল বীজ—যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে তার মূল। আবার লীলা-অবসানে তিনিই এই সমস্ত বিশ্বের চিরবিশ্রামের স্থল।

গীতার এই মন্ত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণ— পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী অর্থাৎ মহাপুরুষ মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। তিনি শরণাগতি প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটি প্রায় বলতেন। সবসময়ে যদি ঈশ্বরকে সুহৃৎ মনে করি, তখন তিনি একেবারেই আমাদের কাছের মানুষ, অতি আপন হয়ে ওঠেন। ভগবানকে এইরূপে মনে করে তাঁর শ্রীচরণে জীবনকে সমর্পণ করতে হবে। তাই যো-সো করে এই জীবনে ঈশ্বরলাভ করাই উদ্দেশ্য। ঈশ্বরলাভ করা মানে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। ঈশ্বরের গুণে গুণান্বিত হওয়া। ঈশ্বর হওয়া। উপনিষদ বলছেন, 'ব্রহ্মবেদো ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্মই হয়ে যাওয়া।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ।। ১৯

অর্জুন (হে অর্জুন) অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি) অহং (আমি) বর্ষং (জল) নিগৃহ্ণামি (আকর্ষণ করি) উৎসৃজামি চ (বর্ষণকরি) (আমি) অমৃতং (দেবগণের পক্ষে অমৃত) মৃত্যুঃ চ (এবং মর্তবাসীদের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ) সৎ (অবিনাশী অব্যয় আত্মা) অসৎ চ (অনিত্য ব্যক্ত জগৎ)।

হে অর্জুন, আমি সূর্যরূপে উত্তাপ দান করি। আমিই পৃথিবী থেকে জল আকর্ষণ করি, পুনরায় সেই জল বর্ষণ করি। আমি দেবতাদের পক্ষে অমৃত এবং মর্তবাসীর মৃত্যুস্বরূপ (অথবা আমি জীবনের জীবন ও মৃত্যুস্বরূপ)। আমি নিত্য অবিনাশী আত্মা, আবার আমিই অনিত্য জগৎ।

সূর্য তাপ দেন, কিন্তু তিনি কে?—তিনিই ভগবান। ভগবান সর্বশক্তিমান। সকলের আত্মা। তিনি তাপ দেন, আবার জলও দেন। তিনি প্রাণশক্তি, আবার তিনিই মৃত্যুর কারণ। তাঁকেই কেন্দ্র করে সবকিছু ঘটছে। প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া ভগবানের দ্বারাই ঘটছে। তিনিই সূর্য ও অগ্নির ভিতর দিয়ে উত্তাপ দান করছেন। তিনিই সূর্যকিরণ দ্বারা ভূমি হতে জল শোষণ করছেন, মেঘরূপে জলবর্ষণ করছেন। তিনিই মৃত্যু, আবার তিনিই অমৃত। জীবন-হরণের কর্তাও তিনি, আবার জীবনদাতাও তিনি। এই বিশ্বজগতে যে-সকল শক্তি ক্রিয়া করছে সমস্তই তিনি, যা-কিছু আছে তাও তিনি, আবার যা নাই মনে করি, তাও তিনি। হে অর্জুন আমিই এই সব হয়েছি। জীবের আসা ও যাওয়া দুই-ই

আমার থেকে। জীবন ও মৃত্যু দুই-ই এক। আমি সৎ এবং অসৎ দুই-ই। অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন দুই-ই এক। কারণ সবকিছুই এক। জগতের আপাতবৈচিত্র ও বহুত্বের পিছনে যে পরম একত্ব রয়েছে, সেটিই মূল কথা।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ।। ২০

ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদজ্ঞগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করে) সোমপাঃ (সোমরস পান করে) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ হয়ে) স্বর্গতিং (স্বর্গলোক) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন) তে (তাঁরা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্র-লোকম্ (স্বর্গলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হয়ে) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেবভোগান্ (দেবভোগসকল) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)।

ত্রিবেদজ্ঞ ব্যক্তিরা (অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি) নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করেন এবং যজ্ঞশেষে সোমরসপানে নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। পুণ্যফলে তাঁরা পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে উত্তম দেবভোগ্যসমূহ ভোগ করে থাকেন।

ঋক্, যজু ও সাম—এই তিন বেদ বেশি পরিচিত। এই তিন বেদে অনেক যাগ-যজ্ঞের কথা আছে। এই যাগযজ্ঞ কাদের জন্যে? যাদের মনে অনেক বাসনা। সন্তানের কামনা, ধনের কামনা, স্বর্গের কামনা—এই সব বহু রকমের কামনা মানুষের মনে। এই সব কামনা যাতে চরিতার্থ হয়, সেজন্য নানা রকমের যাগযজ্ঞের বিহিত করা আছে বেদে। এই সব যাগযজ্ঞ যথাবিহিত করতে পারলে মানুষ স্বর্গলাভ করে। এই সব যাগযজ্ঞ করা হয় ঈশ্বরের উদ্দেশে, কিন্তু ইন্দ্র বসু আদিত্য রুদ্র প্রভৃতি দেবতাদের মাধ্যমে। যাঁরা এইসব যজ্ঞ করেন, যজ্ঞের অগ্নিতে তাঁরা সোমরস উৎসর্গ করেন। সোমরসের অবশিষ্টাংশ পান করে তাঁরা নিজেদের নিষ্পাপ মনে করেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদের সমান নিজেদের মনে করেন। তাঁরা সব সকাম ভক্ত। স্বর্গসুখ ভোগ করেও তাঁরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই স্বর্গসুখ সীমিতকালের জন্য কিন্তু তারপর আবার সংসারে ফিরে আসতেই হবে।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ।।২১

তে (তাঁরা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোক অর্থাৎ স্বর্গসুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করে) পুণ্যে ক্ষীণে (সেই পুণ্যক্ষয় হলে) মর্ত্যলোকং (মর্তলোকে) বিশন্তি

(প্রবেশ করেন) এবং (এভাবে) ত্রয়ীধর্মং (ত্রিবেদবিহিত ধর্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানকারী) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ) গতাগতং (সংসারে যাতায়াত) লভন্তে (লাভ করেন অর্থাৎ যাতায়াত করে থাকেন)।

তাঁরা অর্থাৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীরা তাঁদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মর্তলোকে প্রবেশ করেন। এইভাবে কামনাপরায়ণ ব্যক্তিরা ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে বারবার সংসারে আসা-যাওয়া করেন।

বেদোক্ত সকাম কর্ম দ্বারা সংসারবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করা যায় না। তাহলে মুক্তির কী উপায়? উপায়—নির্বাসনা হওয়া, যার কথা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বারবার বলতেন, ঈশ্বরের কাছে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। আর যদি আমাকে দেহধারণ করতে হয়, তাহলে তা করব লোককল্যাণের জন্য, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' অথবা ঈশ্বরার্থে। এরূপ কর্মকে স্বামীজী 'পূজা' বলতেন। এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞান লাভ হলে জীবন্মুক্তি, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসমান। স্বর্গসুখ তার কাছে তুচ্ছ।

অতএব ভগবানকে লাভ করতে হলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে হবে। এই উৎসর্গ না হলে তাঁর সঙ্গে নিবিড় যোগ, প্রকৃত মিলন সাধিত হয় না। আমাদের অহমিকাকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে, সমগ্র জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে হবে, প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্য হবে—ভগবানের প্রীতিসাধন ও তাঁর মঙ্গলসাধন। সকাম কর্মের ফল যাই হোক না কেন তা ক্ষণস্থায়ী, তা আমাদের বহির্জগতের ক্ষুধা মেটাতে পারে, হয়তো মৃত্যুর পর আমাদেরকে কোনও এক স্বর্গলোকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা আমাদের আত্মার ক্ষুধা মেটাতে পারে না, আমাদের চির আনন্দ ও শান্তি দিতে পারে না।

বেদের দুটি অংশ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের উপনিষদগুলি জ্ঞানকাণ্ড। এই জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে কীভাবে জ্ঞান অর্থাৎ সত্যকে বোঝা যায়, তার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অসীম সত্যকে জানাই জীবনের উদ্দেশ্য, স্বর্গসুখ অনিত্য, তাই উপনিষদ সেগুলিকে বিশেষ মূল্য দেয়নি। উপনিষদ ও গীতার মূল বক্তব্য—নিজের মধ্যে অনন্ত আত্মাকে উপলব্ধি করে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করুন। 'ইহৈব, ইহৈব'—এই দেহে, এই পৃথিবীতেই আমরা সেই পরম বস্তু উপলব্ধি করতে পারি। তার জন্য এখানে-ওখানে সুখের জন্য ছোটাছুটি করার প্রয়োজন নেই। সেই অনন্ত এবং অবিনাশী আত্মা হলো আমাদের যথার্থ স্বরূপ। সেই স্বরূপকে প্রকাশ করতে হবে এবং নিজের আত্মাকে সকল জীবের মধ্যে দেখতে হবে। মানুষই নিজের দেবত্বকে প্রকাশ করবে। মানুষকে ঈশ্বরমুখী এবং সেইসঙ্গে নিষ্কাম-কর্মযোগী গড়ে তোলাই গীতা ও উপনিষদের মূল উদ্দেশ্য। ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের প্রধান উপাসনা।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ।। ২২

অনন্যাঃ (অনন্যচিত্তে অর্থাৎ আমাকে ছাড়া অন্য চিন্তা না করে) মাং (আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তা করতে করতে) যে (যেসকল) জনাঃ (ব্যক্তিরা) পরি-উপাসতে (ধ্যান করেন) নিত্য-অভিযুক্তানাং তেষাং (আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ব্যক্তিদের) যোগ-ক্ষেমম্ (যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) অহম্ (আমি) বহামি (বহন করি)।

অনন্যচিত্তে নিরন্তর স্মরণ-মনন দ্বারা যেসব ভক্তরা আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তদের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করে থাকি অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনীয় অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ আমিই করে থাকি।

ভগবানের এ এক অসাধারণ প্রতিশ্রুতি। ভগবান বলছেন, ভক্তের 'যোগ' ও 'ক্ষেম' আমি বহন করি। যা তার নেই, তা যোগ করে দিই, আর যা আছে, তাকে রক্ষা করি। 'ভক্তর বোঝা ভগবানে বয়'। চিরকাল একথা সত্য। ভক্ত ভগবানকে শুধু ভালবাসতে চায়। প্রকৃত ভক্ত যারা, তারা ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানে না। ঈশ্বরই তাদের সর্বস্ব। সব সময়েই ঈশ্বরচিন্তা তাদের মনে। ফলে, তারা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। ঈশ্বর এই সব ভক্তদের প্রতি সর্বদা সদয় থাকেন। তাদের যা প্রয়োজন তা জুটিয়ে দেন। একেই বলে—'যোগ'। আবার ভক্তদের যা আছে, তা যাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাও দেখেন। এর নাম—'ক্ষেম'। অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বতোভাবে ভক্তের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভক্ত না চাইলেও তার যা প্রয়োজন ঈশ্বর জুটিয়ে দেন। আবার ভক্তের যত অসম্ভব আবদার ভগবান পূরণ করে দেন।

ঈশ্বরকে ধরে জীবনযাপন, সংসার ও কর্তব্যকর্ম করা। যখন সর্বতোভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হবে, যখন ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হয়ে যাবে, তখন কর্তব্যকর্ম কমে যাবে। তখন ঈশ্বর তার সবকিছু করে দেন। ঈশ্বর যার কাছে সর্বস্ব, তার সমস্ত দায়দায়িত্ব ঈশ্বরই বহন করেন।

তাই ভগবান বলছেন, 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।'— যারা নিত্য আমাতে যুক্ত হয়ে আছে, তাদের 'যোগ' এবং 'ক্ষেম' আমি বহন করি। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হল 'যোগ' আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা হল 'ক্ষেম'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—যা তাদের নেই সেটা আমি যোগ করে দিই, আর যা তাদের আছে সেটা যাতে নষ্ট না হয়, এও আমি দেখি। যে সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে আছে, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু যে জানে না, তার প্রতি এটা যেন ঈশ্বরের কর্তব্য। ঈশ্বর যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছেন, এইরকম ভক্তের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহন করতে।

তাই এই সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ হল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা। অনেক সময় সংসারে এত ব্যস্ততা থাকে যে, তাঁকে ডাকবার সময় হয় না। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সংসারে ভাল-মন্দ কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিক করা যায় না। এই অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন শরণাগতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরকে আমমোক্তারী দাও। (Power of attorney) ঈশ্বরের উপর সব ছেড়ে দাও।

ঈশ্বরের উপরে তুমি যদি ভার দাও তাহলে তিনি কখনও তোমাকে ছেড়ে যাবেন না, ফেলে দেবেন না। তাঁর উপর ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, তিনি যে কাজ তোমাকে করতে দিয়েছেন তাই কর। কিন্তু ঈশ্বরকে ছেড়ে কাজ করলে সমূহ বিপদ।

ভক্ত যদি অন্য কোনও দেবতা বা অপর কারও আশ্রয় গ্রহণ না করে সমস্ত বিষয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করেন, নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের হাতে ছেড়ে দেন তাঁরা 'অনন্যাঃ চিন্তয়ন্তঃ'। এইরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে যাঁরা নিজেদের সমস্ত ভার ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে সর্বদা তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন ভগবানও তাঁর সবদিক থেকে অভাব, সকল দুঃখ মোচন করে থাকেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে অনেক ঘটনা আছে যেখানে ঈশ্বরই তাঁর সব দায়িত্ব নিয়েছেন। একটি চমকপ্রদ ঘটনাটি এরকম : স্বামীজী তখন কপর্দকহীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন কোনও টাকাপয়সা স্পর্শ করবেন না। ট্রেনে চলেছেন। কেউ হয়তো তাঁকে প্রথম শ্রেণির একটি টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খাবারদাবার এবং জল কিছুই ছিল না। যেমন তাঁর ক্ষিধে পেয়েছে, তেমনি জলতেষ্টাও। ট্রেন থেকে উত্তরপ্রদেশের তড়িঘাট স্টেশনে নামলেন। তাঁর সঙ্গে ঐ কামরায় একজন ধনী ব্যক্তিও ভ্রমণ করছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের দুরবস্থা দেখে বিদ্রূপ করে বললেন, 'তুমি উপার্জনের চেষ্টা করোনি, তাই কষ্ট পাচ্ছ।' ঐ ব্যক্তিও স্বামীজীর সঙ্গে ঐ স্টেশনে নামলেন এবং তিনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, পোশাক পরিচ্ছদ ভাল বলে স্টেশনে ভাল জায়গায় বেঞ্চিতে বসলেন। সন্ন্যাসী স্বামীজীর বেশভূষা অতি সাধারণ তাই তিনি সেখানে বসতে পারলেন না। এক পেট খিদে নিয়ে বাইরের একটি গাছের তলায় তিনি বসে রইলেন। গ্রীষ্মকাল বাইরে প্রচণ্ড গরম।

ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দূর থেকে একজন লোক প্ল্যাটফর্মে এসে স্বামীজীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবাজী, বাবাজী, আমি আপনার জন্য খাবার ও ঠাণ্ডা জল এনেছি। আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন। স্বামীজী ভাবলেন, লোকটির নিশ্চয় ভুল হয়েছে। তাই তিনি বললেন, 'আমি তো তোমাকে চিনি না, তোমার বোধহয় ভুল হচ্ছে। তুমি বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।'

তখন লোকটি উত্তর দিল: 'না না না, আমি আপনার কাছেই এসেছি। আমি এখানকার এক মিঠাইওয়ালা। আমি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। আমি দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম

করছিলাম। এমন সময় স্বপ্নে আমার শ্রীরামজী আমাকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'আমার ভক্ত অভুক্ত, কষ্ট পাচ্ছে। তুমি গিয়ে তাঁর সেবা কর। প্রথমটা আমি গ্রাহ্য না করে ঘুমোতে লাগলাম। স্বপ্নের নির্দেশে কর্ণপাত করলাম না। কিন্তু প্রভু আমাকে আবার ঠেলা দিয়ে বললেন, 'যাও, যাও, এক্ষুনি যাও।' তখন আমি ধড়মড় করে উঠে পড়ে এইসব লুচি, মিষ্টি ও জল নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এলাম এবং দূর থেকে দেখে আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি।

স্বপ্নে রামচন্দ্র আপনাকেই দেখিয়েছিলেন। কাজেই, দয়া করে আপনি এগুলো গ্রহণ করুন। ভগবানের কৃপার কথা শুনে স্বামীজীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি সেইসব খাবার খেয়ে মিঠাইওয়ালাকে আশীর্বাদ করলেন। এই ঘটনাটি দূর থেকে দেখে ঐ কৃপণ ধনী ব্যক্তি অভিভূত ও নির্বাক হয়ে যান। এভাবে ঈশ্বর স্বয়ং ভক্তের দাস হয়ে ওঠেন। তাই ভগবান বলছেন, আমি কারও দাস নই, আমি কেবল ভক্তের দাস। এই হলো ভগবান বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া প্রতিশ্রুতি।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ।।২৩

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সঙ্গে) অন্বিতাঃ (যুক্ত হয়ে) যে অপি (যে সকল) ভক্তাঃ (ভক্তেরা) অন্যদেবতাঃ (অন্যান্য দেবতাদের) যজন্তে (পূজা করেন) তে অপি (তাঁরাও) অবিধি-পূর্বকম্ (অজ্ঞানপূর্বক অর্থাৎ আমার সর্বাত্মক স্বরূপ না জেনে) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করেন)।

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে-সকল ভক্ত অন্য দেবতাদের পূজা করেন, তাঁরাও অজ্ঞানপূর্বক অর্থাৎ আমার সর্বাত্মক স্বরূপ না জেনে আমারই পূজা করেন।

ঈশ্বর এক, দুই নয়। অজ্ঞতার বশে কেউ কোনও পশুপক্ষী বা উদ্ভিদকে দেববুদ্ধিতে পূজা করতে পারে, এতে তার আত্মজ্ঞান হয় না। সে বারবার জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার পূজা বৃথা যায় না। এই পূজা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছায়। ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তার চিত্তের মালিন্য দূর করে দেন এবং ঈশ্বর তাঁর স্বরূপ তার কাছে প্রকট করে তাকে শান্তি ও মুক্তি দেন। তার আর পুনর্জন্ম হয় না।

সংসারে সাধারণ লোকেরা ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপের কোনও সন্ধান পান না। তাঁরা প্রকৃতিতে চিত্তাকর্ষক শক্তি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু সাধকের যদি ভক্তি থাকে, যদি তাঁর উপাসনা আন্তরিক হয়, সেই উপাসনা কখনও ব্যর্থ হয় না। ঐসব ভক্তের মধ্যে শ্রদ্ধা আছে ঠিকই, কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, ঈশ্বর এক ও অনন্ত। সেই সত্য তাঁদের জানা নেই, তাই তাঁরা এখানে- সেখানে স্বতন্ত্র দেবদেবীর পূজা করেন। কিন্তু তাঁদের সেসব পূজা পরিণামে ভগবানের কাছেই এসে পৌঁছায়। ভগবান

অন্তর্যামী, তিনি সাধকের হৃদয় দেখেন।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ।। ২৪

হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্বযজ্ঞানাম্ (সকল শ্রুতিবিহিত এবং স্মৃতিবিহিত যজ্ঞের) ভোক্তা (দেবতারূপে ভোক্তা) প্রভুঃ এব চ (এবং ফলদাতা) চ তু (কিন্তু) তে (তাঁরা অর্থাৎ অন্য দেবতার ভক্তগণ) তত্ত্বেন (স্বরূপত) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানন্তি (জানেন না) অতঃ (এই হেতু) চ্যবন্তি (সংসারে পতিত হন অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করেন)।

আমিই দেবতারূপে সকল শ্রুতিবিহিত ও স্মৃতিবিহিত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু অন্য দেবতার উপাসকরা আমাকে স্বরূপত জানেন না বলে বারবার সংসারে ফিরে আসেন।

ঈশ্বর অনুগ্রহ করে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। অর্জুন তাঁর প্রিয়পাত্র, তাই তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন। কত নামে ও কত রূপে আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। কিন্তু ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। যতদিন না এই সত্য আমরা জানতে পারছি, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই। বহু দেবদেবীর বরলাভের জন্য আমরা বহু যাগযজ্ঞ করি। কিন্তু এই যাগযজ্ঞের ফলদাতা ও ফলভোক্তা ঐ এক ঈশ্বর। এই সত্য না জানা পর্যন্ত আমাদের বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে, দেবতাদের পূজাও সেই ভগবানেরই পূজা, ভগবানই সমস্ত যজ্ঞের প্রভু এবং ভোক্তা। মানুষ যে-কর্মই করুক না কেন, যে-উপাসনায় ব্রতী হোক না কেন, ভগবানই তার সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু, তার সমস্ত সাধনার ফলদাতা ও ভোক্তা। এইসব বিভিন্ন দেবদেবীর পিছনে শুধু এক অনন্ত ঈশ্বরই বিদ্যমান। কিন্তু অজ্ঞানী সাধক তা বুঝতে পারে না। তাই অজ্ঞানতাবশত সে যজ্ঞের প্রকৃত পথ, যথার্থ উদ্দেশ্য ও মহৎ ফল হতে বিচ্যুত হয়ে সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভগবানলাভের পরিবর্তে সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিই কামনা করে। ফলে আধ্যাত্মিক জীবনে যে মুক্তির আনন্দ তা লাভ করতে না পেরে সংসারের ভোগে ও দুঃখে নিমগ্ন হয়। তাই আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে— আমরা যদি কোনও এক বিশেষ দেবতার পূজা করি, আমাকে বুঝতে হবে যে, আমার ইষ্টদেবতা বা ইষ্টদেবী সেই পরম অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই একটি মূর্তি বা রূপ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ।।২৫

দেব-ব্রতাঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (ইন্দ্রাদি দেবগণকে) যান্তি (লাভ করেন) পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যাঁরা পিতৃগণের পূজা করেন সেই পিতৃভক্তগণ) পিতৃন্ যান্তি (পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন) ভূত-ইজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যান্তি (যক্ষ,

রক্ষ, বিনায়ক প্রভৃতি ভূতগণকে লাভ করেন) মদ্‌যাজিনঃ (আমার পূজকগণ) মাম্-অপি (আমাকেই) যান্তি (লাভ করেন)।

ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন; শ্রাদ্ধাদি দ্বারা যাঁরা পিতৃগণের পূজা করেন তাঁরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; যাঁরা যক্ষ, রক্ষাদি ভূতগণের পূজা করেন তাঁরা ভূতলোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁরা আমাকে পূজা করেন তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।

শ্রুতির একটা কথা আছে, 'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি'—অর্থাৎ আমরা যার পুজো করি আমরা তা-ই হই। যদি আমরা দেবতাদের পুজো করি, তাহলে আমরা দেবলোকে যাব এবং দেবতা হব; যদি পিতৃগণের পুজো করি, তাহলে পিতৃলোকে যাব এবং তাঁদের একজন হব; যদি ভূতগণের পুজো করি, তাহলে ভূতলোকে যাব এবং তাঁদের একজন হব; যদি ঈশ্বরের পুজো করি, তাহলে ঈশ্বরে মিশে যাব। আমার জন্ম-মৃত্যুর খেলা শেষ।

বিভিন্ন ধরণের উপাসকরা আপন-আপন অভীপ্সিত লোকে গিয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরকে ভজনা করেন, তাঁরা ঈশ্বরকে লাভ করেন। পরমাত্মা নিজে বলছেন, যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমার কাছেই আসেন। ঈশ্বর- উপাসনা সকল উপাসনা থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই এক, অনন্ত ও অবিনাশী পরমেশ্বরের উপাসনা অতি সরল। অন্য সকল উপাসনা অপেক্ষাকৃত জটিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে পরমাত্মা সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তাঁর উপাসনাই সবচেয়ে সহজ। ভগবানের উপাসনায় আত্মজ্ঞান, পরম আনন্দ, শান্তি ও মুক্তিলাভ হয়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ।। ২৬

যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) পত্রং (পত্র) পুষ্পং (ফুল) তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (দান অর্থাৎ অর্পণ করেন) অহং (আমি) প্রযত-আত্মনঃ (শুভবুদ্ধি নিষ্কাম ভক্তের) ভক্তি-উপহৃতম্ (ভক্তিপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (প্রীতিপূর্বক ভক্ষণ অর্থাৎ গ্রহণ করি)।

যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তির সাথে পত্র (তুলসী, বেলপাতা ইত্যাদি), ফুল, ফল ও জল অর্পণ করেন আমি সেই ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত উপহার- সকল আনন্দের সাথে গ্রহণ করি।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে যেমনভাবে পারে পুজো করুক আমি তাতে খুশি। আমি চাই আন্তরিক শুদ্ধা ভক্তি। ঐশ্বর্য দিয়ে ঈশ্বরকে ভুলানো যায় না। আমরা যাকে ঐশ্বর্য বলি, ঈশ্বরের কাছে তা ঐশ্বর্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'ঈশ্বর মুক্তি দিতে কাতর নন, ভক্তি দিতে কাতর।' ভক্ত বলে—'আমি ঐশ্বর্য চাই না, ঈশ্বরকে চাই।' ভক্তি চাই, কিন্তু

কীরকম ভক্তি? শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—'ভগবানের সঙ্গে দোকানদারি করা চলবে না।' ভালবাসা মানে নিঃস্বার্থ ভালবাসা। কিছু চাই না। ভালবাসি, তাই ভালবাসি। বিনিময় নয়, আদান-প্রদান নয়। একাঙ্গী ভালবাসা।

ভগবান বলছেন, আমার পূজায়, আমার যজ্ঞে কোনও আড়ম্বরের দরকার নাই। সাধক যদি ভক্তির সহিত আমাকে একটি ফুল, একটি পাতা, একটি ফল বা একটু জল প্রদান করে আমি তাই প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি। আমি সাধকের হৃদয় দেখি, তার পূজার বাহ্যিক আড়ম্বর দেখি না। তার নিবেদিত দ্রব্য, তার উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক না কেন ভক্তিপ্রণোদিত হলেই আমি তা গ্রহণ করি।

ভক্তের আত্মদান, অহংকে বলিদান, ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ, নিজের হৃদয়-দানই হলো ঈশ্বর-উপাসনা বা যজ্ঞের প্রধান উপাদান। ভগবান চান ভক্ত- হৃদয়ের প্রেম। বাহ্যিক দান যত তুচ্ছ হোক না কেন তার সঙ্গে যদি ভক্তি মিশ্রিত থাকে তবে তিনি তা-ই গ্রহণ করেন। সেইজন্য ভগবান বলছেন, তিনি সাধকের হৃদয় দেখেন। বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্গে যা-কিছু দেওয়া যায়, তার মূল্য অসীম। অতএব ভক্তির পথে আচার-অনুষ্ঠান কমে যায়, ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না এবং বাহ্যিক লোকদেখানো অনুষ্ঠানও কমে যায়। এই ভক্তির মহিমা যা ভক্তকে ভগবানের খুব কাছে নিয়ে যায়।

ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এক গভীর বিশুদ্ধ নিষ্কাম ভালবাসা থাকে। ঈশ্বর এই শুদ্ধ প্রেমটুকুই চান। ভক্ত তাঁকে কত উপচারে ভোগ দিলেন, ওসব তিনি দেখেন না। সকল ভক্তকে উদ্দেশ করে শ্রীভগবান এই কথাটাই বলতে চাইছেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ।।২৭

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) যৎ করোষি (যা-কিছু কর্ম কর) যৎ অশ্নাসি (যা ভোজন কর) যৎ জুহোষি (যা হোম কর) যৎ দদাসি (যা দান কর) যৎ তপস্যসি (যা তপস্যা কর) তৎ (তা সমস্তই) মৎ-অর্পণম্ (আমাকে অর্পণ) কুরুষ্ব (করবে)।

হে অর্জুন, তুমি যা-কিছু লৌকিক বা বৈদিক কর্ম কর, যা-কিছু ভোজন কর, যা-কিছু হোম কর, যা-কিছু দান কর, যা-কিছু তপস্যা কর, সে-সবই আমাকে অর্পণ কর।

যা-কিছু করি আমরা, তাকে পুজো বলে গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে করছি। মানুষের কর্মগুলি দুইভাগে বিভক্ত—১) সাংসারিক কর্ম বা লৌকিক কর্ম (Secular)যেমন—আহার-বিহারাদি ২) ধর্মার্থ বা আধ্যাত্মিক কর্ম (Spiritual)। যেমন--যজ্ঞ, তপস্যা, পূজা, দান, প্রার্থনা প্রভৃতি। এই সব কর্মকে বৈদিক কর্ম বলা হয়। আমরা সাধারণত এই দুই কর্মকে দুভাবে আলাদা- আলাদা দেখে থাকি। কিন্তু গীতাতে ভগবান বলছেন, সমস্ত কর্মই আধ্যাত্মিক কর্ম এবং তা ভগবানের উদ্দেশে সমর্পণ করতে হবে।

ভগবানে সমর্পণ করলে সাংসারিক কর্মগুলিও আধ্যাত্মিক কর্মে পরিণত হয় এবং মুক্তির পথে তা সাহায্য করে। পক্ষান্তরে ভগবানকে স্মরণ না করে, তাঁকে অর্পণ না করে যজ্ঞ-দানাদি কর্ম করলেও তা আধ্যাত্মিক কর্ম বলে গণ্য হতে পারে না এবং তা মুক্তির সহায়ক না হয়ে বন্ধনেরই কারণ হয়।

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ করা। সুতরাং যা-কিছু করি তা ঈশ্বর-লাভের জন্যে। আমি নিজেকে তাঁর পাদপদ্মে উৎসর্গ করেছি, সুতরাং আমি যা-কিছু করব, তা তাঁর পূজা। সেই কারণে ভগবান বলছেন, তুমি যা করছ, যা খাচ্ছ, যা আহুতি দিচ্ছ, যা দান করছ কিংবা তপস্যা হিসেবে যা করছ সব আমাতে অর্পণ কর। এইসব কাজের জন্য যে শুভ বা অশুভ ফল হবে তা তোমাকে ভোগ করতে হবে না। সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

আমার মনটা বিষয়ের দিকে ছুটছে, সেটাকে ঈশ্বরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। মনের সব চিন্তা, সব বৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে, বিষয় থেকে ঘুরিয়ে ঈশ্বরমুখী করতে হবে। আমি রান্না করছি, অফিসে চাকরি করছি, ব্যবসা-বাণিজ্য করছি—এভাবে সবকিছু করব আমি। তবে সব ঈশ্বরের উদ্দেশে করব। এই যে বিষয়, সেটা 'নির্বিষয়' হয়ে যাবে, যদি এই ভাবটা অবলম্বন করা যায়। আমি ভাইকে ভালবাসি, বোনকে ভালবাসি, বন্ধুকে ভালবাসি—সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'ধর্ম'কি করে? ধর্ম্ একজন শিক্ষককে আরও ভাল শিক্ষক করে তোলে। একজন জেলেকে আরও ভাল জেলে হতে সাহায্য করে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা কেউ অফিসে টাইপ করছেন, কেউ স্কুলে পড়াচ্ছেন, কেউ বাগানে কাজ করছেন, কেউ গ্রন্থ-প্রকাশনার কাজ করছেন, কেউ হাসপাতালে রোগীদের ওষুধ দিচ্ছেন, ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের কর্মের সঙ্গে তফাতটা হল এই যে, সাধুরা ঐ মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা যা কিছু করছেন সব ঈশ্বরের উদ্দেশে। কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করছেন। যেমন মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করা হয়, তেমনি তাঁরা কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করছেন। কাজটাই তাঁদের ক্ষেত্রে উপাসনা হয়ে গেছে।

স্বামীজী এটাকেই বলছেন : Work is worship গীতায় ভগবান তাই অর্জুনকে বলছেন : তুমি যা কিছু করছ—খাচ্ছ, হোম করছ, দান করছ কিংবা হয়তো তপস্যা করছ—সবকিছুই তুমি আমাকে অর্পণ কর। সংসারে আমরা যদি এই ভাবটি আমাদের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কর্মে রাখতে পারি যে, সংসারের সকল কাজের মধ্যে দিয়ে আমি ঈশ্বরেরই সেবা করছি, তাহলে কাজটা আর কাজ থাকে না, উপাসনা হয়ে যায়। সংসার তখন আনন্দের সংসার হয়ে যাবে।

শাস্ত্র বলছেন—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্ম আগে, তার পরে অর্থ এবং কাম। ধর্ম হল ভিত্তি। বলছে ঈশ্বরনির্দেশিত পথে, ধর্মানুমোদিত পথে সংসার কর ও ভোগ কর। এবং

এই চতুর্বর্গের সবশেষে হচ্ছে মোক্ষ অর্থাৎ সংসারের কর্মের ভিতর দিয়েই মুক্তি-লাভ সম্ভব হবে।

আসল কথা হচ্ছে, লক্ষ্যটা স্থির রেখে চলা। একজন নৌকা করে যাচ্ছে নদীতে, কোন দিকে যাচ্ছে, নৌকাটাকে কোন মুখে রেখেছে—সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের গন্তব্যস্থল ঈশ্বরলাভ। আমি ঈশ্বরলাভ করতে চাই জীবনে। ঈশ্বরকে মনে রেখে আমি সংসারের জীবন-সংগ্রামে সব কর্তব্য পালন করছি, এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধও করছি। আমার যা-কিছু কর্মপ্রচেষ্টা সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমি তাঁরই দিকে এগিয়ে চলছি। আমার কোনও বাসনা নেই, স্বতন্ত্র কোনও ইচ্ছা নেই। তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তিনি যেভাবে রেখেছেন, ও যা করাচ্ছেন তাতেই আমি খুশি। শুধু সংসারে কর্মের মোড় ঈশ্বরমুখী করে দেওয়া।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ।।২৮

এবং (এইরূপে) শুভ-অশুভ ফলৈঃ কর্মবন্ধনৈঃ (কর্মের শুভ-অশুভ ফলরূপ বন্ধন থেকে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে) সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা (আমাতে সমস্ত কর্মফল সমর্পণ-রূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে) বিমুক্তঃ (জীবিতকালে মুক্ত হয়ে) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (দেহান্তে প্রাপ্ত হবে)।

এইভাবে সকল কর্ম আমাতে সমর্পণ করলে শুভ-অশুভ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। আমাতে সর্বকর্মসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে, জীবিতকালেই মুক্তিলাভ করবে এবং দেহান্তে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর পুনরায় দেহধারণ করতে হবে না।

ভগবান বলছেন, সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে, বিমুক্ত হয়ে আমাকে তখন তুমি লাভ করবে। এখানে সন্ন্যাসযোগ বলতে বাহ্যিক সন্ন্যাস নয়। এটি আন্তরিক সন্ন্যাস অর্থাৎ কামনা ও অহংবুদ্ধি ত্যাগ। সাধক যখন নিজের কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করতে পারেন তখন তাঁর প্রকৃত সন্ন্যাস হয়। এই আন্তরিক ত্যাগ দ্বারাই তিনি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হন।

এককথায় পুরো জীবনটাই ঈশ্বরমুখী হয়ে ওঠে। পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করা। নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদন করা। যো-সো করে ঈশ্বর-লাভ করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। যাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁদের জীবন ধন্য। তাঁদের আর পুনর্জন্ম নেই। তাঁদের কর্মবন্ধন ঘুচে গেছে। তখন সব ঈশ্বরের কাজ, ফলও ঈশ্বরের। কারণ, আমি তুমি এক। আমার সব তোমার। সবকিছু ঈশ্বরে অর্পণ করেছি আমি। এইভাবে নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। মনের মলিনতার জন্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে

পারছি না। একমাত্র নিষ্কাম অর্থাৎ কামনাশূন্য কর্মই মনের মলিনতা মুক্ত করে এবং ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। আমার হৃদয়ের মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর প্রকাশিত হন। তখন মুক্তিলাভ হাতের মুঠোয়।

নিষ্কামভাবে কাজ করা খুব সহজ নয়। আমাদের অহংবুদ্ধি সহজে যেতে চায় না। সেই অহংবুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে যাই, ভাবছি হয়তো নিজের জন্য ফল কামনা করছি না, কিন্তু কোথা থেকে বাসনা এসে যায়। ফলে মন্দই করে ফেলি অনেক সময়। নিজেরও মন্দ করি, অন্যেরও মন্দ করি। মানুষকে আঘাত করে ফেলি। একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করলাম, নিঃস্বার্থভাবে শুরু করেছিলাম, শেষে দেখা যায়, সেই উদ্দেশ্য আমি ভুলে গেছি। নিজের স্বার্থই দেখছি শুধু।

কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন বা ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর যে 'আমি' সেটা 'পাকা আমি'; তিনি যা কিছু করেন ঈশ্বরের জন্য করেন—সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে কাজ করেন। তিনি যা-কিছু করেন তাতেই লোকের কল্যাণ হয়। তাঁর উপস্থিতিতেই লোকের কল্যাণ হয়।

তাই আমাদের কাজ করতে হলে বিচারবুদ্ধি সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। সবসময় চিন্তা করতে হবে, এই কাজটা আমি অনাসক্তভাবে করতে পারছি তো? ঈশ্বরের উদ্দেশে করতে পারছি তো? সবসময় প্রার্থনা করতে হয় তাঁর কাছে যে, প্রভু 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' এই বোধ আমাকে দাও। তুমিই আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নাও। আমার লক্ষ্য যেন তোমার দিকে থাকে অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ। কাজের মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে না ফেলি। মন-প্রাণ দিয়ে আমি কাজ করব, ঈশ্বরের কাজ ভেবে করব। কাজ উদ্দেশ্য নয়, কাজ হচ্ছে উপায়, ঈশ্বরলাভের উপায়—ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। যতদিন কর্মক্ষেত্রে আছি ততদিন ঈশ্বরকে যেন ধরে থাকতে পারি। অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাস করতে করতে এই বোধ পাকা হয় যে, আমার যা-কিছু সব তাঁর। তখন সব কাজকর্ম সুন্দর হয় এবং কাজের ফলে আমার চিত্তশুদ্ধি হয়।

ঈশ্বরকে যদি আমি সত্যি সত্যি ভালবাসি, তাহলে কাজে আমার কোনওরকম অবহেলা আসতে পারে না। তিনি আমার সর্বস্ব। তিনি আমার প্রিয়তম। আমার আপনার থেকেও আপনার। তাই তাঁর কাজে আমি সবচেয়ে বেশি যত্ন নেব। আমার যত শক্তি আছে সবটা দিয়ে সেই কাজ করব।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।। ২৯

অহং (আমি) সর্বভূতেষু (সকল ভূতে) সমঃ (সমান) মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (অপ্রিয়) প্রিয়ঃ চ (এবং প্রিয়) ন অস্তি (নেই) তু (কিন্তু) যে (যাঁরা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা

(ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করেন) তে (তাঁরা) ময়ি (আমাতে) অহম্ অপি (আমিও) তেষু (তাঁদের অন্তরে) (অবস্থান করি)।

আমি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করি। আমার প্রিয় ও অপ্রিয় বলে কিছু নেই। কিন্তু যারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে তারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাদের হৃদয়ে বাস করি।

ঈশ্বরের কাছে আমরা সবাই সমান। ছোট-বড় কেউ নেই। কেউ আমার শত্রু নয়, আমার মিত্রও কেউ নেই। সকলের প্রতি আমার সমান মনোভাব। সূর্য যেমন পাপী বা সাধু, ভাল বা মন্দ সকলকেই সমান আলো দেয়, ঈশ্বরও ঠিক তাই। তাহলে পার্থক্য কোথায়? তবে যে তাঁকে বেশি ভালবাসে, সে তাঁকে নানাভাবে পেয়ে থাকে। তিনি ভক্তাধীন। যে তাঁকে ভালবাসে, তিনি তার চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূর করে দেন। তার চিত্তে তখন তিনি উজ্জ্বল হয়ে প্রকট হন। অর্থাৎ ঈশ্বরীয় যে সত্তা, তা তখন সেই ভক্তের মধ্যে ফুটে ওঠে। সে তখন আর সাধারণ মানুষ নয়, স্বয়ং ভগবান। জবাফুলের কাছে একটুকরো স্ফটিক রাখলে সেই স্ফটিক জবাফুলের রঙ পায়। ঈশ্বরের চিন্তা করতে-করতে মন ঈশ্বরের রঙে রঞ্জিত হয় তখন মানুষ ভগবৎ-সত্তা লাভ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: Dignity of labour—শ্রমের মর্যাদা। প্রতিটি কাজই সম্মানের। 'Each is great in his own place. The scavenger in the street is quite as great and glorious as the king on his throne.'—নিজের নিজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে যে-লোকটি আর সিংহাসনে আসীন যে রাজা—দুজনেই সমান বড়। যদি নিজের নিজের কাজ তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে করেন, তাহলে দুজনের মধ্যে তফাত নেই কোনও। কাজটা কী তা দিয়ে দুজনকে বিচার করা যাবে না। রাজা হয়তো রাস্তা ঝাঁট দিতে গেলে মোটেই পারবেন না। আবার ঝাড়ুদার সেও রাজ্য চালাতে পারবে না। সমাজে সকলের যোগ্যতা সমান নয়। যোগ্যতা অনুযায়ী একেক জন একেকটা কাজ করে। এই পার্থক্য প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা পালটাতে হবে। বিবেকানন্দ বলছেন—কাজ দিয়ে মানুষকে ছোট-বড় বিচার করা ঠিক হবে না। ছোট-বড় ঠিক করা হবে কাজটা সে কীভাবে করছে তা দিয়ে। ছোট-বড় ঠিক হবে চরিত্রগুণে। আমি সামান্য কাজ করছি, কিন্তু সেই কাজ আমি করছি নিষ্ঠার সাথে, সততার সাথে, ঈশ্বরের পূজা জ্ঞানে—তাহলে আমি সম্মানের পাত্র। আর যদি এমন হয় যে, একটা বড় পদ আমি আঁকড়ে আছি, কিন্তু আমি আমার কর্তব্য পালন করছি না, আমি সৎ নই, আমি স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত—তাহলে যত বিদ্যাবুদ্ধি আমার থাকুক না কেন, মানুষ হিসাবে আমি অনেক নীচে—আমি সম্মানের যোগ্য নই। সম্মান-অসম্মান বাইরের কোনও বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। তোমার করণীয় যেটুকু আছে সেটুকু তুমি ঠিকভাবে করে যাও। তা যদি হয়, কর্তব্যনিষ্ঠা যদি থাকে তোমার, তাহলেই তুমি সম্মানের যোগ্য।

সংসারে আমার কর্তব্যকর্ম অনাসক্তভাবে করে যাব। এই কর্তব্যনিষ্ঠা, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরের পূজা-জ্ঞানে কাজ করলে নিষ্কাম-ভাব আপনা-আপনি চলে আসে। ঈশ্বরকে আমি ভালবাসি তাই আপাতদৃষ্টিতে কাজ যতই সামান্য হোক না কেন, আমার কাছে তা অসামান্য। কারণ এই কাজের ভিতর দিয়ে আমি আমার ঈশ্বর প্রিয়তমকে সেবা করছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যদি আমরা সংসারে সব কাজ করি তাহলে শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনধারা নয়, সমগ্র জাতির জীবনধারা পালটে যাবে। কোনও কাজই ঐহিক নয়, যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে করা যায়, তাহলে সব কাজই পারত্রিক। সব কাজই তখন 'যোগ' হয়ে যায়। সেইসঙ্গে আমাদের মধ্যে ভেদদৃষ্টি ঘুচে যাবে, আমরা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হব। এই দৃষ্টিতে কর্ম করলে সকলেই, এমনকী নিকৃষ্টতম মানুষও, ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ লাভ করবেন।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ।।৩০

সু-দুরাচারঃ অপি (অত্যন্ত দুরাচার অর্থাৎ দুষ্টু ব্যক্তিও) চেৎ (যদি) অনন্যভাক্ (অনন্যচিত্ত হয়ে) মাম্ (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) সঃ (তাঁকে) সাধুঃ এব (সাধু বলেই) মন্তব্যঃ (মনে করা উচিত) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (শুভ সঙ্কল্পযুক্ত)।

অতি দুরাচারী অর্থাৎ দুষ্ট ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমাকে ভজনা করে তবে তাকে সাধু বলেই জানবে। কারণ তার সংকল্প অতি শুভ।

ঈশ্বরের কৃপার কাছে পাপী, সাধু, সাধারণ ভক্ত এবং অতি শুদ্ধ ভক্তের কোনও বাছবিচার নেই। ঈশ্বরের ভালবাসায় পাপী-তাপী, দুষ্ট সকলেই উদ্ধার হয়ে যাবে। ভগবান বলছেন, অত্যন্ত দুরাচারী, সে-ও যদি অনন্যভাবে আমাকে ভজনা করে, তবে তাকে সাধুই মনে করতে হবে। এই হলো ভক্তির মাধুর্য ও মহিমা। ধরা যাক্ কোনও এক ব্যক্তি অনেক অন্যায় করেছে। সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তার স্পর্শও কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু সেই লোকই যদি হঠাৎ ঈশ্বরানুরাগী হয় অর্থাৎ তার মন-প্রাণ সর্বদা ঈশ্বরে ডুবে থাকে, তখন সে সকলের নমস্য হয়। সে তখন দেবমানব। এই পরিবর্তন তার হয়েছে শুধু ঈশ্বর ধ্যান-চিন্তার গুণে। ঈশ্বরের নাম-কীর্তন স্পর্শমণির কাজ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পাপীদের মধ্যেও সাধুত্বের বীজ লুকিয়ে থাকে। প্রচলিত কথা—'No saint without a past, no sinner without a future' যিনি সাধু তাঁরও একটা অতীত আছে, আর যে পাপী তারও ভবিষ্যৎ আছে। আমরা কত মহাপুরুষের

জীবনীতে দেখতে পাই, যাঁদের অতীতে কত দুর্বলতা ছিল—সবকিছু অতিক্রম করে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সকলের আদর্শস্থানীয় পুরুষ হয়েছেন, অতীতের সব কালিমা দূর করে তাঁরা জ্যোতির রাজ্যে পৌঁছেছেন, জ্যোতির্ময় হয়েছেন, শুদ্ধ, পবিত্র হয়েছেন, মহৎ হয়েছেন, সাধু হয়েছেন। আবার আজকে যাকে দেখছি খারাপ, কাল সে-ও ভাল হয়ে যাবে। মূলকথা ভগবানের শরণাগত হলে ভগবান তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেবেন।

ঘোর পাপীরাও ঈশ্বরের দিব্যস্পর্শে মহান সন্ত হয়ে যায়। ভগবান দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন, 'সাধুরেব স মন্তব্যঃ'—তাঁকে সাধু বলে মনে করবে। কারণ 'সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ'—তাঁর মনে ভালো হবার সুসংকল্প উদিত হয়েছে। তাঁর মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতীত মুছে গিয়ে নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে তাঁর। এই হলো ঈশ্বরপ্রেমের অকল্পনীয় শক্তি।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ।।৩১

সঃ (তিনি) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্মাত্মা (ধার্মিক বা সাধুপুরুষ) ভবতি (হন) শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং (শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করেন) কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র অর্জুন) মে (আমার) ভক্তঃ (উপাসক) ন প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হন না) (ইতি) প্রতিজানীহি (নিশ্চয়রূপে জান, প্রতিজ্ঞা করে বলতে পার)।

সেই দুরাচারী ব্যক্তি শীঘ্রই ধার্মিক হন এবং চিরশান্তি লাভ করেন। হে কুন্তীপুত্র অর্জুন, আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হন না, একথা তুমি শপথ করে বলতে পার। মুক্ত-কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে পার: আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হবে না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

ভগবান এখানে অর্জুনকে উপলক্ষ করে আমাদের সকলের উদ্দেশে উদার অঙ্গীকার করছেন। বলছেন—অতি দুরাচারী ব্যক্তিও আমার কৃপায় ধর্মাত্মা অর্থাৎ নৈতিক এবং সদাচারসম্পন্ন হয়ে উঠবে। আমার প্রতি ভালবাসায় সে পরম শান্তি লাভ করবে। তার কখনও বিনাশ হয় না। শ্রীভগবান অর্জুনকে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে বলছেন।

পাপ হতে উদ্ধারের বা চরিত্র-সংশোধনের প্রধান উপায় হলো ভক্তিপূর্বক ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাকে ভালবাসা। ভক্তি বা ঈশ্বরের নাম যেন পরশপাথর—যা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে যায়। প্রচীনকালে এরূপ বহু ঘটনা আছে যে, ঘোর পাপীর জীবনও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জগাই ও মাধাই দুটি ভাই ভক্ত নিত্যানন্দের সংস্পর্শে এসে সাধু ও ভক্ত হয়ে গেলেন। সাধু হরিদাসের সংসর্গে এসে পতিতা রমণীও ধর্মজীবন লাভ করল। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হলেন। দস্যু অঙ্গুরীমাল ভগবান বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে সন্ত-জীবন লাভ করেন।

পাপীর চিত্ত ঈশ্বরমুখী হওয়ার সহজ উপায় সাধুসঙ্গ। মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসলে পাপীর চিত্তও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎকথা শ্রবণ, সৎসঙ্গে কালযাপন প্রভৃতি উপায়ে পাপীর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হতে পারে। যত পাপী হোক না কেন, তার চিত্তে একবার ভগবদ্ভক্তি জেগে উঠলে উদ্ধার সুনিশ্চিত—এতে কোনওপ্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই ভগবান জোরের সঙ্গে বললেন, হে অর্জুন, তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ভগবানের ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, সে কখনও সংসারে আসক্ত হয়ে দুর্গতি ভোগ করে না। যেমন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলছেন, 'বিধির সাধ্য নেই যে, আমার সন্তানের ক্ষতি করতে পারে।'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ খুব মদ্যপান করতেন। কিন্তু তিনি একজন বড় নাট্যকারও ছিলেন। তিনি স্বীকার করতেন, পৃথিবীতে যত রকমের পাপ আছে, সব তিনি করেছেন। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এত সব দোষ সত্ত্বেও তিনি গিরিশের প্রতিভা ও গুণগুলিই দেখতেন। তাঁকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন। শেষপর্যন্ত গিরিশচন্দ্র একজন মহাত্মা হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি নিজ মুখে বলেছিলেন, 'এ হলো শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক কাণ্ড। তিনি আমাকে কখনও বলেননি, এটা ছাড়, ওটা ছাড়। তিনি শুধু আমার সৎ প্রবণতাটি উসকে দিয়েছিলেন, আর তাতেই আমি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলাম। এমনকী যেসব মেয়েরা গিরিশ ঘোষের নাট্যালয়ে অভিনয় করতেন, এবং যাঁদের সেকালে নিম্নশ্রেণীর মহিলা বলেই গণ্য করা হত, তাঁদেরও শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করেছিলেন। তার ফলে তাঁদের জীবনেও পরিবর্তন এসেছিল। তাই ভগবান বলছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ 'প্রণশ্যতি'—হে অর্জুন, তুমি সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বল, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ।।৩২

পার্থ (হে পৃথাপুত্র) যে (যারা) পাপ-যোনয়ঃ অপি (এমনকী পাপযোনিসম্ভূত অর্থাৎ নীচকুলজাত) স্যুঃ (হয়) (এবং যারা) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) বৈশ্যাঃ (বৈশ্য) তথা (এবং) শূদ্রাঃ (শূদ্র) তে অপি (তারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করে) পরাং (শ্রেষ্ঠ) গতিম্ হি (গতিই) যান্তি (লাভ করে)।

হে পার্থ, কেউ পাপযোনিসম্ভূত অর্থাৎ নীচকুলজাতই হোন অথবা বৈশ্য, শূদ্র বা স্ত্রীলোকই হোন, আমাকে আশ্রয় করলে তাঁরাও পরমগতি লাভ করেন।

যারা আমাকে আশ্রয় করেছে অর্থাৎ যারা আমার শরণাগত তাদের কোনও ভয়ের কারণ নেই। আমি সর্বদা তাদের রক্ষা করি। ভক্তির পথই সবচেয়ে সহজ পথ। এখানে ভগবান জোর দিয়ে বলছেন, সমাজ যাদের অবহেলা করে, সমাজের দৃষ্টিতে যারা হেয়,

আমার প্রতি ভক্তি হলে তারা সকলেই আমাকে লাভ করবে। গীতা এবং উপনিষদ উভয়ই শিক্ষা দেয় যে, সকলেই মুক্তি লাভ করতে পারে, কেউ পাপজাত সন্তান নয়। উপনিষদ বলছেন—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'—তোমরা সব অমৃতের সন্তান। মহিলা, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উঠতে পারেন। ঈশ্বরের কাছে ভক্তের কোনও বাছবিচার নেই। স্ত্রী-পুরুষ বা উচ্চ-নিচের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। কারণ তারা সকলেই সেই পরমেশ্বরের সন্তান। প্রত্যেকের সম্পর্ক সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং সেই সঙ্গে সমাজের সকল সম্প্রদায় অর্থাৎ সকল মানুষই ঈশ্বর বা অমৃতের সন্তান।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।।৩৩

পুণ্যাঃ (পুণ্যবান, পুণ্যজন্মা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) ভক্তা (ভক্ত) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ, ক্ষত্রিয়গণ) (পরমগতি লাভ করবেন) কিং পুনঃ (তার আর কথা কি): (অতএব) অনিত্যম্ (অনিত্য, ক্ষণিক) অসুখম্ (সুখহীন) ইমং (এই) লোকং (মর্ত্যলোক) প্রাপ্য (পেয়ে) মাম্ (আমাকে) ভজস্ব (ভজনা কর)।

পুণ্যবান ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিরা যে পরমগতি লাভ করবেন তাতে আর সন্দেহ কি? অতএব, যখন এই অনিত্য সুখহীন মর্ত্যলোকে জন্মলাভ করেছ, তখন আমাকেই ভজনা কর।

যদি পাপাচারী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষও ভক্তির সাহায্যে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়, তবে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সুকৃতিশালী এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে শ্রেষ্ঠগতি অবশ্যই পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীভগবান সবাইকে, বিশেষতঃ যারা উচ্চ আধারের মানুষ, তাদের আহ্বান করে বলছেন—আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এগিয়ে এসো, তোমরা মুক্ত হয়ে যাও। এ সুযোগ ছেড়ো না। কিন্তু ভক্তি চাই—পাপী কিংবা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি উভয়কেই ভক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করতে হবে। ভক্তি থাকলে ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদিও ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে শ্রেষ্ঠগতি লাভ করবে, পক্ষান্তরে ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের মানুষও ভগবানকে না পেয়ে অধমগতি প্রাপ্ত হবে। অতএব হে অর্জুন, এই অনিত্য দুঃখবহুল সংসারে মানবজন্ম লাভ করে বিষয়-বাসনায় মত্ত হয়ে আমাকে ভুলে থেকো না। সর্বদা ভক্তির দ্বারা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর, তা হলে তোমারও শ্রেষ্ঠগতি লাভ হবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪

মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমাতে ভক্তিমান) মদ্‌যাজী (আমার উপাসক) ভব (হও); মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার অর্থাৎ প্রণাম কর) এবম্ (এইভাবে) মৎপরায়ণঃ (আমার শরণাগত হয়ে) আত্মানং (নিজেকে অর্থাৎ নিজের মনকে) যুক্ত্বা (আমাতে যুক্ত করে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হবে)।

তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। এভাবে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে।

কীভাবে মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে? ঈশ্বরের একান্ত শরণাগত হতে হবে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁকে চাই, আর কাউকে চাই না। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে যায়, তার পৃথক সত্তা থাকে না, তেমনই ভক্ত ভগবানে মিশে এক অনুভব করে। ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি আমাকে ভজনা কর, আমাতে একনিষ্ঠ হও, তুমি অন্য বিষয়ের ধ্যান চিন্তা পরিত্যাগ করে আমাতেই মন নিবিষ্ট কর। আমিই যেন শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তোমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হই।

তুমি আমার ভক্ত হও। আমার প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভালবাসলে তবেই আমার কর্মে তোমার নিষ্ঠা আসবে। আমার প্রতি তোমার চিত্তে প্রেম জন্মালে, আমাকে ভালবাসতে শিখলে তোমার সমস্ত কর্মই হবে আমার উদ্দেশে যজ্ঞ এবং তোমার সমস্ত কর্মের ফল আমাকে অর্পণ করবে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ তার আধ্যাত্মিক জীবনের সঠিক অনুভূতি করতে পারে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঈশ্বর প্রেমের মাধ্যমে, মানব প্রেম, সহমর্মিতা এবং সেবাভাবের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করে। এগুলিই বিশুদ্ধ ভক্তির ফল।

ভগবান এখানে তাঁর ভক্তের প্রতি একান্ত আবেদন করছেন—তোমার চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট কর, আমার ভক্ত হও, যা কিছু পূজা-অর্চনা এবং যজ্ঞ, তা আমার উদ্দেশেই কর, আমাকে প্রণাম কর, এইভাবে যাঁরা সম্পূর্ণভাবে আমার অনুরক্ত, তাঁরা যোগযুক্ত হয়ে আমাকেই লাভ করবে। আমিই তোমার একমাত্র পরম লক্ষ্য। আমিই তোমার জীবনের ধ্রুবতারা।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

ভগবান বলছেন—এই যোগ বা বিদ্যা—'রাজবিদ্যা'—এ হলো রাজবিদ্যা, সকল বিদ্যার রাজা। 'রাজগুহ্যম্'—রহস্যের চূড়ামণি। 'পবিত্রম্ ইদম্ উত্তমম্'—এই বিদ্যা পরম শোধনকারী। এই ধরনের বিদ্যার মাধ্যমে কী অসাধারণ চারিত্রিক পরিবর্তনই না আসতে পারে! বস্তুত পবিত্রতা, প্রেম, সেবাভাব, শরণাগতি—সবই এই বিদ্যার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আসবে। 'প্রত্যক্ষাবগমম্'—দৈনন্দিন জীবনেই তা অনুভব করা যাবে, তার জন্য সুদূর অরণ্যে বা স্বর্গে যাওয়ার দরকার হয় না। রান্নাঘরে, কলকারখানায় বা অফিসে কাজ করতে করতেই আপনারা এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারেন। 'ধর্ম্যম্'—ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা যা মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ ঘটায়, যার দ্বারা সামাজিক কাঠামো দৃঢ় হয়, একজন মানুষের সঙ্গে আর পাঁচজন মানুষের ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সুসুখম্ কর্তুম্—যা আচরণ করা সহজ এবং সুখকর। কিন্তু 'ফলমব্যয়ম্' তার ফল অক্ষয়। ভগবানকে লাভ করতে হলে একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তা প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা। শেষে ভগবান তাঁর ভক্ত অর্থাৎ আমাদের কাছে এক প্রেমের আবেদন করেছেন যাতে আমাদের মন সকল কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতি নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাযুক্ত ভালবাসায় তাঁকে প্রণাম ও পূজা করে।

যাঁরা প্রকৃত মহাত্মা, তাঁরাই দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্বক সর্বদা ভগবানের কথা কীর্তন করতে করতে ভক্তির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে ভগবানের উপাসনা করেন। যাঁরা অন্য অভিলাষ ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের ভজনা করেন, সেই সকল শরণাগত ব্যক্তির সমস্ত ভার (যোগ ও ক্ষেম) ভগবান বহন করেন। ভগবানের একনিষ্ঠ ভজনকারী ভক্তকে সৎ ও সাধু বলে জানবে। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই। সকল ভগবদ্ভজনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন।

মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলার জন্য ভগবান গীতাতে চারটি যোগের ব্যাখ্যা করেছেন—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানযোগ বা রাজযোগ। চারটি পথেই পরমাত্মাকে এই জীবনে অনুভব করা যায়। 'ব্রহ্মবেদো ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মকে জেনে মানুষ তখন ব্রহ্মই হয়ে যায়। যোগশাস্ত্র এই অনুভূতির কথা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। আমাদের দেহের মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ডের নীচ পর্যন্ত একটা পথ আছে। তার নাম সুষুম্না। মেরুদণ্ডের নীচে কুণ্ডলিনী শক্তি ঘুমিয়ে আছে। তাকে সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সেই সাপ যেন মাথাটা নীচের দিকে করে ঘুমিয়ে আছে। এই চারটি পথে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই কুণ্ডলিনী শক্তির ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করা হয়। পুরো সুষুম্না পথকে ছয়টি ভাগে, ছয়টি পদ্মরূপে কল্পনা করা হয়। মেরুদণ্ডের সবচেয়ে নীচে—মূলাধার চক্র। তার একটু উপরে—স্বাধিষ্ঠান চক্র। তার একটু উপরে—মণিপুর চক্র, বুকের কাছে আছে—অনাহত চক্র।

গলায় বিশুদ্ধ, ভ্রূ-এর মধ্যে—আজ্ঞা চক্র। এই হলো ষট্‌চক্র। মাথার উপর সহস্রার। এই সহস্রারে আছেন পরমাত্মা বা ভগবান। মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি। পরমাত্মা বা ভগবান সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে আকর্ষণ করছেন। কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি ঘুমিয়ে আছেন। তাই মানুষ ঈশ্বরকে ভুলে নানা বিষয় নিয়ে মেতে রয়েছে। মানুষ যখন যে কোন একটি যোগের পথ ধরে কিংবা চারটি যোগের সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক পথে চলতে শুরু করবে, তখন এই কুণ্ডলিনী শক্তির ঘুম ভাঙবে, ধীরে ধীরে সেই শক্তি সুষুম্নার পথ ধরে উপরে উঠতে থাকবে। এক একটা চক্রে সেই শক্তি যখন পৌঁছাবে, তখন মানুষ এক এক রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করবে। শেষে সহস্রারে পরমাত্মাকে লাভ করবে। সপ্তভূমি সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হয়ে যায়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন—তিনি শক্তির সঙ্গে মিলিত হন। তন্ত্রমতে শিব-শক্তির মিলন হয়। যোগমতে বলা হয় পরমাত্মা-জীবাত্মার মিলন হয়েছে। বেদান্ত মতে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তখন মানুষ সত্যিকারের দেবতায় পরিণত হয়। তাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা ঈশ্বরলাভ।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

ঈশ্বরের বিভূতির অন্ত নেই। শ্রীভগবান অর্জুনের মঙ্গল কামনা করে তত্ত্বকথা বলছেন। ভগবানের স্বরূপ কেউ জানে না। দেবতারাও জানেন না। কারণ, ভগবান তাঁদেরও আদি কারণ, অর্থাৎ সকল দেবতাগণও শ্রীভগবান থেকে উদ্ভূত, সমস্ত মহর্ষি, চতুর্দশ মনু প্রভৃতি সব তাঁর থেকে সৃষ্ট। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'তাঁর অর্থাৎ ভগবানের ইতি করা যায় না। তাঁর কাণ্ড মানুষ কী বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড। তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল ''মা মা'' বলে ডাকি। মা যা করেন।'

ভগবান বলছেন—আমি সমস্ত ভূতবর্গের আদি, অন্ত ও মধ্য। আমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি সূর্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমা, দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, বায়ুগণের মধ্যে আমি মরীচি। আমিই সকল সত্ত্বগুণের আধার। যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্ন বা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন তা সবই আমার শক্তির সামান্য প্রকাশ বলে জানবে। আমিই একাংশে এই সমস্ত জগৎ জুড়ে বিরাজিত। ক্ষুদ্র মানুষ আমার পূর্ণমহিমা কীকরে বুঝবে?

শ্রীভগবান কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনকে লক্ষ করে আমাদের সকলকে তাঁর অনন্ত স্বরূপের মহিমা সম্পর্কে কিছু আভাস মাত্র দিয়েছেন। ভগবান বলছেন—হে অর্জুন, আমার দিব্য আত্মবিভূতির মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলি তোমাকে বলব, কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই। আমি সর্বভূতাশয়স্থিত আত্মা। আমি সৃষ্টির আদি, অন্ত এবং মধ্য। আমিই শ্রেষ্ঠজ্ঞান অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। আমিই সকলের কর্মফলবিধাতা এবং সর্বভূতের বীজস্বরূপ।

ভগবান যে কেবল তাঁর বিভূতিসমূহের মধ্যেই প্রকাশমান তা নয়, সমস্ত বিশ্বেই তাঁর প্রকাশ। ভগবান এখানে তাঁর অনন্ত বিভূতির সামান্য কিছু উপমা দিয়েছেন, উদ্দেশ্য ভক্ত যেন তাঁকে সহজ উপায়ে জানতে পারে ও শরণাগত হতে পারে। তাঁর বিভূতির এত অধিক আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই। এই বিপুল বিশ্ব ভগবানের অনন্ত সত্তা ও শক্তির একাংশের প্রকাশ মাত্র। যাঁরা ভগবানে চিত্ত অর্পণ করে প্রীতিপূর্বক তাঁর ভজনা করেন—তাঁরাই তাঁর সামান্য স্বরূপ বুঝতে সমর্থ হন। এই সত্য যখন ভক্ত সম্যক উপলব্ধি করবে তখন বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু, গুণ, ভাব বা ক্রিয়াতেই তাঁর সত্তা এবং শক্তি অনুভব করতে পারবে, সর্ববস্তুতে ভগবৎ-স্ফুরণ হচ্ছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। বস্তুত ভগবান স্বয়ং ভক্তের নির্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হলে বুদ্ধিবিচার দ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারে না। তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও অপার।

শ্রীভগবানুবাচ
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন) মহাবাহো (হে মহাবাহো) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং (শ্রেষ্ঠ) বচঃ (বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর) যৎ প্রীয়মাণায় (প্রীতিমান) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিত-কাম্যয়া (তোমার হিতকামনা-হেতু) বক্ষ্যামি (বলব)।১

শ্রীভগবান বললেন—হে মহাবাহো, পুনরায় আমার ভগবদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট তত্ত্ব কথা শোন, আমার কথায় তুমি প্রীতিযুক্ত হও বলে আমি তোমার হিতের জন্য কল্যাণপ্রদ কথা বলছি।

ভগবানের অমৃতকথা শ্রবণ করে অর্জুন অত্যন্ত প্রীত হন। তাই ভগবান তাঁর ভক্তের হিতকামনা বা কল্যাণকামনা করে তাঁর স্বরূপ মহিমা বলছেন। এই গভীর তত্ত্বকথা সকলকে বলা যায় না। যারা মূঢ় বা অজ্ঞান তারা ভগবানের পরমতত্ত্ব বুঝতে পারবে না। কিন্তু ভগবানের প্রিয় হলো ভক্ত। ভগবানের অতি প্রিয় অর্জুন, তাই ভগবান তাঁকে এই গভীর তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন। ভগবৎ তত্ত্ব দুর্বোধ্য, ভগবানের কৃপা ছাড়া লাভ হয় না। ভগবান একদিকে যেমন বিশ্বের অতীত অব্যয় সত্তা, অপরদিকে তিনিই সমস্ত কিছু হয়েছেন। এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু তিনিই। তাঁর স্বরূপ জ্ঞানের আভাস ভক্তের হিতকল্পে জানা প্রয়োজন। ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ভক্তকেই বলা যেতে পারে। অর্জুন যেহেতু ভক্তিমান, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত এবং তাঁরই হিতকল্পে এই পরমতত্ত্ব ভগবান বলছেন।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ।।২

সুরগণাঃ (দেবতাগণ ও) মে (আমার) প্রভবং (প্রভাব বা উৎপত্তি) ন বিদুঃ (জানেন না), মহর্ষয়ঃ চ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) হি (যেহেতু) অহম্ (আমিই) দেবানাং (দেবতাদের) মহর্ষীণাং চ (এবং মহর্ষিদেরও) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) আদিঃ (আদিকারণ)।২

দেবগণ কিংবা মহর্ষিগণ কেউই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিষয় জানেন না। কারণ সর্বতোভাবেই আমিই সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণস্বরূপ । (অতএব আমার কৃপা ছাড়া কেউই আমাকে জানতে পারে না)।

ভগবান বলছেন—আমি অজ, অনাদি, জন্মমৃত্যুরহিত, অক্ষর পুরুষ। আবার আমিই বিধিরূপে জগতে প্রকাশিত। আমার এই অনাদি, অব্যয় স্বরূপ সম্পর্কে দেবতা এবং মহর্ষিগণও সমগ্রভাবে জানেন না। অর্থাৎ ভগবানের প্রভাবেই যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হচ্ছে সেই তত্ত্ব সকলের জানা সম্ভব নয়। কারণ ভগবানই তাঁদের উৎপাদক ও বুদ্ধির প্রবর্তক, আদি কারণ। অতএব ভগবানেরই সৃষ্ট দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁর অজ ও অনাদি স্বরূপ বা বিবিধ রূপে প্রকাশ কী প্রকারে জানতে পারবে? বাস্তবিক ভগবান কাউকে কৃপা না করলে অর্থাৎ তাঁর নির্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হলে কারও পক্ষে তাঁকে জানা সম্ভব হয় না। তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।।৩

যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অনাদিম্ (আদিরহিত বা সনাতন) অজম্ (জন্মরহিত) লোক-মহেশ্বরম্ চ (এবং সর্বলোকের মহেশ্বররূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্যেষু (মনুষ্যমধ্যে বা মর্তলোকে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হয়ে) সর্বপাপৈঃ (সর্বপ্রকার পাপ হতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন)। ৩

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনি মনুষ্যমধ্যে মোহশূন্য হয়ে, সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত হন।

ভগবান একদিকে অজ, অনাদি, অক্ষর পুরুষ, দেশকালের অতীত, অনির্বচনীয়। মন বা বাক্য দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। আবার তিনিই এই বিশ্বে বিবিধরূপে প্রকাশিত, তিনিই সর্বলোকের মহেশ্বর ও প্রভু, তিনিই সকলকে চালনা করছেন, সকলকে রক্ষা করছেন। অতএব যিনি ভগবানকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখে তাঁকে সমস্ত কারণের কারণ এবং অনাদি পরমেশ্বর বলে জানতে পারেন, তিনি অজ্ঞান বা মোহ হতে মুক্ত হন অর্থাৎ পূর্বকৃত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাপ হতে মুক্ত হন। তাঁকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করলে জীবের কায়, মন ও বাক্য-কৃত ত্রিবিধ পাপ প্রকারান্তরে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিনকালের পাপরাশি দূর হয়। সেইসঙ্গে পাপবুদ্ধির উৎস অবিদ্যা বা মোহ সবই নিবৃত্ত হয়ে যায়। তিনি এই বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করেন এবং সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হন।

তাঁকে কোনও পাপও স্পর্শ করতে পারে না। যাঁর চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, যিনি প্রতি কর্মে, প্রতি চিন্তায় ভগবৎপ্রেরণা অনুভব করেন তাঁর পক্ষে কোনওপ্রকার পাপ কর্ম করা বা তার ফলভোগ করা অসম্ভব।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ।।৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ।।৫

বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) জ্ঞানং (জ্ঞান) অসংমোহঃ (মোহহীনতা) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সত্যং (সত্য বলা) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়াদির সংযম) শমঃ (অন্তঃকরণ-সংযম) সুখং (আনন্দ বা আহ্লাদ) দুঃখং (দুঃখ) ভবঃ (উৎপত্তি) অভাবঃ (বিনাশ) ভয়ম্ (ত্রাস) অভয়ম্ চ (এবং অভয়) অহিংসা (পরপীড়ন না করা) সমতা চ (এবং রাগদ্বেষাদিরাহিত্য-রূপ সাম্যভাব) তুষ্টিঃ (দৈববশে প্রাপ্তিতে সন্তোষ) তপঃ (ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক কৃচ্ছ্র সাধন) দানম্ (ন্যায়ভাবে অর্জিত ধনাদি-দান) যশঃ (সৎকীর্তি) অযশঃ (দুষ্কীর্তি) এতে (এসব) ভূতানাং (প্রাণিগণের) পৃথগ্‌বিধাঃ (স্বকর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)। ৪-৫

বুদ্ধি (সূক্ষ্মার্থ বিচারের ক্ষমতা), জ্ঞান (আত্ম-অনাত্ম বিচার), অসংমোহ (মোহহীনতা), ক্ষমা, সত্য, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম), শম (চিত্তসংযম), সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, রাগদ্বেষাদি-রাহিত্যহেতু সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপঃ (ইন্দ্রিয় সংযম, কৃচ্ছ্রসাধন), উপার্জিত ধনাদি দান, সৎকীর্তি, অকীর্তি—প্রাণিগণের এসব নানাবিধ ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ভগবান বলছেন, ভালো, মন্দ—মানুষের সবকিছু ভাবের উৎপত্তি হলো সেই এক ব্রহ্ম থেকে। ভগবান যে শুধু লোকসমূহের স্রষ্টা এবং প্রভু তা নয়, মানুষের চিত্তে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, যে-সকল ভাব দ্বারা প্রণোদিত হয়ে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, যাদের দ্বারা চালিত হয়ে সে সাংসারিক জীবন যাপন করে. সেই সমস্ত ভাবই ভগবান থেকে সৃষ্ট। বেদান্ত বলে না যে, ভালো যা-কিছু তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, আর যা-কিছু মন্দ তা এসেছে শয়তানের কাছ থেকে। সবকিছুর উৎস সেই এক এবং অসীম ব্রহ্ম।

এখানে ভগবান কতকগুলি ভাবের উল্লেখ করেছেন—বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের শক্তি যার দ্বারা নিঃসংশয়রূপে সূক্ষ্মার্থ বুঝবার ক্ষমতা হয়। আত্ম ও অনাত্ম বস্তু বিচারপূর্বক বোধের নাম জ্ঞান। পরা ও অপরা জ্ঞান। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হলো পরা জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। মোহহীনতা ও ইষ্ট-অনিষ্ট ফল বিচারে স্থিরভাব। ক্ষমা—দণ্ড দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও

অন্তঃকরণের যে বুদ্ধি ঐ কাজ হতে নিবৃত্ত করে। সত্য—অন্তঃকরণের যে বৃত্তি দ্বারা পদার্থের স্বরূপ নির্ধারিত হয়, চৈতন্যই যে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ, সেই চৈতন্যই নিত্য সত্য। বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে নিবৃত্ত করবার শক্তিই হলো দম। অন্তঃকরণ বা চিত্তের সংযমকে শম বলে। মানুষের চিত্ত যখন আনন্দ লাভ করে এবং যা ধর্ম হতে উৎপন্ন তার নাম সুখ। যা অধর্ম হতে উৎপন্ন এবং জীবের বিবিধ পরিতাপের কারণ, তা দুঃখ। উৎপত্তির নাম ভব , অসত্তার নাম অভাব। ত্রাসের নাম ভয়, ত্রাসহীনের নাম অভয়। স্থাবর-জঙ্গমাদি কোনও জীবকে দুঃখ না দেওয়া অর্থাৎ সবার প্রতি ভালবাসাই অহিংসা। ইষ্ট-অনিষ্ট, রাগ-দ্বেষ শূন্যতার নাম সমতা। ধর্মপথে প্রাপ্ত বস্তুর লাভেই তৃপ্তি বা তুষ্টি। শাস্ত্রমতে কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনার নাম তপঃ। সঠিক দেশকালে সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্বক বস্তুপ্রদানে তৃপ্তি দেওয়াই দান। ধর্মাদি কর্মে প্রশংসার নাম যশঃ। অধর্ম কর্মের জন্য লোক-অপবাদের নাম অযশঃ। এইরূপ সমস্ত বৃত্তিরই উৎপাদনের মূলাধার একমাত্র ভগবান। বস্তুত তাঁর থেকেই সমস্ত উৎপন্ন হয়েছে। একটি সত্তাই বহু হয়েছে। বেদান্ত কখনও দুটি অনন্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জগতে বহুর প্রকাশ সেই এক থেকেই হয়েছে।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ।। ৬

সপ্ত (সাত) মহর্ষয়ঃ (মহর্ষিগণ) পূর্বে চত্বারঃ (পূর্ববর্তী চারজন) তথা মনবঃ (এবং চতুর্দশ মনু) মদ্ভাবাঃ (আমার শক্তিসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (হিরণ্যগর্ভাত্মক আমার সংকল্পজাত) লোকে (এ জগতে) যেষাম্ (যাঁদের হতে) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (স্থাবরজঙ্গমাদি প্রাণিগণ) (সৃষ্ট হয়েছে)।৬

ভৃগু প্রভৃতি সপ্তমহর্ষি, তাঁদের পূর্ববর্তী সনকাদি চারজন এবং চতুর্দশ মনু—এঁরা সকলেই আমার সংকল্পজাত এবং জ্ঞানৈশ্বর্যাদি-প্রভাবসম্পন্ন। জগতের সকল প্রজাই এঁদের থেকে উৎপন্ন।

সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। এঁদের পূর্বে উদ্ভূত মহর্ষি চতুষ্টয়—সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দ এবং চতুর্দশ মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি —এঁরা মানবজাতির আদিপুরুষ। কেবল সাধারণ জীব-সকলই যে ভগবানের বিভূতি হতে উৎপন্ন হয়েছে তা নয়। প্রজাসকলের সৃষ্টিকর্তা চতুর্দশ মনু, সপ্ত ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ মহর্ষি এঁদের সকলেরই আদি ভগবান। এঁদেরই পুত্র-পৌত্রাদি এবং শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা মানবকুল বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁরা ভগবানের মনঃসংকল্পজাত এবং ভগবানের চিরন্তন বিভূতি। এঁদের মধ্য দিয়েই মানবকুলের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধিসাধন হয়েছে।

সমগ্র মানবকুলের আদি এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ বলে এঁরা ভগবানের বিশেষ বিভূতি। তাঁরা ভগবানের সঙ্কল্পজাত, তাঁর মনের সৃষ্টি। ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবান নারায়ণের মনের প্রকাশ। ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন। তারপর ব্রহ্মা থেকে জন্মালেন চার শ্রেষ্ঠ কুমার। তারপর ঋষিগণ এবং মনুগণ। তাঁদের থেকে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে জগতে মানবের সৃষ্টি হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে সৃষ্টির প্রথমে এক বিশুদ্ধ চৈতন্য ছিল। তাতে কোনও বৈচিত্র ছিল না। পরে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে স্থূলরূপে প্রকাশিত হয়। যখন আবার জগৎ গুটিয়ে নেবার সময় আসবে, তখন ক্রমটি উলটে যাবে। স্থূল ক্রমশ গিয়ে মিশবে সূক্ষ্মে, পরে সূক্ষ্ম থেকে অব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ একত্বে মিলিয়ে যাবে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।। ৭

যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) অবিকম্পেন (অবিচলিত) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞান বা সম্যগ্‌দর্শন-দ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন) অত্র (এতে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই)।৭

যিনি আমার এই বিভূতি অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব এবং যোগৈশ্বর্য যথাযথ জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে জ্ঞানসমাধি যোগের দ্বারা আমাতেই যুক্ত হন—এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পূর্বে বর্ণিত ভগবানের ঐ বিভূতি এবং যোগ যিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন তিনি ভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হন। অবিকম্পেন যোগেন—অবিচলিত যোগ, যা থেকে কখনোই চ্যুত হন না। স্থির ও দৃঢ়জীবন। কারণ তাঁর নিশ্চিত ও দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয় যে, বিশ্বের সমূহ প্রকাশের পেছনে স্বয়ং ভগবান এবং তিনিই জীবের অন্তরে থেকে তাকে নানাভাবে চালনা করছেন। অজ্ঞানী মানুষের মতো তিনি জাগতিক বস্তুসমূহকে পৃথকভাবে দেখেন না। তিনি সকলের মধ্যে একই আত্মার বিকাশ দেখতে পান। তিনি তাঁর আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে এক অনুভব করেন। এই যোগ যতই গভীর হয় তিনি ততই ভগবানের প্রকৃতি বা দৈবীভাব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তিনি দেবমানবে রূপান্তরিত হন। এই ভাব প্রাপ্ত হলে মুক্তপুরুষ যে- অবস্থায় থাকুন না কেন, যে-কর্মই করুন না কেন ভগবানের সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় যোগ স্থাপিত হয় তা থেকে তিনি চ্যুত বা বিচলিত হন না। যেহেতু এই যোগ সম্যগদর্শন এবং আত্মানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তা হতে বিচ্যুতির কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।। ৮

অহং (আমি) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তিস্থান) মত্তঃ (আমা হতে) সর্বং (সমস্ত) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ইতি মত্বা (এ তত্ত্ব জেনে) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হয়ে) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন)।৮

আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে—এই তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে জেনে জ্ঞানিগণ প্রেমপূর্বক আমার আরাধনা করে থাকেন।

ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ভগবানেরই প্রেরণাতেই লোকের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং চন্দ্র-সূর্যাদির গতিবিধি চালিত হচ্ছে। অর্থাৎ তিনিই সর্বময় কর্তা—এইরূপ যাঁর স্থির বিশ্বাস, তিনিই প্রীতিযুক্ত হয়ে মনের আনন্দে ভগবানের ভজনা করে থাকেন। জগতে যা-কিছু ভাব সবই তাঁর অনন্ত সত্তা হতে উদ্ভূত এবং জগতে যা- কিছু কর্মপ্রচেষ্টা দেখা যায় সবকিছুর প্রবর্তক ভগবান। এই তত্ত্ব যাঁরা সম্যকরূপে বুঝতে পারেন, সেসব জ্ঞানিগণ ভক্তি ও প্রেমে আপ্লুত হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। আসল কথা ভগবানকে ভালবাসতে হলে, তাঁকে ভক্তি করতে হলে, তাঁর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। তিনিই একমাত্র প্রভু, তিনি আমাদের পালনকর্তা। আমাদের হৃদয়ের প্রভুও তিনি এবং হৃদয়ের সকল ভাবসমূহ তাঁর থেকে জাত। তিনিই আমাদের হৃদয়ে সর্বদা উপস্থিত থেকে আমাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করছেন। এরূপ ভগবানের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মালে প্রতি চিন্তায়, প্রতি কর্মে ও প্রতি দৃশ্যে ভক্ত তাঁরই সত্তা অনুভব করেন। ভক্তের হৃদয় তখন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, প্রীতিভরে তাঁর সমগ্র হৃদয় ভগবানের চরণে নত হয়ে যায়, তিনি অনন্যমনা হয়ে পরম প্রভু, পরম সুহৃদ ভগবানের ভজনায় রত হন। এরূপ ব্যক্তিরা পরমজ্ঞানী ও ভক্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরূপ মানবিক ধর্মের কথা বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও এইরকম ছিলেন। তাঁর হৃদয়বত্তা, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের দুঃখকষ্টে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমান যুগে আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণও এই আনন্দের ধর্মই আমাদের উপহার দিয়েছেন। এঁরা মানুষকে ভালবাসতে শেখান এবং অন্যের ভালবাসা গ্রহণ করতেও শেখান। আমাদের শিক্ষা দেন, আমাদের চারপাশে প্রকৃতিরূপে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রকাশ। তাঁদের সেবা করাই ঈশ্বরের আরাধনা বা ভজনা। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই প্রকৃত ধর্ম। ভগবান আমাদের জগতে সকল প্রকাশিত বস্তুর মধ্যে তাঁকে দর্শন ও সেবা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তিনি সেইরূপ জ্ঞানী মানুষদের কথা বলছেন যাঁদের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে পরিপূর্ণ। তাঁরা শুষ্ক নন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, যে ধর্ম হৃদয়কে শুষ্ক করে তা ধর্মই নয়। ধর্ম মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে, হৃদয়কে প্রেম, ভালবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, আবেগ-অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। মস্তিষ্কের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হৃদয়ের বিকাশ।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ।। ৯

মচ্চিত্তাঃ (আমাতেই নিবিষ্টচিত্ত) মদ্গতপ্রাণাঃ (মদ্গতজীবন) মাং (আমার বিষয়) পরস্পরম্ (পরস্পরকে) বোধয়ন্তঃ (বুঝিয়ে) নিত্যং চ (ও সর্বদা) কথয়ন্তঃ (কীর্তন করে) তুষ্যন্তি চ (তুষ্ট হন) রমন্তি চ (আবার আনন্দও লাভ করেন)।৯

যাঁদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে আমাতেই নিবিষ্ট ও সমাহিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার প্রসঙ্গ ও গুণকীর্তনাদি করে পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করেন। তাঁদের আর কোনও অভাব থাকে না, তাঁরা (সংসারে থেকেও) পরমানন্দ-সম্ভোগ করেন।

ভগবান ব্যতীত যাঁদের মন অন্য কোনও বিষয়ে ধাবিত হয় না, যাঁদের চক্ষু-কর্ণ ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না, যাঁরা ভগবান ভিন্ন আর কোনও বিষয়—চান না এইরূপ ব্যক্তিরাই প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত। তাঁরা কোনওপ্রকার বিষয়ভোগে আনন্দ পান না। ভগবানের চিন্তায়, ভগবানের নামগুণ লীলাকীর্তনে, ভাগবত কর্ম সম্পাদনেই তাঁরা পরমানন্দ অনুভব করেন। ভগবানেই তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকে, ভগবানকে ছেড়ে তাঁরা ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকতে চান না। সমগ্র জীবন তাঁরা ভগবানের পদেই উৎসর্গ করেন। জগতে সকল জীবের সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা স্থাপন করেন। তাঁরা নিজের সুখের জন্য লালায়িত হন না। অপরের সুখে সুখী এবং অপরের দুঃখে দুঃখী। এইরূপ ভগবৎপ্রাণ জ্ঞানী ভক্তগণ সমান সমান ব্যক্তিতে এবং গুরু-শিষ্যে মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভগবানের রূপ গুণলীলা সম্পর্কে আলাপ করে পরমানন্দ অনুভব করে থাকেন । ভগবৎভক্তগণ পরস্পরের আলাপে এতই বিমুগ্ধ হন ও আনন্দ অনুভব করেন যে, অন্য কোনও সুখের জন্য লালায়িত হন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের চিত্রটি শ্রীম সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করে মাস্টার মশায়ের মনে হল, যেন সাক্ষাৎ শুকদেব উপস্থিত হয়ে ভগবানের নামগুণকীর্তন করছেন এবং সেখানে সকল মুনি-ঋষি, সর্ব তীর্থের সমাগম হয়েছে। যেন নতুন করে আবার ভগবানের লীলা ও মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতকথা সকলে পান করছেন। আবার মাস্টারমশায়ের মনে দ্বিতীয় যে ছবিটি ভেসে উঠল তাতে তিনি দেখলেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তসঙ্গে যেমন ঈশ্বরীয় কথা বলছেন, ঠিক সেইরূপ পুরীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অন্তরঙ্গ রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসে উচ্চ ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন অথবা ভগবানের নামগুণকীর্তনে মত্ত হয়ে নাচছেন বা ভাবসমাধিতে ডুবে যাচ্ছেন। 'পাণ্ডবগীতা'-তে একটি মন্ত্র আছে সেখানে এই রূপটি ব্যাখ্যা করছেনঃ 'নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্। যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ।।' ভগবানকে হৃদয়ে অনুভব করলে এইরকম অবস্থা হয়। তাঁদের জীবন নিত্য উৎসবে

পরিণত হয়। সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধি তাঁদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রকটিত হয়। সকল শুভ এবং মঙ্গলের আধার সেই হরি তাঁদের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। তখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দময় হয়ে যায়, জীবন আনন্দের হাট হয়ে উঠে। ধর্ম মানুষকে এইভাবে রূপান্তরিত করে। বেদান্ত শিক্ষা দেয় মানুষ অমৃতের সন্তান, মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে বিকশিত করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।।১০

সততযুক্তানাং (আমাতে সতত যুক্তচিত্ত) প্রীতি-পূর্বকম্ (ভক্তিপূর্বক) ভজতাং (ভজনকারী) তেষাম্ (তাঁদের) তম্ (সেই) বুদ্ধি-যোগম্ (মদ্‌বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান) দদামি (প্রদান করি) যেন (যে বুদ্ধিদ্বারা) তে (তাঁরা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হন)।১০

যাঁরা আমাতে সতত যুক্তচিত্ত ও নিবিষ্ট হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁদের আমি মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করি সেই জ্ঞান দ্বারা তাঁরা আমাকে পরমাত্মারূপে লাভ করেন।

ভগবান একমাত্র ভালবাসা ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হন। যেখানে এই প্রেমাভক্তি, সেখানেই ভগবান বাঁধা পড়ে থাকেন। ভগবানকে কোনও নাম, ভাষা দিয়ে ধরা যায় না। তাঁকে ধরা যায় ভালবাসা দিয়ে। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান বলছেন, 'বশে কুর্বন্তি মাম্ ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা'—সতী-সাধ্বী নারী যেমন তার ভালবাসা দিয়ে স্বামীকে বশ করে রাখে, ভক্ত তেমনি তার ভক্তির সাহায্যে ভগবানকে বশ করে রাখে। ভগবান নিজেই বলছেন, 'অহং ভক্তপরাধীনঃ'—আমি ভক্তের অধীন। ভক্তের কাছে ভগবানের যেন কোন স্বাধীনতা নেই। যিনি চিরস্বতন্ত্র, স্বাধীন ঈশ্বর, তিনি বলছেন আমি স্বাধীন নই, ভক্তপরাধীন। তাই সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন বলছেন, 'সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে'। 'পুরে' অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে। সকলের হৃদয়শায়ী যে ঈশ্বর, তিনি ভক্তিরসের রসিক, ভক্তিরস আস্বাদ করতে তিনি ভালবাসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে এটাই দেখাচ্ছেন। ভালবাসা দিয়ে মাকে অর্থাৎ জগন্মাতাকে বেঁধে রেখেছেন। মা তাঁর কাছে বাঁধা পড়ে আছেন।

আমাতে যারা সতত যুক্ত হয়ে আছে আর আমাকে যারা প্রীতিপূর্বক ভজনা করে, আমি তাদের জ্ঞান দিই, যে জ্ঞানের দ্বারা তারা আমাকে লাভ করতে পারে। আসলে ভক্তি মানেই প্রেম। পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমই হল ভক্তি। প্রেমের প্রতি ঈশ্বর সর্বদাই দুর্বল। যেখানে প্রেম, যেখানে অনুরাগ, সেখানে তিনি ধরা দেন। সাধারণত ভগবান ভক্তকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু আবার এও দেখা যায় ভক্ত ভগবানকে আকর্ষণ করছে। কখনও ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ। আবার কখনও ভক্ত চুম্বক হন এবং ভগবান ছুঁচ

হন। ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈঠকখানা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হলে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। ভালবাসা যেন দড়ি। সেই দড়ি দিয়ে ভক্ত ভগবানকে বেঁধে রাখেন। শত-বিপদেও ভক্ত ভগবানকে ছাড়ে না। যত দুঃখ দাও, যত কঠোর হও, আমি তোমায় ধরে আছি। আমার সম্পদে-বিপদে, পরাজয়ে-পতনে—সব অবস্থায় আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। ভক্ত বলে, ভগবান তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ব না। চিরকাল তোমার চরণ ধরে থাকব।

তাই ভক্তি মানে জগৎবিমুখতা নয়—জগৎকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে গ্রহণ করা। আর ঈশ্বরবুদ্ধিতে যে জগৎকে দেখে, জগতের কল্যাণ সেই করতে পারে। কারণ তারই প্রকৃত শুদ্ধজ্ঞান হয়। শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান এক। ভগবান বলছেন, যাঁরা ভগবানের সঙ্গে সর্বদা একাত্ম হয়ে প্রেমের সঙ্গে তাঁর ভজনা করেন, ভগবান তাঁদেরকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন, মন-প্রাণ বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে অনন্ত ব্রহ্মসত্তাতে স্থাপন করেন, এবং সকল জীবে একই আত্মা বিরাজ করছেন জেনে জীবের কল্যাণে নিষ্কাম কর্ম করেন। ভগবানের কৃপায় ঐরূপ ভক্তের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাবের বিকাশ হলে, স্বভাবতই তাঁর ভিতর প্রেম, করুণা, সেবা ও আত্মোৎসর্গের ভাব জেগে ওঠে। একজন অধ্যাত্মজগতের মানুষ, স্বভাবপ্রেরণাবশেই সৎ, ধার্মিক, নীতিপরায়ণ এবং চরিত্রবান হয়ে ওঠেন। ভগবান বলছেন, তিনি কৃপা করে তাঁদেরকে 'বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন' অর্থাৎ সেইসব মানুষের মধ্যে পরা বা আত্ম-জ্ঞানের বিকাশ ঘটান। তাঁরা তখন আত্মবিদ বা ব্রহ্মবিদ হন। এইসব মানুষের প্রকৃতি সাধারণ মানুষের প্রকৃতি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁদের জীবন ও চারিত্রিক উৎকর্ষে জগৎ পবিত্র ও মধুময় হয়ে ওঠে। গায়ত্রী মন্ত্রে আমরা প্রার্থনা করি—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—সেই পরম 'ধী' বুদ্ধিলাভের পথে আমাদের চালনা করুন। এখানে ভগবান সেই পরম বুদ্ধিতে আমাদের ভূষিত করছেন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ।।১১

তেষাং (তাঁদের প্রতি) অনুকম্পার্থম্-এব (অনুগ্রহবশতই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাঁদের অন্তরের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হয়ে) ভাস্বতা (দীপ্তিমান) জ্ঞান-দীপেন (জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অবিদ্যা বা মোহজনিত) তমঃ (অজ্ঞান-অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)।১১

সেই ভক্তগণের প্রতি কৃপাপরবশ হয়েই তাদের অন্তঃকরণে আত্মসত্তার প্রকাশপূর্বক তাঁদের হৃদয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপ জ্বেলে দিয়ে অজ্ঞানতা-জনিত মোহান্ধকার সমূলে বিনষ্ট করি। অর্থাৎ ঐ ভক্তগণ আমার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান লাভ করে থাকে।

ঐসকল নিষ্ঠাবান ভক্তগণের প্রতি ভগবান অনুগ্রহার্থ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিতে ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার এবং ভ্রান্তি নাশ করেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তের যে, সকল ইচ্ছা পুরণ হয় সেই প্রসঙ্গে ভগবান বিশেষ করে বলেছেন। যে ভক্ত তাঁকে ব্যতীত আর কারও আরাধনা করেন না, তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর জন্মজন্মান্তরের কর্মবীজসংস্কার রূপ নষ্ট করে দেন। বাইরের কোনও বিষয় দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয় না। একমাত্র ভগবানই আত্মস্বরূপে সাধকের হৃদয়মধ্যে জ্ঞানালোকের বিকাশ ঘটান। ভগবান নিজেই অনুগ্রহ করে ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানদীপ জ্বেলে সাধককে দর্শন দেন। তিনি দয়া করে দেখা না দিলে কোনও বুদ্ধিতেই কেউ তাঁকে দেখতে পান না। ভক্তের হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট হলে তাঁর সকল সংশয় নাশ হয়, তিনি দেখতে পান পরমেশ্বরই এই জগতে সকল বস্তুরূপে প্রকাশমান। ভগবান এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও রক্ষাকর্তা এবং তিনিই আবার জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে তাঁদের চালনা করছেন। তিনি অনুভব করেন, যে আত্মা তাঁর অন্তরে আছেন, সেই এক আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান। তিনি আর অপর জীব থেকে নিজেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করেন না। তাঁর বুদ্ধি থেকে সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা দূর হয় এবং তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। ভগবান অনুগ্রহ করে এইরূপ শরণাগত ভক্তের সকল অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতা দূর করে তাঁর চিত্তকে জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ করে দেন।

অর্জুন উবাচ
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম ।।১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ।।১৩

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বললেন), ভবান্ (আপনি পরম ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম) পরং (শ্রেষ্ঠ) ধাম (আশ্রয়) পরমং (প্রকৃষ্টরূপে) পবিত্রং (পাবন) সর্বে (ভৃগু প্রভৃতি সকল) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) তথা (এবং) অসিতঃ (অসিত) দেবলঃ (দেবল) ব্যাসঃ (ব্যাস) চ (এবং) ত্বাম্ (আপনাকে) শাশ্বতং (সনাতন) পুরুষম্ (পুরুষ) দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ) আদি-দেবম্ (দেবগণেরও আদি) অজং (জন্মরহিত) বিভূম্ (সর্বব্যাপী) আহুঃ (বলে থাকেন) স্বয়ম্ এব চ (এবং আপনি নিজেও) মে ব্রবীষি (আমায় বলেছেন)।।১২-১৩

আপনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, আপনিই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতাবিধায়ক। ভৃগু-আদি সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস আপনাকে সনাতন পুরুষ ও দিব্য অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ আদিদেব, জন্মাদিরহিত এবং সর্বব্যাপী বিভু বলেছেন। আপনি স্বয়ং আমাকে তা-ই বলছেন।

ভগবান মানবশরীরে স্বয়ং অর্জুনের রথে সারথিরূপে যুদ্ধের জন্য উপবিষ্ট। তিনি উপদেশ দিয়ে অর্জুনকে অজ্ঞান অবিদ্যা থেকে জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন সেই পরম সত্য অর্জুনের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। অর্জুনের মন থেকে মোহ সন্দেহ দূর হয়েছে তাই তিনি ভগবানের স্তব ও প্রশংসা আরম্ভ করলেন। অর্জুন বললেন—তুমি উপাধিবর্জিত পরমপুরুষ। তুমিই নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ—উপাসনার অতীত পরব্রহ্ম। সমস্ত জগৎ তোমারই আশ্রিত। তুমি পবিত্র ও মঙ্গলস্বরূপ কারণ তুমি প্রকৃতির অতীত। হে কৃষ্ণ, তুমিই সেই বিশ্বাতীত অনাদি, নির্বিশেষ, পরম ব্রহ্ম। তুমিই জীবের পরমগতি, প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে মানুষ তোমাতেই চিরবিশ্রাম লাভ করে। মহর্ষি, দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মাগণও তোমাকে ঐরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অসিত, দেবল, ব্যাস, নারদ প্রভৃতি পরম জ্ঞানী ঋষিগণ তোমাকেই সকল দেবতার আদি, সর্বগত, সর্বব্যাপী, অজ, শাশ্বত পুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন এবং তুমি স্বয়ং তাই আমাকে বলেছ। ঋষিরা তোমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তুমিও সেকথা নিজেই স্বীকার করছ। অর্জুনের দৃঢ় প্রত্যয় হল যে, শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন সবই সত্য।

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ।।১৪

কেশব (হে কেশব) মাং (আমাকে) যৎ (যা কিছু) বদসি (বলছ) এতৎ সর্বং (এ সকলই) ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি) (যেহেতু) ভগবন্ (হে ভগবান), তে (তোমার) ব্যক্তিং (অভিব্যক্তি বা প্রভব, উৎপত্তি) দেবাঃ (দেবতারা) দানবাঃ চ (দানবগণও) ন বিদুঃ (জানেন না)।১৪

হে কেশব, তুমি যা কিছু আমায় বলেছ সে সবই সত্য বলে মনে করি। কারণ, হে ভগবান, কি দেবগণ, কি দানবগণ, কেউই তোমার প্রভব অর্থাৎ আবির্ভাবতত্ত্ব জানেন না।

এই বিশ্বে যা কিছু আছে সমস্তই ভগবানের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ভগবানের এই যে বিবিধরূপে বিশ্বে প্রকাশ তা দেবতা ও দানবগণও সম্যক অবগত নয়। ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হয়ে নিজ নিজ বুদ্ধি-বিচার দ্বারা কেউ তাঁর প্রভাব জানতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও মধুকৈটভাদি দানবগণ তাঁরই মায়ায় মোহিত হয়ে তাঁকে জেনেও জানতে পারেন না। অর্জুনের প্রতি দয়া করে যেমন তিনি নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন, তেমনই তিনি দয়া করে কাউকে না বুঝালে কেউ তাঁকে বুঝতে পারে না। কারণ দেবতা, দানব বা মানবের জ্ঞান অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ। কাজেই ভগবানের অনন্ত প্রকাশের বিষয় জানবেন কী প্রকারে? যা শ্রেষ্ঠ দেবতা ও শক্তিশালী দানবদের অজ্ঞেয় তা মানুষের পক্ষে জানা তো

একরূপ অসম্ভব। তাই অর্জুন বললেন, হে ভগবান, নারদাদি ঋষিগণ তোমার স্বরূপ সম্পর্কে যা ব্যাখ্যা করেছেন, যা এখন তুমি স্বয়ং বলছ তা সমস্তই আমি সত্য বলে মনে করি।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫

পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম), ভূতভাবন (হে ভূতোৎপাদক), ভূতেশ (হে ভূতসমূহের নিয়ন্তা) দেবদেব (হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা), জগৎপতে (হে জগৎপতি বা বিশ্বপালক), ত্বং (তুমি) স্বয়ম্ এব (নিজেই) আত্মনা (নিজের দ্বারা অর্থাৎ নিজেই) আত্মানং (নিজেকে) বেত্থ (জান)।১৫

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, অর্থাৎ দেবগণেরও প্রকাশক, হে জগৎপতে, তুমি স্বয়ংই নিজের জ্ঞানদ্বারা নিজের স্বরূপ জান। অর্থাৎ, তোমার স্বরূপসম্বন্ধে আর কেউই জানে না।

যিনি মায়া ও গুণের অতীত তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত ভূত যাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তিনি ভূতভাবন। যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ামক ও রক্ষক, তিনি ভূতেশ। যিনি ইন্দ্র ও আদিত্যাদি দেবতারও দেবতা, তিনি দেবদেব। যিনি সাধুহৃদয়ে শুভকর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, তিনি জগৎপতি। অর্জুন বললেন, হে পুরুষোত্তম, তোমাকে কেউ জানতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যমহিমা বোঝানোর জন্যই অর্জুন এই সব বিশেষণ ব্যবহার করছেন।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬

ত্বং (তুমি) যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতিদ্বারা) ইমান্ (এই পরিদৃশ্যমান) লোকান্ (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত হয়ে) তিষ্ঠসি (রয়েছ) (সে) দিব্যাঃ (অলৌকিক) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজ বিভূতিসমূহ) অশেষেণ হি (বিস্তৃতভাবে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে) বক্তুম্ (বলতে) (তুমি) অর্হসি (যোগ্য হও অর্থাৎ পার)।১৬

তুমি যে-সকল বিভূতি দ্বারা এই লোকসকল ব্যাপ্ত হয়ে আছ, সেসব অদ্ভুত আত্মবিভূতি তুমিই বিশেষভাবে বলতে পার।

অর্জুন এখন বুঝতে পারছেন যে, সৃষ্টিমধ্যে ভগবানের বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই সকল বিভূতির গূঢ় তত্ত্ব ভগবান ভিন্ন আর কেউই জানে না ও ব্যাখ্যা করতে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব ভগবান স্বয়ং ব্যতীত আর কেউই সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে জানে না। তাই অর্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানেরই মুখে শুনতে চাইলেন—হে ভগবান, আপনার যেসব

ঐশী বিভূতি বা দিব্য প্রকাশ আছে, সে- সম্পর্কে আমাকে খুলে বলুন, আপনার শ্রীমুখ থেকেই আমি তা শুনতে চাই। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াদির অতীত, জগতের অতীত এক তত্ত্ব। আবার তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই জগতে ভগবানের সেই দিব্য সত্তার প্রকাশগুলি অর্জুনের জিজ্ঞাস্য। যদিও ভক্ত ভগবানের দিব্য বিভূতির খুঁটিনাটি অত জানতে চান না, কারণ ভক্ত ভগবানকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে চান। এখানে ভক্ত ভগবানের বিচিত্র বিভূতি ও ব্যক্তরূপের বিষয়ে অবগত হয়ে তাঁর সাহচর্যও আস্বাদন করতে চান এবং প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান। তাই অর্জুন বলছেন, যে-যে মহিমার দ্বারা আপনি নিজেকে এই সমগ্র জগতে ব্যক্ত করছেন, সেই সব সবিস্তারে আমাকে বলুন।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।।১৭

যোগিন্ (হে যোগীন) অহং (আমি) কথং (কীভাবে) ত্বাং (তোমাকে) সদা (সর্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করে) বিদ্যাম্ (জানতে পারব?) ভগবন্ (হে ভগবন্) কেষু কেষু চ ভাবেষু (এবং কী কী বস্তুতে) ময়া (আমার দ্বারা) চিন্ত্যঃ (তুমি চিন্তনীয়) অসি (হবে)।

হে যোগীন, আমি তোমাকে সর্বদা কীভাবে বিভূতির মাধ্যমে চিন্তা করলে তোমার মাহাত্ম্য জানতে পারব? হে ভগবন্, আমি তোমাকে কোন কোন বস্তুতে তোমার সত্তার ধ্যান করব, তা আমায় বল।

ভগবান সমস্ত ঐশ্বর্যসম্পন্ন বলে অর্জুন তাঁকে 'যোগিন্' শব্দে সম্বোধন করছেন। ভগবানের বিভূতি অনন্ত। 'বিভূতি' শব্দের অর্থ বিশেষভাবে প্রকাশ হওয়া। ভগবান এই বিশ্বে বিশেষভাবে যা হয়েছেন তা তাঁর বিভূতি। এই বিশ্বে তিনি কত ভাবে কোথায় কীরূপে বিরাজ করেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাই অর্জুন নিজের কল্যাণের জন্য এবং ধ্যানোপযোগী আরাধ্য বিশেষ বিভূতির কথা ভগাবানকে জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান অনন্ত শক্তির আধার। এ-জগতে বিভিন্ন জাতি, বস্তু, ব্যক্তি, গুণ, ভাব, ক্রিয়া প্রভৃতি যা-কিছু আছে সমস্ত কিছুতেই তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। এই সকল বিকাশের মধ্য দিয়ে ভগবান আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। কোথাও কোথাও বিশেষরূপে তাঁর শক্তির অধিক প্রকাশ দেখা যায়। সেই সব বিশেষ ঐশ্বর্য ও বলবীর্যের প্রকাশগুলিই হলো ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি। ভগবানকে জানবার ও তাঁকে সর্বদা স্মরণ- মনন করবার পক্ষে এই-সকল বিভূতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাধারণ মানুষ ভগবানের এই সব ব্যক্ত বস্তুর চিন্তা সহজে করতে পারে।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।।১৮

জনার্দন (হে জনার্দন) আত্মনঃ (নিজের) যোগং (যোগ) বিভূতিং চ (ও বিভূতি)

বিস্তরেণ (সবিস্তারে) ভূয়ঃ (পুনরায়) কথয় (বল) হি (যেহেতু) অমৃতম্ (তোমার অমৃতোপম বাক্য) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করে) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তি) ন অস্তি (হচ্ছে না)।১৮

হে জনার্দন, তুমি পুনরায় তোমার অসীম যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি-সকল আমায় সবিস্তারে বল। কারণ, তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না—অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যাচ্ছে—আরও শোনবার ইচ্ছা হচ্ছে।

দয়া করে আমাকে পুনরায় তোমার বিভূতির কথা বল। এসব শুনেও আমার আশ মিটছে না। তোমার বিভূতির অনন্ত প্রকাশ। তোমার বিভূতিসকল কোনও নির্দিষ্ট দেশ, কাল বা পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এদের হিসাব বা সংখ্যা নির্দেশ করা অসম্ভব। এই বিভূতি জগৎময় ছড়িয়ে আছে। বিভূতি দ্বারা ভগবান এই জগৎ ব্যাপী আছেন। সর্বদা সকল স্থানেই ভগবানকে স্মরণ করা যায়। যেমন সূর্য বা চন্দ্র ভগবানের বিভূতি এবং সূর্য ও চন্দ্রের দিকে তাকালেই ভগবানের কথা স্মরণ হয়। তাঁর অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম করুণার ভাব আমাদের চিত্তে আপনা-হতেই জেগে ওঠে। তাই অর্জুন বলছেন, তোমার অমৃতময়ী, শাশ্বত সত্যের কথা শুনেও আমার আশা মিটছে না। আমি আরও শুনতে চাই। ভগবানের কথা শুনে কখনও আশা মেটে না, আরও প্রেরণা, উদ্দীপনা ও ভালবাসা মনে জেগে ওঠে। একমাত্র ভগবানের কথা আমাদের অন্তরাত্মার ক্ষুধা মেটায়। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা অর্থাৎ আত্মার অনির্বচনীয় স্পর্শ চায় ভক্ত—এটাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম।

শ্রীভগবানুবাচ
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ।।১৯

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন), হন্ত (হে) কুরুশ্রেষ্ঠ (কুরুশ্রেষ্ঠ) দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজ বিভূতিসকল) প্রাধান্যতঃ (প্রধানভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলব) হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (নানা বিভূতির) অন্তঃ (শেষ) নাস্তি (নেই)।১৯

শ্রীভগবান বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেশ, তাই হবে। আমার বিশেষ বিশেষ দিব্য-বিভূতিসকল তোমায় বলছি কারণ, আমার বিভূতির অন্ত নেই। কাজেই সে সব নিঃশেষে বলাও অসম্ভব।

ভগবানের অনন্ত বিভূতির কথা, বলা বা লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। সমস্ত বিভূতির কথা বিস্তার করে বলা অসম্ভব। অনন্ত শক্তির অনন্ত বিকাশ। শুধুমাত্র যেগুলি প্রধান সেগুলিই তোমায় বলব। প্রধান প্রধান কয়েকটি বিভূতির নমুনা তোমায় বলব। অর্জুন জগতের কল্যাণার্থ ভগবানের প্রধান প্রধান বিভূতির কথা শ্রবণ করতে উৎসুক হয়েছেন। ভগবানের এই দিব্য বিভূতির কথা শ্রবণ ও মনন করে বহু সাধক উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করেছেন। ঐসকল বিভূতি ধ্যানের সহায়ক।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ।।২০

গুড়াকেশ (হে জিতনিদ্র অর্জুন) (আমি) সর্বভূত-আশয়স্থিতঃ (সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা (পরমাত্মা) অহম্ এব (আমিই) ভূতানাম্ (সর্বভূতের) আদিঃ (উৎপত্তিস্থান) মধ্যম্ (স্থিতি) অন্তঃ চ (ও লয়স্থানস্বরূপ)।২০

হে গুড়াকেশ অর্জুন, আমি সর্বভূতের অন্তরে আনন্দঘন চৈতন্যরূপে বিরাজমান। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়স্থান স্বরূপ, অর্থাৎ আমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা।

ভগবান বিভূতি বর্ণনার পূর্বে তাঁর স্বরূপের কথা বললেন। তিনি এই বিশ্বের সকল জীবের হৃদয়ে আত্মারূপে লুকিয়ে আছেন। 'ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—-একটি সুতো যেমন বহু মুক্তোর মধ্যে প্রবেশ করে মালার মধ্যে তাদের ধরে রাখে, তেমনি ভগবান সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা। সর্বভূতের সর্বজীবের আত্মারূপে ভগবান তাদের হৃদয়ে গোপনভাবে অবস্থিত আছেন। ভগবানেরই শক্তির প্রকাশরূপে এদের জন্ম, স্থিতি ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের মধ্যে এদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। ভগবানের শক্তির প্রকাশ ছাড়া কোনও বস্তুর প্রকাশ সম্ভব নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্', 'যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্।'—সেই সত্য, জ্ঞান বা অনন্ত চৈতন্য—আমাদের হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন। তাঁকে খুঁজে উপলব্ধি করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আত্মা, আমিই সকল জীবের আদি, মধ্য এবং অন্ত। ভগবান থেকেই আমরা এসেছি, ভগবানেই আমাদের স্থিতি এবং অন্তিমে সেই ভগবানের কাছেই আমরা ফিরে যাব।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ।।২১

অহং (আমি) আদিত্যানাম্ (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণুনামক আদিত্য) জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্মানদের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিমান) রবিঃ (সূর্য) মরুতাম্ (ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচিনামক বায়ু) অস্মি (হই) নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্রমা)।২১

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে অংশুমান সূর্য, ঊনপঞ্চাশ মরুতের মধ্যে আমি মরীচি (বায়ু) আর নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা।

দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, ইন্দ্র,পূষা,পর্জ্জন্য সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু।

সপ্ত মরুৎ—আবহ, প্রবাহ, বিবর, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ ও পরিবহ। প্রকৃতপক্ষে বায়ুর সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ।

সমস্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে ভগবানের শক্তির বেশি প্রকাশ সেইসব প্রধান বিভূতির কথা এখানে উল্লেখ করছেন। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণু। অগ্নি আদি যত জ্যোতিষ্মান পদার্থ আছে তার মধ্যে আধারভূমি সূর্যই তিনি। মরুৎগণের মধ্যে মরীচিতে তাঁর বিভূতির বেশি প্রকাশ। অশ্বিনী আদি নক্ষত্ররাজির অধিপতি চন্দ্রমা তিনি। সমস্ত পদার্থই তাঁর বিভূতি হলেও যাতে বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, ভগবান সেগুলি উল্লেখ করছেন। পিতা কশ্যপ মুনি এবং মাতা অদিতির গর্ভে দেবতাগণের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে পঞ্চম সন্তান বিষ্ণু। এই বিষ্ণুই দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই জগতের রক্ষক ও পালনকর্তা। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে সূর্যই প্রধান। এই সূর্য জীবজগতের প্রাণধারণের হেতু। এদের মধ্যে মরীচি নামক বায়ু বেগ ও শীতলতায় শ্রেষ্ঠ। নক্ষত্রগণের মধ্যে স্নিগ্ধ কিরণ প্রদানকারক চন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রই ভগবানের বিভূতি।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ।। ২২

(আমি) বেদানাং (বেদসকলের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ হই) দেবানাং (দেবতাগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি (মনও হই) ভূতানাং চ (এবং ভূতগণের) চেতনা অস্মি (তাদের মধ্যে জ্ঞানশক্তিরূপে বিরাজ করি)। ২২

আর বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (সংকল্পবিকল্পাত্মক) মন; আর প্রাণিগণের মধ্যে চেতনাশক্তি।

বেদসমূহের মধ্যে সামবেদই ভগবানের বিভূতি। যদিও চার বেদই সমান পবিত্র ও পূজ্য, তথাপি সামবেদ সুরসংযোগে গ্রথিত হওয়াতে তা সর্বত্র গীত হয়ে থাকে। সঙ্গীতের প্রাধান্য বেশি। বেদসমূহের মধ্যে একমাত্র সামবেদেই সুরের প্রাধান্য। ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিও এই সামবেদ। দেবতাদের মধ্যে আমি হলাম বাসব, অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র। দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র শৌর্যে ও বীর্যে শ্রেষ্ঠ বলে তিনি ভগবানের বিভূতি। আমাদের দেহ-মন-বিশিষ্ট শরীরে মন এক অভিনব সত্তা। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের নিয়ামক বলে মনই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কোনও একটি বস্তুকে দেখে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন ওঠে—অন্তঃকরণের এই সংকল্প-বিকল্পাত্মিকা অবস্থাকেই মন বলে। অন্তঃকরণের চারটি ভাগ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। মনঃসংযোগ না হলে ইন্দ্রিয়ের কোনও অনুভূতি হয় না। মনই অপর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপগুলিকে সুসমঞ্জস করে তুলতে পারে। সকল জীবের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ চেতনশক্তি। চেতনশক্তিই জীবজগতের শক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চেতনার প্রকাশ মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানরূপে। চেতনার অভাব হলে কোনও শক্তিই কার্যকারী হয় না। এজন্য তা ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ।। ২৩

রুদ্রাণাং (একাদশ রুদ্রের মধ্যে) শঙ্করঃ (শঙ্কর) অস্মি (হই) যক্ষ-রক্ষসাম্ (যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে) বিত্ত-ঈশঃ (কুবের) বসূনাং চ (এবং অষ্টবসুর মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি (হই) শিখরিণাম্ চ (এবং পর্বতসমূহের মধ্যে) অহম্ (আমি) মেরুঃ (সুমেরুপর্বত)।২৩

আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে অগ্নি এবং পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরু-পর্বত।

একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, বহুরূপ, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, ত্র্যম্বক, হর, (মৎস্যপুরাণ, ৫ম অধ্যায়, পুরাণান্তরে নামভেদ আছে)।

অষ্টবসু—দক্ষকন্যা বসুর গর্ভজাত ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্করই শ্রেষ্ঠ। এইজন্য তিনি মহাদেব, ভক্তগণের মুক্তি দান করে থাকেন তাই ভগবানের বিভূতি। যক্ষ ও রক্ষদিগের মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি যক্ষাধিপ নামে পরিচিত এবং অপরিসীম ধনের অধিকারী ও প্রভাবশালী। এইজন্য কুবের ভগবানের বিভূতি। অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অগ্নিই ভগবানের বিভূতি। অগ্নিদেব সর্বশোধনকারী, জগতের উত্তাপবিধায়ক এবং অন্যতম দেবতারূপে পূজিত। সুমেরু পর্বত পরম রমণীয় শোভার আধার। এই গিরি অতি উচ্চ এবং কথিত স্বর্গলোক এই গিরিশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত এবং দেবগণের নিকেতন। পর্বতসমূহের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদির প্রধান আকরভূমি বলে সুমেরু শ্রেষ্ঠ এবং ভগবানের বিভূতি।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ।। ২৪

পার্থ (হে পার্থ) মাং (আমাকে) পুরোধসাম্ চ (এবং পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতিরূপে) বিদ্ধি (জানবে) অহং (আমি) সেনানীনাম্ (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্তিকেয়), সরসাম্ (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ (সমুদ্র) অস্মি (হই)।২৪

হে পার্থ, পুরোহিতগণের মধ্যে আমাকে মুখ্য বৃহস্পতি বলে জানবে। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্তিকেয়, আর জলাশয়-সকলের মধ্যে সমুদ্র।

বৃহস্পতি দেবতাগণের মধ্যে প্রধান। তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারী এবং তাঁর পরামর্শে দেবগণ যুদ্ধে অসুরগণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই কারণে তিনি পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পৌরোহিত্যে বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠ এবং ভগবানের বিভূতি। কার্তিকেয় মহাদেবের পুত্র, দেবতাগণের সেনাপতি। তিনি বিক্রমশালী এবং অসুর-নিধনকারী। তিনি দেবসেনাপতি ও সেনানীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই ভগবানের বিভূতি। সকল জলাশয়ের মধ্যে অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগরই শ্রেষ্ঠ। সমস্ত নদনদী এই সমুদ্রের মধ্যে জলরাশি বিসর্জন করে। এই সাগর ভগবানের বিভূতি।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ।। ২৫

অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) অস্মি (হই), গিরাম্ (শব্দসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর প্রণব) অস্মি (হই) যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ) স্থাবরাণাং (স্থাবর পদার্থের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়-পর্বত) অস্মি (হই)।২৫

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে আমি ব্রহ্মবাচক একাক্ষর ওঙ্কার, যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়।

মহর্ষিগণের মধ্যে অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন ভৃগুমুনি। তাঁর পদচিহ্ন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বক্ষঃস্থলে ধারণ করেছিলেন। এইজন্য ভৃগু ঋষির মধ্যে ভগবানের বিভূতি বেশি প্রকাশ। ওঁকারই সকল শব্দ ও বাক্য এবং মন্ত্রের উৎস। যত বাক্য ও শব্দ আছে তার মধ্যে ব্রহ্মবাচক একাক্ষরস্বরূপ ওঁকারই ভগবানের বিভূতি। অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যত প্রকার যজ্ঞ আছে তার মধ্যে জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। অন্যপ্রকার যজ্ঞে কিছু ত্রুটি থাকলে বা ব্যয়সাধ্য হলে জপযজ্ঞে কোনওপ্রকার হিংসা বা ত্রুটি নেই এবং সর্বসাধারণের উপযোগী। জপ সকলেই করতে পারে। জপের মহিমা অপার। তাই ভগবান বলছেন, সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ। জপযজ্ঞ—বারবার ঈশ্বরের নাম করা। তারপর সকল স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে বিশালতা, উচ্চতা প্রভৃতি কারণে হিমালয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গিরিরাজ নানা রত্নসম্পদ, বিবিধ বনস্পতি, পশুপক্ষী এবং বহু নদ-নদীর উৎস। এর শিখরদেশ চিরতুষারমণ্ডিত ও পরম সৌন্দর্যের আধার এবং দেব ও মানবের আশ্রয়স্থল। তাই হিমালয় পর্বত ভগবানের বিভূতি।

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ।। ২৬

(আমি) সর্ববৃক্ষাণাং (বৃক্ষসকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থবৃক্ষ) দেবর্ষীণাং চ (এবং

দেবর্ষিদের মধ্যে) নারদঃ (নারদ) গন্ধর্বাণাং (গন্ধর্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ) সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃমুনিঃ (কপিল নামক মুনি) ।। ২৬

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে কপিল মুনি।২৬

সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ। অশ্বত্থ বৃক্ষ বিশালাকার। ভারতবর্ষে অশ্বত্থ বৃক্ষকে পবিত্র বৃক্ষ হিসাবে পূজা করা হয়। এই বৃক্ষের শীতল ছায়া পথিকদের উপকার করে ও এর ফল পাখীদের খাদ্য। ভগবান বুদ্ধ এই বৃক্ষের নীচে জ্ঞানলাভ করেন তাই এই বৃক্ষের পবিত্রতা আরও বেড়ে যায় এবং এই বৃক্ষকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি হলাম নারদ ঋষি। ভক্তি ও জ্ঞানের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদই ভগবানের বিভূতি-স্বরূপ। গন্ধর্বগণ স্বর্গলোকের গায়করূপে প্রসিদ্ধ। এঁদের মধ্যে আবার চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে তিনি ভগবানের বিভূতিরূপে পূজিত হন।

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের আতিশয্যের দিক থেকে কপিল মুনি শ্রেষ্ঠ। দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানের জনকরূপে আমাদের সাহিত্যে কপিল মুনির স্থান অতি উচ্চে। তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ঋষি, পরম জ্ঞানী। বেদে বলা হয়েছে, কপিল যা-কিছু বলেন তাই পবিত্র। কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা। শ্রীমদ্ ভাগবতেরতৃতীয় স্কন্দে কপিলের উল্লেখ আছে, যিনি তাঁর জননী দেবহূতিকে উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন ঋষি ছিলেন।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ।। ২৭

অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাং (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈশ্রবা) গজেন্দ্রাণাং (হস্তিদের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) নরাণাং চ (এবং মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপং (রাজা) বিদ্ধি (জানবে)।২৭

আমাকে অশ্বগণের মধ্যে সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলে জানবে।

অমৃতের জন্য যখন সমুদ্রমন্থন করা হচ্ছিল, তখন দেবতা, দানব এবং মানুষ তাতে অংশ নেয়। সেই মন্থনক্রিয়ার ফলে সমুদ্রগর্ভ থেকে নানা জিনিস উঠে এসেছিল। তার মধ্যে যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ধন্বন্তরি ছিলেন, তেমনি ছিল উচ্চৈঃশ্রবা নামক ঘোড়াটিও। সর্ববিধ সুলক্ষণ ও পরম শোভার জন্য অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাতে ভগবানের বিভূতির প্রকাশ। তাকে অমৃতজাত বলে জানবে। দিব্যতেজ ও দেবরাজের বাহন হওয়ায় হস্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঐরাবতই ভগবানের বিভূতি। মনুষ্যগণকে ধর্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম হতে

নিবৃত্ত করবার একমাত্র নেতা ও শাসনকর্তা বলে রাজাই মানবগণের মধ্যে ভগবানের বিশেষ বিভূতি। একথা বলা হয় যে, প্রজারা যা-কিছু সৎকাজ করেন, ধ্যানধারণা করেন, আধ্যাত্মিক সাধনা করেন, তার ফলের কিছুটা রাজাও পেয়ে থাকেন, কারণ তিনি সমাজকে রক্ষা করেন, সমাজের আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বজায় রাখেন, যাতে তাঁর প্রজারা শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। তাই তিনি নরাধিপ অর্থাৎ রাজা।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ।।২৮

আয়ুধানাম্ (অস্ত্রসকলের মধ্যে) অহং বজ্রং (আমি বজ্র), ধেনূনাং (ধেনুসকলের অর্থাৎ গোজাতির মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (কামধেনু হই) (অহং) প্রজনঃ (প্রজা-উৎপাদক) কন্দর্পঃ (কাম) অস্মি (হই) সর্পাণাং চ (এবং সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (সর্পরাজ বাসুকি হই)।২৮

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি সন্তান-উৎপত্তিহেতু কামরূপ কন্দর্প আর সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি।

ভগবান বলছেন, অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র। দেবগণের প্রার্থনায় বৃত্রাসুর-বধের নিমিত্ত দধীচি মুনি নিজ শরীর ছিন্ন করে যে অস্থি প্রদান করেছিলেন তার দ্বারা বজ্র নামক মহাস্ত্র নির্মিত হয়। এই অস্ত্রদ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রাসুর ও অপরাপর অনেক অসুরকে বধ করেছিলেন। এই হেতু সকল অস্ত্রের মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনুর নাম সুরভি। এই ধেনুর নিকট যা প্রার্থনা করা যায় তাই পাওয়া যায় বলে এর নাম কামধেনু। সমুদ্র মন্থনের সময় এই গাভীটির উৎপত্তি হয়েছিল। রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রম থেকে এটিকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে চাইলে সুরভির শরীর থেকে বহু সৈন্য সৃষ্টি হয়ে রাজা বিশ্বমিত্রকে পরাজিত করে। এই সব অলৌকিক শক্তি ও পার্থিব জগতে সকল প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতাবশত কামধেনু অনান্য গাভীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কাম-চেষ্টা আছে, তার মধ্যে পুত্রোৎপাদন করবার জন্য কন্দর্পবৃত্তিই ভগবানের বিভূতি। এই কন্দর্পবৃত্তির দ্বারা জীবকুলের রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই কন্দর্পের অভাবে কুলের ধ্বংস অনিবার্য। আবার সকল সর্পগণের মধ্যে তাদের রাজা বাসুকি শ্রেষ্ঠ। এই বাসুকিই স্বীয় মস্তকের উপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। এই কারণে ইনি সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভগবানের বিভূতি।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ।।২৯

নাগানাং (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ (নাগরাজ অনন্ত) অস্মি (হই) যাদসাম্ চ (এবং

জলচরগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) বরুণঃ (জলদেবতা বরুণ) পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অর্যমা (পিতৃরাজ অর্যমা) অস্মি (হই) সংযমতাম্ চ (এবং নিয়ামকগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) যমঃ (যম)।২৯

নাগগণের মধ্যে আমি নাগরাজ অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং নিয়ামকদের মধ্যে আমি (মৃত্যুপতি) যম।

বিষধর সর্পজাতি হতে বিষহীন নাগজাতি ভিন্ন। শেষনাগ বা অনন্তদেব নামক নাগরাজই ভগবানের বিভূতি। প্রলয়ান্তে লক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হয়ে ভগবান নারায়ণশেষ শয্যায় শয়ন করেন এবং অনন্তদেব বহু ফণা বিস্তারপূর্বক তাঁকে আবৃত করে রাখেন। নাগকুলের মধ্যে অনন্তদেব শ্রেষ্ঠ। সমুদ্রের মধ্যে বহু জলচর জন্তু বাস করে। ঐসকল জলজন্তুর নাম যাদস্। বরুণদেব ঐ যাদোগণের অধিপতি। তিনি দেবতা বলে পূজিত হয়ে থাকেন। অর্যমা পিতৃদেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ সংযমকারী যত সমর্থ পুরুষ আছেন, তাঁদের মধ্যে যমরাজ শ্রেষ্ঠ। যাঁরা সংযত করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসন করেন, তাঁদের মধ্যে আমি মৃত্যুর দেবতা যম। যম, কাল, মৃত্যু-এসব শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সবকিছুই কালের অধীন। কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। তাই বলা হচ্ছে, সকল নিয়ামকের মধ্যে আমি হলাম সেই যম। তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে ধর্মাধর্মের বিচার করেন তেমন কেউ করতে পারে না। যমের পুরস্কার যেমন মহান, দণ্ডও তেমন ভীষণ।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ।। ৩০

অহম্ (আমি) দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (প্রহ্লাদ হই) কলয়তাম্ চ (ও গণনাকারিগণের মধ্যে) কালঃ (কাল) মৃগাণাং চ (এবং পশুগণের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (পশুরাজ সিংহ) পক্ষিণাম্ চ (এবং পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (বিনতানন্দন গরুড়)।৩০

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি পশুরাজ সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি বিনতানন্দন গরুড়।

মানুষ, অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত। দৈত্যগণের মধ্যে সাত্ত্বিক স্বভাব ও ভক্তিভাবের জন্য প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু ছিলেন যেমন দুর্দান্ত ও বলশালী তেমনি হরিবিদ্বেষী। পুত্র প্রহ্লাদ কিন্তু পরম হরিভক্ত। এই কারণে তাঁকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। তথাপি তিনি হরিনাম ত্যাগ করেননি। ভগবান হরি শেষে নরসিংহ-মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। প্রহ্লাদ দৈত্যকুল-

শিরোমণি, তাঁর জন্মে দৈত্যকুল ধন্য হয়েছিল।

নিয়ন্ত্রক ও পরিমাপক বস্তুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কাল। বাস্তবিক সময়ের দ্বারা সব মাপা হয়। কাল হচ্ছে বিনাশকারী ও গ্রাসকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালের যেমন সর্বগ্রাসী ক্ষমতা এরকম আর কারও নেই। তাই কালকে বিনাশকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। পশুদের মধ্যে বল, বিক্রম ও গম্ভীর স্বভাবের জন্য সিংহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। পক্ষীদের মধ্যে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে যাতায়াতের সামর্থ্য আছে বলে গরুড়ই শ্রেষ্ঠ। পক্ষীদের মধ্যে গরুড় অমিতবলশালী ও বিষ্ণুর বাহন বলে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় পরম্পরায় গরুড় অতি শ্রদ্ধার পাত্র। তাই এঁরা ভগবানের বিভূতি।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ।।৩১

(অহং-আমি) পবতাম্ (বেগবানগণের মধ্যে) পবনঃ (বায়ু) শস্ত্র-ভৃতাম্ (শস্ত্রধারীদের মধ্যে) অহম্ (আমি) রামঃ (দাশরথি) ঝষাণাম্ (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (মকর হই) স্রোতসাম্ চ (এবং নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী (জাহ্নবী- গঙ্গা) অস্মি (হই)।৩১

বেগগামিগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, নদীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী।

এই সংসারে পবিত্রকর যেসকল বস্তু আছে তন্মধ্যে পবনদেবই শ্রেষ্ঠ। জীবগণ শ্বাসপ্রশ্বাসযোগে বায়ু সেবন করে বেঁচে আছে। অতিবেগে ভ্রমণকারী পদার্থপুঞ্জের মধ্যে বিশালত্ব ও বেগাতিশয্য প্রযুক্ত বায়ুই ভগবানের বিভূতি। যুদ্ধকুশল শস্ত্রধারিগণের মধ্যেও রাক্ষসকুল নিধনকারী বীরগণের মধ্যে দশরথ-তনয় রামচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি রাবণকে বধ করে ভূমণ্ডলকে রাক্ষসের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। এই কারণে তিনি ভগবানের বিভূতি। অতি তেজস্বিতা এবং গঙ্গাদেবীর বাহন মৎস্যগণের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ। নদীসকলের মধ্যে জাহ্নবী সর্বশ্রেষ্ঠা। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ও সর্বপাতকসংহন্ত্রী গঙ্গা অতি পবিত্র। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা স্বর্গ হতে আনীত হয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র তীরে মুনিদিগের বাস এবং বহু তীর্থস্থান সেখানে অবস্থিত তাই এই গঙ্গা ভগবানের বিভূতি।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ।। ৩২

অর্জুন (হে অর্জুন) সর্গাণাম্ (সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে) আদিঃ (উৎপত্তি) অন্তঃ (প্রলয়) মধ্যম্ চ (ও স্থিতিহেতু) অহম্ এব (আমিই) বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা) প্রবদতাম্ চ (এবং তার্কিকগণের বাদ, বিতণ্ডা ও জল্পের মধ্যে)

বাদঃ (আমি বাদ)।৩২

হে অর্জুন, আমি আকাশাদি সৃষ্ট পদার্থসমূহের আদি, অন্ত ও মধ্য, অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য যে তর্ক বা আলোচনা।

ভগবান সমস্ত সৃষ্ট চেতন ও অচেতন পদার্থের আদি অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা এবং তিনিই তার অন্ত অর্থাৎ সংহারকর্তা। সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ—এই তিনটি অবস্থা আছে। এই সকল অবস্থাই ভগবানের প্রকাশস্বরূপ।

শাস্ত্রকারগণ চতুর্দশ বিদ্যার উল্লেখ করেছেন। ছয় বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত ও ছন্দ। চার বেদ এবং মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এই চতুর্দশ বিদ্যা। এইসকল বিদ্যা বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রখর করে, ধর্মপ্রবৃত্তি বর্ধিত করে। এগুলির দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সাধিত হয়। কিন্তু যে- বিদ্যাদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তাই অধ্যাত্মবিদ্যা। এই বিদ্যা সকল-বিদ্যাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহার দ্বারা চরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয়। অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা জীবের ব্রহ্মবুদ্ধি উদয় হয়, তাই এই বিদ্যা ভগবানের বিভূতি।

জগতে বহুরকম বিজ্ঞান আছে। যে জ্ঞান নিজেকে জানতে সাহায্য করে তাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বলা হয়। অধ্যাত্মবিদ্যা বলতে আত্মজ্ঞানলাভের বিজ্ঞানকেই বোঝায়। এই দেহ, ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন ইন্দ্রিয় এবং মনের পিছনে এক অনন্ত আত্মাকে—যা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং অনন্ত। এই হল পরম সত্য। সেই সত্যের উপর ভিত্তি করেই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অধ্যাত্মবিদ্যা ভগবান স্বয়ং। উপনিষদে ঋষিরা এই সত্য আবিষ্কার করে প্রচার করেছেন। একটিমাত্র বস্তুই সনাতন বা শাশ্বত এবং তা হল অনন্ত আত্মা। বাকি সবকিছুই পরিবর্তনশীল। এই জগৎও। সূর্য, তারকা, যা কিছু, সবই কালের বশীভূত, পরিবর্তনের শিকার। কিন্তু আত্মা শাশ্বত, সনাতন ও অপরিবর্তনশীল। এই আত্মাকে জানলে সব বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব। সকল জ্ঞানের উৎস আত্মজ্ঞান।

তর্কশাস্ত্রে তিন প্রকার তর্ক আছে—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য যে তর্ক তার নাম বাদ। বাদ—এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য সত্যকে খুঁজে বার করা। অতএব, সত্যান্বেষণের মনোভাব নিয়ে শান্ত, ধীর-স্থির হয়ে, আপনি আলোচনা করবেন—কখনোই মাথা গরম করবেন না। এই প্রকার সত্যান্বেষী, যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় বাদ। উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে এই বাদ-এরই প্রাধান্য। দ্বিতীয় হল জল্প—আলোচনার উদ্দেশ্যটাই আপনি ভুলে যাবেন এবং সত্যে উপনীত হবার সৎ- প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করে যে-কোনও উপায়ে বিপক্ষকে পরাস্ত করতে হবে। আর বিতণ্ডায় প্রতিপক্ষের কোনও যুক্তি না শুনেই আপনি তাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করবেন। যাঁরা বিতণ্ডা করেন সত্যের প্রতি তাঁদের কোনও

আগ্রহই থাকে না। ভগবান বলছেন, তর্কাতর্কির যত পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে আমি হলাম প্রথমটি, অর্থাৎ বাদ। সত্যকে ধরে, সংসারের সুখ ও কল্যাণবিধানের লক্ষ্য সামনে রেখে আলাপ-আলোচনা করাই বাদ। ভগবান বাদ, কারণ সত্যস্থাপনই তাঁর লক্ষ্য।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ।।৩৩

(অহং-আমি) অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (অকার অর্থাৎ 'অ' হই), সামাসিকস্য চ (এবং সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস) অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ (ক্ষয়হীন) কালঃ (কাল) অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফলদাতা)।৩৩

বর্ণসমূহের মধ্যে আমি (আদ্য অক্ষর) অকার এবং সমাসসকলের মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস। আমি অক্ষয় কাল (অথবা কালের দেবতা পরমেশ্বর) এবং আমিই সর্বজগতের সমস্ত কর্মফলদাতৃগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা বা ঈশ্বর।

বর্ণমালা বা অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার শ্রেষ্ঠ, কারণ সেটি সকল বর্ণের প্রথম বর্ণ। শ্রুতি বলেন, 'অকারো বৈ সর্বা বাক্'—অর্থাৎ অকারই সকল বাক্স্বরূপ। তারপর অকার ভিন্ন কোনও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হতে পারে না। ওঁকারের প্রথম বর্ণ 'অ'। সংস্কৃতে 'অ'-ই প্রথম অক্ষর, যা থেকে অন্যান্য বর্ণের জন্ম। তাই 'অ' হল আদি অক্ষর এবং ভগবানের বিভূতি।

সমাসে পূর্বপদ বা উত্তর পদ, এদের একটির প্রাধান্য থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদই প্রধান, এজন্য সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস শ্রেষ্ঠ। তাই দ্বন্দ্ব সমাসে কোন পক্ষপাত থাকে না, সকল পদ গৃহীত হয়। তাদের প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে বলে তা ভগবানের বিভূতি।

ভগবান অক্ষয়, অনাদি ও অন্তহীন কাল। এই কালের গতি নিয়ত প্রবহমান তাই জগতিক সমস্ত ব্যাপার ঘটছে। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখ। সর্বত্রই তিনি বিদ্যমান। তিনি তাঁর সর্বব্যাপিত্ব হেতু সমস্ত ধারণ করে আছেন, সমস্ত বিধান করছেন। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক ও অবিচ্ছিন্ন স্থান-কাল পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্থানকে কালের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। স্থান-কাল একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বা প্রবাহ এবং অন্তহীন প্রবাহ। কালই সমস্ত বিশ্বকে আত্মসাৎ করে। কাল সকল ঘটনারই সাক্ষিস্বরূপ—এই জন্য তা ভগবানের বিভূতি। আবার দেবদেবীর উদ্দেশে কর্মানুষ্ঠান করলে তাঁরা ফলদান করেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় চতুর্বর্গ ফলদানে কারও সামর্থ্য নেই। এই জন্য তা ঈশ্বরের বিভূতি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ'—আমি আবার কর্মফলদাতা,

ধাতা, যাঁর দৃষ্টি সর্বতোমুখী।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ।।৩৪

অহম্ (আমি) সর্ব-হরঃ (সর্বসংহারকারী) মৃত্যুঃ (মৃত্যুস্বরূপ) ভবিষ্যতাম্ চ (এবং ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে) উদ্ভবঃ (অভ্যুদয় ও তৎপ্রাপ্তির কারণ) নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ (কীর্তি প্রভৃতি ধর্মের সপ্তপত্নীস্বরূপ) ।। ৩৪

আমি সর্বসংহারক মৃত্যু, ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে অভ্যুদয় বা উৎকর্ষের হেতু এবং নারীগণের মধ্যে শ্রী, বাক্, কীর্তি, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমারূপ (দৈবীসম্পদস্বরূপ) আমি।

সর্বহর মৃত্যুর প্রভাব বা অধিকার কেউ অতিক্রম করতে পারে না। প্রতিদিনই একটু একটু করে আমাদের মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু যখন চরম মৃত্যুর মুহূর্ত আসে তখন ভয়। মৃত্যু সর্বগ্রাসী। মৃত্যু এই জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান। মৃত্যু সর্বদাই সকলকে তাড়া করে চলেছে, গ্রাস করবার জন্য তাদের অনুসরণ করে চলেছে। একমাত্র আত্মাতে মৃত্যু পৌঁছাতে পারে না। বাকি সবকিছুই মৃত্যুর অধীন। একমাত্র আত্মাই কষ্ট ও মৃত্যু থেকে মুক্ত। ভগবানের বিভূতি মৃত্যু যা সব কিছুকে সংহার করে।

এই মৃত্যুর দ্বারা জগৎ রক্ষা হচ্ছে। একদিকে যেমন পুরাতনের ধ্বংস হচ্ছে, অতীত চলে যাচ্ছে, অপর দিকে যা ভবিষ্যতে কার্যকারী হবে সেই নূতনের আবির্ভাব হচ্ছে। উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। ঐশ্বর্যের উৎকর্ষরূপ উদ্ভবই পরম কল্যাণস্বরূপ। এইরূপে মৃত্যু ও উদ্ভব এই দুয়ের মধ্য দিয়ে জগচ্চক্র চলছে। এটি ভগবানের বিভূতি।

ধর্ম-প্রবৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবের মুক্তিমার্গে গতি হয়, এই জন্য তা-ও ভগবানের বিভূতি। ধর্মের দ্বারা পরম সৌভাগ্য লাভ হয়—যেমন, চতুর্দিকে যশ ও সুনাম অর্থাৎ কীর্তি লাভ হয়। শরীর ও মনে উজ্জ্বল শোভা বা কান্তি অর্থাৎ শ্রী লাভ। সর্বগুণসম্পন্ন সংস্কৃতবাণী বা মধুর কথা বাক্ লাভ। অপূর্ব স্মরণশক্তি লাভ। সহজে জ্ঞানের উপলব্ধি, আত্মবুদ্ধি বা মেধা লাভ হয়। ধৃতিঃ—প্রগাঢ় সহিষ্ণুতা ও দুঃখ-কষ্ট নিবৃত্ত করবার শক্তি লাভ। হর্ষ বা বিষাদে ধৈর্য ও ক্ষমা লাভ। ভগবান বলছেন, এই যে সব শ্রেষ্ঠ গুণ তা আমিই। ভগবান জগতের জড় ও চেতন সবকিছুকে যেমন আবৃত করে আছেন তেমনি সবকিছুর ভিতরেও প্রকাশিত আছেন।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ।।৩৫

অহম্ (আমি) সাম্নাং (সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে) বৃহৎসাম (মোক্ষপ্রতিপাদক সামবিশেষ), ছন্দসাম্ (ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী) তথা (এবং) মাসানাং (মাসসমূহের মধ্যে) অহম্ (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ মাস) ঋতূনাং (ঋতুসকলের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্তকাল)।৩৫

আমি সামবেদোক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসকলের মধ্যে গায়ত্রী, বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুসকলের মধ্যে পুষ্পময় বসন্তঋতু।

বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ। সামবেদের যে-সকল বিভাগ আছে তার মধ্যে আবার বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ। এই বিভাগে ইন্দ্রের স্তুতিরূপ গীতি আছে, সেই বৃহৎসাম ভগবানের বিভূতি। ছন্দোবদ্ধ ঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ। ঋগ্‌বেদ বৃহতী, জগতী, অনুষ্টুপ, গায়ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দ বেদের রয়েছে। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসমূহের মধ্যে গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। এই গায়ত্রীমন্ত্র ধারণ ও দীক্ষালাভ করে দ্বিজগণ ধর্মানুষ্ঠানের অধিকারী হন।

মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাস সকল মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ পূর্বকালে অগ্রহায়ণ মাস থেকে বৎসর গণনা আরম্ভ হত। মহাভারতের যুগে বছর শুরু হত মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস থেকে। আজও ভারতবর্ষে এই মাসকে অত্যন্ত পবিত্র মাস মনে করা হয়। ঋতূনাং কুসুমাকরঃ—ছয় ঋতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋতু বসন্ত। এই ঋতুতে ফুলের শোভায় প্রকৃতি অপরূপ হয়ে ওঠে। শীতে প্রকৃতি যেন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। বসন্তে আবার সেই প্রকৃতি সৌন্দর্য এবং রমণীয়তায় পুষ্পিত হয়ে ওঠে। তাই মলয়পবনসেবিত-সর্বসুগন্ধি কুসুমসকলের আকর বলে এই ঋতু পরম রমণীয়। তাই ভগবান বলছেন, ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু তাঁর বিভূতি।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ।।৩৬

অহম্ (আমি) ছলয়তাম্ (ছলনাকারীদের মধ্যে) দ্যূতম্ (অক্ষক্রীড়ারূপ ছল), তেজস্বিনাম্ (তেজস্বীদের মধ্যে) তেজঃ (প্রভাব) অস্মি (হই) অহম্ (আমি) জয়ঃ (জয়) অস্মি (হই) ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) অহম্ (আমি) সত্ত্ববতাম্ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) অস্মি (হই)।৩৬

আমি বঞ্চনাকারীদের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তেজস্বীদের তেজস্বরূপ; আমিই জয়ীর জয়, উদ্যমীর উদ্যম এবং সাত্ত্বিক পুরুষগণের সত্ত্বগুণ।

ছলনা করবার যত উপায় আছে তার মধ্যে দ্যূতক্রীড়া সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এর দ্বারা লোকে স্ত্রী, পুত্র এমনকি রাজ্য পর্যন্ত হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এর মোহিনী শক্তি এত অধিক যে বিজ্ঞ লোকেরাও এর দ্বারা আকৃষ্ট হন। মহাভারতে পাশাখেলায় শকুনি কী ছলনাই না করেছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পাণ্ডবগণ সর্বস্ব হারিয়েছিল। বিশেষ শক্তিশালী

বলে এটা ভগবানের বিভূতি। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর জগৎ থেকে পৃথক কোনও সত্তা নন। ঈশ্বর থেকেই এই জগতের আবির্ভাব। জগতে যা- কিছু ঘটে, সবই ঈশ্বরের এক-একটি প্রকাশ। ভালমন্দ, এমনকী ধূলিকণাটুকুও ভগবানের থেকে প্রকাশিত। তাই ভগবান বলছেন, শক্তিশালী দ্যূতক্রীড়া তাঁর বিভূতি।

তেজস্বিগণের তেজই ভগবানের বিভূতি। কারণ তেজ আছে বলে তেজস্বিগণ জগতে প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়, অপর লোকসকল আজ্ঞাবহ থাকে, সকলের আদর ও সম্মান লাভ করে অপর লোকসকল আজ্ঞাবহ থাকে। জগতে শক্তিমান পুরুষই জয় লাভ করে থাকে। বিজয়ী পুরুষগণ অপরকে পরাজিত করে শক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা, তাই জয় ভগবানের বিভূতি। উদ্যমমাত্রই শক্তির পরিচায়ক এবং কর্মে সাফল্যলাভের প্রধান উপায়। শক্তিহীনতা ও উদ্যমহীনতা প্রায় একই কথা। উদ্যম ব্যতীত মানুষের কোনও পুরুষার্থ লাভ হয় না। অধ্যবসায়ীদের দৃঢ়সংকল্পযুক্ত উদ্যমই নিজ জীবন ও জাতীয় জীবনকে উন্নততর করে। এই উদ্যমই ভগবানের বিভূতি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের যুবকদের ঐকথাই বলছেন— পরাধীন ভারতে মানুষ দাসত্ব করতে করতে মেরুদণ্ডহীন ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েছে। ধর্মের দ্বারা মানুকে ফিরিয়ে দিতে হবে উদ্যম ও সংঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধ। তবেই এই দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে। সত্ত্বগুণই সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণে সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বগুণের ফলস্বরূপ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি ভগবানের বিশেষ বিভূতি। যাঁরা শান্ত এবং স্থির, সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, তাঁদের মধ্যে ভগবান সত্ত্বগুণরূপে প্রকাশিত। মনের তিনটি অবস্থা—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। সত্ত্বগুণই মানুষের মধ্যে সমত্ববুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ।। ৩৭

অহং (আমি) বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে) বাসুদেবঃ (বাসুদেব কৃষ্ণ) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) মুনীনাম্ অপি (আর মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব) কবীনাম্ (কবিগণের মধ্যে) উশনা কবিঃ (কবি শুক্রাচার্য) অস্মি (হই)।৩৭

আমি যাদবকুলের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে (শ্রেষ্ঠ) অর্জুন, বেদজ্ঞ মুনিদের মধ্যে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবং সূক্ষ্মার্থদর্শী কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য।

বৃষ্ণিবংশে যে-সকল ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার বলে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি একদিকে অমিতবলশালী, অপরদিকে গভীর জ্ঞানের আধার। পাণ্ডুপুত্রদিগের মধ্যে অর্জুনই শৌর্যবীর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর শ্রেষ্ঠতা

উপলব্ধি করেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসদেব ভগবানের বিভূতি। ব্যাসদেব বেদসমূহের বিভাগকর্তা, মহাভারত গ্রন্থের প্রণেতা, বহু পুরাণের রচয়িতা, বেদান্তদর্শনের রচয়িতা। অশেষতত্ত্বদর্শী মহর্ষি ব্যাসদেব ভগবানের অবতার বলে পরিচিত। এই কারণে তিনি মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মার্থদর্শী কবিদিগের মধ্যে উশনা অর্থাৎ শুক্রাচার্য ভগবানের বিভূতি। তিনি দৈত্যগুরু, সর্বশাস্ত্রদর্শী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। অতিশয় জ্ঞানের অধিকারী বলে তিনি কবি নামে প্রসিদ্ধ।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ।। ৩৮

অহম্ (আমি) দময়তাম্ (দমনকারীদের) দণ্ডঃ অস্মি (রাজদণ্ড হই) জিগীষতাম্ (জয়-ইচ্ছুদের) নীতিঃ অস্মি (সামাদি নীতি হই) গুহ্যানাং (গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে) মৌনম্ এব চ (তূষ্ণীম্ভাব) জ্ঞানবতাম্ চ (এবং জ্ঞানিগণের) জ্ঞানং অস্মি (জ্ঞান হই)।৩৮

আমি দমনকারীদের দণ্ড, জয়াভিলাষীদের মধ্যে আমি নীতি অর্থাৎ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। গোপনীয় বিষয়ে মৌন এবং আত্মজ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞান।

যাঁদের উপর লোকসমাজের শাসনভার ন্যস্ত তারা যেসকল উপায়ে লোকদিগের শাসন করেন তন্মধ্যে দণ্ড বা শাস্তিদানই প্রধান। দুষ্টলোকদের উপযুক্ত দণ্ড বা শাস্তি দেওয়া হয় বলে লোকসমাজের রক্ষা ও পালন হচ্ছে। এই কারণে সমাজরক্ষার প্রধান নিদর্শন ও প্রভুত্বের নিদর্শন বলে দণ্ড ভগবানের বিভূতি।

যারা জয়লাভ করতে ইচ্ছুক তারা সেই উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন করে তাদের সাধারণ নাম নীতি (policy)। এই নীতি চার প্রকার, যথা—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। শত্রুপক্ষের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনপূর্বক তাদের বশীভূত করে কার্যোদ্ধারের নাম সাম। বিপক্ষ দলের ব্যক্তিবিশেষকে বা অনেক লোককে যথেচ্ছ অর্থাদি দান দ্বারা বশীভূত করে জয়লাভ করার নাম দান। প্রতিপক্ষীয় লোকদিগের মধ্যে পরস্পর মতান্তর ও বিদ্বেষভাব উৎপাদনপূর্বক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নাম ভেদ। অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগদ্বারা বাহুবলে বিপক্ষকে অধীন করার নাম দণ্ড। আবশ্যকমতো উপরোক্ত নীতিসমূহের সুকৌশলে প্রয়োগই জয়লাভের প্রধান উপায়। জয়লাভ ও রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত এই নীতিসমূহ বিশেষ কার্যকারী ও প্রভাবসম্পন্ন বলে তা ভগবানের বিভূতি। গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত হলে পাছে নিজের বা অপরের হানি হয়, এই জন্য লোকে যে মৌন অবলম্বন করে, সে মৌনও ভগবানের বিভূতি। আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনও প্রকৃত মৌন অবস্থা। সত্যোপলব্ধি, তত্ত্বানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতির ক্ষেত্রে মৌনতার অসাধারণ মূল্য এবং সর্বত্রই অতীন্দ্রিয় জীবনের উচ্চতর স্তরে এই মৌনতা বেশি দেখা যায়। মৌমাছির তুলনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যতক্ষণ সে ফুলের ওপর উড়তে থাকে ততক্ষণ

সে গুনগুন করে। তার গুনগুনানি আর থামে না। কিন্তু ফুলের ওপর বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলেই তার গুঞ্জন বন্ধ হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঐ একই অবস্থা। তাই ভগবান বলছেন, সকল গুহ্য বিষয়ের মধ্যে তিনি মৌনতা। জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারপাশ বিমোচন হয়, এইজন্য জ্ঞান ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি। জ্ঞান মানে এখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আমাদের স্বরূপজ্ঞান। এই জ্ঞান যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ভগবানই সেই জ্ঞান।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ।। ৩৯

অর্জুন (হে অর্জুন) যৎ চ অপি (এবং যা-কিছু) সর্ব-ভূতানাং (সকল ভূতের) বীজং (উৎপত্তির কারণ) তৎ (তা) অহম্ এব (আমিই) ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ (যা) স্যাৎ (হতে পারে) তৎ (সেই) চর-অচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) ভূতং (পদার্থ) ন অস্তি (নেই)।৩৯

হে অর্জুন, আর সর্বভূতের যা কারণ তাও আমি। আমা ছাড়া সত্তাবান হতে পারে স্থাবর-জঙ্গমে এমন কোনও পদার্থই নেই। অর্থাৎ আমিই সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।

এই জগতের সকল বস্তুর মধ্যে বীজরূপে আমিই আছি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই পরম চৈতন্য ব্রহ্ম এবং জগতে যা কিছু আছে, তার উৎপত্তি সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য পরম ব্রহ্ম থেকে। এই জগতে চর বা অচর, স্থাবর বা জঙ্গম এমন কিছুই নেই, পরমাত্মা ছাড়া যার অস্তিত্ব সম্ভব হতে পারে। চৈতন্য ব্রহ্ম সরিয়ে নিলে কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ শূন্যের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, এক-এর পিঠে শূন্য বসালে শূন্যের মূল্য বাড়তে থাকে। শুধু শূন্যের কোনও মূল্য নেই। এক আছে বলে শূন্যের মূল্য আছে। সেইরূপ ঈশ্বর আছে বলে, জগৎ আছে। ঈশ্বর নেই তো, জগৎ নেই। জগতের পরিবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে এক অদ্বিতীয় বস্তু রয়েছে, সেটিই একমাত্র সত্তা। সেই এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অবিনাশী সত্তা সবকিছুকে সত্য করে তোলে। তাঁকে সরিয়ে নিলে সবকিছুই মিথ্যা হয়ে যায়। ভগবান বলছেন, বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেইরূপ সর্বভূতের মূল কারণ মায়োপহিত চৈতন্যে ভগবানের বিভূতি। সেই মূলবীজ ব্যতীত কোনও ভূতই উৎপন্ন হতে পারে না। আচার্য শঙ্কর উপনিষদের ভাষ্যে বলছেন, 'তদাত্মনা বিনির্মুক্তঃ জগৎ অসৎ সম্পদ্যতে'—এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে আত্মাকে সরিয়ে নিলে, ব্রহ্মাণ্ড একেবারে মূল্যহীন হয়ে যাবে। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—'ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বম্।'—এই সমগ্র ব্যক্ত বিশ্ব সেই অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম হল—সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। আর জগৎ হল—নাম ও রূপ। তাই ব্রহ্ম আছে বলে নাম ও রূপের প্রকাশ। তাই ভগবান বলছেন—তিনি সব-কিছুর কেন্দ্রবিন্দু।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ।। ৪০

পরন্তপ (হে পরন্তপ) মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাং (বিভূতি সকলের) অন্তঃ (অন্ত) ন অস্তি (নেই) এষঃ তু (সেজন্য এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমার দ্বারা) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (বলা হলো)।৪০

হে পরন্তপ, আমার দিব্য-বিভূতিসকলের অন্ত নেই। তথাপি আমি বিভূতির এই বিস্তার অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শনরূপে মাত্র বললাম।

ভগবানের বিভূতির সম্পূর্ণ বর্ণনা করা অসম্ভব। সর্বজ্ঞ ব্যক্তিও তা বলে উঠতে পারবে না। ভগবানের বিভূতির অন্ত নেই। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া তাঁর বিভূতিসকল বর্তমান। সেই সকলের সম্যক বর্ণনা বা হিসাব নির্ণয় করা অসম্ভব। ভগবান তাঁর দিব্য বিভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দিলেন। এই সামান্য বিবরণ থেকে ভগবানের অসীম অনন্ত ঐশ্বর্যের পরিচয় কিছুটা অনুভব করা সম্ভব হবে। এরপর ভগবান একটি অসাধারণ মহৎ উক্তি করলেন।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ।। ৪১

বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রীমৎ (শ্রীযুক্ত বা লক্ষ্মীযুক্ত) ঊর্জিতম্ এব বা (কিংবা অতিশয়-প্রভাবসম্পন্ন) যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (বস্তু) তৎ তৎ এব (তা সব কিছুই) মম (আমার) তেজঃ-অংশ-সম্ভবম্ (শক্তি-অংশ হতে উদ্ভূত) অবগচ্ছ (বলে জেনো)। ৪১

এই জগতে যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও শক্তিমান, সে সব বস্তুই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলে তুমি জেনো।

উপসংহারে ভগবান অর্জুনকে বললেন, যা উৎকৃষ্ট, যা শ্রেষ্ঠ, বা যেখানেই অসাধারণ ভাব দেখবে, সেখানেই ভগবানের শক্তির প্রকাশ বলে জানবে। যেখানেই মহৎ কর্ম সেখানেই ভগবানের দিব্য শক্তির প্রকাশ। পূর্বে ভগবান একটি-একটি করে তাঁর বিভূতির কথা বললেন। এখানে তিনি আরও সহজ করে বললেন, জগতে অসংখ্য বস্তু ও জীবনের মধ্যে কোথায় তাঁর বিভূতির বেশি প্রকাশ তা অনায়াসে চিনে নেওয়া যাবে। এই জগতে যা-কিছু অসাধারণ শক্তি, ঐশ্বর্য, সম্পদ্, শ্রী বা বলবীর্যের আধার তাকেই ভগবানের বিভূতি বলে জানতে হবে। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের শক্তি বা তেজের বিকাশস্থল। এমন কিছু নেই যা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের তেজোবর্জিত। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে এই তেজ বা শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশিত, কোথাও বা তা নিষ্প্রভ বা লুকিয়ে আছে। এই বিশেষভাবে প্রকাশমান তেজের স্থলগুলিকেই বিভূতি বলে মনে করতে হবে। যেহেতু অর্জুন পূর্বে

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে কৃষ্ণ, কোন কোন বস্তুতে বা বস্তুর সাহায্যে আমি তোমাকে চিন্তা করব? ভগবান প্রথমে কতকগুলি ভাব, গুণ ও বস্তুর নাম উল্লেখ করে এখানে সহজ করে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—যে কোনও বস্তুতে অসাধারণ বিভূতি, শ্রী বা বলবীর্য ও শুভ উদ্যম শক্তির প্রকাশ দেখতে পাবে সেখানেই আমার প্রকাশ মনে করে আমাকে স্মরণ ও চিন্তন করবে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।। ৪২

অথবা (অথবা) অর্জুন (হে অর্জুন) এতেন (এসব) বহুনা (বিস্তারিত ভাবে) জ্ঞাতেন (জেনে) তব (তোমায়) কিং (কী প্রয়োজন) অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) এক-অংশেন (এক-পাদদ্বারা) বিষ্টভ্য (ধারণ করে) স্থিতঃ (অবস্থিত রয়েছি)।৪২

অথবা হে অর্জুন, আমার এত সব বিভূতিবিস্তার-সম্বন্ধে তোমার জানার প্রয়োজন কী? এইমাত্র জানলেই যথেষ্ট হবে যে, আমি আমার মাত্র একপাদ দ্বারা এ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত বা ধারণ করে রয়েছি। আমার বাকি তিন পাদ অব্যাকৃত নির্গুণ স্বরূপে স্থিত রয়েছে।

ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানী জেনে বললেন, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি জানবার প্রয়োজন নেই। তুমি উত্তম অধিকারী। পরমাত্মার একাংশমাত্রে জগৎ অবস্থিত—এইরূপে তাঁকে সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষ বলে ধ্যান কর। পরম ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশমাত্র এই জগৎরূপে প্রকাশিত। অবশিষ্ট তিন ভাগ অব্যক্ত এবং অবিনশ্বর। অর্থাৎ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত এই ব্রহ্মাণ্ড সেই এক পরম ঐশী শক্তির সামান্য একটু অংশ থেকে উদ্ভূত।

হে অর্জুন, তুমি যদি আমার বিভূতিসমূহ জানতে চাও তবে সংক্ষেপে জেনে রাখ যে, এই জগতে এমন কিছু নেই যা আমার সত্তাতে প্রকাশিত নয় অথবা আমা হতে স্বতন্ত্র। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের শক্তির প্রকাশ। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব তখন বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু, গুণ, ভাব বা ক্রিয়াতেই আমার সত্তা এবং শক্তি অনুভব করতে পারব, সর্বত্র ভগবৎ-স্ফূরণ হবে। তখন আর বিভূতি জানবার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে না।

উপনিষদ বলছেন—'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি'—এই বিশ্ব ও ভূতবর্গ ব্রহ্মের একপাদ। অবশিষ্ট তিন পাদ স্বর্গে বিরাজিত। অবশ্য অনন্ত ব্রহ্মকে বিভিন্ন পাদে বিভক্ত করা অসম্ভব। এই বিশ্ব যত বড়ই হউক না কেন তা ব্রহ্মের এককণিকা মাত্র, ব্রহ্মাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসমুদ্রের একটি তরঙ্গ মাত্র। বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতীত বিরাট সত্তার নিকট তা নগণ্য। তবে আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। সত্যটি হল—'নানা অস্তি কিঞ্চন'-

—এই জগতে বহু বলে কিছু নেই। ভেদ দর্শন করা চলবে না। কারণ আমরা সকলেই স্বরূপত এক—এই বোধই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। ঐক্যই বিশ্বের ভিত্তি। মানুষ ও সমস্ত প্রকৃতির পেছনে ঐক্য রয়েছে, এক সত্তা রয়েছে। এই হলো বেদান্তের বক্তব্য।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **'বিভূতিযোগ'** -নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

শ্রীভগবানের সব চাইতে বড় বিভূতি এই যে, তিনি বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতিগ, প্রপঞ্চাভিমানী হয়েও প্রপঞ্চাতীত। তিনি এক আবার বহু । যাঁকে বেদে ব্যাখ্যা করছেন—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।'—তিনি অণু হতেও অণুতর এবং মহান হতেও মহত্তর, আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে আত্মস্বরূপে অবস্থিত। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অথচ পরিপূর্ণস্বরূপ এবং যিনি অন্তরাত্মারূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবার সেই পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মের অনন্ত মস্তক, অগণিত চক্ষু ও চরণ—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ'। সেই ব্রহ্ম জগতে সর্বত্র পরম চৈতন্যরূপে প্রকাশিত— 'ঈশা বাস্যমিদং' —ইত্যাদি। বাস্তবিক ঋষিরা ব্রহ্মকে যত সহজে ব্যাখ্যা করেন আমাদের চোখে অবশ্য এই সত্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মন শুদ্ধ হলে, জগতের গভীরে প্রবেশ করে বহুর পিছনে সেই পরম একেকে আবিষ্কার করা সম্ভব। তখন নিজের মধ্যে যেমন আমরা এই সত্য অনুভব করব, তেমনি বাইরের জগতের দিকে তাকিয়েও আমরা সেই 'একম্ অদ্বিতীয়ম্' সত্তাকেই দেখব। দেখব ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশিত রয়েছেন। তাই ঋষিরা বলছেন, যিনি বহুর মধ্যে একেকে দেখেন, তিনি শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হন, অন্য কেউ নয়, অন্য কেউ নয়।

তিনি সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তিনি 'এক' আবার 'দুই', আবার এক দুয়ের পার। তিনি দ্বৈত, তিনি অদ্বৈত, আবার 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা উপনিষদে দেখি ব্রহ্মের সম্বন্ধে কিরকম সব পরস্পরবিরোধী কথা বলা হচ্ছে। বলছেন, 'তদেজতি তন্নৈজতি'—তিনি চলেন আবার চলেনও না। 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'—তিনি দূরে আছেন, আবার কাছেও আছেন। 'তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'—সকলের

অন্তরে আছেন তিনি, আবার বাইরেও আছেন।(ঈশোপনিষদ্-৫) পরস্পরবিরোধী সব বলছেন অর্থাৎ তাঁর সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলা যায় না। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্' বোবার মুখে কথা ফোটাতে পারেন, পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না। পুষ্পদন্তের শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে আছে—'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে, সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী। লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং, তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।'—নীল পাহাড় যদি কালি হয়, সমুদ্র যদি দোয়াত হয়, পারিজাত গাছের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি হয় কলম আর পৃথিবী যদি হয় কাগজ এবং সেই কাগজে যদি স্বয়ং সরস্বতী অনন্তকাল ধরে লিখে চলেন তবুও, হে ঈশ্বর, তোমার গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

ঈশ্বরীয় সত্তা অনন্ত, সর্বব্যাপী, প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজমান—কারও মধ্যে প্রকাশ বেশি, কারও মধ্যে প্রকাশ কম, এই যা। ভারতবর্ষের মানুষ যেমন দেবতা বা অবতার-পুরুষকে পূজা করেন, সেইরূপ আচার্যগণ শিক্ষা দেন, মহান ব্যক্তি ও তাঁর কর্মের মধ্যে, গুণের মধ্যে, ঈশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে। একজন সাধু বা ভিক্ষুর মধ্যে ত্যাগ-তপস্যা ও সৎ-চরিত্রের জন্য তাঁকে সম্মান ও পূজা করতে। ঈশ্বরের বিশ্বজনীন ভাবটিই আমাদের সকলকে নিতে হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'তিনি (ঈশ্বর) কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'তিনি বিভুরূপে (পরমেশ্বররূপে) সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা নাহলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়, আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে বেশি, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ-কথা মানো কি না?' অতএব ঈশ্বরের বিভূতির এই তারতম্যের পিছনে রয়েছে প্রকাশের মাত্রার তারতম্য, কারও মধ্যে বেশি এবং কারও মধ্যে কম। এই কারণেই জগৎ বৈচিত্র্যময়। এক ব্রহ্মই এই বিচিত্র জগৎরূপে প্রকাশিত। মানুষ ইচ্ছা করলে তার জীবন ও চরিত্রের মধ্যে আরও বেশি ঈশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

পূর্ব অধ্যায়ে নানাপ্রকার বিভূতি বর্ণনা করে শেষে ভগবান বললেন, 'আমি নিজ স্বরূপের এক-অংশের দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছি।' এই কথা শুনে অর্জুন অত্যন্ত অনুগ্রহান্বিত হয়ে শ্রীভগবানের সমগ্র বিভূতি সাক্ষাৎকার করবার অভিলাষ প্রকাশ করলেন। কারণ এখন ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে অর্জুনের পূর্ণ বিশ্বাস ও শরণাগতি হয়েছে। অর্জুন ভগবানের দিব্য মাহাত্ম্যসকল শ্রবণ করে, কীভাবে বিভূতিসমূহের মধ্য দিয়ে ভগবান জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন—সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন:

'হে কমলপত্রাক্ষ! তুমি যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বললে, তাতে আমার মোহ দূর হয়েছে। ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধীয় তোমার অব্যয় মাহাত্ম্যও শ্রবণ করলাম। এখন হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন করতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো, হে যোগেশ্বর, তুমি আমাকে ঐ রূপ দর্শন করাও।' শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় রূপ দেখার জন্য অর্জুনকে 'দিব্যচক্ষু' বা 'জ্ঞাননেত্র' দিয়েছিলেন। ঐ দিব্যচক্ষুদ্বারা অর্জুন দর্শন করেছিলেন শ্রীভগবানের দিব্যরূপ--যে রূপদর্শন হলে জীবের পরমগতি লাভ হয়।

এখানে কয়েকটি শ্রুতিবাক্য উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরলে বোঝা যাবে শ্রুতির সঙ্গে অপূর্ব সামঞ্জস্য রেখেছেন ভগবান। শ্রুতি বলছেন—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হয়েও বহু হয়েছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই পরম ব্রহ্মের বিরাট রূপ। 'তৎ সর্বমভবৎ'—তিনি এই সব হয়েছেন। তিনিই বহু হয়েছেন। 'একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।'—আমি এক, বহু হব—প্রজা সৃষ্টি করব। ভগবান গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে

বলেছেন—'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা'। তিনি এক হয়েও নিজেকে জগদাকারে জীবরূপে, প্রজারূপে সৃষ্টি করলেন। জগৎসৃষ্টি করে তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। 'স ইদং সর্বম্ অসৃজৎ, তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ।'— তিনি নিজেকে এরূপ অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে রূপায়িত করলেন এবং সর্ব বস্তুতে তিনি চৈতন্যরূপে বিরাজমান। 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম--নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বর্তমান—এখানে এক ছাড়া বহু নেই। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু।

অতএব শ্রুতিবাক্যগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রেখেই শ্রীভগবানের ঐ বিশ্বরূপের প্রকটন। এ জগৎ ব্রহ্মের বিরাট শরীর। শ্রুতিতে যিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'—পরমপুরুষ রূপে বর্ণিত হয়েছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই বিরাট রূপ—অনেক মুখ, অনেক নয়নবিশিষ্ট, অনেক পাদ ও হস্ত প্রসারিত। ভগবান কৃপা করে অর্জুনকে তাঁর সেই অনির্বচনীয় বিশ্বরূপ দেখালেন—নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট ভগবানের অনুপম দিব্যরূপ। অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য-আভরণ, অনেক সর্বাশ্চর্যময় বিশ্বতোমুখ এবং অনন্তদেবকে দর্শন করে অর্জুন বলছেন—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার দেহে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং সর্বত্র অনন্ত রূপ দেখছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আকাশে সহস্র সূর্য উদিত হলেও সেই বিশ্বরূপের জ্যোতির প্রভার তুলনা হয় না। অর্জুন আনন্দে, ভয়ে ও বিস্ময়ে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপূর্বক ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন।

ঐ বিশ্বমূর্তির মহাকালরূপ অভিব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করে অর্জুন ভীতকম্পিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করলেন। তখন শ্রীভগবান সৌম্যমূর্তি ধারণপূর্বক অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বললেন—'যে বিশ্বরূপ তুমি দর্শন করলে তা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ। একমাত্র অনন্য ভক্তি ও শরণাগতি ছাড়া আমার ঐ বিশ্বরূপ কেউ দর্শন করতে পারে না। তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমার প্রার্থনাতে তুষ্ট হয়ে তোমাকে আমি ঐ দুর্লভ বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। আমিই তোমার পরম গতি; অতএব আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে, আমার অভীষ্ট কর্ম কর। সর্বকর্মের কর্তাই আমি এবং সর্বকর্মই আমার কর্ম—এই বুদ্ধিতে অনাসক্ত চিত্তে তুমি যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম কর। হে অর্জুন, যে আমার কর্মকারী, মৎপরায়ণ, সঙ্গবর্জিত, ভক্ত এবং সর্বভূতে নির্বৈর, সে-ই আমাকে লাভ করে।' ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন বুঝলেন যে, কোন কার্যে তাঁর নিজের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই।

অর্জুন উবাচ
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ।।১

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বললেন) মৎ-অনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য) পরমং (অত্যন্ত) গুহ্যম্ (গুহ্য) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ (অধ্যাত্মনামক) যৎ (যে) বচঃ (বাক্য)

ত্বয়া (তোমার দ্বারা) উক্তং (কথিত হলো) তেন (তার দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (ভ্রম) বিগতঃ (বিনষ্ট হয়েছে)।১

অর্জুন বললেন—হে ভগবন, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে যে পরমগুহ্য আত্মতত্ত্ববিষয়ক কথা বর্ণনা করলে, তাতে আমার এই মোহ বিদূরিত হয়েছে।

অনেক মহান ঋষি, সাধক এবং ভক্ত গীতার এই অধ্যায়কে অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে মনে করেন। কারণ পরম ভক্ত অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান তাঁকে ঈশ্বরীয় বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। অর্জুন বলবীর্যে, শিক্ষায় ও জ্ঞানে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেও গীতার প্রথমে আমরা দেখছি, তিনি অজ্ঞান মানবকুলের প্রতীক বা প্রতিনিধি। তিনি সাধারণ মানুষের মতো মোহযুক্ত। আপনজনদের মরণ স্মরণ করে তিনি ক্ষাত্রধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ হয়েছিলেন, এবং আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর দ্বারা যুদ্ধে অনেক প্রাণ নষ্ট হবে। কিন্তু ভগবানের মুখে বিভূতিতত্ত্ব শ্রবণ করে, এই ভ্রান্তি বা মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি শান্তি লাভ করলেন। যে সকল-পরম গুহ্যকথা সাধকরা শুনতে পায় না, এবং যা পরম জ্ঞানী-পুরুষ ব্যতীত অন্য কেউ বুঝতে পারে না, সেই সব আত্মতত্ত্ববিষয়ক কথা শ্রবণ করে তাঁর মোহ দূর হয়েছে। তিনি নিজেকে যে ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাদের হননকর্তা মনে করেছিলেন, সেই মিথ্যা অভিমান দূরীভূত হল। অর্জুন বুঝলেন কোনও কর্মেরই তিনি কর্তা নন। ঈশ্বরই কর্তা। তিনি বুঝলেন, মানবরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি হয়ে তাঁকে পরম গুহ্য কথা বলছেন এবং তিনিই সেই পরব্রহ্ম, তিনি মানুষরূপী ভগবান।

তাই অর্জুন বললেন, তুমি আমার প্রতি প্রেম ও করুণাবশত এতক্ষণ পর্যন্ত যা-কিছু বললে, তা অতি পরমগুহ্য আত্মতত্ত্ববিষয়ক কথা। তোমার মুখনিঃসৃত সেই বাণী শ্রবণ করে আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে। আমি আমার সকল মোহ এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার অনন্ত সত্তাই এই বিশ্বরূপে, বিভূতিসমূহের মধ্য দিয়ে জগৎরূপে প্রকাশিত এবং তা তোমার স্বরূপের মাত্র এক অংশ।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ।। ২

কমল-পত্র-অক্ষ (হে কমললোচন) ত্বত্তঃ (আপনার কাছ থেকে) ভূতানাং (ভূতসকলের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও প্রলয়) ময়া (আমার দ্বারা) বিস্তরশঃ হি (বিস্তারিতভাবেই) শ্রুতৌ (শোনা হলো) অব্যয়ম্ (তোমার অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্ অপি চ (সগুণ ও নির্গুণ মাহাত্ম্যের মহিমাও) (শোনা গেল)।২

হে কমলপত্রাক্ষ, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় এবং সেই সঙ্গে তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অক্ষয় মাহাত্ম্যের কথা,তোমার কাছ থেকে আমি সবিস্তারে শুনলাম।

আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি কমলপত্রাক্ষ বা ভগবান। ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অর্জুন বুঝলেন যে, ভগবানই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ। হে কমলপত্রাক্ষ—পদ্মপলাশলোচন! এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় যা তোমা হতে হয়, তা তোমার কাছ থেকে আমি সবিস্তারে শুনেছি। শুধু প্রাণীগণের উৎপত্তি বা বিনাশ নয়, সেই সঙ্গে তোমার পরম মাহাত্ম্য অর্থাৎ তোমার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য, বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্মের কথা এবং তোমার অসঙ্গতা ও উদাসীনতা ইত্যাদি ভাব—সোপাধিক ও নিরুপাধিক অক্ষয় মাহাত্ম্যের কথা আমি শ্রবণ করেছি।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ।। ৩

পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর) যথা (যেমন) ত্বম্ (তুমি) আত্মানম্ (আত্মতত্ত্ব, নিজের সম্বন্ধে) আত্থ (বলেছ) এতৎ (ইহা) এবম্ (এ প্রকারেই) পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম) (আমি) তে (তোমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপম্ (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।৩

হে পরমেশ্বর, তোমার আত্মতত্ত্ব বা বিভূতি সম্বন্ধে যা বলেছ, তা যথার্থ। তবু হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

হে পরমেশ্বর, তুমিই যে জগতের আদিকারণ, এই জগৎ যে তোমা হতে উৎপন্ন হয়েছে এবং পুনরায় তোমাতেই বিলীন হয়ে যাবে, এই জগতের যে পৃথক কোনও অস্তিত্ব নাই, এটা যে তোমারই প্রকাশরূপমাত্র—তা আমি তোমার মুখে বিস্তারিতভাবে শুনেছি। এই বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে তোমার যে অনন্ত মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে তাও আমি অবগত আছি। তুমি যে বলেছ, এই বিশ্ব তোমারই আত্মপ্রকাশ, তুমি অনন্ত বিভূতিসম্পন্ন--তাও যথার্থ। এক্ষণে তোমার এই বিশ্বরূপ আমি দেখতে ইচ্ছা করি। ঈশ্বরের সেই বিশ্বাত্মক রূপ বা বিশ্বরূপ শুধু শুনলেই মন ভরে না, শ্রবণ ও দর্শন দুহ-ই প্রয়োজন।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বাত্মক রূপ দেখার জন্য অধীর হয়েছেন, বলছেন:

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ।। ৪

প্রভো (হে প্রভো), যদি (যদি) তৎ (তা—অর্থাৎ সেই ঐশ্বররূপ) ময়া (আমা কর্তৃক) দ্রষ্টুম্ (দৃষ্ট হতে) শক্যম্ (যোগ্য) ইতি (এরূপ) মন্যসে (মনে কর) ততঃ (তা হলে) যোগ-ঈশ্বর (হে যোগের ঈশ্বর), ত্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানম্ (আত্মরূপ—নিজের স্বরূপ) দর্শয় (দেখাও)।। ৪

হে প্রভো, যদি তুমি মনে কর যে আমি সেই বিশ্বরূপ দেখবার যোগ্য, তা হলে, হে

যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় জগদাত্মরূপ দর্শন করাও।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর মনে হলো যে তিনি তো সাধারণ মানুষ। তিনি ভাবছেন তাঁর পার্থিব চক্ষুর দৃষ্টি ও সাধারণ অপরিচ্ছিন্ন মন নিয়ে কি ভগবানের ঐ দিব্যরূপ দর্শন সম্ভব? পাছে ভগবান অর্জুনকে তাঁর দিব্যরূপ দর্শনের অনধিকারী ভেবে উপেক্ষা করেন, অর্জুন এই আশঙ্কায় অর্জুন বললেন—হে যোগেশ্বর, যদি আমাকে তোমার বিশ্বরূপ দেখবার উপযুক্ত বলে মনে কর, তবে সেই রূপ আমাকে দেখাও।

শ্রীভগবানুবাচ
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।। ৫

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন)—পার্থ (হে পার্থ) মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (বিবিধ প্রকার) নানাবর্ণ–আকৃতীনি চ (এবং নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপসকল) পশ্য (দেখ)।৫

শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ, নানাবর্ণ ও বিচিত্র এবং শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন আকৃতি–সমন্বিত আমার এই দিব্যরূপ দর্শন কর।

যাঁর ভগবানে বিশ্বাস, ভগবানের চরণে যাঁর একান্ত ভক্তি, ভগবানের নাম ও রূপ ব্যতীত যাঁর আর কিছুই ভাবনা নেই, তিনিই প্রকৃত সাধক। বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে আজ অর্জুন ভগবানের কৃপা লাভ করলেন। দেবদুর্লভ ভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শন করলেন। সেই রূপে ভগবান অশেষ বর্ণের সমাবেশ, অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব, অথবা তাতে কত যে কী আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁর অনন্ত রূপ। কঠোর তপস্যা করেও সাধক ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয় না। আজ ভক্ত অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান নিজ অদ্ভুত রূপ দেখবার জন্য অর্জুনকে অনুমতি দিলেন। অর্জুন ধন্য! তিনি ভগবানের কৃপাধন্য! ভক্তের প্রতি সর্বদা ভগবানের অশেষ দয়া, কৃপা ও ভালবাসা থাকে। তাই মানুষ সকল সুখ ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রার্থনায় আনন্দিত হয়ে বলছেন, হে অর্জুন, এস, দেখ—বিভিন্ন দিব্যরূপ, বিভিন্ন বর্ণের ও নানা আকৃতির।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত।। ৬

ভারত (হে ভারত) আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্টবসু) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা (ও) মরুতঃ (ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, বায়ু) পশ্য (দেখ) চ (এবং) বহূনি (অনেক) অদৃষ্ট–পূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্যাণি (আশ্চর্য বস্তুসকল) পশ্য (দেখ)।৬

হে ভারত, এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশদ মরুতকে দর্শন কর এবং পূর্বে যা কখনও দেখনি এমন অদৃষ্টপূর্ব বহুবিধ আশ্চর্যবস্তুও আমার এ বিশ্বরূপে দর্শন কর।

ভগবান বলছেন, তুমি দু–চোখ দিয়ে জগতের যা কিছু দেখে থাক তার চেয়েও বিস্ময়কর বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য বস্তুসকল যা আছে তা তুমি আমার মধ্যে দর্শন কর। এই সব দিব্যরূপ তুমি দর্শন কর যা পূর্বে কখনও মানুষ দেখেনি। আমাদের পুরাণে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশ মরুৎ–এর কথা শুনেছ। সেই সব আমার এই বিশ্বরূপের মধ্যে দর্শন কর। ভগবানের কৃপায় ভক্ত ভগবানের এই বিশ্বরূপ দেখতে পায়।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭

গুড়াকেশ (হে অর্জুন, জিতনিদ্র) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্থং (একত্র সংস্থিত, অবয়বরূপে) কৃৎস্নং (সমগ্র) সচরাচরম্ (স্থাবরজঙ্গম–সহিত) জগৎ (বিশ্ব) অন্যৎ চ (এবং অন্য) যৎ (যা) দ্রষ্টুম্ (দেখতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) অদ্য (এখন বা আজ) পশ্য (দেখ)।৭

হে জিতনিদ্র অর্জুন, আমার এই বিরাট দেহে অবয়বরূপে একত্র সন্নিবিষ্ট স্থাবরজঙ্গম–সহ সমগ্র বিশ্ব এবং অন্য যা–কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা আজ দর্শন কর।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎসত্তায় বিদ্যমান রয়েছে। ভগবানই স্থাবরজঙ্গম–সহ সমগ্র বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। বহু জন্মের তপস্যায় যা সম্ভব নয়, ভগবৎকৃপায় ভক্ত অর্জুন একস্থানে সেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পার যে, উপস্থিত যুদ্ধে কার জয়, কার পরাজয় হবে।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮

অনেন (এই) স্ব–চক্ষুষা এব (তোমার এ চক্ষু অর্থাৎ চর্মচক্ষু দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুম্ (দেখতে) ন শক্যসে (সমর্থ হবে না) তে (এইজন্য তোমাকে) দিব্যং (দিব্য, অলৌকিক) চক্ষুঃ (চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টি) দদামি (দিচ্ছি) মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) যোগং (অঘটন–ঘটনরূপা যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর)।৮

হে অর্জুন, তুমি তোমার এই চর্মচক্ষু দ্বারা আমার এই ঐশ্বরিক রূপ দর্শনে সমর্থ হবে না। সেই জন্য তোমায় আমি দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, তার সাহায্যে আমার এই ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটন-সামর্থ্যরূপা যোগশক্তি দেখ।

অর্জুন ভগবৎকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করে ভগবানের সগুণব্রহ্মে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ বিশ্ববিভূতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই অলৌকিক পরমাত্মার বিশ্বরূপ মানুষ সাধারণ চক্ষুর দৃষ্টি সহায়ে দেখতে পারে না। কারণ মানুষের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, ভগবানের অনন্তরূপ দর্শন করা সম্ভব নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক পৃথক জ্ঞান হওয়া সম্ভব কিন্তু একসঙ্গে সমগ্র জ্ঞানের ধারণা সম্ভব নয়। মানুষ বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা কেবল বস্তুর পার্থিব বাহ্যরূপই অনুভব করতে পারে, তার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সত্তা অনুভব করতে পারে না। কেবল দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই ভগবানের দিব্যরূপ দেখতে সমর্থ। তাই ভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করলেন। তার সাহায্যে অর্জুন ভগবানের ঐশ্বরিক যোগবিভূতি সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। অর্জুন স্পষ্টই দেখতে পান—ভগবানই অক্ষয় অব্যক্ত হয়েও বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন, এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানেরই দেহস্থ। এই দিব্যদর্শনের ফলে অর্জুনের কর্তৃত্বাভিমান নষ্ট হয়ে ভগবানের উপদেশের উপর আস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ।। ৯

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বললেন)—রাজন্ (হে রাজন ধৃতরাষ্ট্র) মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (নারায়ণ) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলে) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (পার্থকে) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয় এইরূপ) পরমং (পরম) রূপম্ (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখালেন)।৯

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন (ধৃতরাষ্ট্র), মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে অর্জুনকে নিজ ঐশ্বরিক পরম রূপ বিশ্বরূপ দেখালেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরে তাঁর প্রাসাদে বসে আছেন, সঞ্জয় তাঁর কাছে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যা-যা ঘটছে, তার বিবরণ দিয়ে চলেছেন। অন্ধ কুরুরাজকে ভক্তবৎসল ভগবানের অপার মহিমা বোঝাবার জন্য, এবং ঈশ্বরের পরম কৃপাপাত্র অর্জুন এই যুদ্ধে যে জয়লাভ করবেন, তার ইঙ্গিত করবার জন্য সঞ্জয় বললেন, যে ভক্তের প্রতি ভগবানের এত করুণা, বিনা প্রার্থনায় ভগবান তাঁকে দিব্যচক্ষু দান করলেন, তাঁর যে জয়লাভ পরম মঙ্গল হবেই হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভগবান তাঁর পরম ভক্ত অর্জুনকে কৃপা করে তাঁর পরম দিব্য বিশ্বরূপ দেখালেন।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ।।১০

(সেই বিরাট বিশ্বরূপ) অনেক-বক্ত্র-নয়নম্ (অগণিত মুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট) অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্ (বহু অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট) অনেক-দিব্য-আভরণং (অনেক দিব্য আভরণবিশিষ্ট) দিব্য-অনেক-উদ্যত-আয়ুধম্ (অনেক উদ্যত দিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট)।১০

ঐ পরম বিশ্বরূপ অসংখ্য মুখ ও অগণিত চক্ষুযুক্ত, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু ও বিবিধ দিব্য আভরণবিশিষ্ট এবং অসংখ্য উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত।

যাঁর চারদিকে দৃষ্টি, যিনি সর্বতোমুখ, যাঁর সৌন্দর্যসজ্জার সীমা নাই, আজ সেই অপার মহিমা ও সৌন্দর্যের আধার ভগবান্ ভক্ত অর্জুনকে মহারণস্থলে অদ্ভুত বহু রূপবিশিষ্ট, নানা দিব্য অলংকারে ভূষিত এবং নানা প্রকার উদ্যত দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত পরম রমণীয় বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন তাঁর দিব্য চক্ষু দ্বারা এই অদ্ভুত ঐশ্বরীয় পরম রহস্যময় বিশ্বরূপ দেখতে লাগলেন। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অর্জুন এক নজরে দেখছেন।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ।। ১১

দিব্যমাল্যাম্বর-ধরং (দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রধারী) দিব্যগন্ধ-অনুলেপনম্ (দিব্যগন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব-আশ্চর্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্যময়) দেবম্ (দ্যুতিময়) অনন্তং (অনন্ত) বিশ্বতোমুখম্ (সকলদিকেই মুখবিশিষ্ট)।১১

সেই বিশ্বরূপ দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রে সুশোভিত, দিব্যগন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যময়, দ্যুতিমান, অনন্ত ও সকলদিকেই মুখবিশিষ্ট।

সেই দিব্যপুরুষ দিব্যমাল্য ভূষিত, দিব্যবস্ত্র শোভিত ও দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত, বিস্ময়কর, জ্যোতিরাত্মক, অসীম এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত, সূর্যের মতো। সূর্যের কথা পরের মন্ত্রে বলা হয়েছে। অর্জুন দেখছেন ভগবান যে রূপ ধারণ করেছেন, তাতে পুষ্প ও রত্নাদি-রচিত কত দিব্য মাল্য, পীতাম্বরাদি কত দিব্যবস্ত্র, চন্দনাদির অনুলেপন, অথবা তাতে কত আশ্চর্য তেজ, বল, বীর্য, শক্তি, রূপ, গুণ ও অবয়ব বিদ্যমান রয়েছে, তা অবর্ণনীয়। তাঁর প্রকাশে জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে। সে রূপে পরিচ্ছেদ বা সীমা নেই, এবং যে দিকে দেখ, সেই দিকেই তাঁকে সম্মুখবর্তী বলে বোধ হয়।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।।১২

দিবি (আকাশে) যদি (যদি) সূর্য-সহস্রস্য (সহস্র সূর্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একসঙ্গে) উত্থিতা (উত্থিত) ভবেৎ (হয়) সা (সে প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ(সেই মহাত্মার অর্থাৎ বিশ্বরূপের) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হতে পারে)।১২

আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সহস্র সূর্যের প্রভা উত্থিত হয়, তাহলে সেই মিলিত দীপ্তি মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পূর্বে প্রখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যখন আমেরিকায় প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নির রূপ দেখে তিনি এই শ্লোকটিই আবৃত্তি করেছিলেন। ওপেনহাইমার গীতা পড়েছিলেন, তাই বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তাঁর মনে এই মন্ত্রটির কথা মনে পড়েছিল। আকাশে সহস্র সূর্য একসঙ্গে উঠলে যে দীপ্তি হয়, তার সঙ্গে ভগবানের সেই বিশ্বরূপের মহিমা বা উজ্জ্বলতার কিছুটা তুলনা করা হতে পারে। একটি সূর্যেরই কী প্রচণ্ড দীপ্তি। তার ওপর সহস্র সহস্র সূর্যের মিলিত দীপ্তির প্রকাশ। এই সহস্র সূর্যের অপূর্ব রূপের ছটা দর্শন করা কখনও সম্ভব নয়। ভগবান অর্জুনকে স্বয়ং দর্শন-শক্তি দিয়েছেন। সেই অপূর্ব রূপের বর্ণনা আমরা কিছুটা গীতায় পাচ্ছি।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ।।১৩

তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) তত্র (সেখানে অর্থাৎ ভগবানের সেই বিরাট দেহে) দেবদেবস্য (দেবদেবের) শরীরে (দেহে) অনেকধা (দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদি নানাভাবে) প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) একস্থং (একত্রস্থিত) অপশ্যৎ (দেখলেন)।১৩

তখন অর্জুন সেই দেবাদিদেবের বিরাট দেহে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদি নানাভাবে বিভক্ত তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ সমগ্র বিশ্ব একত্র অবস্থিত দেখতে পেলেন।

ভগবানের বিশ্বরূপের শরীরে অর্জুন কী দেখলেন, উপরের চারটি মন্ত্রে (১০ম-১৩শ) তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা কবিত্বময়। অর্জুন দেখলেন, ভগবানের দেহে অখিল জীবের সমাবেশ। অনেক আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর দেহে বর্তমান। সহস্র সূর্যের কিরণমালার ন্যায় তাঁর দিব্য দেহের জ্যোতি। সমস্ত বিশ্ব, দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোকাদি অনেক অংশে বিভক্ত হয়ে এই বিশ্বরূপের দেহে একত্র বিরাজ করছে। ভগবানের এক ও অদ্বিতীয় সত্তা অনন্ত প্রকাশের মাধ্যমে খণ্ডিত। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অপূর্ব বিশ্বরূপ দেখে বিস্মিত হয়েছেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ।।১৪

ততঃ (তারপরে) সঃ (সেই) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) বিস্ময়-আবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে) দেবং (বিরাটরূপধারী ভগবানকে) শিরসা (নতমস্তক হয়ে) প্রণম্য (প্রণাম করে) কৃতাঞ্জলিঃ (করজোড়ে) অভাষত (বলতে লাগলেন)।১৪

সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হলো। তিনি নতমস্তকে সেই বিরাট-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর দ্বারা দৃষ্ট রূপের বিষয়ে বলতে লাগলেন।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে বিস্ময়ে আবিষ্ট হলেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে তাঁর সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হল। তিনি অবনতমস্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে করজোড়ে দিব্যভাবে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। অর্জুনের এই স্তুতি শত শত বছর ধরে ভক্তরা প্রার্থনা হিসাবে আবৃত্তি করে আসছে। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ভগবানের দিব্য অনুভূতিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর অনন্ত, অনন্ত তাঁর ভাব, তাঁকে অনুভব করার পথও বহু। ঈশ্বরের এই দিব্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে মানুষ পবিত্র ও মহৎ চরিত্রের মানুষ হয়। ঈশ্বরের অনুভূতির এই সৌন্দর্যকে মানুষ নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। মানুষের চরিত্র কতটা রূপান্তরিত হলো, সেইটিই দিব্য অনুভূতির সত্যতা যাচাই করার একমাত্র মানদণ্ড। তাই অনুভূতিই ধর্মের প্রকৃত প্রাণ, ধর্মকে যাচাই করার কষ্টিপাথর। আধ্যাত্মিক অনুভূতির অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার—স্তম্ভ অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, স্বেদ, রোমাঞ্চ, পুলক, স্বরভঙ্গ, বেপথু অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণতা, অশ্রু এবং প্রলয়।

অর্জুন উবাচ
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ।।১৫

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বললেন) দেব (হে দেব) তব (তোমার) দেহে (শরীরে) সর্বান্ (সমস্ত) দেবান্ (দেবগণকে) তথা (এবং) ভূত-বিশেষ-সঙ্ঘান্ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহকে) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষিগণকে) সর্বান্ চ (এবং সকল) উরগান্ (সর্পগণকে) কমল-আসনস্থং চ (ও পদ্মাসনস্থিত) ঈশং (সৃষ্টিকর্তা) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখছি)।১৫

অর্জুন বললেন, হে দেব, আমি তোমার বিরাট দেহে সকল দেবতা, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিবিধ সৃষ্টপদার্থ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকি, অনন্ত, তক্ষকাদি সর্প এবং কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্তা প্রভু ব্রহ্মাকে দেখছি।

অর্জুন করজোড়ে বললেন, হে দেব, আমি তোমার মধ্যে সব বিস্ময়কর প্রকাশ দেখছি। তোমার দেবদেহে অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে আমি বসু, রুদ্র, আদিত্য, স্থাবর-জঙ্গম, সমস্ত চরাচরের বিধাতা ব্রহ্মাকে, ভৃগু আদি ঋষিগণকে এবং বাসুকি আদি সর্পগণকে দেখতে পাচ্ছি। ভগবানের সমষ্টি-শরীর অর্জুন দেখছেন, এই শরীর ভগবানের মহাকাল-মূর্তি বা আদি বিরাটরূপ।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।।১৬

বিশ্বেশ্বর (হে জগদীশ্বর) বিশ্বরূপ (হে বিশ্বরূপ) অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্র-নেত্রম্ (বহু-বাহু-উদর-বদন-নেত্রবিশিষ্ট) অনন্তরূপম্ (অনন্তরূপধারী) ত্বাং (তোমাকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখছি) পুনঃ (এবং) তব (তোমার) ন অন্তং (না অন্ত) ন মধ্যং (না মধ্য) ন আদিং (না আদি) পশ্যামি (দেখছি অর্থাৎ তোমার অন্ত, মধ্য বা আদি দেখছি না)।১৬

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, আমি তোমাকে অসংখ্য বাহু-উদর-মুখ-নয়নবিশিষ্ট, সকল দিকেই অনন্তরূপে দেখছি। কিন্তু তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত কোথাও কিছু দেখছি না।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে সুগভীর বিস্ময়কে প্রকাশ করতে চাইছেন। ভক্ত ভগবানকে দর্শন করে স্তব্ধ অর্থাৎ তাঁর বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অর্জুন ভগবানের দিব্যরূপের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর বিস্ময়কে কিছুটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। ভগবানের নেত্র-নাসাদির শেষ নাই, শোভার শেষ নাই, রূপের শেষ নাই। কোথায় তাঁর আদি, কোন স্থানে তাঁর মধ্য ও কোথায় তাঁর অন্ত—তার কিছুই বুঝবার উপায় নাই।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ।। ১৭

কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাহস্ত) চক্রিণং চ (ও চক্রধারী) সর্বতঃ (সর্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিমান) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জশালী) দুর্নিরীক্ষ্যং (অতিকষ্টে যা দেখা যায়) দীপ্ত অনল-অর্ক-দ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাসম্পন্ন) অপ্রমেয়ং চ (এবং অপরিমেয় অর্থাৎ পরিচ্ছেদ করা অসম্ভব) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সবদিকে) পশ্যামি (দেখছি)।১৭

কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য,অপ্রমেয়স্বরূপ তোমার অদ্ভুত মূর্তি আমি সবদিকে দেখছি। তোমার এই দীপ্তিময় রূপ এবং সীমাহীন দেহকে আমার পক্ষে নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য।

অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে করজোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছেন--হে দেবশ্রেষ্ঠ, তুমিই সর্বজীবের আধার। এই ত্রিলোকে যত জীব আছে-ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা, স্বর্গবাসী দেবতাগণ, মর্তবাসী ঋষি ও অন্যান্য জীবকুল এবং পাতালবাসী বাসুকি ও

নাগগণ—সমস্তই তোমার দেহে একত্র বিদ্যমান। তোমার অসংখ্য বাহুদ্বারা তুমি কর্ম কর, অসংখ্য উদরে তুমি ভোজন কর, অসংখ্য মুখে তুমি কথা বল, অসংখ্য চোখে তুমি দর্শন কর। তোমার দেহের আদি, অন্ত বা মধ্য কিছুই নির্ণয় করা যায় না। তুমি অসীম, পরিচ্ছেদ বা পরিমাপ করা অসম্ভব। তোমার ঐশ্বর্য ও তেজোবীর্যের সীমা নাই। তোমার মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা ও চক্র। চারদিকে ব্যাপ্ত তেজোরাশি দ্বারা তুমি দীপ্তিমান। প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তোমার প্রভা। তোমার দিকে তাকালে চক্ষু ঝলসে যায়, অতি কষ্টে তোমার রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তোমাকে সর্বত্র আমি এইরূপ দেখছি।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।।১৮

ত্বম্ (তুমি) অক্ষরং (পরব্রহ্ম) পরমং (শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (জগতের) পরং (শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র) নিধানম্ (আশ্রয়) ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বত-ধর্ম-গোপ্তা (সনাতন ধর্মের রক্ষক) ত্বং (তুমি) সনাতনঃ (চিরন্তন) পুরুষঃ (পরমাত্মা) মে (আমার) মতঃ (অভিমত)।১৮

তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম এবং জ্ঞানিগণের একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি সনাতন বৈদিক ধর্মের রক্ষক। তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ—এই আমার নিশ্চিত অভিমত।

অর্জুন বিশ্বরূপের বর্ণনা করে বললেন—হে ঈশ্বর, বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই, এবং সেই জন্যই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্যও তুমি। তুমিই অব্যক্ত পরমপুরুষ, এই বিশ্বের পরম আশ্রয়স্থান। এই বিশ্ব তোমা হতে উৎপন্ন হয়ে তোমাতে স্থিতিলাভ করে, আবার তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে সনাতন নিয়ম চলছে, তুমিই তার নিত্য রক্ষক, তোমাকেই সেই সনাতন পুরুষ বলে আমি উপলব্ধি করছি।

আমাদের যথার্থ প্রকৃতি যে আত্মা, তিনি সনাতন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সনাতন সম্পর্ক। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন—'শাশ্বত ধর্মগোপ্তা', আপনি এই শাশ্বত ধর্মের, এই সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তা। মানুষের তৈরি ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ধর্ম চিরস্থায়ী। শাশ্বত ধর্ম বা সনাতন ধর্মের এই হলো অর্থ। ভারতের বেদান্ত ধর্মকে আমরা সনাতন ধর্ম বলি। শাশ্বত সত্যই শাশ্বত ধর্মকে রক্ষা করতে পারে। বেদই শাশ্বত সত্য। সেই শাশ্বত সত্যের রক্ষাকর্তা স্বয়ং ভগবান।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্-
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ।। ১৯

অনাদি-মধ্য-অন্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তহীন) অনন্ত-বীর্যম্ (অনন্ত-শক্তিশালী) অনন্ত-বাহুং (অগণিত বাহুবিশিষ্ট) শশি-সূর্য-নেত্রম্ (চন্দ্র-সূর্যরূপ চক্ষুবিশিষ্ট) দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রং (জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট) স্ব-তেজসা (স্বীয় তেজদ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বম্ (জগৎ) তপন্তম্ (সন্তাপকারী) ত্বাং (তোমাকে) পশ্যামি (দেখছি)।১৯

আমি দেখছি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তুমি অসীম শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট, চন্দ্রসূর্য তোমার নেত্রস্বরূপ, তোমার বদনমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশনের জ্যোতিঃ, তুমি নিজ-তেজে নিখিল বিশ্বকে সন্তপ্ত করছ।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে স্তব করছেন। হে ভগবন্! তুমি আদি, মধ্য, অন্তহীন অর্থাৎ তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশবর্জিত। অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট—তোমার হাত, পা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই অনন্ত। পরম জ্যোতির আধারস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য তোমার দুটি চোখ, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসদৃশ তোমার মুখ, তুমি নিজের তেজরাশি দ্বারা জগৎকে তপ্ত করছ। তোমার অপরিমেয় প্রভাবের শেষ নেই। তোমার অবয়বের সীমা করবার সামর্থ্য কারও নেই।

দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ।।২০

মহাত্মন্ (হে ভগবন্) দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্ (এই) অন্তরম্ (অন্তরীক্ষ অর্থাৎ মধ্যস্থল) একেন (একমাত্র) ত্বয়া হি (তোমার দ্বারাই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত আছে) সর্বাঃ চ (ও সকল) দিশঃ (দিক্) তব (তোমার) ইদম্ (এই) অদ্ভুতম্ (অদৃষ্টপূর্ব) উগ্রং (ঘোর) রূপম্ (রূপ) দৃষ্টা (দেখে) লোক-ত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্ (ব্যথিত বা সন্তাপিত হচ্ছে)।২০

হে মহাত্মন্, একমাত্র তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এই অন্তরীক্ষ এবং সকল দিক ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ। তোমার এ অদ্ভুত উগ্রমূর্তি দর্শন করে ত্রিভুবন ভীত হচ্ছে।

ভগবানের বিশ্বরূপ কেবল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত তা নয়, তা ভীষণ ও উগ্র। অর্জুন বলছেন, হে ভগবন্! তুমি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমুদয় স্থান ও সমস্ত দিক ব্যেপে আছ। স্বর্গ, মর্ত, অন্তরীক্ষ অথবা যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাই না। দেখছি, তুমি ভিন্ন যেন আর কোনও পদার্থই নাই। সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপ। হে ভগবন্! তোমার এই অদ্ভুত রূপ আর কেউ কখনও দেখেনি। হে

মহাত্মা, তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শনে ও এর উগ্রতেজঃ-প্রভাবে ত্রিলোকের প্রাণিবর্গ ভীত, ব্যথিত ও সন্ত্রস্ত হচ্ছে।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি

কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।

স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ

স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ।। ২১

অমী (ঐ) সুরসঙ্ঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বাং হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করছেন) কেচিৎ (কেউ বা) ভীতাঃ (ভীত হয়ে) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (স্তুতি করছেন) মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধ পুরুষগণ) স্বস্তি ('স্বস্তি'—জগতের কল্যাণ হোক) ইতি (এই) উক্ত্বা (বলে) পুষ্কলাভিঃ (সারগর্ভ) স্তুতিভিঃ (স্তুতিবাক্যে) ত্বাং (তোমাকে) স্তুবন্তি (স্তব করছেন)।২১

বসু-প্রভৃতি ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধ পুরুষগণ 'স্বস্তি'—জগতের কল্যাণ হোক বলে প্রচুর স্তুতিবাক্যদ্বারা তোমার স্তব করছেন।

অর্জুন বলছেন—দেবতা, ঋষি, বসু, রুদ্র, আদিত্য সকল দেবতাগণ তোমার শরীরে প্রবেশ করছেন। তোমার বিশ্বরূপ দেখে সকলে ভয়বিহ্বলচিত্তে তোমার নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করছেন। নারদাদি ঋষিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধপুরুষগণ জগৎ যাতে বিনষ্ট না হয়, তার জন্য স্বস্তিবচনে তোমার স্তুতিগান করছেন।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ।। ২২

রুদ্র-আদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ) যে চ (এবং সে সকল) সাধ্যাঃ (সাধ্য নামক দেবতা) বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (এবং মরুদ্গণ) উষ্মপাঃ (উষ্মপায়ী পিতৃগণ) গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (চমৎকৃত হয়ে) ত্বাং (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করছেন)।২২

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ, উষ্মপা পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তোমার এই বিরাটরূপ দর্শন করছেন।

হে ভগবন্! তোমার অনন্ত মায়া বুঝতে না পেরে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। সকলেই তোমার দিকে গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন।

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩

মহাবাহো (হে মহাবাহো) তে (তোমার) বহু–বক্ত্র–নেত্রং (অসংখ্য মুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট) বহু–বাহু–ঊরু–পাদম্ (অনেক বাহু, ঊরু ও চরণবিশিষ্ট) বহু–উদরং (অনেক–উদরবিশিষ্ট) বহু–দংষ্ট্রা–করালং (বহু দন্তবিশিষ্ট ভীষণাকৃতি) মহৎ (বিরাট) রূপং (রূপ, আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখে) লোকাঃ (সকল প্রাণী) প্রব্যথিতাঃ (ভয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে) তথা (তেমনি) অহম্ (আমিও) ভীত হয়েছি।২৩

হে মহাবাহো, তোমার বহু মুখ, চক্ষু, বাহু, ঊরু, পদ ও উদর এবং বিশালদন্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে প্রাণিগণ অতীব ভীত হয়েছে—আমিও ভীত হয়েছি।

হে ভগবন্! তোমার এই বিশ্বরূপ অসংখ্য মুখ ও চোখ, বাহু, ঊরু, চরণ, উদর এবং দন্তবিশিষ্ট। ভয়ঙ্কর বিরাট দেহ যেন সংহারসূচক বলে বোধ হচ্ছে। লোকত্রয় তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছে। আমাকে তুমি অনুগ্রহ করে এই অপূর্ব রূপ দেখালে এবং এই রূপ দেখার জন্য দিব্য চক্ষুও তুমি দান করেছ। কিন্তু তোমার সমষ্টিরূপ দেখে আমি ভীত হয়েছি। সমগ্র বিশ্ব এই একটি শরীরে অবস্থিত। আমি ভীত হয়েছি এবং এই তিন লোকের সকল প্রাণীও আমার মতো আশঙ্কায় ভীত হয়েছে।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ।। ২৪

বিষ্ণো (হে বিষ্ণু) নভঃস্পৃশং (আকাশস্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেক-বর্ণং (নানাবর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্তৃতমুখবিশিষ্ট) দীপ্ত–বিশাল–নেত্রং (অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখে) প্রব্যথিত–অন্তরাত্মা (ব্যথিতচিত্ত আমি) ধৃতিং (ধৈর্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি (পাচ্ছি না)।২৪

হে ভগবন বিষ্ণু, তোমার গগনস্পর্শী, তেজোময়, নানাবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিতবদন, অত্যুজ্জ্বল বিশাল নয়নবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমার চিত্ত ব্যথিত হয়েছে, আমি ধৈর্য হারিয়েছি, মনকেও শান্ত করতে পারছি না।

হে বিষ্ণো! তোমাকে দেখে যে কেবল ভীত ও ব্যথিত হয়েছি, তাই নয়, তোমার

উজ্জ্বল দীপ্তি আমার চক্ষু সহ্য করতে পারছে না। তোমার মস্তক আকাশ স্পর্শ করেছে। তোমার দেহ দীপ্তিমান এবং অনেক বর্ণশোভিত। তোমার বদন বিস্ফারিত, চক্ষু জ্বলন্ত এবং বিশাল। তোমার এই সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর মুখ ও প্রলয়দৃষ্টি দেখে আমি স্থির ও শান্ত থাকতে পারছি না। তুমি শীঘ্রই এই ভয়ানক রূপ প্রত্যাহার না করলে আমি নিতান্ত বিকল হয়ে পড়ব।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।।২৫

দেবেশ (হে দেবেশ), দংষ্ট্রা করালানি (দীর্ঘ দন্তদ্বারা ভীষণদৃশ্য) কাল–অনল–সন্নিভানি চ (এবং প্রলয়াগ্নিতুল্য) তে (তোমার) মুখানি (মুখসকল) দৃষ্ট্বা এব (দেখেই) দিশঃ (দিকসকল) ন জানে (জানি না, অর্থাৎ আমি দিশেহারা হয়েছি) শর্ম চ (ও শান্তি) ন লভে (পাচ্ছি না), জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস—জগতের আধার) প্রসীদ (তুমি প্রসন্ন হও)।২৫

হে দেবেশ, দীর্ঘদন্ত দ্বারা বিকৃত ও ভীষণদর্শন এবং প্রলয়াগ্নিসদৃশ তোমার বিবিধ মুখ দেখে আমার দিগ্‌ভ্রম হয়েছে। মনে শান্তিও পাচ্ছি না। হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হয়ে শান্তমূর্তি ধারণ কর।

হে ভগবন্! ভেবেছিলাম তোমার অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে পরম সুখ লাভ করব। কিন্তু হে দেবেশ! তুমি যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছ, তা দেখে আমার পূর্বাপর দিগ্‌ভ্রম হচ্ছে, প্রলয় অগ্নির মতো তোমার বিধ্বংসী উজ্জ্বল রূপ। সেই আগুন যেন সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করবে। উদ্বেগে, ভয়ে ও চাঞ্চল্যে সমস্ত সুখই বিনষ্ট হচ্ছে। পূর্ব–পশ্চিম, উত্তর–দক্ষিণ, কোনওকিছুই আমি ঠাহর করতে পারছি না, আমি দিগ্‌ভ্রান্ত এবং আমার চিত্তের সমস্ত সুখ ও শান্তি নষ্ট হচ্ছে। হে জগন্নিবাস! (অর্থাৎ সর্বজগৎ যাঁতে অবস্থান করে সুখ ও শান্তি ভোগ করে) তুমি প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে তোমার শরণাগত সকল জীবের তৃপ্তি সাধন কর।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ।। ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ।। ২৭

অবনিপাল-সঙ্ঘৈঃ সহ (নৃপতিগণের সঙ্গে) অমী চ (এই সকল) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) সর্বে এব (সকলই) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) তথা (এবং) ভীষ্মঃ (ভীষ্ম) দ্রোণঃ (দ্রোণ) অসৌ সূতপুত্রঃ (এবং ঐ সূতপুত্র কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ অপি (আমাদের পক্ষেরও) যোধমুখ্যৈঃ সহ (প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণসহ) ত্বাং (তোমাতে) ত্বরমাণাঃ (দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (বিকট দন্তদ্বারা বিকৃত) ভয়ানকানি (ভয়ানক, ভীষণ) বক্ত্রাণি (মুখগহ্বরসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করছে) কেচিৎ (কেউ কেউ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তম অঙ্গৈঃ (মস্তকদ্বারা উপলক্ষিত হয়ে) দশন-অন্তরেষু (দন্তসন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (সংলগ্ন) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হচ্ছে)।

জয়দ্রথাদি রাজন্যবর্গসহ সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণসহ দ্রুতগতিতে তোমার দংষ্ট্রাকরাল, বিকৃত ও ভয়ঙ্করদর্শন মুখগহ্বরে ধাবিত হয়ে প্রবেশ করছে। কারও কারও মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তা তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

এই যুদ্ধে কী ঘটবে এখানে তারই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভগবান দেখালেন, অর্জুনের জয় নিশ্চিত। তাই অর্জুন বলছেন, হে ভগবন্! শল্যাদি রাজগণসহ ধার্তরাষ্ট্রগণ, অজেয় ভীষ্মদেব, দুর্জয় দ্রোণাচার্য, আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ এবং আমাদের ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যোদ্ধবর্গ তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে। দুর্যোধনাদি দুষ্টগামীর বিকট দন্ত বদনমধ্যে শীঘ্র ধাবিত হচ্ছে। প্রবেশকালে কারও কারও মস্তক যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ও কেউ কেউ বা তোমার দন্তপার্শ্বে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে। সকল পরাক্রান্ত বীরগণ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। কৌরবরা এবং অন্যান্যরা সকলেই মৃত্যুর মুখে ধেয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিত্রাণ নেই, সবাই কালগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ।।২৮

যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (অনেক) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হয়ে) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে) তথা (তেমনি) অমী (এইসকল) নরলোক-বীরাঃ (এই ভূমণ্ডলস্থ বীরগণ) তব (তোমার) অভিবিজ্বলন্তি (সর্বদিকে প্রজ্বলিত) বক্ত্রাণি (মুখসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করছে)।

যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে দ্রুতবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনি এই পৃথিবীর বীরপুরুষগণ তোমার সর্বত্র প্রজ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।

যেমন নদীসমূহ নানা ধারায় বিভক্ত হয়ে, নানা দিক দিয়ে সাগরের দিকে আপনা-আপনি সবেগে ধাবিত হয়ে সেখানে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্যোধনাদি রাজা ও বীরবর্গ যেন বুদ্ধি-বিচার-চেষ্টা না করে অনায়াসে তোমার মুখ-মধ্যে প্রবেশ করছে। কেউ এর পথ রোধ করতে পারছে না। একইভাবে নরলোকের বীররা তোমার লেলিহান মুখবিবরে প্রবেশ করছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ।। ২৯

যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গসকল) সমৃদ্ধ-বেগাঃ (অতিবেগে ধাবমান হয়ে) প্রদীপ্তং (জ্বলন্ত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) তথা (তেমনি) লোকাঃ অপি (লোকগণও) সমৃদ্ধবেগাঃ (দ্রুতবেগে) নাশায় এব (মৃত্যুচালিত হয়েই, মরণের জন্যই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখসমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করছে)।

যেমন পতঙ্গসকল অতিবেগে ধাবমান হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনি এই মনুষ্যগণও মরবার জন্যেই অতিবেগে ধাবিত হয়ে তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।

—চারপাশে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি। আর সেইসব মুখ জ্বলছে। একসঙ্গে বহু নদী যেমন প্রবল বেগে সমুদ্রে গিয়ে মেশে, কুরুক্ষেত্রের এই সব বীর যোদ্ধারাও তেমনি প্রবল বেগে তোমার জ্বলন্ত মুখের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। পতঙ্গ যেমন আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ে, মানুষ সেইভাবে নিজেদের বিনাশের জন্য তোমার মুখের ভিতরে প্রবেশ করছে। নদীর জলধারা সাধারণ নিয়মের গতিতে সমুদ্রে এসে মেশে কিন্তু এখানে পতঙ্গ যেমন অগ্নির আকর্ষণে ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনি দুর্যোধনাদি বীরগণ মরবার জন্য তোমার বিকট মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।

বিশ্বরূপ ভগবানের পূর্ণ বিভূতির প্রকাশ কিন্তু ভগবান যেহেতু অনন্ত পান সব ঐশ্বর্য ফেলে দিয়ে সহজ-সরলভাবে ভক্তের কাছে আসতে। ভক্তের প্রয়োজনেই ভগবান ছোট হয়ে, সমস্ত ঐশ্বর্য গোপন করে আসেন। ভক্তের সামর্থ্য তো সীমিত। তিনিও তাই সীমিত হয়েই ভক্তের কাছে আসেন। তিনি তাঁর পূর্ণ বিভূতি নিয়ে এলে ভক্ত তাঁকে ধরতে পারত না। এখানে ভগবান অর্জুনকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। অর্জুন দেখছেন—এ কী, কৃষ্ণই তো সব! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সবকিছু তাঁর মধ্যে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—সব তাঁর ইঙ্গিতে হচ্ছে। অর্জুন সেই সব ভয়ঙ্কর রূপ দেখছেন।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।। ৩০

জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহদ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোককে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করে) সমন্তাৎ (চারিদিকে, সর্বত্র) লেলিহ্যসে (বারংবার লেহন বা আস্বাদন করছ) বিষ্ণো (হে বিষ্ণো) তব (তোমার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভাসমূহ) তেজোভিঃ (তেজের দ্বারা) আপূর্য (পূর্ণ করে) সমগ্রং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্ব) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করছে)।

তুমি জ্বলন্ত মুখসমূহদ্বারা প্রাণিগণকে গ্রাস করে বারংবার যেন লেহন বা আস্বাদন করছ। হে বিষ্ণো, সমগ্র জগৎ তোমার তীব্র তেজোরাশিদ্বারা সন্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

বীরগণ কেবল মরবার জন্য আপনা-আপনি ছুটে আসছে তা নয়, তোমার গ্রাসেচ্ছার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তারা বেগে আসছে, আর তুমি নিজ প্রদীপ্ত বদনে সকলকে গ্রাস করে ফেলছ। লেলিহান জিহ্বা দ্বারা তুমি লেহন করে নিচ্ছ। তোমার এই সংহারময় দীপ্তিতে জগৎ নিতান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তোমার তেজোপূর্ণ অগ্নি সমগ্র জগৎকে দগ্ধ করছে।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১

উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্তি) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) দেববর (হে দেববর) প্রসীদ (তুমি প্রসন্ন হও)। আদ্যং (আদিপুরুষ) ভবন্তম্ (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (জানতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) হি (যেহেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিম্ (কার্য) ন প্রজানামি (বিশেষরূপে জানিনা)।

এহেন উগ্রমূর্তি তুমি কে, তা আমাকে বল। হে দেববর, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি। তুমি কে, তোমার প্রচেষ্টা কি তা আমি কিছুই জানি না।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। এখন অর্জুন খুব নম্র হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন ভগবানের শান্ত, সুন্দর, সৌম্য রূপ দেখবেন। কিন্তু তিনি এ কী দেখলেন? তিনি শ্রীভগবানকে অনুনয় করে বলছেন, হে ভগবন্! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করেছ, তা দেখে তোমাকে আমি চিনতে

পারছি না। তাই জিজ্ঞাসা করছি, হে দেবোত্তম! তুমি কি প্রলয়কারী মহারুদ্র বা প্রলয়ানল, অথবা মহামৃত্যু, কিংবা কালান্তক, বা পরম পুরুষ, অথবা আর কিছু? তুমি তোমার স্বরূপ পরিষ্কার করে আমাকে বুঝিয়ে দাও। তোমাকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। আমি তোমার সখা ও শিষ্য হয়েও তোমার অলৌকিক তত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারছি না। বস্তুত তোমার তত্ত্ব তুমি অনুগ্রহ করে না বুঝিয়ে দিলে কেউই নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা তোমাকে জানতে সমর্থ হয় না। তোমার অনন্ত রূপ—অনন্ত ভাব—অনন্ত চেষ্টা ও অলৌকিক প্রকৃতি কেউই বুঝে উঠতে পারে না। তাই হে ত্রিলোকনাথ! তোমার এই বিকট বিশ্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

শ্রীভগবানুবাচ
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।। ৩২

শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) লোক-ক্ষয়-কৃৎ (আমি লোকসংহারকারী) প্রবৃদ্ধঃ (অত্যুৎকট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কালঃ (কাল অর্থাৎ মৃত্যু) অস্মি (হই) লোকান্ (প্রাণিগণকে অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থমাত্রকে) সমাহর্তুং (সংহার করতে) ইহ (এখন) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হয়েছি) ত্বাং ঋতে অপি (তুমি বধ না করলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষসৈন্যদলে) যে (যে-সকল) যোধাঃ (যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রয়েছে) সর্বে (তারা কেউই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকবে না)।

শ্রীভগবান বললেন—আমি লোকক্ষয়কারী অতিভীষণ মহাকাল। বর্তমানে এই লোকসমূহ সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও, অর্থাৎ তুমি যুদ্ধে বিরত থাকলেও, বিপক্ষদলে যে যোদ্ধৃগণ আছেন তারা কেউই জীবিত থাকবে না, অর্থাৎ মহাকালরূপে আমিই সকলকে সংহার করব।

অর্জুনের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন, সমস্ত প্রাণীজগৎ সৃষ্টি করে আমিই আবার তাদের সংহার করে থাকি। আমি হলাম মহাকাল, জীবকুলের ক্ষয়সাধন করাও আমার কাজ। আমি বর্তমানে ঘোর রূপ ধারণ করে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সমাগত যোদ্ধাদের সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। কেবল দুর্যোধনাদি নয়, তুমি যে ভীষ্ম, দ্রোণ এঁদের বধ করতে শঙ্কিত হয়েছ, দুই পক্ষের সেইসব মহারথিবর্গও সংহত হবে। তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমার সংহার-মায়া দ্বারা সকলেই মৃত্যু-বরণ করবে।

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ।। ৩৩

তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (ওঠ) যশঃ (যশ) লভস্ব (লাভ কর) শত্রূন্ (শত্রুদের) জিত্বা (জয় করে) সমৃদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর) ময়া (আমা দ্বারা) এতে (এঁরা) পূর্বম্ এব (পূর্বেই) নিহতাঃ (নিহত হয়েছে) সব্যসাচিন্ (বামহস্তদ্বারাও শরক্ষেপণে সমর্থ, হে অর্জুন [তুমি]) নিমিত্তমাত্রং (উপলক্ষমাত্র) ভব (হও) ।৩৩

অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প হয়ে ওঠ অর্থাৎ অস্ত্রধারণ কর, শত্রুজয় করে যশ লাভ কর ও নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। হে অর্জুন, আমি এঁদের সকলকে পূর্বেই নিহত করেছি; তুমি এখন শুধু উপলক্ষমাত্র বা নিমিত্তমাত্র হও।

বাস্তবিক, এটা একটা বিরাট প্রশ্ন—Free will or God's will? স্বাধীন ইচ্ছা, না ঈশ্বরের ইচ্ছা? অর্জুন বলছেন : আমি যুদ্ধ করতে পারব না। আত্মীয়স্বজনদের বধ করে আমি রাজ্য ভোগ করতে পারব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন, বললেন? তুমি যুদ্ধে এদের মারবে মনে করছ? এই দেখ, আমি এদের আগেই মেরে দিয়েছি। তাদের কর্মদোষে আমার সংহার-মায়ার তীব্র তেজে তারা সকলে আপনা-আপনিই দগ্ধ হয়ে রয়েছে। বস্তুত তুমি বধকারী নও, এবং বধজন্য পাপভাগীও হবে না। তুমি না মারলেও তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব নির্বোধের মতো এই অনায়াস যশোলাভের শুভ অবসর পরিত্যাগ করো না। যুদ্ধ করলেই তোমার নিশ্চয় জয় হবে। তবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রয়েছ কেন? উঠো, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। ভীষ্মদেব দুর্জয় মনে করো না। কেননা, আমি পূর্বেই তাদেরকে সংহার করে রেখেছি।

ভগবান বলছেন—অর্জুন, তুমি কারণমাত্র, উপলক্ষমাত্র হয়ে বিজয় ও খ্যাতি লাভ কর। তুমি শুধু নিমিত্ত হও, আমার যন্ত্রস্বরূপ কাজ কর। নিমিত্তমাত্র অর্থাৎ আমি কিছু না--সব তুমি করছ। কেন করছ জানি না—কিন্তু তুমিই সব করছ। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরনি। আমি রথ, তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি। আমি যা-কিছু করছি, সে তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছ বলে করছি।

মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সব শক্তির আধার ঈশ্বর। সবকিছুর মূল তিনি। তাঁর থেকেই সব শক্তি। আমাদের স্বাধীন শক্তি কিছু নেই। তাঁর থেকে আমরা আলাদা থাকতে পারি না। সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁর আলোতে সবকিছু আলোকিত হচ্ছে – 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

বাস্তবিক দুটি দৃষ্টিভঙ্গি—দৈব ও পুরুষকার। একদল বলছে—সব তুমি। আর একদল বলছে—সব আমি। একদল বলছে সব দৈব। আর একদল বলছে—না সব পুরুষকার।

দৈব যদি সব হয় তাহলে একটা প্রশ্ন হয়, আমরা যে পাপ করি, ভুল করি, অন্যায় করি--সেও তো ঈশ্বরের ইচ্ছায়? তাহলে আমি অন্যায় করে যাই না কেন? কারণ, তাঁর উপরে তো আমার কোনও হাত নেই। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা তখন আমি আর অন্যায় করব না। এ যদি হয়, তাহলে আমাদের সব কর্মপ্রচেষ্টাই অর্থহীন হয়ে যায়। দৈব যদি সব হবে, তাহলে আর সাধন-ভজনের কী দরকার? ঈশ্বরের যখন ইচ্ছা হবে তখন তিনি দেখা দেবেন। এখন আমি অন্যায় করে যাই, যা ইচ্ছা তাই করি—তাঁর ইচ্ছায় এ সব করছি, আবার তাঁর যখন ইচ্ছা হবে তখন তিনি দেখা দেবেন। কিন্তু আমরা দেখি যে, যুগ যুগ ধরে সাধকরা ঈশ্বরলাভের জন্য কত কষ্ট করেছেন, কত সাধনভজন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কত কঠোর তপস্যা করেছেন, অথচ তিনিই বলছেন : সবই ঈশ্বরাধীন। তাঁরা বলছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা অথচ তাঁরা ঈশ্বরলাভের জন্য কত তপস্যা করছেন।

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, ঈশ্বরদর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ভেদবুদ্ধি, ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকবেই থাকবে। এটা ঠিকই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সবকিছু হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরলাভ করার আগে পর্যন্ত আমরা সেকথা বলতে পারি না, বললে সেটা 'মিথ্যাচার' হয়ে যায়। কারণ, আমাদের 'অভিমান' আছে। আমার এই বোধ আছে যে, 'আমিই করছি।' আমি যদি করি, তাহলে আমি ভালও করছি, মন্দও করছি। ভাল করলে ভাল ফল পাব, মন্দ করলে মন্দ ফল পাব। শুধু মন্দটার সময় বলা চলবে না যে, 'ঈশ্বর করছেন।' ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরের পূর্ণ শরণাগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের 'আমি' ভাব যায় না। সবই তোমার ইচ্ছা—এই ভাব ঈশ্বরদর্শনের পরই আসে। তখন সেটা ঠিক ঠিক বলা যায়। তার আগে পর্যন্ত পুরুষকারের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব : প্রভু, তুমি আমাকে কৃপা কর, যাতে আমি সত্যি সত্যি বলতে পারি—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী—মন-মুখ এক করে যেন একথা বলতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিচারবুদ্ধি সবসময় জাগ্রত রাখব। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ—এই বিচার সবসময় করতে হবে। বিচার করে মনকে মন্দ থেকে ভালর দিকে নিয়ে যাব। মনকে বোঝাব যে, সব ঈশ্বর করছেন, সব দৈবনির্ভর। পুরুষকার অবলম্বন করে মনকে 'অসৎ' থেকে 'সৎ'-এর দিকে নিয়ে যাব, 'Lower Truth' থেকে 'Higher Truth'-এর দিকে নিয়ে যাব। তাই ভগবান পূর্বে বলেছেন—নিজেই নিজেকে উদ্ধার করব। আমিই আমার ত্রাণকর্তা। আমি নিজে যদি নিজেকে উদ্ধার না করি—কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। তাই ভগবান বলছেন আমি তো আছি, কিন্তু নিমিত্তমাত্র হয়ে, আমার উপর নির্ভর করে, এগিয়ে যাও। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এক-পা যদি তুমি ঈশ্বরের দিকে এগোও, তাহলে তিনি দশ-পা তোমার দিকে এগিয়ে আসবেন। অর্থাৎ আমাকে এগোতে হবে,আমি যদি এগিয়ে না যাই, তাহলে হবে না। ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরদর্শন হবে কিন্তু সেই কৃপা পেতে গেলে তপস্যা চাই। তাঁর কৃপা ধারণের যোগ্যতা তো অর্জন করতে হবে। আমি যোগ্যতা অর্জন না করে যদি কোনও জিনিস পাই,

পেয়েও সেটা ধরে রাখতে পারব না। যাতে আমার উপর ঈশ্বরের কৃপা হয়ে, ব্যাকুল হয়ে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার উপর জোর দিতে হবে। এই চেষ্টাই আমার তপস্যা। পুরুষকারের দ্বারা চেষ্টা এবং শেষে দৈব। আত্মকৃপার পর দৈবকৃপা। মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। নিজের সমস্ত কুসংস্কার পুরুষকারবলে দূর করতে পারে। শেষে সে দেখে যে, তার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথাহন্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ।। ৩৪

ময়া (আমা কর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং চ (দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধ-বীরান্ অপি (যুদ্ধবীরগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বিনাশ কর)। মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হয়ো না) রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদের) জেতাসি (জয় করবে) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ।৩৪

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করেছি, অর্থাৎ তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করে রেখেছি, এখন তুমি স্থিরনিশ্চিত মৃত্যু যাদের, সেই বীরগণকে নিহত কর। তুমি ব্যথিত হয়ো না, যুদ্ধ কর। তুমি নিশ্চয়ই এই যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করতে পারবে, অতএব যুদ্ধ কর।

অর্জুন হয়তো ভাবছেন, দ্রোণাচার্য ব্রহ্মতেজবিশিষ্ট ধনুর্ধারী গুরু, তিনি দুর্জয়, ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু ও দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, পরশুরামও তাঁকে পরাভব করতে পারেননি, তিনি অজেয়। জয়দ্রথ স্বয়ং শিবভক্ত, তাঁর শিরচ্ছেদ করে ভূমিতে যে নিক্ষেপ করবে সেই মুহূর্তে সেই যোদ্ধার মস্তক ছিন্ন হয়ে পড়বে। কর্ণ সূর্যসদৃশ তেজীয়ান ও অক্ষয় কবচকুণ্ডলধারী, তাঁকে বধ করা কঠিন। আবার কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা ও ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি বীরগণও শক্তিশালী যোদ্ধা। এ সমস্ত বীরগণকে নিহত করা কি সহজ হবে? এই জন্য ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি বৃথা চিন্তিত ও ভীত হয়ো না, যখন যুদ্ধার্থ সজ্জিত হয়ে এসেছ, তখন কাপুরুষের ন্যায় নিবৃত্ত না হয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এইসকল বীরদের মৃত্যু অনিবার্য। আমার দ্বারা তারা আগেই হত হয়েছে অর্থাৎ আমিই পরমেশ্বর কালরূপে তাদের ইতোমধ্যেই গ্রাস করেছি। তুমি এদের বধের কর্তা নও, তুমি উপলক্ষমাত্র। এখন আমার দ্বারা নিহত ব্যক্তিগণকেই তোমাকে বধ করতে হবে। তুমি যুদ্ধ কর, নিশ্চয়ই শত্রুগণকে জয় করতে পারবে। তোমার বিজয় নিশ্চিত।

সঞ্জয় উবাচ
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ।। ৩৫

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বললেন)—কেশবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনে) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (কিরীটধারী অর্জুন) কৃত-অঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলি হয়ে) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করে) ভীতঃ ভীতঃ (অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে) প্রণম্য (প্রণাম করে) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) সগদ্গদম্ (গদগদস্বরে) আহ (বললেন)।৩৫

সঞ্জয় বললেন—শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জুন পুনরায় ভয়ে-ভয়ে কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ও প্রণাম করে গদগদভাবে বলতে লাগলেন।

ইন্দ্র-প্রদত্ত কিরীটধারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করে কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করলেন এবং অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে পুনরায় নমস্কার করে গদগদস্বরে বললেন—।

অর্জুন উবাচ
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।। ৩৬

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বললেন)—হৃষীকেশ (হে কৃষ্ণ) তব (তোমার) প্রকীর্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্তনে) জগৎ (বিশ্ব) প্রহৃষ্যতি (অত্যন্ত প্রসন্ন হয়) অনুরজ্যতে চ (অনুরক্তও হয়) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হয়ে) দিশঃ (দিকে দিকে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে) সর্বে (সকল) সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ (সিদ্ধগণও) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন) স্থানে (এসবই যুক্তিসঙ্গত বটে)।৩৬

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্যকীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত হয়ে যে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় —এ যুক্তিসঙ্গত, কারণ তুমিই প্রাণিগণের একমাত্র গতি। আবার তেমনি রাক্ষসেরা যে ভীত হয়ে চারদিকে পলায়ন করে তাও স্বাভাবিক, কারণ তুমিই দুষ্টদের ভয়ের কারণ এবং সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন, তাও যথার্থই বটে।

হে ভগবন্! তুমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক, অদ্ভুত প্রভাবশালী ও ভক্তবৎসল। তোমার গুণগাথা কীর্তন ও শ্রবণ করে সকল প্রাণী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবেই তো। তুমি যে বলেছ, দুষ্টগণের সংহারের জন্য তোমার আবির্ভাব, এই শুনে রাক্ষসগণ যে ভয়ে

পলায়ন করবে, তাতে আশ্চর্য কী? আবার তোমার কৃপায় মোহিত হয়ে দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণ আদি যাঁরা তোমাকে নমস্কার করবেন, তাও তো বিচিত্র নয়।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ।। ৩৭

মহাত্মন্ (হে মহাত্মান) অনন্ত (হে অনন্ত) দেবেশ (হে দেবেশ) জগৎ-নিবাস (হে জগদাশ্রয়) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মা হতেও) গরীয়সে (গরীয়ান) আদিকর্ত্রে চ (এবং আদিকারণ) তে (তোমাকে) কস্মাৎ (কেন) (দেবগণ) ন নমেরন্ (নমস্কার না করবেন?) সৎ (ব্যক্ত) (এবং) অসৎ (অব্যক্ত) পরং (এ উভয়ের অতীত) যৎ (যে) অক্ষরং (অক্ষর পরব্রহ্ম) তৎ চ (তাও) ত্বম্ (তুমি) ।৩৭

হে মহাত্মন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কর্তা। অতএব সমগ্র জগৎ তোমাকে কেন নমস্কার করবে না? যা ব্যক্ত ও যা অব্যক্ত—সে সবই তুমি এবং সৎ ও অসতের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম—তাও তুমি অর্থাৎ তুমি ছাড়া এ ত্রিজগতে অন্য কিছুই নেই।

হে মহাত্মন্—পরম উদারচিত্ত! হে অনন্ত—সকল প্রকার পরিচ্ছেদ-বিহীন! হে দেবেশ-—হিরণ্যগর্ভ আদি দেবগণেরও নিয়ামক! হে জগন্নিবাস—সকলের আশ্রয়! হে জগৎ-নিয়ন্তা, হে জগতের আশ্রয়স্বরূপ! তুমি জগৎ-বিধাতা ব্রহ্মারও পরম গুরু ও সৃষ্টিকর্তা। এইজন্য সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। তুমি সৎ ও অসতের অতীত অক্ষর ব্রহ্ম, তুমিই কারণ এবং তুমিই কার্য আবার কার্য-কারণের অতীত। তুমি ব্যক্ত ও তুমি অব্যক্ত আবার তুমিই ব্যক্ত-অব্যক্তের অতীত মূল কারণ পরব্রহ্ম। তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।। ৩৮

অনন্ত-রূপ (হে অনন্তরূপ) ত্বম্ (তুমি) আদি-দেবঃ (দেবগণেরও আদি অর্থাৎ দেবগণও তোমা হতে উদ্ভূত) পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ (পুরুষ) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র) নিধানম্ (লয়স্থান) বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং ধাম চ (পরম পদও) অসি (হন) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বম্ (এ জগৎ)

ততং (ব্যাপ্ত রয়েছে) ।৩৮

হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, অনাদি পুরুষ, তুমিই এ বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান। তুমিই জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, তুমিই পরম ধাম। তুমিই এই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অবস্থান করছ।

হে ভগবন্! তুমিই সকল দেবতাদের মধ্যে প্রথম দেবতা অর্থাৎ তোমা হতেই সকল দেবতার উদ্ভব হয়েছে। তুমি সকল সৃষ্টির আদি, তুমি অনাদি—অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে তুমিই প্রকাশিত। শরীরমাত্রেই অন্তরাত্মারূপে তোমারই স্থিতি। তুমি জগতের লয়স্থান, তুমি জগতের সকলই জ্ঞাত আছ, আবার তোমাকেই জ্ঞাত হবার জন্য জগৎ ব্যাকুল। তুমিই পরম ধাম অর্থাৎ জীবের শেষ আশ্রয় স্থান—সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু। জগতে ওতপ্রোতভাবে তোমারই সত্তা বিদ্যমান।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ।। ৩৯

ত্বং (তুমি) বায়ুঃ (বায়ু) যমঃ (যম) অগ্নিঃ (অগ্নি) বরুণঃ (বরুণ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ (পিতামহ ব্রহ্মা) প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারও জনক) তে (তোমাকে) সহস্র-কৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) পুনঃ চ (পুনর্বারও) নমঃ (নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃপুনঃ নমস্কার) ।৩৯

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র। তুমিই লোক-পিতা ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার জনকও তুমি। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আবার তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।

হে ভগবন্! তুমিই বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়ে জীবের জীবন রক্ষা করছ। তুমিই যমরূপে আবার তাদেরকে সংহার করছ। তুমিই তেজোরূপে জগৎকে উত্তপ্ত করছ। আবার জলরূপে সকলকে শীতল করছ। সূর্য ও চন্দ্ররূপে তুমিই জগৎকে প্রকাশ করছ। তুমি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করছ। তুমি সকলেরই প্রণম্য। আমি তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্বক বারংবার নমস্কার করছি। তোমাকে যতবারই প্রণাম করি, কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হচ্ছে না—প্রাণ-মন যেন আরও বারবার সহস্রবার প্রণাম করতে চাইছে। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে অর্জুন তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই কেবলই বলছেন, 'তোমাকে সহস্র প্রণাম।'

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ।।৪০

সর্ব (হে সর্বাত্মন) তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (এবং) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাতে) নমঃ (নমস্কার করি) তে (তোমার) সর্বতঃ এব (সবদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) অনন্ত-বীর্য (হে অনন্তশক্তি) অমিত-বিক্রমঃ (অমিত বিক্রমশালী) ত্বং (তুমি) সর্বং (সমস্ত বিশ্বে) সমাপ্নোষি (ব্যাপ্ত হয়ে আছ) ততঃ (তাই) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হও)।৪০

হে সর্বাত্মান, তোমাকে সম্মুখ হতে নমস্কার, পশ্চাৎ দিক হতে নমস্কার, তোমাকে সকল দিক হতেই নমস্কার করছি। হে অনন্তবীর্য, তুমি অসীম বিক্রমশালী। তুমি সমস্ত বিশ্বে এক আত্মারূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ। তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। সমস্তই তুমি-সেজন্যই তুমি সর্বস্বরূপ।

ভগবান সর্বস্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ আদি-অন্ত-পরিচ্ছেদশূন্য, তাঁর অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ নেই। কিন্তু ভক্তগণ তাঁকে সকল কর্মের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ বলে স্বীকার করেন। তাই অর্জুন সকল কর্মের আদিতে, তাঁর সম্মুখ ভাগে, অন্তে পশ্চাৎ ভাগে ও মধ্যে সর্বত্র বিদ্যমানতা দর্শন করে তাঁর সম্মুখে, পশ্চাতে ও চারদিকে নমস্কার করলেন। ভগবানের কায়িক বল, রূপ, বীর্য, শিক্ষা এবং শস্ত্রাদির প্রয়োগ-কুশলতারূপ বিক্রমের সীমা নাই। তিনি নিজ সত্তা অর্থাৎ আত্মারূপে জগৎব্যাপী রয়েছেন। এই জন্য তিনি সর্বস্বরূপ নামে আখ্যাত হয়েছেন। অর্জুন প্রার্থনা করছেন—'সর্ব সমাপ্নোষি'— তুমি সবকিছু আবৃত করে আছ। 'ততোঽসি সর্বঃ'—তাই তুমি সব। তুমিই সকল বস্তুর জ্ঞাতা, তুমিই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, তুমিই মুক্ত জীবের পরম নিবাসস্থল। হে অনন্তরূপ, তুমিই সমস্ত বিশ্বব্যাপী বর্তমান আছ। এই ব্যক্ত বিশ্ব পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। মুণ্ডক উপনিষদে (২-২-১১) বলা হয়েছে—'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং' অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ জগৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই। তাই সর্বদিকে তোমাকে প্রণাম জানাই।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ।। ৪১

তব (তোমার) মহিমানম্ (মাহাত্ম্য) ইদং চ (এই বিশ্বরূপ) অজানতা (না জেনে অর্থাৎ অজ্ঞতাবশত) ময়া (আমার দ্বারা) প্রমাদাৎ (চিত্তের বিক্ষেপবশত) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশত) সখা (সখা) ইতি মত্বা (এইরূপ মনে করে) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) হে যাদব (হে যাদব) হে সখে (হে সখা) ইতি মত্বা (এরূপ মনে করে) প্রসভং (অবিবেচনাপূর্বক বা প্রগলভতাবশত) যৎ (যা কিছু) উক্তং (বলা হয়েছে)।৪১

তোমার এই বিশ্বরূপ এবং ঐশ্বর্যমহিমাদি না জেনে, তোমাকে শুধু সখা মনে করে, আমি ভুল করে বা প্রণয়বশত 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে'—এভাবে অশোভনভাবে

অর্থাৎ অবিবেচনাপূর্বক সম্বোধনে যা-কিছু বলেছি সবকিছুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বললেও ভগবানের প্রকৃত মাহাত্ম্য না জেনে, সমবয়স্ক এবং সখা ভেবে তাঁকে হয়তো কখনও মাতুলপুত্র বোধে যাদব, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা সখা বলে লৌকিক বুদ্ধিতে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এখন দিব্যদৃষ্টিতে ভগাবানের অনির্বচনীয় বিশ্বরূপ দর্শন করে নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে করে পূর্বকৃত স্পর্ধা ও ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাইলেন। তাই অর্জুন বলছেন, 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা' ইত্যাদি তোমাকে এমন সব কথা কী করে বলতে পারলাম? আমি একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। 'ময়া প্রমাদাৎ'—ভ্রমবশত আমি তোমাকে আমারই মতো এক সাধারণ মানুষ মনে করেছি, অথবা 'প্রণয়েন বাপি'—প্রণয়বশত বন্ধুর মতো ভালবেসে তোমার সঙ্গে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছি।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ।।৪২

অচ্যুত (হে অচ্যুত) বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু (আমোদ, ক্রীড়া, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী —অর্থাৎ নিভৃতে) অথবা (অথবা) তৎ-সমক্ষম্ (বন্ধুজনসমক্ষেও) অবহাসার্থম্ (পরিহাসচ্ছলে) চ এবং যৎ (যেমন) অসৎকৃতঃ (অবজ্ঞাত বা অসম্মানিত) অসি (হয়েছ) অহম্ (আমি) অপ্রমেয়ম্ ত্বাম্ (অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার কাছে) তৎ (তার জন্যে) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। ৪২

হে অচ্যুত, আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে, একাকী অথবা বহুজনের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার কত অমর্যাদা করেছি। হে অচিন্ত্যপ্রভাব, সেসবের জন্য তোমার কাছে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

খেলার সময়, শয্যায় শয়নকালে, আসনে বসবার সময়ে এবং ভোজন- কালে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী অথবা মিত্রসঙ্গে রয়েছেন, অর্জুন হয়তো সেই-সেই সময়ে কত উপহাসের কথা বলেছেন। তাই এখন ভগবানের নিকট বিনীতভাবে বলছেন, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবশালী, তুমি নির্বিকার ও পরম দয়ালু, আমার অজ্ঞানকৃত সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা কর। হে অপ্রমেয়, হে অনন্ত, তোমার প্রতি আমার এই শিশুসুলভ আচরণ ক্ষমা কর।

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ।। ৪৩

অপ্রতিমপ্রভাব (হে অতুলশক্তি) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) চর-অচরস্য (স্থাবর ও জঙ্গম) লোকস্য (জগতের) পিতা পূজ্যঃ গুরুঃ (স্রষ্টা, পূজনীয় ও গুরু) গরীয়ান্ চ (এবং গুরুর গুরু অর্থাৎ গুরু অপেক্ষাও অধিক পূজনীয়) অসি (হও) লোক-ত্রয়ে-অপি (ত্রিজগতেও) ত্বৎ-সমঃ (তোমার সমান) ন অস্তি (কেউ নেই) অভ্যধিকঃ (তোমার চেয়ে বড়) অন্যঃ কুতঃ (অন্য কোথায় থাকবে?)।৪৩

হে অপ্রতিমপ্রভাব পুরুষ, তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, তুমি পূজ্য, গুরুবৎ এবং গুরু-অপেক্ষাও অধিক সম্মানার্হ। এ ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই, অতএব তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে?

সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ তোমা হতে উৎপন্ন—এইজন্য তুমি সকলের পিতা। সকল দেবের দেবতা তুমি—এইজন্য তুমি পূজ্য। বেদাদির উপদেষ্টা তুমি— এইজন্য তুমি গুরু। তোমা হতে কেউ আর শ্রেষ্ঠ নাই, এইজন্য তুমি গুরুতর। তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' অর্থাৎ তুমিই এক এবং অদ্বিতীয়। তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই। তোমার শক্তি ও মহিমা অতুলনীয়।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ।। ৪৪

দেব (হে দেব) তস্মাৎ (সেইজন্য) অহম্ (আমি) কায়ং (শরীরকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ অবনত করে) প্রণম্য (প্রণাম করে) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাম্ (তোমাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করছি) পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের) সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (সখার), প্রিয়ঃ ইব (প্রিয় যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) (অপরাধ ক্ষমা করেন, তেমনি তুমিও আমার সব অপরাধ) সোঢুম্ (সহ্য করতে, ক্ষমা করতে) অর্হসি (সমর্থ)।৪৪

হে পূজনীয় দেব, (আমি তোমার কাছে অপরাধী), তাই দণ্ডবৎ প্রণাম করে তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করছি। তুমিই সকলের বন্দনীয় ভগবান। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় (পতি) যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও তেমনি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর।

শেষে অর্জুন দীনভাবে আত্মনিবেদন করছেন এই বলে—হে পরম প্রভু, আমার দেহকে শ্রদ্ধাবনত তোমার চরণে নিবেদন করে, আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করে, সখা যেমন তার প্রিয় সখাকে ক্ষমা করে, প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদকে ক্ষমা করে, তেমনি করেই, হে দেব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার আশ্রিত অর্থাৎ তোমাকে ভিন্ন আর কাউকে জানি না। শরণাগত ভক্তকে রক্ষা

করবার কর্তা তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। তুমি প্রসন্ন হয়ে আমাকে ক্ষমা কর।

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ।। ৪৫

দেব (হে দেব) অদৃষ্ট-পূর্বং (অদৃষ্টপূর্ব তোমার বিশ্বরূপ) দৃষ্টা (দেখে) হৃষিতঃ (হর্ষান্বিত) অস্মি (হয়েছি) ভয়েন চ (আবার ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতং (বিশেষ ব্যথিত হয়েছে) দেবেশ (হে দেবেশ) জগৎ-নিবাস (হে জগন্নিবাস) তৎ (সেই) রূপম্ এব (পূর্বরূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখাও) প্রসীদ (তুমি প্রসন্ন হও)।৪৫

হে দেব, তোমার অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু ঐ বিরাট রূপ দর্শন করে ভয়ে আমার মন বিশেষ ব্যথিত হয়েছে। অতএব হে দেব, তোমার সেই চিরপরিচিত মধুর শান্ত রূপটি আমাকে দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে কৃতার্থ ও আনন্দিত হয়েও সুখী হতে পারলেন না। কারণ, তাঁর অনন্তরূপ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-বুদ্ধিদ্বারা ধারণা করা অসম্ভব এবং তিনি ধ্যানের অতীত। তাই অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি বলছেন, হে প্রভু! তোমার স্বরূপ দর্শনে আমার কোনও অভিলাষ নেই। কিন্তু হে দেব! তুমি যে রূপে ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত করে দাও, অনুগত ও শরণাগতের মন কেড়ে নাও, সখাবেশধারী তোমার সেই মোহন রূপটি আমি দেখতে বড় ভালবাসি, আমাকে সেই শান্ত, মধুর ও মোহন রূপটি দেখাও। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও অর্থাৎ পূর্বের মতো সেই রূপ দেখিয়ে আমাকে অনুগ্রহ কর।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ।। ৪৬

অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (পূর্ববৎ) কিরীটিনং (কিরীটধারী) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তম্ (চক্রধারীরূপে) দ্রষ্টুম্ (দেখতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি সহস্রবাহো (হে সহস্রবাহু) বিশ্বমূর্তে (হে বিশ্বমূর্তি) তেন (সেই) চতুঃভুজেন (চতুর্ভুজ) রূপেণ এব (মূর্তিতেই) ভব (বিরাজ হও)।। ৪৬

আমি তোমাকে কিরীটধারী এবং গদা ও চক্রহস্তরূপে তোমার সেই পূর্বরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহু, বিশ্বমূর্তি, তুমি সেই চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ কর।

তোমার এই বিশ্বরূপ দেখে আমি একদিকে খুব খুশি হয়েছি। খুশি হয়েছি কারণ এই রূপ 'অদৃষ্টপূর্ব'। আগে যা কেউ দেখেনি, তা তুমি কৃপা করে আমাকে দেখিয়েছ, কিন্তু এই বিশ্বরূপ দেখে আমি আবার ভীষণ ভয়ও পেয়েছি। কেন বলছেন, 'ভয় পেয়েছি'? কারণ, এতে যেন শ্রীকৃষ্ণকে দূরের বলে মনে হচ্ছে। ভক্ত আপনার হৃদয়বল্লভকে নিজ মনোমোহন মূর্তিতে দেখতে ভালবাসে। যেমন আমরা গোপীদের ক্ষেত্রে দেখি। মথুরায় রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণ আছেন—গোপীরা তাঁকে দেখে মাথায় কাপড় দিচ্ছে। বলছে—এ কে? এঁকে তো আমরা চিনি না, পরপুরুষ ইনি। তাঁরা যাঁকে চেনেন তাঁর হাতে মোহন বেনু, মাথায় শিখিপাখা—তিনি তাঁদের ব্রজের রাখাল। শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ তাঁদের কাছে অপরিচিত। অর্জুনেরও ঠিক সেই অবস্থা। তিনি যাঁকে চেনেন, তিনি তাঁর সখা, তাঁর রথের সারথি, অতি আপনার জন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে তাই তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। তাই অর্জুন ভগবানকে সহস্রবাহুযুক্ত বিশ্বরূপের পরিবর্তে কিরীটাদিতে অলঙ্কৃত গদাচক্রপাণি ভক্তবৎসল রূপ ধারণ করতে প্রার্থনা করলেন।

তাই অর্জুন বলছেন—'তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস'—হে দেবেশ, হে জগতের আধার, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। কৃপা করে তুমি তোমার আগের রূপ আমাকে দেখাও। তোমার বিভূতি তুমি সংবরণ কর, এই ঐশ্বর্য তুমি লুকিয়ে ফেল। এতদিন তোমাকে যে রূপে দেখে এসেছি, সেই রূপেই তুমি আমার কাছে দেখা দাও। অর্জুনের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিভূতি সংবরণ করলেন এবং অর্জুনও আশ্বস্ত হলেন।

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখলেও তাঁকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলে জানতেন। এই মূর্তি তাঁর ইষ্টমূর্তি। ভগবানের যে-কোনও মূর্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন, তাতে তাঁর ইষ্টমূর্তিই দৃষ্ট হয়ে থাকে। অভেদবুদ্ধিবশত সাধক ভগবানের নানা রূপে, নিজ এক ইষ্টরূপই দর্শন করেন। অর্জুনেরও তাই ঘটেছিল। ভগবানের অনন্ত বিগ্রহের মধ্যেও অর্জুন ঐ চতুর্ভুজ বিষ্ণু- মূর্তিই দেখেছিলেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতেই অনেক বাহু, উদর, বক্ত্রাদি প্রকাশিত হয়েছিল।

চতুর্ভুজ অর্থে চার হাত, তবে অর্জুন এখানে গদা ও চক্র—শুধু এই দুটি অস্ত্রের উল্লেখ করলেন। ভগবানের আর দুই হাতে শঙ্খ ও পদ্ম থাকে। অর্জুন প্রার্থনা করলেন--হে ভগবান! তোমার যে-মূর্তিতে কেবল গদা ও চক্র ভিন্ন অন্য কোনও অস্ত্র নাই সেই শান্ত মূর্তি ধারণ কর। অর্থাৎ শঙ্খ ও কমল তো ভয়ের কারণ নয়, তাই অর্জুন ঐ দুটি হাতের কথা উল্লেখ করলেন না। বস্তুত অর্জুন ভগবানের চতুর্ভুজ মোহনরূপ বিষ্ণু-রূপকে লক্ষ করেই প্রার্থনা করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ।। ৪৭

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) অর্জুন (হে অর্জুন) প্রসন্নেন (প্রসন্ন হয়ে) ময়া (আমার দ্বারা) আত্মযোগাৎ (নিজের যোগবিভূতি-প্রভাবে) ইদং (এই) তেজোময়ং (তেজঃপূর্ণ) অনন্তম্ (অনন্ত) আদ্যং (আদিভূত) পরং বিশ্বং রূপং (শ্রেষ্ঠ বিশ্বাত্মকরূপ) দর্শিতম্ (প্রদর্শিত হলো) যৎ (যেরূপ) ত্বদন্যেন (তুমি ছাড়া অন্যের দ্বারা) ন দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে কেউ দেখেনি)।৪৭

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে নিজ যোগমায়া প্রভাবে আমার এই তেজোময়, অনন্ত আদিভূত বিশ্বাত্মক শ্রেষ্ঠ রূপ তোমাকে দেখালাম। আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্বে আর কেউ দেখেনি।

হে অর্জুন! তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হও না। তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, তোমাকে কৃতার্থ করবার জন্যই এই দেবদুর্লভ রূপ দেখিয়েছি। এই রূপের তেজে কোটি সূর্যের তেজ পরাভূত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই এর অন্তর্গত এ রূপের আদিও নাই, অন্তও নাই। অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত তুমি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে এই আশ্চর্য রূপ-দর্শন ঘটেনি। এই বিশ্বাত্মক রূপ তোমাকেই কৃপা করে দেখালাম। তুমি আমার একান্ত অনুগত, শরণাগত ভক্ত হওয়াতেই এই বিচিত্র রূপ দর্শন করতে পেরেছ। অতএব এই রূপ দেখে ভীত না হয়ে বরং নিজেকে ধন্য মনে কর ও প্রসন্ন হও।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।। ৪৮

কুরু-প্রবীর (হে কুরুশ্রেষ্ঠ) ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ (না বেদ অধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞবিদ্যা দ্বারা) ন দানৈঃ (না দানের দ্বারা) ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া দ্বারা) ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্যা দ্বারা) এবং-রূপঃ (এমন রূপবিশিষ্ট) অহং (আমি) নৃ-লোকে (মনুষ্যলোকে) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কেউ) দ্রষ্টুং (দেখতে) শক্যঃ (সমর্থ হয়)। ৪৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যলোকে বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া কিংবা কঠোর তপস্যাদ্বারা—এইরূপ কোনও উপায়ে আমার এই বিশ্বরূপ তুমি ছাড়া অন্য কেউ দর্শন করতে সমর্থ হয় না।

কেউ চার বেদ অর্থবিচারপূর্বক পাঠ করুন, অথবা বিধিপূর্বক বেদভিত্তিক কর্মরূপ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই শিক্ষা করুন, কিংবা নানা (গবাদি, সুবর্ণ ইত্যাদি) দানক্রিয়া করুন, বা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত-স্মার্তাদি ক্রিয়াই করুন, অথবা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিপূর্বক, বা ইন্দ্রিয়সংযম ও

কষ্টক্লেশরূপ কঠোর তপস্যা করুন—প্রকৃত ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে না পারলে এ সমস্তই বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। বিশেষতঃ তাঁর কৃপাদৃষ্টি না হলে কেউ তাঁকে দর্শন করতে পারে না। অর্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ভগবানের বিশ্বাত্মক রূপ-দর্শনে কৃতার্থ হয়েছিলেন। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে—যে প্রার্থনায়, যে কর্মে, যে অনুষ্ঠানে, যে শাস্ত্র অধ্যয়নে, যে তপস্যায়, যে যোগে ও যে জ্ঞানে ভগবৎকৃপা লাভ হয় তাই প্রকৃত কর্ম, বাকি সব অকর্ম।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ।। ৪৯

ঈদৃক্ (এ প্রকার) ইদম্ (এইরূপ) মম (আমার) ঘোরম্ (ভয়ঙ্কর) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখে) তে (তোমার) ব্যথা (ভয় বা মোহ) মা (না হোক) বিমূঢ়-ভাবঃ চ (এবং ব্যাকুলচিত্ত) মা (না হোক) ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ সন্ (প্রসন্নচিত্ত হয়ে) পুনঃ (পুনরায়) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ (সেই) রূপম্ এব (পূর্বরূপই) প্রপশ্য (দর্শন কর)।।৪৯

হে অর্জুন! তুমি আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ব্যথিত হয়ো না এবং তা দেখে তোমার যেন বিমূঢ় ভাব না আসে। তুমি নির্ভয়ে প্রসন্নচিত্তে পুনরায় আমার সেই (তোমার অভিপ্রেত) পূর্বরূপ দর্শন কর।

বিশ্বরূপ দর্শন করে ভক্তের ভয় ও মোহ হচ্ছে দেখে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান স্নেহপূর্বক অর্জুনকে বললেন যে, তুমি আর ভীত, দুঃখিত বা বিমূঢ় হয়ো না। প্রসন্নচিত্তে দেখ, যে চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্তিতে তুমি মন-প্রাণ সমর্পণ করেছ, আমি সেই মনোহর রূপই ধারণ করছি। ভক্ত যখন যা প্রার্থনা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান তখন তাই পূরণ করেন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখতে চেয়েছিলেন বলে ভগবান সেই বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিলেন। আবার অর্জুন এক্ষণে পূর্বরূপ দেখতে চাইলেন, তাই ভগবান তাতেই সম্মত হলেন। কারণ তিনি সর্বদা ভক্তের নিষ্কাম ভক্তিতে ধরা দেন।

সঞ্জয় উবাচ
ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ।। ৫০

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বললেন)—বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনম্ (অর্জুনকে) ইতি (এরূপ) উক্ত্বা (বলে) ভূয়ঃ (পুনরায়) তথা (সেই প্রকার) স্বকং (স্বীয়) রূপং (পূর্বের রূপ) দর্শয়ামাস (দেখালেন)। মহাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমূর্তি) ভূত্বা (হয়ে) ভীতম্ (ভীত) পুনঃ (পুনরায়) এনং (অর্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করলেন)।

সঞ্জয় বললেন—মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এই কয়েকটি কথা বলে পুনরায় নিজমূর্তি ধারণ করলেন এবং প্রসন্নমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে পুনরায় আশ্বস্ত করলেন।

যে রূপ দেখলে ভক্তের চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে, ভগবান বিশ্বাত্মক রূপ সংবরণ করে সেই কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক, শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত চতুর্ভুজ, শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালাপীতাম্বরাদিযুক্ত সৌম্য কৃপাকল্পতরু রূপ-ধারণপূর্বক অর্জুনের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। অর্জুনের প্রার্থনামতো ভগবান শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি বাসুদেব-রূপ ধারণ করলেন। পরে ভগবান তাঁর দ্বিভুজ মূর্তি ধারণ করলেন। এই বাসুদেবই দ্বিভুজ মোহন-মুরলীধর হয়ে ব্রজবালা ও ব্রজ বালকবর্গের সঙ্গে ক্রীড়া করেছিলেন। দ্বিভুজ মূর্তিতে কংসবধ, এবং মথুরায় ও দ্বারকায় রাজত্ব করেছিলেন, এবং এই দ্বিভুজ মূর্তিতেই কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন।

অর্জুন উবাচ
দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ।। ৫১

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বললেন) জনার্দন (হে জনার্দন) তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (শান্ত, প্রসন্ন) মানুষং রূপং (মানবরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখে) ইদানীম্ (এখন) অহম্ (আমি) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ (সঞ্জাত) প্রকৃতিং গতঃ (এবং প্রকৃতিস্থ) অস্মি (হয়েছি)।।

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানবরূপ দর্শন করে আমি এখন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলাম।

ভগবানের সুন্দর ও শান্ত রূপ দেখে অর্জুন বলছেন—হে জনার্দন, আমার মন এখন শান্ত হয়েছে। আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি। আমার সব ভয় চলে গেছে। অর্জুন নিজ সখাকে মনুষ্যরূপে দেখে সুস্থির হলেন। বাস্তবিক আমাদের মন-বুদ্ধি যাঁকে ধারণা করতে পারে না, মনের সাধ মিটিয়ে যাঁকে দেখতে গেলে প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়, ভক্তের হৃদয় ভগবানের সেই রূপ দেখতে ইচ্ছা করে না। ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট মানুষরূপে আসেন, তবেই তাঁকে বোঝা একটু সহজ হয়। ঈশ্বরের দিব্য অথবা ভয়ঙ্কর রূপ মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাই ভগবান ভক্তদের অনুগ্রহ করতে অবতাররূপে আসেন।

ভগবানকে চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ যে মূর্তিতে অর্জুন দেখতে চেয়েছিলেন, ভগবান সেই

সৌম্য রূপেই তাঁকে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান একদিকে যেমন সুন্দর, সৌম্য, অপরদিকে তেমনি উগ্র, ভীষণ। এক হাতে গড়েন অপর হাতে ভাঙেন। একদিকে সৃষ্টি করেন, বিশ্বকে সৌন্দর্যসুষমায় মণ্ডিত করেন, অপরদিকে নির্মমভাবে তার ধ্বংসসাধন করেন। এই সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয় দিকেই তাঁর মঙ্গল হস্ত প্রসারিত। বরাভয়দায়িনী জগদ্ধাত্রী যেমন জগৎকে ধারণ ও পালন করেন, করালবদনা কালী তেমনি নাশ করেন। যিনি জগদ্ধাত্রী তিনিই কালী, যিনি সৃষ্টিস্থিতিবিধাত্রী, তিনিই আবার সংহার কর্ত্রী। সাধক উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপ দর্শন করেন। এখানে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপের সংহারমূর্তি দেখালেন আবার সৌম্য মানবরূপও দেখালেন।

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।। ৫২

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন)—মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দর্শম্ (দুর্নিরীক্ষ্য) যৎ (যে) রূপং (বিশ্বরূপ) দৃষ্টবান্ অসি (তুমি দেখলে) দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য (এই) রূপস্য (রূপের) নিত্যং (সর্বদা) দর্শন-কাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী)।।

শ্রীভগবান অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন—তুমি আমার যে সুদুর্দর্শ বিশ্বরূপ দেখলে তা দর্শন করা সুকঠিন। দেবতারাও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

হে অর্জুন 'সুদুর্দর্শম্ ইদং রূপম্'—যে রূপ তোমাকে আমি দেখিয়েছি, তা অতি দুর্লভ। দেবতাগণ এইরূপ দর্শন করবার জন্য চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করেও এই রূপ দেখতে পান না। এ রূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বল, বুদ্ধি, কৌশল, ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি কোনও উপায়েই আমার এই রূপ দর্শন করা যায় না।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।। ৫৩

যথা (যেমন) মাং (আমাকে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখলে) এবংবিধঃ (এই প্রকার) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদ অধ্যয়ন দ্বারা) ন তপসা (না তপস্যা দ্বারা) ন দানেন (না দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (না যজ্ঞাদি দ্বারা) দ্রষ্টুং (দৃষ্ট হতে) শক্যঃ (যোগ্য হই)।

আমার যে বিশ্বরূপ তুমি দর্শন করলে তা বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, গোসুবর্ণাদিদান বা যজ্ঞাদিঅনুষ্ঠান দ্বারাও কেউ আমার সেই রূপ দর্শনে সমর্থ হন না।

আমার মনোমুগ্ধকর সুন্দর অবতাররূপ দর্শন সুলভ, কিন্তু আমার সমগ্র বিশ্বরূপের দর্শন অতি দুর্লভ। ঋষি দেবতা সকলেই ঐরূপ দর্শনে সর্বদা ইচ্ছুক। দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা আমার কোনও বিশেষ রূপের দর্শন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঐসব ক্রিয়ার

দ্বারা বিশ্বরূপের দর্শন হয় না। অর্জুন শুদ্ধাভক্তির দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ করেন এবং ভগবানের স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।। ৫৪

পরন্তপ অর্জুন (হে শত্রুতাপন অর্জুন), তু (কিন্তু কেবলমাত্র) অনন্যয়া (অনন্যা) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) এবংবিধঃ (এই প্রকার) অহম্ (আমি) জ্ঞাতুং (স্বরূপত জানতে) দ্রষ্টুম্ চ (এবং প্রত্যক্ষ দর্শন করতে) প্রবেষ্টুম্ চ (এবং আমাতে প্রবেশ বা আমার প্রাপ্তিরূপ তাদাত্ম্যলাভ) শক্যঃ (পারা যায়)।৫৪

হে পরন্তপ অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই এরূপ আমাকে জানতে পারা যায় এবং প্রত্যক্ষদর্শন ও অন্তে আমার তাদাত্ম্যলাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তিও ভক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়।

এখানে ভগবান ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন। ভক্তিপথ সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট পথ। অনন্যা ভক্তিদ্বারা ভগবানের অক্ষর, অব্যক্ত সত্তা এবং বিশ্বে প্রকাশিত সমস্ত রূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ সহজে সম্ভব হয়। ভক্ত ভক্তিদ্বারা ভগবানের বিবিধ রূপ দর্শন করেন। ভক্তিপথেই সাধক আত্মজ্ঞানে, বিশ্বপ্রেমে এবং ভাগবত কর্মে ভগবানের সঙ্গে একীভূত হন। অনন্যা ভক্তির দ্বারাই সাধক তাঁতে লীন হয়ে যান। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান না করলে যে জ্ঞান লাভ হয় না, এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়।

ভগবান বলছেন, অনন্যা ভক্তিই একমাত্র উপায়। অনন্যা অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই যা ধাবিত হয়েছে তাদৃশী যে ভক্তি—নিরতিশয় প্রীতি কেবলমাত্র তারই দ্বারা এবংবিধ দিব্যরূপধারী আমাকে জানতে পারা যায়। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বাত্মক দিব্য স্বরূপ দর্শন আদি, অনন্যা ভক্তি দ্বারাই সহজে হতে পারে। অর্জুন অনন্যা ভক্তি-সহ ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন বলেই এই বিশ্বরূপ এবং ইষ্টরূপ দর্শনে কৃতার্থ হলেন।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।। ৫৫

পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন), যঃ (যিনি) মৎ-কর্ম-কৃৎ (আমার প্রীতির জন্য কর্মকারী) মৎ-পরমঃ (মৎপরায়ণ) সঙ্গবর্জিতঃ (আসক্তিহীন, স্পৃহাশূন্য) মৎ-ভক্তঃ (আমার ভক্ত অর্থাৎ একমাত্র আমারই ভজনশীল) সর্বভূতেষু চ (এবং সর্বভূতে) নির্বৈরঃ (বৈরভাবশূন্য) সঃ (তিনি অর্থাৎ সেই ভক্ত) মাম্ (আমাকে অর্থাৎ বাসুদেবরূপ শ্রীভগবানকে) এতি (প্রাপ্ত হন) ।। ৫৫

হে অর্জুন, যিনি আমারই প্রীতির জন্য যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেন, আমিই যাঁর একমাত্র আশ্রয়, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যাঁর কারও প্রতি শত্রুভাব নেই অর্থাৎ কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই-(আত্মবুদ্ধিতে সকলের

সঙ্গেই মিত্রতা) সেই ভক্ত আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চরম উপদেশ প্রদান করে বললেন—হে অর্জুন, তুমি বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক আমার ভক্ত হও, আমাকেই তোমার পরম গতি, পরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর। স্বজন-বন্ধু কারও উপর নির্ভর না করে আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর। আমিই তোমার পরম পুরুষার্থ, পরম জ্ঞাতব্য বস্তু—এইরূপ নিশ্চয় করে আমার শরণাপন্ন হও। তুমি কারও প্রতি শত্রুতা বা হিংসার ভাব পোষণ করবে না, সকল জীবকে ভালবাসবে। সর্বভূতের একত্ব জেনে সমত্ববুদ্ধিতে সকলের সঙ্গে মিত্রভাবে ব্যবহার করবে।

ভগবান এখানে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারস্বরূপ যে অর্থ, নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী অর্থাৎ মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ যাতে তা অনুষ্ঠান করতে পারেন তার জন্য এখানে সুন্দরভাবে একত্র ব্যাখ্যা করলেন। 'মৎকর্মকৃৎ'—যিনি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থই নিষ্কামভাবে সমস্ত শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের উদ্দেশে, ঈশ্বরার্পণমানসে কর্তব্যকর্ম অর্থাৎ স্বধর্মপালন যিনি করেন তিনি 'মৎকর্মকৃৎ'। 'মৎপরম'—ভগবানকে স্বরূপত লাভ করাই যাঁর সমস্ত উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য। একমাত্র ঈশ্বরই যাঁর নিকট পরম প্রাপ্তব্য বলে নিশ্চিত। স্বর্গাদি বিষয় যাঁর নিকট প্রাপ্তব্য বলে নিশ্চিত নয়—তিনি 'মৎপরম'। যিনি সর্বদা ঈশ্বরভজনে তৎপর। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ ভগবান ব্যতীত যিনি ইহলোকে এবং অপরলোকের আর কোনও কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি অনন্যা ভক্তিসহ ভগবৎসত্তায় নিজের ক্ষুদ্র জীবভাব বিসর্জন দিয়ে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন—তিনিই 'মদ্ভক্তঃ'। স্বজন ও বাহ্যবস্তুতে স্পৃহাশূন্য হয়ে অনন্যাভক্তিসহ ভগবানের শরণাগত হওয়াই 'সঙ্গবর্জ্জিতঃ'। 'নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু'—সকল প্রাণীর উপর, এমনকী অপকারীর প্রতিও যিনি বিদ্বেষশূন্য। সর্বজীবে মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে ধ্যানাভ্যাস করবেন, ভগবানকে স্বরূপত; চিন্ময়সত্তারূপে জেনে তাঁকে নিজ সত্ত্বার সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করে তাঁর কৃপা ও মুক্তিলাভ করবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গ্রীনএকারে পাইন বৃক্ষের নীচে বসে ঈশ্বর সাধনা প্রসঙ্গে বলছেন—'ঈশ্বরের প্রেরিত দিব্যপুরুষরা সকলেই আমার গুরু। আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং মহম্মদের কথা জানতে গিয়ে খ্রিস্টের কথা শিখেছি। আমি একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করি। আমি "সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।" আমি কোনও জাতি, রাষ্ট্র বা ধর্মের মধ্যে নিন্দার কিছুই দেখি না, কারণ আমি এ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখি। আমাদের উত্তরণ মন্দ থেকে ভালতে নয়, ভাল থেকে আরও ভালয় এবং ক্রমাগত অধিক ভালতে। ভাল বা মন্দ এসব হতেই আমি শিক্ষা লাভ করি। জাতিতে (নেশন) জাতিতে প্রভেদ এবং এই ধরনের অর্থহীন ব্যাপারসকল যেখানে খুশি থাকুক। ভালবাসা, শুধু ভালবাসা, ঈশ্বরকে এবং আমার ভাইকে অর্থাৎ মানবজাতিকে ভালবাসাই অর্থপূর্ণ আমার কাছে।

'যা কিছু ঐক্য-বিধায়ক তা-ই নৈতিক, যা কিছু বিভেদ সৃষ্টি করে তা-ই অনৈতিক। সেই অদ্বিতীয় এককে জান, এই জানার মধ্যে যেন এক মুহূর্তের জন্যও ছেদ না আসে।

সেই এক যিনি বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত তিনিই বিশ্বের ভিত্তি এবং সকল ধর্মকে, সকল জ্ঞানকে এই কেন্দ্রবিন্দুতে আসতেই হবে। সকল ধর্মের সমস্ত ত্রুটি, ভয়াবহ দিকসমূহ একদিকে সরিয়ে রেখে যে ভাবগুলি সব ধর্মের মধ্যে সমভাবে বর্তমান, সর্ব ধর্মমতের সার সত্য—আত্মার অমরত্ব, একেশ্বরবাদ, ঈশ্বর এবং তাঁর বাণীদূত যে পবিত্রাত্মা—এই তত্ত্ব, প্রত্যেকেই একই মানব-পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এই বিশ্বাস এবং প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে অন্য ধর্মের মানুষের প্রয়োজন মেটাবার মতো সত্য আছে—এই মতবাদ, এই সকলকেই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং মুক্তির জন্য প্রত্যেক ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে।'

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **বিশ্বরূপদর্শনযোগ** নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

শ্রীভগবানের কাছে অর্জুন বিশ্বরূপদর্শনের জন্য যখন কাতর প্রার্থনা জানালেন তখন ভগবান প্রসন্ন হয়ে তাঁর ঐশ্বর রূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীধরস্বামী বলছেন—'ঐশ্বর রূপ' অর্থাৎ জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজঃ প্রভৃতির দ্বারা প্রকটিত ভগবদ্রূপ। আচার্য রামানুজও বলছেন—ভগবানের অসাধারণ রূপ যা সকলের নিয়ন্তা, পালয়িতা, স্রষ্টা, সংহর্তা, ভর্তা, কল্যাণগুণাকর, পরতর, সকল থেকে ভিন্ন মূলজাতীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ ঈশ্বর দর্শনের জন্য শরণাগতি ও ব্যাকুলতা চাই—'দেখা দাও, দেখা দাও' বলে কাঁদতে হবে—তবেই তাঁর কৃপাতে দর্শন সম্ভব। ঈশ্বরকে সাধারণ চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে করতে (ঈশ্বরের কৃপায়) একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখা যায়, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়।..খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়।...

ভগবান অর্জুনকে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করবার পূর্বে তাঁকে ঐশ্বর-রূপ দর্শনোপযোগী প্রজ্ঞানেত্র প্রদান করেছিলেন। কোটি কোটি তপস্যা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদিদ্বারা দেবগণেরও যে-রূপের দর্শন অতীব ক্লেশকর হয়, এই প্রকার বিশ্বরূপ ভগবান ভক্তকে দেখালেন। ঈশ্বরে অনন্যা ভক্তি ও শরণাগতিই একমাত্র পথ। তাই ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত করলেন এবং বললেন—'আমা-কর্তৃক এই সকল (জীবগণ) পূর্বেই নিহতপ্রায় হয়ে রয়েছে। হে সব্যসাচিন্! (অর্জুন) তুমি এই লোকনাশের নিমিত্তমাত্র হও।'

ভক্তিপথেই হোক আর জ্ঞানপথেই হোক—মানুষের আমি 'অকর্তা' এই বোধ হওয়া চাই, অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর পূর্ণ শরণাগতি চাই। আমি 'কর্তা'—আমি করছি কিংবা আমি ভোক্তা—আমি ভোগ করছি—এই অভিমান জীবের থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। তাই আমি ভক্ত, তুমি ভগবান, আমি দাস, তুমি প্রভু—এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বর দর্শন হয়। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্তা, তুমিই সব করছো, আমি কেবল যন্ত্র, আমাকে যেমন করাও তেমনি করি। আর এ সব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য তোমার জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস। তুমি সব করছ, সব কিছু তোমার। তোমার হাতে সব ছেড়ে দিলাম, তুমি যা কর সবই তোমার। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। জীবনের সব কাজে, সব আচরণে এই ভাবটা অভ্যাস করতে হয়, কায়মনোবাক্যে অভ্যাস করতে হয়—আমি কিছু না, ঈশ্বর, তিনিই সব। জ্ঞানী দেখেন চৈতন্যময় জগৎ। আমাদের সবার মধ্যে এক চৈতন্য বিরাজ করছেন। উপনিষদ্ বলছেন—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। চৈতন্যের শক্তিতে সব চৈতন্যময়। সবত্র চৈতন্যের প্রকাশ। আবার সব আনন্দের উৎস সেই চৈতন্য। জগতে সব আনন্দ সেই চৈতন্য থেকেই আসছে। এই জগতের একমাত্র তিনিই অধিষ্ঠান। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন, আবার পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র বস্তু, সেও তিনি হয়েছেন—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।'

শ্রীভগবান তাঁর অনন্ত বিশ্বরূপ শরণাগত ভক্ত অর্জুনকে কৃপা করে দেখালেন এবং শেষ শ্লোকে বলছেন কীভাবে ভক্ত তাঁকে সর্বদা দর্শন করতে পারবেন। সমস্ত গীতার সারাংশ এবং সর্বশাস্ত্রের সারভূত পরম-তত্ত্ব তিনি বলছেন—হে পরন্তপ! অনন্যাভক্তি ব্যতীত কেউই কোনও সাধনা দ্বারা আমার স্বরূপের দর্শনলাভ করতে পারেন না। আমার নিমিত্ত যিনি সকল কর্ম করেন, তিনি আমার কর্মকারী 'মৎকর্মকৃৎ'। আমিই যাঁর পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ একমাত্র গতি তিনি মৎপরায়ণ। আমারই ভক্ত—আমাতে ভক্তিমান ও আশ্রিত, যাঁর বিষয়ে আসক্তি নেই—স্বজন-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্য। কোন জীবের প্রতি শত্রুভাব নেই—সর্বপ্রাণীতে অজাতশত্রু অর্থাৎ সর্বভূতে মদ্ভাবদর্শী—যিনি এরূপ অবস্থানকারী ও ব্যবহারকারী তিনিই আমাকে লাভ করেন, অন্যে নয়।

অতএব হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে সমুদয় কর্ম করেন, আমি যাঁর একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূণ্য, যাঁর কারও উপর শত্রুভাব নেই, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন। এই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীকার এবং সমগ্র গীতার যে শিক্ষা তার সারতত্ত্ব।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

এই অধ্যায়ে বিশেষত ভক্তিমার্গ আশ্রয় করে ঈশ্বর-উপাসনার উপদেশ করা হয়েছে। সেইজন্য এ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ আশ্রয় করে যাঁরা সংযতেন্দ্রিয় ও সর্বত্র সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সর্বভূতে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করেন এবং সকল প্রাণীর মঙ্গলে নিরত থেকে ব্রহ্মের চিন্তা করেন, তাঁরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন। আবার যাঁরা নিষ্কাম কর্মযোগী তাঁরা সর্বকর্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করে তদ্‌গতচিত্তে অনন্যভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তাঁদেরও শ্রীভগবান এ সংসারসাগর হতে উদ্ধার করেন। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম বা যোগ এবং জ্ঞান—এদের মধ্যে এক বা একাধিক বা সকল উপায়দ্বারা ঈশ্বরলাভ করা সম্ভব। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ—প্রত্যেকটিই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ সাধনা। অধিকারিভেদে যে-কোনও একটি সাধনাই মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা-এ দুটি পথের মধ্যে কোনটি সহজ ও শ্রেষ্ঠ তা উপদেশ করে বলছেন : যদিও দুটি মার্গ একই বস্তুর প্রাপ্তিসাধক, তবুও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ ও সুসাধ্য। অব্যক্ত ব্রহ্মের সাধনায় অধিক ক্লেশভোগ আছে। তাই ভক্তিমার্গ সহজ। আবার এই ভক্তিমার্গেরও বিবিধ উপায় আছে—তার মধ্যে অনন্যা-ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম শ্রেষ্ঠ।

ভক্তিশাস্ত্র বলেছেন: ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তি বা প্রেমাভক্তি। বৈধী ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি—শাস্ত্র অনেক কর্ম করতে বলে গেছে তাই

করছি—এরূপ ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। সাধারণের পক্ষে ভক্তিপথই ভাল। জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তিযোগই যুগধর্ম। ঈশ্বরের উপর খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। প্রেমাভক্তি খুব ভাল কিন্তু সহজে আসে না। একেবারে শেষের কথা প্রেমাভক্তি। তার আগে পর্যন্ত জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি। তবে সব থেকে শ্রেষ্ঠ হলো অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি। অনন্যাভক্তি অর্থাৎ একমুখী ভক্তি। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাই না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন: 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ । অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ।।' অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্যসাধন, সখ্যসাধন ও আত্মনিবেদন—এই নয়টি ভক্তির প্রধান অঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর। ভক্ত প্রধানত এই পাঁচটি ভাবে ভগবানের চিন্তা করে। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে ধর্মজীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায়। শান্তভাব—ঋষিদের ছিল। শান্তভাবের লক্ষণ নিষ্ঠা। দাস্যভাব—ঈশ্বর প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য। যেমন হনুমানের ভাব। সখ্যভাব—বন্ধুর ভাব। ঈশ্বর ও ভক্ত বন্ধু। দুজনেই সমান। যেমন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদাম। বাৎসল্যভাব-ঈশ্বর সন্তান এবং ভক্ত তাঁর জননী। যেমন যশোদার ভাব। মধুরভাব—ঈশ্বর কান্ত, ভক্ত কান্তা। ঈশ্বর প্রেমাস্পদ, ভক্ত তাঁর প্রেমিক। ভক্ত নারী, ঈশ্বর তাঁর স্বামী। যেমন শ্রীমতীর ভাব।

রাগভক্তি প্রেমাভক্তি, ঈশ্বরে আত্মীয়ের ন্যায় ভালবাসা এলে আর কোনও বিধি-নিয়ম থাকে না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা আসবে বলে জপ-তপ, উপবাস। ঈশ্বরের উপর অনুরাগ, প্রেম এলে জপাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী কর্ম কে করবে? ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হলো। তারপরই সূর্য দেখা দেবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। যাঁদের রাগভক্তি, তাঁদেরই আন্তরিক অনন্যাভক্তি, ঈশ্বর তাঁদের ভার নেন।

সাধন করতে করতে ভক্ত নিজেই বুঝতে পারবেন—তিনি সাধনপথে কতটা অগ্রসর হচ্ছেন। ভক্তির পক্কতা লাভ হলে ঈশ্বরদর্শন ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হয় । সচ্চিদানন্দরূপ ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—ঈশ্বরদর্শনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়, বুকের ভিতর তুবড়ির মতো গুড়গুড় করে মহাবায়ু উঠে। যাঁর ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য-প্রকাশ হচ্ছে, তাঁর ঈশ্বরলাভের আর দেরি নাই। অনুরাগের ঐশ্বর্য কী কী? বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নামগুণ-কীর্তন, সত্যকথা—এই সব।

ভক্তহৃদয়ে এসব অনুরাগের লক্ষণ প্রকটিত হলে ঠিক বুঝতে পারা যাবে, ঈশ্বরদর্শন বা পরমানন্দ-প্রাপ্তির আর বেশি দেরি নেই। ঈশ্বরের ওপর ভক্তি হলে একটুতেই উদ্দীপন

হয়। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ ভক্তের ভাল লাগে না । নিষ্ঠার পর ভক্তি।

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ।। ১

অর্জুন (অর্জুন) উবাচ (বললেন) এবং (এইরূপ অর্থাৎ এইভাবে) সততযুক্তাঃ (সতত আপনাতে যুক্তচিত্ত হয়ে) যে ভক্তাঃ (যে-সকল ভক্তগণ) ত্বাং (তোমাকে) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) যে চ অপি (এবং যাঁরা) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত) অক্ষরম্ (অক্ষরকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে) [উপাসতে—উপাসনা করেন] তেষাং (তাঁদের মধ্যে) কে (কারা) যোগবিত্তমাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর যোগী?) ।১

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবন, এভাবে তোমাতে কর্ম সমর্পণপূর্বক সর্বদা সতত যুক্তচিত্ত হয়ে যে-সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁরা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে?

পরমেশ্বর ভগবান একাধারে অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মসত্তা, অপরদিকে প্রকৃতির স্রষ্টা ও প্রভু। অব্যক্ত ব্রহ্মসত্তা এবং ব্যক্ত জগৎ সমস্তই সেই পরমেশ্বর, আবার তিনি এরও উপর। ভগবানের কাছে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উভয় সাধন পথের কথা শুনে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগল, যিনি জ্ঞানযোগে অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, আর যিনি ভক্তিযোগে পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের আরাধনা করেন—এই উভয়ের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে অধিকতর যুক্ত কে?

আবার একাদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান 'মৎকর্মকৃত', 'মৎপরম' ইত্যাদি পদে বারবার 'মৎ' অর্থাৎ 'আমার'—এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্জুনের মনে সংশয় এই 'মৎ' শব্দ দ্বারা ভগবান নিরাকারের প্রতি লক্ষ করছেন, না সাকারের প্রতি লক্ষ করছেন। এই সংশয় দূর করার জন্য অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান! যাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক একান্তচিত্তে তোমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন ও যাঁরা সমাধিপূর্বক ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ীভূত তোমার নির্গুণ স্বরূপের সাধনা করেন—এই দুয়ের মধ্যে যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগী কে? অথবা আমি তোমার সাকার বা নিরাকার কোন স্বরূপের চিন্তা করব? এটা আমাকে বুঝিয়ে দাও।

তাছাড়া বেদের কর্মকাণ্ড—যাগযজ্ঞ এসব খুব কঠিন। কর্মকাণ্ডের চেয়ে ভক্তিপথ সোজা। দু-একজন হয়তো কর্মকাণ্ডের পথে যেতে পারে কিন্তু সাধারণের জন্য এপথ নয়। তুমি হয়তো যজ্ঞে পশুবলি দিলে—কিন্তু তাতে তোমার কী হল? তোমার মনের মলিনতা গেল কি? আসল সমস্যা তো মনে। মনটাকে তুমি জয় করতে পারছ না আর তুমি পশুবলি দিচ্ছ, যাগযজ্ঞ করছ—এতে কী লাভ হল! তবে কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন কিছু-কিছু জিনিস আছে যা নাকি অবশ্যই করণীয়, আবার কতকগুলি আছে যা না

করলেও চলে। আমরা যে জপ, ধ্যান, বা অল্পবিস্তর প্রাণায়াম করি সেগুলোও কিন্তু কর্মকাণ্ডের মধ্যেই পড়ছে। কিন্তু যে-পথেই যাই না কেন, এসব কিছুটা রাখতেই হবে। তাই কর্মকাণ্ডটাকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এগুলি থাকবে। কিন্তু এগুলিই যেন মুখ্য না হয়ে যায়। মুখ্য হবে ভক্তি, ভালবাসা। সরলভাবে ভগবানকে ডাক, ভালবাস। তাই ভগবান বলছেন, জ্ঞানপথের চেয়ে ভক্তিপথ সহজ।

শ্রীভগবানুবাচ
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ।। ২

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) যে (যাঁরা) ময়ি (আমাতে) মনঃ (চিত্ত) আবেশ্য (নিবিষ্ট করে) নিত্য-যুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হয়ে) পরয়া উপেতাঃ(পরা বা পরম দৃঢ় হয়ে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্বক) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁরা) যুক্ত-তমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগী) (এই) মে (আমার) মতাঃ (অভিমত—অর্থাৎ আমি মনে করি)।২

শ্রীভগবান বললেন—যাঁরা সর্বদা আমাতে মন নিবিষ্ট করে, সতত যুক্ত হয়ে অর্থাৎ দিবারাত্র পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বললেন—যাঁরা পরমাত্মা, পরমেশ্বরের সগুণ বা সাকার রূপে মন নিবিষ্ট করে, তাঁর সঙ্গে সর্বদা যুক্ত হয়ে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁর উপাসনা করেন, অর্থাৎ ভগবান আমার একমাত্র 'গতি'—এই মনে করে অনন্যভাবে, প্রীতিপূর্ণচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তাঁরা ভগবৎ-স্বরূপই লাভ করে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এই যুগে সাধারণের পক্ষে ভক্তিপথই ভাল। তাদের জন্য নারদীয় ভক্তি—অর্থাৎ নারদের যেমন ভক্তি। অহরহ তিনি ঈশ্বরের নামগুণগান করে বেড়াচ্ছেন। তাতেই তাঁর আনন্দ, তাতেই তাঁর তৃপ্তি। অন্য কিছুরই তিনি প্রার্থী নন। সারাক্ষণ তিনি ঈশ্বরের নামগুণগান করে বেড়াচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঐরকম ভক্তি চাই। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। কারণ এযুগে আমাদের জীবনধারাটা অন্যরকম। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। এযুগের পক্ষে সোজাসুজি ভগবানের নাম করাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ।

ভক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থা হলো—সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য। সাযুজ্য অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় এবং আনন্দের ঐক্যে নিজেকে ভুলে যাওয়া। ভক্ত ভগবানের চিন্তা করতে করতে এতটা তন্ময় হয়ে যায় যে, তার পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যায়। শুধু ভগবান আছেন—আর কিছু নেই, সে নিজেও নেই, এই অনুভূতি হয়। ভক্ত-ভগবানে কোনও ভেদ নেই আর। সাধক এবং দেবতা একাত্ম হয়ে যায়। সালোক্য—

সেই পরম লোকে বাস। পরমপুরুষ ঈশ্বরের আনন্দময় লোকে চিরনিবাস। সামীপ্য—আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান—তাঁর কৃপাপ্রার্থী। আমি তাঁর সাথে 'এক' হব না, 'সাযুজ্য' চাইব না; চাইব 'সামীপ্য'—তাঁর সমীপে থাকব, খুব কাছাকাছি থাকব। তাঁর কাছে থেকে তাঁকে আস্বাদ করব। আমি তাঁকে ভালবাসি। সার্ষ্টি অর্থাৎ ভগবানের সমান ঐশ্বর্য। সারূপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমান রূপ ও গুণ লাভ করা।

তবে ভক্তিপথেই হোক কিংবা জ্ঞানপথেই হোক—চরম উপলব্ধি যেটা হয় সেটা দু-পথেই এক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক। শুদ্ধজ্ঞান যেখানে শুদ্ধা ভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়। জ্ঞানপথ দিয়ে যে সিদ্ধ হয়েছে, সে দেখে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সবকিছুই ব্রহ্ম। আর ভক্ত, সেও দেখে 'সর্বভূতময়ং হরিম্'—হরিই সর্বভূতে। বিবেকানন্দ বলছেন—'ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।' আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ।। ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ।। ৪

যে (যাঁরা) তু (কিন্তু) সর্বত্র (সর্বদ) সমবুদ্ধয়ঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে) সর্ব-ভূত-হিতে (সকল প্রাণীর কল্যাণে) রতাঃ (নিযুক্ত হয়ে) চ ইন্দ্রিয়গ্রামং (এবং ইন্দ্রিয়-সকলকে) সংনিয়ম্য (সংযত করে) অনির্দেশ্যম্ (যা নির্দিষ্ট করা যায় না—অর্থাৎ অনির্বচনীয়) অব্যক্তম্ (অব্যক্ত) সর্বত্রগম্ (সর্বব্যাপী) অচিন্ত্যম্ (অচিন্তনীয়) কূটস্থম্ (সকলের মূলে মায়া অধিষ্ঠানরূপে স্থিত) অচলং (অচল) ধ্রুবম্ (নিত্য) অক্ষরম্ (নির্গুণ ব্রহ্ম) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁরা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন)। ৩-৪

যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করে অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, নির্গুণ অক্ষরব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং সর্বত্র সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে সর্বজীবের হিতসাধনে রত থাকেন, তাঁরাও আমাকেই (নির্গুণ স্বরূপে) প্রাপ্ত হন।

'অক্ষর'—যাঁর ক্ষয় নাই। 'অনির্দেশ্য'—বাক্য যাঁকে নির্দেশ করতে পারে না। অর্থাৎ লৌকিক ভাষা—যাঁর দ্বারা বস্তুর জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তিনি তারও অতীত। 'অব্যক্ত'—যাঁর কোনও প্রকাশরূপ নাই, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 'সর্বত্রগ'—যিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য। যিনি 'অচিন্ত্য'—যাঁকে চিন্তাদ্বারা ধারণা করা যায় না অর্থাৎ সর্বব্যাপী বস্তুকে মন ধ্যান করতে সক্ষম নয় । 'যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।' যাঁকে লাভ করতে গিয়ে বাক্য, মন অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসে, যিনি চিন্তার অগম্য। যিনি

কূটস্থ —এই নাম-রূপ জগৎপ্রপঞ্চকেই কূট বলা হয় অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা অথচ সত্যরূপে প্রতীত হচ্ছে, কারণ পিছনে অধিষ্ঠানরূপে নিত্য-স্থিতি কূটস্থ চৈতন্য। অধিষ্ঠান সাক্ষাৎ চৈতন্য নিত্য, নির্বিকার। যিনি অচল বা যিনি বিকার দ্বারা বিচলিত হন না, যিনি ধ্রুব বা যাঁর পরিণাম নাই, নিত্য, সেই নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মকে যিনি সমস্ত বৃত্তিবর্জিত হয়ে সমাহিত চিত্তে, তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনার অধিকারী হলেন তিনি যিনি শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং যাঁর সর্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি আছে। কাজেই সর্বভূতে এক আত্মাকেই দেখে তিনি সর্বভূতের হিতচিন্তায়, সকলের হিতসাধনে রত থাকেন। এটা জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানীদের কথা। জ্ঞানীরা সকলকে সুখী করেন এবং সকলের কল্যাণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

শ্রুতি বলছে, এই নিত্যবস্তু বাইরে নয়, আমারই ভিতরে। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। 'নিত্য' বলে কিছু যদি থাকে, শাশ্বত কিছু যদি থাকে, তাহলে তা বাইরে নয়—তোমারই ভিতরে। তুমিই সেই শাশ্বত বস্তু, তুমিই সেই ব্রহ্ম। এই অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী আত্মাকে সাধক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আচার্য শঙ্কর তাঁর 'নিবাণষট্‌কম্' স্তোত্রে এই উপলব্ধি করছেন —'ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং। ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।। ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।'—আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, চিত্ত নই। আমি কান, জিভ, নাক কিংবা চোখও নই। আমি আকাশ নই, ভূমি নই, 'তেজ' অর্থাৎ আগুন নই, বায়ুও নই। চিদানন্দরূপ শিব আমি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব আমি। সেই আমার স্বরূপ। আমি নির্বিকল্প, নিরাকার। সর্বব্যাপী আমি। সবকিছুতে অনুস্যূত হয়ে আছি। আমি ছাড়া তো আর দ্বিতীয় কিছু নেই। চিরমুক্ত আমি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব আমি। এইরূপ অক্ষরব্রহ্মের উপলব্ধি করেন সাধক।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ।। ৫

তেষাম্ (সেই সকল) অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্ (নির্গুণ ব্রহ্মে সংযুক্ত-চিত্ত যোগিগণের) অধিকতরঃ (অধিকতর) ক্লেশঃ (কষ্ট হয়) হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহধারী মানবের পক্ষে) অব্যক্তা (নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখম্ (বহু কষ্টকর সাধনাদ্বারা) অবাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়)।৫

অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মে অনুরক্তচিত্ত যোগিগণের সিদ্ধিলাভ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কারণ দেহধারী মানুষের চিত্ত নামরূপাত্মক সংস্কারে আবদ্ধ। তাই তাঁরা অনেক ক্লেশকর সাধনদ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠালাভ করে থাকেন।

যাঁরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করেন, তাঁদের সিদ্ধিলাভের জন্য সগুণ উপাসকদের

চেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়। কারণ নির্গুণব্রহ্মে নিষ্ঠালাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হতে চিত্তকে নিরুদ্ধ করে অব্যক্ত, অক্ষর, অনির্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনায় রত থাকা অনেক ক্লেশসাধ্য। কারণ বিশ্বে ভগবানের প্রকাশরূপ যেমন সহজে উপলব্ধি করা যায়, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি তেমন সহজ নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই প্রকার রূপের মধ্যে ডুবে থাকে। ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করে অব্যক্ত ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য কাজ। সেইজন্যে সাধারণের জন্য ভক্তিপথই সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। তা বলে জ্ঞানপথ বা কর্মপথের নিন্দা করছেন না ঠাকুর। সব পথ দিয়েই ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়। গন্তব্যস্থল এক, শুধু পথ আলাদা।

জ্ঞানপথে যিনি যান, তিনি 'নেতি নেতি' করে এই জগৎপ্রপঞ্চকে বর্জন করেন। তাঁর কাছে এই জগৎটা মিথ্যা। কিন্তু চোখের সামনে দেখছি এই জগৎ, আমার আত্মীয়স্বজন প্রিয়জন, কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—আমি বলব এ মিথ্যা? না হয় জোর করে বললাম, কিন্তু মনে-মনে সেই বিশ্বাসটা কতক্ষণ রাখতে পারব? তাই 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই বোধ দেহবুদ্ধি না গেলে হয় না। অতএব আমি দেহ নই, আমি মন নই, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নই, আমি সুখ-দুঃখের অতীত; আমার রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু নেই—এসব বোধ হওয়া কঠিন। যতই জ্ঞানের দ্বারা বিচার কর, কোনখান থেকে দেহাত্মবুদ্ধি এসে দেখা দেবে। দেহাভিমান যাওয়া সহজ নয়। আর যতক্ষণ দেহাভিমান থাকে ততক্ষণ 'আমি ব্রহ্ম' একথা বলা যায় না। তাই নির্গুণ উপাসনায় সর্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি লাভ করা প্রয়োজন। একান্ত বিশুদ্ধ না হলে চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযোগী হয় না। চিত্ত শুদ্ধ হলে আচার্যের নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ করে, মনন ও বিচার দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ করা আবশ্যক। তারপর নিদিধ্যাসন বা একাগ্র ধ্যানদ্বারা চিত্ত ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। কাজেই অব্যক্ত ব্রহ্মে স্থিতিলাভ অতি কষ্টসাধ্য। দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্র সাধনা ছাড়া তা লাভ করা যায় না। তাই দেহাভিমান সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে আত্মাতে স্থিতিলাভ করা অতিশয় কষ্টকর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, লোকে অব্যক্ত ব্রহ্ম, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ইত্যাদি নানা গালভরা কথা বলে; তারা জানে না, একটু এদিক-ওদিক হলেই পতন অনিবার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণকিশোর নামক একজন ভক্ত বলত: আমি ঐ আকাশের মতো। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই—আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন—তোমার দেহবুদ্ধি রয়েছে, তোমার কাছে সংসার সত্য, অথচ তুমি বেদান্ত বিচার করছ আর বলছ, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথা-এই বিচার মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে তোমার ক্ষেত্রে। সেইজন্য তুমি জীবনে যখন একটা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছ, তখন ঐ বেদান্ত-বিচার তোমার কাজে লাগছে না। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি থাকে ততক্ষণ 'আমি সেই' এই অভিমান করা ভাল নয়। যে এ অভিমান করে, তার বিশেষ হানি হয়।

আমাদের সমস্ত সমস্যা মন নিয়ে। মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে বলা হয় 'মত্ত করী'। এই মনকে বশে আনতে হবে অর্থাৎ দমন করতে হবে এবং সেটা ভক্তিপথে অনেক সোজা। ভক্তিপথ বিশ্বজনীন পথ। তাই বিশ্বের সর্বত্রই এই পথের এত সমাদর। জ্ঞানপথ বিশেষ বিশেষ অধিকারী মানুষের জন্য।

এই সাকার বা নিরাকার উপাসনা—এ দুটোরই প্রয়োজন আছে। প্রথম অবস্থাতেই ঈশ্বরকে নিরাকারভাবে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। একটা আকার চাই। ঈশ্বর নিরাকার—এটা সকলের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব হয় না। প্রথম অবস্থাতে খুবই কঠিন। তখন মনের একটা সাকার রূপ চাই, একটা অবলম্বন চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সবাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? রুচি ভেদ আর অধিকারী ভেদ আছে। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, তাই ভিন্ন ভিন্ন পথ সে বেছে নিচ্ছে। কিন্তু সবাই একই জায়গায় পৌঁছাচ্ছে, ঈশ্বরে পৌঁছাচ্ছে। সব নদীই যেমন একই সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, এও ঠিক তেমনি। ধাপে ধাপে এগোচ্ছি আমরা। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—from a lower truth to a higher truth আমরা সবসময় সত্যকে খুঁজছি, ঈশ্বরকে খুঁজছি—কিন্তু ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে। এই যে সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, দ্বৈতবাদ-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদ—এগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। এগুলি ক্রমবিকাশের একেকটা ধাপ। যতক্ষণ আমার দেহবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ আমি ভাবব, ঈশ্বরেরও একটা দেহ আছে, আকার আছে, রূপ আছে। যতক্ষণ আমার নিজেকে ব্যক্তি বলে বোধ হবে, ততক্ষণ আমার এই বোধও থাকবে যে, ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি। একই ঈশ্বর, একই ব্রহ্ম—আমাদের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কখনও মনে হচ্ছে তিনি সাকার, কখনও মনে হচ্ছে তিনি নিরাকার, কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ; কখনও মনে হচ্ছে তিনি আর আমি আলাদা, আবার কখনও মনে হচ্ছে —এক।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।। ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। ৭

পার্থ (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) যে (যাঁরা) সর্বাণি (সকল) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করে) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হয়ে) অনন্যেন (অনন্যচিত্ত হয়ে) যোগেন এব (যোগের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তি-সহকারে) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান করে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ময়ি (আমাতে) আবেশিত-চেতসাম্ তেষাম্ (সমর্পিতচিত্ত সে-সকল মানবের) মৃত্যু-সংসার সাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসার-সাগর হতে) ন চিরাৎ (অচিরে) সমুদ্ধর্তা (উদ্ধারকর্তা) অহম্ (আমি) ভবামি (হই)।৬-৭

হে পার্থ কিন্তু যাঁরা সমুদয় কর্ম আমাতে (পরমেশ্বরে) সমর্পণপূর্বক একমাত্র আমাতেই চিত্ত সমাহিত করেন ও ধ্যানপরায়ণ হয়ে আমার উপাসনা করেন, সেই ব্যক্তিগণকে আমি এই মৃত্যুযুক্ত অনিত্য সংসারসাগর হতে অচিরেই উদ্ধার করে থাকি।

প্রকৃত ভক্ত ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় বলে গ্রহণ করেন। একনিষ্ঠ হয়ে ভক্তিপূর্বক ভগবানের ভজনা করেন। চঞ্চল মনকে ইতস্তত ছুটতে দেন না। তিনি যা করেন, সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে ভগবানকে অর্পণ করেন। কোনোরকম ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না বা সামান্যতম স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম করেন না। নিজেকে কর্মের কর্তা বা ভোক্তা মনে না-করেই কর্ম করেন। অনন্যা ভক্তির দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বিষয় হতে চিত্তকে প্রত্যাহারপূর্বক, ধ্যানস্থ হয়ে ভগবানের উপাসনা করেন। একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে একনিষ্ঠ ভক্তি, প্রেম ও কর্ম সহযোগে ভগবানের উপাসনা করেন এবং ভগবানও তাঁদের চিত্তে জ্ঞানের আলোক জ্বেলে তাঁদের এই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করেন।

সমস্ত ভক্তিপথটা একটা ভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেটা হলো অনন্যা ভক্তি। ভালবাসায় ভগবান বাঁধা পড়েন। ভক্তিপথে ভক্ত একটা ভাব বা সম্পর্ক নিয়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যান। ঈশ্বর ভাবের বিষয়। যাঁর যেমন ভাব, তাঁর তেমনই গতি হয়। ভাবটা যেন একটা ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য ভগবানকে আকর্ষণ করে আনে। যাঁর যত ভাব, ধর্মজীবনটা তাঁর কাছে তত সহজ, স্বাভাবিক ও মধুর। ভাবগুলি হলো—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কেউ ভগবানকে প্রভুরূপে দেখতে পারেন—নিজেকে তাঁর দাস ভাবছেন। ভগবানকে পিতারূপে দেখছেন-নিজেকে তাঁর সন্তান ভাবছেন। যে ভাবটা তাঁর ভাল লাগে ভক্ত সেই ভাবেই ভগবানকে ভালবাসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতাতে পারলে ধর্মজীবনটা অনেক সহজ হয়ে যায়। ঋষিদের শান্তভাব অর্থাৎ ঈশ্বরে পূর্ণ নিষ্ঠা। তাঁদের অন্য কিছু ভোগ করবার বাসনা ছিল না। দাস্যভাবে ঈশ্বর প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য। বাৎসল্য-ভাব যশোদার ছিল। ভগবান তাঁর সন্তান এবং ভক্ত তাঁর জননী। সখ্যভাব হচ্ছে বন্ধুর ভাব। ঈশ্বর আর ভক্ত বন্ধু। দুজনেই সমান। মধুরভাব হচ্ছে—ঈশ্বর কান্ত, ভক্ত কান্তা, ঈশ্বর প্রেমাস্পদ, ভক্ত তাঁর প্রেমিক। ভক্ত নারী, ঈশ্বর তাঁর স্বামী। শ্রীমতী রাধারানির মধুরভাব ছিল। এই ভাবের মধ্যে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

যে-কোনও একটাকে ধরে এগিয়ে যেতে হয়। দৃঢ়ভাবে ধরতে হয়। ভাসা-ভাসা নয় বা 'ভাবের ঘরে চুরি' নয়। যে-ভাবটা ধরব, ঠিক ঠিক ধরব। মন-মুখ এক করে ধরব। যদি আমি ঈশ্বরকে প্রভু হিসাবে দেখি, নিজেকে মনে করি তাঁর দাস, তাহলে আমার প্রতি-আচরণে সেটা ফুটে উঠবে, আমার সমস্ত জীবনটা ঐ একটা ভাবকে কেন্দ্র করে চলবে। শাস্ত্র বলে, যে দৃঢ়ভাবে কোনও একটা ভাব গ্রহণ করে, যথাকালে সে সেই

ভাবের ফল লাভ করে থাকে। প্রকৃত ভক্ত ভগবানের ঐশ্বর্য দেখেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—কী জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্যের আদর করে বলে, ভাবে ঈশ্বরও ঐশ্বর্যের আদর করেন। ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন।... যখন দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন মথুরবাবু বললেন, 'দূর ঠাকুর! তোমার কোনও যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু করতে পারলে না!' আমি তাঁকে বললাম, 'এ তোমার কী কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না করছে, তাঁর পক্ষে এগুলো মাটির ডেলা! লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কি না, এ নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এরকম কথা বলতে নাই।' ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ। তিনি কী চান?—টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এইসব চান। কাজেই সব বিষয়-ঐশ্বর্য ভুলে ভগবানকে ভালবাসতে হয়। আপনার থেকেও আপনার মনে করতে হয় তাঁকে। স্তব-স্তুতি করলে ভগবান যতটা খুশি হন, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হন তাঁকে ভালবাসলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক ভক্তকে বলছেন—বাসনা ত্যাগ করার কী দরকার? কেবল ঈশ্বরের দিকে বাসনার মোড় ফিরিয়ে দাও। তা যদি দেওয়া যায়, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। এইভাবে শাস্ত্র ভক্তিযোগকে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ হিসাবে তুলে ধরেছে। ভক্তিযোগ সাধারণ মানুষকে ধীরে ধীরে চরম অনুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ।।৮

ত্বং (তুমি) ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব (স্থাপন কর) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) নিবেশয় (নিবিষ্ট কর) অতঃ ঊর্ধ্বং (এর পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (নিবাস করবে) [এতে] সংশয়ঃ (সংশয়) ন (নেই)। ৮

অতএব তুমি আমাতেই মন নিবিষ্ট কর এবং বুদ্ধি স্থির কর; তাহলে দেহান্তে আমাতেই বাস করবে, অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হবে, এতে কোনও সংশয় নেই।

তোমার মন কেবল আমার উপর স্থাপন কর অর্থাৎ ভগবানে মন সমাহিত করার অভ্যাস কর। তোমার বুদ্ধিও আমাতে নিবিষ্ট কর অর্থাৎ তোমার বুদ্ধিকে মনের চঞ্চল বৃত্তিসমূহের সঙ্গে একীভূত না করে আমাতেই প্রতিষ্ঠিত কর। মনকে অনিত্য বিষয় হতে সংযত করে ভগবানে স্থাপন কর। তাহলে তুমি চির নিত্য ঈশ্বরেই বাস করতে পারবে অর্থাৎ ঈশ্বরের চৈতন্যময় চিরন্তন সত্তায় স্থিতিলাভ করতে পারবে। তোমার মধ্যে আত্মজ্ঞানের উদয় হবে এবং দেহান্তে তুমি আমাতেই বিলীন হবে। সগুণব্রহ্মের উপাসনাপরায়ণ সাধকগণ দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক ক্রমমুক্তি লাভ করে থাকেন। আর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের

অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারলে সাধক ইহলোকেই জীবন্মুক্তি লাভ করে দেহান্তে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষ দেখেন, সচ্চিদানন্দ কেবল এই দেহকে আশ্রয় করে, এই দেহের অন্তরে ও বাইরে রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় ছয় মাস নির্বিকল্পভূমিতে ছিলেন। ছয় মাস পরে তিনি শুনলেন জগন্মাতা তাঁকে বলছেন, 'তুই ভাবমুখে থাক।' তারপর ধীরে ধীরে তাঁর শরীরটা নির্বিকল্পভূমি থেকে নেমে এল। 'ভাবমুখে থাকা' অর্থাৎ অদ্বৈতভূমি আর দ্বৈতভূমির ঠিক সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকা। ঠাকুর যখন নির্বিকল্পভূমিতে আছেন তখন তাঁর মধ্যে একটুও 'আমি' নেই, জীব-জগৎ কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই তাঁর কাছে। কিন্তু যখন 'ভাবমুখে' আছেন তখন 'আমি' আছে—সেই আমি 'বিরাট আমি' এবং দেখছেন যে জীব-জগৎ সব তিনিই হয়েছেন, তিনিই সবকিছু।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ।। ৯

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্ত) স্থিরম্ (স্থিরভাবে) সমাধাতুং (সমাহিত করতে) ন শক্নোষি (না পার) ততঃ (তবে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পেতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর বা চেষ্টা কর)।

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে (পুনঃপুনঃ জপধ্যানাদি) অভ্যাসদ্বারা চিত্তকে সমাহৃত করে আমাকে পাবার চেষ্টা কর।

মানুষের মন চঞ্চল, মন স্বভাবতই ইতস্তত ছুটাছুটি করে। মন ও বুদ্ধিকে সমাহিত করে ঈশ্বরে স্থাপন করা কঠিন। অনেকে বহু চেষ্টা করেও মন ঈশ্বরচিন্তায় একাগ্র করতে পারে না। তাই ভগবান কৃপা করে বলছেন, যদি তুমি তোমার চঞ্চল মনকে নিশ্চল করে আমার চিন্তায় নিবিষ্ট করতে না পার, তোমার নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। অধ্যবসায়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করে ভগবানের চিন্তায় সংলগ্ন করতে পুনরায় চেষ্টা কর। 'অভ্যাসযোগেন ততো মাম্ ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়'—এই অভ্যাসযোগের দ্বারা আমার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা কর। এইরূপ অভ্যাসযোগের দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য ক্রমে ক্রমে অনুভূত ও উপলব্ধ হবে। তাই অভ্যাসযোগ অত্যন্ত সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রতিমাদি ও বাহ্যমূর্তিতে ভগবৎ- বুদ্ধি স্থাপনপূর্বক ভক্তিসহ পূজা করবে, ও হৃদয়ে সেই রূপের ধ্যান করবে। তা হলে আমাকে লাভ করবে।

ব্রাদার লরেন্সের সম্বন্ধে একটি বই আছে—'The Practice of the Presence of God'। তিনি একটা সাধনা করেছিলেন। সবসময় মনে করতেন, ভগবান যেন তাঁর সাথে-সাথে রয়েছেন। তাঁর সাথে কথা বলছেন, রাগ করছেন, অভিমান করছেন। কাজ করতে গিয়ে কোনও ভুল করে ফেলেছেন, তার জন্যে হয়তো কেউ বকেছে। মনে

দুঃখ পেয়েছেন, ভগবানকে বলছেন: তুমি কেন আমাকে আগে থেকে সাবধান করে দিলে না? তাহলে তো আমাকে এরকম তিরস্কার সহ্য করতে হত না। ভগবান আপনার জন। আমার মনের যা-কিছু খেলা, রাগ, দুঃখ, অভিমান, আনন্দ—সব তাঁকে নিয়ে। এই হচ্ছে আটপৌরে সম্পর্ক।

সাধক রামপ্রসাদ যেমন বলছেন: 'মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে। গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।। শয়নে প্রণাম-জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান। আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে।।'—শয়ন শয়ন নয়, মাকে প্রণাম। ঘুমিয়ে আছি, যেন মায়ের ধ্যান করছি। আহার করছি, যেন মাকে আহুতি দিচ্ছি। সবসময়, সব অবস্থায়, সব কাজের মধ্যে তাঁকে স্মরণ করছি। আমরা হিন্দুরা 'সেকুলার' (Secular) আর 'স্পিরিচুয়াল' (Spiritual)—এরকম কোনও ভাগ করি না। আমাদের সম্পূর্ণটাই ধর্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা 'স্পিরিচুয়াল'। ভগবানকে যখন যে-অবস্থায় থাকব, ডাকব। ঈশ্বর আমার আপনজন। আমার সত্যিকারের মা বাবা। যখনই পারব, তাঁকে ডাকব। কোনও বাছবিচার নেই। শ্রীমা সারদাদেবী যেমন বলছেন, সংসারের কাজ করতে করতে ভগবানকে চিন্তা করতে হয়। তিনি দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকতেন এবং শত কর্মের মধ্যে ঈশ্বর- সাধনা ও তপস্যা করতেন। একজন ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনি তো ভোরবেলার ঠাকুরের নাম করতে বলছেন, কিন্তু আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়ার অভ্যাস। সারদাদেবী বলছেন, চা খেয়েই জপ কর না কেন। ভগবানের সাথে আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক, অন্তরের সম্পর্ক, নিয়ম-বিধি সেখানে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমনকী রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেও ঈশ্বরের নাম জপ করা যায়।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ।।১০

(যদি) অভ্যাসে অপি (অভ্যাসেও) অসমর্থঃ (অক্ষম) অসি (হও) (তাহলে) মৎ-কর্ম-পরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও) মদর্থম্ (আমার প্রীতির জন্য) কর্মাণি (কর্মসকল) কুর্বন্ অপি (করলেও) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ) অবাপ্স্যসি (লাভ করবে)।১০

যদি তুমি এপ্রকার অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহলে মৎকর্মপরায়ণ হও অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির জন্য পূজা, পাঠ, শ্রবণ-কীর্তন ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান কর, (কারণ) আমার প্রীতিসাধনের জন্য কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধিক্রমে তুমি সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মোক্ষলাভ করবে।

অনেকে বারংবার চেষ্টাদ্বারাও পরমেশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করতে পারেন না। হয়তো তাঁরা অতিশয় কর্মপ্রবণ, সর্বদাই কোনও না কোনও সংসার-কর্মে লেগে আছেন।

কৃপাসিন্ধু ভগবান তার জন্য আরও সহজ উপায় বলছেন যে, তবে আমার প্রীতির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান কর—১) ভগবানের নাম শ্রবণ করবে, ২) শ্রদ্ধাপূর্বক কীর্তন করবে, ৩) সুখে বা দুঃখে সর্বদা ভগবানের নাম স্মরণ করবে, ৪) ভগবৎ প্রতিমার চরণসেবা করবে, ৫) চন্দন, পুষ্প, ধূপ ও দীপ ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করবে, ৬) শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা তাঁকে নমস্কার ও বন্দনা করবে, ৭) নিজেকে ভগবানের অনুগত দাস বলে জ্ঞান করবে, ৮) অথবা ভগবানকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করবে, ৯) ভগবানের চরণে দেহ-মন সমর্পণ করে দেবে। এইরূপ কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধি হবে এবং আত্মজ্ঞান উদিত হয়ে পরমেশ্বরকে লাভ করবে।

ভগবান চাইছেন, তাঁকে স্মরণ করতে করতে ভক্ত যেন তাঁর প্রত্যেক করণীয় কর্ম সম্পাদন করেন। ভগবানের প্রীতিসাধনই যেন ভক্তের কর্মের উদ্দেশ্য হয়। সর্বদা ভগবানের নিমিত্ত কর্ম করা। ভগবানের নিমিত্ত কর্ম পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যজ্ঞ, পূজা, অর্চনা, শ্রবণ, কীর্তন, নামজপ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম। বর্ণাশ্রম অনুযায়ী সমস্ত কার্য লৌকিক কর্ম। অতএব বৈদিক কর্মই হোক আর লৌকিক কর্মই হোক, পারিবারিক কর্মই হোক আর সামাজিক কর্মই হোক-প্রত্যেক কর্মই ভগবানের কর্ম মনে করে, তাঁকে স্মরণপূর্বক সম্পাদন করবে। কোনও কর্মই নিজের কর্ম বলে মনে করবে না। প্রত্যেক কর্মই ভগবানের পূজা বলে মনে করবে। এই কর্মদ্বারাই ভক্তের সিদ্ধিলাভ এবং অমৃতত্ব লাভ সহজ হবে।

আনাতোল ফ্রাঁস-এর একটি গল্প আছে—Our Lady's Juggler। এক যাদুকর যাদু দেখায়। কিন্তু সে আসলে একজন ভক্ত। মা মেরীর প্রতি তার খুব ভক্তি। সে যেখানে থাকত, তার কাছাকাছি একটা মঠ ছিল। সেই মঠের যিনি প্রধান সন্ন্যাসী তাঁর সংস্পর্শে এসে সে সাধু হয়ে যায়। আর সে যাদু দেখায় না—সেই মঠেই থাকে। সে লক্ষ করল, সেখানকার সন্ন্যাসীদের নানা রকম গুণ। কেউ ধর্মপুস্তক লেখেন, কেউ বক্তৃতা করেন, কেউ স্তোত্র রচনা করেন, কেউ গান গাইতে পারেন। সবাই তাঁরা নানা কর্ম মেরীর উদ্দেশে করছেন। এঁদের এই সুন্দর জীবনযাত্রা দেখে সেই যাদুকরের নিজের সম্বন্ধে খুব ধিক্কার এল—আমি তো এই সব কর্ম কিছুই জানি না। আমার এমন কোনও গুণ নেই যা দিয়ে মা মেরীর সেবা করতে পারি। হতভাগ্য আমি। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, আমি তো যাদু দেখাতে পারি। ঠিক আছে, এই দিয়েই আমি মাকে খুশি করতে চেষ্টা করব। তারপর থেকে সে একটা সময় বেছে নিল, যখন মা মেরীর মন্দিরে কেউ থাকে না সেই সময় সে মন্দিরে গিয়ে মা মেরীর সামনে যাদু দেখায়। প্রতিদিন সেই ঐ যাদু দেখাতে লাগল। ধীরে ধীরে তার সব দুঃখ চলে গেল, চোখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। মঠের যিনি প্রধান সন্ন্যাসী তিনি ঐসব কথা শুনে চুপিচুপি দেখতে গেলেন ব্যাপারটা কী। গিয়ে দেখেন যে, সেই যাদুকর মাথা নীচে আর পা উপরে করে কয়েকটা ছুরি আর তামার বল নিয়ে মা

মেরীকে খেলা দেখাচ্ছে। যেসব খেলা সে লোককে দেখাত এবং যা দেখে লোকে তার প্রশংসা করত। প্রধান সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবলেন এ তো ভয়ানক অনাচার। এক্ষুনি একে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।—সরিয়ে দিতে যাবেন, এমন সময় প্রধান সন্ন্যাসী দেখলেন, মা মেরী বেদী থেকে নেমে আসছেন। যাদুকর যাদু দেখিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। মেরী এসে সেই ঘাম মুছিয়ে দিলেন। ঐ দৃশ্য দেখে সেই সন্ন্যাসী খুব অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা কত প্রার্থনা করছেন কিন্তু মা মেরী তো তাঁদের দেখা দেননি। অথচ এই যাদুকর সামান্য যাদু দেখিয়ে মায়ের দর্শন পেলেন। ধর্মজীবনে এরকমই ঘটে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটা গল্প বলছেন, একজন লোক শবসাধনা করবে বলে গভীর জঙ্গলে গিয়ে শব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস জোগাড় করে বসেছে। হঠাৎ একটা বাঘ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। তার আর সাধনা করা হল না। আর একজন বাঘের ভয়ে গাছে উঠেছিল। সে এসে ঐ শবের আসনে বসতেই জগন্মাতার দর্শন পেয়ে গেল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এই মন্ত্র পড়লে তাঁকে পাওয়া যায়, বা এই পথে চললে তাঁকে পাওয়া যায়—এরকম জোর করে কিছু বলা যায় না। তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। তবে কৃপা পাব বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব না। ঈশ্বর কৃপা করেন ভক্তের ব্যাকুলতা থাকলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ 'কর্মযোগ' বক্তৃতায় বলছেন, কোনও কাজই বড় বা ছোট নয়। কাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই আসল। তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন 'ব্যাধগীতার' ব্যাধের কথা তাঁর মনপ্রাণ ছিল ঈশ্বরে সমর্পিত এবং তিনি তাঁর মাংস বিক্রি করার কাজের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করতেন। একজন গৃহিণী—তিনিও সংসারের সব কাজ ঈশ্বরে নিবেদন করে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেছিলেন। ভগবান এখানে তাই বলছেন, ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করে মানুষ অধ্যাত্মজীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান ।। ১১

অথ (আর যদি) এতৎ অপি (এটাও) কর্তুং (করতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) অসি (হও) ততঃ (তা হলে) যতাত্মবান্ (সংযতেন্দ্রিয় হয়ে) মদ্‌যোগম্ (আমাতে সমুদয় কর্ম অর্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করে) সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগং (সকল কর্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর)।১১

যদি এতেও অসমর্থ হও, তাহলে মদ্‌যোগ অর্থাৎ আমাতে সর্বকর্ম-অর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করে, সংযতাত্মা হয়ে, সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ কর।

যদি তুমি এটিও না করতে পার, তবে আমাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ নির্ভর করে আত্মসংযত হয়ে, সব কাজের ফল ত্যাগ করে,কর্ম কর। তোমার সকল কর্মের ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ কর। ভক্তের ভক্তি ধাপে-ধাপে বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান বলছেন—তোমার সব কর্মের ফল আমাকে দিয়ে তুমি যত খুশি কাজ কর। তা যদি হও, তুমি পূর্ণতা লাভ করবে।

নিষ্কাম কর্ম সাধনই ভগবানের প্রধান উপদেশ। কারণ মানুষের মনে কামনা- বাসনা ও সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল। সেই স্বার্থসিদ্ধি ও সুখভোগের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কর্ম করে থাকে। কিন্তু এপ্রকার কর্মের দ্বারা সে সংসারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কখনও মুক্তির দিকে অগ্রসর হতে পারে না। তাই যিনি ভগবানকে চান, প্রকৃত ভক্তি চান, তাঁর কর্তব্য হল মনের ঐসকল বৃত্তিগুলিকে সংযত করে বিবেকপরায়ণ হয়ে, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা। কর্মের ফলাফল ভগবানে সমর্পণপূর্বক কর্তব্যবোধে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সকল কর্ম সম্পাদন করলেই ভগবানের অর্চনা হবে এবং এইরূপ অর্চনার দ্বারা ভক্তিবৃদ্ধি ও ঈশ্বরলাভের পথ সহজ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, কর্মের জন্যই কর্ম কর। এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের প্রভাব সত্যই জগতের পক্ষে কল্যাণকর। তাঁরা কর্মের জন্যই কর্ম করেন, নাম-যশ গ্রাহ্য করেন না, স্বর্গেও যেতে চান না। লোকের প্রকৃত উপকার হবে বলেই তাঁরা কর্ম করেন। প্রেম, সত্য, নিঃস্বার্থপরতা—এগুলি শুধু নীতি-সম্বন্ধীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা নয়, এগুলি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। এগুলির মধ্যেই মহতী শক্তি নিহিত রয়েছে। আত্মসংযম থেকেই এসব মহতী শক্তির বিকাশ ঘটে। সমুদয় বহির্মুখ কার্য অপেক্ষা আত্মসংযমেই অধিকতর শক্তির প্রকাশ। তাই অতি সামান্য কর্মকেও ঘৃণা করা উচিত নয়। কর্মেই আমাদের অধিকার, ফলে নয়, ফল যা হবার হোক। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তিনিই সংযমের রহস্য বুঝেছেন এবং আত্মসংযম করেছেন। কর্মযোগের এটাই আদর্শ। অতএব আমাদের সামনে যেরূপ কর্ম আসবে, তাই করতে হবে এবং রোজ আমাদের ক্রমশ আরও বেশি নিঃস্বার্থ হতে হবে। এমন সময় একদিন আসবে, যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে পারব। আর সেই মুহূর্তে আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রকাশিত হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মানুষের মনটা দাঁড়িপাল্লার মতো, একদিকে হেললে—সংসার ও বিষয়কর্ম, আর একদিকে হেললে—ভগবান। ভক্তের একটা নিষ্ঠা থাকে, তিনি তাঁর মনটিকে ভগবানের চরণে পূর্ণ সমর্পণ করে কর্ম করেন। যেমন চাতক পাখি—সে শুধু মেঘের জল ছাড়া অন্য জল খায় না। মরে যাবে, তবুও সে অন্য জল খাবে না। এমনই তার নিষ্ঠা। হনুমান—রাম ছাড়া অন্য কিছু সে জানে না। সবসময় সে রামরূপ ধ্যান

করছে। চোখে সে রাম ছাড়া আর কিছু দেখে না। ভক্ত তেমনি ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ান।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ।। ১২

অভ্যাসাৎ (বিবেকহীন অভ্যাস অপেক্ষা) জ্ঞানম্ হি (জ্ঞানই অর্থাৎ শব্দ ও যুক্তির দ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ পরোক্ষজ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানাৎ (আবার পরোক্ষজ্ঞান-অপেক্ষা) ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়) ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্মফল-ত্যাগঃ (কর্মফলের ত্যাগ শ্রেষ্ঠ) ত্যাগাৎ অনন্তরম্ (কারণ কর্মফলত্যাগের পরেই) শান্তিঃ (শান্তি বা মুক্তিলাভ হয়) ।১২

যেহেতু বিবেকহীন অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান অর্থাৎ শব্দ ও যুক্তির দ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ পরোক্ষজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান অর্থাৎ নিদিধ্যাসন শ্রেষ্ঠ, আবার ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ ঐ কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ হলে অচিরেই সংসার নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তিলাভ হয়।

বিভিন্ন সাধনের কথা এখানে বলা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, সাধারণ বিবেকহীন অভ্যাস অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ, লীলা, কর্ম সম্বন্ধে কিছু না জেনে, অন্ধ বিশ্বাসবলে কতকগুলি নিয়মিত ধর্মানুষ্ঠান করা। অন্ধবিশ্বাস নিয়ে কতকগুলি বিহিত ধর্মানুষ্ঠানকেই এখানে অভ্যাস বলা হয়েছে। তাই জ্ঞানহীন অভ্যাস অপেক্ষা শাস্ত্রানুযায়ী ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ। আবার নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় বলে তা জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বাহ্যিক উপাসনা অপেক্ষা পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে মনে মনে ভগবানের ধ্যান, চিন্তন ইত্যাদি সমধিক উপকারী এবং শক্তিশালী। বাহ্য প্রতিমাদির পূজা অপেক্ষা নিদিধ্যাসন ও ধ্যান ইত্যাদি আন্তরিক উপাসনা দ্বারা ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হয়।

কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ কর্মফলত্যাগ দ্বারাই চিত্তের নির্মলতা ও বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়ে থাকে। কামনা হতে কর্মীর চিত্তে ফলাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এবং এই কামনাবাসনা চিত্তের মালিন্য ও বিক্ষেপের কারণ। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হয়ে, ঈশ্বরে ফলাফল সমর্পণপূর্বক, সমুদয় বিহিত কর্ম সম্পাদন করলে চিত্ত নির্মল, বিশুদ্ধ ও শান্ত হয়ে থাকে। আসক্তি ত্যাগ হতেই শান্তি, ত্যাগ ব্যতীত শান্তিলাভের অন্য কোনও উপায় নাই। এবং চিত্ত শান্ত না হলে কোনও প্রকার উপাসনাই ফলপ্রসূ হয় না। চিত্তের এই শান্ত ভাব, কর্মফলত্যাগ দ্বারাই লাভ করা সম্ভব বলে এই পদ্ধতিকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

উপাসনা ও ভক্তির তারতম্য অনুযায়ী ভক্তেরও চার রকম স্তর হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ

বলছেন, ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ দেখা যায়। ভক্তির সত্ত্ব যার আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। দেহের, পোশাকের বা বাড়ির অর্থাৎ বাহ্যিক কোনও বস্তুর জাঁকজমক নাই। অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন। ঈশ্বরের চরণে নিজের দেহ-মন সমস্ত অর্পণ করেছে।

ভক্তির রজঃ থাকলে সেই ভক্ত বাইরের একটু আড়ম্বর পছন্দ করে। ভক্তের হয়তো তিলক আছে, রুদ্রাক্ষের মালা আছে। সেই মালার মধ্যে মধ্যে আবার সোনার দানা। যখন পূজা করে, গরদের কাপড় পরে পূজা করে। সে দেখাতে চায়, লোককে জানাতে চায়, 'এই দেখ আমি কত বড় ভক্ত'।

ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো'। এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব। গিরিশ ঘোষের এই ভক্তির তম—জ্বলন্ত বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে বলছেন, পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলছে—কৃপা করবে না মানে? করতেই হবে। তা না হলে তুমি কিসের অবতার। কান্নাকাটি নয়, অনুনয়-বিনয় নয়—জোর করে, জুলুম করে। ঈশ্বর আপনার জন, কাজেই এরকম জোর করা চলে। সেই ভক্ত পাপ নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে বলে, কী! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ। আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী।

আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের অতীত -তার বালক সভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা। শুদ্ধ তাঁর (ভগবানের) নাম। ভক্ত মীরাবাঈ বলছেন—প্রভু তুমি তো অন্তর্যামী। তোমার নাম ছাড়া আমার জীবনটা কীরকম জান? পদ্মকে জল থেকে তুলে নিলে যেমন হয়, কিংবা আকাশে চাঁদ না থাকলে যেমন হয়—তোমাকে বাদ দিয়ে আমারও সেই অবস্থা। আমার জীবনটা শূন্য, অন্ধকার। আমি তোমার জন্মজন্মান্তরের দাসী। সর্বক্ষণ তোমার চরণে পড়ে আছি আর তোমার নাম করছি। ঐশ্বর্য, মান-মর্যাদা কিছুই চাই না।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ।।১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।।১৪

সর্বভূতানাম্ (সকল প্রাণীর প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষশূন্য) মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন) করুণঃ (দয়ালু) নির্মমঃ (মমত্ববুদ্ধিশূন্য) নিরহঙ্কারঃ এব চ (এবং অহঙ্কারশূন্য) সম-দুঃখ-সুখঃ (সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন) ক্ষমী (ক্ষমাশীল) সততং (সদা) সন্তুষ্টঃ (পরিতুষ্ট) যোগী (সমাহিতচিত্ত) যতাত্মা (সংযতস্বভাব) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়বিশ্বাসী) ময়ি (আমাতে) অর্পিত-

মনঃ-বুদ্ধিঃ (যাঁর মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত অর্থাৎ ভজনশীল) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ।১৩-১৪

যিনি কাউকেও দ্বেষ করেন না, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়াবান, যিনি মমত্ববুদ্ধিশূন্য ও অহংকার-বর্জিত, যিনি সুখে-দুঃখে সমচিত্ত, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট, আমাতে সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, মদ্বিষয়ে দৃঢ়-বিশ্বাসী, যাঁর মনবুদ্ধি আমাতে সম্পূর্ণ অর্পিত—এপ্রকার ভক্ত আমার প্রিয় ।।

ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করছেন। ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। যিনি বিশুদ্ধ প্রকৃতি হয়ে তাঁর ভজনা করেন, তিনিই তাঁর কৃপা লাভ করে থাকেন। প্রকৃত ভক্ত জগতে কোনও জীবকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না, এবং জগতে কোনও প্রাণীর প্রতিকূল হন না। ভক্ত প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে পান। কাজেই কারও প্রতি তাঁর দ্বেষ, অপ্রীতি বা হিংসার ভাব থাকতে পারে না। তিনি কাউকেও ঘৃণা করেন না, কারও অনিষ্ট চিন্তাও করেন না। অপকারীকেও তিনি প্রীতির চক্ষে দেখে থাকেন। তিনি সকলের সুহৃৎ, সকলের উপকারী, বিশ্বপ্রেম সর্বদা তাঁর হৃদয়ে বিরাজিত। দুঃখীর প্রতি তাঁর অপরিসীম দয়া, সর্বভূতে করুণা তাঁর হৃদয়ে সদা বিরাজমান। তিনি ক্ষমাশীল--কারও দ্বারা নিজে উৎপীড়িত হলেও তার প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হন না। তিনি ক্রোধ ও দ্বেষের বশে বিবেক হারান না।

তাঁর চিত্তে মমত্ববোধ অর্থাৎ 'এটি আমার'—এই বোধ নেই। যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনি সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন, তাঁর সমস্তই তিনি ভগবানের বলে মনে করেন। তিনি নিরহঙ্কার। 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা'—এই ভাব তাঁর থাকে না। তিনি সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন—সুখেও হৃষ্ট হন না, দুঃখেও বিমর্ষ হন না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই অবিচল থাকেন। তিনি অপর কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমা করেন।

যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সর্বদা সন্তুষ্ট তিনি সর্বদাই পরিতুষ্টচিত্ত এবং সমাহিত। আমাদের কামনার অপূরণই অসন্তোষ ও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। কিন্তু যাঁর চিত্তে-কামনা বাসনার আধিপত্য নাই তাঁর অসন্তুষ্ট ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হবারও কোন কারণ নেই। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহই মনকে চঞ্চল করে তোলে, কামক্রোধাদি আমাদেরকে বিপথে নিয়ে যায়। কিন্তু ভক্তের ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং রিপুগণ সম্পূর্ণ সংযত। ভগবানে তাঁর অচল বিশ্বাস। ভগবানই একমাত্র সৎ, অন্য সমস্ত অসৎ—এই দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয় স্থির করে তাঁরই শরণাপন্ন হন এবং দৃঢ়সংকল্প হয়ে তাঁকে পাবার চেষ্টা করেন। যিনি সংকল্প-বিকল্প ছেড়ে, মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করেছেন, এইরকম ভক্তই ভগবানের প্রিয়। এই হচ্ছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মনকে ঠিক পথে চালনা করতে হলে সদা যত্নশীল হতে হয় এবং আদর্শের অনুশীলন করতে হয়। কিছু মানুষ

আছেন তাঁরা এই আদর্শ নিয়েই আনন্দে থাকেন।

এখানে একটা কথা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমা করা মানে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। মানুষকে আদর্শ পথে এগিয়ে দেওয়া। আর একটি প্রশ্ন—সর্বভূতে তো ঈশ্বর আছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, God the wicked, God the sinner—দুষ্ট নারায়ণ, পাপী নারায়ণ। তাহলে কি চোর চুরি করতে আসলে তাকে ছেড়ে দেবো বা ক্ষমা করে দেব ? চোরের কাজে কি আমি সাহায্য করব? আমরা গাজীপুরের পওহারীবাবার কথা জানি। তাঁর আশ্রমে একদিন একটা চোর চুরি করতে এসেছিল। বাবাজী তাঁর আশ্রমে ছোটোখাট যেসব জিনিস—কম্বল, ঘটি, লোটা বা রুটি ছিল, তিনি সেগুলি সব নিয়ে দৌড়ে চোরকে ধরলেন তারপর তাকে নারায়ণ-জ্ঞানে সব কিছু দান করতে চাইলেন। কিন্তু সেই চোর তার ভুল বুঝতে পারে এবং পরবর্তিকালে সে তার জীবনকে অনেক উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তিকালে সেইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, পাপীদের মধ্যেও সাধুত্বের বীজ লুকিয়ে থাকে। একটি কথা প্রচলিত আছে—'No saint without a past, and no sinner without a future'—সাধুরও একটা অতীত ছিল, আর যে পাপী তারও একটা ভবিষ্যৎ আছে। মানুষই পারে অতীতের দুর্বলতা ত্যাগ করে আদর্শ মানুষ—জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ, পবিত্র, মহৎ, মানুষ হতে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পওহারীবাবা যা করতে পারেন, আমরা সাধারণ লোক তা পারি না। পওহারীবাবা সিদ্ধপুরুষ, সর্বভূতে তিনি ঈশ্বর দর্শন করছেন--তাঁর কাছে চোর চোর নয়, নারায়ণ। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তো চোর চোরই। শ্রীরামকৃষ্ণ একটা গল্প বলতেন—মাহুত নারায়ণ আর হাতি নারায়ণের গল্প। একজন সাধুকে তাঁর গুরুদেব শিখিয়ে দিয়েছেন—সব নারায়ণ। এর পরদিনই সেই সাধু একটা পাগলা হাতির সামনে গিয়ে পড়েছেন। মাহুত বলছে—পালাও, পালাও। কিন্তু সাধুটি সরছেন না। সদ্য সদ্য তিনি যা শিখেছেন, সেটা তিনি প্রয়োগ করে ছাড়বেন। হাতিকে 'হে—প্রভু, হে নারায়ণ!' বলে প্রণাম করছেন। আর হাতি এসে তাঁকে শুঁড়ে জড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। একেবারে ক্ষতবিক্ষত অবস্থা ধরাধরি করে তাঁকে আশ্রমে নিয়ে আসা হলো। গুরুদেব সব শুনে বললেন, বাপু, হাতির মধ্যেই তুমি শুধু নারায়ণ দেখলে, মাহুতের ভিতরে যে নারায়ণ আছেন সেটা তুমি বুঝলে না? মাহুত-নারায়ণ তো তোমাকে পালিয়ে যেতে বলেছিল, তার কথা শুনলে না কেন তুমি? বাস্তবিক, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে 'মাহুত-নারায়ণ' ও 'হাতি-নারায়ণের' মধ্যে তফাতটা রাখতে হয়। সবাই নারায়ণ, সবার মধ্যেই এক তিনি—সাধুর মধ্যেও যেমন, অসাধুর মধ্যেও তেমন। কিন্তু সাধুর সঙ্গে যে ব্যবহার চলে, অসাধুর সঙ্গে সেই ব্যবহার চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'আপো নারায়ণঃ'--জল নারায়ণ। ঠিক। কিন্তু কোনও জলে পুজো হয়, কোনও জল খাওয়া চলে, আবার

কোনও জলে শুধু পা ধোওয়া চলে। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তফাতটা রাখতেই হবে। নাহলে সমাজ, সভ্যতা ও সৃষ্টি চলবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' অদ্ভুত কথা! ছোট্ট কথা--কিন্তু খুব ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে। আমি ভক্ত, তার মানে এই নয় যে, সবাই ভক্ত। যারা অসৎ তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আমাকে রাখতে হবে। নিজেকে ও নিজের জিনিসপত্র সাবধানে রাখব যাতে অন্যকে অন্যায় করতে সাহায্য না করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ জাহাজে করে আমেরিকা যাচ্ছেন। তুরীয়ানন্দজী তাঁর কেবিনের দরজা খুলে বাইরে ঘুরছেন। স্বামী বিবেকানন্দ দেখলেন, একটি দামি সোনার ঘড়ি তাঁর কেবিনের টেবিলের উপর রয়েছে—একদম অরক্ষিত অবস্থায়। স্বামিজী খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তুরীয়ানন্দজীকে ডেকে বললেন, হরি ভাই, তোমার কোন অধিকার আছে মানুষকে এইভাবে প্রলুব্ধ করার? গরিব মানুষ এরা, ঐরকম দামি জিনিস দেখে এরা প্রলুব্ধ হবে। এদের মধ্যে যদি কেউ এটা তুলে নিয়ে যায়, তাহলে তোমার দোষ হবে। অতএব আমাদের আচরণের বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে, যাতে আমার দ্বারা অপরের মনে কোনওপ্রকার অসৎ ভাবের উদ্দীপন না হয়। এটাও আমার কর্তব্য। যার মন দুর্বল ও অন্যায়প্রবণ—তার প্রতি এটাও আমার কর্তব্য। তার পরেও যদি সে চুরি করে বা কোনও একটা অন্যায় করে—তবে নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দিতে হবে, দুষ্টু-নারায়ণের সঙ্গে দুষ্টু ব্যাবহারই করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শটা মনে রাখতে হবে, সে-ও নারায়ণ। তার মধ্যে দেবত্ব বা ব্রহ্মত্ব সুপ্ত আছে। উপযুক্ত সুযোগ ও সময় পেলে সে তার দেবত্বকে পরিস্ফুট করতে পারে। আর যদি আমাদের সাধ্য থাকে তাহলে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে সে ভাল হয়, সে যাতে সুন্দর হয়। যদি আমার নিজের কিছুই করণীয় না থাকে, তাহলে তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। কোনও অবস্থাতেই ঘৃণা করব না। তার মধ্যেও নারায়ণ আছেন। তার সেই প্রকৃত স্বরূপ নারায়ণকে আমরা অসম্মান করতে পারি না।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ।।১৫

যস্মাৎ (যে ভক্ত হতে) লোকঃ (কোন ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হন না) যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (কোনও ব্যক্তি হতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হন না) যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষ-অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগৈঃ (আনন্দ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিতে অথবা পরশ্রীদর্শনে চাঞ্চল্য, ভয় এবং উদ্বেগ হতে) মুক্তঃ (মুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)।১৫

যাঁর দ্বারা অপর লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত বা ক্ষুব্ধ হন না, আর যিনি অন্য কোনও লোক হতেও ভয়ে উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি

আমার প্রিয়।

যাঁর মন ঈশ্বরে অর্পিত, তিনি কারও উদ্বেগের কারণ হন না। তিনি এমন কোনও কাজ করেন না যাতে অপরের অনর্থক উদ্বেগ, ক্লেশ বা কায়িক ও মানসিক পীড়া জন্মাতে পারে। তিনি নিজেও কারও কোনও কর্মে উদ্বেগ বোধ করেন না। অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হলেও সেই উৎপীড়ন তাঁর চিত্তের সমতা বা শান্তি নষ্ট করতে পারে না। তিনি কোনও ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষে উৎফুল্ল হন না, প্রাপ্তির অভাবেও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন না। তিনি কারও থেকে ভয় পান না। কোনও প্রতিকূল বা অনিষ্টকর ঘটনাও তাঁর চিত্তে উদ্বেগ জন্মাতে পারে না। সাধারণ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম প্রভৃতি হতে তিনি মুক্ত। তিনি শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীকে পীড়া দেন না এবং অন্য প্রাণীও তাঁর কোনও ক্ষতি করেন না। তিনি সমস্ত জীবকে আত্মবৎ বোধে ও সকলের প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোনও জীব তাঁর ক্ষতি করেন না। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা বন্য হিংস্র জন্তুকেও বিরুদ্ধ-স্বভাব ত্যাগ করাতে সক্ষম হন। অর্থাৎ তিনি কারও ভয়ের কারণ হন না, তিনিও কারও নিকট হতে ভয় পান না। তাঁর চিত্ত সর্বদাই শান্ত, কোনও অবস্থাতেই তাঁর চিত্ত ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হন না। এইরূপ ভক্তিমান ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় ও নিকট।

ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক স্থাপন হলেই ভক্ত এইসব সম্পদের অধিকারী হন। চিরদিন মানুষ একরকম থাকে না। আজ যে খারাপ, কাল সে ভাল হয়ে যেতে পারে, আজ যাকে দেখছি দুর্বল, হীনবীর্য—কালই হয়তো দেখব সে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তে মানুষের জীবনের গতি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, হয়ে যাই-ও। ঈশ্বরীয় একটা কথা, একটা ঘটনা বা একটা গান—সামান্য একটা উদ্দীপনই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে জাগিয়ে দিতে পারে। সেই মুহূর্ত থেকে সেই ব্যক্তি রূপান্তরিত হয়ে যায়, নতুন মানুষ হয়ে যায়। একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়—জমিদার লালাবাবু পালকি করে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে শুনলেন ধোপার মেয়ে তার বাবাকে বলছে : বাবা, বেলা যে পড়ে এল, 'বাসনায়' আগুন দেবে না? ধোপাদের কাছে 'বাসনা' হচ্ছে শুকনো কলাপাতা। কিন্তু লালাবাবু ভাবলেন, তাই তো, আমারও তো বেলা শেষ হয়ে গেল, দিন ফুরিয়ে এল, আমি তো এখনও আমার কামনাবাসনায় আগুন দিলাম না! সেই ভাবনা তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ পালটে দিল। তিনি পালকি থেকে নেমে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে গেলেন। এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। একটা ফোয়ারার মুখে পাথর চাপা দেওয়া ছিল। কেউ সেই পাথরটি তুলে নিল—জলস্রোত মুক্ত হয়ে আবার বইতে লাগল। আমার মনের কালিমাযুক্ত মেঘটা সরে গেল, আর অমনি আমার 'প্রকৃত আমি'কে উপলব্ধি করতে পারলাম। আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আমি অন্য-রকম হয়ে গেলাম। আমি অসৎ ছিলাম, ঈশ্বরের সংস্পর্শে সৎ হয়ে গেলাম। নিষ্ঠুর ছিলাম—প্রেমিক

হয়ে গেলাম। ছিলাম ঘোর স্বার্থপর, হয়ে গেলাম নিঃস্বার্থ, এখন আমি পরের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নই। হয়ে গেলাম প্রকৃত ভক্ত। ভক্তের আদর্শে আমার জীবন পূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে উঠল।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।।১৬

যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) অনপেক্ষঃ (জাগতিক বিষয়ে স্পৃহাশূন্য) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি) দক্ষঃ (অনলস বা কার্যপটু) উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিত) গতব্যথঃ (ব্যথাশূন্য) সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী (সকল প্রকার সকাম-অনুষ্ঠানত্যাগী) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)।

যিনি জগতের সর্ববিষয়ে নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত, ভয়হীন এবং সর্ববিধ সকাম-কর্মের অনুষ্ঠানপরিত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তিনি কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না। কারও উপর কোনও বিষয়ের জন্য নির্ভর করেন না। একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর নির্ভরস্থল। তিনি মুক্ত, তিনি স্বাধীন। তাঁর দেহ ও মন উভয়ই পবিত্র। তিনি তাঁর কর্তব্য-কর্মের বিষয়ে সর্বদা তৎপর। সম্পূর্ণ ঈশ্বর নির্ভরশীল হয়ে, অহংবোধ, ব্যক্তিগত বুদ্ধি, রুচি, কামনা ও সংশয় শূন্য হয়ে তিনি কর্ম করেন। তিনি জগতের সমস্ত বিষয়ে উদাসীনের মতো ব্যবহার করেন। সুখে, দুঃখে বা বিপদে তিনি সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকেন। তাঁর চিত্ত শাশ্বত সনাতন সত্যে অর্থাৎ ঈশ্বরে স্থিত থাকে। দুঃখে বা ক্লেশে তিনি কোনওপ্রকার ব্যথা অনুভব করেন না। অহংকার দ্বারা বা নিজ স্বার্থ দ্বারা তিনি অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনও কর্মই সৃষ্টি করেন না। অথচ তিনি দক্ষ অর্থাৎ প্রচণ্ড কর্মকুশল। জগতের শুভ বা মঙ্গল কর্মের জন্য সদা প্রস্তুত। তাঁর মাথার ওপর হয়তো কাজের বোঝা চেপে রয়েছে, কিন্তু অনুভব হচ্ছে না, কারণ তিনি সম্পূর্ণ 'নির্লিপ্ত'। যা চারপাশে ঘটছে, তার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত। আদর্শটি এইরকমঃ কাজ করবেন কিন্তু কাজের জন্য তাঁর মানসিক উদ্বেগ থাকবে না। কর্তব্য সম্পাদন করবেন কিন্তু শত্রু ও মিত্র কারও প্রতি ভাল বা মন্দভাবের পক্ষপাত করবেন না, লোকে প্রশংসা বা নিন্দা করলে হৃদয়ে ব্যথিত হবেন না—এইরূপ যে বা যিনি অনাসক্ত ভক্ত তিনি ভগবানের পরম প্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : সংসারের সব কর্তব্য করে যাও কিন্তু মন পড়ে থাক ঈশ্বরের পাদপদ্মে। সংসারে ঈশ্বরের পাদপদ্ম এক হাতে ধরে থাকবে, আর এক হাতে কাজ করবে। যে খুঁটি ধরে ঘুরপাক খায় সে কখনও পড়ে না। ঈশ্বর হচ্ছেন সেই খুঁটি। তাঁকে ধরে রেখে যে সংসারে চলে তার কখনও ভুল হয় না। শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন তার দৃষ্টান্ত। সংসারে ডুবে আছেন যেন। লোকে কখনও কখনও সন্দেহ করে বলত : মা,

আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ। মা বলতেন : কী করব বাবা, আমরা মেয়েমানুষ তো, আমাদের এইরকমই। একদিন বললেন, কী জান—বিদ্যুৎ যখন চমকায় শার্সিতে চমকায়, খড়খড়ির কিছু হয় না। অর্থাৎ বলতে চাইছেন : আমি যা-কিছু করছি, অনাসক্ত হয়ে করছি। আমাকে কিছু স্পর্শ করতে পারছে না। পদ্মপাতা জলে থাকলেও জল যেমন কখনও পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না—আমরা ঠিক সেইভাবে সংসারে থাকব। প্রকৃত ভক্ত এইরূপ অনাসক্ত হয়ে সংসারে কর্ম করেন।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ।।১৭

যঃ (যিনি) ন হৃষ্যতি (প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না) ন দ্বেষ্টি (বস্তুর অপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (জাগতিক কোনও বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না) যঃ (যিনি) শুভ-অশুভ-পরিত্যাগী (শুভ-অশুভ বা পুণ্যপাপ-কর্মত্যাগী) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)।১৭

যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিতেও দ্বেষ করেন না, যিনি পুণ্যপাপ বা শুভাশুভকর্ম-পরিত্যাগী ও ভক্তিমান, তিনিই আমার প্রিয়।

ভগবানের যিনি প্রিয় ভক্ত তিনি সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যদি তাঁর সুখের স্পর্শ উপস্থিত হয় তাতেও তিনি হৃষ্ট হন না। সেইরূপ যদি দুঃখের কারণ উপস্থিত হয় তাতেও তিনি ব্যথিত হন না এবং আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি আত্মীয়স্বজনের বিনাশে শোকও করেন না। কারণ কোনও বিষয়ের নিমিত্তই তাঁর আকাঙ্ক্ষা নাই। শুভ ও অশুভের মধ্যে তিনি কোনওরকম ভেদ দর্শন করেন না। উভয়ই তাঁর নিকট সমান তুল্য। প্রিয় বস্তুর আগমনে হর্ষ কিংবা অপ্রিয় সমাগমে দ্বেষ—উভয় অবস্থাতেই তিনি সমভাবে অবস্থান করেন। স্বর্গাদি লাভের জন্য পুণ্য কর্ম বা নরকাদি গমনের কারণ পাপকর্ম অথবা জন্মান্তরে ভাল জন্মলাভের আশায় সৎ কর্ম ইত্যাদি কোনও আকাঙ্ক্ষা নিয়েই কর্ম করেন না। তিনি সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে করেন এবং শুভ ও অশুভ ফল উভয়ই তিনি ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গ করেন। কোনও অবস্থাতেই তিনি বিচলিত হন না। এইরূপ ভক্তিমান ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় হন।

প্রকৃত ভক্ত, যাঁর জ্ঞান লাভ হয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বরকে জেনেছেন, তিনি সংসারে থাকেন কিন্তু তাঁর দেহবোধ থাকে না। দেহবোধ অর্থাৎ দেহাভিমান, দেহটাই আমি, সেই-ভাব থাকে না। সাধারণ অবস্থায় আমরা তো সবাই দেহাভিমানী। আমাদের যা-কিছু চিন্তাভাবনা, কর্মপ্রচেষ্টা, সবকিছুই এই দেহকে কেন্দ্র করে। দেহের সামান্য সুখ-দুঃখ আমাদের বিচলিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সংসারে থেকে যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর এই দেহাভিমান চলে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উপমা দিচ্ছেন—খড়ো নারকেল।

বলছেন : 'ঈশ্বরলাভ হলে লক্ষণ এই যে, সে ব্যক্তি খড়ো নারিকেলের মতো হয়ে যায়—দেহাত্মবুদ্ধি চলে যায়। দেহের সুখ-দুঃখে তার সুখ-দুঃখ বোধ হয় না, সে ব্যক্তি দেহের সুখ চায় না। সে জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়ায়।' যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে সে ঐ খড়ো নারকেল; শাঁস আর মালা যে আলাদা, আত্মা আর দেহ যে ভিন্ন—এই বোধটা তার হয়ে গেছে। শরীরের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মা চির নিত্য।

এইরূপ ভক্ত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষ সংসারে কীভাবে কর্ম করেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন : ঝড়ের এঁটো পাতা। একটা শুকনো পাতা, হাওয়াতে তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই সে যাচ্ছে। তার নিজের কোনও ইচ্ছা নেই। ঈশ্বরলাভ করার পর ভক্ত ঐভাবে সংসারে থাকেন। কূটস্থ হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করেন। সংস্কার অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি প্রারব্ধ। এতদিন আমি যত কাজ করেছি—এ জন্মে বা আগের জন্মগুলিতে—তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রারব্ধ কর্ম আর সঞ্চিত কর্ম। প্রারব্ধ হচ্ছে, সেই কাজটা, যেটা এর মধ্যেই ফল দিতে শুরু করেছে। যে কাজটা এখনও ফল দিতে শুরু করেনি, পরে করবে, তাকে বলে সঞ্চিত কর্ম। আর আমি এই মুহূর্তে যে-কাজটা করছি সেটা হচ্ছে ক্রিয়মাণ কর্ম। ঈশ্বরলাভ হলে সঞ্চিত আর ক্রিয়মাণ কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রারব্ধটা থেকে যায়। যতদিন না প্রারব্ধ ভোগ শেষ হয়, ততদিন শরীরটা থেকে যায়। একটা চাকা—তাকে যদি ঠেলে গড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যতটা জোরে চাকাটিকে ঠেলা হল, সেই অনুসারে চাকাটা কিছুদূর গড়িয়ে যাবে। সেটি নিজের ইচ্ছাতে যাচ্ছে না। তেমনি জ্ঞানলাভ বা ঈশ্বরলাভ যে করেছে, তার আর স্বতন্ত্র কোনও ইচ্ছা নেই। ঈশ্বরের উভর নির্ভরশীল হয়ে যেসব কর্ম সে করে সেসব ঐ সংস্কারবশে অর্থাৎ প্রারব্ধ তাকে যা করায়, তাই সে করে। যতদিন করায় ততদিন তার শরীর থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সন্ন্যাসি-সন্তানগণ যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী শিবানন্দ ঠিক ঐভাবে কর্ম করতেন। সংসারে থেকেও সংসারে নেই, শরীরে থেকেও শরীরে নেই। ঘরভর্তি লোকের মধ্যে বসে আছেন কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বসে আছেন। যেন অন্য কোনও লোকে বিচরণ করছেন। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে জগৎটাকে হঠাৎ যেন চিনে উঠতে পারছেন না। শিবানন্দজী মহারাজ অর্থাৎ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর খুব খারাপ। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করছেন : মহারাজ, কেমন আছেন? তিনি উত্তরে বলছেন : আমি? আমি বাবা খুব ভাল আছি। ঠাকুর দয়া করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই দেহটা 'আমি নই'। আমি খুব ভাল আছি। তবে যদি দেহের কথা জিজ্ঞেস কর, এ এর ধর্ম পালন করছে। বৃদ্ধ হয়েছে, দুদিন পরে ধ্বংস হয়ে যাবে।—এই সেই খড়ো নারকেল। মহাপুরুষজী বলছেন: ঠাকুরের কৃপায় আনন্দে আছি। সত্যিই তাঁর মুখে, চেহারায়, ব্যবহারে সবকিছুর ভিতর দিয়ে সেই আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছে।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, দেহকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের জীবনসংগ্রাম

চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এটা যদি আমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখি যে, দেহ থেকে আমরা আলাদা, আমাদের একটা আলাদা স্বরূপ আছে, সেই যে স্বরূপ, আর তাতে ব্যাধি নেই, সুখদুঃখ নেই, জন্মমৃত্যু নেই—তাহলে সংসারের সুখ বা দুঃখ কোনোটাই তখন আর আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমাদের আর কোনও চিত্তচাঞ্চল্য থাকবে না। আমাদের জীবনের আদর্শ হচ্ছে এই দুয়ের ঊর্ধ্বে যাওয়া, দ্বন্দ্বাতীত হওয়া। যিনি রাগ-দ্বেষ উভয়কে অতিক্রম করেছেন, সুখ-দুঃখকে সমভাবে গ্রহণ করেছেন এবং পরমাত্মার আনন্দে সমাহিত আছেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ।।১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ।।১৯

শত্রৌ (শত্রুর প্রতি) মিত্রে চ (এবং মিত্রের প্রতি) সমঃ (সমভাবাপন্ন) তথা (এবং) মান-অপমানয়োঃ (সম্মান ও অপমানে) শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু চ (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন) সঙ্গ-বিবর্জিতঃ (অনাসক্ত) তুল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসাতে সমভাব) মৌনী (সংযতবাক) যেন কেন চিৎ সন্তুষ্টঃ (যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট) অনিকেতঃ (নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন অথবা গৃহাদিতে আসক্তিবর্জিত) স্থির-মতিঃ (স্থিরবুদ্ধি) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (ব্যক্তি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ।১৮-১৯

যিনি শত্রু ও মিত্রে সমভাবাপন্ন, আবার তেমনি মান ও অপমানে, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে সমানবোধ করেন, যিনি সর্ববিষয়ে আসক্তি-বিবর্জিত, নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি, যিনি সংযতবাক্, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট এবং নিকেতনশূন্য, স্থিরবুদ্ধি ও ভক্তিমান, এইরূপ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

প্রকৃত ভক্ত শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন, তিনি শত্রুকে দ্বেষ করেন না, মিত্রকেও আদর করেন না। মান ও অপমান তাঁর নিকট সমতুল্য। কেউ সম্মান করলেও তাতে হৃষ্ট হন না, কেউ অপমান করলেও তাতে ব্যথিত হন না। তিনি উভয়ই সমানভাবে গ্রহণ করেন। তাঁর মন থেকে সমস্ত দ্বন্দ্বভাব বর্জিত। শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই তিনি সমভাবাপন্ন। তিনি ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত এবং বিষয়ে আসক্তিশূন্য। সর্বদা অনাসক্ত হয়েই সংসারে কর্ম করেন। নিন্দা ও স্তুতি উভয়ক্ষেত্রেই তিনি নির্বিকার। কেউ স্তুতি করলে তাঁকে আদর করেন না, নিন্দা করলেও অনাদর দেখান না।

বাচালতা মানুষের চিত্তে বিক্ষেপ ঘটায় তাই তাঁর বাক্য সংযত। সংসারে যা কিছু পেয়েছেন তিনি তাতেই সন্তুষ্ট। তাঁর মনে অতৃপ্তিভাব নেই। যা পান ভগবানের কৃপারূপে গ্রহণ করেন এবং তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। এই জগতে কোনও বাড়ি-ঘরকেই তিনি

আপনার বলে মনে করেন না, কাজেই গৃহাদিতে তাঁর কোনও আসক্তি জন্মায় নি। যেখানে বাস করেন, সেখানেই স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করেন। ভগবানে তাঁর মন সমর্পিত। সুতরাং তাঁর চিত্ত স্থির, বিষয়ী লোকের ন্যায় অস্থির চিত্ত নয়।

শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন—এই ভাবনার পিছনে যুক্তি হচ্ছে—ভক্ত মনে করেন 'আমার নিজের প্রারব্ধ কর্ম অনুসারে, কেউ আমার অপকারী শত্রু, আর কেউ বা আমার উপকারী মিত্র হয়েছে'—এই সত্য জেনেই তিনি সমভাবাপন্ন হন। সেইরকম 'আমার গুণেরই প্রশংসা বা মান, ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হয়ে থাকে'—এইরকম ভেবে নিজেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন। শীত বা উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ—নিজ প্রারব্ধ কর্মের ফল জেনে দুটিকেই সমভাবে ভোগ করেন এবং চেতন ও অচেতন কোনও বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হয়ে আসক্তচিত্ত হন না, মন একমাত্র ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত রাখেন—তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র।

কেউ ভাল বা মন্দ কাজ করলে লোকে তাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়েই স্তুতি বা নিন্দা করে থাকে। এখানে লোকে কার্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করছে, অতএব ভক্ত মনে করেন, তিনি কার্য থেকে আলাদা, কার্যের প্রশংসায় সুখী বা দুঃখী হব কেন?—এইভাবে বিচার করে দুটি বিষয়েই উদাসীন হয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে বাক্‌সংযম এবং ভগবানের কৃপাতে প্রাপ্ত অল্প বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকেন গৃহকে ঈশ্বরের নিবাস মনে করে, মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করে সেখানে বাস করেন। তাঁর মন-প্রাণ সর্বদা ভগবানেই অবিচলিত থাকে। এই রকম গুণান্বিত ভক্তিমান ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র।

ভক্তির প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে—ভগবান এবং বিষয় ভোগসুখ, এই দুয়ের উপাসনা একসাথে সম্ভব নয়। ভগবানকে পেতে হলে আর সবকিছু আমাকে ছাড়তে হবে। একেই বলে অনন্যা ভক্তি বা অহৈতুকী ভক্তি, অর্থাৎ একমুখী ভক্তি। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু চাই না—এই ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন প্রার্থনা করছেন—লোকমান্য চাই না, আর কিছু চাই না—শুধু শুদ্ধা ভক্তি চাই। আমি শুধু ভগবানকে ভালবাসতে চাই। এই ভালবাসাকে অনেকে অন্ধ ভালবাসা বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা এইরকম-ই হয়ে থাকে। আমি যাকে ভালবাসি, নির্বিচারেই ভালবাসি। কেন ভালবাসি—এর কোন উত্তর নেই। ভালবাসি তাই ভালবাসি।

এই ভালবাসা অহৈতুকী ভালবাসা। যে ভালবাসার পেছনে কোনও প্রত্যাশা নেই। এই ভালবাসা নিষ্কাম ভালবাসা। কোনও স্বার্থগন্ধ নেই, কোনও দোকানদারি নেই। এই ভালবাসার জন্য অর্থ, মানযশ, স্বাস্থ্য কিছুই আশা করি না। এই ভালবাসার জন্য আমি হয়তো কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু তবুও ভালবাসি। ভাল না বেসে আমি পারি না। ঈশ্বর কৃপা করুন আর না করুন—তবুও আমি তাঁকে ভাল না বেসে পারি না। এই হচ্ছে অহৈতুকী ভালবাসা। প্রভু আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী, তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমি কোনও বর

চাই না, আমি শুধু তোমাকে চাই। আমাকে তোমার নামগান করতে দাও—তাতেই আমার আনন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা করবে। শ্রীশ্রী মা সারদাদেবী বলছেন—ভগবানের কাছে কিছু চাইবে না, যদি কিছু চাইতে হয়, তাহলে 'নির্বাসনা' চাইবে। ভগবানের কাছে বলবে, তিনি যেন তোমার সব বাসনা দূর করে দেন। তাঁর কাছে ভক্তি চাওয়া যেতে পারে—কিন্তু এই কামনা কামনার মধ্যে পড়ে না। আমি যে-অবস্থায় থাকি না কেন, আমার একটি প্রার্থনা—তোমার পাদপদ্মে যেন সর্বদা আমার ভক্তি থাকে। এ ছাড়া আমার আর কোনও কামনা নেই।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ।।২০

যে তু (যে-সকল) ভক্তাঃ (ভক্ত) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হয়ে) যথা-উক্তম্ (উক্ত প্রকার) ইদং (এই) ধর্ম-অমৃতম্ (মোক্ষদায়ক ধর্ম) পর্যুপাসতে (সাধনা করেন) তে (তাঁরা) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়)।২০

যেসকল ভক্ত পূর্বোক্ত প্রকারে যত্নসহকারে অমৃতসদৃশ এই ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, যাঁরা আমার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান এবং আমিই যাঁদের শ্রেষ্ঠগতি—সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

যাঁরা মুমুক্ষু, তাঁরা শ্রদ্ধাবান হয়ে সগুণ ও নির্গুণ—উভয়ভাবে অর্থাৎ অভেদবোধে পূর্বকথিত নিষ্কাম কর্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে শ্রবণ, মনন ও ধ্যানাদি যোগে জ্ঞানলাভপূর্বক নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি অর্থাৎ ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করেন অথবা অনন্যভক্তিযোগে পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের উপাসনা করেন এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন। নির্গুণ নির্বিকার ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান হলে সাধকের লক্ষণসম্মত সমবুদ্ধির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রকৃত পরম ভক্তের লক্ষণও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাধকগণের প্রকৃতিভেদে উপাসনাপ্রণালী পৃথকভাবে কীর্তিত হয়েছে মাত্র। জ্ঞানী ও পরম ভক্ত উভয়েই নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বা শ্রীভগবৎস্বরূপ পরব্রহ্মই লাভ করেন।

এই জ্ঞান-ভক্তি-কর্মমিশ্র ধর্মকেই এখানে ধর্মামৃত বলা হয়েছে। ভগবান পুরুষোত্তমই মানুষের পরমগতি—এরূপ মনে করে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে, 'মৎপর' অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণতা বা ভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহকারে যিনি এই অমৃতধর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি ভগবানের একান্ত প্রিয়।

জ্ঞানী ও পরমভক্ত শ্রীচৈতন্যদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন : 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে'—হে জগদীশ, আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী কিংবা পাণ্ডিত্য, কিছুই চাই না। 'মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি'—তোমার প্রতি

জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।তিনি মুক্তিও চাচ্ছেন না। বলছেন: বারবার আসব, তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

আবার দেখছি, যশোদার প্রার্থনা। রাধা এসেছেন যশোদার কাছে। বলছেন : শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্য, আমি হচ্ছি তাঁর শক্তি। 'বরং বৃণুষ ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্'—যা তোমার মনে ইচ্ছা হয়, আমার কাছ থেকে তুমি চেয়ে নাও। যা জ্ঞানীরা পায় না, এমন জিনিসও আমি তোমাকে দিয়ে দেব। যশোদা বলছেন: ভগবানে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আর আমি যেন তাঁর দাসী হয়ে থাকতে পারি। এই আমার কাম্য।

মীরাবাঈ বলছেন: 'মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ'—গিরিধারী গোপাল ছাড়া আমার আর কেউ নেই। রাজবধূ ছিলেন মীরাবাঈ। রাজৈশ্বর্য, সমাজ সংসার, সব ত্যাগ করে পথে বেরিয়েছিলেন কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। ভগবানের আকর্ষণ এমনই দুর্বার। ঈশ্বর ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই।

সুরদাস বলছেন : 'সুরদাস মন উল্লাস রামচন্দ্রকে চরণ আশ যুগ যুগ হো ময়় দাস গাওয়ত নাম রাম রাম রাম'—আমি তোমার জন্মজন্মান্তরের দাস। চিরকাল আমি এই রামনাম করে যাব। তোমার চরণের আশাতে আমি বসে আছি। তোমার চরণ একদিন আমি লাভ করব, এই চিন্তাতেই আমার মন আনন্দে ভরে আছে।

তুলসীদাস বলছেন : 'চহৌ ন সুগতি'—মৃত্যুর পরে আমার সদ্গতি হবে, স্বর্গে যাব, এ আমি চাই না। 'সুমতি'—অনেক বিদ্যাবুদ্ধি হবে আমার, অনেক পাণ্ডিত্য হবে তাও চাই না। 'সম্পত্তি কছু রিধি সিধি বিপুল বড়াই'—সম্পত্তি হবে, যোগবিভূতি লাভ করব কিংবা খুব মানসম্মান হবে—এও আমি চাই না। আমি শুধু চাই 'হেতুরহিত অনুরাগ রামপদ বঢ়ো অনুদিন অধিকাই'—রামের পাদপদ্মে আমার যেন অহৈতুকী অনুরাগ হয়, আর সেই অনুরাগ যেন দিন দিন বাড়তে থাকে।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছে : ভক্তের একমাত্র কাম্যবস্তু ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি। 'যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি'—সেই ভক্তি পেলে সে আর কিছুই চায় না। 'আমি যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি'—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা করছেন : 'মা, এই লও তোমার অজ্ঞান, এই লও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' বলা হয় যে, মুক্তির থেকেও ভক্তি দুর্লভ। শ্রীশ্রী সারদাদেবী বলছেন : মুক্তি তো প্রতিক্ষণেই দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি ভগবান সহজে দিতে চান না।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **ভক্তিযোগ** নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন। ভক্তেরা ভাব ও ভক্তি অনুযায়ী উপাসনার বিভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। যাঁরা পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের উপাসনা করেন তাঁরাই যুক্ততম ভক্ত, তাঁদের যোগ সর্বাপেক্ষা গভীর ও নিবিড়। এই ভক্তি পথই সহজ ও সুগম। অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ সম্ভব কিন্তু ঐ পথ অতি ক্লেশযুক্ত। কিন্তু যাঁরা সমস্ত কর্ম ভগবানকে সমর্পণ করে অনন্যা ভক্তির সঙ্গে ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁরা সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানেই বাস করেন। অতএব ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে যাঁরা মনকে স্থির করতে পারেন তাঁরাই সাধনার উচ্চস্তরে অবস্থিত। এর জন্য চাই অভ্যাসযোগ, জপ, পূজা, কীর্তন, প্রার্থনা এবং সেই সঙ্গে নিষ্কাম কর্ম। ভগবানের স্বরূপ, গুণ, লীলা, কর্ম প্রভৃতি জেনে তাঁর উপাসনা করাই শ্রেয়। বাহ্যিক উপাসনা অপেক্ষা মানস উপাসনা শ্রেয়। অন্তরে তাঁর ধ্যানচিন্তা দ্বারা ভগবানের সঙ্গে নিকট-যোগ স্থাপন করাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই উপাসনা থেকেও সর্বকর্মফলত্যাগ শ্রেয়। কারণ কর্মফল ত্যাগের দ্বারাই পরম শান্তি লাভ সম্ভব।

শেষে ভগবান তাঁর পরম ভক্তের সম্পর্কে বলছেন—ভগবানে মন-বুদ্ধি সমুদয় সমর্পণকারী ঐকান্তিক ভক্তই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ভক্ত—যিনি স্পৃহাশূন্য, শুচি, দক্ষ (অনলস), উদাসীন, মনোব্যথাশূন্য, সর্বারম্ভপরিত্যাগী, যিনি হর্ষ-দ্বেষ-শোক-আকাঙ্ক্ষা-শুভাশুভ পরিত্যাগকারী, শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ যাঁর কাছে সমান, যিনি দুঃসঙ্গবর্জিত, যিনি নিন্দাস্তুতিকে তুল্য জ্ঞান করেন, যথালাভে সন্তুষ্ট, অনিকেত, স্থিরমতি ও ভক্তিমান, তিনিই তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অমৃতস্বরূপ এই ভক্তিধর্ম যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁরাই ভগবানের পরম প্রিয়।

সহজ করে বলা যায় প্রকৃত ভক্তের একমাত্র প্রার্থনা—প্রভু, যেন তোমার পাদপদ্মচ্যুত কিছুতেই না হই, তোমাতে বিশ্বাস ভক্তি প্রীতি যেন হিমালয়ের ন্যায় দৃঢ় এবং অচল থাকে। ভক্তের আর কার উপর রাগ বা অভিমান হবে। যা কিছু সমস্তই ভগবানের উপর—প্রীতি তাও ভগবানের সঙ্গে, কলহ তাও তাঁর সঙ্গে। ভগবানের সঙ্গে তাঁর সবকিছু। ভগবানকে তিনি কখনও ছেড়ে থাকতে পারে না। প্রেমে হোক অপ্রেমে হোক তাঁকে ছাড়তে পারে না। বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে যত বেশি সম্ভব পারা যায় ঈশ্বরের

স্মরণ, মনন, ধ্যান, জপ ও অবস্থা অনুযায়ী জীবসেবায় রত থাকা। এইরূপে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করা। যাঁরা ঈশ্বরের পদে জীবন অর্পণ করেছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। তাঁরা মনে করেন সকল ভাব ভগবানেরই। যখন যে ভাবের উদয় হবে তখন সেই ভাবেই ডুবে যাওয়া ভাল। এই সংসারে যাওয়া আসা কর্ম করা সবই তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছা। যাওয়াও তাঁর কাছে, থাকাও তাঁর কাছে, ফিরে যদি আসতে হয় সেও তাঁর সঙ্গে। তিনিই ইহকাল ও পরকাল জীবন-মরণের সাথী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

এই অধ্যায়ের নাম 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগঃ'। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ দেহ ও আত্মার প্রভেদ-দর্শনেই মুক্তি। আমাদের দেহাত্মবোধ অর্থাৎ এই নশ্বর দেহকেই আত্মবোধ করা অজ্ঞান এবং যতপ্রকার বন্ধনের কারণ। বিবেক বা আত্মজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মা যে দেহ হতে পৃথক—এই জ্ঞানেই নির্বাণ বা মুক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, রোগশোক। দেহেরই এইসব, আত্মার নয়। আত্মজ্ঞান হলে সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হয়। দেহ, মন ও বুদ্ধি সবই সৃষ্ট পদার্থ—সবই সগুণ, সবই নশ্বর, অতএব এইসকল আত্মা হতে পারে না।

মানবজীবনের লক্ষ্য নিজের স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করা। কিন্তু দেহকে আত্মা বলে বোধ করাই অজ্ঞান। স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ দেহ ও আত্মার পার্থক্য বোধই প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন--'যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত। সে ঠিক বুঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না।' দেহ ও দেহী—দেহ ক্ষেত্র এবং দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহের মধ্যে অবস্থিত দেহীকে যিনি জানেন তিনিও ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই দেহীকে জানাই হল স্বরূপের জ্ঞান।

আত্মা যে নির্গুণ এ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত। অথচ আমাদের মায়া বা অবিদ্যা আছে, তাই দুঃখ, পাপ, অশান্তি এসকল জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। আত্মা সর্বাবস্থায় নির্লিপ্ত। দেহে অবস্থিত হয়েও নির্লিপ্ত। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত। বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুই-ই আছে। তিনি নির্লিপ্ত। বায়ুতে কখনও সুগন্ধ, কখনো দুর্গন্ধ পাওয়া যায়; কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

ভগবান বলছেন—আত্মা নির্লিপ্ত। সুখ দুঃখ, পাপ-পুণ্য—এসব আত্মার কোনও

অপকার করতে পারে না; তবে এসব দেহাভিমানী জীবকে কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়ালকে ময়লা করতে পারে, আকাশের কিছু করতে পারে না। শরীর ক্ষেত্র এবং আত্মাকে যিনি জানেন তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর জড় এবং আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। জগতে স্থাবর-জঙ্গম যা-কিছু দেখা যায় সবই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের মিলনে জাত। যিনি সমস্ত বিনাশী পদার্থের মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে দেখেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা।

আমাদের জানতে হবে ক্ষেত্র অর্থাৎ জড়, বিকার্য বা পরিবর্তনশীল সমস্ত সৃষ্টিক্রিয়া এই ক্ষেত্রেরই পরিণাম। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন, নির্বিকার ও অপরিবর্তনীয়। ক্ষেত্রজ্ঞ কোনও কর্মে লিপ্ত নন, তিনি প্রকৃতির কর্মের দ্রষ্টা। এই সম্পর্কে উদাহরণ দিচ্ছেন মুণ্ডক উপনিষদ—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নোঽভিচাকশীতি।।' সর্বদা যুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুটি শোভন পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) পরস্পর আলিঙ্গন করে আছে। তাদের মধ্যে একজন (জীব) দেহ-বৃক্ষের বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল (সুখদুঃখাত্মক কর্মফল) ভোজন করছে, অপরটি কিছু আস্বাদন না করে স্থির, শান্ত ও দ্রষ্টারূপে অবস্থান করছে।

সেইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ে উভয়ের সখা। ঈশ্বর সর্বদা জীবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ। উভয়েই এক দেহ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে অবস্থান করেন। অথচ ঈশ্বর ক্ষেত্রজ্ঞ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কেবল দ্রষ্টা। সুখদুঃখরূপ কর্মফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

অর্জুন উবাচ
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ।।১

অর্জুন (অর্জুন) উবাচ (বললেন)—কেশব (হে কৃষ্ণ), প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ চ (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ম্ এব চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সকল) বেদিতুম্ (জানতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।১

অর্জুন বললেন—হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় কী তা জানতে ইচ্ছা করি।

অর্জুন এখানে ভগবানকে তিনটি প্রশ্ন করলেন—১) প্রকৃতি এবং পুরুষ কী? ২) ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ কী? ৩) জ্ঞান বা জ্ঞেয়ই বা কী? এই সবগুলোর সত্য অর্জুন জানতে চান। প্রকৃতি হচ্ছেন ত্রিগুণাত্মিকা এবং তিনি সর্বকার্য—দেহ, করণ—ইন্দ্রিয় ও বিষয়—রূপরসাদি আকারে পরিণত হয়ে পুরুষের ভোগ উৎপন্ন করেন। এই ভোগের আধার শরীর 'ক্ষেত্র' নামে কথিত হয়। এটাই সংসারের উৎপত্তির কারণ। আমি, আমার মনে করেন। এই দেহকে যিনি (আমি,আমার বলেন) জানেন অর্থাৎ যিনি ক্ষেত্রকে জানেন,

সেই অন্তরের চৈতন্যসত্তা এই দেহকে জানেন—তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র নিজেকে জানে না, কিন্তু অন্তরে এমন একজন আছেন যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন—তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। জ্ঞান অর্থাৎ 'আমরা যা জানি', জ্ঞেয় হলো 'জ্ঞানের বস্তু বা বিষয়' অর্থাৎ যাকে জানি। তিনটি জিনিস আছে—জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়। বেদান্তে ত্রিপুটি বলে। এই ত্রিপুটি লয় করে পরম ঐকাত্ম্য জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জ্ঞানই একমাত্র সত্য, চিৎ বা শুদ্ধজ্ঞান। ঈশ্বরই চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ।

জ্ঞানপথে প্রথমে ভেদদৃষ্টিতে জগৎটাকে বর্জন করে, নিত্যবস্তুকে জানার পথে এগিয়ে যেতে হয়। জগৎটা মিথ্যা, স্বপ্নবৎ—এই বিচার করে চলছেন। কিন্তু তাঁর যখন জ্ঞান হয়ে গেল, তখন তিনি এই জগৎটাকে কী চোখে দেখছেন? তখনও কি তিনি এই জগৎটাকে মিথ্যা বলছেন?—না। জগৎ তখন তাঁর কাছে সত্য। কারণ, তিনি তখন পরম জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতে এই জগৎকে দেখছেন। আমরা যদি জগৎকে 'জগৎ' হিসাবে দেখি, তাহলে মিথ্যা। কিন্তু যদি ব্রহ্মরূপে দেখি, তাহলে জগৎ সত্য। অতএব 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এই উপলব্ধির নাম জ্ঞান। আর 'ব্রহ্মময়ং জগৎ'—জগৎ ব্রহ্মময়—এই উপলব্ধির নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-অভেদ দৃষ্টি।

শ্রীভগবানুবাচ
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ।।২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন)—কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) ইদং শরীরং (এই ভোগায়তন দেহ) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) যঃ (যিনি) এতৎ (একে) বেত্তি (জানেন) তৎ-বিদঃ (সেই জ্ঞানিগণ, বেত্তাগণ) তং (তাঁকে) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি (এরূপ) প্রাহুঃ (বলে থাকেন)।২

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন, এই ভোগায়তন শরীর 'ক্ষেত্র' বলে অভিহিত হয়। যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, অর্থাৎ যিনি ক্ষেত্রসম্বন্ধে 'আমি', 'আমার'— এরূপ অভিমান করেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা বলা হয়। সেই আমিই হলো ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা—তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এইরূপ বলে থাকেন।

আমাদের শরীরের সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াসমূহও এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত। অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার), পঞ্চ প্রাণ—এই সবের সঙ্গে সুখ-দুঃখের ভোগায়তন এই শরীরের নাম ক্ষেত্র। কারণ জীবকে তার দেহ অবলম্বন করেই জাগতিক সমস্ত কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং দেহেই তার সমুদয় কর্মের ফল ভোগ হয়ে থাকে। এই শরীরের মধ্যে থেকে যিনি 'অহং', ও 'মম' অভিমান করেন। জীব মনে করেন—আমার দেহ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, দেহসম্বন্ধে এভাবে

'আমি', 'আমার', জ্ঞান করেন—তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। অর্থাৎ জীবের এই ক্ষেত্রকে জিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রত্যেক জীবের দেহকে আশ্রয় করে যে আত্মা আছে তাই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা। আত্মাই চেতন, আর সমস্তই জড়। চেতনেরই জ্ঞানশক্তি আছে, জড়ের জ্ঞানশক্তি নাই। তবে এই ক্ষেত্রজ্ঞের দুটি অবস্থা আছে—একটি বদ্ধ জীবাত্মা এবং অপরটি মুক্ত জীবাত্মা।

বদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞানবশত জীব আত্মার স্বরূপ জানতে না পেরে দেহেতেই 'আমি', 'আমার' বলে অভিমান করেন এবং দেহের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে দেহের সুখদুঃখেই আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করেন। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় জ্ঞানলাভ হলে জীব আত্মাকে দেহ-অতিরিক্ত চেতনসত্তা বলে উপলব্ধি করেন। আত্মা দেহ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই প্রকারে জীব যখন ক্ষেত্রের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন তখনই তাকে প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। তিনি মুক্ত জীবাত্মা, তিনি জানেন—শরীর জড় ও আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং তিনিই শরীরকে ক্ষেত্র এবং জীবকে বদ্ধ-জীবাত্মা বা অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দেন। তবে ঈশ্বরই সব ক্ষেত্রের পরম ক্ষেত্রজ্ঞ।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ।।৩

ভারত (হে অর্জুন), সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সকল ক্ষেত্রেই) মাং (আমাকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে) ক্ষেত্রজ্ঞং চ (ক্ষেত্রজ্ঞ বলে) বিদ্ধি (জানবে) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (তা-ই) জ্ঞানং (প্রকৃত জ্ঞান) মম (আমার) মতম্ (অভিমত)।৩

হে ভারত, সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিখিল প্রাণীদেহে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ দেহী বলে জেনো। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ যে জ্ঞান, তা-ই প্রকৃত জ্ঞান—এই আমার মত। ভগবান সুস্পষ্টভাবে বললেন, ক্ষেত্র বিভিন্ন রূপে ও নামে দেখা যায় কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেরই একজন জ্ঞাতা। ক্ষেত্র বহু কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ এক এবং ভগবানই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। একই পরমাত্মা পরমপুরুষ বিভিন্ন দেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত থেকে ক্ষেত্রকে জানছেন। আবার এই পরমাত্মাই বিরাট অখণ্ড বিশ্বদেহের জ্ঞাতা। শুধু ক্ষেত্রজ্ঞ সম্পর্কে জানলেই চলবে না, ক্ষেত্র-কেও অবশ্যই জানতে হবে। ভৌত বা জড় বিজ্ঞান বাহ্য জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে-জ্ঞান দেয়, তা এই ক্ষেত্র সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে অস্বীকার করলে চলবে না। এই অপরা জ্ঞানকেও জানতে হবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতেরও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন জীবের দেহ পৃথক পৃথক প্রতীয়মান হলেও তাঁদের জ্ঞাতা অন্তরস্থ পরমাত্মা এক। বৈচিত্র যা কিছু, তা সবই ওপর ওপর—বাহ্য প্রতীতি ছাড়া কিছুই নয়। বাস্তবে কিন্তু বিশ্বের

সকল দৃষ্ট বস্তুর এবং সকল দ্রষ্টার জ্ঞাতা একটিই—বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই চৈতন্যই বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। জীব যে নিজেকে পৃথক জ্ঞাতা বলে মনে করে এটি তার অজ্ঞানতাপ্রসূত। এই অজ্ঞানতা দূরীভূত হলে সে সর্বক্ষেত্রে একই আত্মাকে জ্ঞাতারূপে দেখতে পায়। তখন উপলব্ধি হয় পরমাত্মাই সমস্ত হয়েছেন এবং তিনিই সমস্তের জ্ঞাতা। আত্মার জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। আত্মাকে ছেড়ে প্রকৃতির যে জ্ঞান তা প্রকৃত জ্ঞান নয়, তা অজ্ঞানেরই নামান্তর। এই আত্মার জ্ঞানই মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকার হতে মুক্ত করে। আমরা যখনই নিজের অন্তরের সত্তার সন্ধানে নিযুক্ত হব তখনই আমাদের জ্ঞানের বিস্তার ঘটবে। তখনই আমরা জীব, ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সম্যক ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হব। অতএব ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের স্বরূপজ্ঞান ও প্রভেদজ্ঞানই পূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান।

তাই ভগবান অর্জুনকে প্রকৃত অধিকারী জেনে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করছেন। ভগবান বলছেন, তিনিই সকল জীবের অধিষ্ঠানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও বিভু এবং ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে বিরাজ করছেন। ক্ষেত্র মায়াধীন, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ মায়াধীশ বা মায়ার অতীত। উভয়ের এইরূপ ভেদবুদ্ধি উদয় হলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। আবার আত্মবুদ্ধি হলে ভগবান ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই—এই একত্ব উপলব্ধি হয়। তাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুটিকেই জানতে হবে। দুটিকে জানলে পূর্ণ জ্ঞান। বাইরে থেকে বহু মনে হয় কিন্তু বস্তুত এক ও অবিভাজ্য সত্তা। একটি সত্যই সব কিছুর পিছনে রয়েছে।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ।।৪

তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যা) যাদৃক্ চ (এবং যে রূপ, অর্থাৎ যে ধর্মযুক্ত) যৎ-বিকারি (যে যে বিকারযুক্ত) যতঃ চ (এবং যা থেকে) যৎ (যে ভাবে উৎপন্ন) সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যে প্রকার স্বরূপবিশিষ্ট) যৎ-প্রভাবঃ চ (এবং যে প্রভাবসম্পন্ন) তৎ (তা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে (আমার কাছ থেকে) শৃণু (শোন)।৪

সেই ক্ষেত্র কীরকম, তার বৈশিষ্টগুলি কী, কীরকম বিকারযুক্ত, কোন্ কারণ থেকে কী কার্যের উৎপত্তি হয় এবং তিনি (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) কে, কীই বা তাঁর শক্তি, তা সংক্ষেপে আমার কাছ থেকে শোন।

ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়—১) ক্ষেত্রের স্বরূপ বা উপাদান কী? ২) ক্ষেত্রের প্রকৃতি বা ধর্ম কী? ৩) তা কী কী বিকারবিশিষ্ট? ৪) তার মধ্যে কোন কারণ হতে কোন কার্য উৎপন্ন হচ্ছে? অর্থাৎ সেই ক্ষেত্র জড় ও দৃশ্যমান বস্তু, ক্ষেত্রের ইচ্ছাদি ধর্ম, ক্ষেত্রের ইন্দ্রিয়ের বিকার, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে জীব-জগৎ উৎপন্ন ইত্যাদি বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন।

ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়—১) ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কী? ২) ক্ষেত্রজ্ঞ কী কী

প্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের শক্তি এবং ঐশ্বর্য কী? অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপত যা ও যেমন প্রভাবসম্পন্ন সেই বিষয়গুলি ভগবান ব্যাখ্যা করবেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমস্ত তত্ত্বই ভগবান বলবেন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ।। ৫

ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (বিভিন্ন বেদে নানা ছন্দে) পৃথক্ (পৃথক-ভাবে) বহুধা (অনেক প্রকারে এই ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব) গীতম্ (ব্যাখ্যাত হয়েছে) বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়শূন্য) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ এব চ (এবং বেদান্তদর্শনরূপ ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহ-দ্বারাও বর্ণিত হয়েছে)।৫

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব ঋষিগণ কর্তৃক নানা ছন্দে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বেদচতুষ্টয়ের নানা শাখায় এই তত্ত্ব বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ও ব্রহ্মসূত্রপদসকলও এ তত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে বর্ণনা করেছেন।

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক পৃথকভাবে এবং বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারে উক্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে শাস্ত্র কোথাও ত্রুটি করেন নি। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যোগশাস্ত্র পাঠ করলে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানতে পারা যায়। বেদে নানা ছন্দে, নানা মন্ত্র ও ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা তা কথিত হয়েছে। উপনিষদাদি ব্রহ্মসূত্রসকলও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা ও স্বরূপ নানাপ্রকারে বর্ণনা করেছেন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্বে সৎস্বরূপ ছিল, সেই সৎস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। এইরূপ নানাস্থানে নানাভাবে এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। ব্রহ্মকে নির্দেশ করে এমন সব বাক্যসমূহ, যুক্তিযুক্ত ও সংশয়াতীতভাবে, নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে তারই সংক্ষিপ্ত আভাস দিলেন।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।।৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ।।৭

মহাভূতানি (পঞ্চ মহাভূত) অহঙ্কারঃ (মহাভূতের কারণ-স্বরূপ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব) অব্যক্তম্ এব চ (এবং এর কারণভূত মূলা প্রকৃতি) দশ-ইন্দ্রিয়াণি (বাহ্য জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ) একম্ চ (এবং এক মন) পঞ্চ (শব্দাদি পঞ্চ) ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়) ইচ্ছা (সুখ-স্পৃহা) দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহেন্দ্রিয়-সংহতি অর্থাৎ শরীর) চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য) এতৎ সবিকারম্ (বিকারযুক্ত এই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (বলা হলো)।৬-৭

ক্ষেত্রের স্বরূপ—পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত (মূলা প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয় ও এক অর্থাৎ মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) ও ধৃতি (ধৈর্য) এইসব ইন্দ্রিয়-বিকারযুক্ত ক্ষেত্রের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হলো।

সাংখ্য মতে—অব্যক্ত (প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—পঞ্চ বিষয় এবং ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত একত্রে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—ক্ষেত্র নামে অভিহিত।

অব্যক্ত—এটি মূল প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। এই গুণগুলি সমভাবে থাকলে সৃষ্টি হয় না। কোনও গুণের বৈষম্য হলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

বুদ্ধিঃ—এটির অপর নাম মহৎ। এটি মূল প্রকৃতির প্রথম বিকার বা পরিণাম। এটাই জীবগণের সমষ্টিগত বুদ্ধি।

অহঙ্কারঃ—বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার। অর্থাৎ আমিত্বের বোধ। আমি অন্যের থেকে পৃথক অর্থাৎ আমি-ভাবই একত্ব থেকে বহুত্বের সৃষ্টি করে।

মন—এক মন, এটি অহঙ্কারের সাত্ত্বিক বিকার। ইন্দ্রিয় বহু হলেও পরিচালক মন এক।

দশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। এগুলি অহঙ্কারের সাত্ত্বিক বিকার।

মহাভূতানি—পঞ্চ মহাভূত এবং পঞ্চ তন্মাত্র, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ —পঞ্চভূতের পঞ্চতন্মাত্র।

অতএব মূল প্রকৃতি অব্যক্ত এবং তার ত্রয়োবিংশতি পরিণাম—এগুলির সমষ্টিদ্বারাই ক্ষেত্র গঠিত।

বেদান্ত-মতে অব্যক্ত (মায়া), বুদ্ধি (মায়িক বৃত্তিরূপ ঈক্ষণ), অহঙ্কার (বহুরূপে জগৎ বিকাশের মায়িক সঙ্কল্প), মায়ার পরিণাম পঞ্চ মহাভূত, মন (চার অন্তঃকরণ), দশ ইন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় (অন্তঃকরণের মধ্যে ইচ্ছাদি ধর্ম),—এগুলির সংঘাতেই পঞ্চভূতাদির পরিণামরূপ জড়শরীর বা ক্ষেত্র। শরীর-ইন্দ্রিয়াদি স্থূল- শরীর, মন-বুদ্ধি-আদি সূক্ষ্মশরীর, এবং অব্যক্তই (মায়া বা প্রকৃতি) কারণশরীর। এই ত্রিবিধ শরীরই বিকারযুক্ত ক্ষেত্ররূপে কথিত হয়েছে।

এরপর ক্ষেত্রের ধর্ম বলা হয়েছে। সুখম্ দুঃখম্—সুখ এবং তার বিপরীত অবস্থা দুঃখ। এটি মনের ধর্ম। কাজেই ক্ষেত্রেরই বিকার। আত্মা আনন্দময়, কিন্তু প্রকৃতির সংস্রবে এসে অজ্ঞানতাবশত যখন দেহাভিমানীর 'দেহই আমি'—এই অহংজ্ঞানের উদয় হয় তখন প্রকৃতির ক্রিয়াবশত 'আমি সুখী, আমি দুঃখী'—এই জ্ঞান জন্মে। এগুলি মনের ধর্ম।

ইচ্ছা দ্বেষঃ—'সুখজনক পদার্থ আমারই হউক'—এইরূপ যে বাসনা তার নাম ইচ্ছা। এর থেকে রাগ ও কাম—এই দুটি শব্দ ইচ্ছারই নামান্তর। দুঃখ ও সেই সম্পর্কযুক্ত ঘটনা না ঘটুক—এইপ্রকার বিরোধী বাসনাই দ্বেষ। এর থেকে ক্রোধ বা ঈর্ষা জন্মায়।

চেতনা—জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তির নাম চেতনা। জীবের মধ্যে যে প্রাণের ক্রিয়া, চেষ্টা, চাঞ্চল্য দেখা যায় তাকে চেতন বলা যেতে পারে।

ধৃতিঃ—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়কে কার্যে আসক্তিশূন্য রাখবার শক্তি বা প্রযত্ন। অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে স্থির রাখবার প্রযত্নের নাম ধৃতি।

সংঘাতঃ—দেহ ও ইন্দ্রিয়ের যে অপূর্ব সংযোগ হতে অন্তঃকরণবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটে। জন্ম হতে মরণ পর্যন্ত পরিণামরাশির নাম বিকার।

অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রের ধর্ম। কাম, সংকল্প, বিকল্প, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য, অধৈর্য, লজ্জা, চিন্তা, ভয়—এই সব মনের ধর্ম।

সাংখ্য মতে পঁচিশতম তত্ত্বটি হলো পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি আত্মা, দেহ হতে স্বতন্ত্র। যিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে সেই অধ্যাত্মজ্ঞানের সাধনার কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত সাধন অভ্যাসের দ্বারা শরীর সংযত ও শুদ্ধ এবং চিত্ত বিবেক-যুক্ত, অনাসক্ত ও ভগবৎ-ভাবে অনুরঞ্জিত হলে সাধক বুদ্ধিস্থ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। জ্ঞানের সাধনার অঙ্গ হিসাবে সংক্ষেপে নিষ্কাম কর্ম, ভক্তিযোগ ও বিবেক-বিচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ।।৮

অমানিত্বম্ (শ্লাঘারাহিত্য) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভরাহিত্য) অহিংসা (পরপীড়াবর্জন) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জবম্ (সরলতা) আচার্যোপাসনং (গুরুসেবা) শৌচং (পবিত্রতা, সদাচার) স্থৈর্যম্ (শুভকার্যে স্থিরতা বা একনিষ্ঠা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরনিগ্রহ বা আত্মসংযম)।৮

শ্লাঘাশূন্যতা, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরচিত্ততা, আত্মসংযম—এই সমস্তই জ্ঞানলাভের সহায়ক।

৮-১৩ পর্যন্ত মন্ত্রে ভগবান জ্ঞান ও জ্ঞানের সাধন কী তাই বলছেন।

অমানিত্বম্—নিজের অবিদ্যমান গুণসমূহের প্রচারের নাম মানিত্ব অর্থাৎ 'আমি বিদ্বান, আমি ধার্মিক'—এই সব লোকসমাজে দেখানো আত্মশ্লাঘা। এর অভাব অমানিত্ব। অজ্ঞানী লোকে আত্মশ্লাঘা করে থাকে, জ্ঞানী আত্মশ্লাঘাশূন্য হন।

অদম্ভিত্বম্—বড় অনুষ্ঠান, প্রচার দ্বারা নিজের ধার্মিকত্বের প্রকাশ বা ধার্মিক বলে খ্যাতিলাভের চেষ্টাই দম্ভ। এর অভাব অদম্ভিত্ব।

অহিংসা—বাক্য, মন বা শরীরের দ্বারা কারও পীড়া উৎপাদন না করা। হিংসার অভাব অহিংসা। অর্থাৎ সকল জীবকে ভালবাসা। কোনও জীবনের অনিষ্ট না করা। আবার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে ভগবৎ ইচ্ছায় রাগ-দ্বেষ বর্জন করে স্বধর্ম পালন করাই সৎ বা অহিংস কর্ম। এই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবৎ প্রেরণায় স্বধর্ম পালন করতে (যুদ্ধ করতে) বলছেন অধর্মের বিরুদ্ধে—সেটি হিংসা নয়। জ্ঞানিগণের সমস্ত কর্মই লোকসংগ্রহার্থ ভগবৎ কর্ম।

ক্ষান্তিঃ—ক্ষমাশীল। জ্ঞানী শত্রু-মিত্র সকলের প্রতিই ক্ষমাশীল। অন্য ব্যক্তির দ্বারা উৎপীড়িত হলে লোকে তার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয় এবং সেই উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে।—একেই বলে প্রতিহিংসা। জ্ঞানীর চিত্তে কখনও প্রতিহিংসার ভাব স্থান পায় না এবং তিনি প্রতিহিংসার ভাবে বা প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে কোনও কর্ম করেন না।

আর্জবম্—ঋজু অর্থাৎ সরল ব্যবহার। বালকের ন্যায় সরল ব্যবহার জ্ঞানীর প্রধান লক্ষণ। বিষয়াসক্ত মানুষই কুটিলতার আধার। হৃদয়ে এক ভাব, মুখে আর এক ভাব, অপরকে প্রবঞ্চিত করে। জ্ঞানীর মন-মুখ এক। কাউকে তিনি কখনও প্রবঞ্চিত করেন না।

আচার্যোপাসনা—আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা আচার্যের শুশ্রূষা এবং নমস্কারাদি দ্বারা সেবা করাই আচার্যোপাসনা। গুরুসেবা বা আচার্য-সেবা জ্ঞানলাভের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। আচার্যকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করতে না পারলে শিষ্যের চিত্তে জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই শিষ্যের বিনয় ও নম্রতা লাভের শিক্ষা হয়, অহঙ্কার বিনাশ হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হয়।

শৌচম্—শুচিতা, পবিত্রতা। শৌচ দুই প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। শরীরের যত্ন নেওয়া, সৌন্দর্য ও শুচিতা রক্ষা করা। সেইসঙ্গে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাদি ও অপরের দোষ না দেখা—এই সকল দ্বারা মনের শুচিতা বৃদ্ধি করা। ভগবৎ ভাবনা দ্বারা মনের শুদ্ধতা রক্ষা করা।

স্থৈর্যম্—শত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলেও ঈশ্বরের পথে অর্থাৎ মুক্তির পথে সাধনায় স্থির থাকা। জ্ঞানলাভের পক্ষে এই স্থৈর্য একান্ত আবশ্যক। চিত্তের স্থিরতাও একান্ত প্রয়োজন। অজ্ঞানীর চিত্ত সামান্য কারণেই অস্থির হয়ে ওঠে, এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়, কিন্তু জ্ঞানীর চিত্তের স্থৈর্য কিছুতেই নষ্ট হয় না।

আত্মবিনিগ্রহঃ—ঈশ্বরের পথে বা মুক্তির পথে প্রতিকূল অবস্থাকে নিরুদ্ধ করে সাধনপথে এগিয়ে যাওয়াকে আত্মনিগ্রহ বলে। এ-প্রকার আত্মনিগ্রহ জ্ঞানলাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কারণ বিষয়াভিমুখী চঞ্চল চিত্তবৃত্তিগুলি সংযত না হলে জ্ঞানলাভ সহজ হয় না।

সহজ করে আদর্শগুলিকে একত্রে বলা যায়—নিজের গুণের জন্য অভিমান না থাকা, লোকের কাছে খ্যাতির জন্য নিজের ধর্মভাব প্রকাশ না করা, কায়মনোবাক্যে

সকলকে ভালবাসা, নিজের শক্তি থাকা সত্ত্বেও অপরের দোষ না দেখা বা অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, মন-মুখ এক অর্থাৎ হৃদয়ে ও বাইরে এক ব্যবহার করা, সৎ ব্যক্তি ও আচার্যকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা করা, দেহের ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা, মনের চঞ্চলতা স্থির করা, বাইরের নানা প্রতিকূল বাধা হতে নিজেকে অর্থাৎ নিজের জীবন, চরিত্র, আধ্যাত্মিক চেতনাকে রক্ষা করা ও ঈশ্বরের শরণাগত থাকাই জীবনের লক্ষ্য।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্‌ ।।৯

ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) বৈরাগ্যম্‌ (বিরাগ বা অনাসক্তি) অনহঙ্কারঃ এব চ (ও নিরহঙ্কারিতা) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্‌ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখসমূহে পুনঃপুন দোষদর্শন)।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগ, সেইসঙ্গে নিরহংকারিতা, এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের অশুভ দিকগুলির কথা বারংবার চিন্তা করা—তবেই উচ্চতর জ্ঞানলাভ সম্ভব।

উচ্চতর জ্ঞানলাভ করতে হলে দেহবোধ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি থেকে মনকে আসক্তিশূন্য রাখতে হবে। এই দেহবোধ ও বিষয়তৃষ্ণাই মানুষের জ্ঞানকে বলপূর্বক নীচে অজ্ঞানের পথে টেনে নিয়ে যায়। তাই জ্ঞানলাভের পথের ব্যাখ্যা করছেন—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্‌—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে বিরাগ বা আসক্তিশূন্য হওয়া। অজ্ঞানী মানুষ দেহবোধ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপরসাদির উপভোগেই তৃপ্তিবোধ করে। এছাড়া কোনও উচ্চতর আনন্দের আস্বাদ সে পায় না। কিন্তু জ্ঞানী দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে কোনও আনন্দ অনুভব করেন না। ইন্দ্রিয়সুখে তাঁর কোনও স্পৃহাই থাকে না। তিনি সর্বদা ঈশ্বরানন্দে বা ব্রহ্মানন্দে ডুবে থাকেন।

অনহঙ্কারঃ—দুইভাবে মানুষ অহঙ্কার করে থাকে। ১) অহংবোধে গর্বের ভাব—আমি বড়, আমি বিদ্বান, আমি বুদ্ধিমান ইত্যাদি এই প্রকার অনুভূত হওয়া। ২) কর্তৃত্বাভিমান--আমি কর্তা, আমি ভোক্তা--এইভাবে সংসারে অহঙ্কার ও আনন্দ অনুভব করা। অজ্ঞানী মানুষ এইসকল বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু জ্ঞানী কখনও এই প্রকারের গর্ব করেন না। তিনি সর্বদা নিরভিমান, নিরহঙ্কার।

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষ-অনুদর্শনম্‌—জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে নিরন্তর দোষদর্শন করা চাই। এইগুলি মানুষের দুঃখের উৎস। জীবের বারংবার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির আক্রমণ থেকে ক্লেশ উৎপন্ন হয় এবং অন্যান্য প্রকারের বিবিধ দুঃখ থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে হয়। কারণ এর থেকে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এইসকল ক্লেশ ও দুঃখের বারংবার আলোচনা দ্বারা দেহ ও বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে। সেটাই জ্ঞানলাভের প্রধান সাধন।

দেহাত্মবোধ ও বিষয়ভোগে স্পৃহাশূন্য হওয়াই জ্ঞানলাভের অনুকূল পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ শূন্য হওয়া। সর্বদা মনে করা এই মানবশরীরের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ করা। এই মানবশরীর বিষয়ভোগের আনন্দে ডুবে থাকার জন্য নয়।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।।১০

অসক্তিঃ (বিষয়ে অনাসক্তি) পুত্র-দার গৃহাদিষু (পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে) অনভিষ্বঙ্গঃ (মমত্ববুদ্ধিশূন্যতা) ইষ্ট-অনিষ্ট-উপপত্তিষু চ (এবং শুভ ও অশুভপ্রাপ্তিতে) নিত্যম্‌ (সদা) সমচিত্তত্বম্‌ (মনের সাম্যভাব)।

পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা অর্থাৎ মমত্বের অভাব, এবং বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত লাভে সমচিত্ততা অর্থাৎ মনের নিরবচ্ছিন্ন সাম্যভাব রক্ষা করা।

পুত্র-দার গৃহাদিষু অসক্তিঃ—অজ্ঞানী মানুষ মমত্ববুদ্ধিতে 'এই আমার স্ত্রী, এই আমার পুত্র, এই আমার গৃহ' ইত্যাদি মনে করে সেইসকল বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ ও মমত্ববোধের জন্য সে ঈশ্বরচিন্তায়, আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করতে পারে না। তাই জ্ঞানী বিষয়ে আসক্তি ও মমত্ববোধ ত্যাগ করেন। এইসকল বিষয় আমার বলে মনে করেন না। তাঁর জাগতিক কোনও বিষয়ে আসক্তি জন্মায় না। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদি বিষয়ের সঙ্গে বাস করেও অনাসক্ত এবং ঈশ্বরের চিন্তায় মনকে নিবিষ্ট রাখেন।

অনভিষ্বঙ্গঃ—অজ্ঞানী মানুষ মমত্ববোধে তার স্ত্রী-পুত্র ও প্রিয়জনের সুখে নিজেকে সুখী ও গর্ব অনুভব করে এবং তার দুঃখে নিজেকে দুঃখী এবং জীবনকে শূন্য মনে করে। জ্ঞানী নির্লিপ্ত তাই তিনি এরূপ মনে করেন না। তিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত থাকেন, মমত্বশূন্য হয়ে স্ত্রী-পুত্র ছাড়াও সকলের সুখে সুখী এবং সকলের দুঃখাদিতে দুঃখ অনুভব করেন। কারণ তিনি সকলের মধ্যে নিজেকে দেখেন এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখেন। একত্ব অনুভব করেন।

ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু সমচিত্তত্বম্‌—জ্ঞানী বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত বস্তুতে অর্থাৎ ইষ্ট উপস্থিত হলেও তাতে হৃষ্ট হন না, আবার অনিষ্ট ঘটলেও তাতে বিষাদ অনুভব করেন না। তিনি সর্বদা সকল অবস্থাতেই সমচিত্ত থাকেন।

মনের প্রকৃতি হলো রাগ-দ্বেষের প্রতি আকৃষ্ট ও চঞ্চল হওয়া। তাই এই মনকে সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হলে মনও দৃঢ় হয়, তখন মনে সাম্যভাব আসে। প্রথমে সাম্যভাব আসে না কিন্তু অভ্যাস করতে করতে এই সাম্যভাব দৃঢ় হয়, মন তখন বশে আসে। মনে অনাসক্তিও দৃঢ় হয়। তখন প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ

না হয়ে সমভাবাপন্ন থাকা সম্ভব হয়।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ।।১১

ময়ি (আমাতে) অনন্য-যোগেন (অনন্যচিত্তে বা সর্বান্তঃকরণে) অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ (ঐকান্তিকী ভক্তি) বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্ (বিঘ্নশূন্য নির্জন স্থানে বাস) চ জনসংসদি অরতিঃ (এবং বহু জনসমাগমের সংসর্গে অনিচ্ছা বা উপর বিতৃষ্ণা)।১১

আমাতে (ভগবান পরমেশ্বরে) অনন্যা যোগদ্বারা বা নিষ্ঠাদ্বারা ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ নির্জন স্থানে নিয়মিত বাস, বহুজনসমাগমের উপর বিতৃষ্ণা বা সংসর্গে অনিচ্ছা।

ভগবান পরম জ্ঞানলাভের কথা ব্যাখ্যা করছেন। সেখানে জ্ঞানী বা ভক্ত ভাবেন—ভগবান ব্যতীত আমার গতি, মুক্তি বা আশ্রয়স্থান নাই, একমাত্র ভগবানই আমার গতি ও আশ্রয়। তাই ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম, পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস অর্থাৎ চিত্তে আনন্দ দেয় সেইরূপ নির্জন স্থানে বাস, সাধারণ জনসমাগম অর্থাৎ যারা জ্ঞান-ভক্তিবর্জিত, বিষয়ভোগে মত্ত এবং ভগবৎচিন্তায় বিমুখ—এইরূপ প্রতিকূল পরিবেশ ত্যাগ করা এবং জ্ঞানসাধনের পরম অনুকূল পরিবেশে বাস করা। শাস্ত্রে বলে সঙ্গত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ করা। যাঁদের সঙ্গ করলে ঈশ্বরচিন্তার উদ্দীপন হয়।

'ময়ি অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ'—যিনি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করেছেন তিনি আমাতে অর্থাৎ ভগবান পুরুষোত্তমে, পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিমান হন। পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের জ্ঞানই সমগ্রের জ্ঞান—তাঁর নির্গুণ ও সগুণ উভয় স্বরূপের জ্ঞান। পরমেশ্বরকে একান্ত গতি ও মুক্তি মনে করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ভজনা করেন। এই ভক্তি দৃঢ় ও গভীর। কোনও প্রতিকূল কারণে এর শিথিলতা আসে না। এই পরম ভক্তিই জ্ঞানলাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

বিবিক্তদেশসেবিত্বম্—জ্ঞানী স্বভাবত বা সংস্কারবশত শুদ্ধ, পবিত্র। তিনি জনকোলাহলবর্জিত স্থানে থাকতে ভালবাসেন। অপবিত্র, অশুদ্ধ, কোলাহলপূর্ণ স্থান চিত্তের স্থিরতা রক্ষার প্রতিকূল বলে জ্ঞানী বা জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি ঐ স্থান বর্জন করেন।

জন-সংসদি অরতিঃ—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, অবিনীত, কলহপরায়ণ লোকেদের সভায় যোগদান করতে জ্ঞানী ভালবাসেন না। এই প্রকার লোকসমাগম জ্ঞানসাধনের পরিপন্থী। জনবহুল স্থানে বাস বা প্রশংসালাভের স্পৃহাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে। তাই জ্ঞানলাভার্থী লোকসমাগম হতে দূরে থাকেন।

মুমুক্ষু ব্যক্তি নির্জনে থাকবেন, লোকসমাগম হতে দূরে থাকবেন। যদি লোকসঙ্গ করেন তাহলে সৎসঙ্গ করবেন, কেননা সৎসঙ্গ ভবরোগের মহৌষধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন-

-ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। সংসারে বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনবাসও করতে হবে। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে । ঈশ্বরই সৎ—কিনা নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ—কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ।।১২

অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে অবিচলিত নিষ্ঠা) তত্ত্ব-জ্ঞান-অর্থ-দর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা বা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান) এতৎ (এইসব অর্থাৎ অমানিত্ব হতে তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্যন্ত) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের সাধন) প্রোক্তম্ (বলা হয়) যৎ (যা) অতঃ অন্যথা (এর বিপরীত) তৎ (তা) অজ্ঞানং (জ্ঞানলাভের বিরোধী বা প্রতিবন্ধক, অজ্ঞান)।

পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন বা ফল সম্বন্ধে আলোচনা—এই সকলকে আত্মজ্ঞানলাভের সাধন বলে কথিত হয়। এদের বিপরীত মানিত্ব ও দাম্ভিকতাদি অজ্ঞান বলে জানবে এবং এগুলি মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী সংসারপ্রবৃত্তির কারণ বলে সর্বতোভাবে পরিহার্য।

শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় ও তত্ত্বজ্ঞানের সাধনসমূহ বিবৃত করা হয়েছে উপরের মন্ত্রগুলিতে। আত্ম-অনাত্ম বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভার্থ একান্ত নিষ্ঠা, বেদান্তবাক্য ('অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি) আত্মজ্ঞানের সহায়ক বিষয়ে আলোচনা এবং অমানিত্বাদি সাধন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এর বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান। অতএব আমাদের সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অন্বেষণ বা আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান করাই জীবনের লক্ষ্য।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মাকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাই অধ্যাত্মজ্ঞান। এই অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ব অর্থাৎ স্থিরনিষ্ঠাই হল জ্ঞানীর লক্ষণ। কিন্তু অজ্ঞানীরা ইন্দ্রিয়জাত স্থূল বিষয়সমূহের জ্ঞানকে একমাত্র জ্ঞান বলে মনে করে। এই বিষয়জ্ঞানেই তাদের স্থিতি। এর চেয়ে উচ্চতর জ্ঞানের প্রতি তাদের কোনও আকর্ষণ নেই। আবার তারা আত্মার জ্ঞানলাভকে অসম্ভব বলে মনে করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানী আত্মজ্ঞানের আনন্দে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি লাভ করে, তাঁর নিকট ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অজ্ঞান ও অনিত্য।

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—আত্মার স্বরূপের যে জ্ঞান তাই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের উৎকর্ষ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞানী সর্বদাই সচেতন থাকেন। সংসারে বিষয়বন্ধন থেকে মুক্তিলাভই তত্ত্বজ্ঞানের ফল এবং আত্মার স্বরূপজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ—এই প্রকার বিচার, বিষয়ে দোষদর্শন ও তা পরিত্যাগ, এবং আত্মজ্ঞানই পরম লক্ষ্য এইরূপ আলোচনা দ্বারা জ্ঞানী মোক্ষলাভের চেষ্টা করেন।

ভগবান বললেন, এই তত্ত্বজ্ঞান সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। এটা জ্ঞানীর অনুভূতির বিষয়। তাই এখানে জ্ঞানের সাধনা এবং জ্ঞানীর লক্ষণসকল ব্যাখ্যা করে তত্ত্বজ্ঞান বোঝানো হয়েছে। অনন্যা ভক্তি এই জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানের প্রধান সাধন।

'এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্'—এগুলিকে জ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এইগুলি তোমাকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে। আত্মাকে অনুভব বা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

'অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা'—এর বিপরীত যা-কিছু, তা অজ্ঞান। অতএব জ্ঞানের প্রতিকূল সব কিছুই হলো অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের সাধন বা অনুশীলন করে আমি গভীর থেকে গভীরতর অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যাব।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।।১৩

যৎ (যা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয়) যৎ (যা) জ্ঞাত্বা (জেনে) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) তৎ (তা) প্রবক্ষ্যামি (বলব) তৎ (সেই) অনাদি-মৎ (আদিহীন) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ন সৎ (সৎ নন) ন অসৎ (অসৎও নন) উচ্যতে (এরূপ বলা হয়)।১৩

যা জ্ঞেয় তাই বলছি এবং যা জানতে পারলে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করতে পারা যায়, সেই জ্ঞেয় বস্তু পরব্রহ্ম আদিহীন। সেই পরব্রহ্ম কার্যও নন, কারণও নন—অর্থাৎ তাঁকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।

অর্জুন জানতে চেয়েছিলেন, জ্ঞান কী এবং জ্ঞেয়ই বা কী? ভগবান পূর্বে জ্ঞান কী তা বলেছেন। এখন জ্ঞেয় বস্তু কী তাই বলছেন। সাধারণ মানুষ জ্ঞেয় বস্তু বলতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়কে বুঝে থাকেন। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিদ্বারা যা জানা যায় তাই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু বলে মনে করেন। অজ্ঞেয়বাদীরা মনে করেন ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর জ্ঞানলাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যবহারিক জগতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই জ্ঞান আমাদের অমৃতত্ব দিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের-জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত নিত্য সত্য পরমজ্ঞান বা পরম আনন্দ অনুভব করা যায় না। এই বিচিত্র জগতের পশ্চাতে যে ঐক্য রয়েছে, যে শাশ্বত জ্ঞানের রাজ্য রয়েছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা দিতে পারে না। মানুষের মনে যে উচ্চ পরাজ্ঞান বা অমৃতত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা পূর্ণ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমরা সেই জ্ঞান চাই যা নিত্য, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত। যে জ্ঞান আমাদের অজ্ঞানকে দূর করে অর্থাৎ ভ্রম-দর্শন নাশ করে। এবং সনাতন সত্যকে জানতে সাহায্য করে। যাঁকে জানলে আমাদের আর কিছু জানার থাকে না। জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে আমরা অমৃতত্ব লাভ করতে পারি। সেই জ্ঞেয় বস্তুর কথা ভগবান এখানে বলছেন।

মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয় বস্তু—এই শাশ্বত এবং অমৃতত্বপ্রদ জ্ঞানই হল পরম ব্রহ্ম। যাঁকে জানলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই আমাদের অমৃতত্ব প্রদান করতে পারে। ব্রহ্মের স্বরূপ—অনাদিমৎ অর্থাৎ যাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। ব্রহ্ম অজ, শাশ্বত, পুরাণ, অব্যয়—সমস্ত বিশ্বের ধ্বংসেও তাঁর ধ্বংস হয় না। তাঁকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। তিনি সৎ ও অসতের অতীত। সমস্ত কারণের তিনি কারণস্বরূপ এবং নির্বিশেষ দেশকালের অতীত। যেহেতু ব্যাহারিক বুদ্ধিতে যা দেশ-কাল দ্বারা সীমিত, যা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিগ্রাহ্য তাকেই আমরা সৎ বলে থাকি এবং যা সেইরূপ নয় তাকে অসৎ বলে থাকি। নাম, রূপ, গুণ আদি ক্রিয়া দ্বারা তাঁকে ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করা যায় না।

মহাপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপূর্ব কয়েকটি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন: 'সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম।' ব্রহ্ম কী তা কেউ কথা বা চিন্তা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারেনি। ব্রহ্ম সবকিছুর পারে। শুধু নেতি, নেতি, অর্থাৎ এটা নয়, এটা নয়—এই নঞর্থক পদ্ধতি অনুসরণ করেই চরম সত্য ব্রহ্মকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সমাধির অনুভূতি কীরকম, তা খুলে বলার বহু চেষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন, কিন্তু পারেননি। ত্যাগী-সন্তানদের কাছে একদিন তিনি খুব জোর করে বললেন, 'আজ তোদের কাছে সব কথা বলব, একটুও লুকোব না'—এই বলে আরম্ভ করলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্যন্ত সব চক্রাদির কথা বেশ বললেন, তারপর ভ্রূমধ্যস্থল দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পরদামাত্র ব্যবধান থাকে। সে তখন এইরকম দ্যাখে' —এই বলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করে বলতে আরম্ভ করলেন, অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলতে চেষ্টা করলেন, পুনরায় সমাধিস্থ হলেন। এরকম বার বার চেষ্টার পর সজল নয়নে ত্যাগী-সন্তানদের বললেন, 'ওরে, আমি তো মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোব না, কিন্তু মা কিছুতেই বলতে দিলে না—মুখ চেপে ধরলে।' শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার বলছেন—নুনের পুতুল একবার সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। যেই না জল ছুঁয়েছে, অমনি সে সমুদ্রে গলে গেলো। তখন আর পুতুল কোথায়, যে বলবে সমুদ্র কত গভীর? মনও সেইরকম আত্মার অসীম গভীরতা মাপতে গিয়ে তাতেই লয় হয়ে যায়। তবে যিনি তাঁকে উপলব্ধি করেছেন, বোঝা যাবে তাঁর জ্ঞান-অন্বেষণ শেষ হয়েছে। সকল সংশয় দূর হয়েছে। এই অনুভূতি কাউকে বোঝানো যায় না।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।।১৪

সর্বতঃ (সর্বত্র) পাণি-পাদং (যাঁর হস্ত ও পদ), সর্বতঃ (সর্বত্র) অক্ষি-শিরঃ-মুখম্ (যাঁর চক্ষু, মস্তক ও মুখ), সর্বতঃ (সর্বত্র) শ্রুতিমৎ (যাঁর কর্ণ), তৎ (তিনি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম) লোকে (ইহলোকে) সর্বম্ (সমস্ত পদার্থকে) আবৃত্য (আবৃত করে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করছেন) ।১৪

তিনি (সেই পরব্রহ্ম) সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখযুক্ত, সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট হয়ে এই লোকমধ্যে সমুদয় বস্তুতে আবৃত করে রয়েছেন।

সর্বত্র যাঁর হাত ও পা, সর্বত্র যাঁর চক্ষু, মস্তক ও মুখ এবং সর্বত্র যাঁর কর্ণ—অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম জগতের সমস্ত কিছুকে আবৃত করে অবস্থান করছেন।

পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি সাকার নন। অথচ এই জগতে যত হস্ত-পদের ক্রিয়া হচ্ছে, যত চক্ষু, মুখ ও মস্তক কাজ করছে তার মূলে শক্তিস্বরূপ সেই ব্রহ্মই অবস্থিত আছেন। সেই ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা শক্তিমান হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করছে। সকল জড়ের মূলে সেই এক চৈতন্য। অতএব একদিকে তিনি যেমন নির্গুণ ও নিরাকার অপরদিকে তিনি সাকার—যে সব হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ এ-জগতে কার্য করছে তা এই ব্রহ্মেরই হস্ত,পদ প্রভৃতি। তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, তাঁর সত্তাতেই সকলেই সত্তাবান, তাঁরই শক্তিতে সকলেই শক্তিমান। তিনিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম।

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যে, জগৎ ও ঈশ্বর আলাদা নয়। একমাত্র ঈশ্বরই সবকিছু হয়েছেন। তাই একমাত্র ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাঁর কাছ থেকেই এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তাঁতেই অবস্থান করছে এবং অন্তিমে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তিনি ভিতরে এবং বাইরে—সর্বত্র আকাশের ন্যায় অখণ্ডরূপে বিরাজ করছেন।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ।।১৫

সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং (সকল ইন্দ্রিয় ও তাদের গুণে আভাসিত) সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ (সকল ইন্দ্রিয়-বিহীন) অসক্তং (সঙ্গশূন্য) তথাপি সর্ব-ভৃৎ (সকলের আধারস্বরূপ) নির্গুণং চ এব (এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণরহিত) গুণ-ভোক্তৃ চ (এবং সকলগুণের ভোক্তা বা পালক) ।১৫

তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত। তিনি নিঃসঙ্গ, সর্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারস্বরূপ—অর্থাৎ সকল পদার্থকে ধারণ করে আছেন;

তিনি গুণাতীত, তাঁতে কোনও গুণ বিদ্যমান নেই, অথচ তিনিই সকল গুণের ভোক্তা।

তিনি ইন্দ্রিয়বর্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাদের গুণসমূহের প্রকাশক। তিনি সর্ব সম্বন্ধবিহীন অথচ সকল দ্রব্যের আধার। তিনি গুণরহিত কিন্তু সর্বগুণের ভোক্তা। এটাই বুঝতে হবে যে, তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় নেই, কিন্তু তাঁর শক্তি-ভিন্ন হস্ত-পদাদির কাজ কেউ করতে পারে না। শ্রবণ, কথন, সংকল্প ও নিশ্চয় আদি এবং শ্রোত্র, বাক্, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁর শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই। তিনি চক্ষুহীন হয়েও দর্শন করেন, শ্রুতিবর্জিত হয়েও শ্রবণ করেন। তিনি কারও সঙ্গে বা সম্বন্ধে যুক্ত নন, কিন্তু তাঁকে অবলম্বন করেই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি স্বয়ং নির্গুণ আবার গুণসমূহের ভোক্তা। তিনি সকলের সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও গুণবর্জিত।

তিনি অসক্ত—প্রকৃতির সমস্ত কর্মের প্রভু হয়েও কোনও কর্মে তিনি আসক্ত হন না, কোনও ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি 'সর্বভৃৎ'—তিনি অসক্ত হয়েও সমস্ত জগৎকে ধারণ এবং পোষণ করছেন। তাঁর সত্তাতেই সমস্ত সত্তাবান, তাঁর শক্তিতেই সমস্ত জগৎ শক্তিমান এবং তাঁর দ্বারাই সমস্ত জগৎ পুষ্ট। এই জগতে সকল কর্ম তিনগুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারাই চলছে। কিন্তু ব্রহ্ম এইসকল গুণের অতীত। কোনও গুণের ক্রিয়াই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, কোনও গুণের ক্রিয়াতে তিনি আবদ্ধ নন। অথচ তিনি গুণসমূহের ভোক্তা। তাঁরই নিমিত্ত প্রকৃতির সকল ক্রিয়া চলছে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাঁরই সংকল্প সাধন করছে। তিনি আত্মানন্দে স্থিত থেকে দ্রষ্টারূপে প্রকৃতির এই লীলা উপভোগ করছেন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ।।১৬

তৎ (তিনি অর্থাৎ সেই আত্মা) ভূতানাম্ (ভূতসকলের) বহিঃ অন্তঃ চ (বাহিরে ও ভিতরে আছেন) অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (এবং জঙ্গম দেহসমূহ তিনিই) সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্ম বলে) তৎ (তিনি) অবিজ্ঞেয়ং (জানবার অযোগ্য) তৎ চ (এবং তিনি) দূরস্থং (দূরেও) চ অন্তিকে (নিকটেও) ।১৬

সেই ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত, আবার তিনিই স্থাবর-জঙ্গমরূপ ভূতগণ। সূক্ষ্মতাবশত তিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অগোচর। তিনি অতি দূরবর্তী, অথচ নিকটেই অবস্থিত, অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি এবং সর্ব বস্তুতেই তিনি ।

প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে এবং বাইরে একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশমান। স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি। তিনি অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাই তাঁকে জানা অসম্ভব। তিনি দূর হতেও দূরে, এবং অতি নিকট হতেও নিকটে অর্থাৎ তিনি সর্বত্র। দৃশ্য জগতে যা-কিছু আছে তিনি সমস্তই, জড় ও চেতন সমস্তই তিনি, এবং সর্বত্র তিনি বিরাজমান। তিনি রূপহীন আকাশ হতেও অতি সূক্ষ্ম

বলে আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা তাঁকে জানতে পারি না। ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা স্থূল বস্তুর জ্ঞান হয়, অতিসূক্ষ্ম বস্তুকে জানা অসম্ভব। শতকোটি বর্ষ চেষ্টা করলেও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না। তাই অবিশ্বাসী, অবিবেকী ও বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি দূর হতেও অতি দূরে প্রতীত হন। আবার ভক্তিমান, বিবেক-বৈরাগ্যবান ও সংযতাত্মা পুরুষের পক্ষে তিনি নিকট হতেও অতি নিকট বলে প্রতীত হয়ে থাকেন। সূক্ষ্মদর্শী ভারতীয় ঋষিরা তাঁদের অভিজ্ঞতার দ্বারাই ব্রহ্মকে এইরূপ আপাতবিরোধী বিচার দিয়ে সত্যের উপলব্ধি করেছেন। আত্মা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঈশ উপনিষদ্ বলছেন, 'তৎ এজতি, তৎ ন এজতি'—তিনি চলন, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল। তিনি অচল অর্থাৎ স্থাণু। প্রকৃতিতে দুই-ই আছে, গতি আছে আবার গতিহীনতাও আছে। আত্মা স্থির, অচঞ্চল আবার তিনি চেতন, তাঁর শক্তিতে বিশ্ব গতিময়। কঠোপনিষদে (১-২-২০) বলা হয়েছে—'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।'—অণুর থেকেও ছোট, আবার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়। এই আত্মা সকল জীবের হৃদয়ে লুকিয়ে আছেন। এইভাবে ঋষিরা উপলব্ধি করেছেন। বেদান্তের এই সত্য আধুনিক বিজ্ঞান অনুভব করতে চলেছে। প্রতিদিনই আমাদের সামনে সত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলছেনঃ 'হিন্দু যুগ যুগ ধরে যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হবার উপক্রম দেখে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।'

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৭

তৎ (সেই) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয় ব্রহ্ম) ভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তং চ (অবিভক্ত হয়েও) বিভক্তম্ ইব স্থিতম্ (ভিন্ন হয়ে যেন অবস্থান করছেন) ভূতভর্তৃ চ (এবং ভূতসকলের পালনকর্তা) গ্রসিষ্ণু (সংহর্তা) প্রভবিষ্ণু চ (এবং সৃষ্টিকর্তা বলে) জ্ঞেয়ম্ (তাঁকে জানবে)।।১৭

সেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম অবিভক্ত হয়েও সর্বভূতে পৃথক পৃথক রূপে প্রতীত হন। তাঁকেই ভূতসকলের পালনকর্তা, সংহর্তা ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানবে।

ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বভূতে অবিচ্ছিন্ন থেকেও প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত রয়েছেন বলে প্রতীত হন। তিনিই সকল ভূতের ধারণকর্তা, তিনিই সকল ভূতের সংহর্তা এবং সকল ভূতের উৎপাদনকর্তা। আমাদের অজ্ঞানতাবশতই মনে হয় যে, বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিভিন্নরূপে আত্মা অবস্থান করছেন। কিন্তু এক অখণ্ড ব্রহ্মই এই সমস্ত জীবে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। তিনি অবিভক্ত হলেও আমাদের নিকট তাঁকে বিভক্তের ন্যায় দেখাচ্ছে। সেই এক অখণ্ড পরমাত্মাই সকল জীবের উৎপত্তির কারণ, তাঁর থেকে এই বিশ্বের উদ্ভব হয়েছে, তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই স্থিতিরূপে

সকলের ধারণ ও পোষণ করছেন, তাঁর সত্তা দ্বারাই সকলে সঞ্জীবিত হয়ে আছে, আবার অন্তকালে তিনিই সকলকে গ্রাস করেন অর্থাৎ তাঁতেই সমস্তের লয় হয়। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র এই কথাই বলছেন—সমস্তকিছুই সেই ব্রহ্ম থেকে এসেছে, তাঁতেই অবস্থান করছে এবং প্রলয়কালে তাঁতেই ফিরে যাবে। ব্রহ্ম একাধারে নির্গুণ আবার সগুণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বের অতীত, অজ, অব্যয়, জ্ঞানময় সত্তা, আবার তিনিই বহুরূপে বিশ্বে প্রকাশিত। তিনি সমস্ত ভাব ও গুণের অতীত, আবার তাঁতেই সমস্ত বিরোধী ভাব ও গুণের সমন্বয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—বেদে তাঁকে সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে। সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে। যিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ-দর্শন হয়।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্।।১৮

তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃসমূহের অর্থাৎ সূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) তমসঃ পরম্ (অজ্ঞানরূপ তমের অতীত) উচ্যতে (বলা হয়) জ্ঞানং (তিনি জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং চ (ও জ্ঞানগম্য) সর্বস্য (সকল প্রাণীর) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত)।১৮

তিনি জ্যোতিষ্ক সকলেরও (সূর্যাদিরও) জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক; তিনি তমের অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত বলে কথিত। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়-তত্ত্ব রূপাদি সাকার জ্ঞানের বিষয়। তিনিই জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, অর্থাৎ অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনদ্বারা প্রাপ্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত।

ব্রহ্ম সকল জ্যোতিরও জ্যোতি। অর্থাৎ এ জগতে যতরকমের আলো আমরা দেখতে পাই, সে সবই আসছে ব্রহ্মের থেকে। তাই তাঁকে সকল জ্যোতির জ্যোতি বলা হয়ে আসছে। সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির যে জ্যোতি তা বাহ্য জ্যোতি। সূর্য বাহ্য বস্তুসমূহকেই প্রকাশ করে। কিন্তু সূর্যকে প্রকাশিত করে কে? সূর্য নিজে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে না। এই ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সূর্য জ্যোতিষ্মান। আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের যে প্রকাশশক্তি তারও মূলে সেই ব্রহ্মজ্যোতি। অজ্ঞানী তাঁকে জানতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানী তাঁকে জানতে পারেন, কারণ তিনিই জ্ঞানীর হৃদয়ে সর্বদা জ্ঞানরূপে অবস্থিত। তিনি যেমন প্রকৃতিতে প্রকাশমান সেইরূপ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে স্বপ্রকাশ আত্মারূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তাই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী নিজের হৃদয়েই তাঁকে দেখতে পান।

কঠোপনিষদ্ সুন্দর করে বলছেন—তাঁরই আলোকে সমস্ত পদার্থ আলোকিত, তাঁর প্রভায় সকলে প্রভাশালী। 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি

কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।'(২-২-১৫) সেই স্বপ্রকাশ আত্মাকে সূর্য আলোকিত করতে পারে না, চন্দ্রও না, তারকারাও না, বিদ্যুৎও না, গৃহের এই সাধারণ অগ্নির আর কথা কী। আত্মা দীপ্তিমান বলেই এইসব আলোকিত। তাঁর আলোতেই সমগ্র বিশ্ব বিভাসিত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ঐ কথা বলছেন—'যস্য তেজসা বিদ্ধঃ সূর্যো তপতি'—আত্মার আলোয় অর্থাৎ ব্রহ্মের তেজে সমৃদ্ধ হয়ে এই সূর্য আলোক বর্ষণ করে। আত্মার আলোতেই আমরা অস্তিত্ববান, তার আলোতেই আমরা চলাফেরা ও কাজকর্ম করি। এই বিশ্ব ঈশ্বরের আলোয় উদ্ভাসিত, তিনিই সবকিছু আলোকিত করে রেখেছেন। সূর্যই হোক, আর নক্ষত্রমণ্ডলীই হোক, সব আলোর উৎপত্তির মূল হলেন ব্রহ্ম, যিনি জ্যোতির জ্যোতি।

সেইরূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য—এই তিনটিই আমাদের হৃদয়ে রয়েছে। জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের লক্ষ্য—হৃদয়ের এই সকল সম্পদ অর্থাৎ ঈশ্বরই জ্ঞানস্বরূপ, আমাদের জ্ঞান হলে বুঝতে পারব ঈশ্বরই জ্ঞেয়, ঈশ্বরই জ্ঞানগম্য অথচ সেই ঈশ্বর দূরে নয়, আমাদের অতি নিকটে, আমাদের হৃদয়ে আত্মারূপে বিরাজ করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'Each soul is potentially divine' অর্থাৎ জীব স্বরূপত ঈশ্বর। প্রত্যেক জীবই অব্যক্ত ঈশ্বর। আমাদের লক্ষ্য সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ব্যক্ত করা। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। লক্ষ্য, এই জীবনে মুক্তি লাভ করা। তাই কঠোপনিষদ্ বলছেন—'এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে'—এই আত্মা প্রত্যেক জীবের ভিতরেই আছেন, তবে লুকিয়ে। (১-৩-১২)

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৯

ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা (এবং) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (বলা হলো) মদ্ভক্ত (আমার ভক্ত) এতৎ (এই তিনটি তত্ত্ব) বিজ্ঞায় (জেনে) মদ্ভাবায় (আমার স্বরূপলাভে) উপপদ্যতে (সমর্থ হন)।।১৯

এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হলো। আমার ভক্ত এসবের যথার্থ তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভাব-লাভে সমর্থ হয়—সে মোক্ষলাভ করে থাকে।

ভগবান ক্ষেত্রাদির বিষয়, অধিকারী ও ফলের প্রসঙ্গে বলছেন। ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি তত্ত্ব জানলে ভক্ত যথার্থ অধিকারী হন এবং ব্রহ্মভাব-লাভে সমর্থ হন। এই তিনটি তত্ত্ব অর্থাৎ শরীর, জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ পরমাত্মা সম্পর্কে যথার্থভাবে জানলে, যাবতীয় সত্যই উপলব্ধি করা সম্ভব। এই দেহের মধ্যেই পরমজ্ঞান রয়েছে, তাই দেহের এত মূল্য।

হে অর্জুন এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়, কারণ এই ক্ষেত্রে তুমি কর্মের বীজ বপন করো এবং কর্মফল ভোগ করো। এই দেহের যিনি দ্রষ্টা, যিনি দেহকে জানেন তাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। আবার সব ক্ষেত্রের মধ্যে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জেনো। আমিই সব ক্ষেত্রের একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনিই চৈতন্য—এক এবং অখণ্ড। চৈতন্য এক এবং অবিভাজ্য বা এক এবং অদ্বিতীয়। তাই এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্পর্কে উপলব্ধি করলে পরমাত্মার স্বরূপ লাভ করবে। ভক্ত উপলব্ধি করে যে, তার দেহের মধ্যেই শাশ্বত আত্মা বিরাজ করছেন। ভক্ত সেই আত্মাকে জেনে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন অনুভব করে। এইটি মানুষের অপূর্ব মহিমা। মানুষই তার হৃদয়ের অনন্ত অসীম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। সেই সামর্থ্য তার আছে। মানুষ সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনে প্রতিটি কর্মে ফুটিয়ে তুলবে। সেইসব মানুষ জীবনের সর্বস্তরে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাবে। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আমূল রূপান্তর ঘটাবে। সমস্ত কর্মই আধ্যাত্মিক কর্মে রূপান্তরিত হবে। তখন সে তার আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ভেঙে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত হয়ে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করবে, সকলের হিত সাধনে রত থাকবে। তাই ভগবান বলছেন—যে আমার ভক্ত সেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও ক্ষেত্রের যথার্থ তত্ত্ব জেনে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।২০

প্রকৃতিং পুরুষং এব চ (প্রকৃতি এবং পুরুষ) উভৌ অপি (এই উভয়কেই) অনাদী (আদিরহিত) বিদ্ধি (জেনো) বিকারান্ চ (এবং বিকারসকল) গুণান্ এব চ (এবং গুণসমূহ) প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতিজাত) বিদ্ধি (জানবে)।।২০

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানবে। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারসমূহ এবং সুখদুঃখ-মোহাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন হয়েছে জানবে।

সাংখ্যদর্শন মতে, প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুইটিকে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে দেখানো হয়েছে। উভয়ের সংযোগে এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও নাশ ঘটছে। প্রকৃতিই ক্রিয়াশীল শক্তি, সুতরাং সৃষ্টি, পালন ও নাশের হেতু। পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি ক্রিয়মাণ। প্রকৃতির বিবর্তন থেকেই এই মহাবিশ্বের প্রকাশ। পুরুষ রয়েছেন চৈতন্যরূপে। সাংখ্যমতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়। কর্ম যা-কিছু, তা প্রকৃতি করে।

গীতার মতে অর্থাৎ বেদান্তমতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়, এক তত্ত্ব। এঁরা এক ব্রহ্মেরই দুটি দিক রূপে প্রকাশিত। তাই এঁরা উভয়েই অজ, অনাদি। ব্রহ্ম হলেন পুরুষ, শুদ্ধ চৈতন্য। ব্রহ্ম থেকেই প্রকৃতি এসেছেন এবং যা-কিছু বিবর্তন, তা এই প্রকৃতিরই। বিবর্তিত প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম সুপ্তরূপে আছেন। তাই জাগতিক বস্তুসমূহ প্রকৃতিরই বিকার অর্থাৎ গুণত্রয়ের বিরূপ পরিণাম থেকে অভিব্যক্ত। মূল প্রকৃতি অজ ও

অনাদি হলেও বিকার এবং তাঁর গুণকার্যসমূহ অনাদি বা চিরন্তন নয়। প্রকৃতির এই বিকার তথা পরিণতি আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের নিকট জগৎরূপে প্রতিভাত হয়। এঁরা দেশকাল দ্বারা অবিচ্ছিন্ন, কাজেই দেশকালের মধ্যে অভিব্যক্ত এবং দেশকালের মধ্যে অব্যক্ত হয়।

ঈশ্বরের শক্তি—মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ। এই মায়া- শক্তিকে অপরা প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই অপরা শক্তিকে এখানে প্রকৃতি বলা হচ্ছে। ক্ষেত্রজ্ঞকে পরা প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে সেই পরা প্রকৃতিকেই 'পুরুষ' বলা হচ্ছে। এই পুরুষ ও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই রূপ, তাই অনাদি। কিন্তু তাঁর ষোড়শ বিকার—দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং মন। সুখ-দুঃখ মোহরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ মায়ারূপ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেনঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি—অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা এবং লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।...

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলছেনঃ আদ্যাশক্তি লীলাময়ী তিনি, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এইসব করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি—প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী। যার পুরুষজ্ঞান আছে তার মেয়েজ্ঞানও আছে। যার বাপ-জ্ঞান আছে, তার মা-জ্ঞানও আছে। যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার সুখ-জ্ঞান আছে তার দুঃখ-জ্ঞান আছে।...ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম-অভেদ। অভেদ সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২১

কার্য-করণ-কর্তৃত্বে (কার্য ও কারণ এদের কর্তৃত্ব-বিষয়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপাদনে) প্রকৃতিঃ (ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি) হেতুঃ (কারণ বলে) উচ্যতে (কথিত হয়) পুরুষঃ (পুরুষ অর্থাৎ জীব) সুখ-দুঃখানাং (সুখ-দুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (কথিত হয়)।।২১

কার্যের (শরীরের) ও কারণের (ইন্দ্রিয়ের) কর্তৃত্ববিষয়ে হেতু প্রকৃতি অর্থাৎ কার্যকারণরূপ পরিণামসমূহ প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়। আর পুরুষ (জীব) সুখ ও দুঃখসমূহের অনুভূতির কারণ বলে কথিত হয়।

সহজ করে বলা যায়—প্রকৃতিই দেহেন্দ্রিয়ে ক্রিয়াশক্তির মূল, এবং পুরুষ সুখ-দুঃখভোগের কারণ। ক্ষেত্র (প্রকৃতি) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (পুরুষ)—এই উভয়ের যোগে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি। প্রত্যেক জীবেরই যেমন শরীর ও ইন্দ্রিয় আছে, সেইরূপ সুখ-দুঃখের একটা আন্তর অনুভূতি আছে। প্রকৃতি দ্বারা বাহ্যিক অনুভূতি এবং পুরুষ অন্তরের অনুভূতি উৎপন্ন করে।

কার্য (জীবের দেহ) এবং কারণ (ইন্দ্রিয়াদি দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত—ত্রয়োদশ কারণ) তার সঙ্গে যুক্ত সুখ-দুঃখ মোহাদির উৎপাদন-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু। প্রকৃতি হতে জীবের দেহ, ইন্দ্রিয় এবং সুখ, দুঃখ, মোহাদি উৎপন্ন হয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির যত কিছু কাজ হয়, তা সমস্তই প্রকৃতি হতে স্ফুরিত হয়ে থাকে। এটা প্রকৃতির পরিণাম। কিন্তু জীবের যে অনুভূতি হয়—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা—এই সকল প্রকৃতিজাত নয়। পুরুষই এই সকল অনুভূতির হেতু। পুরুষ কার্য-কারণ ভাবে অভেদ-রূপে একত্র বিজড়িত ও বিরাজিত।

আমাদের অনুভবের কর্তা পুরুষ। অনুভব দুঃখের হতে পারে আবার আনন্দের হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মানুভূতির ক্ষেত্রে এই অনুভব সর্বদাই আনন্দের। সৎ-চিৎ-আনন্দ হলো পরম সত্যের স্বরূপ এবং তা হলে আমরা আনন্দে পূর্ণতা লাভ করব।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।।২২

হি (যেহেতু) পুরুষঃ (ভোক্তা) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হয়ে) প্রকৃতি-জান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত সুখ-দুঃখ-মোহাদি গুণ) ভুঙ্ক্তে (ভোগ করেন) অস্য (এই পুরুষের অর্থাৎ জীবের) সৎ-অসৎ-যোনি-জন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মধারণ-বিষয়ে) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহে আসক্তি) কারণম্ (হেতু)।।২২

পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিসম্ভূত সুখ-দুঃখ-কার্য-কারণরূপে পরিণত ও মোহাকারে অভিব্যক্ত গুণসকল ভোগ করেন। এই সকল গুণে অভিমান বা আসক্তিই পুরুষের (ক্ষেত্রজ্ঞের) সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ।

এই পুরুষ মায়ারূপ প্রকৃতিতে অবিমিশ্রিতভাবে (নির্বিকার বা উদাসীনভাবে) অবস্থিত হয়ে সেই প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে আসক্তিবশত অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির কার্যে আত্মাভিমান করে মনে করেন—আমি এই সব কর্ম করছি, আমিই কর্মের ফলভোগ করছি, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী। এইরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধের জন্যই পুরুষকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির তাদাত্ম্য সম্বন্ধের জন্য সত্ত্বগুণাধিকারে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকারে মানবদেহে ও তমোগুণাধিকারে পশু আদি যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে। তাদাত্ম্য অভিমানই

ভিন্ন ভিন্ন জন্মের একমাত্র কারণ। গুণত্রয়ের সঙ্গবর্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা হতে পারলেই যোনিভ্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে থাকে।

গুণসঙ্গ—অর্থাৎ কামনা বা বাসনা মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে নিতান্তই ত্যাগ করা চাই। কামনাবর্জিত হয়ে কোনও কর্ম করলে ও গুণাদি হতে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে পারলে আর সুখ-দুঃখের জন্য যথাক্রমে অনুরাগ বা দ্বেষ পেতে হয় না। বিদ্বান ব্যক্তি এইরূপ অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হয়ে কর্ম করেন। যেহেতু কার্যকালে কোনও ফলের অভিসন্ধি থাকে না, তাই তাঁর কর্তৃত্বের অভিমান থাকে না। ফলে যোনিভ্রমণের কারণরূপ বীজ বা সংস্কার সঞ্চিত হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতিজাত তিন গুণের প্রতি আসক্তিই পুরুষের বন্ধনের কারণ হয়। এই অহংবোধ বা আসক্তি যুক্ত আত্মাভিমানই পুরুষকে প্রকৃতিজনিত ক্রিয়ার ফলভোগী করে। গুণসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকলে গুণ-ভেদানুসারে সুখ-দুঃখাদির ভোগের জন্য পুরুষ বা জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ করতে হয়।

তাই ভগবান বলছেন, প্রকৃতির মধ্যে থাকায় কোনও দোষ নেই। কিন্তু যতদিন প্রকৃতির এই গুণগুলির প্রতি আসক্তি থাকবে ততদিন এইরূপ জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহের মধ্যে থেকে নানাবিধ দেহ ধারণ করতে হবে। হে অর্জুন, প্রকৃতির এই দাসত্ব ঘোচাতে হবে। আমি প্রকৃতিতে আছি কিন্তু নির্বিকার, উদাসীন, স্বতন্ত্র—আমি অনাসক্ত। আমি সব বন্ধন থেকে মুক্ত। আমি আত্মা, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ—এই হচ্ছে বেদান্তে মুক্তির ধারণা।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২৩

অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে অবস্থিত) পরঃ (স্বতন্ত্র বা পরম) পুরুষঃ (পুরুষ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষি স্বরূপ) অনুমন্তা (অনুমোদনকারী) ভর্তা চ(ও পালনকর্তা) ভোক্তা (ভোগকর্তা) মহেশ্বরঃ (পরমেশ্বর) পরমাত্মা চ (ও পরমাত্মা) ইতি অপি (ইত্যাদি রূপেও) উক্তঃ (উক্ত হন)।।২৩

এই দেহে যিনি পরমপুরুষ বিদ্যমান রয়েছেন তিনিই জীবের সমস্ত কর্মের দ্রষ্টা এবং অনুমোদন কর্তা, তিনিই জীবের দেহেন্দ্রিয়-মনের পোষক ও ধারক, তিনিই সুখদুঃখাদির ভোক্তা, তিনিই সর্বাত্মা মহেশ্বর। তিনিই পরমাত্মা বলে কথিত হয়ে থাকেন।

পুরুষের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করছেন—

পুরুষ এই দেহে বিদ্যমান থেকেও তিনি সর্বথা স্বতন্ত্র, কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। তিনি ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। এবং শ্রুতি তাঁকেই পরমাত্মা বলে ব্যাখ্যা করেন।

পুরুষ স্বরূপত সকল বিষয় হতে নির্লিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র। স্বচ্ছ স্ফটিকে লাল জবা

ফুলের ছায়া পড়লে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায়। বস্তুতঃ শ্বেতস্ফটিকে কোনও রক্তবর্ণ নেই, সেইরূপ আত্মাতে প্রকৃতিসম্বন্ধবশত অহংভাব ঘটে এবং আমি জীব, আমি মনুষ্য, আমি সুখী ইত্যাদি অধ্যাস এসে পড়ে। কিন্তু আত্মা স্বরূপত সর্বথা স্বতন্ত্র। আত্মা দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ, এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে কীরূপ কার্য হচ্ছে তা তিনি দ্রষ্টারূপে দর্শন করেন। তাই তিনি সাক্ষী বা উপদ্রষ্টা। তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কর্তা নয়।

পুরুষ উপদ্রষ্টা—যিনি অভিসন্ধিপূর্বক কোনও কার্য দর্শন করেন, তিনি দ্রষ্টা এবং যিনি অভিসন্ধিবিহীন—নিজ অবস্থায় নিজে বিদ্যমান, অথবা প্রকৃতির কায-´সকল যাঁর দৃষ্টিপথে আপনা-আপনি ঘটছে দেখেন—তিনিই উপদ্রষ্টা। তিনি প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী। জ্ঞানিগণ আত্মাকে সকল কার্যে উদাসীনবৎ মনে করেন, তাঁরা তাঁকে উপদ্রষ্টা বলে জানেন।

তিনি অনুমন্তা—পুরুষ প্রকৃতির কার্যে লিপ্ত না থাকলেও পুরুষের সমক্ষে প্রকৃতি কার্য করছেন এবং পুরুষ কাছে থেকেও তা নিবারণ করছেন না, কাজেই পুরুষ প্রকৃতির কার্যের অনুমোদক।

তিনি ভর্তা—পুরুষের সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির স্ফূর্তি হতে পারে না, এজন্য তিনি ভর্তা। পুরুষই অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে প্রকৃতিকে ধারণ ও পোষণ করছেন, তাঁর শক্তিতে সঞ্জীবিত এবং তাঁর জ্ঞানের আলোকেই সমস্ত প্রকাশিত।

তিনি ভোক্তা—পুরুষের ভোগের নিমিত্তই প্রকৃতির কর্ম। প্রকৃতি কর্ম করে যায়, পুরুষ নিজের আনন্দে নিজেই এই লীলা উপভোগ করেন। অর্থাৎ তিনি নির্বিকার ও নির্লিপ্ত হয়েও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়রাশির উপলব্ধি করে থাকেন, এইজন্য তিনি ভোক্তা।

তিনি মহেশ্বর—তিনি মহান ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃতির প্রভু, সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা, সমস্ত অবস্থাই তাঁর আয়ত্তে বা অধীনে—তিনি মহেশ্বর, জগৎপ্রভু।

আত্মার ঐরূপ স্বরূপ উপলব্ধি করলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের অন্তরে সেই আত্মা বিরাজ করছেন, যিনি পরমেশ্বর, গুণাতীত, অবস্থাতীত, অন্তর্যামী ও অখণ্ড পরমাত্মা। কোনও মানুষ সামান্যতম এই ভাব উপলব্ধি করতে পারলে তাঁর জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাই ভগবান এখানে জোর দিয়ে বলছেন যে, আমাদের অন্তরে স্বয়ং পরমাত্মা বিরাজ করছেন। আমরা ক্ষুদ্র ও সীমিত ভাব নিয়ে অর্থাৎ 'সংকীর্ণ আমি'—এই ভাব নিয়ে বাস করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই 'আমি'কে 'কাঁচা আমি' বলছেন। তিনি আমাদেরকে 'পাকা আমি' বা 'বড় আমি'-ভাবকে অনুভব করতে বলছেন, অর্থাৎ ব্যক্তি-আত্মার ভাবকে ত্যাগ করে পরমাত্মার ভাবকে অনুসরণ করতে বলছেন এবং তখনই হবে প্রকৃত অধ্যাত্মজীবনের শুরু।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।।২৪

যঃ (যিনি) পুরুষং (পরমাত্মাকে) চ (এবং) গুণৈঃ সহ (গুণসমূহের সহিত) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) এবম্ (এই প্রকারে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বথা (সর্বভাবে—অর্থাৎ যে-কোন অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (বিদ্যমান থেকেও) ভূয়ঃ(পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন না)।।২৪

যিনি পুরুষ ও গুণ-সহিত প্রকৃতিকে জানেন অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত বিবেকজ্ঞানী, তিনি যে-কোনও অবস্থায় অবস্থিত থাকলেও তাঁর আর এ-সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভ করেন।

পুরুষের স্বরূপ যিনি জানেন অর্থাৎ আত্মা কোনও কর্মে লিপ্ত হন না। তিনি প্রকৃতির কর্মের দ্রষ্টা, সাক্ষী, অনুমন্তা, প্রকৃতির প্রভু, তার ভোক্তা। তিনি জানেন যে, এই দেহস্থ আত্মা এবং প্রকৃতির প্রভু পরমাত্মা উভয়েই স্বরূপত এক। অতএব গুরুবাক্য, বেদান্তবাক্য এবং আত্মার সাক্ষাৎকার যিনি লাভ করেছেন, তিনি যে- দেহেই অবস্থান করুন না কেন, সন্ন্যাসী হন বা গৃহী হন, কর্মী হন বা কর্মত্যাগী হন, তাঁকে এ সংসারে পুনরায় জন্মাতে হবে না। তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করে সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হন। মুক্ত পুরুষই সংসারে কর্ম করতে পারেন। সেই কর্ম প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম, তা লোককল্যাণে সম্পাদিত হয়।

কর্ম আত্মবিকাশের অন্তরায় নয়। ফলে আমরা যে-কাজই করি না কেন, তাতে আমাদের অন্তরে আত্মার বিকাশ হতেই পারে। আমরা কাজকর্ম করে যাচ্ছি এবং ভিতরে ভিতরে আমাদের অন্তরে আত্মার বিকাশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। ফলে একদিন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করব। ভগবান তাই এই সত্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন যাতে আমরা প্রত্যেকে এই জীবনেই আত্মার বিকাশের জন্য অনুশীলন এবং অনুসরণ করতে পারি। তখন আমরা বুঝতে পারব আমরা সামান্য দেহ-মন-বিশিষ্ট মানুষ নই, আমরা স্বরূপত অখণ্ড আত্মা বা পরমাত্মা। আমরা প্রকৃতির দাস নই, প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ নই, আমরা দ্রষ্টা, সাক্ষী, নিত্যমুক্ত পরমাত্মা।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।২৫

কেচিৎ (কেউ কেউ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধিতে) আত্মনা (শুদ্ধ অন্তঃকরণ-দ্বারা) আত্মানম্ (প্রত্যক্ চৈতন্যকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) অন্যে (আবার অন্য কেউ কেউ) সাংখ্যেন যোগেন (জ্ঞানযোগ দ্বারা) অপরে চ (এবং অপরে) কর্ম-যোগেন (কর্মযোগ দ্বারা দর্শন করেন)।।২৫

কোনও কোনও সাধক শুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহায্যে ধ্যানযোগে নিজের অন্তরেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার লাভ করে থাকেন, কেউ কেউ সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগের দ্বারা আবার কেউ বা নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শন করে থাকেন।

ভগবান বলছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে একটা পথকে আশ্রয় করতে হয়। এই পথকে যোগ বলে। যে-কোনও একটি পথে যাওয়া যায় আবার সব পথের সমন্বয়েও তাঁকে লাভ করা যায়। তাই ভগবান বলছেন, কেউ ধ্যানযোগে প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেউ জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করেন, আবার কেউ কেউ নিষ্কাম কর্মের দ্বারাও তাঁকে লাভ করেন। ধ্যানযোগ, বিচার এবং নিষ্কাম কর্ম—এই তিন যোগ আত্মদর্শনের সাধনস্বরূপ। অনন্যভক্তির পথ অবশ্যই যুক্ত রয়েছে সর্বদা। কারণ আমরা সাধারণত চারটি যোগের কথা বলে থাকি—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ (অর্থাৎ জ্ঞানযোগ), কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। আমাদের শাস্ত্র যে-কোনও পথ অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন—ঈশ্বরকে কত ভাবে পাওয়া যায়, কত পথে পাওয়া যায়। তিনি সকল পথে ঈশ্বরকে দর্শন করে বলেছেন : 'যত মত তত পথ'—অনন্ত পথ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৬

অন্যে তু (আবার অন্য কেউ কেউ) এবম্ (উক্তপ্রকার অর্থাৎ সাংখ্যযোগাদিদ্বারা আত্মাকে) অজানন্তঃ (না জেনে) অন্যেভ্যঃ (অন্যের অর্থাৎ গুরুর নিকট হতে) শ্রুত্বা (শুনে অর্থাৎ সাধনের উপদেশ গ্রহণ করে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে অপি চ (এবং তাঁরাও) শ্রুতি-পরায়ণাঃ (গুরু-উপদেশনিষ্ঠ হয়ে) মৃত্যুম্ এব (মৃত্যুকেই) অতিতরন্তি (অতিক্রম করেন)।।২৬

আবার অন্য কেউ কেউ সাংখ্যযোগাদি সাধনদ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ করতে না পেরে আত্মদ্রষ্টা আচার্যের নিকট শ্রদ্ধাপূর্বক সাধনোপদেশ শ্রবণ করে উপাসনা করেন। তাঁরাও নিষ্ঠার সঙ্গে (গুরুপ্রদত্ত) উপদেশ সাধন করে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

ভগবান বলছেন, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন উপায় আছে এবং এই জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সাধক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকেন। বাস্তবিক উচ্চ মানব জীবন লাভ করতে গেলে একজন মানুষকে চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়—১) শুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধির প্রকাশ করা, ২) শুদ্ধ মন ও মনের উপর প্রভুত্ব করা। ৩) উন্নত ও নিষ্কাম কর্ম করবার কৌশল আয়ত্ত করা ৪) পবিত্র হৃদয়ে ভালবাসার প্রসার করা। তাই আমাদের চারটি যোগের সাধন।

১) ধ্যানযোগ বা রাজযোগ—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে তাদের বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করে ধ্যানযোগে যোগী আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সাধারণত ধ্যানযোগ বলতে রাজযোগ বোঝায়। যোগী পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। শুদ্ধ মনে শুদ্ধ

জ্ঞানের প্রকাশ। তাই মনকে বিশুদ্ধ করা এবং মনের উপর প্রভুত্ব করাই যোগের ক্রিয়া। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে নিয়ে পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। আমাদের মনটাকে তুলনা করা হয় জলাশয়ের সাথে, সবসময় তাতে নানারকম তরঙ্গ উঠছে, বৃত্তি উঠছে। সৎ বৃত্তি উঠছে, অসৎ বৃত্তি উঠছে। ধ্যানযোগী চেষ্টা করেন যাতে এই সব বৃত্তি না ওঠে। পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলছেন—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'—সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই হচ্ছে যোগ। যোগের উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। রাজযোগ অভ্যাসের সময় মন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র রাখতে হয়।

২) জ্ঞানযোগ—প্রকৃতি ও পুরুষ, আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ বিচার করে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। জ্ঞানী উপলব্ধি করেন পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা, প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল এবং পুরুষ প্রকৃতির কার্যের দ্রষ্টা, উদাসীন সাক্ষী মাত্র, তখন জ্ঞানযোগী মুক্তি লাভ করেন। সৎ ও অসৎ বস্তুর বিচারের নাম আত্ম-অনাত্মবিবেক। আত্মাই সৎ আর সমস্ত অসৎ—এরূপ বিচারের দ্বারা অনাত্মা থেকে আত্মাকে পৃথক উপলব্ধি করেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার। সদসৎ, নেতি নেতি বিচার করতে করতে দেখা যায়, তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা, আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি সেই ব্রহ্ম। বিচারের যেখানে শেষ, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

৩) কেউ কেউ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা ঈশ্বরে ফল অর্পণপূর্বক কর্ম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। কর্মযোগ অর্থাৎ কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ। অর্থাৎ ঈশ্বরে মন রেখে যাবতীয় কর্ম করা কর্তব্য। আমি ঈশ্বরের যন্ত্র—তিনি আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন। সংসারে সবার প্রতি সব কর্তব্য করে যাচ্ছি কিন্তু কোনও ফল প্রত্যাশা করছি না। সংসার তাঁর, ফলও তাঁর। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে পূজা জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ।

৪) ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন এই সব করে তাঁতে মন রাখা। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা। সেই সম্পর্ক ধরে তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া । এই হচ্ছে ভক্তিপথ। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসার দ্বারা বশে রাখেন। ভক্তের ভালবাসায় ভগবান বাঁধা পড়েন। ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমকে বলা হয় প্রেমরজ্জু। সেই প্রেমরজ্জু দিয়ে ভগবানকে বাঁধা এবং ভগবানও ভালবাসেন ভক্তের ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে ।

ভগবান গীতায় বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন সাধন-প্রণালী নির্দিষ্ট করেছেন। এই উদারতা ও আশার বাণীই গীতার বিশেষত্ব।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।।২৭

ভরত-ঋষভ (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জুন) যাবৎ (যা) কিঞ্চিৎ (কিছু) স্থাবরজঙ্গমম্ (স্থাবরজঙ্গম—অর্থাৎ চরচর) সত্ত্বং (পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে হয়) বিদ্ধি (জেনো) ।।২৭

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বে স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়, তা সবই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে হয়ে থাকে—এটি জেনো।

যত কিছু স্থাবর ও জঙ্গম বা প্রাণী উৎপন্ন হয় তা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হয়ে থাকে। অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য জড়, অনির্বচনীয় ভাব ও অভাবরূপ জগৎপ্রপঞ্চ, জীবদেহের ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি ক্ষেত্রের রূপ জানবে। সুখ, দুঃখ, মোহ ইত্যাদিও ক্ষেত্রের বিকার। ক্ষেত্রাতীত তিনি স্বপ্রকাশ, পরমার্থ, সৎস্বরূপ, অসঙ্গ, উদাসীন, অদ্বয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। এঁদের সংযোগ অর্থাৎ মায়াবশত পারস্পরিক অবিবেকের জন্য সত্য ও অনৃতের মিথুনীকরণরূপ মিথ্যা তাদাত্ম্য অধ্যাসের নাম সংযোগ। এই সংযোগহেতু জগতের প্রকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু এই দৃশ্যজগৎ মিথ্যা, মায়াকল্পিত জানবে।

ভগবান তাঁর স্বরূপ ও লীলার কথা সুন্দর করে বলছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি-এই দুয়ের সংযোগ চাই। দুয়ের প্রয়োজন এবং সংযোগের ফল এই দৃশ্যমান জগৎ। এই স্থূল ও অচেতন জড় বস্তুর পিছনে চৈতন্য সত্তা রয়েছে। জড় ও চৈতন্য দুয়ের সংযোগে এই প্রকাশ।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।।২৮

বিনাশ্যৎসু (নশ্বর) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (ভূতে) সমং (সমভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরম্ (পরমাত্মাকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (সম্যগদর্শী) ।।২৮

সম্যগদর্শন—যিনি বিনাশশীল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ নির্বিশেষ সৎরূপে অবস্থিত অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, অর্থাৎ সেই পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান তা প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, তিনিই সম্যগদর্শী।

সেই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন। পূর্ণভাবে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে ও বাইরে বিরাজ করছেন। জড় চেতন সর্ব বস্তুর মধ্যে তিনি চৈতন্যরূপে বিরাজ করছেন। আর যিনি এইসব বিনাশশীল বস্তুর মধ্যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে, এমনকী গাছপালা, পশু, এক কথায় সর্ববস্তুতে আত্মাতে সমান ও নির্বিকারভাবে অবস্থিত এবং তাঁকে অবিনাশী বলে দর্শন করেন, তিনি যথার্থ সমদর্শী।

জগতের বস্তুমাত্রই পরিণামী, ক্ষয়শীল। দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে যায়। আত্মা সেইসব বস্তুর মধ্যে স্থিত থেকে সমানভাবে নিত্য বিদ্যমান। আত্মা নিত্য, তাঁর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় ইত্যাদি নেই। সমস্ত দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বস্তু বিনষ্ট হলেও আত্মার বিনাশ হয় না।

সংস্বরূপ ব্রহ্মে মায়াশক্তির অবিদ্যাকল্পিত নামরূপময় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হলেও আত্মার কোনও হানি হয় না। সমদর্শী সেই আত্মা পূর্ণ অর্থাৎ সমান একরসবিদ্যমান দর্শন করেন। এই দৃশ্যমান জগৎ বিচিত্র হলেও তার অন্তরস্থিত আত্মা এক, অভিন্ন এবং অবিনাশী। এই এক দর্শন অর্থাৎ একত্ব ও সমত্বের জ্ঞানই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৯

হি (যেহেতু) সর্বত্র (সকল স্থানে) সমং (নির্বিশেষরূপে) সমবস্থিতম্ (অবস্থিত) ঈশ্বরম্ (পরমাত্মাকে) পশ্যন্ (দেখে) আত্মনা (আত্মাদ্বারা) আত্মানং (নিজেকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না) ততঃ (সেজন্য) পরাং (পরম) গতিম্ (পদ বা মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হন)।

যিনি নির্বিশেষ-রূপে অবস্থিত ঈশ্বরকে সর্বভূতে সমভাবে দর্শন করেন, তিনি আত্মার দ্বারা আত্মার হনন (দেহাদিবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে সংসারে আবদ্ধ) করেন না এবং সেজন্য পরমগতি প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানিগণ আত্মাকে সর্বত্র সমান, নির্বিকার ও সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ জেনে 'আমি ব্রহ্ম' এই অভেদ বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যারূপ মায়াজাল ছিন্ন করে মুক্তি লাভ করে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞানী দেহাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে আত্মাকে অবিদ্যারূপ মায়াজালে অধিকতর আচ্ছন্ন করে হনন করে থাকে। শ্রুতি বলছেন—'আসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ'—দম্ভ ও দর্পাদি আসুরিক বৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ অন্ধ-তমসাবৃত নরকে গমন করে। দেহাদি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি করে তারা আত্মঘাতী হন।

অজ্ঞান ব্যক্তি এই আত্মাকে খণ্ডিত, পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন জীবে অবস্থিত, ক্ষুদ্র, বদ্ধ এবং সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যুর অধীন বলে মনে করে এবং এক ব্যক্তি থেকে আর ব্যক্তির মধ্যে ভেদ ও দ্বেষভাব পোষণ করে। অজ্ঞান ব্যক্তি নিজের দেহের মধ্যে অবস্থিত আত্মার স্বরূপ না জেনে দেহ, মন ও বুদ্ধিকেই আত্মা বলে মনে করে এবং অখণ্ড মুক্ত আত্মাকে একটা আমিত্বের আবরণে আবদ্ধ করে। সে দেহের সুখদুঃখে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' মনে করে সুখদুঃখ ও জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে পড়ে। অতএব এই অবস্থায় সে তার আত্মা দ্বারাই আত্মাকে হিংসা করে। অজ্ঞান লোকেরা সংসারকূপে পতিত হয়ে বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত অশেষ ক্লেশভোগ করে থাকে।

জ্ঞানী কিন্তু সেরূপ করেন না। তিনি জ্ঞানলাভ করে যেন বদ্ধ আত্মাকে মুক্তির পথে নিয়ে যান এবং পরমগতি বা মোক্ষলাভ করেন। জ্ঞানী 'আত্মনা আত্মানং'-নিজের দ্বারা নিজেকে 'ন হিনস্তি' আঘাত বা হনন করেন না। অর্থাৎ 'আত্মনা' শব্দের দ্বারা জীবের কামনাময় বদ্ধ আত্মা এবং 'আত্মানং' শব্দের দ্বারা অজ, অনাদি, মুক্তি আত্মা বোঝানো

হয়েছে। আত্মা বদ্ধ বলতে দেহ, মন, মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিই তার ঊর্ধ্ব আত্মাকে সংসারে আবদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু জ্ঞানী সবার মধ্যে অর্থাৎ অন্যের ভিতর যে আত্মা, সেই এক আত্মাকে নিজের ভিতরেও দেখেন। সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ অনুভব করেন। তখনই তিনি পরম লক্ষে পৌঁছে যান এবং একত্ব উপলব্ধিই তাঁকে মোক্ষলাভের দিকে নিয়ে যায়। এটিই মানুষের সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।।৩০

যঃ চ (এবং যিনি) কর্মাণি (সকল কর্ম) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি বা মায়াশক্তিদ্বারাই) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (অকর্তা) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনিই) পশ্যতি (যথার্থ দেখেন)।।৩০

প্রকৃতিদ্বারাই সকল কর্ম সর্বতোভাবে সম্পাদিত হচ্ছে এবং পক্ষান্তরে আত্মা কোনও কর্ম করেন না, আত্মা অকর্তা, উদাসীন—এই তত্ত্ব যিনি জানতে পেরেছেন, তিনিই যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী।

যে বিবেকী পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানী এটি বুঝতে পেরেছেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা অকর্তা এবং প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার দ্বারাই সমস্ত কাজ হচ্ছে—এইরূপ দর্শন করেন, তিনি সমদর্শী। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্বারা এই জগতে সকল কর্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস হচ্ছে কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষিস্বরূপ—অকর্তা। আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলে যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, আত্মা নিষ্ক্রিয়—এরূপ দর্শন করেন যথার্থদর্শী। তাঁরা মুক্ত জীব, আসক্তিশূন্য। অজ্ঞান, ভ্রান্ত ব্যক্তি দর্শন করেন দেহই আত্মা এবং এই আত্মা কর্ম করছেন। এরা বদ্ধ জীব এবং আসক্তিপূর্ণ।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩১

যদা (যখন)(সাধক) ভূত-পৃথক্-ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব) একস্থম্ (এক আত্মাতে অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং তা হতেই) বিস্তারং (বিস্তার, অভিব্যক্তি, বিকাশ) অনুপশ্যতি (দেখেন) তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মভাব লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন)।।৩১

যখন তত্ত্বদর্শী সাধক ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব এক ব্রহ্মেই অবস্থিত দেখেন এবং অখণ্ড ব্রহ্ম হতে ভূতসমূহের বহুত্বের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

তত্ত্বদর্শী, সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানী উপলব্ধি করেন যে নানা ভাগে বিভক্ত এই পরিদৃশ্যমান

জগৎ এক আত্মাতেই অবস্থিত। একই আত্মা হতে এই বহুত্বের বিকাশ বা বিস্তার হয়েছে তখন সেই জ্ঞানীর প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ ঘটে। তাঁর আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর আবরণ খুলে যায়। তিনি তখন নিজেকে মহান, বিরাট বলে অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন তাঁর দেহস্থিত জীবাত্মা এবং বিশ্বের প্রাণরূপে অবস্থিত পরমাত্মা স্বরূপত এক ও অভিন্ন। তিনি দেখতে পান বিশ্বের এই বস্তুসমূহ এক পরমাত্মা হতে উদ্ভূত হয়েছে, এক পরব্রহ্মেরই প্রকাশরূপ, যিনি এক অখণ্ড তিনিই আবার নানারূপে জগতে প্রকাশমান—তখন তাঁর ব্রহ্মদর্শন হয়, তিনি ব্রহ্মাই হয়ে যান। এক থেকেই এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের উৎপত্তি।

ঈশ উপনিষদ বলছেন—'যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।।' যিনি জেনেছেন যে, তাঁর আত্মাই এই সমস্ত জগৎরূপে প্রকাশিত এবং যিনি সর্বত্র একই আত্মাকে দর্শন করেন, সেই জ্ঞানী পুরুষের মোহরূপ মূল কারণ দূরীভূত হয়। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যেমন এক অনুভব করেন বাইরেও বৈচিত্রের মধ্যে এক দর্শন করেন, তখন তাঁর আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়েছে। 'এক' হলেন ব্রহ্ম যিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। সেই পরম 'এক'-এর মধ্যেই আমরা রয়েছি, তার ভিতরেই আমাদের বিস্তার এবং পরিশেষে সেই একেই আমার ফিরে যাব। সেই 'এক' নিত্য বর্তমান।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩২

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), অনাদিত্বাৎ (আদিরহিত) নির্গুণত্বাৎ (নির্গুণ অর্থাৎ তিন গুণসম্বন্ধ শূন্য) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অব্যয় অর্থাৎ বিকারহীন) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে অবস্থিত থেকেও) ন করোতি (কিছু করেন না), ন লিপ্যতে (কর্মে লিপ্ত হন না)।।৩২

হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ, এই কারণে অব্যয়। সেজন্য তিনি শরীরস্থ হয়েও কিছু করেন না। অতএব কখনও কোন কর্মফলে অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের দ্বারা লিপ্ত হন না।

আত্মা নিত্য একরসবিদ্যমান। তাঁর কখনও উৎপত্তি বা আদি নাই, এই জন্য তিনি অনাদি। আবার তিনি ত্রিগুণাতীত। সুতরাং তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেরও অধীন নয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতজনিত ক্রিয়ার ফল আত্মা ভোগ করেন না। সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানি দেখেন এই অব্যয় পরমাত্মা জীবদেহে অবস্থিত হলেও, প্রকৃতির আবরণে আপনাকে আবৃত করলেও প্রকৃতির কোন কর্মেই তিনি লিপ্ত হন না, আপনাকে কোনও কর্মেরই কর্তা বলে মনে করেন না। তাঁকে কোন কর্মের ফল ভোগ করতে হয় না, কোন কর্মের দোষ বা গুণ তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সর্বদা নির্বিকার নির্লিপ্ত থাকেন।

পরমাত্মা এই শরীরে অবস্থান করলেও তিনি অব্যয়, বিকারহীন, কারণ তিনি অনাদি।

জন্ম, স্থিতি ও বিনাশ—এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পদার্থের রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়। কিন্তু পরমাত্মা সনাতন, আদিহীন, অন্তহীন বিকারহীন। এই শরীরে অবস্থান করেও তিনি কিছুই করেন না এবং কোন কিছুতেই লিপ্ত হন না। কর্মফল আত্মাকে স্পর্শ করে না। আত্মা অন্তরে নিত্যশুদ্ধ। আচার্য শঙ্কর বলছেন—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরম্ আত্মন্। পরমাত্মার স্বরূপ হল তিনি নিত্যশুদ্ধ অর্থাৎ চিরপবিত্র, নিত্যবুদ্ধ অর্থাৎ পরমজ্ঞান, নিত্যমুক্ত অর্থাৎ চির স্বাধীন। আমরা সর্বদা সেই পরিপূর্ণ দিব্য স্বরূপটিকে সর্বদা ব্যক্ত করার জন্য ব্যস্ত।

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩৩

যথা (যেমন) সর্বগতং (সর্বত্র অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতাবশত) ন উপলিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হন না) তথা (তেমনি) সর্বত্র (সর্ববিধ অর্থাৎ সকল দেহে (শরীরে) অবস্থিতঃ (বিদ্যমান থেকেও) আত্মা (পরমাত্মা) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।।৩৩

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সর্ববস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও অতিসূক্ষ্মতাহেতু কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কারও সঙ্গে সম্বদ্ধ হয় না, তেমনি এই আত্মা সকল দেহে অবস্থিত থেকেও নির্লিপ্ত অর্থাৎ দেহের দোষগুণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হন না।

আকাশ যেমন সর্বত্র বিরাজ করেও কোন স্থান, কাল বা বস্তুর সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম, রজঃ ও পঙ্কাদির গুণ-দোষে লিপ্ত হন না। আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, মানব, পশু ও পক্ষী আদির দেহে থেকেও কারও প্রাকৃতিক ধর্মে লিপ্ত হন না। আত্মা সর্বদা অবিকৃত এবং একভাবেই অবস্থান করেন। আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থেকেও স্থূল জগৎপ্রপঞ্চের সঙ্গে তার কোন সংশ্লেষ ঘটে না। আকাশের মধ্যে সকল বস্তুর অবিরাম গতি এবং ক্রিয়াচাঞ্চল্য ঘটলেও অতি সূক্ষ্মতাহেতু বস্তুর দ্বারা আকাশের গায়ে কোন দাগ পড়ে না অথবা কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা বিকৃতি ঘটে না। সেরূপ সর্বব্যাপী আত্মা সকল প্রাণী ও তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে ধারণ করলেও ঐ সকল কর্ম হতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং কোন কর্মফল লিপ্ত করে না।

পরমাত্মাকে বোঝাতে আকাশের তুলনাটি ভগবান বেছে নিয়েছেন। বস্তুর ভিতরে ও বাইরে আকাশ কখনও মলিন হয় না। ব্রহ্মও তাই। তিনি সবকিছুর ভিতরে, আবার বাইরেও। এবং সর্বদাই শুদ্ধ। ঈশ্বর থেকে জগতের সবকিছু এসেছে, ঈশ্বরেই তাদের স্থিতি, আবার ঈশ্বরেই তাদের লয় পাবে। কিন্তু শুদ্ধচৈতন্য, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যনির্মল, নির্লিপ্ত—এই হলো ঈশ্বর বা পরত্মার স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে দেহ-ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে পাপ স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তরে যে শুদ্ধআত্মা আছেন, তিনি সর্বদা

নির্দোষ ও অপাপবিদ্ধ। পাপ তাঁকে কোনও দিন স্পর্শ করতে পারে না।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৪

ভারত (হে অর্জুন), যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (একই সূর্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকম্ (জগৎ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (তেমনি) ক্ষেত্রী (দেহী, পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্র) ক্ষেত্রং (জগৎ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন)।।৩৪

হে ভারত, যেমন সূর্য এক অথচ এই সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, তেমনি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা এক হয়েও সমগ্র ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন।

ভগবান সূর্যের উপমা দিয়ে বলছেন, যেমন এক অখণ্ড সূর্য জগতের যাবতীয় বস্তুকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করলেও সূর্য এক এবং অখণ্ড থাকে, সেরূপ আত্মা সমস্ত জীবের দেহে অবস্থান করে বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক হলেও তিনি কখনও বিভিন্ন হন না, তাঁর অখণ্ডতার কোনও হানি হয় না। আবার সূর্যের আলো না পেলে যেমন কোন বস্তুর প্রকাশ হয় না, সমস্ত বস্তুই অন্ধকারে আবৃত থাকে, সেরূপ আত্মার আলোক না পেলে আমাদের চিত্তও অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত থাকে। আবার সূর্য সকল বস্তুকে প্রকাশিত করলেও ঐ সকল বস্তুর দোষগুণে যেমন সূর্য লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাও দেহধারী জীবের কোন কর্ম-প্রচেষ্টা বা চিত্তের কোন সুখদুঃখে লিপ্ত হয় না।

কঠ উপনিষদ বলছেন—'সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।।' (২-২-১১)—জগতে সমস্ত লোকের চক্ষুস্বরূপ এক সূর্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য, বাহ্য, অশুচি বস্তুর দোষে লিপ্ত হয়ে নিজে কোন প্রকারে দূষিত হয় না, সেরূপ এক আত্মা সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত থেকেও লোকদুঃখে লিপ্ত বা সম্বন্ধ হয় না অর্থাৎ জীবের দুঃখ পরমাত্মাকে ভোগ করতে হয় না, কারণ তিনি নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র-স্বভাব।

ভগবান বলছেন, সকল ক্ষেত্রের এক জ্ঞাতা। এক অসীম পরমাত্মাই আমাদের সকলের মধ্যে বিরাজমান। দেহ বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা মিথ্যা আমিত্ব-বোধ আছে, যে আমিত্ব দেহাভিমানী, মন ও সংস্কারগতির দ্বারা প্রভাবিত। এই মিথ্যা আমিত্ব-বোধের জন্যই আমি আপনার থেকে পৃথক হয়ে রয়েছি। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে ভিন্ন দেখছি। আমি নিজের শত্রু। নিজেকে হয়তো হত্যা করতে পারি। তাই গীতায় ভগবান বারবার একত্বের উপর, সমত্বের উপর জোর দিয়েছেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক। এক ও অদ্বিতীয়। দুই বলে কিছু নেই। বহুর মধ্যে এক-কে দেখাই ঠিক ঠিক দেখা, সঠিক দর্শন। তাই নিজের অন্তরের আত্মজ্যোতিতে দর্শন করতে হবে। চৈতন্যের আলোতে জগতের সবকিছু আলোকিত, অতএব সেই চৈতন্যের আলোকে আমার মধ্যে

ও জগতের সবকিছুই আলোকিত রয়েছে, ঐরূপ এক আত্ম-দৃষ্টিতে আমাদের জগৎকে দেখতে হবে।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৫

যে (যাঁরা) এবম্ (এ প্রকারে) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (বিভাগ, প্রভেদ) ভূত-প্রকৃতি-মোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি অবিদ্যারূপ মিথ্যা হতে মুক্ত) জ্ঞান-চক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের দ্বারা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁরা) পরম্ যান্তি (পরমপদপ্রাপ্ত হন)।।

উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পর প্রভেদ এবং ভূতগণের অবিদ্যারূপ প্রকৃতির মিথ্যা, বিবেকজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা যাঁরা দর্শন করেন, যিনি প্রকৃতির অধীনতা হতে জীবের মুক্তির উপায় জানেন, তিনি পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ভগবান বললেন, হে অর্জুন, আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব যা বললাম, ঐ তত্ত্ব সম্যকভাবে অবগত হয়ে উহাদের প্রার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য যিনি জ্ঞানদৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে পারেন এবং যিনি নিম্ন প্রকৃতির অধীনতা হতে মুক্তিলাভের উপায় জানেন তিনিই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।

মানবের জ্ঞানদৃষ্টি বা জ্ঞানচক্ষুর আবরণ খুলে গেলে তিনি এই তত্ত্ব অবগত হন। আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সাহায্যে এই তত্ত্ব জানা যায় না। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তিনি প্রথমে দেহ ও আত্মার পার্থক্যটি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তফাৎটি বুঝতে পারবেন। তারপর প্রকৃতি ও তাঁর বিষয় থেকে মুক্তি আসবে। তখন পরম সত্যকে জানতে পারবেন। অতএব আমরা চেষ্টা করলেই আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করতে পারব।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ ও প্রকৃতি—এঁদের সংযোগের হেতু হল মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিয়েছেন চার ধরণের জীবের—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যমুক্ত জীব। কিছু মানুষ বদ্ধজীব হয়েই তৃপ্তিতে আছে। কিছু মানুষ প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মোটেই সুখী নন, তারা সংগ্রাম করে মুক্ত হতে চায়। কিছু জীব মুক্ত। সবশেষে আছে নিত্যমুক্ত, কোনও বন্ধনই তাঁদের বাঁধতে পারে না। তাঁরা মায়াজালে কখনও ধরা পড়ে না। শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি চরিত্রের উদাহরণ দিচ্ছেন—নরেন্দ্রনাথ ও নাগ মহাশয়। নরেন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞানের প্রভাবে এত বিরাট যে, মায়ার জাল তাঁকে বাঁধতে পারে না। অপরদিকে নাগমহাশয় ভক্তিভাবে দীনতার ভাবে অতি ক্ষুদ্র হয়ে মায়ার জালের ফাঁক দিয়ে সহজেই বেরিয়ে যান। যাঁরা এই পরম সত্যকে জানেন তাঁরা মুক্ত হয়ে যান। তাঁরা সর্বোচ্চ স্থিতি লাভ করেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ** নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করতে হলে প্রথমত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। জানতে হবে ক্ষেত্র অর্থাৎ জড়, বিকারবান ও পরিবর্তনশীল, সমস্ত সৃষ্টিক্রিয়া এই ক্ষেত্রেরই পরিণাম। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ চেতন, নির্বিকার ও অপরিবর্তনীয়। ক্ষেত্রজ্ঞ কোনও কর্মে লিপ্ত নয়, তিনি প্রকৃতির কর্মের দ্রষ্টা ও অনুমন্তা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি মুণ্ডক উপনিষদ খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন এই তত্ত্ব বোঝানোর জন্য। সর্বদা যুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি শোভনপক্ষ পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহ-বৃক্ষকে আশ্রয়পূর্বক পরস্পর আলিঙ্গন করে আছেন। তাদের মধ্যে একজন (জীব) দেহ-বৃক্ষের বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল (সুখদুঃখাত্মক টক-মিষ্টি কর্মফল) ভোজন করেন, অপর পক্ষীটি কিছু ভক্ষণ না করে কেবল সাক্ষীরূপ দর্শন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে, আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নেই জন্ম নেই। ঈশ্বর দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহবুদ্ধি যায়; তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

ভগবান এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ বিশেষ করে ব্যাখ্যা করেছেন, এই ভোগায়তন দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয়েছে, আর যিনি দেহবাসী সেই দেহীই ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা)। আরও বিশেষ স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য ভগবান বলছেন—সর্ব ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে। এক ক্ষেত্রজ্ঞ সব দেহে তিনিই 'আত্মা' রূপে বিরাজমান। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং তা-ই পরমেশ্বরের জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের, প্রকৃতি ও পুরুষের, বিকারী ও নির্বিকারের ভেদদর্শন এবং ঐ উভয়ের সংযোগের হেতু যে মায়া, সেই মায়াতরণের উপায় যিনি জানেন তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করেন।

এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সাধনের দরকার এবং চার যোগের সাধনমার্গের সাহায্যে ঐ তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, তবে ধর্মজীবন বা সাধনপথ সহজ হয়ে যায়। এক একটি পথে ঈশ্বরের সঙ্গে এক এক ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা। ভাববিহীন সাধন ভজন

নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়। যোগমার্গ অবলম্বন করে ধ্যান-ধারণা ও সমাধিদ্বারা যেমন আত্মদর্শন সম্ভব, তেমনি আত্ম-অনাত্ম-বিচাররূপ জ্ঞানমার্গ অবলম্বনেও সেই আত্মজ্ঞানরূপ মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। আবার কর্মমার্গ ও ভক্তিমার্গেও আত্মজ্ঞান লভ্য। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই চরম অদ্বৈত অবস্থা লাভ করা। সর্বত্র এক চৈতন্য দর্শন অর্থাৎ সর্বভূতে এক ঈশ্বর দর্শন করেন। এই অদ্বৈত অবস্থাকেই আত্মদর্শন, ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্তি, সর্বভূতাত্মৈক্য-জ্ঞান, দেহাত্ম-বিবেক, পুরুষপ্রকৃতি-বিবেক, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমেশ্বরের দর্শন বা মোক্ষ ইত্যাদি বিবিধ নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

এই অধ্যায়ের নাম 'গুণত্রয়বিভাগযোগ'। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ--প্রকৃতির এই তিন গুণ। গুনত্রয়ের সাম্যাবস্থাই পরমা-প্রকৃতি। তিন গুণের বৈষম্য উপস্থিত হলেই প্রকৃতির প্রকাশ বা সৃষ্টি শুরু হয়। তিন গুণের প্রভাবেই জীব জগৎ ও মহাবিশ্ব কর্ম করে চলেছে।

তিন গুণের প্রকাশ এবং তিন গুণের অতীত অবস্থার কথা এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিরই পরিণাম। পরমেশ্বর সৃষ্টিসংকল্প করেই স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে এই জীবজগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। পরমেশ্বর বা তাঁর স্বীয় শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই সৃষ্টি বা জীব জগতের প্রকাশ। পরমেশ্বর ভূতগণের পিতৃস্বরূপ এবং প্রকৃতি মাতৃস্বরূপিণী।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনগুণ একত্রে অবস্থান করে। যখনই কোনও মানুষের মধ্যে—জ্ঞানের প্রাধান্য ঘটে, তখন সেই মানুষকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন বা সাত্ত্বিক ব্যক্তি বলে জানবে। রজোগুণ অর্থাৎ রাগাত্মক। রজোগুণের বৃদ্ধিতে কর্মে উদ্যম, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ ও লোভ উৎপন্ন হয়। তাই কোনও মানুষের মধ্যে এ সকল গুণের প্রাধান্য ঘটলে তাকে রজোগুণী বলা হয়। তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে কামনা, বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম এবং বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটে। যখন কোনও ব্যক্তির মধ্যে এসবের প্রাবল্য দেখা যায়, তখন তাকে তমোগুণী বা তামসিক-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি বলা হয়। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান ও সুখ, রজোগুণ হতে কর্মপ্রবৃত্তি এবং তমোগুণ হতে অজ্ঞান, বুদ্ধিবিপর্যয় ও 'প্রমাদ' উৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত, তিনি এই তিন গুণের ঊর্ধ্বে। তিন গুণের ক্রিয়ার দ্বারা যিনি বিচলিত নন, নির্লিপ্ত, অকর্তা, উদাসীনবৎ, সমদর্শী এবং অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ঈশ্বরের সেবা করেন, তিনিই গুণাতীত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—একনিষ্ঠ ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সেবা করলেই, তিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ভগবানই অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত এবং ঐকান্তিক সুখস্বরূপ ব্রহ্ম। তাই ভগবান অর্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' 'নিত্যসত্ত্বস্থ' হবার নির্দেশ দিয়েছেন। ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ—দেহে তিন গুণের কার্য চললেও যিনি নির্লিপ্ত সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন, সুখদুঃখাদিতে বিচলিত হন না, তিনি ত্রিগুণাতীত। তিনি মায়াতীত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবলাভ করেন। অতএব যিনি ঐকান্তিক ভক্তি-যোগ সহকারে শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হতে সমর্থ হন। স্থিতপ্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত—একই অবস্থা। মানব জীবনের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

শ্রীভগবানুবাচ
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বললেন) জ্ঞানানাম্ (জ্ঞানসকলের মধ্যে) উত্তমম্ (মোক্ষজনক, শ্রেষ্ঠ) পরং (পরমার্থবিষয়ক) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরপি) প্রবক্ষ্যামি (বলব) যৎ জ্ঞাত্বা (যা অর্থাৎ যে জ্ঞান লাভ করে) সর্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনি অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তিগণ) ইতঃ (দেহবন্ধন হতে) পরাং (পরম) সিদ্ধিং (মোক্ষরূপ সিদ্ধি) গতাঃ (লাভ করেন) ।।১

শ্রীভগবান বললেন—আমি সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে পুনরায় বলব। এই জ্ঞান লাভ করে মুনিগণ এরপর, দেহান্তে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি তথা মোক্ষলাভ করেছেন।

পূর্বে ভগবান অর্জুনকে অনেক তত্ত্ব কথা বলেছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা উত্তম ফলপ্রদ জ্ঞানের সাধন সম্পর্কে বলবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ তথা আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই ভগবান বলছেন, 'যে জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনিগণ দেহ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আমার পরম স্বরূপ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন, আমি তোমাকে আবার সেই শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞান-সাধনের বিষয়ে বলব।' এই জ্ঞানলাভের সুযোগ কেবল মানুষের আছে। একমাত্র মানুষই এই জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে—অন্য প্রাণীরা পারে না। বহু ঋষি এই ত্রিগুণাতীত আত্মার লাভ করে মুক্তিলাভ করেছেন, অতএব আমরাও একদিন এই অবস্থা লাভ করে মুক্ত হয়ে যাব। এই জ্ঞান লাভ করেই মানুষ জীবনের চরম কল্যাণে পৌঁছেছেন। তাই এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ।।২

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে আশ্রয় করে) মম (আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের) সাধর্ম্যম্ (স্বরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হয়ে) সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না) প্রলয়ে চ (প্রলয়কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না, অর্থাৎ পুনর্জন্মবশত ব্যথা প্রাপ্ত হন না) ।।২

এই জ্ঞানসাধনকে আশ্রয় করে যে মুনিগণ আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন, তাঁরা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাঁরা জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

যিনি এই আত্মজ্ঞান সাধন করেন, তিনি ভগবানের অদ্বয় নির্গুণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাই ঈশ্বরের জগৎরূপে প্রথম প্রকাশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি হলেও তাঁর আর উৎপন্ন হতে হয় না, এবং হিরণ্যগর্ভের লয় হলেও তাঁকে বিলীন হতে হয় না। অতএব এই মৃত্যুময় সংসার জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে ভগবানের আধ্যাত্মিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে হলে ভগবানের স্বরূপজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। আমরা সাধারণত দেহ-ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা গঠিত যে নিম্ন-প্রকৃতি তাতেই বাস করি এবং ঐ প্রকৃতির নিয়মদ্বারা চালিত হই। সাধক এই নিম্ন-প্রকৃতির বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মদ্বারা ভগবানের সঙ্গে যোগস্থাপনপূর্বক আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ভগবানের স্বরূপ লাভ করেন। 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ'—তাঁরা আমার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। এই সাধকগণ 'সর্গেঽপি ন উপজায়ন্তে'—সৃষ্টিকালেও আর জন্মগ্রহণ করেন না কারণ তাঁরা মুক্ত। এবং 'প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ'—প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ যখন লয় পায়, তখনও তাঁরা দুঃখবোধ করেন না। এঁরা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে পড়েন না। কারণ তাঁরা ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেছেন। তাঁরা প্রকৃতির তিন গুণের পারে চলে গেছেন, তাই তাঁরা আর জগতের প্রলয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন না কিংবা সৃষ্টিকালে তাঁদের আর জগতে ফিরে আসতে হয় না অর্থাৎ দেহ ধারণ করতে হয় না—তাঁরা মুক্ত তাই ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন। প্রকৃতির খেলা তাঁদের বিব্রত করতে পারে না।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ।।৩

ভারত (হে অর্জুন), মহৎ ব্রহ্ম মম যোনিঃ (মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ মূল প্রকৃতি বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আমার গর্ভাধানস্থান) তস্মিন্ (তাতে) অহম্ (আমি) গর্ভং (সৃষ্টির বীজ) দধামি (নিক্ষেপ করি)। ততঃ (তা হতে অর্থাৎ সেই গর্ভাধান হতে) সর্বভূতানাং সম্ভবঃ (সর্বভূতের উৎপত্তি বা জন্ম) ভবতি (হয়) ।।৩

হে অর্জুন, মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন মূল প্রকৃতিই আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান;

আমি তাতে গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পাদন করি। সেই গর্ভাধান হতেই ব্রহ্মাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হয়।

ভগবান বলছেন, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান- স্বরূপ। আমি সেই প্রকৃতি-যোনিতে সঙ্কল্পরূপ গর্ভ বা জগৎ-বীজ নিক্ষেপ করি। সেই গর্ভাধান হতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়ে থাকে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ-সন্নিধানবশত জগতের আবির্ভাবের কারণ হন। প্রকৃতি পৃথকভাবে কোনও কার্য করতে পারে না। বেদান্তমতে কল্পস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সৃষ্টিকার্যে সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব না থাকলেও তাঁর বিদ্যমানতার অনির্বচনীয় মহিমাই মায়াশক্তি বিকাশের হেতু। তাই আবির্ভাবরূপ কার্য ঈশ্বরাধীন বলে স্বীকৃত। তিনি নিজে সুখদুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ তাঁর সত্তাতেই জগৎরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আদি ঘটনা অনির্বচনীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কার্য। শুদ্ধ ব্রহ্মের মায়া তাই অনির্বচনীয়। সেরূপ পুরুষপ্রকৃতির অনির্বচনীয় সংযোগও মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য।

আপাতদৃষ্টিতে পরমেশ্বর ও প্রকৃতি আলাদা কিন্তু আমাদের জ্ঞান হলে বুঝতে পারব সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ। ব্রহ্ম ও শক্তি—এক ও অভিন্ন। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মতো। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই পরম ব্রহ্ম। দুই নয়, এক। একই সত্তা থেকে সব কিছুর আবির্ভাব এবং পরিণামে তাতেই মিলে যাবে। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হলে দ্বৈতভাব এসে যায়। তাতে মোহ বা ভ্রান্তির উৎপত্তি ঘটে। অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে 'এক' দর্শন--যেখানে প্রকৃতি ও আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চৈতন্য সব মিশে মূলে 'এক' স্থাপন করে। তাই ভগবান বলছেন 'মম যোনিঃ মহদ্ব্রহ্ম'—আমার গর্ভ হল এই প্রকৃতি, যাকে মহৎ ব্রহ্ম অথবা বিরাট ব্রহ্মা বলা হয়। 'তস্মিন্ গর্ভ দধাম্যহম্'—আমি তাতে গর্ভসঞ্চার করি। যাতে প্রাণযুক্ত বিশ্ব প্রকাশ লাভ করে। ভগবানই প্রকৃতির বিশ্ব-প্রসবের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ ঈশ্বর ও তাঁর মায়াশক্তির সক্রিয়তা থেকে বিশ্বের প্রকাশ। এই মহাশক্তিকে আমরা জগজ্জননী বলি। তিনিই আদ্যাশক্তি মহামায়া, জগদম্বা। দুটি ভাবে ব্যাখা করা হয়—ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এবং শিব ও শক্তি। শক্তির মধ্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ।।৪

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), সর্বযোনিষু (দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদি সকল যোনিতে) যাঃ (যে সকল) মূর্তয়ঃ (স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্তি বা দেহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) তাসাং (তাদের) ব্রহ্ম মহদ্যোনিঃ (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, মাতৃস্থানীয়) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা) পিতা (জনক) ।।৪

হে কৌন্তেয়, সকল যোনিতে যেসব স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্তি বা শরীর উৎপন্ন হচ্ছে,

মহদ্ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি তাদের যোনি অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া, আর আমি তাতে বীজপ্রদ পিতা।

বিভিন্ন কারণে এই বিশ্বে যত রকমের মূর্তি বা দেহ উৎপন্ন হয়, তাদের সবার উৎপত্তিস্থান গর্ভ হলেন মহৎব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতি, যিনি মাতৃতত্ত্ব। ঈশ্বর স্বয়ং সেই গর্ভে সকলের বীজপ্রদানকারী পিতা। এই দুয়ের সংযোগে সমগ্র বিশ্বের 'বিরাটের' প্রকাশ। এ যেন রং-তুলি দিয়েই ঈশ্বর প্রতিনিয়ত বিশ্বের রূপবৈচিত্র্যের ছবি আঁকছেন। জগতের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর। তিনিই একাধারে পিতা ও একাধারে মাতা। পিতারূপে সৃষ্টির বীজ অর্থাৎ চিৎসংকল্প যোনিস্বরূপ মহৎব্রহ্ম বা মূল প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করেন। আবার তিনিই মাতৃরূপে সেই বীজসংযোগে গর্ভধারণপূর্বক জীবমূর্তিসকলের প্রকাশ ঘটান। তাই ঈশ্বর পিতা, আবার গর্ভধারিণী মাতাও তিনি। প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা নয়, এক ও অদ্বিতীয়।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ।।৫

মহাবাহো (হে মহাবাহো), সত্ত্বং (সত্ত্ব) রজঃ (রজ) তমঃ (তম) প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাত) ইতি গুণাঃ (এই তিনগুণ) অব্যয়ম্ (নির্বিকার) দেহিনম্ (দেহীকে অর্থাৎ আত্মাকে) দেহে (শরীরে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে রাখে)।।৫

হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রকৃতিজাত গুণসকল প্রাণিদেহে অব্যয় (নির্বিকার) দেহীকে (চিৎস্বরূপ আত্মাকে) দেহাভিমানের দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে।

তিন গুণের সাম্য-অবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য-অবস্থাই তিনগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। গুণ ও প্রকৃতিতে কোন ভিন্নতা নেই। তিনগুণের দ্বারা প্রাণী দেহ লাভ করে এবং শোকমোহাদি রূপ নানা পাশে জীবাত্মা বদ্ধ হয়ে থাকে। এই তিনগুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারাই সৃষ্টিকার্য চলছে। সমগ্র জগৎ এই তিনগুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ তিনগুণেই আবদ্ধ থাকে। মানুষের সুখ দুঃখ মোহ ইত্যাদি এই তিন গুণের ক্রিয়া হতে উৎপন্ন। এই তিন গুণের ক্রিয়া একে অন্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। তবে কোন গুণ আবার অপর গুণদুটিকে অভিভূত করে স্বয়ং প্রধানরূপে প্রকাশ পায়। এই গুণগুলির তারতম্য ভেদে বলা হয় যে তমোগুণের প্রকাশ জড়, মোহ তথা অজ্ঞান। রজোগুণের প্রকাশ ক্রিয়াশীলতা, কর্তৃত্ব, রাজসিক ভাব। সত্ত্বগুণের প্রকাশ জ্ঞান, ঐক্য, সত্যভাবের প্রকাশ।

মানুষের দেহের মধ্যে যিনি দেহী অর্থাৎ আত্মা, তিনি অব্যয়, অবিনাশী, অক্ষয়। এই তিনগুণের প্রভাবে মানুষ তার স্বরূপ ভুলে যায়। মানুষকে তার স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে হলে বা ঈশ্বরলাভ করতে হলে এই তিনগুণের বন্ধন মুক্ত করতে হবে। তিনগুণ কিভাবে মানুষকে আবদ্ধ করে রাখে তা বিস্তারিত বলা হয়েছে। কারণ বন্ধনের স্বরূপ না জানলে তা হতে মুক্তিলাভ সহজসাধ্য হয় না।

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ।।৬

অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন), তত্র (সেই গুণত্রয়ের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মল স্বচ্ছস্বভাব হওয়ার জন্য) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ম্ (নির্দোষ, নিরুপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখ-সঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ (সুখে আসক্তিদ্বারা ও জ্ঞানের আসক্তিদ্বারা) বধ্নাতি (আত্মাকে আবদ্ধ করে)।।৬

হে নিষ্পাপ অর্জুন, সেই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশশীল, নিরুপদ্রবতা ও সুখের ব্যঞ্জক। তাই সত্ত্বগুণ সুখসঙ্গ এবং 'আমি জ্ঞানী' এরূপ জ্ঞানাসক্তি দ্বারা দেহীকে যেন দেহে আবদ্ধ করে রাখে।

সত্ত্বগুণ মায়ার আবরণী শক্তির বিনাশক ও পরম সুখের অভিব্যঞ্জক। সত্ত্বগুণ তাই প্রকাশশীল ও অনাময় নির্দোষ বলে কথিত। এই সত্ত্বগুণ 'আমি সুখী, আমি জ্ঞান লাভ করেছি' ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করে থাকে।

কোনও দর্পণের উপর ময়লার আস্তরণ পড়লে যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনই আমাদের চিত্তও মোহ এবং বিষয়বাসনার দ্বারা মলিন হলে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়। সত্ত্বগুণের কাজ হল ঐ মোহরূপ মলিনতা দূর করে চিত্তকে নির্মল করা।

অতএব সত্ত্বগুণ চিত্তকে স্বচ্ছ এবং নির্মল করে বলে তা জ্ঞানের প্রকাশক। অর্থাৎ নির্মল ও স্বচ্ছ চিত্তেই আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। চিত্তের এই সুখ, শান্ত এবং নির্মল প্রসন্নভাব সত্ত্বগুণের প্রধান লক্ষণ। সত্ত্বগুণ সুখের ব্যঞ্জক, এই কারণে সত্ত্বগুণী ব্যক্তি সর্বদাই প্রফুল্ল চিত্তে থাকেন।

কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রভাবে চিত্ত নির্মল, অনাময় ও বিষয় বাসনার কালিমা দূর হলেও অহংজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তখন অন্য বিষয়ে আকর্ষণ না থাকলেও 'আমি জ্ঞানী, আমি সুখী' এই ভাবটি বর্তমান থাকে এবং জ্ঞান ও সুখের আকর্ষণ তখনও চিত্তকে অধিকার করে থাকে। এই আকর্ষণই বন্ধনের কারণ অর্থাৎ দেহীকে যেন দেহের মধ্যে বদ্ধ করে রাখে।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ।।৭

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র), রজঃ (রজোগুণকে) রাগ-আত্মকম্ (অনুরাগস্বরূপ) তৃষ্ণা-আসঙ্গ-সমুদ্ভবম্ (আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (জানবে) তৎ (তা অর্থাৎ রজোগুণ) কর্ম-সঙ্গেন (কর্মে আসক্তি দ্বারা) দেহিনম্ (দেহীকে, অর্থাৎ আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)।।৭

হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে রাগাত্মক অনুরাগরূপ বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক বলে জানবে, তা দেহীকে কর্মাসক্তি দ্বারা নিতান্ত আবদ্ধ করে।

অপ্রাপ্ত বস্তু পাবার জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষাই তৃষ্ণা এবং প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হবার ভয়ে তাকে সংরক্ষণ এবং ভোগ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকেই আসক্তি বা আসঙ্গ বলা হয়। যে বৃত্তি দ্বারা চিত্ত রঞ্জিত ও আমোদিত হয় তার নাম রাগ বা অনুরাগ। তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা ও আসঙ্গ এই বাসনাগুলি অনুরাগ হতেই উৎপন্ন হয়। রজোগুণ মানুষকে অনুরাগের বশবর্তী করে নানা কর্মে নিয়োজিত করে এবং বিষয়ের প্রতি চিত্তের প্রবল তৃষ্ণা ও আসঙ্গ উৎপাদন করে।

অজ্ঞান মানুষ এই তৃষ্ণা ও সঙ্গ দ্বারাই সংসারে চালিত হয়ে থাকে। যেখানেই তৃষ্ণা বা বাসনা, সেখানে বাসনাটি প্রকাশ করার প্রবণতা থাকবেই থাকবে। ফলে বিষয়ের প্রতি তাদের একটা আসক্তি জন্মায়। 'আমিই কর্মের কর্তা' এই অহঙ্কার এবং 'আমিই কর্মের ফল ভোগ করব'—এই আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে আমরা বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত হই এবং এই সকল কর্মের প্রতি আমাদের প্রবল আসক্তি জন্মায়। এই কর্মের প্রবৃত্তিই রজোগুণের প্রধান লক্ষণ এবং এই কর্মপ্রবৃত্তির মূলে যে অহঙ্কার এবং আসক্তি বর্তমান, তাই জীবকে সংসারে অবদ্ধ করে রাখে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ।।৮

ভারত (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) তমঃ (তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হতে জাত—আবরণশক্তি প্রকৃতি) সর্বদেহিনাম্ (সকল জীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানবে) তৎ (তা-অর্থাৎ তমোগুণ) প্রমাদ-আলস্য নিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা জীবকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ বিমোহিত করে) ।।৮

হে অর্জুন, তমোগুণকে অজ্ঞান হতে জাত ও সকল জীবের পক্ষে ভ্রান্তিজনক বলে জানবে। তা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা (চিত্তের অবসাদ) দ্বারা জীবকে যেন আবদ্ধ করে।

আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান হতে তমোগুণ জাত এবং সেই আবরণশক্তি জীবের বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই অজ্ঞান চিৎস্বরূপকে আবৃত করে জীবের আত্মজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান প্রকাশে বাধা দেয়। সত্ত্বগুণ জ্ঞানের প্রকাশক। তমোগুণ সত্ত্বগুণের বিরোধী। তমোগুণের জন্য মানুষের সৎ বস্তুতে মিথ্যার ভ্রম হয়। কাজেই সত্ত্বগুণ যেমন জ্ঞানের প্রকাশক তমোগুণ তেমন জ্ঞানের আবরক, ভ্রমের উৎপাদক। তমোগুণ জীবের কর্মপ্রচেষ্টা হ্রাস করে, আলস্য উৎপাদন করে, বিকৃত বুদ্ধির প্রকাশ করে। এই তমোগুণ থেকে প্রমাদ অর্থাৎ ভ্রম জন্মায়। মোহ উৎপাদন করাই তমোগুণের কাজ। এই মোহের দ্বারা জীবের বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়। জীব অবিবেকবশত মিথ্যাকে সৎ মনে করে, অনিত্যকে

নিত্য মনে করে, অসুন্দরকে সুন্দর মনে করে তাতেই আকৃষ্ট হয়। দেহে আত্মাভিমানবশত দেহের সুখদুঃখে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। তমোগুণের দ্বারা মানুষ আচ্ছন্ন হলে সে তার মনোযোগ অথবা একগ্রতা হারায়, ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পায়, জীবনকে ভুল পথে চালিত করে, কার্যকালে প্রমাদ আলস্য আসে, অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি করে, জীবন ঘোর অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ।।৯

ভারত (হে অর্জুন), সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখে অর্থাৎ জীবকে ভগবদ্-আনন্দে) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে) রজঃ (রজোগুণ) কর্মণি (সাধ্যকর্মে) তু (কিন্তু) তমঃ (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদিত করে) প্রমাদে (ভ্রমে বা অনবধানতায়) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে) ।।৯

হে অর্জুন, সত্ত্বগুণ মানুষের চিত্তকে সর্বদা সুখের অভিমুখী করে অর্থাৎ দেহীকে দুঃখশোকাদির মধ্যেও উচ্চতর সুখে প্রসন্ন রাখে, রজোগুণ কর্মে নিযুক্ত করে, আর তমোগুণ বিবেক জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে জীবকে প্রমাদ ও আলস্যাদিতে নিমগ্ন করে রাখে।

তিনটি গুণ মানুষের মধ্যে থাকে এবং এক এক সময়ে এক একটি গুণ প্রবল রূপ ধারণ করে। আবার সত্ত্ব ও রজঃ যুক্তভাবে কিংবা রজঃ ও তমঃ যুক্তরূপে, মানুষের মধ্যে প্রবল রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ আলাদাভাবে থাকে না। প্রকৃতির মধ্যেও যেমন তারা মিলেমিশে থাকে, আমাদের ভিতরেও তেমনি মিলেমিশে থাকে।

সত্ত্বগুণ চিত্তে সুখ, আনন্দ ও শান্তি প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণ মানুষকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে, চিত্তে যতই দুঃখের কারণ উপস্থিত হোক না কেন। দুঃখক্লেশ আসলেও সত্ত্বগুণ চিত্তকে ব্যথিত হতে দেয় না। সত্ত্বগুণ হতে চিত্ত আরও ঊর্ধ্বে ব্রহ্মানন্দরূপ শাশ্বত আনন্দের নিমিত্ত উন্মুখ হয়।

রজোগুণ জীবকে কর্মে লিপ্ত করে। মানুষের মনে তৃষ্ণা ও আসক্তি উদ্ভব করে। রজোগুণ সুখের কারণকে সরিয়ে জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কর্মমার্গে জীবকে আকর্ষণ করে থাকে। কারণ কর্ম ব্যতীত কোনও কামনা পূরণ হতে পারে না। কাজেই রজোগুণ দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ সর্বদাই কর্মপ্রচেষ্টায় ঘুরতে থাকে এবং কর্মে তার একটা আসক্তি জন্মায়।

তমোগুণ বাড়লে সত্ত্বগুণের কার্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে তা প্রমাদবুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ করে। আলস্য ও কর্মহীন হয়ে বুদ্ধিহীন হয়। চিত্তে ভ্রম, অনবধানতা এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা জন্মায়। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি জ্ঞানের উপদেশ পেলেও সে

মোহাচ্ছন্ন বলে তা চিত্তে ধারণ করতে পারে না। সে সর্বদাই ভুল পথে, বিপথে চলে। হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ।।১০

ভারত (হে অর্জুন), সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ (রজোগুণকে) তমঃ চ (এবং তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করে) ভবতি (প্রবল হয়, অর্থাৎ নিজের প্রাধান্য দেখায়) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণকে) তমঃ এব (তমোগুণকে) তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণকে) রজঃ চ (এবং রজোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়) ।।১০

হে ভারত, সত্ত্বগুণ কখনও রজোগুণকে ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়; রজোগুণ কখনও সত্ত্বগুণকে ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয় এবং তমোগুণ কখনও রজোগুণকে ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়।

এই তিন গুণ কখনও সমভাবে মানুষের মধ্যে থাকে না। সাম্যভাবে থাকলে কোন প্রকার সৃষ্টি বা কর্মই হয় না। অতএব একজন মানুষকে কখনও সাধু প্রকৃতি, কখনও অসাধুপ্রকৃতি আবার কখনও কর্মে ব্যস্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ এই যে, সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে তাঁকে সাধু, রজোগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁকে কর্মে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রভাবে তাঁকে অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত দেখা যায়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামস প্রকৃতি অনুসারে মানুষের মধ্যে সাধুতা, কর্মপটুতা ও অসাধুতা দেখা যায়।

এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্যবশত মানুষের চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা হয়ে থাকে এবং গুণভেদ অনুসারে মানুষকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কখন কখন দুইটি গুণ মিলে তৃতীয় গুণকে নিরস্ত করে প্রবল হয়ে উঠে। তখন উভয় গুণের মিশ্রিত ক্রিয়া দেখা যায়। গুণের প্রাধান্য কখনও মানুষের মধ্যে স্থায়ী প্রকৃতিরূপে দেখা যায়, আবার সেটি সাময়িকভাবে ঘটতে দেখা যায়। যেমন কোন সাত্ত্বিকপ্রকৃতির মানুষও অবস্থাবিশেষে রজ বা তমোগুণ সম্পন্ন হতে পারে। আবার রাজসিক মানুষকেও সময়ে সাত্ত্বিক বা তামসিক ভাবদ্বারা চালিত হতে দেখা যায়। এই অবস্থার সম্মুখীন আমরা প্রতিদিনই হই। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের উন্নত করতে পারি। দোষত্রুটিগুলি শুধরে নিতে পারি।

জন্মকালে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কোনও গুণ বা গুণসমষ্টির প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু কোনও গুণের প্রাধান্য জন্মগত হলেও পরবর্তীকালে শিক্ষা, সংসর্গ, সাধন বা অন্য পরিবেশে তাঁর গুণগত প্রকৃতির পরিবর্তন হতে পারে। তাই আজকে যাঁকে সাধু বলছি অতীতে হয়ত তিনি চোর ছিলেন, কিংবা আজকে যাঁকে চোর বলছি ভবিষ্যতে তাঁর মধ্যে সাধু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব আমরা নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। নিজেই নিজের প্রভু হয়ে আমার আমাদের চরিত্রকে বিকশিত করতে পারি।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ।।১১

যদা (যখন) অস্মিন্ (এই) দেহে (দেহে) সর্বদ্বারেষু (সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং (জ্ঞানের) প্রকাশঃ (প্রকাশ বা আধিক্য) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত (তখনই) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (প্রবল হয়েছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানবে) ।।১১

যখন এই ভোগায়তন দেহে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে এবং অন্তঃকরণে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধির প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়, তখন জানবে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

সত্ত্বাদি গুণের উদ্ভব হলে মানব দেহে ও মনে কী কী লক্ষণ উপলব্ধি হয় তাই বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ শব্দাদি অনুভব করে থাকে। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিতে যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রূপ, রস ও শব্দাদির অনুভূতির দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি সজীব, জাগ্রত এবং প্রকাশময় হয়ে উঠে, তখন আমরা এই সকল জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ অনুভব করি। তখনই জানতে হবে আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়েছে। সত্ত্বগুণের প্রকাশ হলে বিবেক বুদ্ধি জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হয়, মন শান্ত ও প্রসন্নতায় জেগে ওঠে। এই শান্ত প্রকাশময় প্রসন্নতা চিত্তে কাউকে কোন কথা বললে, তা সরল, মৃদু, সরস ও হিতাহিতকর হবে। কেউ কোন কথা বললে মনে তা বিরুদ্ধভাবে গৃহীত হবে না। যা কিছু দেখবে, তা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হবে অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই যেন দেবভাব এসে বিরাজ করবে। এই মানব শরীরেই এই জ্ঞানের দীপ্তি উৎপন্ন হয়। তাই ভগবান বুদ্ধ বলছেন, 'তুমি জ্যোতিস্বরূপ হও', বিবেকানন্দ বলছেন, 'ভাল হও এবং ভাল কর—এটাই মানব জীবনের ধর্ম'।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ।।১২

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ), লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণের ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (সর্বদা কর্মে প্রবৃত্তি আসক্তি) কর্মণাম্ (কর্মের) আরম্ভঃ (নিত্য নতুন উদ্যম, পরিকল্পনা) অশমঃ (অশান্তি, অস্থিরতা) স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা, বাসনা) এতানি (এসব লক্ষণ) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্ধিত হলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ।।১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, সর্বদা কর্মে প্রবৃত্তি এবং সর্বকর্মে উদ্যম, শান্তি ও তৃপ্তির অভাব, বিষয়স্পৃহা—এই সব লক্ষণ জাগ্রত হয়।

রজোগুণ যখন অন্য গুণদ্বয়কে অভিভূত করে প্রবল হয়ে উঠে তখন আমাদের শরীর মনে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—

লোভঃ—চিত্তে ধন, সম্পত্তি, পদমর্যাদা ইত্যাদি বিষয়লাভে প্রবল তৃষ্ণা জন্মায়। নিজের ধন, সম্পত্তি না থাকলেও পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হয়। নিজের যা আছে তা

এতটুকুও ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত নয়, বরং অপরকে শোষণ করবার ইচ্ছা সর্বদা পোষণ করে।

আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তিঃ—চিত্তে লোভ প্রবল হলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের নিমিত্ত সর্বদা চেষ্টা, যত্ন ও প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। কী প্রকারে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কেমন করে পদমর্যাদা, মান সম্মান লাভ হবে, কী প্রকারে অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা যাবে, অপরকে শোষণ করা যাবে, তার জন্য নিরন্তর উদ্যম।

কর্মনাম্ আরম্ভঃ—নিত্যনতুন কর্মের পরিকল্পনা ও সর্বদা কর্মের অনুষ্ঠানে রত। যে কোন সকাম কর্মে আনন্দ, কর্ম না থাকলে অস্বস্তিবোধ করে। কর্ম যতই বৃহৎ বা কঠিন হয় তাতে উৎসাহ ও উদ্যম তত বৃদ্ধি পায়। নিজেদের ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য এরা সুযোগ পেলে বহু আড়ম্বরপূর্ণ ও কঠিন কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

অশমঃ—অস্থিরতা, কামনাবাসনার উদ্রেকহেতু এদের চিত্ত সর্বদা চঞ্চল থাকে। এক কর্ম থেকে অন্য কর্ম করবার চিন্তা ও সংকল্প এদের চিত্তকে সর্বদা আন্দোলিত করে রাখে। এক কামনা পূর্ণ হতে না হতেই অপর বাসনা চিত্তে জেগে উঠে। এক কর্ম শেষ না হতেই অপর কর্মের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ফলে এরা চিত্তে কখনও শান্তি উপলব্ধি করতে পারে না।

স্পৃহ—বাসনা, সুখভোগের তৃষ্ণা। চোখ দিয়ে সুন্দর বস্তু দর্শন, কান দিয়ে সুমিষ্ট শব্দ শ্রবণ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিরও প্রীতিকর বিষয়ে উপভোগের ইচ্ছা ইত্যাদি প্রবৃত্তি যখন এদের চিত্তে খুব প্রবল হয়—তখনই জানবে আমাদের মধ্যে রজোগুণের বৃদ্ধি হয়েছে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ।।১৩

কুরুনন্দন (হে কুরুপুত্র), অপ্রকাশঃ (অবিবেক, জ্ঞানের অপ্রকাশ) অপ্রবৃত্তিঃ চ (এবং কর্মে অনুদ্যম, আলস্য) প্রমাদঃ (কর্তব্যের বিস্মৃতি, অনবধানতা) মোহঃ এব চ (এবং মোহ বিপরীতবুদ্ধি, মিথ্যা অভিনিবেশ) এতানি (এই সকল) তমসি (তমোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্ধিত হলে) জায়ন্তে (জন্মে) ।।১৩

হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে মানুষের জ্ঞানের অপ্রকাশ, বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্মে অনুদ্যম, প্রমাদ কর্তব্যবিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, মোহ অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে।

তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা যায়—

অপ্রকাশঃ—আলোর অভাব, সত্ত্বগুণের বিপরীত, গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যরূপ জ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশের কারণ থাকতেও বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ না হওয়াই অপ্রকাশ। তমোগুণ

দ্বারা চিত্ত আচ্ছন্ন হলে অন্ধকারে চিত্ত ঢেকে যায়। কোন বস্তুর যথার্থ জ্ঞানলাভ হয় না। যা নিতান্ত বাহ্য, স্থূল তাই ইন্দ্রিয় মনের নিকট ভেসে ওঠে। বুদ্ধি মলিন হয়ে যায়, ভাল জ্ঞান ধারণ করতেই পারে না। মানসিক জড়তা এসে পড়ে।

অপ্রবৃত্তিঃ—কাজ করার কোনও ইচ্ছা নেই। কর্মে অনীহা, রজোগুণের বিপরীত। তমোগুণে চিত্ত আচ্ছন্ন হলে, কর্মের দ্বারা সংসারে উন্নতি করা, ধন সম্পত্তি, মান সম্মান রক্ষা করা—এরূপ পুরুষার্থ লাভের চেষ্টা না করে নিষিদ্ধ কর্মের দিকে মন যায়।

প্রমাদঃ—মতিভ্রম, ভুল বোঝার প্রবণতা। কর্তব্য ভুলে যাওয়া অর্থাৎ কোন সময়ে কোন কর্ম কর্তব্য তা অনুষ্ঠান না করা—এটাই তমোগুণের লক্ষণ। কোন বিষয়ে তাদের মনোযোগ নেই। সম্মুখে কর্তব্য আছে, অথচ সেদিকে খেয়াল নাই। নিষিদ্ধ কর্মে মন যায় সর্বদা।

মোহঃ—মূঢ়তা, সঠিক কর্তব্য ভুলে, যা অকর্তব্য তাকেই কর্তব্য বলে মনে করে। তমঃপ্রধান ব্যক্তির বুদ্ধি সর্বদাই মোহাচ্ছন্ন থাকে। কাজেই কোনও বিষয়ই তার নিকট স্পষ্টরূপে ও যথার্থভাবে প্রতিভাত হয় না, বিপরীতরূপে প্রতীয়মান হয়। সে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য মনে করে।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ।।১৪

তু (কিন্তু) যদা (যখন) সত্ত্বে (সত্ত্বগুণ) প্রবৃদ্ধে (বৃদ্ধি পেলে) দেহভৃৎ (দেহধারী জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (লাভ করে) তদা (তখন) উত্তম-বিদাং (উত্তম তত্ত্বজ্ঞানীদের) অমলান্ (নির্মল, প্রকাশময়) লোকান্ (সুখভোগের-স্থানসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ।।১৪

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় যদি কোন দেহাভিমানী জীবের মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর উত্তম তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রাপ্য নির্মল দিব্যলোকে গতি হয়ে থাকে।

সত্ত্বগুণগুলি যদি মরণকালে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা হলে সেই ব্যক্তিদের বিশেষ কি ফল হয় তা এখানে বলা হচ্ছে—হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণের নাম 'উত্তম'। যাঁরা এই দেবগণের উপাসনা করেন, তাঁরা 'উত্তমবিৎ'। এঁদের বাসস্থান অতি পবিত্র, প্রকাশময় ও সুখসেব্য দিব্যভোগ্য ভাবে সুসজ্জিত। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে দেহান্ত হলে সাধকের এই দিব্যলোকে গতি হয়ে থাকে। দুঃখহীন লোকে গমন হয়, যথা—দেবলোক, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ।।১৫

রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং (মৃত্যু) গত্বা (প্রাপ্ত হয়ে) কর্মসঙ্গিষু (কর্মাসক্তিযুক্ত মনুষ্যলোকে) জায়তে (জাত হয়) তথা (এবং) তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃতব্যক্তি) মূঢ়-যোনিষু জায়তে (পশু-আদি যোনিতে জন্মলাভ করে) ।।১৫

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মাসক্ত মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে পশু-আদি মূঢ়যোনিতে জন্ম হয়।

রজোগুণ বৃদ্ধির অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে সে কর্মাসক্ত লোকদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ এমন পরিবেশে জন্মাবে যেখানে চারপাশে মানুষ তীব্রভাবে কর্মের প্রতি আসক্ত। ফলে সেও কর্মের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হবে। তমোগুণের প্রাধান্যে মৃত্যু হলে সে পশুপক্ষীদের মধ্যে জন্ম নেয়। কারণ মৃত্যুকালে মানুষের মনে যে যে ভাবের উদয় হয়, মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণকালে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মানুষ সারাজীবন যে ভাবে, বা যে চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করে অর্থাৎ কর্ম করে থাকে মৃত্যুকালে সেই চিন্তা বা সেই ভাবই তার মনে উদিত হয়। মনের ভাব গুণের উপর নির্ভর করে উদিত হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে চিত্তে বিভিন্ন গুণের ক্রিয়াজাত ভাব অনুসারেই জীবের পারলৌকিক গতি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তাই গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ভগবানকে সকল সময় স্মরণ করা উচিত, তবেই মৃত্যুকালে ভগবানের নাম ও স্বরূপের চিন্তা মনে উদয় হয়।

কর্ম অনুসারে মানুষের উর্দ্ধগতিও হতে পারে, আবার নিম্নগতিও হতে পারে। যদি কোনও মানুষের কর্ম এমন হয় যে তার সুপ্ত বাসনাগুলির প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির জন্য পশু বা তার চেও হীন কোন শরীরের দরকার, তাহলে তার মনুষ্যেতর প্রাণী হয়ে জন্মানো কেউই ঠেকাতে পারবে না। ক্রমশ নিম্নস্তরের চিন্তাধারা থেকে মানুষ উচ্চতর চিন্তাধারায় উঠে এসেছে। ফলে এ জন্মে যদি ভালো আচরণ না করে, পশুর মতো আচরণ করে, তবে তাকে পশু শরীর ধারণ করতেই হবে। এই জন্মে গুণের প্রকৃতিই আমার ভবিষ্যৎ জন্মটি নির্ধারণ করে দেয়। অতএব আমরা যেমন বীজ পুঁতবো, তেমনি ফসল পাব। আমি যদি সত্ত্বগুণ প্রকাশ করার চেষ্টা করি, সৎ চিন্তা করে কাজ করি, মানুষকে সাহায্য করি, সেবা করি, তবে পরজীবন অবশ্যই অনেক ভাল ও সুন্দর হবে। যদি এ জীবনে লোককে কষ্ট, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি মন্দ কাজে লিপ্ত থাকি, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমার নিকৃষ্ট জীবন হবে। আমার অতীত কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা অনুসারে গুণপ্রকৃতি আমাকে এই দেহ, এই মন ও এই পরিবেশ দিয়েছে। অতএব আমরা দৈনন্দিন জীবনে যদি সৎ জীবন যাপন করি ও সৎ কর্ম করি, তবে আমাদের জীবন ক্রমশ উন্নত হতে থাকবে। অতএব মনে রাখতে হবে আমাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুসারে আমাদের পরবর্তী জীবনের গতিপ্রকৃতি নিধারিত হবে।

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম ।।১৬

সুকৃতস্য (পুণ্য) কর্মণঃ (কর্মের) নির্মলং (নির্মল) সাত্ত্বিকং (সুখময়) ফলম্ (ফল) আহুঃ (জ্ঞানিগণ বলেন) রজসঃ তু (রাজসিক কর্মের) ফলম্ (ফল) দুঃখং (দুঃখ) তমসঃ (তামসিক কর্মের) ফলম্ (ফল) অজ্ঞানম্ (মূঢ়তা) ।।১৬

জ্ঞানিগণ বলেন—সাত্ত্বিক পুণ্যকর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান বা মূঢ়তা।

তত্ত্বদর্শীগণ গুণজাত কর্মের ফল বর্ণনা করেছেন। সত্ত্বগুণের প্রভাবে জীব কেবল সাত্ত্বিক কর্ম করেন। এই কর্মকে পুণ্য বা সুকৃত কর্ম বলা হয়ে থাকে। এই সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ। শান্তি ও প্রসন্নতাই এই সুখের ভিত্তি।

রাজসিক কর্মে চিত্তে কামনাবাসনা সংকল্প উদ্ভব হয়। যতই ভোগ হোক না কেন, ভোগের তৃষ্ণা বাড়তে থাকে এবং তার জন্য চিত্তে প্রবল দুঃখবোধ। তাছাড়া ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের পরিণামস্বরূপ দেহেন্দ্রিয় ও মনের অবসাদ ও দুঃখকর হয়। রাজসিক কর্মে সুখ অল্প কিন্তু দুঃখ অধিক।

তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা। বুদ্ধিতে জড় ভাব। পাশবিক প্রবৃত্তির প্রভাবে কর্ম তাই তামস কর্ম। এই কর্মে চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হয়, অজ্ঞানতায় ঢেকে যায় এবং বুদ্ধি অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। অতএব তমোগুণে জীব প্রবল দুঃখই ভোগ করে থাকে। তামসিক কর্মের ফল চরম অজ্ঞানতা।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ।।১৭

সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হতে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) রজসঃ (রজোগুণ হতে) লোভঃ এব (লোভই জন্মে) তমসঃ চ (এবং তমোগুণ হতে) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) প্রমাদ-মোহৌ এব চ (এবং অনবধানতা ও মূঢ়তাই) ভবতঃ (জন্মে) ।।১৭

সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; রজোগুণ হতে লোভ এবং তমোগুণ হতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সত্ত্বগুণ যতই বর্ধিত হয় ততই চিত্তে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হতে থাকে। তাই সত্ত্বগুণকে জ্ঞানের উৎপাদক বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদিরূপ জ্ঞান আরোহনকালে চিত্তে পরম সুখযুক্ত দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে। সত্ত্বগুণ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করে।

রজোগুণ হতে লোভের উৎপত্তি হয়। রজোগুণ চিত্তের কামনাবাসনা জাগিয়ে বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা লোভ বৃদ্ধি করে। লোভ ও আসক্তি চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত এবং

আচ্ছন্ন করে রাখে বলে, বিষয়াসক্ত চিত্তে সহজে আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। দিন দিন কর্মের তৃষ্ণা ও আসক্তি বাড়তে থাকে।

তমোগুণ হতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে অজ্ঞান ও ভ্রান্তি উৎপাদন করে। অজ্ঞান তথা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন বুদ্ধিকে অবিবেক বলা হয় যা আত্মজ্ঞানের বিরোধী। প্রমাদ ও মোহ অবিবেকী ব্যক্তির মনের দুর্গতির চরম অবস্থা।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ।।১৮

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) ঊর্ধ্বং (ঊর্ধ্বে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন), রাজসাঃ (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি (মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে থাকেন), জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণবৃত্তিসম্পন্ন) তামসাঃ (তমোগুণবিশিষ্ট লোকেরা) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পশ্বাদিযোনি-প্রাপ্ত হয়) ।।১৮

সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বলোকে অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে গমন করেন। রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন এবং প্রমাদ-মোহাদি নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয়, অর্থাৎ নরক বা পশু-আদি যোনি প্রাপ্ত হয়।

তিনগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনুষ্য জীবনের গতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। যাঁরা জীবনে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকেন অর্থাৎ যাঁরা সাত্ত্বিক প্রকৃতির অধিকারী তাঁরা মৃত্যুর পর সুখপ্রদ স্বর্গাদি ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন। রজোগুণে স্থিত লোকেরা মনুষ্যলোকে এবং তমোগুণে প্রতিষ্ঠিত লোকেরা নিম্নলোকে অর্থাৎ পশু-আদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

এখানে পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে যে, সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিদের মন সর্বদা ঊর্ধ্বগতি হয়ে থাকে। নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে অগ্রসর হয় এবং নিষ্কাম পুণ্য কর্মের দ্বারা স্বর্গাদি, দেবলোক কিংবা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যেতে পারেন। ক্রমশ আত্মজ্ঞানের বা মোক্ষের পথে অগ্রসর হয়। রজোগুণে মনের অবস্থা কর্মের আসক্তি, রাগ-দ্বেষ, লোভ তৃষ্ণাকুল দুঃখের ভোগে ডুবে থাকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে মধ্য অবস্থায় থাকে। মনের গতি কখনও নিষ্কাম কর্মে ঊর্ধ্বদিকে, কখনও সকাম কর্মে নিম্নদিকে। কিন্তু তমোগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মন সর্বদা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে অধঃপতিত হীন জন্ম লাভ করে।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ।।১৯

যদা (যখন) দ্রষ্টা (পুরুষ অর্থাৎ জীব) গুণেভ্যঃ (গুণত্রয় হতে) অন্যং (অপর)

কর্তারং (কর্তাকে) ন অনুপশ্যতি (দেখেন না বা বোধ করেন না) গুণেভ্যঃ চ পরং (এবং গুণসমূহের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানেন) (তদা-তখন) সঃ (সেই জীব বা পুরুষ) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ।।১৯

যখন তত্ত্বদর্শী পুরুষ, সত্ত্বাদি-তিনগুণ ব্যতীত অন্য কাউকেও কর্তারূপে দেখেন না অর্থাৎ প্রকৃতিই সকল কর্ম করছেন, আত্মা নিষ্ক্রিয়—অর্থাৎ আত্মাকে গুণাতীত নির্লিপ্ত বলে বুঝতে পারেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ—অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করে থাকেন।

'যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি'—তত্ত্বদর্শী দেখেন, ভিতরে ও বাইরে যা কিছু ঘটে চলেছে, তার একমাত্র কারণ এই তিনটি গুণ। 'নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারম'—গুণগুলির কর্তা আত্মা নন। আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নিত্যমুক্ত ও নিত্যশুদ্ধ। আত্মা কর্মের কর্তা নয়, প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী এবং দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু মানুষ অজ্ঞানবশত দেহে আত্মাভিমান করে আপনাকেই সকল কর্মের কর্তা ও ভোক্তা মনে করেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কর্ম এই তিনগুণের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। অতএব গুণগুলিই কর্তা। আত্মা কর্তা নন—এই সত্য একমাত্র আত্মজ্ঞান হলেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব। আমার দ্বারা যত কর্ম হচ্ছে প্রকৃতির তিন গুণ ব্যতীত উহাদের অন্য কর্তা নেই।

'গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি'—যিনি গুণের অতীত তাঁকে জানেন, অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করেন, তিনি 'মদ্ভাবং সঃ অধিগচ্ছতি'—তিনি আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। তিনি ঈশ্বর বা পরম তত্ত্বের স্বরূপ লাভ করেন। আধ্যাত্মিক এই অবস্থাকে মোক্ষ বলা হয় অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন। এই অবস্থা লাভই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।।২০

দেহী (দেহধারী জীব) দেহ-সমুদ্ভবান্ (দেহ-উৎপত্তির বীজ বা কারণস্বরূপ) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণ) অতীত্য (অতিক্রম করে) জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হতে) বিমুক্তঃ (সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে) অমৃতম্ (অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করেন) ।।২০

জীব দেহোৎপত্তির কারণভূত এই অবিদ্যাময় গুণত্রয় অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হতে চিরমুক্ত হয়ে অমরত্ব বা মোক্ষলাভ করেন।

গুণত্রয় হলো জন্ম-মরণের হেতু। যিনি এই গুণত্রয় অতিক্রম করতে পারেন, তাঁকে জন্ম-মৃত্যু বশীভূত করতে পারে না। অতএব আমাদের সাধনা গুণসঙ্গবর্জিত হওয়া। গুণসঙ্গ ত্যাগ করতে পারলে জীব এই দেহেই পরমানন্দরূপ অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

তিনগুণের সমবায়েই এই জীবদেহের উদ্ভব হয়ে থাকে। এরা দেহের উৎপাদক বলে

দেহমধ্যস্থ দেহীকে অর্থাৎ আত্মাকে যেন বন্ধন করে। কিন্তু মানুষ যখন আত্মজ্ঞান লাভ করে তখন এই তিন গুণের বন্ধনকে অতিক্রম করে। তখন সে জন্মজরামৃত্যুজনিত দুঃখ হতেও মুক্ত। জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম, এরা আত্মার ধর্ম নয়। কাজেই এরা দেহ ছাড়া আত্মাকে কোন প্রকারে পীড়িত করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু জীব অজ্ঞানবশত দেহে আত্মাভিমান করে 'আমি জন্মজরামৃত্যুর অধীন', 'আমি দুঃখী' এইরূপ মনে করে দুঃখ ভোগ করে থাকে। বাস্তবিক আমরা সর্বদা মুক্ত কিন্তু অবিদ্যাবশত আমরা প্রকৃতির জালে পড়ি। তারপর আবার এই জাল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করি। যদি এই মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাই, একদিন না একদিন আমরা সফল হবই হব, কারণ মুক্তি আমাদের সকলের প্রকৃত স্বরূপ।

অতএব মানুষ যখন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখন সে বুঝতে পারে আত্মা স্বরূপত অব্যয়, নির্বিকার। দেহের ধর্ম—জন্মজরামৃত্যু আত্মাকে স্পর্শও করতে পারে না। দেহের জন্ম হয়, দেহের জরা হয় এবং দেহেরই মৃত্যু হয়। আত্মার জন্ম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই। এই উপলব্ধি করে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। এই অবস্থাই মোক্ষ এবং জীবন্মুক্তি।

অর্জুন উবাচ
কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে।।২১

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বললেন)—প্রভো (হে প্রভু, হে কৃষ্ণ), কৈঃ (কী কী) লিঙ্গৈঃ (লক্ষণের দ্বারা জীব) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিনটি) গুণান্ (গুণকে) অতীতঃ (অতিক্রম করেন অর্থাৎ তা থেকে মুক্ত) ভবতি (হন), কিম্-আচারঃ (কিরূপ আচারযুক্ত হন) কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন)।।২১

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভো, গুণাতীতের লক্ষণ কী? তাঁর আচার-ব্যবহারাদি কিরূপ? এবং গুণাতীত অবস্থা লাভের উপায় কি?

অর্জুন তিনটি প্রশ্ন করলেন ভগবানকে। হে প্রভু, আমরা কী করে বুঝতে পারি যে, কোন ব্যক্তি তিন গুণের পারে গেছেন? অনুগ্রহ করে বলুন গুণাতীতের লক্ষণ কী? তাঁরা কিভাবে আচরণ করেন বা কিভাবে ব্যবহার করেন? বাইরে দেখে তাঁদের আচার আচরণ কিভাবে বুঝব? কী উপায়ে তিনি তিনগুণকে অতিক্রম করেন? অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থা লাভের উপায় কী?

এখানে প্রশ্ন গুণাতীত ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ লক্ষণ কী, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান কীভাবে করেন বা বাইরের লোকের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করেন, গুণাতীত হবার হবার উপায়

কী? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

শ্রীভগবানুবাচ
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বললেন) পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র) প্রকাশম্ (সত্ত্বগুণের ধর্ম প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিম্ চ (এবং রজোগুণের ধর্ম কর্মপ্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (প্রবৃত্ত হলে অর্থাৎ উপস্থিত হলে) (যঃ যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি চ (এবং তার নিবৃত্তি হলেও) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না)।।২২

শ্রীভগবান বললেন—হে পাণ্ডব, সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম কর্ম-প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ। এই সকল গুণধর্ম উদিত হলেও যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল কার্য নিবৃত্ত হলেও যিনি সুখবুদ্ধিতে তা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত।

সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের কার্য মোহ—এই সব গুণপ্রবৃত্তি আবির্ভূত হলেও দুঃখকে তিনি দ্বেষ বা করেন না, অথবা সুখ লাভের অনুকূল হলেও সেই অবস্থা আকাঙ্ক্ষা করেন না। অর্থাৎ যিনি গুণক্রিয়াসমূহকে স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা ঘটনাবলীর ন্যায় মিথ্যা বলে জানেন—তিনিই গুণাতীত। তবে গুণাতীত পুরুষের এ লক্ষণ অন্তঃকরণের। তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারেন না। এই লক্ষণকে স্বার্থ লক্ষণ বা স্বসংবেদ্য বলে। এবং যে লক্ষণ দেখে অন্যে বুঝতে পারে তাকে পরার্থ লক্ষণ বা পরসংবেদ্য বলা হয়ে থাকে। গুণাতীত ব্যক্তি প্রকৃতির কার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন বলে প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারে রাগদ্বেষশূন্য হয়ে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন।

এখানে উদাসীন বলতে গুণাতীত ব্যক্তিকে শুষ্ক হৃদয়ের মানুষ বলা হচ্ছে না। উচ্চ অবস্থায় গুণ-এর ক্রিয়া জাত সুখ ও দুঃখের আসা যাওয়া তাঁর মনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না এবং তিনিও ঐ বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু তাঁর বিবেক ও হৃদয়ের প্রসারতা আরও গভীর হয়। তিনি গভীর হৃদয়বান ব্যক্তি হন যিনি অপরের দুঃখে দুঃখী এবং অপরের সুখে সুখী। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—যে ভগবান বিধবার চোখে অশ্রু মোছাতে পারে না আমি সেই ভগবান মানি না। অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ বা গুণাতীত অবস্থায় সেই ব্যক্তি যেমন আত্মজ্ঞান লাভ করেন তেমন তাঁর হৃদয় প্রসারিত হয়। তিনি জগতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। জগতে সকলকে আপনার করে নেন এবং এক বলে অনুভব করেন। অর্জুন সেই গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হয়েই যুদ্ধ করেছিলেন।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ।।২৩

যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের মতো) আসীনঃ (অবস্থিত হয়ে) গুণৈঃ (তিন গুণের দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)[তিনি] গুণাঃ (গুণসমূহ) বর্তন্তে (স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত) ইতি এবম্ (এরূপে জেনে) অবতিষ্ঠতে (অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না)—তিনিই গুণাতীত বলে উক্ত হন ।।২৩

গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিস্বরূপ অবস্থান করেন, তিন গুণের কার্য সুখদুঃখাদিতে তিনি বিচলিত হন না, গুণগুলি নিজের নিজের কার্যে প্রবৃত্ত—এই জ্ঞানে তিনি অবিচলিত থাকেন এবং আত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত থাকেন। গুণত্রয়ের সম্বন্ধে এবং তাদের কাজকর্মে তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। এখানে মন এক উচ্চ ভাবে অবস্থান করে, এক উচ্চ মূল্যবোধ গড়ে উঠে। অন্তরে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পায়। যে শক্তির দ্বারা ঐ ব্যক্তির মন দৃঢ় হয় এবং সকল পরিস্থিতিতে নির্লিপ্ত ও অবিচলিত থাকে। বেদান্তের একটাই বাণী—তুমি শক্তিমান হও, নির্ভীক হও। বিবেকানন্দ বলছেন, বজ্রের মতো মনকে দৃঢ় কর। এসবের মূলে তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে জানলেন ভয় জয় করতে পারবে। তখন তিনি 'গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে'--তিন গুণের কার্যকলাপ দেখে কখনও বিচলিত হন না। জগৎটাকে তিন গুণের খেলা হিসাবে দেখেন। গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই জগৎটা চলছে।

'যোঽবতিষ্ঠতি'—তাঁরা এই প্রত্যয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি মনে করেন গুণের কার্য হচ্ছে হোক, তাতে আমার কী? আমি দেহ নই, আমি আত্মা, আমি নির্বিকার, আমি গুণাতীত। তিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রকৃতির কোন কার্যকলাপে তিনি চঞ্চল হন না। তিনি অন্তরে এক গভীর শান্তি ও একত্ব অনুভব করেন। একেই বলে দৃঢ় চরিত্রশক্তি। বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণী বলছেন—তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, তোমাকেই বিকশিত করতে হবে। ওঠ, জাগো এবং প্রাপ্য বস্তু লাভের লক্ষ্যে এগিয়ে যাও, কখনও থেমো না।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ।।২৪

(যঃ-যিনি) সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞান) স্ব-স্থঃ (স্ব স্বরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিত) সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন) তুল্য-প্রিয়-অপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান) ধীরঃ (ধীর বা ধীমান) তুল্য-নিন্দা আত্ম-সংস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় সমবুদ্ধি)—তিনিই গুণাতীত বলে কথিত হন ।।২৪

যাঁর সুখে ও দুঃখে সমজ্ঞান, যিনি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁর সমদৃষ্টি, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়কে তুল্যজ্ঞান করেন, নিন্দা ও প্রশংসায় যিনি সমবুদ্ধি,

সেই ধীর বা ধীমান ব্যক্তিকেই গুণাতীত বলা হয়।

গুণাতীত ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে অনাত্মস্বরূপ অন্তঃকরণের গুণের ধর্ম জেনে তাতে উৎফুল্ল বা হতাশ হন না, অর্থাৎ উভয়কে স্বপ্নবৎ মিথ্যাবোধে উপেক্ষা করেন। বস্তুত তিনি স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিত্য অবস্থান করেন ফলে তাঁর একবুদ্ধি বা সমবুদ্ধি। তাঁর মধ্যে সুখদুঃখরূপ বৈষম্যবুদ্ধির উদয় হয় না। তাঁর লোভ ও ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা না হওয়ায় তাঁর মধ্যে মৃত্তিকা, প্রস্তর কিংবা সোনার বস্তুর মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় নিজ হিত ও অহিত দৃষ্টি লোপ পায়। হিতকারী ব্যক্তিকে প্রিয় দেখা এবং অহিতকারী ব্যক্তিকে অপ্রিয় দেখা—এই বৈষম্য বুদ্ধি তাঁর নাশ হয়। তিনি সর্বত্র আত্মা দর্শন করেন তাই গুণ ও দোষের স্তুতি-নিন্দা তাঁকে স্পর্শ করে না। সাধারণ মানুষ সিনেমার মিথ্যা দৃশ্য দেখে আনন্দ বা শোক প্রকাশ করেন কিন্তু এই ব্যক্তির মন এমন এক উচ্চ অবস্থায় অবস্থান করে, তাঁর নিজের সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়বোধ, মিথ্যা স্বপ্নবৎ মনে হয়—তিনিই গুণাতীত ব্যক্তি। এইরূপ গুণাতীত পুরুষ সর্বদাই আত্মানন্দ পূর্ণ, একরস-বিদ্যমান এবং সমদর্শীরূপে বিরাজ করেন।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।।২৫

(যঃ-যিনি) মান-অপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) তুল্যঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন) মিত্র-অরি-পক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (সমজ্ঞানসম্পন্ন—অর্থাৎ অনুগ্রহ নিগ্রহশূন্য) সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী (সর্বপ্রকার উদ্যমশূন্য) সঃ (তিনি) গুণ-অতীতঃ (ত্রিগুণাতীত) উচ্যতে (কথিত হন) ।।২৫

মানে ও অপমানে এবং শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষে যাঁর সমবোধ, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা করে কোন কর্ম করেন না, তিনি গুণাতীত বলে অভিহিত হন।

যিনি সম্মানলাভ করলেও হৃষ্ট হন না এবং অপমানিত হলেও ক্ষুব্ধ হন না। কেউ সম্মান প্রদর্শন করলে তাতে তিনি উৎফুল্ল হন না, আবার কেউ অপমান করলেও তাতে দুঃখবোধ করেন না। যিনি প্রশংসা ও তিরস্কারে, আদরে ও অনাদরে, হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হন না। তিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান আচরণ করেন। উভয়ের প্রতি উদাসীন। মিত্রকেও অনুগ্রহ বা আদর করেন না, শত্রুকেও নিগ্রহ বা দ্বেষ করেন না। ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হন না। এই কর্ম করলে এই ফললাভ হবে—এই প্রকারের চিন্তা দ্বারা তাঁকে কোন লৌকিক বা বৈদিক কোন কর্মেই প্রবৃত্ত করে না। সকাম কর্ম করার উন্মাদনা তিনি পরিহার করেছেন। সকল অবস্থায় তিনি যথাপ্রাপ্ত কর্ম নিষ্কামভাবে করে যান। অবশ্য সেই কাজ তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে করে থাকেন। শারীর যাত্রার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত চাহিদা তাঁর কিছুই থাকে না। আত্মকাম ব্যক্তি যে কাজ করেন তা

কেবল জগতের মঙ্গল কর্ম। বাস্তবিক গুণাতীত ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ হন। তাঁরা জীবিত অবস্থায় মুক্তি লাভ করে অবস্থান করেন। শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেন সকলেই এই গুণাতীত অবস্থা লাভ করতে পারেন। সকলের মধ্যেই এই সম্ভাবনা আছে। মানব জীবনের লক্ষ্যই এই মুক্তিলাভ করা।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬

যঃ চ (এবং যিনি) মাম্ (আমাকে অর্থাৎ সর্বভূতস্থ ঈশ্বরকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগ-সহকারে) সেবতে (সেবা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ (এই) গুণান্ (গুণসকলকে) সমতীত্য (সর্বতোভাবে অতিক্রম করে) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাব-লাভে) কল্পতে (সমর্থ হন)।।২৬

যিনি একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক ভক্তি সহায়ে আমার অর্থাৎ সর্বভূতস্থ পরমেশ্বরের সেবা করেন, তিনি এই তিনগুণকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করে ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন।

অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল—কী উপায়ে গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়? ভগবান তার উত্তরে বলছেন—আমাকে যিনি ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা সেবা করেন, অর্থাৎ সর্ব-অন্তর্যামী ভগবানকে অকপট ভক্তিসহ ভজনা করেন, যিনি তৈলধারা ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমভক্তি দ্বারা ভগবৎ ভজনা ও সেবা করে থাকেন সেই ব্যক্তি গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মভাবের যোগ্য হন। যাঁরা জ্ঞানযোগী তাঁরাও আত্মা ও অনাত্মার বিচার পূর্বক আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করে গুণাতীত ব্রহ্মভাব অবস্থা প্রাপ্ত হন। জ্ঞানযোগে এই অবস্থাকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়েছে। যদিও পূর্বে জ্ঞানপথে গুণাতীত ব্রাহ্মীস্থিতি অবস্থা প্রাপ্তির জন্য তাঁকে বহু ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ভক্তিযোগ সহজ এবং সকলের পক্ষে সুলভ পথ। তাই ভগবান বলছেন, ঐকান্তিক অনন্যা ভক্তির সহিত পুরুষোত্তমের সেবা ও ভজনা করলে তাঁকে সহজে লাভ করা যায়। ভগবান ভক্তের চিত্তে জ্ঞানের আলোক জ্বেলে ভক্তকে সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করেন, তিন গুণের খেলা থেকে মুক্ত করে দেন। 'স এতান্ গুণান্ সমতীত্য'—তিনি এইসকল গুণ সম্যকভাবে অতিক্রম করতে সফল হন। 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে'—ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নত্ব লাভ করতে সামর্থ্য অর্জন করেন। পরম সত্য ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭

হি (যেহেতু) অহম্ (আমি-শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (স্থিতি বা আশ্রয়) অব্যয়স্য (নিত্য) অমৃতস্য (মোক্ষের প্রতিষ্ঠা) শাশ্বতস্য (চিরন্তন) ধর্মস্য চ (ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা) ঐকান্তিকস্য চ (অব্যভিচারী) সুখস্য (সুখের প্রতিষ্ঠা) (অথবা আমি অব্যয় অমৃতস্বরূপ

ব্রহ্মের আশ্রয়স্থান)।।২৭

যেহেতু আমিই (শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব) অব্যয়, অবিনাশী, অমৃতত্ব ব্রহ্মের এবং শাশ্বত সনাতন ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ, সেহেতু, আমার ভক্তদের মদ্ভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

আমি শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ, শাশ্বত ও ধর্মস্বরূপ, আমি অব্যভিচারি-সুখস্বরূপ ব্রহ্ম—অতএব আমাকে ঐকান্তিক ভক্তি ও সেবা করলে জীবের মুক্তিলাভ সহজ ও নিশ্চিত হয়ে থাকে। ভগবান তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে ও পরিস্কার করে বলছেন, বাসুদেব স্বয়ং ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, 'তৎ' পদবাচ্য ব্রহ্ম বিনাশবর্জিত, তিনি অব্যয়, তিনি শাশ্বত, তিনি নির্বিকার, তিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ ও তিনিই সৎ-চিদ্-আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মা সেই বাসুদেব ভগবানকে স্তুতি করে বলছেন—'একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।।'—হে ভগবন্। তুমি সর্বত্র একস্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মাস্বরূপ, সর্ব শরীরে তুমিই স্থিতিরূপে রয়েছ, তুমি নিত্যকাল বিদ্যমান, তুমি সত্যস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ, তুমি অন্তবিবর্জিত, তুমি আদ্য, নিত্য, অক্ষর, সর্বব্যাপক, অজ্ঞানাঞ্জনরহিত, তুমি সর্বত্র পরিপূর্ণ, অদ্বয় ও উপাধিবিহীন এবং তুমি অমৃতস্বরূপ। ভগবান বাসুদেবই পরমব্রহ্মস্বরূপ। সেই বাসুদেবকে যে ভাবে হোক, অব্যভিচারিণী ভক্তি সহ সেবা করলে জীবের মুক্তি হয়ে থাকে।

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্'—ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় তিনি। এ-কথার অর্থ অন্যরূপেও বলা যায় যে, ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য বেদ। আমি বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করে। অতএব এই বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, 'শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য'—শাশ্বত সনাতন ধর্মেরও তিনি ভিত্তিস্বরূপ। অতএব ভগবান বাসুদেবে যাঁর অব্যভিচারিণী ভক্তি, তিনি নিশ্চয়ই পরমধাম প্রাপ্ত হবেন।

ব্রহ্মকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—নির্গুণ এবং সগুণ। তিনি যখন নাম ও রূপের সঙ্গে সংযুক্ত, তখন তা সগুণ। যখন তিনি নাম ও রূপের বাইরে তখন তিনি নির্গুণ। তিনি সসীম আবার তিনি অসীম। অতএব পরমেশ্বর উভয় অর্থাৎ তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তিনি সাকার, তিনি নিরাকার আবার তিনি সাকার-নিরাকারের পার। তত্ত্বদর্শী গুণাতীত ব্যক্তি উভয় ভাবই উপলব্ধি করেন।

সনাতন ধর্ম হল সত্যকে উপলব্ধি করা। সনাতন ধর্ম প্রমাণ করে সত্য এক এবং অদ্বিতীয়, সত্য চিরন্তন, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়—সত্যকে জানাই এই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য, শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করে বলেই ইহা সনাতন ধর্ম। সেই এক সত্যকে ঋষিরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন, তাই সত্যে পৌঁছানোর নানা পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—যত মত তত পথ। পথ বহু কিন্তু সত্য এক।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

মানুষের স্বরূপ হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তিন গুণের ক্রিয়ায় এই জগতের সকল কর্ম ঘটছে। যিনি এই তিনগুণের দ্বারা বিচলিত হন না, উদাসীনবৎ অবস্থান করেন এবং জগতের যাবতীয় কর্তা, কর্ম, ভোগ্য, ভোগ প্রভৃতি যে তিন গুণেরই ঘাত-প্রতিঘাত—এইটি জেনে তিনি অবিচলিত থাকেন, তিনিই গুণাতীত ব্যক্তি। ত্রিগুণাতীত অবস্থায় তিনি সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টি দেখেন—সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, শত্রু-মিত্র, মাটি-পাথর-কাঞ্চন—যাবতীয় ভেদের ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন। ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা ও সেবায় তিনগুণকে অতিক্রম করে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, ঈশ্বরের মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই তিন গুণই ডাকাত (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক), জীবের সর্বস্ব হরণ করে স্বস্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। ...এই জগতে বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে। জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কাম-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে, ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভালমন্দ প্রকৃতির খেলা জীবের পক্ষে, সৎ ও অসৎ জীবের পক্ষে, ব্রহ্মের ওতে কিছু হয় না। তাই ঈশ্বরকে জেনে সংসার করলে জগৎ আর অনিত্য নয়। যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে দেখে জীব-জগৎ সবই তিনি হয়েছেন। সংসারেই ঈশ্বরলাভ হয়, যেমন জনক রাজার হয়েছিল। রাজর্ষি জনক ধর্মে নিপুণ এবং মোক্ষশাস্ত্রে বিশারদ। অতএব ঈশ্বরকে জেনে অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি লাভ করে সংসারে অবস্থান করা—সেটাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—সংসারে এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। ঈশ্বরে মন রেখে যথাযথভাবে সবকিছু করে যাওয়া।

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করে বলছেন—পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম ও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এক, ভিন্ন নয়। তিনি অব্যয় অর্থাৎ তাঁর শেষ নেই। তিনি অমৃতত্ত্ব অর্থাৎ তাঁর স্বরূপই মোক্ষ এবং অমৃতত্ব। তিনি স্বয়ং সনাতন ধর্ম। অতএব তাঁর স্বরূপ লাভই চরম সুখপ্রাপ্তি। পরমতত্ত্ব সগুণ নির্গুণ উভয়ই। অতএব যাঁরা শ্রীভগবানের পরমতত্ত্ব সগুণ রূপে আকৃষ্ট হন তাঁরাও সেই পরম তত্ত্বকেই লাভ করেন। আবার যাঁরা নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা করেন তাঁরাও সেই পরমতত্ত্ব ভগবানকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

এই অধ্যায়ের নাম 'পুরুষোত্তমযোগ'। সমগ্র গীতাশাস্ত্রের যা অর্থ, তাই এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র বেদের যা প্রতিপাদ্য- বিষয় তাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। ভগবান তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে অপূর্ব ভাষায় ব্যাখ্যা করছেন। একটি গাছের রূপকল্পনা দিয়ে ভগবান আমাদের বোঝাচ্ছেন—এই বিরাট বিশ্বকে এক মহাশক্তিধর অশ্বত্থবৃক্ষরূপে চিন্তা কর। পরব্রহ্ম তার মূল এবং এই সংসার তার শাখা। যিনি তাঁকে জানেন, তিনি বেদবিদ্ অর্থাৎ বেদজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ হন।

পুরুষোত্তমতত্ত্বই এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচনার বিষয়। শ্রীভগবান বলেছেন—আমিই ইহলোকে ও বেদে 'পুরুষোত্তম' এই নামে প্রখ্যাত হয়েছি। এই পুরুষোত্তমকে জানলে আর কিছুই জানবার অবশিষ্ট থাকে না। পুরুষোত্তমকে জানলেই জীব সর্ববিদ্ হয়ে যায়। তখন জীব বুঝতে পারে—তিনিই সগুণ, আবার তিনিই নির্গুণ; তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার।

ঈশ্বরই কৃপাপরবশ হয়ে জীবের পরিত্রাণের জন্য অবতাররূপে আবির্ভূত হন। এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব অতিগুহ্য এবং সেই পরমপুরুষের বিশেষ কৃপা ছাড়া এ-তত্ত্ব কেউ বুঝতে পারে না। শ্রীভগবান বলেছেন—জীব আমারই সনাতন অংশ। কর্মফলের দ্বারা সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে সুখদুঃখাদি ভোগ করে। তাই জড়, জীব চৈতন্য এবং এই দুই চৈতন্যের অতীত—উত্তম শুদ্ধচৈতন্য পরমাত্মার স্বরূপ ও তাঁর প্রকাশতত্ত্ব জানলেই জীব পরমপদ লাভ করে।

পুরুষোত্তমই সেই পরব্রহ্ম—পরমপুরুষ পূর্ণ, ভগবান। তিনিই সকল জীব- জগৎকে ধারণ করে আছেন। সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থেকে তাঁর কৃপা দ্বারাই জীব স্মৃতি ও জ্ঞান

লাভ করে। তাঁর দর্শনেই জীব চিরমুক্তি লাভ করে। সেই পুরুষোত্তমই সর্বনিয়ন্তা। তাই কঠোপনিষদ্ বলেছেন—'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'—তাঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, তাঁরই ভয়ে সূর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উত্তাপ দেয়, তাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যুও স্বকার্যে প্রবৃত্ত হয়। সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করে জীব চিরতরে নির্মোহ হয়ে পরমগতি লাভ করে। শ্রীভগবান কৃপাপরবশ হয়ে জীবের কল্যাণে আত্মস্বরূপ উদ্ঘাটিত করে বলেছেন—আমি সেই পুরুষোত্তম এবং এটি পরম গুহ্যতত্ত্ব। আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানলে জীব কৃতার্থ ও অভী হয়, সে চিরমুক্ত হয়ে যায়।

শ্রীভগবানুবাচ
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥১

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন) ঊর্ধ্বমূলম্ (ঊর্ধ্বদিকে যার মূল অর্থাৎ অব্যক্ত-মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম যার মূল) অধঃশাখম্ (নিম্নদিকে যার শাখা অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাদি যার শাখা) (সেই) অশ্বত্থং (সংসাররূপ অশ্বত্থ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী, মায়াময় বৃক্ষ) অব্যয়ম্ (প্রবাহরূপে অনাদি সংসার) প্রাহুঃ (বেদ- পুরাণাদি বলেন) ছন্দাংসি (বেদসমূহ, কর্মকাণ্ড) যস্য (যার) পর্ণানি (পত্রসমূহ) তং (তাকে অর্থাৎ এ-প্রকার অশ্বত্থকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদবেত্তা)॥১

শ্রীভগবান বললেন—শ্রুতিসমূহ ও পণ্ডিতগণ বলেন, এই সংসাররূপ মায়াময় অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে অবস্থিত অর্থাৎ অব্যক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং হিরণ্যগর্ভাদি শাখাসমূহ নিম্নদিকে প্রসারিত। এটি অব্যয়, অনাদি এবং বেদোক্ত-কর্মকাণ্ডসমূহ অশ্বত্থের পত্রসমূহ, যিনি সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের স্বরূপ অবগত আছেন, তিনিই বেদবিৎ বা বেদজ্ঞ।

এই শ্লোকের মূল ভাবটি—সৎ-চিদ্-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই ঊর্ধ্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঊর্ধ্বরূপ ব্রহ্মই সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান। সেই অব্যক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হতে কার্যরূপ উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি ব্যক্ত শাখা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। অশ্বত্থ অর্থাৎ যে বস্তু পরে থাকবে এরূপ বিশ্বাস হয় না, তাই অশ্বত্থ। ব্রহ্মই এই বৃক্ষের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, এইজন্য এটি 'ঊর্ধ্বমূল'। হিরণ্যগর্ভাদি কার্যকলাপ তার শাখা, তাই সেটি 'অধঃশাখ'। এই সংসাররূপ-বৃক্ষ অনাদি অনন্ত- প্রবাহ, তাই তা অব্যয়। ধর্ম-অধর্মের প্রতিপাদক কর্মকাণ্ডযুক্ত বেদ এই বৃক্ষের পত্র। জীবের লক্ষ্য ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হলে ঐ বৃক্ষের সব পত্র ঝরে পড়ে। কার্যরূপ শাখাগুলি শুষ্ক হয়ে যায়। মায়াযুক্ত বৃক্ষমূল উৎপাটিত হয় অর্থাৎ বন্ধন মুক্ত হয়। মায়াময় সংসারের এই নিগূঢ় তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা।

সহজভাবে মূলকথাটি হলো—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বৈরাগ্য একমাত্র কাম্য। বৈরাগ্য আসে

সংসারে অনাসক্তি ও নির্বাসনা অভ্যাস থেকে। যাতে আমাদের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় সেইজন্যে ভগবান, এই সংসাররূপ কার্যকে এক বৃক্ষ কল্পনা করে অত্যন্ত সহজ করে বর্ণনা করেছেন। সংসার-বন্ধন ছিন্ন হলে তবেই মুক্তি লাভ হয়। অতএব সংসারের প্রকৃত স্বরূপটি ভালভাবে না জানলে মনে বৈরাগ্য-অভ্যাস সম্ভব হয় না।

সংসারের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অশ্বত্থ-বৃক্ষের সঙ্গে সংসারের অনেক বিষয়ে সাম্য আছে। অশ্বত্থবৃক্ষের মূল যেমন দৃঢ়প্রোথিত, সংসারবৃক্ষের মূলও তেমনি দৃঢ়বদ্ধ, অশ্বত্থবৃক্ষ যেমন বহুমূল, বহুশাখা তেমনই তার মূল বহুদূর বিস্তৃত। অশ্বত্থবৃক্ষ যেমন অচিরস্থায়ী, সংসারও তেমনি পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই অশ্বত্থবৃক্ষের সঙ্গে সংসারবৃক্ষের বৈষম্য হচ্ছে—অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড ও প্রধান শাখা ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃত এবং প্রধান মূল নিম্নদিকে মৃত্তিকায় প্রোথিত; কিন্তু এখানে সংসারবৃক্ষ ঊর্ধ্বমূল এবং অধঃশাখ।

ঊর্ধ্বমূলম্—সংসারবৃক্ষ ঊর্ধ্বমূল। সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও বিস্তার ভিন্ন রকমের। যে মূলপ্রকৃতি হতে সংসাররূপ জগৎ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ আরম্ভ হয়, তার মূল ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই মূলপ্রকৃতি থেকে সৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ক্রমশ তা মহৎ (বুদ্ধি), অহংকার, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অধোমুখে বিস্তৃত হয়ে, স্থূল পঞ্চভূতের পরিণাম জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিই সংসারবৃক্ষের প্রধান শাখা ও প্রশাখাস্বরূপ। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ সর্বোচ্চ সত্তাস্বরূপ পরমপুরুষেই সংসারবৃক্ষের মূল নিবদ্ধ রয়েছে।

অধঃশাখম্—সংসারবৃক্ষের শাখাগুলি মূলপ্রকৃতি তে আবির্ভূত হয়ে নিম্নমুখে-মহৎ, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চভূতরূপে জগতে বিস্তৃত হয়েছে।

অব্যয়ম্—এই সংসারবৃক্ষের আদি নেই, অন্তও নেই। পরমেশ্বরের প্রকৃতি হতে জাত, অনাদিকাল প্রবৃত্ত এবং প্রবাহক্রমে নিত্য এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল হলেও এই সংসারবৃক্ষ অব্যয় ও চিরন্তন।

ছন্দাংসি যস্য পত্রাণি—বেদ অথবা বৈদিক কর্মকাণ্ড এই সংসারবৃক্ষের পত্র- স্বরূপ। পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষকে রক্ষা করে, সেরূপ বৈদিক কর্মসকলই এই সংসারকে রক্ষা করছে।

অতএব এই সংসারবৃক্ষের যথার্থ স্বরূপ যিনি জেনেছেন, তিনিই বেদের প্রকৃত বেত্তা এবং প্রকৃত তত্ত্বদর্শী পুরুষ। কঠোপনিষদও সংসারবৃক্ষের অনুরূপ বর্ণনা করছেন—'ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।' ঊর্ধ্ব মূল যার। অব্যক্ত প্রকৃতি হতে আরম্ভ করে স্থাবর বৃক্ষাদি পর্যন্ত যে-সংসারবৃক্ষ তার ঊর্ধ্ব-মূল অর্থাৎ ব্রহ্মই তার মূল বা আদিকারণ। যার শাখা অবাক্ অর্থাৎ অধোগামী (স্বর্গ, নরক, মনুষ্য, তির্যক্ ও প্রেতাদিরূপ শাখাসমূহ), অশ্বত্থঃ—যা শ্ব অর্থাৎ আগামীকাল থাকে না। সনাতনঃ—অনাদি, চিরপ্রবৃত্ত, প্রবাহক্রমে নিত্য।

বৃক্ষের মূল অদৃশ্য থাকলেও যেমন বৃক্ষ দেখেই ধারণা করা যায় যে, এর অবশ্য মূল

আছে, সেইরকম এই সংসার দেখেই ধারণা করা যায় যে, কোথাও এর মূল নিশ্চয়ই আছে। সেই শুদ্ধ, অমৃত, পরব্রহ্মই এই সংসারবৃক্ষের মূল। ব্রহ্ম হতেই জগতের উৎপত্তি। জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত লোক তাঁর আশ্রয়ে অবস্থিত। জগৎ প্রথমে অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে ব্রহ্মে নিহিত ছিল, পরে সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। শাখা প্রশাখা জীব ও জড় জগৎরূপে ক্রমশ নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হয়েছে। এই সংসার অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় অচিরস্থায়ী। এটি প্রবাহক্রমে নিত্য। নিয়ত পরিবর্তনশীল এই সংসারপ্রবাহ কবে আরম্ভ হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না, কবে শেষ হবে তাও অজ্ঞাত।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখাঃ
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ।।২

তস্য (তার অর্থাৎ সংসাররূপ অশ্বত্থের) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহের দ্বারা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট) শাখাঃ (শাখাসমূহ) অধঃ ঊর্ধ্বং চ (অধোদেশে ও ঊর্ধ্বদেশে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত) অধঃ চ (এবং নিম্নে) মনুষ্যলোকে (নরলোকে) কর্ম-অনুবন্ধীনি (ধর্মাধর্মরূপ কর্মের জনক) মূলানি (মূলসমূহ) অনুসন্ততানি (ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে) ।।২

এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসমূহ নিম্ন ও উর্দ্ধে বিস্তৃত। তিন গুণের দ্বারা বৃক্ষের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পুষ্ট হয়। শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট তার শাখাসকল। এই সংসারবৃক্ষের বাসনারূপ মূলসমূহ ধর্ম-অধর্মরূপ কর্মের অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কারণ এবং মনুষ্যলোকে ঊর্ধ্ব এবং অধোভাগে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে।

সংসাররূপ এই অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাগুলো উপরে এবং নীচে দুদিকেই বিস্তৃত। নীচের দিকে প্রসারিত শাখাগুলি এই পার্থিব জগতের প্রতীক এবং ঊর্ধ্বমুখী শাখাগুলি দিব্যলোকের প্রতীক। ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী উভয় শাখাগুলির একটি মূল থেকে এসেছে। সেই মূল ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চৈতন্য।

তিনগুণরূপ জলে সিক্ত হয়ে সংসারবৃক্ষ পুষ্ট ও বৃদ্ধি হচ্ছে। তম বা রজ গুণে আচ্ছন্ন হলে জীবসমূহের শাখা নিম্নদিকে প্রসারিত, আবার সৎকর্মগুণে জীবসমূহের শাখা ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত। এই সংসার বৃক্ষের শাখা উর্ধ্বে ব্রহ্মলোক ও নিম্নে মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ দেহাদি পর্যন্ত প্রসারিত। মানুষের মনের গতি উভয়দিকে—নিম্নমুখী হতে পারে আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। মন-বুদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী হলে মানুষ দেবতায় পরিণত হয়, জীবনমুক্ত অবস্থা লাভ করে। আবার মন-বুদ্ধি নিম্নমুখী হলে তা মানুষকে পশুতে পরিণত করতে পারে। এইজন্য বলা হচ্ছে শাখাসকল উর্ধ্ব ও অধোদিকে প্রসারিত।

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের ক্রিয়াদ্বারাই সংসারবৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পুষ্টি লাভ করে। বিশ্বের এই অনন্ত লীলা তিনগুণের কার্য। বিভিন্ন গুণের ক্রিয়াবশতই এই সংসারে বিবিধ কর্ম হয়ে থাকে। 'বিষয়প্রবালাঃ'—ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি পল্লবের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়রূপ মনোরম নূতন নূতন পল্লব স্ফুরিত হচ্ছে। ঐ সকল আপাতরমণীয় বিষয়ই মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে।

মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মের সত্তা এই বৃক্ষের প্রধান মূল হলেও বাসনাজাল এর অবান্তর মূল। বাসনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাগ-দ্বেষাদি বশতঃ জীব ধর্ম ও অধর্ম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই বাসনাসমূহই মানুষকে সংসারে দৃঢ় আবদ্ধ করে রাখে এবং এই বাসনা থেকে মনুষ্যলোকে বিবিধ কর্মের উদ্ভব হয়ে থাকে। তার ফলে কর্মফল ভোগের জন্য জীবের দেহাদির অনন্ত প্রবাহ চলতে থাকে। বাসনা জীবকে কর্মপ্রভাবে কখন ঊর্ধ্বদিকে স্বর্গাদি লোকে এবং বাসনা কখনো পাপকর্মের অনুষ্ঠান মানুষকে অধঃপতিত করে। এইজন্য বলা হয়েছে বাসনাত্মক মূলগুলি উর্ধ্ব ও অধোদিকে প্রসারিত। এই হলো প্রবল শক্তিশালী অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ বিশ্বের চিত্র।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ।।৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ।।৪

ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই অশ্বত্থ-বৃক্ষের) রূপম্ (স্বরূপ) তথা (ঐভাবে) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না) [অস্য = এর] ন অন্তঃ (অন্ত নয়) ন চ আদিঃ (আদি বা আরম্ভও নয়) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতিও নয়, অর্থাৎ এর অন্ত, আদি বা মধ্য এবং সম্যক্‌স্থিতি উপলব্ধ হয় না) এনং (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থম্ (সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থবৃক্ষকে) দৃঢ়েন (দৃঢ়) অসঙ্গ-শস্ত্রেণ (অনাসক্তি বা বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করে) ততঃ (তারপর) তৎ (সেই) পদং (ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করা কর্তব্য) যস্মিন্ (যে স্থানে) গতাঃ (গমন করলে) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন নিবর্তন্তি (প্রত্যাবর্তন করেন না) যতঃ (যে-স্থান হতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তন) প্রবৃত্তিঃ (সংসারগতি বা সংসারপ্রবাহ) প্রসৃতা (বিস্তৃত হয়েছে) তম্ এব চ (সেই-ই) আদ্যং (আদি) পুরুষং (পুরুষকে) প্রপদ্যে (আশ্রয়রূপে গ্রহণ করছি) ।।৩-৪

এখানে মনুষ্যলোকে এই সংসারবৃক্ষের প্রকৃত স্বরূপ (পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী) উপলব্ধ হয় না। এর অন্ত নেই, আদি নেই, স্থিতিও নেই। এই সুদৃঢ়মূল অশ্বত্থকে অসঙ্গ বা তীব্র বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করার পর সেই পরম পদ ব্রহ্মকে (বিষ্ণুকেও) অন্বেষণ করতে হয় বা জানতে হয়। সেই পদপ্রাপ্তি হলে আর এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে হয় না, অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। যাঁর দ্বারা এই সংসার-প্রবৃত্তির বিস্তারলাভ হয়েছে, 'আমি সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করেছি' বা তাঁর শরণাগত হয়েছি—এই প্রকার বুদ্ধিতে অন্বেষণ করতে হবে।

অবিদ্যার অনন্ত ধারার মূলভূমি সংসারপাশ হতে জীব কীরূপে নিস্তার পাবে, এখানে ভগবান সেকথাই বলছেন। সংসারবিমুগ্ধ জীবগণ অজ্ঞানতাবশত এই সংসাররূপ অশ্বত্থের রূপ, উৎপত্তি ও প্রকৃতির যথার্থ তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। কোথায় বা এর আরম্ভ, কোথায় বা সমাপ্তি, এবং কীরূপে এর স্থিতি তাও বোঝা যায় না। কারণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ মায়াদ্বারা মুগ্ধ, ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ। তাঁরা সেই পরমপদকে জানতেও চেষ্টা করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অগাধ মহাসাগরের গর্ভে মৎস্য যেমন সাগরের সীমা দেখতে পায় না, সেরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াতে বিমোহিত জীব যেদিকে দেখে সেই-দিকেই সংসার ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় না। সুতরাং এই আদি-অন্তহীন, অব্যয় পরমাত্মা হতে প্রসূত সংসারের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা বিষয়াসক্ত অজ্ঞান লোকেদের পক্ষে অসম্ভব। অধিকন্তু এই সংসারের রূপ এত অসংখ্য ও বিচিত্র যে, তা সম্যক উপলব্ধি করা সংসারীর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সংসারের প্রকৃত রূপ না জানলে তার বন্ধন হতে মুক্তিলাভও অসম্ভব। তাই মুমুক্ষু জীবের কর্তব্য কী তাই এখানে বলা হচ্ছে। যেমন, কোনও দৃঢ়মূল বৃক্ষকে ছেদন করতে হলে দৃঢ় শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ এই সংসারবৃক্ষকে ছেদন করতে হলে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র আবশ্যক। বিবেক-বিচার দ্বারা এই সংসারকে অনিত্য (যা দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে যায়) জেনে, বিষয়ভোগ-তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্বক তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারলেই—এই মিথ্যা সংসাররূপ বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হয় এবং সংসারবৃক্ষের অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমপদ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়ে থাকে।

সেইসঙ্গে ব্রহ্মপদের সারতত্ত্ব অবগত হয়ে অনন্যভক্তি-সহ অবিদ্যামায়া বিস্তারের মূল মুক্তিদাতা ভগবানের শরণাগত হয়ে পরমপদ অন্বেষণ করবেন। শ্রুতি বলছেন—'সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—সেই পরব্রহ্মকেই অন্বেষণ করবে এবং তাঁকে জানতে ইচ্ছা করবে। বৈরাগ্য জন্মালে মন ভগবানের দিকে যায়। তখন মনে হবে—ভগবানই একমাত্র সত্য, তাঁর থেকে এই সংসারপ্রবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে, তিনিই জীবের একমাত্র আশ্রয় ও গতি। 'আমি সেই আদিপুরুষকে আশ্রয় করছি, তিনি আমার একমাত্র শরণ বা আশ্রয়'—এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি করে, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে। সেই পরমব্রহ্ম সংসারে প্রবৃত্তিজ্ঞান বিস্তার

করেছেন, অজ্ঞানী জীব মাত্রই জালে বিজড়িত হয়ে জন্মজন্মান্তররূপ ক্লেশে আবদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু মুমুক্ষু জীব ব্রহ্মের বা বিষ্ণুর সেই পরমপদে শরণ নিলে, তাঁর ব্রহ্মপদ বা বিষ্ণুপদ লাভ হয়। মায়াজালে তাঁকে আর আবদ্ধ হতে হয় না, সংসারবন্ধন হতে মুক্তি নিশ্চিত। ভক্তির সঙ্গে ভগবানের শরণাগত হওয়াই সংসারবন্ধন হতে তাঁর মুক্তি পাবার সহজ উপায়।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

নির্মান-মোহাঃ (অহঙ্কার ও মোহবর্জিত) জিত-সঙ্গ-দোষাঃ (আসক্তিরূপ দোষ-রহিত) অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ (পরমাত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান) বিনিবৃত্তকামাঃ (কামনাবর্জিত) সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখ নামক) দ্বন্দ্বৈঃ (দ্বন্দ্ব হতে) বিমুক্তাঃ (মুক্ত) অমূঢ়াঃ (মোহশূন্য বিবেকবান ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং পদম্ (অব্যয় পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥

যাঁদের অভিমান ও মোহ দূর হয়েছে, যাঁরা সংসারে আসক্তি হতে মুক্ত, যাঁরা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাযুক্ত, বাসনাবর্জিত, সুখ ও দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে নির্মুক্ত, সেরূপ স্থির শান্ত অজ্ঞানশূন্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পরমপদ প্রাপ্ত হন।

যাঁরা সেই পরম পদ লাভ করেন তাঁরাই যোগী। যাঁরা নিরভিমান ও বিবেকী, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর আগমনে যাঁদের অনুরাগ বা বিরক্তি হয় না, যাঁরা মায়াতীত এবং পরব্রহ্মতত্ত্বের বিচার ও স্মরণ-মননে নিবিষ্ট, যাঁদের এই সংসারে বিষয়- ভোগে অভিলাষ নেই, সুখদুঃখের হেতু—শীত-উষ্ণ, ক্ষুৎ-পিপাসাদি দ্বন্দ্ব যাঁরা নিবারণ করতে পেরেছেন, তাঁরাই সম্যক আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

নির্মানমোহাঃ—অর্থাৎ যাঁদের চিত্ত হতে মান, অহঙ্কার, অভিমান, ঈর্ষা, মোহ, মিথ্যা আকর্ষণ, দ্বেষ প্রভৃতি ভাবসকল দূর হয়েছে। 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী'—ইত্যাদি আমিত্বের মান বা অহঙ্কার হতে যাঁরা মুক্ত হয়েছেন। দেহাভিমান—এই দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ই আমি এবং এই দেহে আমি ভোগ -সুখ চাই—এইরূপ মিথ্যা অভিনিবেশ বা মোহ হতে মুক্ত হয়েছেন।

জিতসঙ্গদোষাঃ—প্রিয় বস্তুর প্রতি আসক্তিরূপ দোষ যাঁরা জয় করেছেন অর্থাৎ যাঁদের চিত্ত এই দোষরহিত। আত্মীয়, গৃহ, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি ভোগাসক্তি যাঁদের মন থেকে দূর হয়েছে এবং যাঁদের চিত্ত সর্বদা ভগবদ্মুখী।

অধ্যাত্মনিত্যাঃ—তাঁরা পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনায় সর্বদা তৎপর। তাঁরা আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত সতত উৎসুক এবং সেই জ্ঞান অন্বেষণে ও সাধনায় নিযুক্ত।

বিনিবৃত্তকামাঃ—তাঁদের চিত্ত হতে কামনাবাসনা চিরতরে দূরীভূত হওয়ায় চিত্ত একান্ত নির্মল ও শান্ত হয়েছে।

সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ—সুখদুঃখ, প্রিয়াপ্রিয়, রাগদ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব তাঁদের চিত্ত হতে দূরীভূত হওয়াতে তাঁরা সর্ব অবস্থায় তাঁরা সম, শান্ত এবং নির্বিকার।

অমূঢ়াঃ—তাঁরা বিবেকবান, তাঁদের কোনওপ্রকার মোহ বা মিথ্যা অভিনিবেশ নেই।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।।৬

যৎ (যে পদ বা যাঁকে) গত্বা (লাভ করে) [যোগী] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করেন না) তৎ (তা অর্থাৎ সেই পদ) সূর্যঃ (দিবাকর) ন ভাসয়তে (প্রকাশ করতে পারে না) ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও না) ন পাবকঃ (অগ্নিও না) তৎ (তা) মম (আমার) পরমং (শ্রেষ্ঠ) ধাম (ব্রহ্মপদ, অর্থাৎ আমার পরমস্বরূপ) ।।৬

যে পরমপদপ্রাপ্ত হলে বা যাঁকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না; সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি যে পরমধামকে প্রকাশ করতে পারে না, তাই আমার পরম স্বরূপ।

মায়াতীত ব্রহ্মপদ লাভ করলে তিন গুণের আবেশ থেকে যোগী সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। সেইরকম গুণাতীত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পুনর্জন্ম হয় না। সেই পরম পদই ব্রহ্মের স্বরূপ। সেই চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে জড়পদার্থ চন্দ্র-সূর্যাদি প্রকাশ করতে পারে না। কঠোপনিষদ বলছেন—'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' (কঠ,-২-২-১৫) সেই পরব্রহ্মকে সূর্য, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করতে পারে না। অতএব অল্প প্রকাশযুক্ত অগ্নি কী করে তাঁকে প্রকাশ করবে? তাঁর প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। তাঁর দীপ্তিতেই জগৎ প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। সমস্তই জ্যোতিঃস্বরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হতে লব্ধ। কাজেই ব্রহ্মের জ্যোতি দ্বারা জ্যোতিষ্মান হয়ে নিজেদের আত্মভূত ব্রহ্মকে প্রকাশিত করতে পারে না। যিনি রূপ প্রভৃতি বিষয় বর্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য তাঁকে কীরূপে দেখতে পাবে? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রই বা তাঁকে কিরূপে প্রকাশ করবে? বস্তত তিনি বাঙ্‌মনশ্চক্ষুর অগোচর। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ আপনার তেজেই (জ্ঞানেই) আপনি প্রকাশিত। ভক্তের প্রতি দয়া করার জন্য তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখনই তাঁর দর্শন হয়। অন্যথা সহস্র উপায় করলেও তাঁর দর্শন লাভ হয় না।

ব্রহ্মস্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা হয়। ভেদবুদ্ধি বোধমাত্রই মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক। সেই পরমপদ প্রাপ্ত হলে কেউ আর সংসারে ফিরে আসে না অর্থাৎ তার পুনর্জন্ম হয় না। ভগবানের এই পরম স্থান যা এই জগতের অতীত, যা দেশ-কাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন—সেখানে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদির আলোকে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। চৈতন্যের রাজ্যে এই জড়বস্তুর প্রবেশাধিকার নেই। সেই চৈতন্যের জ্যোতিতে সকল জড়জ্যোতি প্রকাশিত। সুতরাং যিনি স্বয়ংপ্রকাশ এবং যাঁর জ্যোতিদ্বারাই সমস্ত জড়জগৎ প্রকাশিত হয় তাঁকে আবার প্রকাশ কে করবে?

বস্তুত জীব ব্রহ্ম হতে স্বরূপত অভিন্ন হলেও মায়ার পরিণামহেতু ব্যবধানবশত জীব নিজেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে থাকে, এবং পার্থক্যবোধ জন্যই জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখাদির ক্লেশ পেয়ে থাকে। ব্রহ্মপদ লাভের নিমিত্ত নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনার দ্বারা অন্তঃকরণের বিক্ষেপ নিবৃত্ত হলে ও বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধে, চিত্ত নির্মল শান্ত হলে জীবের স্বস্বরূপের জ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন হয়। অতএব অন্তঃকরণবৃত্তি নিরুদ্ধ হলেই ব্রহ্মস্বরূপে জীবের অভিন্নতা সিদ্ধ হয়ে থাকে। তখন ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ হতে জীবের পৃথক হবার আর কোনও উপাধি না থাকায় জীব ও ব্রহ্মরূপেই নিত্যস্থিতি লাভ করেন। জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। অতএব জীব ভক্তি-বৈরাগ্যাদির দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপে তন্ময়তা লাভ করলে তাঁর ক্ষুদ্র পৃথকভাব দূর হয় এবং ব্রহ্মের ভূমা চিন্মাত্রস্বরূপ তাঁর অন্তরে প্রকাশিত হয়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ।।৭

মম এব (আমারই অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই) সনাতনঃ (চিরন্তন) অংশঃ (এক অংশ বা রূপ) জীবলোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (জীবরূপে বা জীব হয়ে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃ-ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মন-সহ ছয় অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ করে) ।।৭

এই সংসারে জীব আমারই সনাতন অংশ। প্রকৃতির পরিণাম মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংসারভোগের নিমিত্ত জীবলোকে কর্মভূমিতে আকর্ষণ করে থাকে।

অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কা হতে পারে—জীব সাধনার দ্বারা পরমপদ লাভ করলেন। কিন্তু জীব তো প্রকৃতির অধীন, মায়ামোহে জড়িত, ফলে অবশ্যই তাঁর পুনরাবৃত্তি হবেই। জীব স্বর্গে গমন করলেও তাঁর পুনরাবর্তন হয়। অতএব ব্রহ্মপদ লাভ করলে কেন তাঁর পুনরাবৃত্তি হবে না? এই আশঙ্কায় ভগবান বলছেন—জীবকে যদিও প্রকৃতির অধীন, প্রকৃতির অংশ বলে মনে হয় তথাপি জীব স্বরূপত প্রকৃতির অংশ নয়। জীব আমারই (পরমেশ্বরের) অংশ। কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম অবস্থান করে মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংসারভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করেই জীবলোকে জীব প্রকৃতির অধীন হয়ে পড়েছে। ঐ আকর্ষণ বা বন্ধন হতে মুক্ত হলেই জীব আবার আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

জীব পরমেশ্বরেরই অংশ এবং জীবের স্বরূপই ঈশ্বর তা সত্ত্বেও জীব নিজেকে খণ্ডিত, ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেখেন। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং এক এবং অখণ্ড হয়েও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। এই অজ, অব্যয়, চৈতন্য—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত হয়েও প্রকৃতিস্থ মন

ও ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বহু জীব হয়েছেন (অর্থাৎ 'জীবভূতঃ')। প্রকৃতিতে অবস্থান করে মন-ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণবশত জীব ক্ষুদ্র, বদ্ধ ও প্রকৃতির অধীন হলেও, সে প্রকৃতির অংশ নয়, পরমেশ্বরের অংশ। কাজেই ইন্দ্রিয়-মনের আকর্ষণ হতে মুক্ত হলে জীব আবার পরমেশ্বরের স্বরূপই প্রাপ্ত হবেই।

জীবের নিজ স্থান যদি সংসার হত, তাহলে ব্রহ্মপদ পেয়েও জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হতে পারত। কিন্তু জীবের নিজ স্থান ব্রহ্মপদ। ব্রহ্মপদ হতে সংসারে এসেছে বলে জীব সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারে। আত্মজ্ঞান-প্রভাবে সংসার হতে নিজ স্থান—ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হলে জীবের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। অন্তঃকরণে প্রকৃতির আকর্ষণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। মায়া-উপাধি দ্বারা ভোগের নিমিত্ত মন-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে রাখে। উপাধি বিনষ্ট হলেই জীব স্ব-স্বরূপে নিত্য-স্থিতি লাভ করেন।

আবার অখণ্ড চৈতন্যের অংশ বা খণ্ড চিন্তা করাও কঠিন। কিন্তু এই অংশ বলতে দেশ-কাল-অবচ্ছিন্ন খণ্ডিত অংশ বোঝানো হচ্ছে না, অংশ শব্দের অর্থ আংশিক প্রকাশ। নানা রূপে সর্বত্র চৈতন্যের প্রকাশ। জড়-বস্তুর অংশ যেমন অংশী হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে কিন্তু জীব চৈতন্যের অংশে প্রকাশিত তাই চৈতন্য হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। জীব ও ঈশ্বর স্বরূপত এক চৈতন্য।

আবার চেতন ও জড় উভয়ই পরমেশ্বরের প্রকৃতি—পরা এবং অপরা। জড় ও চেতনের যে সংযোগ তা ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। পরস্পরবিরোধী চেতন ও জড়ের একত্র সমাবেশ সম্ভব হয় ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা। এই শক্তির দ্বারা ভগবানের সনাতনী পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির সংযোগে জীব জগৎ হয়েছে। জীবের মন ও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ রহিত হলেই জীব তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। ভগবান বলছেন, জীব তাঁর সনাতন অংশ। জীবও তার সনাতন স্বরূপ উপলব্ধি করে।

পরমার্থতঃ পরমাত্মার কোনও অংশ নাই। এ যেন ঘটাকাশ বা পটাকাশ রূপে বিভক্ত। এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মাও অবিদ্যাযোগে বিভিন্ন দেহে, বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হন। ঘট বা পট ভাঙলে ঘটাকাশ ও পটাকাশ মহাকাশেই মিশে যায়। সূর্যের প্রতিবিম্ব বিভিন্ন জলাশয়ে পড়ে বহু দেখায় কিন্তু এক সূর্য। সেইরূপ জ্ঞানোদয়ে আত্মজ্ঞান জন্মালে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা মিলিত হয়ে থাকে।

ভক্তিবাদিগণ বলেন, ঘটাকাশ বা পটাকাশ মহাকাশের অংশ তেমনই নামরূপ প্রাপ্ত জীব সেরূপ সর্বেশ্বরের কল্পিত অংশ নয়। জীব বদ্ধ অবস্থায় এই পঞ্চভূতময় জীবলোকে অবস্থিত থেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে। যতদিন জীব সংসারে আবদ্ধ থাকে

ততদিন মায়ার বন্ধনের মোচন হয় না। কিন্তু ভগবানের শরণাগত হয়ে প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করলে, জীব পরমধামে ভগবৎসান্নিধ্যে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি নানা ভাবে অবস্থান করেন। কিন্তু বেদান্তবাদিগণ বলেন, ঘটের নাশ হলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিলিয়ে যায়, সেইপ্রকার অবিদ্যার নাশ হলে জীবও ব্রহ্মই হয়ে যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতে, অজ্ঞানের নাশ হলেও জীবের ব্রহ্মে নির্বাণ হয় না, জীব ব্রহ্মের অংশরূপে ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন।

উপনিষদ বলছেন—প্রজ্বলিত অগ্নি হতে যেমন অগ্নিরূপবিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, আবার তাতেই তারা গমন করে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়। 'তদেতৎ সত্যম্ ।-যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি।। (মুণ্ডক,২-১-১)

যেমন একই অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট থেকে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছে, সেইরূপ এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন এবং তাদের সমুদয় পদার্থের বাইরেও আছেন। 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।' (কঠ ২-২-৯)

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ।।৮

ঈশ্বরঃ (দেহী জীবাত্মা) যৎ (যখন) শরীরম্ উৎক্রামতি (শরীর ত্যাগ করেন) যৎ চ অপি (এবং যখন) (শরীরম্ অর্থাৎ শরীর) অবাপ্নোতি (অন্য দেহগ্রহণ করেন) (তদা—তখন) বায়ুঃ (বায়ু) আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হতে) গন্ধান্ ইব (যেমন গন্ধ গ্রহণ করে তেমনি) এতানি (এই ছটি ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করে) সংযাতি (গমন করে) ।৮

বায়ু যেমন গমনকালে পুষ্পাদি আধার হতে গন্ধ আহরণ করে চলে যায়, তেমনি জীবাত্মা যখন এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ গ্রহণ করে তখন এই সকল মন ও ইন্দ্রিয়গণকে (সূক্ষ্মদেহকে) আকর্ষণ করে সঙ্গে নিয়ে যান।

বেদান্তমতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি অবয়ব এবং অহং নিয়ে সূক্ষ্মদেহ। জীব পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করে এই সংসারে জীবলোকে অবস্থান করে। আবার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে গ্রহণ করে এই দেহ ত্যাগ করে। উপমা দ্বারা ভগবান বলছেন—বায়ু যেমন গমন কালে পুষ্পাদি আধার থেকে গন্ধ ইত্যাদি আহরণ করে প্রস্থান করে, শরীর থেকে জীবাত্মা ঐভাবে ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে নিয়ে উৎক্রমণ (বাইরে বেরিয়ে যায়) করে। একে সূক্ষ্মশরীর বলে। জীবের তিনটি শরীর—স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর। জীবাত্মা স্থূল দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহ সঙ্গে

নিয়ে দেহ গ্রহণ করে। অন্য দেহ গ্রহণের পূর্বে লোকান্তরে জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরেরই সুখদুঃখাদি ভোগ করে থাকে। পুনরায় যখন জন্মগ্রহণ হয় তখন সূক্ষ্মদেহের প্রবৃত্তি দ্বারা স্থূলদেহ ধারণ করেন। পূর্ব দেহের প্রারব্ধ অনুসারে এই দেহের উত্তরাধিকারী হয়। তবে পরিবেশ ও পিতামাতার প্রভাবও তার দেহ ও মনকে প্রভাবিত করে।

জীবাত্মার এই তিন প্রকার শরীর বা জীবাত্মার উপর আবরণগুলিকে পাঁচটি ভাগে বা কোষেও বিভক্ত করা হয়ে থাকে—১) অন্নময় কোষ (এটি পঞ্চভূত ও স্থূল শরীর) ২) মনোময় কোষ (মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ৩) প্রাণময় কোষ (পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ৪) বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) ৫) আনন্দময় কোষ (প্রকৃতি বা কারণশরীর বলা হয়)। এই পঞ্চকোষের মধ্যে অন্নময় কোষই স্থূলশরীর। মনোময়, প্রাণময় এবং বিজ্ঞানময়—এই তিন কোষদ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত এবং আনন্দময় কোষই কারণশরীর।

অতএব ভগবান বলছেন, জীবের দেহান্ত হলে স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়ে থাকে। প্রাণাদি বায়ু সকল দেহের বাইরের বায়ুতে মিশে যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে মন—মনোময় শরীর—সূক্ষ্মদেহ, বায়ুর সঙ্গে গন্ধের গতির ন্যায়, জীবাত্মার অনুগমন করে থাকে। পূর্ব দেহে থেকে শুভ ও অশুভ কর্ম বা অন্যরূপ সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের যে পুষ্টি বা ক্ষীণতা লাভ করেছে, সেই ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় ভোগ করবার জন্য জীব অন্য দেহকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। এবং নতুন দেহে প্রবেশ-কালে পূর্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে করে নিয়ে, পূর্বজন্মজনিত প্রারব্ধ কর্ম অনুযায়ী নতুন জন্মে অনুরূপ কার্য করতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ।।৯

অয়ং (এই জীবাত্মা) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক) রসনং (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এব চ (এবং নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয়পূর্বক) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সকল) উপসেবতে (উপভোগ করে)।।

দেহস্থিত জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে আশ্রয় করে শব্দাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করে।।

জীবাত্মা দেহে অবস্থান করে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণচতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার)—এইসব ভোগের যন্ত্র বা দ্বারকে আশ্রয় করে, প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ বিষয় ভোগ করে থাকে। জীবাত্মা এই স্থূলদেহের সাহায্যে সূক্ষ্মশরীরই সবকিছু উপভোগ করে। ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা আমাদের সূক্ষ্মশরীর বিষয়গুলি ভোগ করে। জন্ম

জন্ম ধরে আমরা এই প্রকৃতিকে ভোগ করছি। যতদিন না আমাদের মনে বিষয় ভোগের প্রতি বৈরাগ্য আসবে এবং যতদিন না আমাদের মন আত্মার দিকে দৃষ্টি ফেরাবে ততদিন এই বিষয়-ভোগ চলবে। আত্মার আনন্দে মন পূর্ণ থাকলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির পিছনে আমরা আর ছুটব না। এই পূর্ণতাই মুক্তি। এই মুক্তিলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ।।১০

বিমূঢ়াঃ (অজ্ঞ, মূঢ় ব্যক্তিগণ) উৎক্রামন্তং বা (অথবা দেহান্তরে গমন অবস্থায়) স্থিতং অপি (শরীরে অবস্থানকালে) ভুঞ্জানং বা (অথবা বিষয়ভোগ সময়ে) গুণান্বিতম্ (গুণসংযুক্ত জীবকে) ন অনুপশ্যন্তি (দেখতে পায় না) (কিন্তু) জ্ঞান-চক্ষুষঃ (জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দেখতে পান) ।।১০

অজ্ঞ, মূঢ়, অবিবেকী ব্যক্তিগণ, জীবাত্মা কীভাবে দেহান্তরে গমন করে, অথবা দেহে অবস্থান করে, অথবা গুণযুক্ত হয়ে বিষয়ভোগ করে—তা জানতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানিগণ, জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সেই আত্মাকে দর্শন করে থাকেন।

বিবেক-বুদ্ধি-বিচারবান মহাত্মাগণ শুদ্ধহৃদয়রূপ নেত্রে—দেহত্যাগকালে, দেহে স্থিতিকালে, শোকমোহ-সুখদুঃখাদি ভোগকালে, সত্ত্বাদিগুণসংযুক্ত বিষয়ভোগ সময়ে, আত্মাকে দর্শন করে থাকেন। কিন্তু বিষয়-ভোগবাসনায় উন্মত্ত মূঢ়গণ তাঁকে দেখতে পায় না—এটি বড়ই আক্ষেপের বিষয়। যাঁদের জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছে তাঁরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন। তাঁরা দর্শন করেন—আত্মা অজ, অব্যয়, নির্লিপ্ত। আত্মা কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। প্রকৃতির গুণে সংযুক্ত হওয়াতে আত্মার এই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বের অহঙ্কার জন্মে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোনও ভোগ নেই। যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ততক্ষণই ভোগ এবং পুনরাগমন। সেইজন্য আমাদের পুনর্জন্ম। জ্ঞানিগণ দর্শন করেন জীব বা জীবাত্মা দেহে অবস্থান করে কীভাবে তিন গুণের পরিণাম বিষয়গুলিকে ভোগ করেন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে তখনই এই সত্যটি আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হবে। 'বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি'—মূঢ় ব্যক্তিরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। 'পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ' যাঁদের জ্ঞানচক্ষু আছে তাঁরা এই সত্য দেখতে পান। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা সূক্ষ্মশরীরের সন্ধান পেয়েই পুনর্জন্মের ব্যাপারটি সহজে বুঝতে পেরেছিলেন। পরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিকগণ ও বিজ্ঞানবাদীরা পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমীক্ষা করে এই চিন্তাধারার সত্যতা যাচাই করেছেন।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ।।১১

(সাধনায়) যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণ কিন্তু) আত্মানং (আত্মাকে) আত্মনি (আত্মাতেই) অবস্থিতম্ (সাক্ষিরূপে অবস্থিত) পশ্যন্তি (দেখেন) যতন্তঃ অপি (যত্নশীল হলেও) অকৃত আত্মানঃ (অশুদ্ধচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনং (এই আত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দেখতে পায় না) ।।১১

সাধনে যত্নশীল যোগিগণ নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে আত্মাতে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত দর্শন করেন কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণ যত্নশীল হলেও এই আত্মাকে দেখতে পায় না।

শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ নিষ্কাম কর্মযোগ, ধ্যানযোগ কিংবা জ্ঞানভক্তিযোগ দ্বারা তাঁদের নির্মল বুদ্ধিতে সাক্ষিরূপে প্রকাশিত আত্মাকে দর্শন করে থাকেন। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম দ্বারা যাদের চিত্ত নির্মল হয়নি, এবং অশুদ্ধ চিত্ত, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন নয় এমন যারা তারা শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে সহস্র চেষ্টা করলেও আত্মার দর্শন পায় না। কেননা, চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের প্রধান উপায়।

সুতরাং আত্মার দর্শনলাভ করতে হলে প্রথমে চিত্তশুদ্ধ করা প্রয়োজন। তার জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনার প্রয়োজন। সেইসঙ্গে ভক্তি ও জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারাই আত্মদর্শন হতে পারে। নচেৎ অজ্ঞানী লোক যারা শাস্ত্র আলোচনা, তীর্থাদি ভ্রমণ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাহ্য উপায়ে বহু চেষ্টা করেও আত্মার জ্ঞানলাভ করতে পারে না। অর্থাৎ যে কুকার্য হতে নিবৃত্ত হতে পারেনি, বিষয়াসক্তি ছাড়তে পারেনি এবং একাগ্রচিত্ত হতে পারেনি, সেই অশান্ত ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে জানতে পারে না। 'অকৃতাত্মানো' যাদের মন যোগযুক্ত নয়, অশুদ্ধচিত্ত, তারা কেবল স্থূল-বিষয়ের চিন্তা করেন, সূক্ষ্মচিন্তা তাঁদের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না। 'যতান্তোঽপি' ত—যত্ন-শীল হয়ে চেষ্টা করলেও 'ন এনম পশ্যন্তি' এই দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন সেই আত্মাকে দেখতে পায় না অর্থাৎ উপলব্ধি করতে পারে না। 'অচেতসঃ'—অবিবেকী, তাদের মন সত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ।।১২

আদিত্যগতং (সূর্যস্থিত) যৎ (যে) তেজঃ (জ্যোতিঃ) অখিলম্ (নিখিল) জগৎ (বিশ্বকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রেও) যৎ (যে জ্যোতিঃ) অগ্নৌ চ (ও অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ) তৎ (সেই) তেজঃ (জ্যোতিঃ) মামকম্ (আমারই) বিদ্ধি (জানবে) ।।১২

যে তেজ সূর্যে বিরাজিত এবং যে তেজ এই অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যে তেজ চন্দ্রে বর্তমান এবং অগ্নিতেও যে তেজ দৃষ্ট হয়, ঐ সকলপ্রকার তেজ আমারই তেজ বলে জানবে।

চৈতন্যের জ্যোতিতে জগৎ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজ মায়ায় জগৎ বিস্তারিত রেখেছেন। তাঁর ব্রহ্মতেজেই সূর্যাদি জ্যোতিপূর্ণ। এই তেজেই জীব দেহে সূর্য-অধিষ্ঠিত চক্ষু, চন্দ্র-অধিষ্ঠিত মন ও অগ্নি-অধিষ্ঠিত বাক্ ক্রিয়া করছে। শ্রুতি বলছেন 'যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ। যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি'(মহানারায়ণ উপনিষদ ১-৩)—যে চৈতন্যরূপ তেজ দ্বারা সূর্য উত্তাপ দিচ্ছে ও চক্ষু (নানা রূপাদি) দেখছে।

অর্থাৎ যোগিগণ কেবল নিজের মধ্যে আত্মাকে দেখতে পান তা নয়, তাঁরা এই বিশ্বের মধ্যেও সেই আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন, পরমাত্মা তাঁদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং এই সমস্ত বিশ্ব তাঁরই প্রকাশরূপ। এক আত্মাই জীবের মধ্যে ও বিশ্বপ্রকৃতিতে বিদ্যমান থেকে সমস্ত সৃষ্টিকে আলোকিত ও প্রকাশিত করছেন। তাঁরা দর্শন করেন—যে তেজ সূর্যে বিরাজিত, যে তেজ নিখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করছে; চন্দ্রের যে কিরণমালা জগৎকে স্নিগ্ধ ও রমণীয় শোভায় ভূষিত করছে; অগ্নি যে তেজ, আলোক ও উত্তাপ দ্বারা জীবকুলকে রক্ষা করছে- সেই সমস্তই পরমেশ্বর ভগবানের তেজ। ভগবানই সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে জগৎকে প্রকাশিত, আলোকিত ও রক্ষা করছেন।

'তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্'—জেনো, তাদের সেইসব জ্যোতি আমার কাছ থেকেই পেয়েছে। আমিই সেই স্বপ্রকাশ, জ্যোতিস্বরূপ শুদ্ধচৈতন্য। আমিই সবচেয়ে দীপ্তিমান, যে দীপ্তির কোনও তুলনা নেই। সূর্যের আলোও সাময়িক। কিন্তু যিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম, তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি। তাঁর আলোতে সকলের হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের সকলের হৃদয়-গুহা সেই পরমাত্মা ঈশ্বরের জ্যোতিতে আলোকিত। অনন্ত চৈতন্যরূপ ঈশ্বরের দীপ্তিতেই সবকিছু দীপ্তিমান।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ।।১৩

চ (এবং) অহম্ (আমি) ওজসা (ওজঃ-দ্বারা, নিজ শক্তি দ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (প্রবেশ করে) ভূতানি (চরাচর ভূতসকলকে) ধারয়ামি (ধারণ করে আছি) চ (এবং) রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ ভূত্বা (চন্দ্ররূপ হয়ে) সর্বাঃ (সকল) ওষধীঃ (শস্য, ব্রীহি,যবাদি) পুষ্ণামি (পুষ্ট করি) ।।১৩

আমি নিজ ঐশীশক্তি দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ করে চরাচর ভূতসকলকে ধারণ করে আছি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে ব্রীহি-যবাদি-শস্য প্রভৃতি ওষধিগণকে পুষ্ট করি।

ভগবান বলছেন, একদিকে তিনি প্রকৃতির মধ্যে বিরাজ করছেন, তেমনি মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখি পৃথিবীই আমাদের সবকিছু দেয়, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস ঈশ্বর। তিনিই এই পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নিজ ঐশীশক্তিদ্বারা সমস্ত

প্রাণিগণকে ধারণ করে আছেন। ভগবানের ঐশীশক্তির প্রভাবে এই পৃথিবীর প্রাণিগণের ধারণ ও রক্ষা হচ্ছে। তাঁরই তেজে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত, তাঁরই শক্তিতে নিখিল জগৎ পালিত ও রক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে তিনি আবার চন্দ্ররূপে স্নিগ্ধ কিরণমালা দ্বারা ব্রীহি, যবাদি শস্যের পরিপুষ্টি সাধন করে জীবগণকে খাদ্য জোগাচ্ছেন। ভগবান বলছেন, এই যে জীব খাদ্য গ্রহণ করছে, এই কাজ ঈশ্বরের শক্তিতেই সম্পন্ন হচ্ছে। এই বিশ্বে ভগবান সর্বত্র ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। তাঁর শক্তিতেই সকল কার্য সম্পন্ন হচ্ছে এবং তাঁর দ্বারাই আমরা প্রতিমুহূর্তে বেঁচে আছি।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ।।১৪

অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি বৈশ্বানর) ভূত্বা (হয়ে অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপে) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (দেহ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করে) প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে) চতুর্বিধম্ (চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চার প্রকার) অন্নং (অন্ন, খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি) ।।১৪

আমি জঠরাগ্নি বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান-বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চারপ্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

পরমেশ্বর যেমন শস্যাদির পরিপুষ্টি করেন, জীবজগতের খাদ্য—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য—এই চার প্রকার অন্ন সৃষ্টি ও পুষ্টি করেন, জীবজগৎকে রক্ষা করেন, আবার তিনি প্রাণিদেহে জঠরাগ্নিরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করে থাকেন। এই পরিপাকক্রিয়া হতে জীবদেহে রক্ত ও মাংস উৎপন্ন হয়ে সমুদয় জীবকে বাঁচিয়ে অর্থাৎ জীবিত রাখে এবং তাদের পরিপুষ্টি সাধন করে।

এই থেকে বোঝা যায় প্রকৃতিতে সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত এবং নিয়ন্ত্রিত। জীবদেহে সকল গুণক্রিয়াও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বেদান্তের মূল বক্তব্য হলো জাগতিক বলে কোনও কর্ম নেই—সবই আধ্যাত্মিক, সবই পবিত্র, সবই দিব্য। ঈশ্বরীয় শক্তিই নানাভাবে, নানারূপে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে। খাদ্যের উপমা দিয়ে ভগবান বোঝাতে চাইছেন যে, একটিই উৎস—তা হলো ঈশ্বর। তাঁর কাছ থেকেই সবকিছু আসছে এবং গাছপালা, ফুল, ফল, ঋতু, যাবতীয় প্রকৃতির বিকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমাই প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব আমরা বুঝি বা না বুঝি আমাদের সবকিছুই আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক। সমস্ত জীব-জগৎ-বিশ্বটাই ব্রহ্ম, সবকিছুই পবিত্র, সবই দিব্য। ভগবানের এই মহিমা বুঝতে পারলে আমাদের জীবন তখন অর্থবহ, সুন্দর, পবিত্র ও দিব্য ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতাই আমাদের অভ্যাস করতে হবে দৈনন্দিন জীবনে।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ।।১৫

অহং (আমি) সর্বস্য (ব্রহ্মা হতে কীটপর্যন্ত সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (অধিষ্ঠিত হয়ে আছি) মত্তঃ (আমা হতে) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অপোহনম্ চ (সেগুলির বিলোপ ও) সর্বৈঃ (সকল) বেদৈঃ চ (বেদদ্বারাও) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ (বেদ্য, জ্ঞাতব্য) বেদান্তকৃৎ (বেদান্ত-সম্প্রদায়-প্রবর্তক অর্থপ্রকাশক) বেদবিৎ চ (এবং বেদবিৎ) অহম্ এব (আমিই) ।।১৫

আমিই অন্তর্যামিরূপে সকল প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি; আমা হতেই প্রাণিগণের স্মৃতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে, আবার আমিই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপসাধন করি। আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু; আমিই আচার্যরূপে বেদান্তের অর্থপ্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থেকে বেদান্ত-পরিজ্ঞাতা হই।

এই শ্লোকে ভগবান বলছেন—'আমিই সকলের আত্মা'। 'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো'—আমিই সকলের হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তিনি কেবল বাহ্য প্রকৃতিতেই অনুপ্রবিষ্ট থেকে তাঁর কাজ নিয়ন্ত্রণ করছেন তা নয়, মানুষের হৃদয়েও তিনি আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মানুষের মনে যে-সকল ভাবের উদয় হয়, যে সকল স্মৃতি হৃদয়ে জেগে উঠে, যে-জ্ঞানের উদ্ভব হয় বা বিলোপ হয় সে সকলের উৎস ভগবান। তিনি ব্যাবহারিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান উভয়ের উৎস। তিনিই সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের বিষয়, আবার বেদের জ্ঞাতাও তিনি। বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ঋষিগণ, বেদবিদ্‌গণ সকলেই ভগবানেরই রূপ। বাস্তবিক মায়াশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা। অতএব তিনিই সর্বত্মারূপে বিরাজিত। বেদব্যাস-আদি বেদার্থের উপদেষ্টাও তিনিই। তিনিই আবার পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞাতা, অর্থাৎ বেদের অর্থ বোঝাবার কর্তা তিনি, এবং বোঝবারও কর্তা তিনি। ব্রহ্মা হতে স্থাবর পর্যন্ত সকলের বুদ্ধির মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠাতা। বেদান্তবাক্য যেমন 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম', 'আনন্দোব্রহ্ম', 'তদেতদ্‌ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা বেদ মুমুক্ষুগণদের ব্রহ্মস্বরূপের উপদেশ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তিনিই বেদের ব্রহ্মজ্ঞান, সেই সত্য, এক বস্তু এবং তিনিই সেই পরমপদ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ।। ১৬

ক্ষরঃ চ (ক্ষর) অক্ষরঃ চ (এবং অক্ষর) ইমৌ (এই) দ্বৌ (দুই) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (এই জগতে) [প্রসিদ্ধ আছে] ক্ষরঃ (বিনাশী পুরুষ) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত,

বিকার বা কার্য) অক্ষরঃ (অবিনাশী পুরুষ) কূটস্থঃ (কূটস্থ [পুরুষ অবিকারী আত্মা] উচ্যতে (বলা হয়) ।।১৬

সংসারে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ বিদ্যমান আছে। তাদের মধ্যে বিনাশী কার্যরূপ সর্বভূতকে 'ক্ষর' এবং কূটস্থ আত্মাকে অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করা হয়।

এই সংসারে দুটি পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে—একটি ক্ষর পুরুষ, অপরটি অক্ষর পুরুষ। চৈতন্যাত্মক পুরুষ এই দুই নামেই প্রসিদ্ধ। জীবদেহস্থ আত্মা প্রকৃতির বশে এসে দেহাভিমানী হয়ে নিজেকে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' প্রভৃতি অনুভূতির আধার হয়ে এক পুরুষরূপে নিজেকে জাহির করে। এই পুরুষকে 'ক্ষর' বলা হয়। এই ক্ষর পুরুষ পরিণামী, প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরও অনুভূতির পরিবর্তন হয়। সংসারে সমস্ত জীবই ক্ষর পুরুষ।

অথচ এই ক্ষর পুরুষের অধিষ্ঠাতারূপে এক অপরিণামী, অব্যয়, প্রকৃতি হতে স্বতন্ত্র, সনাতন আত্মা আছেন। ইনি প্রকৃতির অধীনতা হতে মুক্ত, স্বাধীন, স্বতন্ত্র। প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে এঁর কোনও পরিবর্তন হয় না। ইনি সর্বজীবে সমভাবে অবস্থিত। বিচিত্র নাম-রূপের মধ্যে ইনি এক স্থায়ী সত্তা। ইনিই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ।

এই দুই পুরুষের কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যাখ্যা করেছেন—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।'(৪-৬) সর্বদা দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন অর্থাৎ সমান-স্বভাব দুটি পাখী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষ অর্থাৎ দেহবৃক্ষ আশ্রয় করে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন (জীবাত্মা) বিচিত্র স্বাদবিশিষ্ট টক, মিষ্ট ফল ভক্ষণ করছেন অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করছেন। আর অপরজন (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ না করে কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন। যিনি ফল ভক্ষণ করেন তিনি এই সংসারে বদ্ধ জীবাত্মা, ক্ষর পুরুষ। আর যিনি তা দেখেন, তিনি দ্রষ্টা, অক্ষর পুরুষ।

বাস্তবিক আদি প্রকৃতিই হলেন অক্ষর পুরুষ। জীবদেহে জীবাত্মাই হলেন আদি প্রকৃতি। ইনি কূটস্থ, অবিনাশী মায়ারূপে আছেন কিন্তু অক্ষর পুরুষ। ইনিই নানা বিকারশীল ক্ষর রূপ ধারণ করেন। এই ভাবটি ভগবান পরের শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ।।১৭

অন্যঃ তু (ক্ষর অক্ষর হতে সর্বতোভাবে ভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্টতম) পুরুষঃ (পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা বলে) উদাহৃতঃ (অভিহিত) যঃ (যিনি) অব্যয়ঃ (অক্ষর) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবনে) আবিশ্য (স্বীয় চৈতন্যশক্তিরূপে প্রবেশ করে) বিভর্তি (পালন করেন) ।।১৭

এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হতে ভিন্ন আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন, যাঁকে পরমাত্মা বলে শাস্ত্র নির্দেশ করেন এবং যিনি অবিনাশী ও ঈশ্বর, যিনি নির্বিকার হয়ে ত্রিলোকের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে পালন করে থাকেন।

পূর্বের শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষের কথা। কিন্তু এই দুই পুরুষ হতে অন্য অর্থাৎ উত্তম এক পুরুষ আছেন যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে প্রতিপালন করছেন। তিনি নির্বিকার, অব্যয় এবং তিনি ঈশ্বর। তিনি জীব-শরীরের পঞ্চকোষের অতীত। তিনি মায়াশক্তির অতীত। তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ প্রকাশিত, তিনি মায়াধীশ পরমাত্মা। তিনিই সব কিছুর প্রভু। ত্রিজগৎকে নিজ অধীনে রেখে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী-আদিকে নিজ নিজ কার্যে প্রেরণ করছেন, সকলকে রক্ষা করছেন ও সকলকে ধারণ করছেন। তিনি অব্যয় এবং তিনিই একমাত্র ত্রিজগতের প্রভু।

এই পরমাত্মা পরমপুরুষ, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন। এখানে পরমপুরুষকে ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ হতে বিলক্ষণ ভিন্ন বলা হয়েছে। তিনি অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ, মহত্তর, বৃহত্তর পুরুষ বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষর ও অক্ষর সেই উত্তম পরমপুরুষের দুটি রূপ। তিনিই মায়াধীন ক্ষর এবং অক্ষর উভয়রূপে প্রকাশিত, আবার তিনি উভয়েরই অতীত। তিনি এক হয়ে বিচিত্র হয়েছেন। এক তিনি—ব্রহ্ম। তিনিই সকল শক্তির উৎস। শক্তির উৎসটি সর্বদা পরিপূর্ণ, অনন্ত, অব্যয়।

তাই বলা হচ্ছে—এই পরমাত্মা অব্যয়, অপরিবর্তনীয়, অজ, অবিনাশী। তাঁর কোনও বিকার নাই, চলন নাই, স্পন্দন নাই। তিনি নির্বিকার, উদাসীন, নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু তিনিই অব্যয়, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় হয়েও আবার সর্বভূতের ঈশ্বর, প্রকৃতির প্রভু। তিনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা। এই অব্যয় ঈশ্বরই সমস্ত ত্রিজগৎ ব্যেপে আছেন এবং এর মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে তিনি সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আছেন, পালন করছেন, রক্ষা করছেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।।১৮

যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত) চ অক্ষরাৎ অপি (এবং অক্ষর হতেও) উত্তমঃ (উত্তম বা শ্রেষ্ঠতম) অতঃ (অতএব) লোকে (ত্রিলোকে) বেদে চ (এবং বেদাদি শাস্ত্রে) পুরুষোত্তমঃ [ইতি] (পুরুষোত্তম বলে) প্রথিতঃ (প্রখ্যাত) অস্মি (হই) ।।১৮

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও আমি উত্তম, সেজন্যই আমি লোকে (লৌকিক পুরাণাদি শাস্ত্রে) ও বেদাদি শাস্ত্রে পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত হয়েছি।

লোকে ও বেদে অর্থাৎ ইহলোকে প্রসিদ্ধ পুরাণাদি শাস্ত্রে এবং বেদাদি শাস্ত্রে আমাকেই পুরুষোত্তমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাকে পুরুষোত্তম বলা হয় তার কারণ আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতে উত্তম। ক্ষর হচ্ছে কার্যরূপ সংসার, অক্ষর হচ্ছে অব্যয়

কারণ বীজরূপ মায়া। ক্ষর ও অক্ষর—কার্য ও কারণ দুই পুরুষ। পরমাত্মা চৈতন্যস্বরূপ তুরীয়, তাই জড় মায়াধীন দুই পুরুষ হতে শ্রেষ্ঠ। সেকারণে লৌকিক পুরাণশাস্ত্র এবং বেদশাস্ত্র তাঁকে পুরুষোত্তম বলে আখ্যা দিয়েছে।

পুরুষোত্তমের অনন্ত সত্তার একটি তরঙ্গ–মাত্র এই বিশ্ব। তিনি প্রকৃতির কর্মের সাক্ষী, দ্রষ্টা হয়েও আবার প্রকৃতির কর্মের চালক ও প্রভু। প্রকৃতি তাঁর সংকল্পসাধন করছেন, তাঁর লীলার নিমিত্তই কর্ম করছেন। তাই বেদে এবং পুরাণে তাঁকে পরমেশ্বর, পরমপুরুষ, পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—'অতঃ অস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ'—আমি বেদে এবং ইহলোকে অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তের ভগবান এবং জ্ঞানীর ঈশ্বর হচ্ছেন পুরুষোত্তম। একই ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ হয়েছেন। একই সত্তা এক দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎরূপে ব্যক্ত হয়েছেন, আবার আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জগতের অতীত চৈতন্যরূপে স্ব–স্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। একই সত্তার দুটি অবস্থা বোঝাতে নিত্য এবং লীলা—এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। নিত্য–স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম এবং লীলা–স্বরূপে তিনি এই জগৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—নিত্য আর লীলা এক। যা নিত্য তাই লীলা। আবার যা লীলা তাই নিত্য। আবার মানুষই এই পুরুষোত্তমকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। উপনিষদ বলছেন- -'যো বেদঃ নিহিতম্ গুহায়াম্'—যিনি আপন হৃদয়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, তিনি এই দেহেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, কারণ ব্রহ্ম তো আমাদের হৃদয়েই নিহিত রয়েছেন। একমাত্র মানুষের এই দুই জগৎ—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে বোঝার ক্ষমতা আছে। নিজের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে, দেহ–মনের ঊর্ধ্বে তার যে অসীম সত্তা, তাকে সে অনুভব করতে পারে। তাই মানুষ মুক্তির জন্য সাধন করে। কারণ মানুষ পুরুষোত্তমকে ভালবাসে এবং তাঁর শরণাপন্ন হয়। মানুষ এবং সকল জীবজগতের একীভূত আত্মাই হলো পুরুষোত্তম।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ।।১৯

ভারত (হে অর্জুন) যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপে অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষরের অতীতরূপে) অসম্মূঢ়ঃ (মোহমুক্ত হয়ে) পুরুষোত্তমম্ (পরব্রহ্ম) মাম্ (আমাকে) জানাতি (জানেন) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) সঃ (তিনি) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন) ।।১৯

হে ভারত! যিনি মোহমুক্ত হয়ে এইরূপে আমাকে পুরুষোত্তম বলে বুঝতে পারেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।

ভগবান বলছেন, যিনি এভাবে আমাকে জানেন অর্থাৎ যে বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানী-

সাধক পুরুষোত্তমকে জেনেছেন তিনি সর্বজ্ঞ। সব মোহ থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর জানবার আর কিছু বাকি থাকে না। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যখন অবতার- পুরুষের স্বরূপ বুঝতে পারেন অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং মনুষ্যদেহ ধারণ করেন—এই অনুভূতি হয়, তখন বুঝতে হবে যে, ঐ বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানীর সম্পূর্ণ মোহ বিদূরিত হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন জগতে আমরা সবাই পুরুষ (ক্ষর), কিন্তু তিনি পরমপুরুষ। তিনি তখন ভগবানকে পুরুষোত্তম জ্ঞানে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা সর্বতোভাবে ভজনা করেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি চিন্তাই তখন পূজা হয়ে যায়, এমনকী খাবার গ্রহণও পূজায় রূপান্তরিত হয়। রামপ্রসাদ বলছেন—'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি মাকে ধ্যান। আহার করি মনে করি আহুতি দেই শ্যামা মাকে।' তাঁর অনুভব হয় ভগবানই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তখন তাঁর দৃষ্টিতে কোনও কিছুই ঈশ্বর–বিযুক্ত নয়। এইজন্য তিনি সর্বজ্ঞ, প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সর্ববিৎ।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ।।২০

অনঘ (হে নিষ্পাপ) ভারত (অর্জুন) ইতি (পূর্বোক্ত) ইদম্ (এই) গুহ্যতমম্ (পরম গুহ্য) শাস্ত্রম্ (শাস্ত্র এই ব্রহ্মতত্ত্ব) ময়া (আমার দ্বারা) উক্তম্ (কথিত হলো) [যোগিগণ] এতৎ (এইতত্ত্ব) বুদ্ধা (জেনে) বুদ্ধিমান্ (ব্রহ্মবিদ বা তত্ত্বজ্ঞানী) চ (এবং) কৃতকৃত্যঃ (কৃতার্থ) স্যাৎ (হয়ে থাকেন) ।।২০

হে নিষ্পাপ ভরতবংশীয়, এইরূপে গুহ্যতম এই শাস্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাকে উপদেশ করলাম। এই তত্ত্ব জেনে যোগী বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ হন। তুমিও যে কৃতার্থ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ভগবান বলছেনঃ হে অর্জুন! তোমাকে এতক্ষণ সবচেয়ে গুহ্যতম বিজ্ঞান বললাম। এই সত্য জেনে মানুষ জ্ঞানী হয়। তুমিও এই শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করে আত্মজ্যোতিতে দীপ্তিমান হবে। ভগবান বলছেন, মানুষ এই জীবনেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। ভগবানকে জেনে বা আত্মসাক্ষাৎকার করে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। ভগবানকে জেনে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মানুষ কৃতকৃত্য বা কৃতার্থ হয়।

এই শাস্ত্রকে গুহ্যতম বলার কারণ, এই তত্ত্ব কেবল জ্ঞানী–ভক্তদের নিকট প্রকাশিত হয়, অপর কেউ এই শাস্ত্র সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এই শাস্ত্র সকলের জ্ঞানগম্য নয় তাই গুহ্যতম। ভগবান অর্জুনের প্রতি কৃপা করে এই গুহ্যতম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছেন—আমি তোমার নিকট এই অতীব গুহ্য রহস্যশাস্ত্র বর্ণনা করলাম, যিনি এই পরমজ্ঞান জানেন, তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করে কৃতকৃত্য হয়ে যান।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে **পুরুষোত্তমযোগ** নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

পুরুষোত্তমযোগ—ঈশ্বরের স্বরূপ এবং নশ্বর এই সংসারের স্বরূপ, অশ্বত্থবৃক্ষের উপমা দিয়ে ভগবান এই গুহ্যতম শাস্ত্র অত্যন্ত সহজ করে ব্যাখা করলেন। বাসনাই এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল। একমাত্র অনাসক্তির কুঠার দ্বারাই এই বৃক্ষের সুদৃঢ় মূল ছেদন করে বিষ্ণু পরমপদ অনুসন্ধান করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্তব্য। তত্ত্বজ্ঞানিগণ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা মনুষ্যজীবনের এই সংসার-চক্রের গতি দর্শন করতে সমর্থ হন। একদিকে সংসার-প্রপঞ্চে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' নামক দুই পুরুষকে তাঁরা যেমন দর্শন করেন, এই দুই হতে ভিন্ন এবং এই দুয়ের নিয়ন্তা ও পরিপালক 'পরমাত্মা' নামে অপর এক তৃতীয় উত্তম পুরুষকে দর্শন করেন। ক্ষর ও অক্ষর হতে অতীত, উত্তম এই 'পুরুষোত্তম'কে যিনি জানেন, তিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করে সর্বতোভাবে 'পুরুষোত্তম'-এর ভজনা করেন। জড় (ক্ষর), জীবাত্মা চৈতন্য (অক্ষর) এবং এই দুই চৈতন্যের অতীত ও উত্তম শুদ্ধচৈতন্য (পরমাত্মা)—এঁদের প্রকাশভেদ-বিচারই তত্ত্ব উপদেশ। ভগবান এই তত্ত্বকে গুহ্যতম শাস্ত্র বলছেন এবং এই তত্ত্ব উপদেশ লাভেই মনুষ্যজীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

ভগবান অর্জুনকে হে অনঘ—নিষ্পাপ, হে ভারত, সম্বোধন করে অর্থাৎ উচ্চ অধিকারী ও পবিত্র কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষ করে বলছেন—ভক্তিপূর্বক গীতার উপদেশ গ্রহণ করে মানুষ পরমপদের অধিকারী হয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি পবিত্র-কুলে জন্মে ও পবিত্রপ্রকৃতি হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে কৃতার্থ হবেই, তাতে আর সন্দেহ কী? নিষ্পাপ না হলে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান উপদেশ পাবার অধিকারী হয় না। তপস্যা দ্বারা যাঁরা নিষ্পাপ হয়েছেন, যাঁরা নিবৃত্তিমার্গে প্রতিষ্ঠিত, বিষয়ের অনুরাগ যাঁদের চিত্ত থেকে দূর হয়েছে এবং যাঁরা মুমুক্ষু ও নিরপেক্ষ, তাঁরাই আত্মজ্ঞান শ্রবণ ও মনন করার অধিকারী হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর।' ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না। অনন্তকে মুখে কে বোঝাবে? যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি, যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি; আর যখন ঐ সব কাজ করেন তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। নিত্য আর লীলা। যতক্ষণ তিনি এ লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। শক্তি বললেই ব্রহ্ম আছেন।

সাকার, নিরাকার—দুই সত্য। আবার সাকাররূপ-বরফ যেমন জ্ঞানসূর্যের তাপে গলে যায়। সেইরূপ যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। তিন গুণযুক্ত সাকার আবার তিন গুণের অতীত নিরাকার। তিনি সগুণব্রহ্ম আবার তিনি নির্গুণব্রহ্ম। নির্বিকল্প সমাধিতে, সেই অনন্ত বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্মের অনুভূতি হয়। তিনি যখন তিন গুণের অতীত তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্যমনের অতীত বলা যায়, তিনিই পরব্রহ্ম।

ব্রহ্মজ্ঞানী দেখেন, ব্রহ্ম অটল নিষ্ক্রিয় সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসারে তাঁর শক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণে রয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত। জ্ঞানী দেখেন যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীবজগৎ, মনবুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান এসব তাঁর ঐশ্বর্য। তাঁর সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্ বলেছেন—'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।।'—তুমি নারী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, আবার তুমিই কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডহস্তে স্খলিতপদে চলেছ বৃদ্ধের সাজে; আবার তুমিই নবীন জীবনের ভূয়িষ্ঠ সম্ভাবনা নিয়ে নবজাতকরূপে পৃথিবীর বুকে দেখা দিচ্ছ নানা দেহে, নানা আকৃতিতে। সেই পুরুষোত্তমকেই ঋগ্বেদে বলা হয়েছে— 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি—সেই বিরাট পুরুষ যাঁর সহস্র অর্থাৎ অনন্ত মস্তক...। সেই পুরুষোত্তমই সর্বনিয়ন্তা। মানব জীবনেই ঈশ্বর-সাক্ষাৎ বা ঈশ্বর-উপলব্ধি করা সম্ভব। আমাদের ভিতরেই সেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। তাঁর যে সন্ধান পায়, আপনা-আপনিই সে জ্ঞানী হয় এবং জগৎ জয় করে।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

এই অধ্যায়ে বিশেষত দৈবী-সম্পদ ও আসুরী-সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা ও বিভাগ করা হয়েছে। সেজন্য এই অধ্যায়টির নাম 'দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ-যোগ'। শুভ ও অশুভ ভোগবাসনা দ্বিবিধ। সাত্ত্বিকী বাসনা শুভ ও মুক্তি-মার্গের হেতু, এবং রাজস ও তামস বাসনা অশুভ ও সংসারে বন্ধনের হেতুস্বরূপ। সাত্ত্বিকী বাসনা দৈবী সম্পদ, এবং রাজস ও তামস বাসনা রাক্ষসী বা আসুরী সম্পদ বলে কথিত হয়।

শ্রীভগবান প্রথমে দৈবী সম্পদের বর্ণনা ও বিভাগ করে বলছেন—'নির্ভীকতা (ভয়শূন্যতা), চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, অসৎ-কর্মে লজ্জা, চপলতাশূন্যতা, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরভাব (শত্রুভাব না করা), অনভিমান (নিজের সম্বন্ধে অভিমানশূন্যতা)' প্রভৃতি এইসব দৈবী সম্পদ। যাঁরা পূর্বজন্মার্জিত শুভ কর্মফলে দৈবী সম্পদের অধিকারী হয়ে জন্মেছেন তাঁরাই এইসব ছাব্বিশটি সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী হন। তেমনি দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক—এসব আসুরী সম্পদ। পূর্বজন্মের অশুভ কর্মের ফলে আসুরী প্রকৃতি নিয়ে যারা জন্মেছে, সেই সব রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম এগুলি।

১) দৈবী-সম্পদ্-বিশিষ্ট দেব-প্রকৃতি বা সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মানুষ—দেবতা হয়। ২) আসুরী-সম্পদ-বিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি বা রজঃ তমঃ প্রকৃতির মানুষ—অসুর হয়। দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভের পথে সেতুস্বরূপ হয় এবং আসুরী সম্পদ সংসারবন্ধনের কারণ হয়।

আসুর-প্রকৃতির লোকের ধর্মাধর্ম-জ্ঞান নেই! তারা শৌচ ও সদাচার জানে না, সত্য, ধর্ম, শাস্ত্র ও ঈশ্বর—এসব কিছু মানে না। অসত্য ও কাম-উপভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ মনে করে এবং অধর্মাচরণেই গর্বানুভব করে। কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে সর্বভূতের ক্ষতিসাধনেই তাদের পরম চরিতার্থতা। এই আসুর-প্রকৃতির মানুষেরা অধর্মাচরণ করে পুনঃপুন অধোগতিপ্রাপ্ত হয়ে জন্মলাভ করে। তাদের মুক্তির কোনও উপায় নেই।

শ্রীভগবান পরম কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনকে লক্ষ করে জগদ্বাসীদের সদুপদেশ দিয়ে বলেছেন— কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি ক্রিয়া আসুর স্বভাবের মূল কারণ এবং নরকের দ্বারস্বরূপ। এই তিনটিকে ত্যাগ করতে পারলেই স্বভাবের সংশোধন হবে এবং জীব শ্রেয়োলাভের পথে ক্রমে অগ্রসর হতে পারবে। অতএব কাম-ক্রোধ-লোভাদি জয় করে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। স্বধর্ম পালনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। তাই শ্রীভগবান বর্তমান অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকে উপদেশের পরিসমাপ্তি করে অর্জুনকে বলেছেন—তুমি শাস্ত্র মেনে স্বধর্ম-আচরণরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীভগবানুবাচ
অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ।।১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ।।২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ।।৩

শ্রীভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন) ভারত (হে অর্জুন), অভয়ং (নির্ভীকতা) সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ (চিত্তের শুদ্ধি) জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানে একান্ত নিষ্ঠা বা অবস্থিতি) দানং (পঞ্চবিধ দান) দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম) যজ্ঞ চ (ও যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদাদিশাস্ত্র-পাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (পরপীড়ন-বর্জন) সত্যম্ (সত্য-বচন) অক্রোধঃ (ক্রোধ ত্যাগ) ত্যাগঃ (প্রাপ্তবস্তুর পরিত্যাগ) শান্তিঃ (চিত্তচাঞ্চল্যের উপশম) অপৈশুনম্ (পরনিন্দাবর্জন) ভূতেষু দয়া (দুঃখিত, পীড়িত জীবের প্রতি দয়া) অলোলুপ্ত্বং (লোভশূন্যতা) মার্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (অসৎ কর্মে লজ্জা) অচাপলম্ (অচাঞ্চল্য) তেজঃ (পৌরুষ, শৌর্য) ক্ষমা (দোষ-মার্জনা) ধৃতিঃ (ধৈর্য) শৌচম্ (বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ) অদ্রোহঃ (অবৈর ভাব, শত্রুভাব ত্যাগ) ন অতিমানিতা (নিরভিমানতা, নিজের সম্বন্ধে অভিমানরাহিত্য (এ সকল গুণ) দৈবীম্ (দৈবযোগ্য, সাত্ত্বিক) সম্পদম্ (সম্পদ, বিভূতি) অভিজাতস্য (সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির) ভবন্তি (লাভ হয়ে থাকে) ।।১-৩

শ্রীভগবান বলছেন—হে ভারত, নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানলাভে দৃঢ়নিষ্ঠা, অন্নাদি-দান, বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, চপলতাশূন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, শত্রুভাব বা বিদ্বেষ না করা ও নিরভিমানতা—এই ছাব্বিশটি গুণ সাত্ত্বিকী বা দৈবী সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে থাকে।

মানুষের সমাজকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—দৈবী ও আসুরী। দৈবীসম্পদসম্পন্নসমৃদ্ধ মানুষের লক্ষণ ও প্রকৃতি সাত্ত্বিকীসম্পন্ন। রজঃ ও তমঃ গুণ ত্যাগ করে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, অবশেষে মানুষ গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁদের মন ও বুদ্ধির গতি ঊর্ধ্বমুখী। গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা প্রকৃতির বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করেন এবং ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আসুরিক সম্পদের গুণে জাত।

দৈবীসম্পদেসমৃদ্ধ অধিকারীর লক্ষণ—

অভয়ম্—নির্ভীকতা, ভয়ের অভাব। মৃত্যু-শঙ্কার অভাবের নাম অভয়। অজ্ঞান হতে ভয়ের জন্ম। কারণ মানুষ দেহে আত্মাভিমান করে দেহের দুঃখ-কষ্টের আশঙ্কায় ভীত হয়। মানুষের সর্বদাই ভয় এই দেহের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুভয়। কিন্তু জ্ঞানী জানেন যে, এই দেহ আত্মা নয়, আত্মা অজ, অবিনাশী। অতএব দেহের দুঃখে এবং মৃত্যুতে জ্ঞানী শঙ্কিত হন না। দৈহিক দুঃখ-কষ্টে অবিচলিত থেকে, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর করে, নির্ভীকভাবে তিনি আপনার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন।

সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ—চিত্তের নির্মলতা ও সুপ্রসন্নতা। চিত্ত হতে রাগদ্বেষ, বাসনা-কামনা দূরীভূত হলে চিত্ত নির্মল হয়। তখন ভগবদ্ জ্ঞানলাভের শুভ আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞান ও যোগে একান্ত নিষ্ঠা। আত্মস্বরূপের নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। একাগ্রচিত্তে আত্মানুভূতির নাম যোগ। আত্মজ্ঞানলাভের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সেই উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানে দৃঢ়তা।

দানম্—অর্জিত অর্থ অথবা প্রাপ্ত অন্ন সমস্ত নিজের ভোগার্থ ব্যবহার না করে অপরের মধ্যে বিভাগ করে দেওয়াই দান। দান সর্বদাই ত্যাগ। চিত্তের শুদ্ধতার জন্য ত্যাগ একান্ত প্রয়োজন এবং তাতে দানকর্ম বিশেষ উপযোগী।

দমঃ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সংযমের নাম 'দম'। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে। এই আসক্তি দূর করতে হলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখাই 'দম'।

যজ্ঞঃ—শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান। যজ্ঞ দুই প্রকার—বৈদিক ও স্মার্ত। বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত পঞ্চবিধ যজ্ঞ। প্রত্যেক গৃহস্থের জন্য পঞ্চ যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ছিল। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন যজ্ঞদ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি আসে। পঞ্চযজ্ঞ যথা—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ।

স্বাধ্যায়ঃ—নিয়মপূর্বক বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন। শৈশবে ব্রহ্মচর্য পালনের সময়ে স্বাধ্যায় একান্ত প্রয়োজন এবং এটাই ধর্ম।

তপঃ—তপস্যা তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।

আর্জবম—সরল ভাব, বালকস্বভাব। মনে বক্রভাব না থাকা, অর্থাৎ মনে যেন বক্রতা বা কুটিলতা না থাকে। মনে কোনও ভাব গোপন রেখে দুষ্ট অভিসন্ধি না করা। এই বক্রতার অভাবই ঋজুতা বা আর্জব। সরলতা ঈশ্বরলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

অহিংসা—হিংসা না করা, কোনও প্রাণীকে পীড়া না দেওয়া অর্থাৎ তাকে ভালবাসা। অপরকে পীড়া দেওয়াই পাপ, অপরকে ভালবাসাই পুণ্য। চিত্তে অহিংসা ভাব আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সত্যম্—সত্য ব্যবহার, সত্যভাষণ, সত্যনিষ্ঠা দৈবী প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। সত্যই ঈশ্বর। যে সত্যকে ধরে আছে সে ঈশ্বরের কোলে বসে আছে।

অক্রোধঃ—ক্রোধ বা প্রতিহিংসার ভাব পোষণ না করা। কারোর প্রতি আক্রোশ ভাব না দেখানো।

ত্যাগঃ—ত্যাগের অর্থ স্বার্থত্যাগ, কামনা-বাসনার ত্যাগ। যিনি চিত্ত হতে আসক্তি ত্যাগ করেছেন তিনি প্রকৃত ত্যাগী।

শান্তিঃ—মানসিক চাঞ্চল্যের উপশম। মানুষের বিষয়তৃষ্ণা এবং শোক-দুঃখাদিই মনের শান্তি নাশ করে। সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মানুষের চিত্ত সর্বদা শান্ত থাকে।

অপৈশুনম্—কারও অসাক্ষাতে তার নিন্দা বা দোষকীর্তনের নাম পৈশুন। অতএব অন্যের কাছে আর একজনের অসাক্ষাতে দোষকীর্তন না করা। চিত্ত থেকে হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা দূর করা। সাত্ত্বিক-প্রকৃতির মানুষ এরূপ পরনিন্দাকে ঘৃণা করেন।

ভূতেষু দয়া—দীনের প্রতি করুণা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—শিবজ্ঞানে জীব- সেবা। দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বভূতে সমভাবে এই দয়া প্রদর্শন করেন।

অলোলুপ্ত্বম্—ভোগের বস্তু সামনে আসলেও ইন্দ্রিয়াদির বিকার না জন্মান। লোভবশত অপরকে শোষণ না করা। ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ লোলুপ হয়ে থাকে। দৈবী প্রকৃতির মানুষের লোলুপতা থাকে না।

মার্দবম্—মৃদুতা, অমায়িক ভাব, কোমল বাক্য প্রয়োগ। রুক্ষ ভাষা বা রুক্ষ ব্যবহার না করা।

হ্রীঃ—অন্যায়, অসঙ্গত কার্যসম্পাদনে লজ্জাবোধ।

অচাপলম্—বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা বলা বা হাত-পা সঞ্চালন করার নাম চাপল। চাপলের অভাব অচাপল।

তেজঃ—কারও প্রভাবে পরাভূত বা সত্যপথ হতে বিচ্যুত না হওয়া। অন্যের নিকট পরাভব স্বীকার না করাই তেজ। মানসিক তেজকে নৈতিক সাহসও বলা হয়। অত্যাচার ও

অবিচার নীরবে সহ্য না করা, স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীর নিকট মাথা নত না করা, অন্যায়ের প্রতিকারচেষ্টাই তেজের লক্ষণ।

ক্ষমা—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিহিংসার বশে অপকারের প্রতিশোধ না নেওয়াই ক্ষমা। দুর্বল ব্যক্তি কখনও ক্ষমা করতে পারে না। তিরস্কৃত হয়ে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ না করা।

ধৃতিঃ—দেহেন্দ্রিয়কে সুস্থির করে রাখবার শক্তি। শরীর ও মনকে অবসন্ন হতে দেয় না। শক্তিতে মানুষ ঘোর বিপদে ধৈর্যহীন হয় না, গভীর শোকদুঃখে অবসন্ন হয়ে পড়ে না।

শৌচম্—শৌচ দুই প্রকার—বাহ্য শৌচ এবং আভ্যন্তর শৌচ। মনোবুদ্ধির নির্মলতা অন্তকরণশুদ্ধি।

অদ্রোহঃ—অবিরোধ। অপরকে হত্যা করবার ইচ্ছায় অস্ত্রগ্রহণকে দ্রোহ বলে। কারও সঙ্গে বিরোধ না করাকে অদ্রোহ বলে।

ন অতিমানিতা—আমি বড়, পূজ্য এই অভিমান না রাখা। আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ অভিমান পোষণই অতিমানিতা। এর অভাব নাতিমানিতা।

এখানে দৈবীভাবগুলি উভয় মার্গ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও গৃহীদের জীবনে প্রকাশলাভ করে থাকে। যেমন, অভয়—সর্বপ্রাণীই আমা হতে অভয় লাভ করুক, শ্রুতির এই আদেশ সন্ন্যাসীর জীবনে অবশ্য পালনীয়। সত্ত্বসংশুদ্ধি—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা লাভ এবং তত্ত্বজ্ঞানসহ অজ্ঞান নাশ, বাসনাক্ষয় রূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ সন্ন্যাসীর পক্ষে দৈবী সম্পদ। জ্ঞানযোগে স্থিত হলেই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

দান, দম ও যজ্ঞ—এইসব গৃহীদের প্রধান দৈবসম্পদ। স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ ব্রহ্মচারীর জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তপস্যা বানপ্রস্থ জীবনের দৈবী সম্পদ বলে কথিত হয়। অহিংসাদি একাদশ গুণ প্রধানত ব্রাহ্মণেরই অসাধারণ দৈবী সম্পদ। ক্ষত্রিয়ের তেজ, ক্ষমা ও ধৃতি দৈবী সম্পদ। বৈশ্যের শৌচ ও অদ্রোহ দৈবী সম্পদ আর নাতিমানিতা শূদ্রের অসাধারণ দৈবী সম্পদ। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম শ্লোকে নয়টি শুভ গুণ যথাক্রমে—সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমী এই চতুর্বর্ণের অসাধারণ ধর্ম বা দৈবী সম্পদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে সতেরোটি শুভ গুণ চতুর্বর্ণের পৃথক পৃথক ধর্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জগতে কেবল দুটি শক্তিই আছে—একটি হলো আত্মার শক্তি বা প্রেমের শক্তি, অন্যটি হলো দেহের বা তরোয়ালের শক্তি। কিন্তু চিরকাল আত্মশক্তি ঐ তরবারির শক্তিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, পরাস্ত করেছে। ভারতবর্ষ চিরকাল আত্মার শক্তিতে শক্তিমান ও বিশ্বাসী। এই দেশ জগৎকে প্রেমের শক্তির মহত্ত্ব দেখিয়েছে। দেহের বা তরোয়ালের শক্তি

জগৎকে ধ্বংসের পথ দেখিয়েছে। ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে—যারা শান্ত, প্রেমের শক্তিকামী তারাই জগৎকে উন্নত করেছে, যারা যুদ্ধবাজ, দাম্ভিক ও উদ্ধত, তারা জগৎকে ধ্বংস করেছে এবং সভ্যতার উন্নতিকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। এরা যদি না আসত মানবসভ্যতা আরো অনেক বেশি উন্নত হতো। তাই যারা উন্মত্ত ও হিংসায় বিশ্বাসী তারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না, যারা সত্য পথে বিশ্বাসী, নম্র, বিনয়ী, প্রেমের শক্তিতে বিশ্বাসী তাদেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ।।৪

পার্থ (হে অর্জুন) দম্ভঃ (ধর্মধ্বজীত্ব) দর্পঃ (ধন ও স্বজনাদির জন্য দর্প) চ অভিমানঃ (এবং অহংকার, অতি অভিমান) ক্রোধঃ (বাসনার অতৃপ্তিজনিত রোষ) পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুর ভাব) অজ্ঞানং চ (কর্তব্য-অকর্তব্য-বিষয়ে অবিবেক) আসুরীম্ (আসুরী) সম্পদং (সম্পত্তি) অভিজাতস্য এব (আসুরী সম্পদ্—অভিমুখে জাত ব্যক্তির) (হয়ে থাকে) ।।৪

হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক—এই ছটি আসুরী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির ভাব, অর্থাৎ যাঁরা এইসব আসুরী প্রকৃতি (রজঃ ও তমঃ) নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ভগবান এখানে আসুরী সম্পদের কথা ব্যাখ্যা করেছেন—

দম্ভঃ—আমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও রূপে সর্বোত্তম। আমি ধার্মিক, আমি পুণ্যবান, আমি দাতা—এই প্রকারের খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিবিধ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানই দম্ভের পরিচায়ক। আসুর প্রকৃতির লোকেরা ধর্মলাভ বা পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনও ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করে না, কিন্তু কেবল নিজেদের ধর্মনিষ্ঠা বা ঐশ্বর্যের পরিচয় দেওয়ার নিমিত্ত খুব ঘটা করে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে—এটাই দম্ভ।

দর্পঃ—আমার এত অর্থ, এত সম্পদ, এত শক্তি, এত প্রভাব—ধন ও আত্মীয়স্বজনের নিমিত্ত গর্ব অনুভব করা এবং নিজেকে মহান ও অসাধারণ ব্যক্তি বলে মনে করা—ইহাই দর্প।

অভিমানঃ—নিজে মোটেই সম্মানের যোগ্য নয় কিন্তু নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানীয় ভাবা এবং লোকে আমাকে সম্মান করুক এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই অভিমান।

ক্রোধঃ—কেউ অনিষ্ট করলে অথবা নিজের কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত হলে মনের ভিতর যে আগুন জ্বলতে থাকে সেটাই ক্রোধ। মনে এই ক্রোধের আগুন জ্বলতে শুরু করলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং আসুরিক কর্মের অনুষ্ঠান করে।

পারুষ্যম্—রুক্ষ বা কর্কশ কথা বলার যে স্বভাব তার নাম পারুষ্য। লোকের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার ও রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ। দম্ভ বা দর্প-যুক্ত লোকেরা অপরের সঙ্গে নম্র বিনীত

ব্যবহার করতে পারে না। তাদের বাক্যে ও আচরণে এমন একটা রুক্ষতা থাকে যা অপরের মনকে কষ্ট দেয়।

অজ্ঞানম্—কর্তব্যবোধের অভাব, বিবেকহীনতা।

এইগুলি সব আসুরী সম্পদ-সম্পন্ন ব্যক্তির গুণ। যে-সমস্ত ব্যক্তি ঐরূপ আসুরী সম্পদকে অভিলক্ষ্য করে জন্ম-গ্রহণ করে তাদের চিত্তে ঐ আসুরী সম্পদ সম্পন্ন দোষগুলি প্রকটিত হয়।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।।৫

দৈবী (সাত্ত্বিক, দৈবী) সম্পদ্ (সদ্‌গুণ) বিমোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত) আসুরী (অসুরযোগ্য সম্পদ) নিবন্ধায় (সংসার-বন্ধনের হেতু) মতা (কথিত হয়) পাণ্ডব (হে অর্জুন) মা শুচঃ (শোক কর না) দৈবীম্ (দৈবী) সম্পদম্ (সম্পদের—অর্থাৎ দৈব-সম্পদ্ প্রাপ্তির জন্য) অভিজাতঃ অসি [তুমি] (যোগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ)।।৫

দৈবী সম্পদ সংসারবন্ধন হতে মুক্তির কারণ এবং আসুরী সম্পদ সংসার- বন্ধনের হেতু হয়। হে পাণ্ডব, তুমি শোক কর না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ।

যারা দৈবী সম্পদের অভিমুখী তারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়। দেবী সম্পদ মুক্তির পথে নিয়ে যায়। যাঁরা শাস্ত্রবিহিত ধর্মানুষ্ঠান করে, শুদ্ধচিত্ত হয়ে, দৈবী সম্পদ লাভ করেন তাঁরা মুক্তিভাগী হন। তাঁরা সত্য, ত্যাগ, তপস্যা, অহিংসা প্রভৃতি সত্ত্বগুণের অধিকারী হয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করেন। এঁদের চিত্ত নির্মল এবং আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ তাই তাঁরা সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেন।

যারা আসুরী সম্পদের অভিমুখী তারা নিত্যসংসারী হয়। তারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ অযথোচিত কার্যানুষ্ঠান করে এবং রাজসী ও তামসী প্রকৃতির দ্বারা আসুর সম্পদ লাভ করে থাকে। তাদের চিত্ত দম্ভ, দর্প, অজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কামনা দ্বারা মলিন হয়ে থাকে, আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ এবং সংসারবন্ধনে আবদ্ধ। আসুরী সম্পদ সর্বদা সংসার-বন্ধনের মূল এবং বারংবার জন্ম-মরণের হেতুভূত।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আসুরী সম্পদ পরিত্যাগ করে থাকেন এবং দৈবী সম্পদের অভিমুখী হন। তাই ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি দৈবী সম্পদের অভিমুখী হয়ে জাত হয়েছ। তুমি সাত্ত্বিকী ভাব ও শুভবাসনা নিয়ে উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করেছ এবং সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশীভূত হয়েই তুমি ধর্মযুদ্ধে দাঁড়িয়েছ। এখন তুমি আসুরী সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির মতো শোক করো না। সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ করে তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করতে পারবে।

আমরা যারা গীতা অনুধ্যান করছি ভগবান আমাদের সকলকেই বলছেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত হওয়া উচিত যে—আমি দৈবী সম্পদ অধিকারের উপযুক্ত। আসুরী সম্পদের অভিমুখী আমি নই। আমরা সব দৈবী সম্পদের যোগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা দৈবী সম্পদের অধিকারী হব। যদি সামান্য ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তা শুধরে নেব।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬

পার্থ (হে অর্জুন) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দৈবঃ (দেবস্বভাব) আসুরঃ এব চ (এবং অসুরস্বভাব) দ্বৌ (দু-প্রকার) ভূত-সর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [হয়েছে] দৈবঃ (দৈবসৃষ্টি) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোক্তঃ (বলা হয়েছে) আসুরং [ভূতসর্গম্] (আসুরী প্রকৃতির) [বিষয়] মে (আমার কাছে) শৃণু (শোন)।।৬

হে পার্থ, এ জগতে দৈব ও আসুর এই দু-প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। দেবস্বভাবসম্পন্ন জীবের কথা বিস্তৃতভাবে বলেছি। এখন আসুরী প্রকৃতির ভূতসৃষ্টির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর।

এই সংসারে দুই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ থাকে। এক প্রকার দেবতাদের প্রকৃতিবিশিষ্ট, অপর প্রকার আসুর প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ। যাঁরা স্বভাবজাত রাগ-দ্বেষ আদি পরাভূত অর্থাৎ সংযত করে ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকেন, তাঁরা দেবতা। আর যারা স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য করে থাকে তারা অসুর। দেবস্বভাব মানুষ ঈশ্বরপরায়ণ, অসুর-প্রকৃতির মানুষ ঈশ্বরবিমুখ।

পূর্বে দৈব প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের লক্ষণ বিস্তারিতভাবে নানা স্থানে বলা হয়েছে—বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণে এবং এই অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে দৈবী লক্ষণ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এখন আসুরী প্রকৃতির লক্ষণ বলা হবে। আসুরী প্রকৃতির মানুষের স্বরূপ ও লক্ষণ বুঝতে পারলেই তা ঘৃণাপূর্বক ত্যাগ করতে জীবের ইচ্ছা হবে।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭

আসুরাঃ (অসুরস্বভাববিশিষ্ট) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিম্ চ (ধর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিম্ চ (এবং অধর্ম হতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না) তেষু (তাদের মধ্যে) ন শৌচং (না শুচিতা) ন আচারঃ অপি (না সদাচারও) ন চ সত্যং (এবং না সত্য) বিদ্যতে (এইরূপ প্রকৃতি বিদ্যমান)।।৭

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের ধর্মে প্রবৃত্তি হয় না, অধর্ম থেকেও তারা নিবৃত্ত হয় না। তাদের মধ্যে শুচিতা, আচার ও সত্য বলে কিছুই নাই।

যারা অসুরস্বভাবের মানুষ তারা খুব দম্ভ ও দর্প আদি ভাবযুক্ত হয়। তাদের ধর্ম ও অধর্ম জ্ঞান নেই কী করা উচিত এবং কী করা অনুচিত, কী কাজে প্রবৃত্তি থাকা উচিত এবং কোন্ কাজে নিবৃত্তি, তা তারা জানে না। শাস্ত্রীয় ধর্মাধর্ম তাদের অজ্ঞাত। লোকসমাজে যে সকল ধর্মনীতি প্রচলিত আছে তাও তারা গ্রাহ্য করে না। চিত্তের কামনা দ্বারা চালিত হয়ে তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। ঐ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জাতীয়-বিচার তাদের মধ্যে একেবারেই নেই।

তাদের শুচিতা বা পবিত্রতার বালাই নেই, সদাচারও নেই। তাদের মধ্যে সত্যও নেই। যারা অতি স্বার্থপর তাদের মধ্যে এইসব গুণ দেখা যায়। যারা স্বার্থপর, যারা চরম অসত্য পথে থাকে তাদের কোনওভাবেই সেই পথ থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। যতরকম আসুরী প্রবৃত্তি আছে,সেগুলি সবই তার মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে। তাই স্বামীজী বলছেন আমি চাই মনুষ্য তৈরির শিক্ষা, আমি চাই চরিত্র তৈরির শিক্ষা। যাদের মধ্যে কোনও উচ্চ আদর্শ নেই, যারা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাশা পূরণে নিয়োজিত, সেইসব মানুষ অসৎ হতে বাধ্য। এইসব মনুষ্যের মধ্যে সত্য ও সত্যবাদিতার কোনও আদর্শ দেখা যাবে না। কোনও প্রকার সদ্গুণই দেখা যায় না।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।।৮

তে (তারা, অসুর প্রবৃত্তির লোকেরা) আহুঃ (বলে) জগৎ (এজগৎ) অসত্যম্ (মিথ্যাব্যবহার-পরিপূর্ণ) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্মাধর্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ ([কর্মফলদাতা ঈশ্বরশূন্য]) কামহৈতুকম্ (কামবশত) অপরঃ-পর-সম্ভূতং (স্ত্রী পুরুষ-সংযোগজাত অথবা সৃষ্টি উৎপত্তি-ক্রমশূন্য) কিম্ (কি) অন্যৎ (অন্য কোনও কারণ নেই) ।।৮

তারা অর্থাৎ আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলে থাকে যে, এই জগতে সবই অসত্য ও এ-জগৎ ঈশ্বরহীন, ধর্ম বা অধর্ম এখানে কিছুই নেই। এ জগতের নিয়ন্তা কোনও ঈশ্বর নেই। স্ত্রী-পুরুষগণ কামবশে পরস্পর মিলিত হওয়ায় এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এ-জগতে সৃষ্টির অন্য কোনও কারণ হতে পারে না।

তারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পরসম্ভূত ও কামহেতুক বলে থাকে। তাদের মতে জগতের অন্য কোনও কারণ নেই। অর্থাৎ অসুরপ্রকৃতির মানুষেরা বলে—জগতে বা জগতের মূলে কোনও সত্য নেই। জগতের নিয়ম যে ধর্ম ও অধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা তারা স্বীকার করে না। ঈশ্বর যে শুভ ও অশুভ কর্মের নিয়ন্তা, সুখ-দুঃখের ফলদাতা, সকল রূপেই তিনি প্রকাশিত, নাম-এর কোনও অস্তিত্ব নেই—এই তত্ত্ব তারা

মানে না। এইজন্য তারা নির্ভয়ে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর হতে যে জগৎ প্রকাশিত এটি তারা স্বীকার করে না। তারা বিষয়ভোগ ও সুখবিলাসকে জগতের সর্বস্ব মনে করে এবং তারা বিশ্বাস করে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে অতএব কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ধর্ম-অধর্ম বা ঈশ্বররূপ কারণ এই জগতের মূলে নেই। সত্য সনাতন ঈশ্বরের ভিত্তির উপর যে জগৎ প্রকাশিত তারা বিশ্বাস করে না। কোনও উচ্চতর শক্তিকেও তারা বিশ্বাস করে না।

আসুর প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে কামনাবাসনার বশেই লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বীয় সুখের জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করে, স্বার্থপরতাই মানুষের কর্মের নীতি। কামচেষ্টাই জীবসৃষ্টির কারণ আর অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে না। আশা-আকাঙ্ক্ষায়, জীবনচর্যায় তারা ঘোর বস্তুবাদী। তাদের অভিমত, জগতের পিছনে কোনও আধ্যাত্মিক সত্য লুকিয়ে নেই। সূক্ষ্ম দিব্যশক্তি তারা মানে না। যা আমি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করব সেটিকেই আমি বিশ্বাস করব। ভোগকামনা ছাড়া জগতের আর কিছুই আমি বিশ্বাস করি না—এই হলো আমার আদর্শ। এইসব চিন্তাকে ভারতীয় দর্শন বস্তুতান্ত্রিক চার্বাক দর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন। চার্বাকপন্থীদের এই বস্তুবাদ চিন্তা, একটি নিকৃষ্টতম চিন্তা। তারা মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা মনে করে পৃথিবী একটি কমলালেবু, সেটি নিঙড়ে তার রসটুকু ভোগ করতে হবে। তাদের একটাই কথা—আমার সুখ চাই এবং যে-কোনও উপায়ে আমি তা লাভ করব।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।।৯

এতাং (এইরূপ) দৃষ্টিম্ (দৃষ্টিভঙ্গি, মত বা দর্শন) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করে) নষ্ট-আত্মানঃ (বিকৃতমতি, মলিনচিত্ত) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্মাণঃ (ক্রূরকর্মা) অহিতাঃ (অনিষ্টকারী [ব্যক্তিগণ]) জগতঃ(জগতের) ক্ষয়ায় (বিনাশের জন্যই) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।। ৯

পূর্বোক্ত আসুর প্রকৃতিমত-অবলম্বন করে বিকৃতমতি, অল্পবুদ্ধি, ক্রূরকর্মা ব্যক্তি এবং অনিষ্টকারিগণ জগতের বিনাশের জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করে থাকে। এরাই জগতের প্রকৃত শত্রুরূপে পরিচিত।

যারা আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি-রজঃ ও তমঃ দোষে তাদের আত্মা আবৃত থাকে। তাদের স্বভাব আসুর-প্রকৃতি হওয়ায় তারা জগতের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং হিংসাত্মক কাজের দ্বারা জগৎকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। তারা স্বভাবত অল্পবুদ্ধিজীবী, নষ্টচিত্ত বা মলিনচিত্ত অর্থাৎ যাদের মনে অহংবুদ্ধি তারাই অল্পবুদ্ধি। উগ্রকর্মা—এ দেহের ভোগের জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাত্মক কার্যকলাপে

লিপ্ত হয়। যেহেতু এদের মনে কোনও পাপপুণ্যের ভেদ নেই তাই। তারা মনে করে—শাস্ত্র, ধর্মনীতি, প্রভৃতি ধূর্ত প্রচারকদের কাজ। মৃত্যুর পরে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে। পরলোক বলে কিছু নেই। পাপের শাস্তি বা পুণ্যের পুরস্কার—এসব কিছুই নেই। যে-কোনও প্রকারেই ইন্দ্রিয়সুখ-চরিতার্থতা ও কামনা-পরিতৃপ্তিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। তাই এরা নিজেদের স্বধর্ম সাধন বা নিজের দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতার নিমিত্ত অপরকে উৎপীড়ন, পরধন লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্কর্মের দ্বারা জগতের ক্ষতিসাধন করে থাকে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ।।১০

(আসুরপ্রকৃতি) দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কামনা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করে) দম্ভ-মান-মদ-অন্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হয়ে) মোহাৎ (মোহবশত) অসদ্গ্রাহান্ (শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত) গৃহীত্বা (গ্রহণ করে) অশুচিব্রতাঃ (অশুচি-ব্রতপরায়ণ হয়ে) প্রবর্তন্তে [উপাসনাদিতে] প্রবৃত্ত হয়ে থাকে) ।।১০

তাদের হৃদয় দুষ্পূরণীয় বাসনাপূর্ণ। দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত হয়ে মোহবশত তারা অসৎ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে অশুচিব্রতে ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

আসুরপ্রকৃতির মানুষদের লোভ, আকাঙ্ক্ষা এতই বেশি যে তা সহজে পূর্ণ হয় না—দুষ্পূরণীয়। শতকোটি বর্ষ ভোগ করলেও যে বিষয়-বাসনার পরিপূর্তি হয় না, সেই বাসনায় পূর্ণ জীবগণ দম্ভ, অভিমান, অহংকার ও মোহবশত অধিক বিষয় ভোগ করবার দুরাশায় প্রভাবিত হয়। 'এই সাধনা করলে অধিক ফল লাভ হবে বা কাউকে বশীভূত করতে সিদ্ধ হব'—এইরূপ অশুচিব্রতে তারা প্রবৃত্ত হয়।

এরা বেশি ফল লাভের আশায় নানা অপদেবতার আরাধনা, মন্ত্র, তন্ত্র কিংবা যজ্ঞের সাধনা করে। অহংকারে মত্ত হয়ে অপরকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে যায়। অসৎ পথ অবলম্বন করে জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় প্রবৃত্ত হয়। অপবিত্র, অশাস্ত্রীয় কর্মকেই এরা ব্রতরূপে গ্রহণ করে অনুষ্ঠানে রত হয়। পরিণামে তাদের অকীর্তির সুবাদে নরকে গতি হয়। চিন্তায় ও কাজে তারা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ।।১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ।।১২

প্রলয়-অন্তাম্ (প্রলয়পর্যন্ত বা মৃত্যুকাল-পর্যন্ত স্থিতিশীল) অপরিমেয়াম্ চ (এবং অপরিমিত) চিন্তাম্ (বিষয়চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করে) কামোপভোগ-পরমাঃ

(কামভোগপরায়ণ) এতাবৎ ইতি [কামভোগেই পরম পুরুষার্থ] এরূপ) নিশ্চিতাঃ (স্থির নিশ্চয় করে) আশা-পাশ-শতৈঃ (শত শত আশারূপ রজ্জুতে) বদ্ধাঃ (বদ্ধ হয়ে) কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ (কাম-ক্রোধপরায়ণ হয়ে) কাম-ভোগ-অর্থম্ (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অসৎ-উপায়-অবলম্বনপূর্বক) অর্থ-সঞ্চয়ান্ (অর্থ-সঞ্চয়ের) ঈহন্তে (চেষ্টা করে) ।।১১-১২

ঐ আসুর প্রকৃতিরা মৃত্যুপর্যন্ত অপরিমেয় বিষয়-চিন্তাকে আশ্রয় করে কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ পদার্থ, এর অতিরিক্ত আর কিছু নেই (কামই পুরুষার্থ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ)—এরূপ কৃতনিশ্চয় হয়ে শত শত আশাপাশদ্বারা আবদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হয়ে, কামোপভোগের জন্য অসদবৃত্তি অবলম্বন করে অন্যায়ভাবে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে।

আসুরী প্রকৃতির লোকেরা একমাত্র ভোগ-কামনা পূরণই নিজ জীবনের পুরুষার্থ বলে মনে করে এবং তাতেই মানবজীবনের সার্থকতা বলে এদের বিশ্বাস। সমস্ত জীবন বিষয়-কামনার চিন্তায় ও উদ্বেগে তারা দিন কাটায়। মৃত্যুকালেও এই বিষয় চিন্তার বিরাম হয় না। এদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগই সংসারের সব। এর অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থতে মানবজীবনের সমস্ত সুখ নিহিত—এটাই তারা মনে করে। এর চেয়ে উচ্চতর কোনও সুখের কল্পনা এরা করতে পারে না।

ধন, মান, উচ্চপদ, সম্পদ, প্রভুত্ব, সুখ ও ভোগের আশা—এরূপ কত আশাই না এদের হৃদয়ে উঠতে থাকে! এই সকল আশা দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সংসারের জালে আরও আবদ্ধ হয়ে তারা জীবন কাটায়। বিভিন্ন বিষয়ভোগের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন আছে বলে এরা অনুচিতভাবে নানাবিধ অসৎ পথ অবলম্বন করে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। সেই বাসনার জালে ডুবে থেকে অপরের অর্থের লোভ, পরদ্রব্য লুণ্ঠন, মিথ্যা কথা প্রভৃতি অসৎ কার্যে এরা সহজেই নিয়োজিত হয়। তাদের একটাই কথা 'যত দিন দেহ থাকবে, ততদিন খাও, পর ও আনন্দ কর' বিষয়-বাসনা ভোগ জীবনের চরম সার্থকতা। তাই —ভোগ করতে হলে অর্থ চাই।অসৎ উপায়ে বিত্ত সঞ্চয়। অতএব যে-কোনও উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করতে হবে। তার জন্য নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ।।১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ।।১৪

অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) ইদম্ (এই বস্তু) লব্ধম্ (লাভ করা হলো) ইদং (এই) মনোরথম্ (অভিলষিত বস্তু) প্রাপ্স্যে ([পরে] পাব) ইদং (এই ধন বা বস্তু) অস্তি

(আছে) পুনঃ (আবার) মে (আমার) ইদম্ (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হবে) ।।১৩

অসৌ (ঐ) শত্রুঃ (শত্রু) ময়া (আমার দ্বারা) হতঃ (হত হয়েছে) অপরান্ অপি চ (এবং অন্য শত্রুদেরও) হনিষ্যে (বিনাশ করব) অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু, ঐশ্বর্যশালী) অহং (আমি) ভোগী (ভোগের অধিকারী) অহং (আমি) সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্য) বলবান্ (শক্তিশালী) সুখী (সুখী) ।।১৪

'আজ আমার এই ধন লাভ হলো', 'পরে এই অভীষ্ট বস্তু শীঘ্রই পাব', 'এই ধন আমার আছে', 'ভবিষ্যতে এই ধনলাভ হবে'।

'আমি এই শত্রুকে নাশ করেছি', 'অন্য শত্রুদেরও বিনাশ করব', 'আমিই ঈশ্বর', 'আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান ও আমিই সুখী'।

আসুর প্রকৃতির মানুষগণ কেবল ধন-তৃষ্ণতেই দিনপাত করে। কত ধন পেলাম, কত ধন পাব, অন্য ধন কীরূপে আমার হবে, ধন লাভের জন্য নতুন নতুন পথ খুঁজে বার করব—এই প্রকার বিষয়চিন্তা দ্বারা তারা নিজ নিজ অধোগামী নরকের পথ সহজ করতে থাকে।

আসুর প্রকৃতি মানুষের চিন্তাই হলো—এমন যে দুর্জয় শত্রু, তাকেও আমি ধ্বংস করেছি। আমার মতো বীর কে আছে? আর অপর যে শত্রু আছে, তাকেও আমি বিনাশ করব ও তার ধন ইত্যাদি হরণ করব। আমার সমকক্ষ কে আছে? অন্যরা কীট-পতঙ্গের মতো—একমাত্র আমিই শক্তিশালী, ঈশ্বরের সমান। এই সংসারে বিষয় ভোগ করবার অধিকারী তো আমিই। ভ্রাতা, পুত্র, আত্মীয় সব আমাকে সুখ দেওয়ার জন্য রয়েছে। আমি যা চাই, তাই করতে পারি। আমার তুল্য পরাক্রমী ও সুখী আর কে আছে।

অসুর-জাতীর মানুষের চিন্তা এই রকমই। যারা মানব সমাজের প্রভূত সর্বনাশ করেছে, তাদের জীবনী যদি পড়া যায় তাহলে দেখা যায়, তাদের চিন্তাধারা এরকমই ছিল।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ।।১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ।।১৬

আঢ্যঃ (ধনবান) অভিজনবান্ (উচ্চবংশজাত) অস্মি (হই) ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ (অপর) কঃ (কে) অস্তি (আছে) যক্ষ্যে (যজ্ঞ করব) দাস্যামি (দান করব) মোদিষ্যে (আনন্দ করব) ইতি (এরূপ) অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ (অবিবেকমুগ্ধ জনগণ) অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ (অনেক প্রকার কল্পনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত) মোহ-জাল-সমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছন্ন) কাম-ভোগেষু (বিষয়বাসনা-ভোগে) প্রসক্তাঃ (আসক্ত) [জনগণ]) অশুচৌ (অপবিত্র, অশুচি) নরকে (নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ।। ১৫-১৬

'আমি ধনী', 'আমি উচ্চবংশজাত', 'আমার তুল্য আর কে আছে', 'আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ-আহ্লাদ করব'—এরূপ অজ্ঞান অভিমানে বিমোহিত, বিবিধ বিষয়চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে আচ্ছন্ন বুদ্ধি, বিষয়ভোগে প্রবল আসক্ত আসুরী-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হয়।

এরা মনে করে—ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমার মতো আর কে আছে? যা কেউ করতে পারে না এরূপ কর্ম ধূমধামের সঙ্গে আমি সম্পন্ন করব। কত লোক আমার বাড়িতে আসবে। সকলে আমার স্তুতি করবে। আমি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে ধন দান করব, তাতে তারা আরো আমার প্রশংসা করবে। লোকেও আমার যশোকীর্তন করবে।

অসুর ভাবাপন্ন মানুষগণ এইরূপ চিন্তায় বিমোহিত থাকে। নানা বাসনার দ্বারা এদের চিত্ত বিভ্রান্ত থাকে। নানা অসৎ চিন্তা দ্বারা চিত্ত অস্থির। এক বাসনা পূরণ না হতেই অপর বাসনার উদয় হয়। চিত্ত ভ্রমজালে আচ্ছন্ন থাকে তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। স্থির শান্তভাবে এরা কোনও বিষয় বিবেচনা করতে পারে না। কেমন করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করবে, কেমন করে ধন-জন, মান-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে—এই চিন্তায় সর্বদা আকুল থাকে। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তারা বাঁচে। নিজের অহং ও স্বার্থকে কীভাবে আরো বৃদ্ধি করবে এটাই তাদের একমাত্র চেষ্টা। অতএব এরা অজ্ঞানের অন্ধকারে বাস করে। নিজের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, প্রকৃতির মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন—এই চিরন্তন সত্য তারা অগ্রাহ্য করে তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আনন্দ ও শান্তি তারা অনুভব করতে পারে না। ফলত অশুচি নরকে পতিত হয়ে তারা নানা ক্লেশ ভোগ করতে থাকে। নরকে বাস বলতে—নরকসদৃশ অতি জঘন্য জীবনযাপন। মানুষের ভিতরেই নরক অর্থাৎ অশুভ শক্তিতে পূর্ণ—তাই নরক।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ।।১৭

আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট, আত্মগর্বিত) স্তব্ধাঃ (অবিনয়ী) ধন-মান-মদ-অন্বিতাঃ (ধননিমিত্ত অভিমান ও মদগর্বিত) তে (তারা) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নাম-যজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা) অবিধিপূর্বকম্ (শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনপূর্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করে) ।।১৭

আত্মশ্লাঘাযুক্ত, অবিনয়ী, ধনমানের গর্বে বিমূঢ় ও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সেই অসুরপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ দম্ভে স্ফীত হয়ে শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।

আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অত্যন্ত গর্বিত। সাধারণত সম্মানিত ব্যক্তিগণ যাঁকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মানভাজন। কিন্তু আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে অপর কেউ সম্মান না করলেও নিজেরাই নিজদিগকে সম্মানভাজন বলে মনে করে। ধনাভিমানে, আত্মাভিমানে

ও বৃথা অভিমানে মত্ত হয়ে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে যাগ যজ্ঞের—অনুষ্ঠান করে। এরা এতটাই ধন ও মানে মত্ত থাকে যে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কারণ কারও নিকট এরা নম্র হয় না, পূজ্য গুরুজনের সঙ্গে বিনয়নম্র ব্যবহার করতে জানে না। এদের যাগযজ্ঞ কর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা থাকে না। এদের সবকিছু আচার-আচরণ অশাস্ত্রীয়। ফলে শাস্ত্রীয় মত অনুসারে দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র বা কর্মানুষ্ঠানে এদের কোনও রুচি থাকে না। শাস্ত্রীয় নিয়ম এরা লঙ্ঘন করে। যা কিছু লোকদেখানো করে সবই ঔদ্ধত্যের প্রকাশ, আত্মগরিমা ও ঐশ্বর্যের অহংকারে করে থাকে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ।।১৮

অহঙ্কারং (অহংকার) বলং (পরপীড়নের শক্তি, বল) দর্পং (ধর্মলঙ্ঘনের কারণ দর্প) কামং (কাম, রতিবৃত্তি) ক্রোধম্ চ (ও বাসনা-প্রতিঘাতজনিত ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (সম্যকরূপে আশ্রয় করে) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াকারিগণ) আত্ম-পর-দেহেষু (স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত) মাম্ (আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) প্রদ্বিষন্তঃ (প্রবলভাবে বিদ্বেষ করে) ।।১৮

সৎব্যক্তিগণের বিদ্বেষকারী বা অসূয়াকারী সেই সব অসুররা অহংকার, বল, দর্প, রতিবৃত্তি ও ক্রোধকে আশ্রয় করে নিজদেহ ও পরদেহে অবস্থিত চৈতন্যসত্তারূপ আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে প্রবলভাবে দ্বেষ করে থাকে।

আসুর স্বভাববিশিষ্ট পুরুষগণ নিজেদের মধ্যে কোনও গুণ বা শরীরে বল না থাকলেও নিজেদেরকে সর্বাপেক্ষা গুণবান ও বলবান বলে মনে করে। বল, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রবৃত্তিদ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের অন্তরে এবং অপরের অন্তরে স্থিত ভগবানকে অস্বীকার করে। গুরু ও সজ্জনগণকে অবজ্ঞাপূর্বক নিজেকে মহান বোধে বৃথা দর্প করে। অপরের সুখ্যাতি বা প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করে।

সর্বদা এদের চেষ্টা কিরূপে কিসে লাভ হবে, কিকরে অন্যের অনিষ্ট করব—এরূপ চিন্তাতে এদের চিত্তে প্রবাহ চলতে থাকে। নিজেদের কামনা পরিতৃপ্তির জন্যই যথেচ্ছ আচরণ করে, আর কারও শাসন বা প্রভুত্ব এরা মানে না। সমাজে ঈশ্বরভক্ত যেসকল সাধুসজ্জন ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সৎপথে থেকে সদাচারে জীবন-যাপন করেন, এরা তাঁদের সুখ্যাতি বা প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। তাঁদের উপর বিবিধ দোষ আরোপ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করে।

যারা সর্বদা দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হয়ে জীবন-যাপন করে, চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় যাদের বিশ্বাস থাকে না এবং আত্মার আনন্দে যারা প্রীত হয় না তাদের মধ্যে কোনও ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না। কারণ যারা সদাচারী, সাধু ও গুরুজনদের অবজ্ঞা করে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ

ব্যক্তির প্রতি যারা অসূয়াপর সেইসব আসুর প্রকৃতি ব্যক্তির হৃদয়ে কীভাবে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হবে? অতএব ভক্তিহীন ব্যক্তির অধোগতি হবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ।।১৯

অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূরকর্মা) নর-অধমান্ (নরাধম, মনুষ্যনামের অযোগ্য) অশুভান্ তান্ (সেই অশুভকারীদের) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুর, অসুরযোগ্য) যোনিষু এব (পশ্বাদি পাপযোনিতে) অজস্রম্ (পুনঃ পুন) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ।।১৯

আমার দ্বেষকারী, ক্রূরমতি, অশুভস্বরূপ, নরাধম সেই অসুর প্রকৃতির জনগণকে আমি সংসারে অসুরযোগ্য পশ্বাদি পাপযোনিতে বারবার নিক্ষেপ করে থাকি।

অশুভ-গুণে পরিপূর্ণ আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ভগবান কখনো কৃপা করেন না। তারা পশুতুল্য লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে নানা দুঃখ ভোগ করতে থাকে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্মকারিগণ শীঘ্রই নীচ পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, জগতে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ ধর্মাত্মা, কেউ আবার পাপাত্মা, কেউ সুখী, কেউ আবার দুঃখী--এসব ঈশ্বরের সৃষ্টি-বৈষম্যহেতু নয়। মানুষ নিজ নিজ পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল অনুসারে এই জীবন লাভ করে থাকে। যে যেমন বীজ বপন করে, তার বৃক্ষ সেইরূপ ফল প্রসব করে থাকে। যাদের পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে, সাধু-প্রবৃত্তিতে ও ভগবানে ভক্তি নেই, তাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

এইসব মানুষ চরম নিষ্ঠুর হয়। সন্ত্রাসবাদী বা অপরাধীরা যেমন বর্বর আচরণ করে থাকে তারাও অনুরূপ কর্ম করে। তাদের মধ্যে যে সৎ বা দিব্য ভাব আছে তা তারা ভুলে যায় এবং পৈশাচিক নিষ্ঠুর কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তারাও মানুষ কিন্তু তাদের প্রবৃত্তি ও চিন্তাধারা এতটাই আসুরিক যে তাদের নরাধম বলা হয়। তাই ভগবান বলছেন, ঐ শ্রেণীর মানুষের কর্মের ফল অনুসারে তাদের অসুর যোনিতে নিক্ষেপ করা হয়। তবে শাস্ত্র বারবার বলছেন, তারা চাইলে তাদের স্বভাব বদলাতে পারে। মানুষ তার স্বভাব অবশ্যই পালটাতে পারে, তার মনের উৎকর্ষসাধন করতে পারে। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা তাদের অবশ্যই আছে। তবে তাদের নিজেদের অন্তরে শুভচেতনা জাগ্রত করতে হবে।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ।।২০

কৌন্তেয় (হে কুন্তিপুত্র) মূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (জন্ম বা যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হয়ে) মাম্ (আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে)

অপ্রাপ্য এব (না পেয়েই) ততঃ (পূর্বাপেক্ষা আরও) অধমাং গতিম্ (অধোগতি অর্থাৎ নীচযোনি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ।।২০

হে কৌন্তেয়! এসকল মূঢ়ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পেয়ে ক্রমে আরও অধম গতি লাভ করে, অর্থাৎ নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

যে ব্যক্তি একবার আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়, এই অবিবেক কর্মের ফলে তার অন্তরে শুভ ভাব জাগ্রত হয় না, তাই তার জন্মে জন্মে আরও অধোগতি হয়ে থাকে। মানুষের অন্তরে শুভ ভাব জাগ্রত হলে বিবেক ও ভক্তি লাভ হয়, তখন ভগবান লাভ সম্ভব হয়। তমোগুণী আসুর প্রকৃতির মানুষের মধ্যে এই দুটি ভাব অর্থাৎ বিবেক ও ভক্তি প্রকাশ পায় না। তাই একবার অধোগতি অর্থাৎ পশুযোনি কিংবা আসুর যোনি প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য। কারণ মূঢ় ব্যক্তির সহজে সৎ-কাজে প্রবৃত্তি হয় না। সৎকাজ না করলে অন্তরে শুভ ভাব জাগ্রত হয় না। অতএব সৎকাজ না করলে পাপ-পুণ্য বা উচিৎ-অনুচিত সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হয় না অর্থাৎ বিবেক-লাভ হয় না। অশুভ চিন্তায় ও নিষিদ্ধ, অশাস্ত্রীয় কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ কখনও সৎকার্য ও শুভচিন্তা করতে পারে না ফলত তারা আরও ক্রমশ নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শীঘ্রই আসুরী সম্পদ্ পরিত্যাগ করে দৈবী সম্পদের আশ্রয় নিয়ে থাকেন ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ।।২১

কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা (এবং) লোভঃ (লোভ) ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) নরকস্য (নরকের) দ্বারম্ (দ্বার) [অতএব] আত্মনঃ (আত্মার) নাশনং (নাশক অর্থাৎ অধোগতি-দায়ক) তস্মাৎ এতৎ (সেইহেতু এই) ত্রয়ং (তিনটি) ত্যজেৎ (ত্যাগ করা উচিত) ।।২১

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ জানবে, কারণ এগুলি আত্মার বিনাশের অর্থাৎ অধোগতির মূল কারণ, অতএব এই তিনটিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।

মানুষের প্রধান শত্রু বা মহান রিপু হলো তিনটি—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হতে পারে না। এই তিনটি রিপু মানুষকে স্বর্গাদির সুখে বঞ্চিত করে ও অধস্তন নরকের দিকে নিক্ষেপ করে। এগুলি মানুষের পুরুষার্থ বিনাশ করে। এই তিনটি রিপুর বশে মানুষ সব রকম অশুভ কাজ করতে পারে। এই তিন রিপুর প্রভাবে মানুষ জগতে কত যে অপকর্ম করে থাকে তার ইয়ত্তা নাই। সকল রকম অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় কার্যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হলে মানুষের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়। তখন সে ঘৃণিত কর্মে নিযুক্ত হয়। ক্রোধে মানুষ জগতের যে কোনও সর্বনাশ করতে ইতস্তত করে না

আর লোভের বশে মানুষ নরহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ যেমন একে অপরকে শোষণ করে, তেমনি এক জাতি অপর জাতিকে শোষণ করে, সবল দুর্বলকে শোষণ করে। তাই বিবেকবান জ্ঞানী ব্যক্তি যত্নপূর্বক এই তিনটি প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করেন। সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা ও বিবেক বুদ্ধির দ্বারা এই তিনটি শত্রুর হাত হতে আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে অন্যথায় কোনও কল্যাণ সম্ভব নয়।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম ।।২২

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনটি) তমোদ্বারৈঃ (তমোময় নরকের দ্বার হতে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হয়ে) নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ (নিজের বা আত্মার) শ্রেয়ঃ (আত্মকল্যাণ) আচরতি (আচরণ করে) ততঃ (সেই শ্রেয় আচরণের ফলস্বরূপ) পরাং (শ্রেষ্ঠ) গতিম্ (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) ।।২২

হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি হতে মুক্ত হলে মানুষ ঈশ্বর আরাধনারূপ আত্মকল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয় এবং অন্তে পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে।

বিধিপূর্বক মানুষ স্বধর্ম পালন করতে করতে তার মধ্যে রাজসিক ও তামসিক ভাব ক্ষীণ হয়ে সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রকাশ হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা মানুষ তার কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করতে সক্ষম হয় এবং শ্রেয়ঃসাধনে রত হয়। যতদিন মানুষ এই তিনটি অপগুণের অধীনে থাকে ততদিন সে আপনার শ্রেয় পথ ত্যাগ করে প্রেয়কেই বরণ করে নেয়। শ্রেয় অর্থাৎ মঙ্গল, ধর্ম ও মোক্ষের পথ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের পথ, ধর্মের পথ এবং প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়, মনোমতো অধর্ম,ভোগ ও বাসনার পথ। কাম, ক্রোধ ও লোভ অর্থাৎ কামনার পরিতৃপ্তিকেই জীবনের পুরুষার্থ মনে করে এই পথের মানুষ। দুঃখ ও মোহপূর্ণ এই প্রবৃত্তির পথ হতে মুক্ত হলেই শ্রেয় পথের শুরু হয়। শ্রেয় পথের সাধনার দ্বারাই মানুষ ক্রমশ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ।।২৩

যঃ (যে) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রের বিধি [নিষেধ]) উৎসৃজ্য (লঙ্ঘন করে) কামকারতঃ (যথেচ্ছভাবে) বর্ততে (কর্মে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সে) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ন সুখং (না-সুখ—দিব্যানন্দ) ন পরাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠ গতি মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না) ।।২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি বা শাস্ত্রের অনুশাসন ত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি

অর্থাৎ পুরুষার্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। অতএব সে জীবনে পরমসুখ বা মুক্তি কিছুই পায় না।

শাস্ত্র বিধিনিষেধ দ্বারা আমাদের জীবনের কর্তব্য ও অকর্তব্য ঠিক করে দেয়। শাস্ত্র আমাদের জীবনকে শাসন করে থাকে। জগতে কোনটি শ্রেয় এবং কোনটি প্রেয় মানুষকে সেটি বিচারপূর্বক গূঢ় অর্থ দ্বারা শিক্ষা দেবার জন্য শাস্ত্র প্রণীত হয়েছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বাক্য দ্বারা, নানাবিধ উপদেশের মাধ্যমে, অধিকারী অনুসারে মানুষের মঙ্গল বিধান করছেন এবং জীবনকে সঠিক পথে চালনা করছেন। শাস্ত্র ঐহিক অর্থাৎ এই জগতে এবং পারলৌকিক অর্থাৎ অন্য লোকে বা পরলোকে কল্যাণলাভের পথ প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করে, বিষয়-বিষরূপ অগ্নিতে নিজ দুর্বল বুদ্ধি দ্বারা যথেচ্ছ অসৎ ভোগের কর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে, তাহলে তার কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না। তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনও কল্যাণ বা সুখ লাভ হয় না। অশাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠান করে সে ধর্মভ্রষ্ট হয় এবং তার স্বর্গ বা মুক্তি লাভের কোনও উপায় থাকে না। আবার অধ্যাত্মবিজ্ঞান হল জীবনের উচ্চতম স্তরে ওঠার বিজ্ঞান। অধ্যাত্মপথই শ্রেয় পথ। সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞান অর্থাৎ গূঢ় আত্মতত্ত্ব জানতে হলে একমাত্র শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। তাই আমাদের শাস্ত্র মেনে চলতে হয়, শাস্ত্র অনুসরণ করতে হয়, শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করা উচিত নয়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি আমাদের মঙ্গলের জন্যই দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে, নিজের অজ্ঞান মোহবশে কর্ম করে, সে ব্যক্তি কখনই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে না এবং সে জীবনে সুখ-শান্তি, পরমগতি বা মোক্ষ কিছুই পায় না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ।।২৪

তস্মাৎ (সেজন্য) কার্য-অকার্য-ব্যবস্থিতৌ (কর্তব্য ও অকর্তব্য নিরূপণে) শাস্ত্রং (বেদানুগত শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণম্ (প্রমাণস্বরূপ) [সুতরাং] ইহ (এই মনুষ্যলোকে) শাস্ত্র বিধান-উক্তং (শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধব্যবস্থা) জ্ঞাত্বা (জেনে) কর্ম (কর্তব্য কর্ম) কর্তুম্ (করা) অর্হসি (উচিত হবে) ।।২৪

অতএব কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ-ব্যবস্থা জেনে এই কর্মভূমি মনুষ্যলোকে কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

কর্ম ও অকর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য, সৎ ও অসৎ, সত্য ও মিথ্যা—এইসব নিরূপণ করতে হলে শাস্ত্রই প্রমাণস্বরূপ। আবার শাস্ত্রবিধি না মানলে অর্থাৎ লঙ্ঘন করলে মানুষের অধোগতি হয়। অতএব হে অর্জুন, তুমি স্বেচ্ছানুসারে অশাস্ত্রীয় কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করে শ্রেয় পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ো না। শাস্ত্র তোমার বর্ণাশ্রম ও স্বধর্ম অনুসারে যেরূপ যুদ্ধকার্যের ব্যবস্থা ও উপদেশ দিয়েছে, তার অমর্যাদা করে অসুরসম্পদের অধিকারী হয়ো না। যা শাস্ত্রবিহিত, তা তোমার রুচিকর হোক বা না হোক, তারই অনুষ্ঠান কর, তাতেই তোমার পরম কল্যাণ হবে।

আমাদের জ্ঞানের উৎস ও প্রমাণ হলো শাস্ত্র। শাস্ত্রকে জীবনে মেনে চললেই আমাদের কল্যাণ। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রুতি অর্থাৎ বেদের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ সকলেই সমান। এক আত্মা—ভেদ-দৃষ্টি দূর করতে হবে। অতএব আমাদের উভয়ের জন্য শাস্ত্র একই নীতি নির্দেশ করেছে। শাস্ত্র কখনও বৈষম্যমূলক শিক্ষা দেয় না।

তাই ভগবান বলছেন, 'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণম্ তে'—শাস্ত্রকে তোমার পথপ্রদর্শকরূপে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্রের শিক্ষা দ্বারা আমরা বহির্জীবনের কর্মদক্ষতা ও অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশ—এই দুই দিকেরই বিকাশ করতে সক্ষম। বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য। শাস্ত্র-শিক্ষা বিশেষ করে এই গীতাশাস্ত্রের শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন। মানুষ তৈরি, চরিত্রগঠন ও দেশগঠন করতে গীতার বাণীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বাণী। এককথায় মানুষ ও দেশের পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থাৎ মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য গীতার বাণী অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদগীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ-যোগ-নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি চব্বিশটি শ্লোকে সমাপ্ত। এ অধ্যায়ে মুখ্যত দৈব ও আসুর-সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা ও বিভাগ করা হয়েছে। গীতাতে 'ক্রিয়া' ও 'কর্মের' সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে--তিন গুণের ক্রিয়াতে মানুষ কর্ম করে। তমোগুণের ক্রিয়াতে মানুষ তামসিক কর্ম করে। রজোগুণের ক্রিয়াতে মানুষ রাজসিক কর্ম করে। সত্ত্ব গুণের ক্রিয়াতে মানুষ সাত্ত্বিক কর্ম করে। তামসিক ও রাজসিক কর্ম মানুষকে অনৈতিক ও স্বার্থপর করে তোলে, আসুরিক সম্পদ বৃদ্ধি করে। সাত্ত্বিক কর্ম অর্থাৎ মানুষের ও দেশের সেবা—এই কর্ম মানুষকে ধর্ম ও সৎ পথে রাখে, দেবভাব বৃদ্ধি করে।

সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ও বৃদ্ধিতে ইতিবাচক শাস্ত্রমূলক যে-সকল সদ্গুণযুক্ত ভাবগুলি জীবের মধ্যে প্রকাশিত হয় তা দৈবী সম্পদ। এইরূপ দৈবী সম্পদবিশিষ্ট মানুষই দৈব-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। এঁরা সত্ত্বগুণ-প্রধান, প্রকৃত ভগবৎ বিশ্বাসী, ভগবৎ ভজনপরায়ণ এবং এঁদেরকে 'মহাত্মা' এবং 'দেবতা' শব্দে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দৈবী সম্পদের বিপরীত ও দৈবী সম্পদ ব্যতীত যা কিছু, তা আসুরী সম্পদ। আসুরী অর্থাৎ রাজসী এবং রাক্ষসী অর্থাৎ তামসী প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের সকল লক্ষণ, গুণগুলিকে আসুরী সম্পদ বলা হয়। মানুষ প্রধানত তিনটি প্রবৃত্তি—কাম, ক্রোধ ও লোভ-এর প্রভাবে মোহগ্রস্থ হয় ও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়।

একমাত্র সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা হৃদয়ে ভগবৎভক্তি প্রকাশ ঘটে। সাত্ত্বিক ভাব পরিত্যাগ করলে মানুষ তমোধর্মের বশীভূত হয়ে আসুর-স্বভাব লাভ করে। অতএব আসুরী সম্পদ পরিত্যাগপূর্বক দৈবী সম্পদের অধিকারী হতে পারলেই মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। দৈবী সম্পদলাভে মুক্তি, আর আসুরী সম্পদলাভে বন্ধন এবং তাদের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সদাচার, পবিত্রতা ও সত্যপরায়ণতা থাকে না। তারা স্বল্পবুদ্ধি, মলিনচিত্ত, উগ্রকর্মা ও জগতের অহিতকারক। কামোপভোগেই তাদের চরম ও পরম গতি এবং ভোগসিদ্ধির জন্য তারা অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আমাদের সকলের জীবনে সর্বদা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনেই দৈনন্দিন জীবনে কর্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে যথেচ্ছাচারী হয়ে কর্ম করলেই ঈশ্বর আমাদের কর্মফল অনুসারে আমাদের অসুর-যোনিতে প্রেরণ করে থাকেন। একবার অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করলে পুনরায় শ্রেষ্ঠ যোনিতে ফেরা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অতএব আসুরস্বভাব পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, সততা ও পুরুষকার সহকারে দৈনন্দিন জীবনে শাস্ত্রানুসারে ভগবৎ ভক্তিধর্ম পালন করে জীবন-পথে চলাই একমাত্র পথ।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

অর্জুনের প্রশ্নে শ্রীভগবান এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন—তিন গুণের ক্রিয়ার প্রভাবে কিভাবে তিন প্রকার শ্রদ্ধা মানবজীবনে প্রকাশিত হয়। তাই এই অধ্যায়ের নাম 'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ'। ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ছাড়াও এই অধ্যায়ে তিনগুণের প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধ যজ্ঞ, ত্রিবিধ তপস্যা, ত্রিবিধ দান ইত্যাদি বিষয়ও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

তিনগুণভেদে মানুষের ত্রিবিধ স্বভাব বা অন্তঃকরণের বৃত্তি হয়, অতএব স্বভাবভেদে তাদের শ্রদ্ধাও সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয়ে থাকে। শ্রদ্ধাভেদে মানুষের কর্মও বিভিন্ন হয়। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধক দেবতার আরাধনা সাত্ত্বিক কর্ম করেন। রাজসিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন মানুষ কামনাসংকুল চিত্তে যক্ষরক্ষাদির পূজা ইত্যাদি তামসিক কর্ম করেন। আবার তামসিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন মানব রোগমুক্তি প্রভৃতি কামনা করে ভূতপ্রেতাদি উপদেবতার উপাসনা ইত্যাদি তামসিক কর্ম করেন।

শ্রদ্ধাভেদে সাধনাও তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সাধনা। সাত্ত্বিক সাধনায় সাধক ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা ঈশ্বরের শুদ্ধ নামটি নিয়ে থাকে, আর কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। নিষ্কামভাবে শুধু ঈশ্বরলাভের জন্য বা ভগবানের চরণে ভক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা, তাঁর নামজপ করা, অনুরাগের সঙ্গে তাঁর নামগুণগান করাকে সাত্ত্বিক সাধনা বলে। সাধনা গোপনে ও নির্জনে, 'মনে, কোণে ও বনে'।

রাজসিক সাধনায় নানারকম প্রক্রিয়া—এতবার পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে প্রভৃতি। বিশেষ আড়ম্বরসহ পূজা করতে হবে, লোকবল, অর্থ ও সময় প্রয়োজন। এতে জানাজানি খুব হয়। অনেক ক্ষেত্রে হাতে হাতে ফলও পাওয়া যায়। অসুখ ভাল করা, মোকদ্দমায় জয়লাভ, মান, যশ ইত্যাদি হয়।

তামসিক সাধনা সম্বন্ধে বলেছেন—তামসিক সাধনা অর্থাৎ তমোগুণ আশ্রয় করে সাধনা। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নেই। তামসিক ভাব—'জয় কালী! কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস।' আবার নানা প্রকার অশুভ ফল লাভের আশায় ভূতপ্রেতাদি উপদেবতারও সাধনা করে থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের অতীত অবস্থাকে বলা হয়েছে ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—তুমি ত্রিগুণাতীত হও। প্রকৃতির তিন গুণের বশে থাকলে, প্রকৃতিভেদে আহারও ত্রিবিধ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান সবই ত্রিবিধ। তাই এই অধ্যায়ে সাধনার অঙ্গরূপে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—এই সংসারে জীবের চার থাক আছে—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য। এই চার প্রকার মানবের প্রকৃতিভেদে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার।

শ্রদ্ধাই ধর্মকর্মের প্রাণস্বরূপ। শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলেই যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি সৎকর্মে পরিণত হয় এবং তার ফলও শুভ হয়। নচেৎ ঐসকল কর্ম শুধু কর্মমাত্র অর্থাৎ শ্রদ্ধার অভাবে যে-কোনও কর্মই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, তা অসৎকর্মরূপে গণ্য হয়। ঐসব কর্ম শুভ ফলদায়ক হয় না, বরং অশুভ ফলের জনক হয়।

আবার মানবের ভিতর যে তিন গুণের প্রকাশ তাও নিজ নিজ পূর্বকৃত কর্মানুসারে প্রকাশিত। পূর্বকৃত প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করবার জন্য জীব জন্ম গ্রহণ করে থাকে। শ্রীভগবান কর্মফলদাতা-মাত্র। তিনি কেবলমাত্র জীবের কর্মফল-ভোগের ব্যবস্থা করে দেন, যাতে জীব নিজ নিজ কর্মফলভোগ করে মুক্তিপথে অগ্রসর হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে বলেছেন—'শুভকর্মে শুভ, মন্দে মন্দ ফল। এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।' শ্রীভগবান প্রত্যেক জীবকেই শুভ কর্মের শুভ ফল এবং অশুভ কর্মের অশুভ ফল দেন। এ নিয়মের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় না, অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিজ নিজ কর্মের ফলভোগ করতে হয় এবং ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু প্রত্যেকের জন্য এই একই বিধান। তাই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সকল কর্ম করাই একান্ত কাম্য।

অর্জুন উবাচ
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ।।১

অর্জুন (অর্জুন) উবাচ (বললেন) কৃষ্ণ (হে ভগবান) যে (যারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শ্রুতিস্মৃতিরূপ শাস্ত্রের বিধানকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করে) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা বা আস্তিক্যবুদ্ধির সঙ্গে) অন্বিতাঃ (যুক্ত হয়ে) যজন্তে (দেবতাদের পূজাদি করে) তেষাং (তাদের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা) কা (কীরূপ) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণান্বিত) রজঃ (রজোগুণান্বিত) আহো (অথবা) তমঃ (তমোগুণান্বিত)।।১

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে অর্থাৎ বৈধী ভক্তির আশ্রয় না নিয়ে— শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজাদি ক্রিয়াকর্ম করে থাকে, তাদের নিষ্ঠা কীরূপ—সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলছেন—কর্ম ও অকর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য, সৎ ও অসৎ, সত্য ও মিথ্যা—এইসব নিরূপণ করতে হলে শাস্ত্রই প্রমাণস্বরূপ। কিন্তু শাস্ত্রবিধি না মানলে অর্থাৎ লঙ্ঘন করলে আমাদের অধোগতি হয়—অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি উল্লঙ্ঘন করে, যে স্বেচ্ছাচারী হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তার জ্ঞানে অধিকার নেই।

এখানে অর্জুনের প্রশ্ন—শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে যারা শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম করে তাদের তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার আছে বা নাই? কর্মানুষ্ঠান তিন ভাবে হতে পারে। ১) যারা শাস্ত্রবিধি জেনেও তাতে অশ্রদ্ধা করে নিজেদের ইচ্ছানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করে—এরা অসুর সম্প্রদায়। ২) যাঁরা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ জেনে সেই অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করেন—তাঁরা দেবসম্প্রদায়। ৩) আর একপ্রকার সম্প্রদায় আছে যারা শাস্ত্রবিধি জেনেও আলস্য বা উদাসীন হয়ে বিধিনিষেধ অনুসারে না চলে, শ্রদ্ধাসহ নিজের স্বেচ্ছানুরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে। ফলে তাদের মধ্যে উভয় ভাব বিদ্যমান—শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করার জন্য আসুর ভাব ও শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় দৈব ভাব। এই শ্রেণির মানুষগণ কোন সম্প্রদায়যুক্ত?

তাই অর্জুনের প্রশ্ন—যারা শাস্ত্রবিধি গ্রহণ না করে, পিতামাতা-আচরিত অথবা নিজেদের স্বেচ্ছানুসারে ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করে, তাদের নিষ্ঠা কী প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক? তারা হয়তো শাস্ত্রবিধি সমস্ত মেনে চলে না, কিন্তু তাদের নিজেদের স্বাভাবিক রুচি, ইচ্ছা, আদর্শ অনুযায়ী—যাতে তাদের চিত্ত সায় দেয়, সেই সকল বিধিই তারা গ্রহণ করে। তারা নিজেদের শ্রদ্ধা অনুযায়ী কর্মের বিধি স্থির করে নেয় এবং সেই বিধিদ্বারাই জীবনকে চালিত করে।

শ্রীভগবানুবাচ
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ।।২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন) দেহিনাম্ (দেহীদের অর্থাৎ মনুষ্যদের) সাত্ত্বিকী

(সত্ত্বগুণসম্পন্ন) রাজসী চ (রজোগুণপ্রধান) তামসী চ (এবং তমোগুণপ্রধান) ইতি (এই) ত্রিবিধা এব (তিন প্রকার) শ্রদ্ধা (আস্তিকা-বুদ্ধি) ভবতি (হয়) [এবং] সা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (স্বভাবজাত, পূর্বজন্মসংস্কার-সম্ভূত) তাং (তা) শৃণু (শ্রবণ কর)।।২

শ্রীভগবান বললেন—মানুষের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী—এই তিন প্রকারের হয়। এই শ্রদ্ধা পূর্বজন্মের সংস্কারপ্রসূত—অর্থাৎ মানুষের ত্রিবিধ স্বভাব হতে জাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার। তা বিস্তারিতভাবে বলা হচ্ছে, শ্রবণ কর।

শাস্ত্রবিধি ও তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে কর্মের অনুষ্ঠানকারীদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হয় কিন্তু নিজ স্বভাব অনুযায়ী, লোকাচার অনুযায়ী কর্ম করলে তাদের ত্রিবিধ স্বভাব অনুযায়ী শ্রদ্ধা তিনপ্রকার হয়। তার কারণ তাদের স্বভাব পূর্ব জন্মের সংস্কারসম্ভূত। মানুষ পূর্বজন্মের কর্ম থেকে স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে থাকে। পূর্বজন্মে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণানুসারে ক্রিয়া করেছে, বর্তমান দেহে সেই প্রকৃতি অনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা লাভ করেছে। অতএব শাস্ত্র শ্রবণ-মনন, বিধি মেনে কর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তা সাত্ত্বিকী। আর শাস্ত্রের উপদেশ না মেনে, নিজ স্বভাব অনুযায়ী আপনা-আপনিই মানুষের মনে কর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তা সেই ব্যক্তির স্বভাব অনুযায়ী তিন প্রকার হয়।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বললেন, মানুষের শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ গুণভেদে তিন প্রকার হয়ে থাকে। মানুষের শ্রদ্ধা তাদের নিজের নিজের প্রকৃতি বা স্বভাব অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে শ্রদ্ধাও বিভিন্ন হয়। স্বভাব বা প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কার প্রত্যেকেরই নিজস্ব। অতীত অভিজ্ঞতা, অতীত কর্ম ও জগতের সঙ্গে বহুরকম ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই মনের স্বভাব গড়ে ওঠে। তবে মনের এই স্বভাবকে ভবিষ্যতে আমরা পাল্টাতে পারি, শোধরাতে পারি, ভাল করতে পারি আবার নীচেও নামাতে পারি। অতএব বর্তমানে মনের যে অবস্থা সেই স্বভাব থেকে শ্রদ্ধা জন্ম নেয় এবং শ্রদ্ধা স্বভাব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সেই শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩

ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য (সকল মানবের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস) সত্ত্ব-অনুরূপা (নিজ অন্তঃকরণবৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হয়ে থাকে) অয়ং (এই) পুরুষঃ (জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্ণ) যঃ (যিনি) যৎ-শ্রদ্ধঃ (যেরূপ-শ্রদ্ধাভাবযুক্ত) সঃ (তিনি) সঃ এব (সেইরূপই)।।৩

হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তি বা স্বভাবের অনুরূপ হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, কারণ যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেইরূপই হয়ে থাকে, অর্থাৎ সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী শ্রদ্ধাভেদে মানুষ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়।

অন্তঃকরণের বিচিত্রতার জন্য শ্রদ্ধার বৈচিত্র্য জন্মে। 'সত্ত্ব-অনুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি'—প্রত্যেক মানুষের শ্রদ্ধা তার মনের সংস্কার অনুযায়ী বিকাশলাভ করে। প্রত্যেকে মানুষের সংস্কার আলাদা, তাই শ্রদ্ধার বিকাশও আলাদা হতে বাধ্য। 'সত্ত্ব-অনুরূপা' ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী, 'শ্রদ্ধা ভবতি' শ্রদ্ধা হয়। 'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো'—শ্রদ্ধা যেমন, এই পুরুষও তেমন। যার ভিতর যেমন শ্রদ্ধা তার প্রকৃতিটিও সেইরকম। বাস্তব জীবনে যিনি যেমন, তিনি তাঁর শ্রদ্ধার অনুরূপ। সংস্কার ও শ্রদ্ধা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি কর্মেই ব্যক্তির সংস্কার ও শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হয়। আমাদের যার ভিতর যেমন শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হবে।

অতএব অন্তঃকরণে শ্রদ্ধা অনুযায়ী মানুষ চালিত হয়। যার সাত্ত্বিক স্বভাব তার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রদ্ধাও রাজসী এবং তামসিক স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির শ্রদ্ধা তামসী। মানুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ তার জীবনের প্রতি চিন্তা, প্রতি কর্ম এককথায় তার সমগ্র জীবন শ্রদ্ধারই বিকাশ বা রূপায়ণ। ব্যক্তির শ্রদ্ধা জানলে তার প্রকৃতি জানা যাবে, আবার প্রকৃতি জানা থাকলে তার শ্রদ্ধাও জানা যাবে। সেই সঙ্গে তার জীবনের কর্মের প্রবণতাও জানা যাবে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪

সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বনিষ্ঠ বা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) দেবান্ (শ্রেষ্ঠ দেবতাগণকে) যজন্তে (পূজা করেন) রাজসাঃ (রাজসিক বা রজোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ ও রাক্ষসদের আরাধনা করেন) অন্যে (অপরে অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজোগুণী ছাড়া অপরে) তামসাঃ (তামসিক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ (প্রেতগণকে) ভূতগণাম্ চ (ও ভূতগণকে) যজন্তে (পূজা করেন)।।৪

সাত্ত্বিক প্রকৃতির সাধক বা ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিরা যক্ষরাক্ষসের এবং তামসিক প্রকৃতির জনগণ ভূতপ্রেতাদির পূজা করেন।

মানুষের শ্রদ্ধাভেদে বা প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন প্রকারের উপাস্য দেবতা হয়ে থাকে। শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানযুক্ত হয়ে যেসকল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণের পূজা করেন তাঁদের পূজা ও উপাসনা সাত্ত্বিক। যারা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত হয়ে স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা রজোগুণযুক্ত কুবেরাদি যক্ষ ও রাক্ষসকে পূজা করে থাকে, তাদের পূজা ও উপাসনা রাজস। আর তমোগুণযুক্ত ভূত-প্রেতাদির উপাসনা যারা করে থাকে, তাদের তামস বলা হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, যার যেমন মনের স্বভাব তার তেমন পূজা। সেইসঙ্গে তার ব্যবহার ও কর্ম তেমন হয়। এই ভাবগুলি আমাদের জানা থাকলে আমরা আমাদের

স্বভাব ও শ্রদ্ধা আরও উন্নত করতে চাইব। বাইরে থেকে জীবনকে উন্নত করা যায় না, যদি না অন্তরের স্বভাব পরিবর্তন হয়। বাইরে সাময়িক ভাল কাজ করলে মানুষ কখনও ভাল হয় না। সে আবার মন্দ কাজ করতে চাইবে। তাই মনের প্রকৃতির উন্নতি করতে হবে। মানসিক প্রবণতার গতিপথকে পরিবর্তন করে ঊর্ধ্বমুখী করতে হবে। তাতেই মনটি ক্রমশ শুদ্ধ হবে এবং সেই ব্যক্তির ব্যবহার ও কার্যকলাপ মহত্তর হতে থাকবে। সব পথে মানুষ কর্ম করতে পারে কিন্তু গীতা বলছেন উৎকৃষ্ট পথে শুদ্ধতার সঙ্গে কর্ম কর। তবেই জীবন উন্নত হবে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ।।৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ।।৬

দম্ভ-অহংকার-সংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত জনগণ) কাম-রাগ-বল-অন্বিতাঃ (কামনা ও আসক্তি-বলযুক্ত) যে (যে সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (জনগণ) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূত-গ্রামম্ (পঞ্চভূত-সমূহকে) [এবং] অন্তঃশরীরস্থং (বুদ্ধির সাক্ষিভূত আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করে—অর্থাৎ অবজ্ঞা করে) অশাস্ত্র-বিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং (ভয়ঙ্কর) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে) তান্ (তাদের) আসুর-নিশ্চয়ান্ (আসুরব্রতকারী) বিদ্ধি (জানবে) ।।৫-৬

যে সকল অবিবেকী ব্যক্তিগণ দম্ভ-অহঙ্কার, কামনা, আসক্তিযুক্ত ও বলগর্বিত হয়ে শরীরস্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বুদ্ধির সাক্ষিভূত আত্মস্বরূপ আমাকে ক্লিষ্ট করে, অর্থাৎ অবজ্ঞা করে, আর শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর তপস্যাদি করে থাকে, তাদের আসুরপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট বলে জানবে।

চতুর্থ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরুষের উপাস্য দেবতা, শ্রদ্ধা বা প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। শাস্ত্রবিধি না জেনেও কেউ কেউ অতীত শুভ-সংস্কারবশে শ্রদ্ধা উত্তম, তারা সাত্ত্বিক হয়। কেউ কেউ বা মধ্যম, তারা রাজস হয় এবং কেউ কেউ অধম, তারা তামস হয়।

কিন্তু কিছু ব্যক্তি মন্দভাগ্য, তারা অসৎ পাষণ্ড আচরণের অনুবর্তী হয়ে অশাস্ত্রবিহিত ভূতভয়ঙ্কর তপস্যা করে থাকে। সেইহেতু দম্ভ, অহঙ্কারযুক্ত, কাম বা অভিলাষ, রাগ বা আসক্তি এবং বল বা আগ্রহ—এইগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়, তাদের অসুর বলে জানবে।

এখানে সেই আসুরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন লোকদের কথা বলা হচ্ছে। অহঙ্কারবশত এরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবিধ কঠোর ও উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করে। এরা চিত্তশুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করবার নিমিত্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করে না। অহংকারে মত্ত হয়ে এরা নিজেদের ধার্মিকত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে এই সব তপস্যা করে থাকে। এই

ঘোর তপস্যার সঙ্গে অসৎ আচরণ, অহংকার, অভিমান, কাম, রাগ ও বলাদিতে অভিভূত-চিত্ত হয়ে তারা উপবাস বা অল্প আহারাদি করে পঞ্চভূতাত্মক দেহকে কৃশ করে। সেইসঙ্গে আত্মস্বরূপ অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত ঈশ্বর বা বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকেও কৃশ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে তুচ্ছবোধ করে, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিগণ ইহলোকে সর্বসুখবঞ্চিত ও পরলোকে অধোগতিপ্রাপ্ত হয়।

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ।।৭

সর্বস্য (সকল মানুষের) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন-প্রকার) প্রিয়ঃ (প্রীতিকর) ভবতি (হয়) তথা (এবং) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং চ (এবং দানও) [তিন প্রকার জানবে] তেষাম্ (তাদের) ইমং (এই) ভেদম্ (বিভাগ) শৃণু (শোন) ।। ৭

সকলের প্রীতিজনক আহারাদিও সত্ত্বাদিগুণভেদে তিনপ্রকার। তেমনি যজ্ঞ-দান-তপস্যাও গুণভেদে তিনপ্রকার। তাদের এই প্রভেদের বিষয় শোন। অর্থাৎ আহারাদির গুণভেদ জেনে রাজস ও তামস আহার-যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করে সাত্ত্বিক আহার ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

মানুষের আহার যেমন তিন প্রকার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের কর্মও সেই অনুযায়ী তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সংসারে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ইত্যাদি আহার, সেইসঙ্গে অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধনাযুক্ত তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি নানা বস্তুর দান—এ সমস্তই তিন গুণ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার হয়ে থাকে। দৈনন্দিন আহার-এর ব্যাপারেও লক্ষ করলে দেখা যাবে সব কাজের পিছনে রয়েছে মনের রুচি। আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে আমাদের রুচি, প্রবণতা ও মন সবই আলাদা। মনের প্রকৃতি অনুযায়ী ও শ্রদ্ধা অনুযায়ী আমাদের খাদ্য, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সব আলাদা আলাদা অর্থাৎ তিন গুণের ভেদ অনুযায়ী হয়ে থাকে। তাই মনকে ঠিকমতো চালানো চাই, মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া চাই। শাস্ত্র ঐ মনের প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছে। কাজের মধ্যে মনের ভিতর কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেটি লক্ষ্য রাখা চাই। মনকে কীভাবে কাজে লাগাচ্ছি, কারণ প্রতিটি কর্মই মনকে গড়ে তুলছে। মনকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা নেই। মনের শক্তি সম্পর্কে সচেতনভাবে যত্ন নিতে হবে, শক্তির মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। দৈনন্দিন জীবন ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের মনের স্বভাব পরিবর্তন করে চরিত্রবল ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। মনে যেমন যেমন গুণের প্রকাশ হয়, কেবল সেই ভিত্তিতে মনের প্রকৃতি বা স্বভাবকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ।।৮

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ (আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচিবর্ধক) রস্যাঃ (সরস বা মধুর) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহময় ঘৃতাদিযুক্ত বা স্নিগ্ধ) স্থিরাঃ (পুষ্টিকর বা স্থায়ী সুফলদায়ক) হৃদ্যাঃ (রুচিকর ও সুস্বাদু) আহারাঃ (খাদ্যদ্রব্য) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণবর্ধক উপযোগী) ।।৮

যে সকল খাদ্য আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি বৃদ্ধি করে এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও প্রীতিদায়ক—এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়, অর্থাৎ সত্ত্বগুণবর্ধক বা সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ।

যে আহার দ্বারা পরমায়ু দীর্ঘ হয়, যাতে শরীরের অবসাদ দূর হয়, যার দ্বারা দুর্বল শরীরেও বলের সঞ্চার হয়, যা গ্রহণ করলে শরীরের পীড়া হয় না, আবার পীড়া থাকলে তা দূর হয়, যা ভোজন করলে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, যা ভোজন করবার সময় রুচি অধিক হয়, যা স্বাদু, স্নিগ্ধ, যা শরীরকে স্নিগ্ধ ও শান্ত করে, যে-সকল খাদ্য দুর্গন্ধ ও অশুচিদোষ নির্মুক্ত, যে খাদ্য দেখলেই খেতে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জন্মায়, মন প্রফুল্ল করে, সেই সকল সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। আহারের সঙ্গে মনের গুণের প্রকাশের একটা সম্বন্ধ রয়েছে। শ্রুতি বলেন— 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ'—আহার শুদ্ধ হলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে, সেই শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে। তাই খাদ্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ, সরস, মধুর, প্রীতিপ্রদ ও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। এইজাতীয় খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা পছন্দ করেন। কোনও খাদ্য দেখে যদি অশ্রদ্ধা হয় তবে সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করেন না।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ।।৯

কটু-অম্ল-লবণ-অতি-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ (অতি-কটু, ঝাল বা তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ ও প্রদাহকারী) দুঃখ-শোক-আময়-প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ) আহারাঃ (খাদ্যবস্তুসকল) রাজসস্য (রাজসিক ব্যক্তির) ইষ্টাঃ (প্রিয় বা উপযোগী) ।।৯

অতি কটু, অতি-অম্ল, অতি-লবণাক্ত, অতি-উষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতি-রুক্ষ, অতীব প্রদাহসৃষ্টিকারী, দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ খাদ্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় অথবা ঐসকল খাদ্য রজোগুণবর্ধক।

অধিক কটু, তেতো, টক, লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ঝাল, রুক্ষ, প্রদাহকর—এই

জাতীয় খাদ্য দুঃখ, শোক, রোগ সৃষ্টি করে। প্রতিদিন এইসব খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের ক্ষতি ও নানা রোগ হতে পারে। কিন্তু এই-জাতীয় খাদ্য রাজসিক ব্যক্তিরা পছন্দ করে। এইসব খাদ্যের ক্ষতির কথা তারা কানেও তুলবে না। যেমন মাদক দ্রব্য প্রভৃতির সঙ্গে এইজাতীয় খাদ্য তারা পছন্দ করে। এইসকল খাদ্য ভোজনকালে যেমন পীড়াদায়ক, পরেও এগুলির দ্বারা মন অপ্রসন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়। কিন্তু তারা নিষেধ মানতে চাইবে না, কারণ তাদের রুচিটাই ঐরকম। এই খাবারে দৈহিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তির উত্তেজনা জন্মায়, তাই রাজস খাদ্য তাদের প্রিয়। রাজস ব্যক্তিরা সাত্ত্বিক খাবার পছন্দ করবে না। কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজস জাতীয় আহার অবশ্যই পরিত্যাগ করবেন।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ।।১০

যৎ (যে) ভোজনং (খাদ্য) যাত-যামং (এক প্রহর পূর্বে পক্ব, মন্দপক্ব বা শীতল) গত-রসং (নীরস—শুষ্ক) পূতি (দুর্গন্ধময়) পর্যুষিতম্ (পূর্বদিনের পক্ব অর্থাৎ বাসী) উচ্ছিষ্টম্ (ভুক্তাবশেষ) অমেধ্যং (যজ্ঞে নিষিদ্ধ বা অভক্ষ্য) [তৎ-তা] তামস-প্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিদের প্রিয় বা তামসিক বৃত্তিবর্ধক)।।১০

যে খাদ্য মন্দপক্ব, বহু পূর্বে পাক হওয়া ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্যুষিত বা বাসি, উচ্ছিষ্ট ও যজ্ঞে নিষিদ্ধ—এই সব অভক্ষ্য খাদ্য তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়, অর্থাৎ তামসিক-গুণবর্ধক।

তামস আহার—যা অর্ধপক্ব বা অতিপক্ব, যা অনেক পূর্বে পাক হয়ে শীতল হয়েছে, যে আহারে দুর্গন্ধ জন্মেছে, যে আহার অন্যের উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ, নীরস অর্থাৎ শুষ্ক খাদ্য, (মাংস, মদ্য) প্রভৃতি তামস ব্যক্তিবর্গের প্রিয় খাদ্য। এই সকল খাদ্য আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রাদির উৎপাদক বলে তামস লোকদের প্রিয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তামস আহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। রাজস আহার সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। রাজস আহারের ন্যায় তামস আহারও সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। যে-সকল খাদ্য আমরা সাধারণত খাই তাদের গুণগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব যাদের যেমন মনের স্বভাব তারা তেমন খাদ্য পছন্দ করে। অর্থাৎ সাত্ত্বিক মনের অধিকারী ব্যক্তিগণ পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেন, শুদ্ধ পবিত্র খাবারের উপর জোর দেন।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ।।১১

অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন ব্যক্তিগণ-কর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ করা

কর্তব্য, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়) ইতি (এ প্রকারে) মনঃ (মন) সমাধায় (স্থির করে) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিধি-অনুসারে) যঃ (যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক [যজ্ঞ])।।১১

ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে, 'নিষ্কাম যজ্ঞই অনুষ্ঠেয়' অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়—এরূপ অবশ্য কর্তব্যবোধে মন স্থির করে শাস্ত্রবিধি-অনুসারে শান্তচিত্তে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।

এবার ভগবান যজ্ঞ প্রসঙ্গে বলছেন। তিনি বলছেন তিন, তিন প্রকৃতির মানুষ তিনরকম যজ্ঞ করে থাকেন। সাত্ত্বিক যজ্ঞ সেইটিই যা নিষ্কাম ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। নিষ্কাম কর্মীদের বলা হচ্ছে 'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ'—অর্থাৎ কর্মের ফল কামনা করে না।

যজ্ঞের বা কর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যজ্ঞের বা কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করা চলবে না। আমার কর্ম বা যজ্ঞ সম্পাদনের উপর অধিকার বা আধিপত্য রয়েছে কিন্তু ফলের উপর আমার অধিকার বা আধিপত্য নেই। ফল ঈশ্বরের হাতে এবং তাতে ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—এই যজ্ঞ 'বিধিদিষ্টঃ' অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত হবে। শাস্ত্র যেমন বলছেন, সেভাবেই আমরা কর্ম বা যজ্ঞ করব।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—এই কর্মের বা যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। অতএব কেবল নির্দিষ্ট যজ্ঞের বা কর্মের উপর মন নিবদ্ধ করা—'মনঃ সমাধায়'। কর্মে মন একাগ্র করতে হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—'যষ্টব্যম্ এব ইতি'—যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞ বা কর্মের জন্যই কর্ম করছি-এই কর্তব্য, এই মনোভাব নিয়ে, অন্য কোনওপ্রকার হেতু বা অভিপ্রায় শূন্য হয়ে কর্ম বা যজ্ঞ করা উচিত। একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম বা যজ্ঞ করছি—এই হলো সাত্ত্বিক মনের ধর্ম। সাত্ত্বিক মানুষ যে-কোনও কর্ম বা পূজা করুন না কেন তা এই ধরনেরই হবে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২

তু (কিন্তু) ফলং (স্বর্গাদি ফল) অভিসন্ধায় (আকাঙ্ক্ষা করে) দম্ভার্থম্ অপি চ এব (অহঙ্কার দেখাবার জন্যই) যৎ (যা) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন) তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) রাজসং (রাজস অর্থাৎ রাজসিক) বিদ্ধি (জেনো)।।১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ফলের অভিসন্ধি করে দম্ভ প্রকাশের নিমিত্তই (নিজ ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব ও ধার্মিকত্ব-খ্যাপনের জন্য) যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজস-যজ্ঞ বলে জানবে।

ফলের অভিসন্ধি করে বা নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কিংবা নিজ মহত্ত্ব, দম্ভ প্রচারের জন্য যে-যজ্ঞ করা হয় সেই যজ্ঞ রাজস বলে জানবে। মৃত্যুর পরে আমি

স্বর্গলাভ করব, এই লোকে আমাকে সকলে ধর্মাত্মা বলে প্রশংসা করবে—এই ভেবে যে-সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় তা রাজস যজ্ঞ বা কর্ম।

রাজসিক যজ্ঞের প্রধান লক্ষণ—১) ফললাভ করা রাজসিক যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। যজ্ঞের দ্বারা পুত্রলাভ, ধনলাভ, সম্পদলাভ, রাজ্যলাভ, মানসম্মান লাভ, স্বর্গলাভ—বিভিন্ন সম্পদলাভের প্রার্থনা করা হয়।

২) এই যজ্ঞ কর্তব্যবুদ্ধিতে আন্তরিক প্রেরণাবশত বা কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয় না। নিজের ধার্মিকত্ব জাহির, জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ—এই দম্ভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাহ্যিক আড়ম্বরের সঙ্গে এইসকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—রাজসিক ভক্ত গরদের ধুতি আর গলায় সোনার চেন ঝুলিয়ে পুজো করতে বসবে। ভগবানের কাছে এসব অর্থহীন হলেও রাজসিক ভক্ত ঐভাবেই তাঁর পুজো করে। তার ভিতরের শ্রদ্ধাই তাকে ঐভাবে পুজো করতে বাধ্য করবে।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩

[(বুধাঃ (পণ্ডিতগণ)] বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্ত-বিধিবর্জিত) অসৃষ্টান্নং [ব্রাহ্মণগণকে উদ্দেশ করে বা সৎপাত্রে] অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীনম্ (অমন্ত্রক বা মন্ত্রবর্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাবিহীন) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামসিক) পরিচক্ষতে (বলেন)।।১৩

শাস্ত্রবিধিবর্জিত, ব্রাহ্মণসেবায় বা সৎপাত্রে অন্নদানবিহীন, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলা হয়।

বিধিহীনং অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অসৃষ্টান্নং অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা সৎপাত্রদিগকে অন্ন ইত্যাদি নিবেদন করা হয়নি, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে সাধুব্যক্তিগণ তামস যজ্ঞ বলেন। আবার বলা যায়, যে-যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত-ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় না, যে-যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি সৎ ব্যক্তিদের অন্নদান করা হয় না, যে-যজ্ঞে শুদ্ধ স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হয় না, যে-যজ্ঞে যথারীতি দক্ষিণা দেওয়া হয় না, যে-যজ্ঞে ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিতে অশ্রদ্ধা দেখানো হয়, সেই-সকল যজ্ঞ তামস যজ্ঞ। তামস যজ্ঞে ইহলোকে বা পরলোকে কোনও শুভ ফল লাভ হয় না।

তামসিক যজ্ঞের লক্ষণ—১) এই যজ্ঞে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি বা কোনও উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করা হয় না। মোহ ও অহংকারে আবদ্ধ অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের মত অনুসারে অনুষ্ঠান করা হয়।

২) এই যজ্ঞে কোনও ত্যাগ ও দানের ভাব থাকে না, ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের অন্নদান করা হয় না।

৩) যজ্ঞে বিশুদ্ধ বিধিমতো মন্ত্র পাঠও হয় না। দেবতাদের উদ্দেশে কোনও উৎসর্গ বা নিবেদন করা হয় না।

৪) ঋত্বিকগণকে কোনও দক্ষিণা দেওয়া হয় না। যজ্ঞকর্তা সমস্ত নিজের ভোগে ব্যয় করে।

৫) যজ্ঞকর্তা শ্রদ্ধা বা অনুরাগের সঙ্গে কর্মের অনুষ্ঠান করে না। কেবল স্বেচ্ছাচারে কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম অনুষ্ঠান করে। তামসিক ব্যক্তির কাছে নীতি, মূল্যবোধ—এসবের কোনও মূল্য নেই। সে যা ভালো মনে করে থাকে, তাই করে থাকে।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ।।১৪

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আচার্যের পূজা) শৌচম্ (বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচিতা) আর্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্যং (কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্যপালন) অহিংসা চ (এবং অহিংসা অর্থাৎ সর্বতোভাবে পরপীড়ন বা হিংসাত্যাগ) শারীরং (কায়িক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়)।।১৪

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আচার্য বা প্রাজ্ঞব্যক্তির পূজা, বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, পবিত্রতা ও অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পরপীড়নত্যাগ—এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে।

ত্রিবিধ যজ্ঞের ব্যাখ্যা করে ভগবান এখন ত্রিবিধ তপস্যা—দৈহিক, বাচিক ও মানসিক তপস্যার বিষয় ব্যাখ্যা করছেন। দৈহিক বা কায়িক তপস্যা—অর্থাৎ শরীরদ্বারা নির্বাহযোগ্য তপস্যা। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, পিতা, মাতা, আচার্য ও প্রাজ্ঞব্যক্তিদের (তাঁরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র—গুণ ও চরিত্রের দিক থেকে প্রাজ্ঞ) পূজা ও শ্রদ্ধা করা, দেহের বাহ্যিক ও মনের শুচিতা সর্বদা রক্ষা করা, সরল ব্যবহার করা, দেহ ও মনের পবিত্রতা ব্রহ্মচর্য সর্বদা রক্ষা করা, জীব-জগতের প্রতি হিংসা না করা অর্থাৎ সকলকে নিষ্কাম ভালবাসাই দেবতপস্যা।

১) পূজা—দেবতা, দ্বিজ, আচার্য, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজন ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পূজা। তাঁদের প্রতি বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। নমস্কার ও প্রণাম দ্বারা অভিবাদন ও পূজা করাই কায়িক তপস্যা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলের যথাযথ সম্মান করা। এর কারণ, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করি।

২) শৌচ—দেহের বাহ্যিক ও মনের আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বজায় রাখা। শরীরের বাহিক শৌচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩) আর্জবম্—সরল ব্যবহার, কুটিল ভাবের অভাব। অন্তঃকরণে যে-ভাবের উদয় হয়, বাহিক কর্মে তার অনুসরণই সরলতা। মন, মুখ ও কর্ম একই সরল পথে অনুষ্ঠিত হওয়া।

৪) ব্রহ্মচর্য—পবিত্র জীবন, জীবনের প্রথম ধাপে শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য পালন একান্ত কর্তব্য। তাতে ওজঃশক্তির প্রকাশ হয়।

৫) অহিংসা—অপরকে কষ্ট বা পীড়া না দেওয়া। অর্থাৎ সকলকে ভালবাসা, জগৎকে আপনার করে নেওয়া।

তপস্যা বলতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য দৃঢ়ব্রত হয়ে মানসিক ও শারীরিক সংযমের অনুষ্ঠান করা। আধ্যাত্মিক জীবনলাভের সহায়ক দৃঢ়ব্রত কর্মমাত্রই তপস্যা। তপস্যা করতে হলে শারীরিক কিছু ক্লেশও সহ্য করতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাইছেন, মানুষ আগে দৈহিক সংযম অভ্যাস করুক। শারীরিক সংযমের সঙ্গে সঙ্গে মনকেও সংযত করতে পারবে। বর্তমান সমাজ এই সংযম ও তপস্যার কথা ভুলতেই বসেছে। এই ভাবগুলি কমে যাচ্ছে বলেই চতুর্দিকে কেবল হিংসা ও অপরাধপ্রবণতা বেড়ে চলেছে।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ।।১৫

যৎ (যে) বাক্যং (কথা) অনুদ্বেগকরং (উদ্বেগ সৃষ্টিকারী নয়, দুঃখকর নয়) সত্যং (যথার্থ সত্য) প্রিয়-হিতম্ চ (প্রিয় ও হিতকর) চ (এবং) স্বাধ্যায়-অভ্যসনম্ এব (বেদাদি শাস্ত্রপাঠ অভ্যাস) বাঙ্ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়)।।১৫

কারও উদ্বেগের কারণ হয় না, এরূপ সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং যথাবিধি বেদাদি শাস্ত্রপাঠকে বাচিক তপস্যা বলে।

বাচিক তপস্যা—উদ্বেগ বা ভয় সৃষ্টি করে না এইরূপ অনুদ্বেগকর সত্য বাক্য, শ্রোতার প্রিয় ও হিতকর বাক্য, যা পরিণামে সুখকর। স্বাধ্যায় অভ্যাস অর্থাৎ বেদ, ষড়্‌দর্শন, প্রস্থানত্রয় নিত্যপাঠ অভ্যাস—এইগুলিকে বাচিক তপস্যা বলা হয়। একটি বাক্যের চারটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর।

'অনুদ্বেগকরং বাক্যং'—আমার কথা যেন অন্যের উদ্বেগের কারণ না হয়। বাক্য অসত্য, অপ্রিয় বা অহিতকর হলেই উদ্বেগ, সত্য বাক্যও উদ্বেগজনক যখন তা অপ্রিয় বা অহিতকর, প্রিয়বাক্যও উদ্বেগজনক যখন সেটি অসত্য বা অহিতকর, হিতবাক্যও উদ্বেগজনক যখন তা অসত্য বা অপ্রিয় হয়। 'মনুস্মৃতি' বলছেন—'সত্যং ব্রুয়াৎ'—সত্য কথা বল। 'প্রিয়ং ব্রুয়াৎ'—যা শ্রুতিমধুর তাই বল। 'মা ব্রুয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্'—শ্রোতার কাছে অপ্রিয় সত্য বলো না। কারণ তাতে সে দুঃখ পাবে। রুক্ষ, কর্কশ, কটু বাক্য বা অপমানজনক কথা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

'সত্যম্'—সর্বদা সত্যকথা বলবে। সত্যভাষণ চরিত্রগঠনের প্রধান উপায়। সত্যভাষণকে তপস্যা বা ব্রতরূপে গ্রহণ করতে হবে। যা সত্য কেবল তাই বলব। যদি সত্য না হয়

অথবা যদি তার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় থাকে, তাহলে আদপেই মুখ খুলব না। এভাবেই মনের সংযম আনতে হবে।

'প্রিয়ম্'—সত্যকথাও রুক্ষভাবে বলা উচিত নয়। বাক্য যথাযথ শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা উচিত। যাতে বাক্যে ও ভাষায় অপ্রিয় এবং কর্কশ শব্দ না হয় সে-বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। ভাষার উপর নির্ভর করে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আবার শত্রুভাবও বৃদ্ধি হয়।

'হিতম্'—যাতে লোকের সর্বদা হিত হয়, এরূপ কথাই বলা উচিত। বিচার না করে কথা বললে সর্বনাশ হতে পারে। শুধু কথা দিয়েই মানুষকে কত না কষ্ট দেওয়া হয়। ভাষা দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্কের সেতু বাঁধতে পারে, আবার তাকে ভাঙতেও পারে। তাই বাক্‌সংযম প্রথমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'স্বাধ্যায়াভ্যসনং'—নিয়মিত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা। শাস্ত্র অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য নিয়মিত পাঠ অভ্যাস করা। তবেই মন একটা উঁচু অবস্থায় থাকবে। মনকে শুদ্ধ ও সংযত রাখাই বাচিক তপস্যা।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ।।১৬

মনঃ-প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (সৌম্যভাব) মৌনম্ (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনের বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ বিষয়বস্তু থেকে মনকে প্রত্যাহার করে ইষ্টধ্যানে সমাহিত করা) ভাবসংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারে কপটতাশূন্য অথবা চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এসব) মানসম্ (মানসিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (বলা হয়) ।।১৬

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মৌনভাব অর্থাৎ বাক্-সংযম বা মনঃসংযম, আত্ম-নিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় হতে মনকে প্রত্যাহার করে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট করা এবং ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ ব্যবহারে কপটতারাহিত্য—এগুলিকে মানসতপস্যা বলা হয়।

মানস তপস্যার লক্ষণ—মনঃপ্রসাদঃ—চিত্তের স্বচ্ছতা বা প্রসন্নতা। তপস্যা অর্থাৎ নিজের মনকে ক্রমাগত ভাল করা। বিচার করে নিজেই নিজের মনকে টেনে তুলতে হবে। চিত্তে প্রসন্নতা থাকলে ঘোর দুঃখকষ্টে পড়লে কষ্ট হয় না, ঘোর বিপদে আকুল হয়ে পড়ে না, চিত্তে মলিনতা জন্মে না। মনের ধর্মই হচ্ছে উন্মত্ত ও অশান্ত হওয়া। সেই মনকে সর্বতোভাবে শান্ত রাখাই তপস্যা।

'সৌম্যত্বং'—কোমলতা, সরলতা, ভদ্রতা, অমায়িকতা, দয়াভাব ও সাত্ত্বিকভাব। অমার্জিত বা রূঢ় কখনই হওয়া উচিত নয়। সর্বলোকের হিত বা মঙ্গল চিন্তা করা উচিত। মানুষের সঙ্গে ও জীবজগতের সঙ্গে একটা মিষ্টিভাবে মেলামেশা করা।

'মৌনম্'—শুধু বাক্‌সংযম নয়। মন নিবিড়ভাবে এক গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে। কথা বলবে কিন্তু সৌম্য বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ও প্রয়োজনীয় ভাষায়। গভীর চিন্তাসম্পন্ন

ব্যক্তিই চুপচাপ থাকতে পারেন। নীরবতায় শক্তি বৃদ্ধি হয়, বাচালতায় শক্তি ক্ষয় হয়। গভীর সংচিন্তা থেকে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। চিত্তের ভাবগুলিকে সংযত করা ও আত্মচিন্তাপরায়ণ হওয়াই মৌন অবস্থা।

'আত্মবিনিগ্রঃ'—মনের চঞ্চল বৃত্তিসমূহের নিরোধ, আত্মসংযম। সুনিয়ন্ত্রিত মন। মন নিজেই নিজের বশে। সেই মন দিয়ে ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা। মন সংযত হলে আত্মচিন্তা বা ঈশ্বরচিন্তা দৃঢ় হয়।

'ভাবসংশুদ্ধিঃ'—অর্থাৎ ছলনারাহিত্য, কপটতারাহিত্য। এর বিপরীত হলো শঠতা, মানুষকে ঠকানো। কাম, ক্রোধ ও লোভের নিবৃত্তি হলে মনের ভাবসমূহ নির্মল ও বিশুদ্ধ হয়। সেই মনে নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি ব্যবহারে কোনও উদ্বেগ বা চিত্তচাঞ্চল্য আসবে না। অসৎ বা কপটতাশূন্য সেই অবস্থাই ভাবসংশুদ্ধি।

ঐ গুণগুলি অভ্যাস করা প্রত্যেক সাত্ত্বিক মানুষের অবশ্যকর্তব্য। তখনই মানুষের জীবন সুন্দর হয়। নৈতিক জীবন পরিশুদ্ধ না হলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয় না। এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও জ্ঞান লাভ করতে হলে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ তপস্যাই একান্ত প্রয়োজন।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ।।১৭

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (ব্যক্তিগণ দ্বারা) পরয়া (পরম) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সঙ্গে) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (সেই অর্থাৎ পূর্বোক্ত) ত্রিবিধং (কায়িক, বাচিক ও মানসিক তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) [শাস্ত্রকারগণ] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলে থাকেন) ।।১৭

পরম শ্রদ্ধাযুক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা কৃত ত্রিবিধ—শরীর, বাক্, মন দ্বারা অনুষ্ঠিত তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

তিন ধরনের তপস্যা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই বিষয়ের কথা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তপস্যা করা হয়। সেগুলির প্রত্যেকটি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ ও স্বভাব ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ—

'শ্রদ্ধয়া'—পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই তপস্যা অনুষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। শ্রদ্ধা অর্থাৎ নিজের প্রতি বিশ্বাস ও জীবজগতের মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস। শ্রদ্ধা হলো সামগ্রিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের তপস্যা করেন। সেই তপস্যা কায়িক, বাচিক বা মানসিক সর্বক্ষেত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ'—এই তপস্যায় কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। অর্থাৎ প্রতিদানে আমি কিছুই চাই না—নৈতিক আদর্শের অনুসরণে, চিত্তশুদ্ধির জন্য কিংবা

আধ্যাত্মিক জীবন লাভের উদ্দেশ্যে এই তপস্যা। আমার নিজের প্রকৃতি বা স্বভাবকে উন্নত ও প্রকাশ করার জন্য তপস্যা করতে চাই, এর থেকে কোনও লাভ চাইছি না। এইরকম তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়।

'যুক্তৈঃ'—যিনি সমাহিতচিত্ত বা একাগ্রচিত্ত। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত তাঁর সমগ্র চিত্ত। কোনও বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনিই সাত্ত্বিক তপস্যার অধিকারী।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ।।১৮

সৎকার-মান-পূজার্থম্ (সৎকার, মান ও পূজালাভের জন্য) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভসহকারেও) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তার ফল) চলম্ (অনিত্য) অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) ইহ (একে) রাজসং (রাজসিক) প্রোক্তম্ (বলা হয়) ।।১৮

প্রশংসা, সম্মান ও পূজা পাবার জন্য দম্ভসহকারে বা খুব ঘটা করে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তার ফল ইহলোকে নিতান্ত অনিত্য ও অনিশ্চিত, তাকে রাজস তপস্যা বলা হয়।

রাজসিক তপস্যার লক্ষণ—সৎকার—সাধুবাদ বা প্রশংসা বাক্য। চারপাশে মানুষের প্রশংসা, বাহবা, সাধুবাদ, মান-সম্মান, পূজা পাবার আশায় তপস্যা। লোকে বাহবা দিয়ে বলবে—ইনি কঠোর ব্রত করেন, ইনি অন্ন ত্যাগ করে কেবল ফল কিংবা বাতাস খেয়ে থাকেন। আবার ইনি শ্রেষ্ঠ সাধু ইত্যাদি বলে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং পা ধুইয়ে দিয়ে অর্চনা করে অর্থাদিও দান করবে। এই প্রকারে অবিবেকী জনসাধারণের নিকট সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভই রাজসিক তপস্যার উদ্দেশ্য।

২) রাজসিক তপস্যা অহংকে বাড়াবার নিমিত্ত, নিজেদের ধার্মিকত্ব প্রকাশের জন্য, বাইরের লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এই তপস্যায় পারলৌকিক ফল হয় না, কেবল ইহলোকে অল্পকালস্থায়ী কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র। এই প্রকার তপস্যা নৈতিক আদর্শ বা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য করা হয় না। এর দ্বারা জীবনের কোনও স্থায়ী উন্নতি বা পুরুষার্থ লাভ করা যায় না। শুধু লোকের সাময়িক প্রশংসা বা পূজা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা অনিশ্চিত বা অল্পকালস্থায়ী। আবার সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, অনিশ্চয়তা, ভয় ও সংশয়ের মধ্যে থাকতে হয়।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ।।১৯

মূঢ়গ্রাহেণ (মূঢ়বুদ্ধিবশে বা অবিবেকোচিত আগ্রহে) আত্মনঃ (নিজের শরীরের) পীড়য়া (পীড়ার দ্বারা) বা পরস্য (বা অপরের) উৎসাদন-অর্থং (উচ্ছেদের জন্য বা

বিনাশের জন্য) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তা) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ।।

মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিবশে বা অবিবেকোচিত আগ্রহে নিজের শরীরকে ক্লেশ দিয়ে অথবা অন্যের বিনাশের নিমিত্ত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামস তপস্যা বলা হয়।

তামসিক তপস্যার লক্ষণ—তামসিক ব্যক্তিও তপস্যা করে। কিন্তু তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত, একটা মোহের বশে তপস্যা করে। এরা অবিবেকী, মূর্খ, অজ্ঞানী ব্যক্তির দল। তারা কোনও একটা কাম্যবস্তু লাভের উদ্দেশ্যে বা স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত শরীরকে পীড়া দিয়ে বিবিধ ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করে। শীতে, রৌদ্রে উন্মুক্ত অবস্থায় উপবাস করে, ভূমিতে শয়ন করে তারা মনে করে যে, এর দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম লাভ হবে। ধনী বা রাজা হবার জন্য কঠিন ব্রত বা তপস্যা করছে। কিন্তু একথা জানে না যে, চিত্ত শুদ্ধ না হলে কেবল শরীরিক ক্লেশ দ্বারা পুরুষার্থ লাভ হয় না। কেউ কেউ অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্য বা শত্রুর ক্ষতি করবার জন্য কঠোর তপস্যা করে থাকে। এরা মূর্খ কুপ্রবৃত্তির বশীভূত। এদের শরীর, বাক্য ও মন সংযত কিন্তু উদ্দেশ্য অন্যের বিনাশ বা ক্ষতি করা। এইরূপ তপস্যাকে তামস তপস্যা বলা হয়। অন্যের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে কৃত ক্রিয়া যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও বশীকরণ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।।২০

দেশে (যথাযথ স্থানে) কালে চ (ও শুভ সময়ে বা তিথিতে) পাত্রে চ (এবং উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দান করা কর্তব্য) ইতি (এইভাবে) অনুপকারিণে (যে প্রতিদানে অসমর্থ অথবা প্রত্যুপকার আশা না করে কোনও ব্যক্তিকে) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ।।

পুণ্য স্থানে, শুভ মুহূর্তে এবং সৎপাত্রে দান করা কর্তব্য। এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ 'দান করা উচিত, তাই দান করি'—এইভাবে অনুপকারী ব্যক্তিকে প্রত্যুপকারের আশা না রেখে দান করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়।

সাত্ত্বিক দানের লক্ষণ—যে দান কেবল কর্তব্য-অনুরোধে, দেশ, কাল ও পাত্রের উত্তম বিচার করে, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করে করা হয়, তাই সাত্ত্বিক দান। অনুপকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিদানে অসমর্থ বা প্রত্যুপকারের ক্ষমতা নেই, তাকেই দান করা উচিত। আমি যদি গ্রহীতার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করি এবং তার যদি প্রতিদানের সামর্থ্য থাকে, তাহলে তা আর দান হলো না। সেটা একটা আপস চুক্তি বা ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপার হলো। দানের যে পবিত্র মহিমা, এই আদর্শটি সেখানে রক্ষিত হলো না। প্রকৃত দান—যেখানে আমাকে কোনও প্রতিদান দেবার ক্ষমতা নেই গ্রহীতার। গ্রহীতার

সাহায্য বা সেবা প্রয়োজন এবং আমি নিঃশর্তে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে সেবা ও দান করছি। উপকারী অর্থাৎ যে আমার কোনও প্রয়োজনে উপকার করে থাকে। কিন্তু দানের ক্ষেত্রে গ্রহীতা অনুপকারী অর্থাৎ যার প্রতিদান দেবার ক্ষমতা নেই।

'দান' অর্থে কেবল অর্থদান বা অন্নদান বোঝায় না। বিদ্যাদান, লোকসেবা এমনকি প্রাণ উৎসর্গ পর্যন্ত এই দানের অন্তর্গত। অন্যান্য কর্মের ন্যায় দানও তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

সাত্ত্বিক দান—দাতার সৎ ইচ্ছা, সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। এটা হৃদয়ের পবিত্রতা ও উচ্চভাব প্রসূত। দাতা কর্তব্যবুদ্ধিতে, নিঃস্বার্থভাবে, প্রসন্নচিত্তে দান করে থাকেন। দানের পরিবর্তে প্রতিদান বা ভবিষ্যতে কোনও উপকার পাওয়া যাবে—এই আশায় যে দান করা হয়, তা সাত্ত্বিক দান নয়। যার নিকট হতে কোনও উপকার পাওয়ার আশা নেই এবং যার প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্যও নেই—এইরূপ লোককে দানই সাত্ত্বিক দান।

সাত্ত্বিক দান উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত কালে ও উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয়। যে- স্থানে দাতার মনে সাত্ত্বিক ভাব অর্থাৎ নিঃস্বার্থ, পবিত্র ভাবের উদয় হয়, সেই স্থানই দানের উপযুক্ত স্থান। সমাজে আর্ত, দরিদ্র, মূর্খ মানুষের ও জীবের সেবার স্থানই তীর্থক্ষেত্র বা পুণ্যের ক্ষেত্র। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, রুগ্‌ণকে ঔষধদান, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান খুবই প্রশংসনীয় কাজ কিন্তু যাতে দেশে অন্নাভাব না হয়, রোগের মাত্রা কমে যায়, অশিক্ষার অবস্থা দূর হয়—সেইজন্য যে দান করা হয়, তার দ্বারা সমাজে অধিক উন্নতি হয়, তাই সেই দান অধিক সাত্ত্বিক। শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য, অন্নাভাব ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি লোকহিতকর কার্যে যারা নিযুক্ত আছে, তারাই দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। বিভিন্ন পুণ্য তিথিতে সাত্ত্বিক ভাবের বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকদের সম্পর্কেও সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। আবার ক্ষুধার্তকে অন্নদান তৃষ্ণার্ত জীবকে জল দান এবং রোগীকে নিরাময় করা—এই সময়গুলিও সাত্ত্বিক দানের সময়।

সাত্ত্বিক দানের পরিণত অবস্থা আত্মদান বা আত্মোৎসর্গ। দাতা যখন লোকহিতার্থ কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়, নিজের স্বার্থের বা মঙ্গলের দিকে না তাকিয়ে তখনই সাত্ত্বিক দানের চরম উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রকাশিত হয়।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১

তু (কিন্তু) যৎ (যা, যে দান) প্রত্যুপকার-অর্থং (প্রতিদানের আশায়) বা ফলম্ চ (বা ([লৌকিক বা পারলৌকিক] ফল) উদ্দিশ্য (লক্ষ করে) পুনঃ (ও) পরিক্লিষ্টং (অনিচ্ছাসত্ত্বে, অতিকষ্টে) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) রাজসং (রাজসিক) স্মৃতম্ (বলা হয়)॥২১

পরন্তু প্রত্যুপকারের আশায় বা লৌকিক-স্বর্গাদিফল কামনা করে বা নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে যে দান করা হয়, তাকে রাজস দান বলা হয়।

রাজস দানের লক্ষণ—

১) দানের পেছনে একটা প্রেরণা, বা প্রত্যাশা কাজ করে। দানের বিনিময়ে, যাকে দান করা হয় তার বা অন্য লোকের নিকট হতে, দানের সমতুল্য বা ততোধিক উপকার পাবার আশায় দান করা হয়। রাজসিক দানে পূর্বে প্রাপ্ত উপকারের প্রতিদান বা ভবিষ্যতে উপকার লাভের আশা দানের পেছনে প্রবল থাকে। এই প্রকার দানে প্রকৃত ত্যাগের ভাব থাকে না।

২) এই দানের পেছনে ইহলোকে খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পরকালে স্বর্গলাভ—এইসব ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে। সমাজে সুখ্যাতির লোভে বা সম্মান-প্রতিপত্তি লাভের আশায় দান করা, ব্যক্তিগত খেয়ালের বসে অহংকে দেখানোর উদ্দেশ্যে এইরূপ দান করা হয়।

৩) এই দানে দাতার মনে প্রসন্ন ভাব থাকে না। অনিচ্ছাসত্ত্বে বা অতিকষ্টে অর্থাৎ দান করবার ইচ্ছা না থাকলেও, অপরের অনুরোধে, আদেশে বা ভয়ে এইরূপ দান করতে রাজি হয়েছে। দাতার মনে দানে পরম তৃপ্তি নেই, পরন্তু দানের জন্য অর্থ বা দ্রব্য ব্যয় হওয়াতে মনে ক্লেশ অনুভব করে, 'কেন দান করলাম'—এই ভেবে অনুতপ্ত।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২

অদেশকালে (অশুচি স্থান ও অশুভ সময়ে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অপাত্রে) অসৎকৃতম্ (অসমাদর-পূর্বক, সৎকার বিনা) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞার সহিত) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই দান) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥২২

অপাত্রে অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে অবজ্ঞা-সহকারে ও আদর-অভ্যর্থনারূপ সৎকারশূন্য যে দান, তাকে তামস দান বলে।

তামস দানের লক্ষণ—

এই দান করা হয় অনুপযুক্ত স্থান, কাল এবং পাত্রে। পৃথিবীর সর্বত্রই কিছু মানুষ আছে যারা উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান করতে চায় না, অথবা অনিচ্ছা ও অবজ্ঞাভরে দান করে থাকে। কিন্তু তামস দানে তারা আনন্দ পায়। যেমন স্বভাবদূষিত, দুর্জনসঙ্গে, পাপযুক্ত অশুচি স্থানে, অসময়ে, অশৌচাদি সময়ে, বিদ্যা ও তপস্যা-বর্জিত অপাত্রে—ধূর্ত, অসৎ ও অসতী, তোষামোদকারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলা হয়।

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অজ্ঞানতাবশত দানের উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করতে পারে না, আবার বিচার করে উপযুক্ত পাত্র নির্ণয় করতে চেষ্টাও করে না। তামস প্রকৃতির ব্যক্তিরা তামস দানই পছন্দ করে। যারা দাতার ন্যায় অলস, কর্মবিমুখ, ভিক্ষোপজীবী তাদেরকেই সে দানের উপযুক্ত বলে মনে করে। সময়েরও কোন নিশ্চয়তা নেই। স্থানেরও কোন বিচার নেই—হাটে-বাজারে, জুয়াবাজারে, পতিতালয়ে, যে-কোনও কুস্থানে দান করে থাকে।

২) সাত্ত্বিক দানে একটা অভ্যর্থনা ও শ্রদ্ধার ভাব থাকে কিন্তু তামসিক দানে সেইরূপ থাকে না। দানগ্রহীতাকে ভিক্ষুক মনে করে অবজ্ঞার সঙ্গে বা ঘৃণার সঙ্গে দান করে।

অজ্ঞানতাবশত, অন্ধ-প্রবৃত্তির দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে উপযুক্ত স্থান, কাল, পাত্রাদির বিচার না করে, কোনও উচ্চভাব দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, ঘৃণা বা অনাদার করে যে দান করা হয়, তাকেই তামস দান বলে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১-১১-৩) দান সম্পর্কে বলছেন—'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'—দান হিসাবে যা দেবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে। 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্'—অশ্রদ্ধাপূর্বক দিও না। কারণ তাতে দানের মূল্যও উচ্চভাব কমে যায়। 'শ্রিয়া দেয়ম্'—সামর্থ্য অনুসারে দান করবে। দান যেন সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। কোন ব্যক্তির দেবার ক্ষমতা অনেক বেশি কিন্তু তিনি মাত্র পাঁচ টাকা দিচ্ছেন অবজ্ঞা সহকারে। 'ভিয়া দেয়ম্'—যা দেবে, মনে করবে তা অতি সামান্য—এই ভয় ও শ্রদ্ধাসহকারে দান করবে। 'হ্রিয়া দেয়ম্'—বিনয়ের সঙ্গে, লজ্জা ও শ্রদ্ধাসহকারে দেবে।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ।।২৩

ওঁ তৎ সৎ ([বেদে] ওঁ তৎ সৎ) ইতি (এই) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) ত্রিবিধঃ (তিন-প্রকার) নির্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (কথিত হয়) তেন (তার দ্বারা, অর্থাৎ এই ত্রিবিধ নির্দেশ দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) চ বেদাঃ (এবং বেদসমূহ) চ যজ্ঞাঃ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (প্রাচীনকালে) বিহিতাঃ (বিহিত বা সৃষ্ট হয়েছে) ।।২৩

বেদে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন শব্দদ্বারা পরব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম নির্দিষ্ট হয়েছে। এই নির্দেশ হতেই পুরাকালে [যজ্ঞের কর্তা] বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, [যজ্ঞের কারণ] বেদ ও [যজ্ঞরূপ] ক্রিয়া সৃষ্ট হয়েছে।

ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি পরব্রহ্মের নাম বেদে উক্ত হয়েছে। 'ওমিত্যক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্' (ছান্দোগ্য উপনিষদ) 'ওঁ' এই শব্দ পরমাত্মার অতি নিকটবর্তী নাম। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছান্দোগ্য উপনিষদ)—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। প্রজাপতি

ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে এই তিন মন্ত্রযোগে পরব্রহ্মকে স্মরণ করে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন।

দুই প্রকার ওঁ-কার শাস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। ১) প্রতীক ওঁ যথা—ওঁ ইতি ব্রহ্ম, এইরূপ বললে ওঁ এখানে প্রতীক ওঁ। ওঁ হল পবিত্রতম প্রতীক। হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের কাছে ব্রহ্মের প্রতীক এই ওঁ পরম শ্রদ্ধার বস্তু।

২) শব্দ ওম্ যথা 'ওমিতি ব্রহ্ম'—ওম্ এখানে শব্দ। অ-উ-ম্—সহিত যুক্ত তিনটি বর্ণ অথবা (অব্)-(মন্ বা অব্)-(ম) ধাতু যুক্ত। পাণিনির মতে অব্ ধাতুটির উনিশটি অর্থ এবং সবটাই ওম্- শব্দের মধ্যে রয়েছে। অ-সৃষ্টি শক্তি, উ-স্থিতি শক্তি, ম-লয় শক্তি। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—'অকারো জ্ঞায়তে ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে। মকারস্তু মহেশ্বর ওঁকারোহি ত্রয়াত্মকঃ।। অর্থাৎ অকারে বুঝায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু উকারে এবং মকারেতে মহেশ্বর—এই তিন নাম মিলিত হয়ে ওঁ কার শব্দ বা পরব্রহ্ম।

তৎ বলতে সেই পরম সত্তা বা পরম সত্যকে বোঝায়, যা এই পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে নিহিত আছে। সেই সত্তাকে আমরা সৎ বলে সম্বোধন করি। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। পরম সত্তা। সৎ—পরম সত্যকে বোঝায়। যিনি নিত্য বা অপরিবর্তনশীল। 'সত্যস্য সত্যম্'—সত্যেরও সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম সত্য। অতএব ওঁ তৎ সৎ-হল ব্রহ্মের বাচকশব্দ। তিনি নির্গুণ পরব্রহ্ম আবার সগুণ ঈশ্বর। এই পরব্রহ্ম থেকে পুরাকালে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জ্ঞানী, বেদজ্ঞ, ধার্মিক ব্যক্তিরা, বেদসমূহ ও যজ্ঞাদি আবির্ভূত হয়েছিল।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।।২৪

তস্মাৎ (সেইজন্য) ওম্ ইতি উদাহৃত্য (ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করে) ব্রহ্মবাদিনাম্ (ব্রহ্মবাদিগণের) বিধান-উক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং (সর্বদা) প্রবর্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ।।২৪

সেইজন্য ওঁ এই ব্রহ্মবাচক প্রণব বা প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রহ্মবাদিগণ শাস্ত্রবিধানানুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

ওঁ এই শব্দ হল প্রণব মন্ত্র, ঈশ্বরের বিশেষ প্রতীক বা প্রথম নাম। এইজন্য বেদবিদ্‌গণ যখন কোনও শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে কার্যে বা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, তখন এই ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করেই তবে অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। অর্থাৎ ভগবান বলছেন যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা শুরু করার পূর্বে ওঁ উচ্চারণ করতে হবে। এটি শাস্ত্রের নির্দেশ। ভারতে সর্বত্র ওঁ উচ্চারণ করার পর যে-কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। মন্ত্রের সূচনা ওঁ দিয়ে হয়। যাঁরা বেদজ্ঞ তাঁরা সর্বদা ওঁ-এর উচ্চারণের উপর জোর দেন। ওঁ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ওঁ ব্রহ্মের প্রতীক। 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দ দিয়েই ব্রহ্মের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই ওঁ নাম উচ্চারণ করেই ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞের সৃষ্টি করেছিলেন, সেইজন্য বেদবিদ্‌গণ সর্বদাই ওঁ মন্ত্রের উচ্চারণ করে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিন পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হন। এই ওঁ শব্দ উচ্চারণ দ্বারা কর্মীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁর কর্ম যেন অন্তর্নিহিত ব্রহ্মভাবের বিকাশস্বরূপ হয় এবং ব্রহ্মই তাঁর কর্মের লক্ষ্য হয়।

কারণ ওঁ দিয়ে আমাদের চারটে অবস্থার কথা বোঝানো হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় আত্মা প্রকাশিত, স্বপ্ন অবস্থাতে আত্মা প্রকাশ পাচ্ছেন, সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মা পূর্ণভাবে উপস্থিত কিন্তু অপ্রকাশিত, চতুর্থ অবস্থাকে তুরীয় অবস্থা, ইন্দ্রিয়াতীত, অনির্বচনীয়, অনুভূতি অবস্থা বা স্থিতি অবস্থা বলা হয়। ওঁ হচ্ছে বিশ্বাত্মক অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রতীক। মাণ্ডূক্য উপনিষদ বলছেন—'ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ ইদং সর্বম্' অর্থাৎ এই বিশ্ব 'ওম্' ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আপাত খণ্ড সত্তাকে অখণ্ড সত্তাতে মিলিয়ে দেবার মহামন্ত্র ওঁ। তাই ওঁ হচ্ছে পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ—দুইই।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ।।২৫

তৎ ইতি (তৎ এই ব্রহ্মবাচক শব্দ) [উচ্চারণ করে] মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ-কর্তৃক) ফলম্ (ফলের প্রতি) অনভিসন্ধায় (অভিসন্ধান না রেখে, আকাঙ্ক্ষা না করে) বিবিধাঃ (বিবিধ) যজ্ঞঃ-তপঃ-ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ ও তপঃ কর্ম) দান-ক্রিয়াঃ চ (ও দানকর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ।।২৫

যাঁরা মোক্ষকামনা করেন তাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে 'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন।

শ্রুতির 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দ উচ্চারণ দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তের অশান্তি নিবারিত হয়, ফল কামনারূপ অভিসন্ধানবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। যজ্ঞ দান তপস্যাদি কর্ম ভগবানের এই আশ্চর্য নামের গুণে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। 'তৎ' শব্দ তাই পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ। মোক্ষকামী বা মুক্তিকামী ব্যক্তিরা নানারকম যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান করে থাকেন। তাঁদের সকল কর্মে সেই 'তৎ' অর্থাৎ পরব্রহ্মের উদ্দেশে উৎসর্গ ও পরব্রহ্মের অনির্বচনীয় অনুভূতি লাভ হয়। কোনও ফল লাভ তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, ব্রহ্মের যে অনির্বচনীয় আনন্দ, মুক্তি ও পবিত্রতা তাই অনুভব করাই উদ্দেশ্য।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ।।২৬

পার্থ (হে অর্জুন), সদ্ভাবে (সদ্ভাবে অর্থাৎ বর্তমান আছে—এই বিদ্যমানতা বোঝাবার

জন্য) সাধুভাবে চ (ও সাধুভাবে—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অর্থ বোঝাবার জন্য) সৎ ইতি (সৎ এই) এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা (সেইরূপ) প্রশস্তে (শুভ) কর্মণি (কর্মে) সৎ-শব্দঃ (সৎ এই ব্রহ্মবাচক শব্দ) যুজ্যতে (ব্যবহৃত হয়) ।।২৬

হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাব অর্থাৎ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব-নির্দেশের জন্য সৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ মঙ্গলজনক কর্মেও সৎ-শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রুতি বলছেন—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ'—'সৎ' এই শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের নাম রূপে গৃহীত হয়েছে। সদ্ভাব বা বস্তুর অস্তিত্ব বোঝাতে, সাধুভাব অর্থাৎ বস্তুর পবিত্রতা বা শুদ্ধতা বোঝাতে 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। সৎ শব্দ দ্বারা সৎ কর্ম, সৎ বিচার, সৎ চিন্তা, কল্যাণ বা শুভচেতনা প্রভৃতি বোঝায়। মহাত্মাগণ 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ করে আশঙ্কা বা সংশয়-স্থলে বৈগুণ্যদোষ নিবারণ করেন, এবং নির্বিঘ্নে কার্য-নির্বাহ নিমিত্ত মঙ্গলকার্যে 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ দ্বারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে শান্তি স্থাপন করেন। শাস্ত্রে কোনও শুভ কর্ম সম্পাদন করবার পূর্বে ভগবানের নাম স্মরণ করার উপদেশ আছে। 'সৎ' শব্দ দ্বারা ভগবানের নাম স্মরণ করা হয়। এই স্মরণ দ্বারা চিত্তের নির্মলতা সাধিত হয়, সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় এবং কর্মের কোনও বৈগুণ্য বা অঙ্গহীন দোষ থাকলে তাও বিনষ্ট হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ।।২৭

যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (এবং দানে) স্থিতিঃ (একনিষ্ঠ হয়ে অবস্থিতি) সৎ ইতি (সৎ এই-শব্দে) উচ্যতে (কথিত হয়) চ তৎ-অর্থীয়ং (এবং তৎ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত) কর্ম চ এব (কর্মও) সৎ ইতি এব (সৎ বলে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) ।।২৭

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানরূপ কর্মে একনিষ্ঠতাও সৎ-শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় এবং তৎ-অর্থীয় কর্ম অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত কর্মেও সৎ শব্দ উচ্চারণ করা হয়।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে একনিষ্ঠতা বা তৎপরতা দেখা যায় তাও 'সৎ' নামে অভিহিত। এই তিনটি কর্ম আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে ভগবদ্‌মুখী করে থাকে। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা-ক্রিয়া সম্পাদনকালে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অনুকূল কর্মবিশেষে অথবা ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম-অনুষ্ঠানকালে মহাত্মাগণ 'সৎ' শব্দ উচ্চারণ করে সর্বপ্রকার বৈগুণ্যদোষ নিবারণ করে থাকেন। ভগবানের উদ্দেশে তাঁকে সমর্পণ করে যে-কর্ম করা হয়, তা সৎ কর্ম। যে কর্ম মানুষের জীবনকে সাধারণ স্তর হতে উদ্ধার করে ভাগবত-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে সৎ কর্ম বলা হয়। যেসব কর্ম তৎ-এর উদ্দেশে নিবেদিত, তাকেও সৎ বলা হয়। অর্থাৎ সেই পরম সত্য বা তৎ লাভের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয়

তা সবই সৎ। 'ওঁ তৎ সৎ' তিনটি আলাদা শব্দ হলেও এটি ঈশ্বরের সামগ্রিক নাম।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ।।২৮

পার্থ (হে পার্থ) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্বক) যৎ (যা) হুতং (হোমরূপে কৃত) দত্তং (দান করা হয়) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) তপ্তং (আচরণ করা হয়) যৎ চ [এবং] যা কিছু) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়) (সে সবই) অসৎ ইতি (অসৎ বলে অর্থাৎ বিদ্যমান নেই বলে) উচ্যতে (উক্ত হয়) তৎ (তা অর্থাৎ সে-সকল কর্ম) ন ইহ (না ইহলোকে) নো (অর্থাৎ না) প্রেত্য (পরলোকে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে ফলপ্রদ হয় না) ।।২৮

হে পার্থ! যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অন্যান্য যা-কিছু কর্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, সে-সবই অসৎ বলে কথিত হয়। ঐসব যজ্ঞাদি কর্মবৈগুণ্যবশত না ইহলোকে, না পরলোকে ফলদায়ক হয়, অর্থাৎ ঐসব কর্ম ইহকালেও শুভফল দেয় না, পরকালেও শুভফলপ্রসূ হয় না ।

শ্রদ্ধা ছাড়া যদি কোনও যজ্ঞ, দান অথবা তপস্যা করা হয়, হে অর্জুন, সেগুলিকে তখন অসৎ বলা হয়। অতএব 'ওঁ তৎ সৎ' শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা করতে হবে। অশ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অথবা যে কোন কর্ম করলে তা সমস্তই অসাধু হয়। পাথরে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ এই শ্রদ্ধাহীন কার্যে 'ওঁ তৎ সৎ' উচ্চারণে চিত্তশুদ্ধি বা পবিত্রতা হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এক এক সংখ্যার পরে শূন্য যুক্ত করলে, শূন্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়। এক ছাড়া শূন্যের কোনও মূল্য নেই। তাই আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ। ঈশ্বরকে আগে বসিয়ে পরে যা-কিছু করা হবে তার মূল্য বৃদ্ধি হবে। সবকিছু তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু তা না করে যদি ঈশ্বরকে সরিয়ে কিছু করা হয় তাহলে সব অসাধু বা মিথ্যা হয়ে যায়। বেদান্ত বলছেন, বহুর পিছনে যে এক রয়েছে তাকেই লাভ করবার চেষ্টা কর। এই বৈচিত্র্যময় জগতের পিছনে এক পরম সত্য লুকিয়ে আছে, সেই সত্যটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। সেই পরম সত্যটিকে 'ওঁ তৎ সৎ' এই শব্দ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে।

শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ পরম সত্যকে স্মরণ করলে শুভ সংস্কার সঞ্চারিত হয়, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্ণ কার্যে পরলোকে স্বর্গাদি ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদিরূপ ফল লাভ হয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে সাত্ত্বিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানই একমাত্র পথ। এই সাত্ত্বিক কর্ম অনুষ্ঠান-কালে যদি কোনও বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে তাহলে তা 'ওঁ তৎ সৎ'- এই মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হয়ে যায়। রাজস ও তামস শ্রদ্ধাসহ যারা রাজস ও তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তারা অসুর, এরা শাস্ত্রের জ্ঞানসাধনের অনধিকারী। কিন্তু যাঁরা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁরা দেব। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞানের সম্যক অধিকারী। অতএব যে সকল সাত্ত্বিক শুভকর্ম ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয় তাই করা উচিত। অনন্যভক্তিসহ পত্রপুষ্পাদি সামান্য

উপচার দ্বারা সাত্ত্বিকভাবে উপাসনা করলেই ভগবানের কৃপা লাভ হয়। আবার ভগবানের শরণাগত হতে পারলে রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হয়ে সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশ হয়ে থাকে। ভগবৎকৃপায় তার হৃদয়ে সাধুভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা যে-কোনও কর্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হলে তা আমাদের জীবনকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে, স্থায়ী সত্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। জীবন থেকে সত্য ও শ্রদ্ধাকে বিসর্জন দিলে জীবন অর্থহীন বোঝামাত্র। এই মহৎ শিক্ষাটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ**-নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সারসংক্ষেপ

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা। কিন্তু ত্রিবিধ গুণ-ভেদে মানুষের সংস্কার, স্বভাব, চরিত্র, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কীভাবে মানবের প্রকৃতিভেদে ত্রিবিধ আহার, ত্রিবিধ যজ্ঞ, ত্রিবিধ তপস্যা ও ত্রিবিধ দান প্রভৃতি কর্ম হয়ে থাকে। অথচ ঐসকল কর্ম আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ইত্যাদি কীভাবে সাধনার অঙ্গরূপে সাহায্য করে তাও এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষই খাদ্যের দ্বারা প্রাণধারণ করে থাকে। ঐ খাদ্যপুষ্ট দেহ-মনের সাহায্যে সাধনা দ্বারা মানুষ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করে ধন্য হয়। প্রত্যেক খাদ্যই ঠিকভাবে পরিপক্ক হলে—ভোক্তার দেহ-মনে একটা সৃজনীশক্তি আনয়ন করে। ভোক্তার প্রকৃতিভেদে ঐ শক্তি সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়। জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্তদুষ্ট হলে প্রত্যেক খাদ্যই ভোক্তার দেহ-মনে তদনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে। অতএব খাদ্যমাত্রই এই তিনপ্রকার দোষমুক্ত হওয়া বিধেয়। মোক্ষলাভে ইচ্ছুক জীবের পক্ষেই এই খাদ্যাখাদ্যের নির্দেশ পালনীয়।

শ্রীভগবান এই অধ্যায়ে ত্রিবিধ যজ্ঞ, শারীরাদি-ভেদে ত্রিবিধ তপস্যা এবং সত্ত্বাদি-ভেদে ত্রিবিধ দানের ব্যাখ্যা করে যজ্ঞাদি কর্মের ব্রহ্মনির্দেশ দিয়েছেন। এই ব্রহ্মনির্দেশ অবশ্যপালনীয়। কর্মকে শোধন করে নেবার এই একমাত্র পন্থা। 'ওঁ তৎ সৎ'—এই তিনটিই ব্রহ্মবাচক সংকল্প। পরব্রহ্ম হতেই 'ওঁ তৎ সৎ'-এর উদ্ভব। যজ্ঞাদি কর্মে 'ওঁ'

অর্থাৎ প্রণব এই ব্রহ্মবাচক বৈদিক মন্ত্রে সংকল্প করা বিধেয়। মোক্ষ-অভিলাষী যে নিষ্কাম কর্ম করেন তাতে 'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক সংকল্প প্রযোজ্য। 'সৎ'—শব্দ 'ব্রহ্ম', 'অস্তিত্ব' ও 'সাধুতা'জ্ঞাপক। সব শুভকর্মে 'সৎ'-শব্দ প্রয়োগের নির্দেশ দিচ্ছেন ভগবান। 'ওঁ তৎ সৎ'—এই তিনটি একত্রে 'সমস্তই ব্রহ্ম'—এই নির্দেশ দিচ্ছেন।

কর্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। অর্থাৎ যা শুভ বা অশুভ কর্ম করা হয়েছে তার ফল অবশ্য ভোগ করতে হবে, ভোগ না করলে শতকোটি-কল্পেও তার ক্ষয় হয় না। সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক জীবের সহস্র সহস্র কল্পে কৃত কর্মরাজি ফলরূপে শ্রীভগবানের মহাশক্তি প্রকৃতির কাছে রক্ষিত আছে—তিনি যথাসময়ে সব কর্মফল ফিরিয়ে দেন। প্রত্যেক প্রাণীকেই সমস্ত কর্মফল ভোগ করতে হয়। শুভ ও অশুভ ছাড়াও কর্মের ত্রিবিধ স্থিতি বর্ণনা করেছেন শাস্ত্র—১) প্রারব্ধ—এ জন্মে যার (যে-কর্মের) ভোগ চলছে, ২) ক্রিয়মাণ—এ জন্মে অর্থাৎ ভোগকালে যা (যে-কর্ম) করা হচ্ছে, ৩) সঞ্চিত—যে-কর্ম এখনও ফলদানে প্রবৃত্ত হয়নি। প্রত্যেক জীবকে এই তিন প্রকার কর্মই ভোগদ্বারাই ক্ষয় করতে হয়।

'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন'(বৃঃ. উপনিষদ্-৩-২-১৩)—পুণ্যকর্মের বা শুভকর্মের দ্বারা পুণ্যের উৎপত্তি হয়, পাপকর্মের বা অশুভ কর্মের দ্বারা পাপের উৎপত্তি হয়। 'তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্'...'অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্'(ছাঃ. উপনিষদ, ৫-১০-৭) সৎ অর্থাৎ রমণীয়-আচরণকারিগণ অর্থাৎ শুভকর্মানুষ্ঠানকারিগণ শ্রেষ্ঠ পিতামাতাগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, নিন্দিত-আচরণকারিগণ নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে থাকে—এটাই জগতের শাশ্বত নিয়ম। ব্রহ্মা হতে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত উচ্চ-নীচ সমস্ত জীবই এ নিয়মের অধীন। এই কর্মপাশমুক্ত না হওয়ায় জীবের শত শত কল্প অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার কর্ম আর শেষ হচ্ছে না। এক কর্মের ফলে শরীরধারণ করে সুখ-দুঃখ-ভোগকালে আবার নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি হতে থাকে। এইভাবে অসংখ্য জন্মের বীজ একই জন্মে উৎপন্ন হচ্ছে। ক্রমে শত শত কোটি কল্পেও কর্মফল-ভোগ আর শেষ হয় না। কারণ কর্ম একবার অনুষ্ঠিত হলে তার ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। কর্মক্ষয়ের আর এক উপায় আছে। শ্রীভগবান বলছেন—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।' ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি দ্বারা (কিন্তু প্রারব্ধ ছাড়া) সমস্ত শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হলে কোনও কর্মই আর ফলপ্রসব করতে পারে না।

প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে। শুভ রমণীয়-আচরণকারিগণ সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করে সত্ত্বাদি কর্ম করে। অন্যে অন্যপ্রকার। শ্রীভগবান কেবলমাত্র জীবের কর্মফলভোগের ব্যবস্থা করে দেন যাতে জীব নিজ নিজ কর্মফলভোগ করে মুক্তিপথে অগ্রসর হতে পারে।

এই অধ্যায় তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনের কর্মপ্রবৃত্তি তিন-গুণভেদে কার্যকরী হয়। তিন-গুণভেদে ত্রিবিধ তপস্যা, ত্রিবিধ দান, ত্রিবিধ যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মপ্রবৃত্তি অনুসারে মনের মধ্যে দুই প্রকার সম্পদ উৎপন্ন হয়—দৈবীসম্পদ ও আসুরিক সম্পদ। এই দুই সম্পদের সংস্কারের উপর নির্ভর করে মানবের মনের স্বভাব সৃষ্টি হয় এবং স্বভাবের প্রকাশভেদে উৎপন্ন হয় শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধাভেদে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কর্মের বাহ্যিক ও মানসিক প্রকাশ হয়। অতএব আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি, স্বভাব, চরিত্র ও শ্রদ্ধা তৈরি করছি—তাই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যদি পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে সর্বদা সকল কর্ম সম্পাদন করি তাহলে আমরা মুক্তি বা মানব জীবনে পূর্ণত্ব লাভ করব।

এই ধর্ম ও আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের জন্য। Never too late—আমরা এক্ষুনি শুরু করতে পারি। বিবেকানন্দ বলছেন—মানুষ পাপ করে না, ভুল করে। ভুল করা মানুষের ধর্ম। মানুষই ভুল করে, মানুষই আবার দেবতা হয়। বাস্তবিক আমরা সবাই দেবতা আছিই, তবে আমাদের সেই দেবভাব ঘুমিয়ে আছেন আমাদের মধ্যে। আমরা সেই দেবতাকে জাগিয়ে তুলব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সেইটাই লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে ভগবান আমাদের সেই দেবতা হওয়ার উপদেশ করছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষ যোগ

এই অধ্যায়ে আটাত্তরটি শ্লোকে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের আলোচনার উপসংহার করে মানবজীবনের চরম আদর্শ ও পরমপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ কীরূপে হয়, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন। সেইজন্য এ অধ্যায়ের নাম 'মোক্ষযোগ'। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা ত্রিবিধ এবং কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখও ত্রিবিধ। তবে সর্বত্রই সাত্ত্বিক ভাব মোক্ষপ্রদ। সাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থাৎ সর্বত্র সমদর্শন, সাত্ত্বিক কর্তা, সাত্ত্বিক কর্ম বা নিষ্কাম কর্ম থেকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, সাত্ত্বিকী ধৃতি, সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয়।

স্বধর্ম বা নিজবর্ণাশ্রম অনুবর্তী কর্তব্যকর্ম করাই শ্রীভগবানের আরাধনা এবং তাতেই পরম সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। স্বধর্ম দোষযুক্ত হলেও তা অনুষ্ঠেয়। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করলেই তা থেকে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি হয়। অনাসক্তচিত্তে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করাই নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা। শুধু কর্মত্যাগ নয়, সর্বকর্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলা হয়। নিষ্কাম কর্মযোগী, নিষ্কাম জ্ঞানযোগী বা নিষ্কাম ভক্তির চরম স্থিতি একইরূপ হয়। শ্রীভগবানও তাঁর অন্তিম উপদেশে বলছেন—মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে সর্বদা আমাতে চিত্ত স্থির রেখে এবং যথাধিকার স্বধর্ম পালন কর, তাহলেই আমার প্রসাদে মুক্ত হতে পারবে। ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষ মায়ামুক্ত হতে পারে না। অহংকারই সেই মায়া। শ্রীভগবান অর্জুনকে গীতার গুহ্যতম উপদেশ দিয়ে বলছেন—তুমি একমাত্র আমাকেই চিন্তা কর, আমাকেই ভক্তি কর, পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি—তুমি আমাকেই পাবে। সর্বধর্ম অর্থাৎ সকল সংকল্প পরিত্যাগ করে তুমি আমারই শরণ নাও—আমি সব মায়াবন্ধন থেকে তোমাকে চিরতরে মুক্ত করব।

শ্রীভগবানের এই অভয়বাণী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। সর্বসাধনার অন্তে শ্রীভগবানে

অনন্যা শরণাগতি আসে। তখনই মানুষ সর্বপ্রকার-সংশয় অতিক্রম করে সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে শ্রীভগবানের অভয়পদ লাভ করে। শ্রীভগবানের ওপর পূর্ণ নির্ভরতা এলে 'ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—এইরূপ অবস্থাতে স্থিতি লাভ হয়—অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরমপদপ্রাপ্তিরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীব পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে।

শ্রীভগবানের এই অভয়বাণীর ফলে অর্জুনের অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি গদগদস্বরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, মন সংশয়মুক্ত হয়েছে, আমি দ্বিধাশূন্য চিত্তে তোমার আদেশ পালন করব।' এই অধ্যায়ে সব উপদেশের উপসংহার করলেন শ্রীভগবান—'তুমি শুধু আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সব পাপ হতে মুক্ত করব।' এটাই হলো শরণাগতি যোগ। শ্রীভগবান নানাভাবে উপদেশ দিয়ে অন্তে অর্জুনকে বলেছেন —তুমি সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা ত্যাগ করে আমাকে আশ্রয় কর। আমি সর্বভূতস্থ অর্থাৎ সকলেরই মধ্যে অন্তর্লীন আত্মা, সর্বত্রসম ঈশ্বর, অচ্যুত ও জন্ম-জরা-মরণবর্জিত, আমা হতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নেই। এরূপ আমাকে আশ্রয় কর, অর্থাৎ শ্রীভগবানকে আশ্রয় কর। ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া কিছুই হবার জো নাই। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হওয়ার যে ইচ্ছা, তাও ঈশ্বরের কৃপা না হলে সম্ভব নয়। তাই অদ্বৈতজ্ঞানী আচার্য শঙ্কর শারীরকভাষ্যে লিখেছেন 'ঈশ্বরানুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবতি'—অর্থাৎ পরমেশ্বর অনুগ্রহ করে যে জ্ঞান দান করেন, তার দ্বারাই মোক্ষসিদ্ধি হয়। মোক্ষলাভও তাঁর কৃপার ওপরেই নির্ভর করে। অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলছেন—যিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে এই গীতার উপদেশ অনুযায়ী ধর্মজীবন পালন করেন তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। যাঁরা গীতা প্রচার করেন, যাঁরা গীতা অধ্যয়ন করেন এবং যাঁরা গীতা শ্রবণ করেন তাঁরা সকলেই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং সকলেই জ্ঞানযজ্ঞের উপাসক। শ্রী ভগবানের কৃপায় তাঁদের জীবনে সামগ্রিক কল্যাণ আসে, ভগবানই তাঁদের ভার নেন।

অর্জুন উবাচ
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ।।১

অর্জুন (অর্জুন) উবাচ (বললেন) মহাবাহো (হে মহাবাহু, অর্থাৎ মহাশক্তিবিশিষ্ট) হৃষীকেশ (হে সর্বেন্দ্রিয়ের নিয়ামক) কেশিনিষূদন (হে কেশিনামক অসুর-বিনাশক) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (এবং ত্যাগের) তত্ত্বম্ (তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথক ভাবে) বেদিতুম্ (জানতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ।।১

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিষূদন! হে মহাবাহো! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব অর্থাৎ কর্ম-সন্ন্যাস ও কর্মফল-ত্যাগের তত্ত্ব আমি পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

এই অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক পরমার্থ-নির্ণয় প্রসঙ্গে সমগ্র গীতার সারতত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে। শুরুতে অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—হে মহাবাহু কৃষ্ণ, সন্ন্যাস ও ত্যাগ-এর তত্ত্ব আমি আলাদা আলাদাভাবে জানতে চাই। সন্ন্যাস কী এবং ত্যাগের অর্থই বা কী ? সন্ন্যাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, সন্ন্যাস একটা মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ এবং বিশেষ অর্থে সন্ন্যাস শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু ত্যাগের অভ্যাস সকলের পক্ষে সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবা। ত্যাগ মানে পরিত্যাগ করা। সেবা হলো কর্মের দ্বারা মানুষের ও দেশের পরিচর্যা করা।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে দর্শনতত্ত্ব নিয়ে বিস্তর বিচার ও মতভেদ চলে আসছে। কেউ কেউ সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নিবৃত্তি মার্গে সন্ন্যাস অবলম্বনকেই মোক্ষলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেন। আবার কেউ কেউ কতকগুলি নিত্যকর্ম —যেমন যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ না করে কর্মের ফলত্যাগ করবার উপদেশ দেন। অতএব সন্ন্যাস ও ত্যাগ- -এই দুই তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে অর্জুন প্রশ্ন করলেন।

শ্রীভগবানুবাচ
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ।।২

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বললেন)—কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (কাম্য—স্বর্গাদিপ্রাপ্তিসাধন অশ্বমেধাদি) কর্মণাং (কর্ম-সকলের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস) বিদুঃ (বলে জানেন) বিচক্ষণাঃ (বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শিগণ) সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগং (সমস্ত কর্মফলের ত্যাগকে অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন)।।২

শ্রীভগবান বললেন—বিচক্ষণ তত্ত্বদর্শিগণ কাম্য কর্মসমূহের অর্থাৎ স্বর্গাদিফলদায়ক অশ্বমেধাদি কাম্যকর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সমস্ত কর্মের অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন।

কাম্যকর্ম ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ সন্ন্যাস ও সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ ত্যাগ বলে থাকেন। অতএব স্বর্গ, পুত্র, রাজ্য, সম্পদ প্রভৃতি ফল লাভের জন্য কাম্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাতে জীব বন্ধনমুক্ত হতে পারে না। কাম্যকর্ম মাত্রই মুক্তির প্রতিবন্ধক। তাই কাম্যকর্মের ফলসহ কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের ও কাম্যকর্মের ফল ত্যাগ করার নাম ত্যাগ।

ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে কর্ম করা হয়, তাই কাম্যকর্ম। সংসারের সকল কর্মই কাম্যকর্ম। বৈদিক কর্মের মধ্যে যজ্ঞাদি কর্ম প্রায়ই ফলাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে—যেমন যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ বা পুত্র ইত্যাদি লাভ। এইজন্য এইসকল কাম্যকর্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু সংসারে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মে কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে

না। আবার এই সকল কর্ম নিত্য না করলে প্রত্যবায় হয়। তাই সর্বকর্মফলকে সংসারের বন্ধনসৃষ্টিকারিরূপে বুঝে কর্মের ফল ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু কোনও ব্যক্তির কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় যতক্ষণ না তিনি জ্ঞাননিষ্ঠ হচ্ছেন। যিনি আত্মরতি তাঁর কোনও কর্তব্যকর্ম থাকে না। তাই যোগী কর্মত্যাগ করবেন না, তিনি কর্ম-দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠ বা আত্মরতি হবেন।

সন্ন্যাসী ফলের আশা করে কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান কখনই করবেন না। কিন্তু ত্যাগী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করতে পারেন, কিন্তু কোনরকম ফল কামনা করতে পারবেন না। সন্ন্যাস বলতে বোঝায় কর্মের সম্যক ন্যাস অর্থাৎ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা। আর ত্যাগ বলতে কর্ম একেবারে ছেড়ে দেওয়া বোঝায় না, ত্যাগের অর্থ কর্ম ও কর্মফলে আসক্তির ত্যাগ। ত্যাগের অর্থ অন্তরের ত্যাগ, কামনাবাসনা ত্যাগ। সন্ন্যাস অর্থ কর্মের বাহ্যিক ত্যাগ ও সেইসঙ্গে অন্তরের ত্যাগও থাকে। অন্তর ও বাইরে কর্মের ত্যাগ চাই তবেই প্রকৃত সন্ন্যাস। অতএব ভগবান দুটি বিষয় বলছেন—কাম্যকর্ম-এর ত্যাগ এবং সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগ। আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—আমি স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে পারি, অথবা 'সর্ব-ভূত-হিতে-রতাঃ' অর্থাৎ 'লোক-সংগ্রহ'-এর উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি। এর তাৎপর্য হলো—আমি সমাজের জন্য, জগতের সকলের কল্যাণের জন্য কর্ম করতে পারি। এইভাবে কাজ করলে নিজের অহংভাব, আমিত্ব মুছে গিয়ে সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ অনুভব করতে পারব। এইভাবে আমার চিত্তশুদ্ধি হবে এবং আমি জ্ঞান লাভ করতে পারব বা আত্মরতি হতে পারব।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ।।৩

একে (কোনও কোনও) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) কর্ম (কর্মমাত্রই) দোষ-বৎ (দোষযুক্ত অর্থাৎ বন্ধনের কারণ) ইতি (এই জন্য) ত্যাজ্যং (ত্যাগ করা উচিৎ) প্রাহুঃ (বলেন) অপরে চ (ও অপর কোনও কোনও মীমাংসক) যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাগ করা উচিত নয়) ইতি (এরূপ বলেন)।।৩

কোনও কোনও মনীষিগণ কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব কর্ম ত্যাজ্য—এরূপ বলেন। অপর কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বিহিত কর্ম আদৌ ত্যাজ্য নয়, যেহেতু বিহিত কর্মত্যাগে প্রত্যবায় হয়।

বিশেষ করে সাংখ্যবিদগণ বলেন, কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, কারণ কর্ম পুরুষকে সংসারে বদ্ধ করে, এটি জ্ঞানের পরিপন্থী। অতএব মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষে দৈনন্দিন অভ্যস্ত কর্ম, যেমন—নিদ্রা, গমন, ভোজন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। এই

সম্প্রদায়ের মতে, যিনি ভিক্ষা-আদি কর্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম ত্যাগ করেছেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। কাম-ক্রোধাদি যেমন মানুষের মুক্তির প্রতিবন্ধক তেমন নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্য কর্ম সমূহ দোষযুক্ত ও মুক্তির প্রতিবন্ধক —তাই এইসকল কর্ম বর্জনীয়।

কিন্তু অপরপক্ষে, বিশেষ করে মীমাংসকগণের মতে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয়। অতএব যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই সকল কর্ম কারও পক্ষে ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। কারণ এইসকল কর্ম ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তা জ্ঞানলাভের সহায়ক। এইসকল কর্ম বিহিত কর্ম, মোক্ষের পক্ষে অনুকূল অতএব কারও, এমনকী সন্ন্যাসীরও এটি ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য। তাছাড়া যজ্ঞ হলো ঈশ্বরের উদ্দেশে সকল কর্ম ও কর্মের ফল উৎসর্গ করা এবং এটি আধ্যাত্মিক কর্ম ও তা ঈশ্বর লাভের পথে সহায়ক। দান অর্থাৎ অপরকে সাহায্য করা—শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'। তপস্যা বা আত্মসংযম। যাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত এবং যিনি আত্মার আনন্দে আনন্দিত তিনিই জ্ঞানী। এই ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।।৪

ভরত-সত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (নিশ্চিতমত, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত) শৃণু (শোন) পুরুষ-ব্যাঘ্র (হে পুরুষপ্রবর) ত্যাগঃ হি (ত্যাগই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার গুণভেদে) সম্প্রকীর্তিতঃ (শাস্ত্রে সম্যগ্-রূপে কথিত হয়েছে) ।।৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই ত্যাগ গুণাদিভেদে ত্রিবিধ বলে শাস্ত্রাদিতে কথিত হয়েছে।

যাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়নি, সেইসব কর্মাধিকারীদের ত্যাগ সম্বন্ধে অর্জুনকে সহজে বোঝাবার জন্য ভগবান তাদের ত্যাগকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক— এই তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যিনি কর্মত্যাগ করবেন তাঁর মানসিক ভাবের দিকে লক্ষ রেখেই এই বিভাগ করা হয়েছে। কারণ এই মনোভাবের উপরই ত্যাগের উপযোগিতা নির্ভর করে। ত্যাগের ক্ষেত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের প্রভাব সুস্পষ্ট। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই তিন গুণের প্রকাশ দেখা যায়।

ফলের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে সকল কর্মের অনুষ্ঠান—প্রথম ত্যাগ। ফল-কামনা সত্ত্বেও যে-কর্মের ত্যাগ তা—দ্বিতীয় ত্যাগ। ফলের ইচ্ছা ও সেইসঙ্গে কর্মের অনুষ্ঠান উভয় ত্যাগ—তৃতীয় ত্যাগ। প্রথম ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ—এটি আমাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়—রাজস ও তামস ত্যাগ আমাদের অকর্তব্য, কারণ—ফলের ইচ্ছা আছে কিন্তু কর্ম ক্লেশসাধ্য বলে আমরা কর্ম ত্যাগ করছি—এটি রাজস ত্যাগ। ভ্রান্তি ও অলস

প্রকৃতি হওয়ায় ফলের ইচ্ছা ও কর্মের অনুষ্ঠান উভয় ত্যাগ করা—এটি তামস ত্যাগ। আর যিনি গুণাতীত ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি তিন গুণের অতীত তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মফল ত্যাগ করেন কারণ চিত্তশুদ্ধির পর আত্মজ্ঞান লাভ হলে যে কর্মত্যাগ হয়, সেই সাধনরূপ ত্যাগ তিনি করেছেন।

ত্যাগের এই গূঢ় মহিমা বোঝাবার উদ্দেশ্যে ভগবান অর্জুনকে 'ভরতসত্তম' ও 'পুরুষব্যাঘ্র' সম্বোধন করে অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের মহত্ত্বত্ব প্রচার করছেন। কারণ অর্জুনই এই ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝবার উপযুক্ত পাত্র।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ।।৫

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নয়) তৎ (তা) কার্যম্ এব (অবশ্যকরণীয়) যজ্ঞঃ (কারণ যজ্ঞ) দানং (দান) তপঃ এব চ (ও তপস্যাই) মনীষিণাম্ ([ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী] মনীষিগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকারক) ।।৫

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম [ত্যাজ্য নয়, পক্ষান্তরে তাহা অবশ্য করণীয়। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এসব কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক।

যজ্ঞ—অর্থাৎ যে-কোনও কর্ম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে—দ্রব্যযজ্ঞ—শ্রৌত অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ এবং স্মার্ত অর্থাৎ কূপখনন, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মের কথা। তপোযজ্ঞ—ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধন, যোগযজ্ঞ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি; স্বাধ্যায় যজ্ঞ—শাস্ত্রপাঠ; জ্ঞানযজ্ঞ—বেদের অর্থনির্ণয়, বিচার দান—অর্থাৎ সৎপাত্রে, সৎস্থানে ও শুভ সময়ে দান ও সেবাকর্ম; তপস্যা—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বশে রাখবার জন্য কষ্টস্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধন কর্ম ইত্যাদি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ শৈশবে, গাহর্স্থ্য জীবনে, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস যে-কোনও আশ্রমেই পরিত্যাজ্য নয়। কারণ এই সকল কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—বিদ্বানগণ মনে করেন। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হয়ে এই সকল কর্ম করলে ব্যক্তির সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় এবং সে নিরাসক্ত ও নির্মলচিত্ত হয়ে জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়। তাই যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কখনই এইসকল কর্ম পরিত্যাগ করেন না। তাঁরা জানেন, এইসকল কর্ম মনকে শুদ্ধ ও সংযত করে। ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' পরিমার্জিত হয়ে মন পরিশুদ্ধ হয় এবং সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে সক্ষম হয়। তাঁদের হৃদয়ের বিস্তার ঘটে ও অন্তরের সব রকমের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। তবে কর্মের পিছনে সঠিক অর্থাৎ সৎ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অবশ্য কর্তব্য।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ।।৬

পার্থ (হে অর্জুন) এতানি (এইসকল) কর্মাণি (কর্মসমূহ) তু অপি (কিন্তু) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ ((এবং ফলাকাঙ্ক্ষা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) কর্তব্যানি (অবশ্যকর্তব্য) ইতি (এটা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (নিশ্চিত) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠ) মতম্ (মত বা সিদ্ধান্ত)।।৬

হে পার্থ! এইসকল কর্ম, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অবশ্যই কর্তব্য-কর্মরূপে করা উচিত—এটা আমার নিশ্চিত ও উত্তম অভিমত।

ভগবান নিশ্চিত করে বলছেন—আমার দৃঢ় ও সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, সব আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এইসকল কর্ম করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য। আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন না করে এই সকল কর্ম—'যজ্ঞ-দান-তপস্যা' সম্পাদন করলে তা মোক্ষপ্রদ না হয়ে বন্ধনেরই কারণ হবে।

আমি এই জাতি, আমার এই মান, এই গুণ, আমি কর্তা প্রভৃতি অভিমান, ভোগাসক্তি ও ফলের আশা ত্যাগ করেই এই সকল কর্ম করাই অবশ্য কর্তব্য এটাই ভগবানের অভিপ্রায়। অর্থাৎ কর্ম করার সময়ে অনাসক্ত হয়ে, মনের সকল সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে এবং নিজেই কর্মের ফল ভোগ করব—এই স্বার্থপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে। জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য কর্ম করছি—এই ভাবটি কর্মের পেছনে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তবেই আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। নচেৎ দৈহিক ও মানসিক সঙ্কীর্ণতার কারণে আসুরিক প্রবৃত্তি—কাম, ক্রোধ, লোভ ও হিংসার প্রকাশ ঘটবে। তাই সতর্কতার সঙ্গে আমাদের অন্তরের দৈবীশক্তির বিকাশ করে, ভাল কাজে লাগালে, চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির —এককথায় সব রকমের সত্ত্বগুণের বিকাশ সম্ভব। একমাত্র মানুষই পারে এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে, আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ।।৭

নিয়তস্য তু (কিন্তু নিত্য) কর্মণঃ (কর্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নয়) মোহাৎ (মোহবশত) তস্য (সেই নিত্যকর্মের) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ) তামসঃ (তামস অর্থাৎ অজ্ঞানপ্রণোদিত) (বলে) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়)।।৭

স্বধর্মানুসারে শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, নিত্যকর্ম চিত্তশুদ্ধিক্রমে মোক্ষের হেতুভূত। মোহবশত ঐ নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করা তামসিক ত্যাগ বলে কথিত হয়।

কাম্য কর্ম বন্ধনের হেতু, তাই আত্মজ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষুগণ সেইসকল কাম্যকর্ম ত্যাগ করবেন। কিন্তু নির্দোষ নিত্যকর্ম কোনও ক্রমেই ত্যাজ্য নয়, বরং নিত্য-কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে।

নিয়ত কর্ম বলতে বোঝায় শাস্ত্রবিহিত কর্ম। একে স্বধর্ম, স্বকর্ম, সহজ কর্ম, স্বভাবজ কর্ম ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। জীবের স্বভাবের বা প্রকৃতির—গুণভেদ, বর্ণভেদ ও কর্মভেদ শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। তাই নিয়ত কর্ম অর্থাৎ স্বধর্মানুসারে যথা—অধিকার প্রাপ্ত কর্ম বোঝায়। নিত্যকর্ম যেমন—১) সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম। ঐ সকল কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কোনও ফললাভ হয় না, অথচ না করলে প্রত্যবায় হয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এইসব কর্ম নিয়ত কর্মের অন্তর্গত। ২) বর্ণাশ্রম- উপযুক্ত কর্ম অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের ও আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম। যেমন—ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি। এই-সকল কর্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম, কারণ মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারাই এইসকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ৩) ভগবৎ প্রীত্যর্থ কর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে ও ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় যেসকল কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে।

এইসকল নিয়ত কর্ম পরিত্যাগ করা কখনও কর্তব্য নয়। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে এইসকল কর্ম সম্পাদন করলে তার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল হয়। কিন্তু অজ্ঞানী মানুষ নানা কারণে এইসকল নিয়ত কর্ম ত্যাগ করে থাকে। তামস প্রকৃতির লোকেরা নিদ্রায় ও আলস্যে থাকতে চায়, প্রকৃতিগত স্বভাবই তাকে কর্মহীন করে দেয়। কর্মহীনতার উপর তাদের আসক্তি। সেইজন্য এদের মোহ বা বুদ্ধিভ্রম ঘটে। তারা বিহিত কর্মও ত্যাগ করে। এই প্রকার ত্যাগ তামস ত্যাগ। এই ত্যাগ দ্বারা পুরুষের অধোগতি হয়।

এইসকল নিয়ত কর্ম সকলের কল্যাণের জন্য অবশ্যপালনীয় কারণ এই কর্ম সম্পাদন করা সমাজের সকলের অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে যখন তমোগুণের-এর প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি তমোগুণের মোহে আচ্ছন্ন হয়, তখন আমাদের এবং সকলের কল্যাণের জন্য যেসকল শাস্ত্র কর্মের বিধান দিয়েছে—সেগুলিকে আমরা অগ্রাহ্য করি ও বর্জন করি। এই ত্যাগ তামসিক ত্যাগ।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ।। ৮

যৎ (যে) কর্ম (কর্ম) দুঃখম্ এব (দুঃখকরই) ইতি (এরূপ ভেবে) কায়ক্লেশভয়াৎ (শারীরিক ক্লেশের ভয়ে) লোকঃ (কোনও ব্যক্তি) ত্যজেৎ (কর্ম ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং (রাজসিক) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করে) ত্যাগ-ফলং (ত্যাগের ফল) ন এব লভেৎ (লাভ করতে পারেন না)।।৮

কর্মফল ত্যাগে মোক্ষলাভ হয় কিন্তু কর্তব্যকর্ম করা অতি দুঃখকর—এইরূপ মনে করে শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্মত্যাগ করা হয়—তা রাজসিক ত্যাগ। যিনি এইভাবে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করেন তিনি প্রকৃত ত্যাগের ফললাভ করেন না।

তিনি জানেন যে, ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়ে শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করলে মোক্ষলাভ অবশ্যই হয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিনিয়ত ঐসকল কর্তব্যকর্ম করা অতি দুঃখকর, শরীরের কষ্ট হবে। তাই এইরূপ শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যিনি কর্মত্যাগ করেন, সেই ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ। নিত্য কর্তব্যকর্মগুলি না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, আবার চিত্তশুদ্ধি না হলে নিত্য কর্তব্যকর্মগুলি অত্যন্ত ক্লেশকর বলে বোধ হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি হলে নিত্য কর্তব্যকর্মগুলি তখন সহজ ও অভ্যাসে পরিণত হয়।

এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যাদের কর্মের প্রতি ঝোঁক বা আসক্তি আছে, তারা কর্মহীনতা চায় না। কিন্তু তারা কর্ম আরম্ভ করলেও পরিণামে নিষ্ফলতা বা বিপরীত ফলের দরুন শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ পায়। কর্মের দ্বারা অনেক শোক-দুঃখ পেয়ে অথবা সংসারজীবনকে অসার মূল্যহীন মনে করে, সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে কর্মত্যাগ করে। এই ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ। এই ত্যাগের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না এবং সেইসঙ্গে সংসারবন্ধন হতে মুক্তিলাভও হয় না। এই ধরনের রাজসিক ত্যাগের দ্বারা সেই ব্যক্তি কখনও ত্যাগের ফল লাভ করতে পারে না।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ।। ৯

অর্জুন (হে পার্থ) সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব (এবং ফলাকাঙ্ক্ষাও) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) কার্যম্ (কর্তব্যকর্ম) ইতি এব (এইরূপ) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম (নিত্য-কর্ম বা অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (সেই) ত্যাগঃ (ত্যাগ অর্থাৎ কর্মফলত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) মতঃ (বলা হয়) ।।৯

হে অর্জুন! কর্তৃত্বাভিমান, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কেবল কর্তব্যবোধে যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই কর্মফল ত্যাগকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হয়।

যাঁরা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করছেন তাঁরা তাঁদের নিয়ত কর্ম ত্যাগ করেন না। যা শাস্ত্রবিহিত, যা স্বভাবনিয়ত, যা ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট—এরূপ সমস্ত কর্মই তাঁরা কর্তব্যবোধে সম্পাদন করেন। যে পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্যন্ত সকলের কর্ম করবার অধিকার থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন শ্রীমকে বলছেন, 'যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম—আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হল। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।'

সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সকল কর্তব্যকর্ম অনাসক্ত হয়ে অনুষ্ঠান করেন। কর্ম

করতে গেলে যে শারীরিক ক্লেশ, মানসিক কষ্ট হয় তাতেও তাঁরা ভীত হন না। কোনও কর্মের উপর বা কর্মফলের উপর তাঁদের আসক্তি থাকে না। 'আমি কর্ম করছি' এই অভিমান, 'আমার এরূপ ফলসিদ্ধি হবে'—এরূপ কামনা, সাত্ত্বিক ব্যক্তি কখনই মনে পোষণ করবেন না। নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্তব্যকর্ম না করলেই ক্ষতি হয় বা, প্রত্যবায় হয় তাই তাঁরা নিত্যকর্ম ত্যাগ করেন না।

যিনি যংযতচিত্তে নিয়মপূর্বক সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্য করেন, তিনি পাপমুক্ত হয়ে আনন্দময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সাত্ত্বিক কর্মিগণ নিত্যকর্মের এইসকল উপাদেয় ফল থাকতেও তা আকাঙ্ক্ষা করবেন না। কারণ যা বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন না। আকাঙ্ক্ষা করলেই মানবকে সংসারপাশে আবদ্ধ হতে হয়। অতএব সাত্ত্বিক ত্যাগ বাহ্যিক ত্যাগ নয়, এটা প্রকৃত অন্তরের ত্যাগ। তাই তাঁরা বাইরে কর্মসকল অনুষ্ঠান করেও অন্তরে পূর্ণত্যাগীই থাকেন।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ।।১০

সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্ন-সংশয়ঃ (অজ্ঞানকৃত সংশয়শূন্য) ত্যাগী (কর্মফলত্যাগী) অকুশলং (অকল্যাণকর) কর্ম (কর্মকে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) কুশলে (সুখকর, কল্যাণকর কর্মে বা নিত্যকর্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ।।১০

সত্ত্বগুণযুক্ত, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়রহিতবিশিষ্ট সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ ক্লেশদায়ক কর্মেও দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিমুক্ত হয়ে কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম করে থাকেন।

সাত্ত্বিক ত্যাগী কীভাবে কৌশলে কর্ম করেন সেই প্রসঙ্গে বলছেন। যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সাত্ত্বিক ত্যাগপরায়ণ হন, তাঁকে সত্ত্বগুণ পূর্ণ আশ্রয় করে। আত্ম-অনাত্ম বিবেকজ্ঞান তাঁর হৃদয়ে প্রকাশ পায়। আত্ম-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত মেধা তাঁতে প্রকাশিত হয়। অন্তর থেকে অবিদ্যা নিবৃত্তির ফলে তাঁর সর্বপ্রকার সংশয় দূর হয়। তাই তিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, এবং মেধাবী, শুভ, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। ঐরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হওয়াতে তিনি সাত্ত্বিক কর্মী। আত্মাকেই একমাত্র সৎ পদার্থ জেনে তিনি অনিত্য জাগতিক পদার্থে অনুরক্ত হন না। বিষয়াকাঙ্ক্ষা তাঁর চিত্তে স্থান পায় না। আত্মার সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। এরূপ জ্ঞানীর সকল সংশয় ছিন্ন হয়। যিনি মেধাবী, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁর সুখকর কর্মে প্রীতি হয় না। স্বর্গের সুখে আসক্ত হন না, আবার দুঃখদায়ী কর্মের জন্য দৈহিক বা মানসিক ক্লেশগুলিও সহজে সহ্য করেন। তাঁর চিত্ত কখনও বিভিন্নমুখী কামনা দ্বারা আন্দোলিত হয় না।

যেহেতু জ্ঞানীর চিত্ত সংশয়বর্জিত 'ছিন্নসংশয়'। তাঁর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই জ্ঞান হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবকে তিনি এক ও অভিন্ন জ্ঞান করেন। সেই বিদ্যারূপা মেধার দ্বারা তাঁর অবিদ্যা দূর হয়েছে এবং অবিদ্যার কার্য যে সংশয় তাও দূর হয়েছে। তিনি পরমেশ্বরকে একমাত্র সত্যবস্তু বলে জানেন, তাই সংসারের কোনও বাসনায় তাঁর চিত্ত ধাবিত হয় না। তাঁর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিসংশয়রূপে কর্তব্যকর্ম স্থির করে।

এইরূপ জ্ঞানী-কর্মী দুঃখে কর্ম হতে নিবৃত্ত হন না, আবার কোনও কর্ম সুখপ্রদ বলে তাতে প্রবৃত্ত হন না। কারণ তাঁর অহংবুদ্ধি বা কর্তাবুদ্ধি থাকে না। সুখের আশায়, বা অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণায় তিনি কর্ম আরম্ভ করেন না, আবার দুঃখ বা ক্ষতির আশঙ্কায় কোনও কর্মও ত্যাগ করেন না। তিনি 'অকুশলং কর্ম ন দ্বেষ্টি'—অকুশল কর্মে দ্বেষ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ কাম্য বা নিষিদ্ধরূপ অশোভন কর্মকে প্রতিকূল বলে মনে করেন না। এবং তিনি 'কুশলে ন অনুষজ্জতে' অর্থাৎ নিত্যবিহিত শোভন, কুশল কর্মে অনুরক্ত হন না বা প্রীতি প্রকাশ করেন না। যেহেতু কর্তৃত্বাদি অভিমান তাঁর দূর হয়েছে তাই এরূপ হয়। তিনি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি প্রভৃতি উপেক্ষা করে কর্মের ফলাফল ভগবানের উপর অর্পণ করে সমস্ত বিহিত নিত্যকর্ম সম্পাদন করেন।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ।।১১

হি (যেহেতু) দেহভৃতা (দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করতে) ন শক্যং (সমর্থ হয় না) [সেজন্য] যঃ তু (কিন্তু যিনি) কর্মফল-ত্যাগী (কর্মফল ত্যাগ করেছেন) সঃ (তিনি) ত্যাগী ইতি (ত্যাগী বলে) অভিধীয়তে (অভিহিত হন) ।।১১

যেহেতু দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে নিঃশেষে সর্ববিধ কর্মত্যাগ সম্ভব নয়, সেইহেতু যিনি কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করেছেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলে কথিত।

যতদিন পর্যন্ত 'আমি মানুষ' জীবিত, আমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, আমি ছাত্র বা গৃহস্থ—এই দেহাভিমান হৃদয় থেকে দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্যন্ত রাগ-দ্বেষাদি মানুষের হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। এইজন্য দেহীগণের এই অভিমান-অজ্ঞান থাকলেও কেবল ফলকামনা ত্যাগ করতে পারলেই তিনি ত্যাগী বলে কথিত হন। এই নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই পরমার্থতত্ত্ব লাভ হয় ও ঈশ্বর দর্শন হয়—তিনিই প্রকৃত ত্যাগী।

দেহধারী মানুষ সকল কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক কর্ম আপনা হতেই হয়ে থাকে। যতদিন শরীর আছে ততদিন এইসকল কর্ম ছাড়বার উপায় নাই। কাজেই কর্মত্যাগ বলতে কর্মের বাহ্যিক ত্যাগ বোঝায় না। ত্যাগের অর্থ ফলত্যাগ, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা না করে সমস্ত বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ত্যাগী।

কর্মের যে বন্ধনশক্তি তা কর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান হতে উৎপন্ন হয় না, যে ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয় সেটাই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্যে কর্মের ফলত্যাগই একান্ত আবশ্যক, বাহ্যিক ত্যাগের কোনও প্রয়োজন নেই। অতএব যিনি ফলকর্মের—ত্যাগ করেছেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী, প্রকৃত সন্ন্যাসী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে (মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত)বলছেন, সংসারে নিষ্কাম কর্ম করবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে কর্ম করে সে ভাল কাজ—নিষ্কাম কর্ম করবার চেষ্টা করে। কর্ম সকলেই করে—তাঁর নামগুণ করা এও কর্ম—সোঽহংবাদীদের 'আমিই সেই' —এই চিন্তাও কর্ম—নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার জো নেই। তাই কর্ম করবে, কিন্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে। শ্রীম-র প্রশ্ন—অর্থের জন্য বেশি চেষ্টা করা উচিত? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশি উপায়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় তো সে টাকায় দোষ নাই।...তবে ঈশ্বরলাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না।...ঈশ্বরলাভ করলে তাঁর বাইরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়। তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসাব থাকে না।

অতএব সামগ্রিকভাবে কেউ কর্মত্যাগ করতে পারে না। যেহেতু দেহ যতদিন থাকবে কর্ম না করে থাকা যাবে না, কোনও না কোনও কর্ম আমাদের পিছু ধাওয়া করবে, সেইহেতু ভগবান বলছেন, কর্মের ফল ও কর্তৃত্ববোধ ত্যাগ করেই সংসারে কর্তব্যকর্ম করতে হবে এবং ঐভাবেই সে ঈশ্বরলাভের পথে এগিয়ে যাবে।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ।।১২

অনিষ্টং (অকল্যাণকর [পশ্বাদিজন্ম]) ইষ্টং (কল্যাণকর[দেবাদি জন্ম]দেবত্ব) মিশ্রং চ (এবং ইষ্ট-অনিষ্ট মিশ্রিত[মানবজন্ম]) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার অর্থাৎ পাপ, পুণ্য ও পাপপুণ্যের মিশ্রণরূপ) কর্মণঃ (কর্মের) ফলম্ (ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের অর্থাৎ যারা কর্মফল ত্যাগ করেনি তাদের) প্রেত্য (মৃত্যুর পরে পরলোকে) ভবতি (ভোগ হয়) তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (কর্মফলত্যাগীদের অথবা আত্মজ্ঞানীদের) ন ক্বচিৎ (কখনই হয় না)।।১২

ত্যাগী ও অত্যাগীদের মৃত্যুর পর কী অবস্থা হয় সেই প্রসঙ্গে বলছেন। যারা কর্মফল ত্যাগ করে না সেই অত্যাগী সকাম-কর্মিগণকে নিজ নিজ কর্মানুসারে মৃত্যুর পর অনিষ্ট--অকল্যাণকর নারকিত্ব, ইষ্ট—কল্যাণকর দেবত্ব, ও ইষ্টানিষ্ট- মিশ্র মানবজন্ম—এই তিনপ্রকার

কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম করেন বা সন্ন্যাসী তাঁরা সাত্ত্বিক-কর্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ জ্ঞানলাভ করেছেন। তাঁদের কখনই এরূপ কর্মফল ভোগ করতে হয় না. অর্থাৎ তাঁরা চিরমুক্ত হয়ে যান।

কর্মফল সাধারণত তিন প্রকার : ১) যাদের সর্বদা পাপকর্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য কামাকর্ম করাই একমাত্র লক্ষ্য, তাদের অনিষ্ট ফল হয়। মৃত্যুর পর তাদের নরকবাস ও পশুযোনিতে জন্ম হয়। ২) যারা কখনও শুভ বাসনা, আবার কখনও অশুভ বাসনা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে পুণ্য এবং পাপ উভয় কর্মের অনুষ্ঠান করে, তারা মনুষ্যজন্মলাভ করে সুখ ও দুঃখ দুটোই ভোগ করে। মানবজীবনেই মিশ্র ফলভোগ--ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয় ফল ভোগ হয়ে থাকে। ৩) আর যারা সর্বদা শুভ বাসনা প্রণোদিত হয়ে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাদের মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয় এবং তারপর তারা উত্তম জন্মলাভ করে।

কিন্তু যাঁরা মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁরা অহংবোধ বা কর্তৃত্ববোধ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের কর্মফল ভোগ করতে হয় না। তাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন। তাঁদের দেহান্তে ইষ্ট, অনিষ্ট অথবা ইষ্ট-অনিষ্ট কোনও প্রকার সংস্কার না থাকায় ভোগায়তন শরীর আর আশ্রয় করতে হয় না। অজ্ঞানতাই জন্মজন্মান্তরের হেতু। অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হলে পুনরায় দেহধারণ হয় না।

পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ।।১৩

মহাবাহো (হে অর্জুন) কৃত-অন্তে (কর্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে) সাংখ্যে (বেদান্তে) সর্বকর্মণাম্ (সকল কর্মের) সিদ্ধয়ে (সম্পাদনের জন্য) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি পঞ্চ কারণানি (এই পাঁচটি কারণ) মে (আমার কাছে) নিবোধ (অবগত হও) [সাংখ্য—কপিল-কৃত সাংখ্যশাস্ত্র বা বেদান্তশাস্ত্র]।।১৩

হে মহাবাহো! বেদান্তশাস্ত্রে কর্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্তে, সকল কর্মের সিদ্ধির হেতু বলে কথিত যে পাঁচটি কারণ নিরূপিত হয়েছে, সেগুলি তুমি আমার কাছে জেনে নাও।

আত্মার কর্তৃত্বাভিমান দূর করবার জন্য অবশ্যই সাংখ্যের এই পাঁচটি কারণ জানা প্রয়োজন। সাংখ্য বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই পরমাত্মার জ্ঞান হয়। পরমাত্মার জ্ঞান হলেই কৃতকর্মের অন্ত বা সমাপ্তি হয়, তাই কৃতান্ত অর্থাৎ বেদান্তে কর্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যে অর্থাৎ বেদান্তে, চরম জ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে। 'সাংখ্যে কৃতান্তে'—কৃতের অর্থাৎ কর্মের অন্ত (শেষ)। সাংখ্যদর্শনে (বেদান্তে) যা কৃত বা কর্ম অর্থাৎ বৈদিক কর্মকাণ্ডের অন্ত, সেখানেই জ্ঞানের বিচারের দ্বারা সকল কর্মের পরিসমাপ্তি। বেদান্তশাস্ত্রে বৈদিক কাম্যকর্ম সকল-যাগযজ্ঞাদির পরিসমাপ্তিতে ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হয়েছে-

-তা-ই কৃতান্ত। অতএব 'পঞ্চ ইমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে'—সকল কর্মের পিছনে যে পাঁচটি কারণ বা হেতু থাকে, তা আমার কাছ থেকে জেনে নাও।

অর্জুনকে 'মহাবাহো' সম্বোধন দ্বারা ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সামর্থ্যের পরিচয় দিচ্ছেন। পাছে অর্জুন কারণগুলি শ্রীকৃষ্ণের নিজ-মনে কল্পিত বলে মনে করেন, তাই ভগবান সেগুলিকে বেদান্তসিদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করছেন। যে বেদান্ত-শাস্ত্রে আত্ম-অনাত্ম জ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মনন করে জীবের মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল ও অন্যান্য সাংখ্যবাদীরা জ্ঞাতব্য বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবংচৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪

অধিষ্ঠানং (শরীর বা স্থান) তথা (এবং) কর্তা (চেতন ও অচেতনের সংযোগকারী অহঙ্কার) পৃথক্-বিধং (এবং বিবিধ প্রকার) করণম্ (চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ) বিবিধাঃ চ ([কার্যত ও স্বরূপত] নানাপ্রকার) পৃথক চেষ্টাঃ (পৃথক পৃথক চেষ্টা অর্থাৎ কার্য) অত্র (এদের মধ্যে) পঞ্চমম্ (পঞ্চম) দৈবম্ এব চ (ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী পুরুষ) ।।১৪

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, চেতন ও অচেতনের সংযোগকারী অহঙ্কার, বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহ, বিবিধ অথচ পৃথক চেষ্টা বা উদ্যম এবং দৈব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অদৃষ্ট, অথবা কর্মফল দাতা অন্তর্যামী পুরুষই পঞ্চম কারণ।

ভগবান এখানে কর্মের কারণগুলি বলছেন। প্রথমে বলা হচ্ছে—

'অধিষ্ঠানং'—মানবদেহ সকল কর্মের ভিত্তি। শরীর না থাকলে কর্ম নেই। জীবের শরীর বলতে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়—এই সকল বুঝায়। দেহে আত্মা অধিষ্ঠিত থাকে বলে এটিকে অধিষ্ঠান বলা হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতন-আদি ধর্মের অভিব্যক্তির আশ্রয়স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের নাম 'অধিষ্ঠান'। এই শরীরে অথবা শরীর দ্বারাই জীবের সমস্ত কর্ম হয়ে থাকে।

কর্তা—কর্ম থাকলেই তার একজন কর্তা থাকবে। শুধু দেহ নয়, অহংকার- বিশিষ্ট মানুষ চাই। চেতন ও অচেতনের সংযোগকারী অহংকার অথবা অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান আদি নামোপহিত ও আত্মার সহিত তাদাত্ম্য-অধ্যাসযুক্ত অহঙ্কার। দেহাভিমানী আত্মাই কর্তা। তিনি মনে করেন—আমি এই কর্ম করছি, সঙ্কল্প করে আমি এই কাজটা করব।

করণম্—উপায় অর্থাৎ যার সাহায্যে কর্ম সম্পন্ন হয়। যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়; মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ করণ নামে উক্ত। বিষয় উপলব্ধির সাধনরূপ ইন্দ্রিয়সকলের নাম করণ।

এইসকল করণের দ্বারা কর্ম সম্পাদন হয়ে থাকে।

পৃথক চেষ্টাঃ—নানা ধরনের কর্মপ্রচেষ্টা ও পদ্ধতি। যে-সকল শক্তি প্রয়োগ করে কর্তা কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তাদেরকে এখানে পৃথক চেষ্টা বলা হয়েছে। পঞ্চভূত দেহের কার্যরূপ, পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান) শক্তির চেষ্টাও নানারূপ। দেহ, কর্তা, ও করণের দ্বারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করাই প্রচেষ্টা।

দৈবম্—শেষে পঞ্চম উপকরণটি হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ—'দৈবম্' অর্থাৎ অদৃষ্ট শক্তি। এই শক্তি দ্বারা কর্মসম্পাদনের সাহায্য হয় অথবা কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এই অদৃষ্ট শক্তিকেই দৈব বলা হয়ে থাকে। কর্মফলদাতা সর্বপ্রেরক অন্তর্যামী ভগবানই দৈব। ইন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠাত্রী অনেক দেবতাই দৈব। যেমন শরীররূপ অধিষ্ঠানের দেবতা পৃথিবী, কর্তৃত্বরূপ অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে—দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। মন ও বুদ্ধির দেবতা চন্দ্র ও বৃহস্পতি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান--এই চেষ্টারূপ পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথাক্রমে সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। আবার দৈব বলতে ধর্ম ও অধর্ম উভয়কেই বোঝায় অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম-সংস্কার।

মূল ভাবটি হলোঃ জীবের কর্ম ও কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের সঙ্কল্প থেকে। শ্রুতি বলছেন—'একোঽহং বহু স্যাম্'—আমি এক আছি, বহু হব। ঈশ্বরের এই সঙ্কল্প হতেই সকল ভূতের উৎপত্তি এবং সকলের স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্তি। অতএব আমরা সকলেই গুণত্রয়ের দ্বারা বদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম করে থাকি।

একথা স্বীকার করতে হয় যে, কর্মের চারটি কারণ অর্থাৎ কর্তা, অধিষ্ঠান, করণ এবং চেষ্টা বা উদ্যম এগুলি বর্তমান থাকলেও কর্ম সফল হয় না। কোনও এক অজ্ঞাত শক্তির বলে সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হয়ে যায়। এই শক্তিই দৈব অর্থাৎ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার শক্তি। কেউ কেউ বলেন, এই অদৃষ্ট শক্তিই দৈব বা নিয়তি। মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলই তার অদৃষ্ট বা নিয়তি। অতীত জন্মে কৃতকর্মগুলি এই জন্মে ভাগ্যরূপে কাজ করে চলেছে। তাই আমাদের ভাগ্য আমরাই গড়ে তুলছি। আমরাই আমাদের ভাগ্যের রূপকার, বাইরের কেউ নয়। কারও ঘাড়ে দোষ চাপানো যাবে না। আমার কর্মের ফল এগুলি। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক কর্মের সাফল্যের পিছনে পাঁচটি কারণ থাকবেই, আবার কর্মের সাফল্যের দ্বারাই এই পাঁচটি কারণের বিকাশ ঘটে।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ।।১৫

নরঃ (মনুষ্য) শরীর-বাক্-মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে)

ন্যায্যং বা (শাস্ত্রীয়, ন্যায্য) বিপরীতং বা (অশাস্ত্রীয়) কর্ম (কার্য) প্রারভতে (আরম্ভ করে) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) তস্য (সেই কর্মের) হেতবঃ (হেতু) ।।১৫

মানুষ কায়-মনো-বাক্যে অর্থাৎ শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে ন্যায্য অর্থাৎ ধর্ম বা অন্যায্য অর্থাৎ অধর্ম বা বিপরীত কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই কর্মের এই পাঁচটিই কারণ।

মানুষ নিজের শরীর, বাক্ ও মনস্ অর্থাৎ দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করে তা কায়িক, বাচিক বা মানসিক—এই তিন শ্রেণির কোনও না কোনওটির অন্তর্গত। এ জগতে আমরা যে-কাজই আরম্ভ করি, কর্মই সেইসকল—'ন্যায্যং বা বিপরীতং'—ন্যায়সঙ্গত শাস্ত্রবিহিত কর্ম বা অন্যায়যুক্ত অশাস্ত্রীয় কর্ম। কিন্তু ভাল বা মন্দ, ন্যায় বা অন্যায়, ধর্ম বা অধর্ম, শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি, অধর্মই হোক, এমনকি জীবন রক্ষার জন্য নিঃশ্বাস, নিমেষ, উন্মেষ ইত্যাদি স্বাভাবিক কর্মই হউক কিংবা কায়িক, মানসিক বা বাচিক যে রূপেই মানুষ কর্মের অনুষ্ঠান করুক, সমস্ত কর্মেরই মূলে অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, পৃথক চেষ্টা বা দৈব—এই পাঁচটি কারণ বর্তমান থাকবেই। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে কর্মের এই পাঁচটি কারণের বিকাশ ও কর্মের অনুষ্ঠানের চেষ্টা ন্যায্য না অন্যায্য।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ।। ১৬

তত্র (সর্বকর্মে বা সর্ববিষয়ে) এবং (এরূপ অর্থাৎ এই পঞ্চ কারণ) সতি (হলেও) তু (কিন্তু) যঃ (যে) কেবলম্ (নিরুপাধিক অসঙ্গ) আত্মানং (আত্মা অর্থাৎ জীবকে) কর্তারম্ (কর্তারূপে) পশ্যতি (দেখে) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (শাস্ত্র ও আচার্যোপদেশ-অভাবে অপরিমার্জিত বুদ্ধিহেতু) সঃ (সেই) দুর্মতিঃ (দুর্বুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্ দর্শন করে না) ।।১৬

কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্মের এই পাঁচটি হেতু হলেও এইরূপ অবস্থায় সকল কর্মে যে কেবল আত্মাকেই (জীবাত্মাকে) কর্তা বলে দেখে, তার দুর্মতি ও অপরিমার্জিত ভ্রান্তবুদ্ধিহেতু সে প্রকৃত আত্মাকে সম্যক দর্শন করে না।

সকল কর্মের পেছনে ঐ পাঁচটি কারণই বর্তমান। কিন্তু যদি অজ্ঞানতাবশত আমি ভাবি যে, আমার আত্মাই কর্তা এবং এই কারণগুলিকেই আত্মা বলে ভুল করে বলি যে, আমি এটা করছি, আমি ওটা করছি—এরূপ ভাবাই নির্বোধের কাজ। যারা এমন ভাবে তারা 'দুর্মতিঃ', বিকৃত মনের মানুষ। তাদের চিন্তা ভুল। 'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'—তাদের মন অমার্জিত। এরূপ অসংস্কৃত মনের অধিকারী হওয়ার দরুন তারা বুঝতেই পারে না যে, আত্মা কর্তা নন, তিনি দ্রষ্টা, ঐ পাঁচটি কারণই কর্মের হেতু। তাই ভগবান বলছেন, তুমি অহং ভাব, দেহাভিমানী ভাব ত্যাগ কর, আত্মবুদ্ধি হলে তখন উপলব্ধি হবে যে, আত্মা নিষ্ক্রিয়,

অকর্তা, দ্রষ্টা—তিনি কিছুই করেন না। এটা উপলব্ধি হলেই তোমার দুর্মতি ত্যাগ হয়ে সুমতি হবে।

অজ্ঞানী অবিবেকী মানুষ, নির্বিকার, অসঙ্গ, উদাসীন নিজের আত্মাকে কর্মের কর্তা বলে মনে করে। তার বুদ্ধি বিকৃত তাই সে সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলে মনে করে। অবিবেকীগণ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব না জানায় ঐরূপ মনে করে। রজ্জুতে সর্পভ্রম করে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ দর্শন করতে পারে না, সেইরূপ আত্মাকে কর্তা বলে বোধ হলে জীবের প্রকৃত আত্মদর্শন হয় না।

কিন্তু বিবেকবুদ্ধির বশীভূত আত্মদর্শী জ্ঞানী মানুষ তা মনে করেন না। বিবেকী জ্ঞানিগণ মনে করেন, মানুষ যে-কোনও কর্মই করুক না কেন, অধিষ্ঠান (দেহ), কর্তা (অহংকার), করণ (ইন্দ্রিয়), চেষ্টা ও দৈব (অদৃষ্ট)—এই পাঁচটিই তার কারণ। এগুলি ছাড়া কোনও কর্ম হতে পারে না। আবার কর্মের দ্বারাই এই পাঁচটি কারণ পরিপুষ্টি লাভ করে।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ।।১৭

যস্য (যাঁর) অহংকৃতঃ ভাবঃ ('আমি কর্তা' এইপ্রকার অহংভাব) ন (নাই) যস্য (যাঁর) বুদ্ধিঃ (ইষ্টানিষ্টবুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সমস্ত লোক) হত্বা অপি (হনন করেও) ন হন্তি (হনন করেন না) [এবং তার ফলেও] ন নিবধ্যতে (হত্যার ফলেও) আবদ্ধ হন না ।।১৭

যাঁর 'আমি কর্তা'—এরূপ অহংভাব নাই, যাঁর বুদ্ধি কর্মের ফলাফল-স্পৃহায় লিপ্ত হয় না, তিনি এই সমস্ত লোককে হত্যা করলেও হত্যাজনিত পাপভাগী হন না এবং ঐ কর্মের ফলেও আবদ্ধ হন না।

স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগী পাপপুণ্যের অতীত। যিনি আত্মদর্শী, জ্ঞানী, ত্রিগুণাতীত, জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মভূত—তিনি পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ অহংকার যাঁর মনে নেই, 'আমি কর্তা' এই অভিমান যাঁর নেই, তিনি যদি পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যাও করেন, তাহলেও তিনি কাউকে হত্যা করছেন না বা এই হত্যার জন্য তাঁকে কোনও কর্মবন্ধনে জড়াতে হচ্ছে না। আসলে তিনি আদৌ কারো ক্ষতি করতে পারেন না। তাঁরা যা করেন, তা ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে করেন, একটা দিব্য মহৎ উদ্দেশ্যে করেন।

যে সকামভাবে কাজ করে, তার কর্মটি বন্ধনের কারণ হয় কারণ তাতে কর্তৃত্বাভিমান থাকে। কিন্তু নিষ্কামভাবে যে কাজ করে, যার মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান নাই অর্থাৎ যে জেনেছে ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা; কিংবা নিজেকে যে বুঝেছে-নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী ও দ্রষ্টা—সে আপাতদৃষ্টিতে যত কাজই করুক না কেন, আসলে সে কোনও কিছুই করছে না। কাজ

তার ক্ষেত্রে 'অকর্ম' হয়ে গেছে। কাজ তাকে বাঁধতে পারছে না। ফলে তার কাজ করাটা কোনও দোষের নয়। দোষ হচ্ছে অহংবুদ্ধিতে। অহংবুদ্ধি যদি থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকলেও মনে মনে কাজ করে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

অতএব আমাদের শেষপর্যন্ত ভালমন্দের যে দ্বন্দ্ব, তার পারে যেতে হবে, কারণ চরম সত্য লাভ করলে আর ভালমন্দ থাকে না। ভালমন্দ এই দুয়ের অতীত সেই চরম সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—পায়ে কাঁটা ফুটলে একটি কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলে ফেলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হবে। প্রথম কাঁটাটি মন্দ এবং দ্বিতীয় কাঁটাটি ভাল। ভাল কাঁটা দিয়ে মন্দ কাঁটাটি তুলে ফেলে, দুটিকেই ত্যাগ করতে হয়। ভাল-মন্দের এই সম্পর্ক। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভাল মন্দ উভয়ের অতীত।

মুক্তপুরুষ ভগবৎ প্রেরণায় তাঁর করণীয় কর্ম করে যান, তিনি ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। তাঁর কৃত কর্ম প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই কর্ম মনে করে তিনি সমস্ত স্বার্থ বা ফলকামনা ত্যাগ করে কর্ম করেন। কাজেই মুক্তপুরুষ হয়ে এই যুদ্ধে লোককে বধ করলেও তাঁর কোনও পাপ হবে না এবং সেই কর্মফল দ্বারা তিনি সংসারে আবদ্ধ হবেন না। তিনি নিমিত্তমাত্র হয়ে কর্ম করছেন।

কর্ম হিংসাত্মক কি না তা নির্ভর করে কর্তার চিত্তের অবস্থার উপর। যদি কেউ ফলাকাঙ্ক্ষা করে নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নরহত্যা করে, তা সেটি হিংসাত্মক কর্ম বলে গণ্য হবে। সেই পাপকর্মের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু যিনি কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, যাঁর অহংকার নাশ হয়েছে, যিনি ভগবানের নিমিত্ত যন্ত্ররূপে কর্ম করছেন তিনি নিমিত্তমাত্র—তিনি কাউকে হত্যা করলেও তা হিংসাত্মক কর্ম বলে গণ্য হবে না, সেই কর্মে তাঁর সংসারবন্ধন হবে না। তিনি ঘাতক নন এবং হননকার্যের ফলভোগীও নন।

এইরূপ ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ, দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য, পরমাত্মায় আত্মবিলীন, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য। এইরূপ মানুষ জেনেছেন আত্মা সর্বদাই শুদ্ধ, সর্বসঙ্গশূন্য, কূটস্থ, দ্বৈতভাববর্জিত ও জন্মমরণাদিরহিত। সেই মানব কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে যান। তিনি সমস্ত কার্যকেই পঞ্চকারণের ফলস্বরূপ জেনে নিজেকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্রস্বরূপে উপলব্ধি করেন। তাঁর সামনে পাপ-পুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ বা সুখরূপ কোনও তরঙ্গই উত্থিত হয় না। তাঁকে পাপপুণ্যজনিত ইষ্ট-অনিষ্ট মিশ্রফল ভোগ করতে হয় না। এইরূপ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি নিজেকে অকর্তা জেনে যদি লোকসমূহকে বধও করেন, তথাপি বধের জন্য তাঁকে বন্ধন-দশাগ্রস্ত হতে হয় না। কেননা, সেই বধ বধই নয় এবং এই বধরূপ-কার্যে অনিষ্টফলরূপ সংস্কার বা অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না। শরীর নষ্ট হলেও আত্মদর্শীর নিকট আত্মার নিধন কখনই হয় না। আত্মা মরেন না, আত্মাকে কেউ মারতেও পারে না—'ন জায়তে

ম্রিয়তে বা'। অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হলেও আত্মার ধ্বংস হয় না।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।।১৮

জ্ঞানং (ইষ্টসাধনের জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য) পরিজ্ঞাতা (এরূপ জ্ঞানের জ্ঞাতা) (এই) ত্রিবিধা (তিনপ্রকার) কর্মচোদনা (কর্মপ্রবৃত্তির হেতু) (এবং) করণং (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি) কর্ম (কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া) (এবং) কর্তা (কর্তা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিনপ্রকার) কর্ম-সংগ্রহঃ (ক্রিয়ার আশ্রয়)।।১৮

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মপ্রবর্তক বা কর্মপ্রবৃত্তির হেতু বা প্রেরণা। করণ (ইন্দ্রিয়), কর্ম (ক্রিয়া), কর্তা—এই তিনটি কর্মসংগ্রহ বা কর্মের আশ্রয়, আত্মা কোনও কর্মের প্রবর্তক বা আশ্রয় নন—তিনি নির্বিকার।

জ্ঞানী কীভাবে কর্ম করেন? জ্ঞানী জানেন যে, তিনি আত্মা। আত্মা নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, দ্রষ্টা। আত্মা কিছু করেন না। এই যে জগৎ-সংসারে এত কর্মপ্রবাহ—মায়ার জন্য হচ্ছে। আত্মা কিছু করছেন না। জ্ঞানীর এই উপলব্ধি হয়—তিনি আত্মা, তিনি নিষ্ক্রিয়। তিনি কর্ম করলেও, তিনি কিছু করছেন না।

পূর্বশ্লোকে ভগবান বলছেন, 'হত্যা করেও হত্যা করেন না, এবং এই কর্মে আবদ্ধও হন না'—এই বাক্যের প্রতিপাদনের জন্য এখানে কর্মের প্রেরণা ও কর্মের আশ্রয়ের কথা বলছেন। 'চোদনা' শব্দের অর্থ বিধি ও উপদেশ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটি কর্মের প্রবর্তক, হেতু বা প্রেরণা। আর করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি কর্মসংগ্রহ অর্থাৎ কর্মের আশ্রয়।

জ্ঞান—মানুষের চিত্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও প্রমাণ দ্বারা বিষয়ের যে প্রকাশ বা অনুভূতি তাই জ্ঞান। কর্ম সম্পাদনের সময় কর্তার চিত্তে বিষয়ের প্রকাশ বা অনুভূতি যেরূপ হয় কর্মও সেইরূপ হয়ে থাকে। কর্তার জ্ঞানই তার কর্মের প্রবর্তক।

যা জানা যায়, যে সত্য জানতে হবে বা জ্ঞানের যা বিষয় অথবা জ্ঞান অর্জন করতে যে-কর্ম করতে হবে তাই—জ্ঞেয়, যিনি জানেন অথবা অনুভব করেন তিনি—জ্ঞাতা। এই তিনটিই সমস্ত কর্মের আরম্ভ করে থাকে। এই তিনটির অভাবে কার্য হতে পারে না। কোনও কোনও স্থলে অজ্ঞানেও কর্ম হয়ে থাকে কিন্তু এখানে অজ্ঞানপূর্বক কর্মের বিচার করা হচ্ছে না। এখানে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। এবং গুণভেদে এই জ্ঞানেরও ভেদ হয়ে থাকে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হলে এই তিনটি আলাদা থাকে না, মিলে এক হয়ে যায়।

এরপর ভগবান বলছেন, 'করণং কর্ম কর্তেতি'—কর্মের উপায় বা করণ, ক্রিয়া এবং কর্তা। এই তিনটিকে সম্মিলিতভাবে 'কর্মসংগ্রহঃ' অথবা কর্মের ভিত্তি বা আশ্রয় বলা হয়। এই তিনটিকে আশ্রয় করেই কোনও কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। করণ দুই

প্রকার—বাহ্য ও আন্তর। দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ। কর্ম বা ক্রিয়া যা কর্তার ইষ্টানিষ্টকারক। এবং যিনি সকল কারকের প্রয়োজক, তিনিই কর্তা। প্রত্যেক কর্মেই 'আমি করছি' এইরূপ অনুভূতিবিশিষ্ট কর্তা, ক্রিয়মাণ কর্ম এবং কর্মসম্পাদনের যন্ত্র ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আবশ্যক। এইজন্য এই তিনটি, কর্মের আশ্রয়।

কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, আত্মা কর্তা নয়, আত্মা অকর্তা। 'আমি করছি'—এই অহঙ্কারবিশিষ্ট জীবই কর্তা। অতএব গুণভেদে কর্তারও ভেদ হয়ে থাকে। যাঁর জ্ঞানলাভ হয়েছে, ব্রহ্মানুভূতি হয়েছে, যিনি শুদ্ধতা ও প্রেমের বিগ্রহ হয়ে গেছেন, তিনি কখনও অপরের ক্ষতি করতে পারেন না। তাঁর পরম ঐক্যের অনুভূতি হয়েছে। তিনি সকলের মধ্যে নিজেকেই দেখছেন।

আত্মা কেন অকর্তা—এই শ্লোকে তা দেখানো হয়েছে। কর্মের দুটি বিভাগ আছে—একটি কর্মের প্রেরণা অর্থাৎ যা থেকে কর্মের প্রবৃত্তি জন্মে, অপরটি কর্মের ক্রিয়া অংশ অর্থাৎ যার দ্বারা কর্মটি সম্পন্ন হয়। এই শ্লোকে দেখানো হয়েছে যে, এদের কোনও অংশেই আত্মা কিছু করছেন না, আত্মা নির্লিপ্ত, অসঙ্গ। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা—এদের মধ্যে কোনটাই —অসঙ্গ আত্মা নয়। আবার ক্রিয়ার সম্পাদন বা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন কর্তা, করণ এবং একটি কর্ম—যার কোনওটিই অসঙ্গ আত্মা নয়। সুতরাং আত্মা প্রকৃতপক্ষে অকর্তা।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯

গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম চ (এবং কর্ম) কর্তা চ (ও কর্তা) গুণভেদতঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণভেদে) ত্রিধা এব (তিনপ্রকার) প্রোচ্যতে (অভিহিত হয়) তানি অপি (ভেদসমেত) (সেই সকলও) যথাবৎ (যথার্থ রূপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ।।১৯

সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্ত্বাদি-গুণভেদে তিনপ্রকার কথিত হয়েছে। সেই সকল অর্থাৎ ত্রিগুণকৃত ভেদসমূহ এখানে বলা হচ্ছে, তা যথাযথরূপে শ্রবণ কর।

মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রে সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার স্বভাব তিন প্রকার হয়ে থাকে। যেহেতু জ্ঞানের অন্তর্গত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এবং ইন্দ্রিয়াদি করণও কর্তার আশ্রয়ভূত তাই আলাদা করে বলা হয়নি। জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা— এই তিনটি বিষয় গুণভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এদের প্রত্যেকটিই সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক—এই তিন প্রকার হতে পারে। যেমন জ্ঞান—সাত্ত্বিক জ্ঞান হতে পারে, রাজসিক জ্ঞান হতে পারে, আবার তামসিক জ্ঞানও হতে পারে। কর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়—কর্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই তিন ধরনের হতে পারে। কর্তাও তিন ধরনের হতে পারে।

সংখ্যাবাদীরা তিন গুণের ভিত্তিতেই এদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

আত্মা শাশ্বত পুরুষ, আত্মা দেহ ও মনের সংঘাতের পিছনে নিত্য বিরাজমান। শরীর ও আত্মা দুটি—আলাদা। এই দুয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-আদির গুণকর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়। গুণের তারতম্য অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ভেদ করা হয়েছে যথা—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন শ্রেণির উপর নির্ভর করে। অতএব বিষয়-জ্ঞান, বিষয়-কর্ম ও ভোগ এবং কর্তা এরা সবাই গুণের অধিকারে, এরা কেউ নির্গুণ নয়। অতএব অসঙ্গ নির্লিপ্ত আত্মার সঙ্গে বিষয়-জ্ঞান, বিষয়-কর্ম ও কর্তার যোগ সম্ভব নেই। আত্মা নিত্য কিন্তু জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা—গুণভেদে পরিবর্তিত হয়।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ।।২০

যেন (যে জ্ঞান দ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিত) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তম্ (অভিন্নভাবে স্থিত) একম্ অব্যয়ম্ (এক অব্যয়) ভাবম্ (ভাব, সত্তা, নিত্যবস্তু) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) তৎ (সেই) জ্ঞানং (অদ্বৈতজ্ঞান) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) বিদ্ধি (জানবে)।।২০

যে জ্ঞানদ্বারা পরস্পর বিভক্তভাবে প্রতীয়মান সর্বভূতে এক অখণ্ড অব্যয় বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, সেই অদ্বৈত-আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে ।।২০

ভগবান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই—তিন গুণের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করছেন। জগতে যে বিভিন্ন বহুবিভক্ত বস্তু বা জীব দেখা যায় তাদের মধ্যে ঐক্য বা সমন্বয়ের জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। বহুর মধ্যে ঐক্য দর্শনই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সাত্ত্বিক জ্ঞানী দেখতে পান যে, জগতের সকল বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের নিকট বহুরূপে প্রতীয়মান হলেও বস্তুত তাদের অন্তরস্থ সত্তা অব্যয়, এক। জগতে সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করে রয়েছে। যে জ্ঞান লাভ হলে মানুষ জীবজগতের মধ্যে সমজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত (নিজের শরীরের) ভেদদৃষ্টি দূর করে, সর্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা দর্শন করতে পারে, সর্ববস্তুর অধিষ্ঠানরূপ অখণ্ড অব্যয় পরমাত্মাকে সর্বত্র বিরাজমান বলে দর্শন করে থাকে সেইরূপ আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে জানবে।

সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হলে দ্বৈতদৃষ্টির নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং অনুভব হয় জগতের সবকিছুই পরমাত্মার শক্তিদ্বারা বিকশিত, একই চেতন সত্তা দ্বারা প্রকাশিত। একই চৈতন্য সমভাবে সকল ভূতে বিদ্যমান আছেন। সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ ঐক্য ও সমভাব অর্থাৎ এক ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ দ্বারাই বিচিত্র জগৎ। প্রকৃতির বিচিত্র কর্মও এক পরমেশ্বর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জীবগণ তাদের বিভিন্ন কর্মদ্বারা এক ভগবৎ ইচ্ছার অনুসরণ করছে। একমাত্র সাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সমস্ত জাগতিক কর্মের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সামঞ্জস্য অনুভব করেন। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, ভেদের মধ্যে অভেদ, বহুর মধ্যে একত্ব, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, অসমঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিচ্ছিন্নের মধ্যে

সংহতি এবং সমস্ত পরিবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে এক অব্যয় আত্মাকে দর্শন করেন।

সহজভাবে বলা যায়, জগতের বৈচিত্রময় সকলের ও সবকিছুর মধ্যে এক অখণ্ড সত্তাকে যিনি স্পন্দিত হতে দেখেন, তাঁর জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। নাম ও রূপ বিচিত্র, আপাতদৃষ্টিতে আমরা আলাদা কিন্তু আমাদের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করছেন। মানুষ ধীরে ধীরে কীভাবে বিষয়-বৈচিত্র-জ্ঞান থেকে অভেদ-পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করবে সেই কথাই এখানে ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে তামসিক, তারপর রাজসিক এবং সবশেষে সর্বোচ্চ সাত্ত্বিক জ্ঞানের দিকেই মানুষ এগিয়ে চলে। সত্ত্বজ্ঞান হলেই মানুষ উপলব্ধি করে নাম-রূপ বৈচিত্রের পিছনে এক সত্যই বিরাজ করছে। এই একত্বের জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের অনুভূতি লাভ হলেই মানুষের মধ্যে ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতি প্রভৃতি সব মহৎ ভাবনা আপনাআপনিই এসে পড়বে।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ।।২১

তু (কিন্তু) যৎ (যে) জ্ঞানং (যে জ্ঞানের দ্বারা) পৃথক্ত্বেন (পৃথক-পৃথক-রূপে) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (শরীরে স্থিত) পৃথক্-বিধান্ (সুখ-দুঃখাদিরূপে) (পরস্পর-বিলক্ষণ) নানাভাবান্ (নানা ভাব) বেত্তি (উপলব্ধি করে) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানবে)।।২১

যে জ্ঞানের দ্বারা জগতে সকল বস্তুকে পৃথক পৃথক (আত্মা) বলে অনুভব হয়, অর্থাৎ সর্বভূতে সুখদুঃখাদিরূপে পৃথকরূপে নানাভাবে উপলব্ধি হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলে জানবে।।২১

রাজসিক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞানের অনেকটা বিপরীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানে বহুর মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি হয় কিন্তু রাজসিক জ্ঞানে বৈষম্যের ভাব উপলব্ধি হয়। রাজসিক জ্ঞানে ভূতগণকে পৃথক পৃথক সত্তা বলে ধারণা হয়। কিন্তু সকল ভূতের এক সত্তাই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ, একই আত্মা সমভাবে সকল ভূতে বিরাজমান—রাজসিকজ্ঞান তা ধারণ করতে পারে না।

রাজস জ্ঞানে বিচার দ্বারা প্রাণীদের ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র আত্মার অনুভব হয় কারণ জগতে ভূতগণের মধ্যে কাউকে সুখী, কাউকে দুঃখী, কাউকে পণ্ডিত, কাউকে মূর্খ ইত্যাদি ভিন্ন রূপে উপলব্ধি হয়। সর্বত্র এক আত্মা হলে সকলেই সুখী, বা সকলেই দুঃখী হত। কাজেই রাজসিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে কোন প্রকার সাম্য দেখতে পায় না, জগতের বৈষম্যই তার দৃষ্টিতে প্রবল হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যেও সে কোনও মিলনের সূত্র খুঁজে পায় না কারণ মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভেদগুলিই সে বড় করে দেখে। ফলে সে কর্মের মধ্যে কোনও একটি নির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শের অনুসরণ করে না। চিত্তে যখন যে-বাসনার উদ্ভব হয় সেই অনুসারে কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

বৈষম্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও বাসনার দ্বারা চালিত হওয়ায় রাজসিক জ্ঞানে অহংভাবের প্রকাশ পায়। রাজসিক ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা অপর হতে পৃথকভাবে দেখে, ফলে সে সর্বদা নিজের স্বার্থসাধনে, অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে ও অপরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না। জগতের সকল ভূতগণকে অর্থাৎ জীব বা প্রাণীকে পৃথক পৃথক সত্তা বলে মনে করে। এই ভেদজ্ঞানের ফলে সে কারও প্রতি প্রবল অনুরক্ত হয় এবং কারও প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়। এই রাজসিক জ্ঞান সমাজের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর। সাত্ত্বিক জ্ঞানই সমাজে মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর।

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।।২২

যৎ তু (কিন্তু যে জ্ঞান) একস্মিন্ (কোনও একটি) কার্যে (বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণরূপে) সক্তং (অভিনিবিষ্ট বা আসক্ত হয়) অহৈতুকম্ (যুক্তিবিরুদ্ধ) অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ অর্থাৎ তত্ত্বহীন বা প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিরোধী) অল্পং চ (এবং ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ) তৎ (তা অর্থাৎ সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামস) উদাহৃতম্ (উক্ত হয়)।।২২

যে জ্ঞান দ্বারা কোনও এক বিষয়ে বা বস্তুতে অর্থাৎ দেহকেই পূর্ণরূপে আত্মা ভেবে তাতেই আসক্ত বা আকৃষ্ট হয়, সেই যুক্তিবিরুদ্ধ, তত্ত্বহীন, অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলা হয়।

তামসিক জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তি যে-কোনও একটি বস্তু, দেহ বা কার্যকেই সমগ্র মনে করে তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া উচ্চ অথবা এর অতিরিক্ত আর যে কিছু আছে তা সে ধারণাই করতে পারে না। সুতরাং এই জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু তামসিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণ তাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকেই সম্পূর্ণ, অযথার্থ জ্ঞানকেই যথার্থ মনে করে এবং তাতেই অন্ধভাবে অনুরক্ত হয়। কেউ তাদের সঙ্কীর্ণতা বা ভুল বুঝিয়ে দিলেও তারা বুঝতে পারে না।

এই প্রকারের জ্ঞান যুক্তিহীন, বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। আত্মার স্বরূপ অখণ্ড ও সর্বব্যাপী। কিন্তু তামসিক জ্ঞাতা মনে করে, আত্মা কোনও একটি দেহে বা কোনও একটি মূর্তিতে অথবা কোনও একটি কার্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট দেহ, বিগ্রহ বা কার্য ব্যতীত আত্মা আর কোথাও নাই। সাময়িক বা আংশিক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই এই জ্ঞানের প্রধান অবলম্বন। এই জ্ঞানের কোনও যথার্থ ভিত্তি নাই। এটি কেবল বস্তুর বা কার্যের বাহ্যিক নাম-রূপের জ্ঞান। নাম-রূপের পেছনে যে অবিনশ্বর স্থায়ী সত্তা বিদ্যমান সেই জ্ঞান তারা লাভ করতে পারে না। তামস জ্ঞান অতি তুচ্ছ, সামান্য। এই জ্ঞান দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ হয় না অথবা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কোনও পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। এই জ্ঞানের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন মানুষ দেহকেই আত্মা মনে করে, প্রতিমাকে ঈশ্বর মনে

করে কিংবা জগতের সৃষ্ট পদার্থকে অজ, অবিনশ্বর ভেবে তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তামসিক জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা নিদ্রা, আলস্য, ঈর্ষা, অপরের ক্ষতি করা প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারেই ডুবে থাকে। ইন্দ্রিয়ের আনন্দেই তাদের তৃপ্তি। কোনও উচ্চ ভাব বা আদর্শ লাভের চেষ্টা তারা করে না।

এই তামসিক জ্ঞান সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাই তুচ্ছ বা অল্প। জগতে সকল বস্তুর মধ্যে এক সত্য প্রতিষ্ঠিত—তাঁকেই আমরা ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মা বলি। এই জগতের ব্যাবহারিক সত্য আছে কিন্তু সব সত্যের ঊর্ধ্বে সেই পরম সত্য ঈশ্বর। পরম সত্যকেই, সত্যের সত্য বলা হয়। পরম সত্য এক এবং অখণ্ড হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত। ব্রহ্ম সেই অখণ্ড পরম সত্য, যা জগতের যাবতীয় সত্যের পিছনে বর্তমান। তাই জগৎও সত্য। বিশ্বের সমস্ত জড় ও চেতনের পিছনে ক্রিয়াশীল সত্যই আত্মা। স্বামীজী বলছেন—হিন্দু-ধর্মমতে মানুষ মিথ্যা থেকে সত্য অভিমুখে অগ্রসর হয় না, তার যাত্রা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে। জাগতিক সত্য হচ্ছে নিম্নতর সত্য। মানুষ তাই নিম্নতর সত্যে তৃপ্ত না হয়ে চরম সত্য ঈশ্বরকে জানতে চায় ও উপলব্ধি করতে চায়। তাই যারা স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অর্থাৎ যাদের কোনও মানসিক উন্নতি হয়নি, তারা জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা ভাবতে পারে না। তারা মনে করে, সবই পৃথক। তারা মনে করে, তারা যা ভাবছে ও করছে সবই ঠিক করছে। তাদের মনোভাব, তাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তামসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা যুক্তিহীন দাবি করে—'আমার ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, আমার ধর্মই শেষ কথা।' এর থেকে ঊর্ধ্বে রাজসিক বোধ। কিন্তু সূক্ষ্মতম বোধ হলো সাত্ত্বিক চেতনা। ঋগ্বেদে ঋষিরা এই কথা দাবি করছেন—'একং সদ্, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, ঋষিরা তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। পরম সত্য এক, নানা রকম হতে পারে না। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত ভারতের সকল মহান আচার্যবৃন্দই সাত্ত্বিক জ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষার চরম অভিব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ এবং যত মত, তত পথ। প্রত্যেক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। এবং ঈশ্বর লাভের এক-একটি পথ। একমাত্র সমন্বয়ের দ্বারা এই পথে চলতে হবে। সমন্বয়-ই সত্য, ঐক্যই সত্য। সমাজকে ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ, সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য সাত্ত্বিক জ্ঞান অপরিহার্য।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ।।২৩

যৎ (যে) কর্ম (কর্ম) নিয়তং (নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত) অফল-প্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী ব্যক্তিকর্তৃক) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্তভাবে) অরাগ-দ্বেষতঃ (অনুরাগ ও বিদ্বেষবর্জিত হয়ে) কৃতম্ (করা হয়) তৎ (সেই কর্ম) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক বলে) উচ্যতে (বলা হয়) ।।২৩

যে কর্ম নিত্য অবশ্যকর্তব্যরূপে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি দ্বারা অনাসক্তভাবে রাগদ্বেষ-শূন্য ও বিদ্বেষ বর্জিত হয়ে অনুষ্ঠান করা হয় সেইসকল কর্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয়।

জ্ঞানের ভেদ ব্যাখ্যা করার পর ভগবান গুণকর্মের ভেদ ব্যাখ্যা করছেন। গুণভেদে কর্ম তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এখানে সাত্ত্বিক কর্মের ব্যাখ্যা করছেন। সাত্ত্বিক কর্মমাত্রই নিয়ত কর্ম। সমস্ত কর্তব্যকর্মকেই নিয়ত-কর্ম বলা হয়ে থাকে। দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রাদি অঙ্গযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সান্ধ্য-উপাসনাদি যে-সকল কর্ম, অভিমান ও গর্ব বর্জন করে, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বা রাগ-দ্বেষাদি সম্পর্কশূন্য হয়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাই সাত্ত্বিক কর্ম।

সাত্ত্বিক কর্মে কর্মীর মনে কোনও আসক্তি থাকে না। তিনি নিজেকে কর্মের কর্তা বলে মনে করেন না। কর্মের সাফল্যে গর্ব অনুভব করেন না এবং রাগদ্বেষবর্জিত হয়ে সমত্ববুদ্ধিতে, কর্মসম্পাদন করে থাকে। এই কর্মে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুধু কর্তব্যবুদ্ধিতে বিহিত নিত্যকর্মের সম্পাদন করা হয়। অতএব সাত্ত্বিক কর্মী কর্মফলের আসক্তি, স্বার্থ, দ্বেষ ত্যাগ করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করেন এবং ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ।।২৪

তু (কিন্তু) পুনঃ (পুনরায় অর্থাৎ ঠিক সেইভাবে) কাম-ঈপ্সুনা (ফলকামী ব্যক্তিকর্তৃক) স-অহংকারেণ বা (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি দ্বারা) বহুল-আয়াসং (বহু কষ্টসাধ্য) যৎ (যে) কর্ম (যাগযজ্ঞাদি কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তা) রাজসম্ (রাজসিক) উদাহৃতম্ (বলে) (কথিত হয়) ।।২৪

আবার ফলকামনা করে অথবা অহংকার-সহকারে বহু কষ্টস্বীকার করে যে কর্ম (যাগযজ্ঞাদি) অনুষ্ঠিত হয়, তা রাজস কর্ম বলে কথিত হয়।

স্বর্গ, পুণ্য ও নানা ঐহিক ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা যার হৃদয়ের লক্ষ্য, সেইব্যক্তি কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করে। নিত্যকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান না করলে মানুষকে প্রত্যবায়ভাগী হতে হয়, কিন্তু কাম্য কর্মফল সংসারে ভোগ ও বন্ধনের হেতু, তাই কাম্যকর্মের সাধন করবার সময় যদি কোনও একটি অঙ্গের হানি হয়, তা হলেই অনুষ্ঠাতা ঐ কর্মের ফল থেকে বঞ্চিত হয়। তাই কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করতে হলে সকাম-কর্মীকে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। এইরূপ কাম্যকর্ম রাজস কর্ম এবং এর মূল লক্ষণ অভিমান ও কামনা।

রাজস কর্মের কর্তার দৃষ্টি কর্মের এবং কর্মফলের উপরেই নিবদ্ধ থাকে। কামনার পরিতৃপ্তি সাধনই এইপ্রকার কর্মের প্রধান লক্ষ্য। রাজস কর্মের কর্তার মনে অহঙ্কার, কর্তৃত্বাভিমান প্রবল থাকে। 'আমি কর্তা', 'আমিই কর্ম করছি', 'আমি কর্মের ফলভোগ করব'—এই সকল ভাব দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রাজসিক কর্তা কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

রাজস কর্ম অতি আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী কোনও প্রকার পরিশ্রম বা শারীরিক ক্লেশেই কাতর হয় না। কোনও বাধাবিঘ্নও তাকে দমন করতে পারে না। নিজের উচ্চাভিলাষ পূরণের নিমিত্ত বা অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য দম্ভসহকারে সে অতি ক্লেশকর কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে। এই দৃশ্য আমরা সমাজে সর্বত্র দেখতে পাই। নিজ স্বার্থে কিছু পাওয়ার জন্য যখন কেউ কাজ করে তখন প্রচণ্ড চেষ্টা করে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। কামনা ও কর্মের চেষ্টা কখনও কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এত প্রবল কামনা বা এত কষ্টের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তবুও আমরা বেশ অহঙ্কারের সঙ্গে বাসনাতাড়িত হয়ে কাজ করি।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ।।২৫

যৎ (যে) কর্ম (যাগযজ্ঞাদি কর্ম) অনুবন্ধং (ভাবী শুভাশুভ ফল) ক্ষয়ং (ধনাদি-ক্ষয়) হিংসাং (প্রাণিহিংসা) পৌরুষম্ চ (ও স্বীয় সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিচার না করে) মোহাৎ (মোহবশতঃ) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়), তৎ (সেই কর্ম) তামসং (তামস) উচ্যতে (উক্ত হয়) ।।২৫

কর্মের পরিণাম, শুভ ও অশুভ ফল, ধনক্ষয়, হিংসা ও কর্ম সম্পন্ন করবার সামর্থ্য আছে কি না ইত্যাদি বিচার না করে, অবিবেকবশত যে-কার্যের (যাগযজ্ঞাদি) আরম্ভ করা হয়, সেই কর্মকে তামস কর্ম বলা হয়।

তামসিক কর্ম সাত্ত্বিক ও রাজসিক কর্মের বিপরীত। তামস কর্মী নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে পারে না, বা ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। বিষয়বাসনার তাড়নায় তার কর্মে প্রবৃত্তি। কর্মের ভাবী ফল শুভ বা অশুভ, কর্ম করবার সামর্থ্য তার নিজের আছে কি না, কর্ম সম্পন্ন করতে কী প্রকার শক্তিক্ষয় বা অর্থক্ষয় হবে, প্রাণি হিংসা হবে কি না, কর্মের কৌশল সৎ না অসৎ—ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিচার না করে হঠকারী হয়ে যে-কর্মের সূচনা হয় তাকে তামস কর্ম বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুর তাড়নায় বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে, মোহাচ্ছন্ন হয়ে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় উত্তেজিত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে অবশভাবে এই তামস কর্মের অনুষ্ঠান হয়।

এই কর্মের (যাগযজ্ঞাদি) সাধনকালে ভবিষ্যতে কী কী হানি হবে, শরীরের কত ক্লেশ, কত মানুষের কষ্ট-দুঃখ উৎপাদন হবে, সমাজের কত ক্ষতি হবে ইত্যাদি বিচার না করে তামস কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়। কুরুক্ষেত্রের মহারণে দুর্যোধন নিজ সামর্থ্যের কথা চিন্তা না করে, কেবল কিছু আত্মীয় অর্থাৎ পাণ্ডবদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে এই তামস কর্ম—যুদ্ধ শুরু করে।

তাই আমাদের সকলের উচিত কর্ম করবার পূর্বে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা

ভেবে দেখতে হবে। তা না করে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে মোহবশে তামসিক কর্মের শুরু করা উচিত নয়। সেই কর্ম নিজের ও অপরের ধ্বংস ডেকে আনবে।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ।।২৬

মুক্তসঙ্গঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, আসক্তিহীন) ন-অহংবাদী (কর্তৃত্বাভিমান বা অহমিকা-শূন্য) ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ (ধৈর্য ও উৎসাহশীল) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে, সাফল্য ও বিফলতায়) নির্বিকারঃ (বিকারশূন্য, নির্বিকার চিত্ত) কর্তা (কর্তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) উচ্যতে (কথিত হয়) ।।২৬

ফলে আসক্তিশূন্য, নিরহঙ্কার, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, সাফল্য ও বিফলতায় নির্বিকার-চিত্ত কর্তাকেই সাত্ত্বিক কর্তা বলা হয়। সাত্ত্বিক কর্মের-কর্তাই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগী।

ভগবান এবার তিন প্রকার কর্ম-কর্তার ব্যাখ্যা করছেন। যিনি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা-ত্যাগী, মোহ-অভিনিবেশ ত্যাগী, অনহংবাদী বা গর্বরহিত—যাঁর 'আমি কর্তা' বা 'আমি ভোক্তা'—এরূপ অভিমান নাই, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য, উৎসাহী বা উদ্যমী—যিনি গুণ থাকলেও গুণের অহংকার করেন না, কর্মে বিঘ্ন থাকলেও উদ্বিগ্ন হন না, কর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন করব—এইরূপ যাঁর দৃঢ়নিশ্চয় বুদ্ধি, কর্মের ফলে সাফল্য আসুক বা অসাফল্য আসুক তাতে তিনি হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হন না, তিনি কেবল শাস্ত্রমতে কর্তব্যবোধে কর্মসাধন করে যান, শাস্ত্রে সেইরূপ কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়ে থাকে।

অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্তার, কর্মের প্রতি বা কর্মফলের প্রতি কোনও প্রকার আসক্তি থাকে না। 'আমি কর্তা'—এরূপ অহংকার তাঁর চিত্তে স্থান পায় না। তিনি মনে করেন ভগবানই তাঁকে দিয়ে কর্ম করাচ্ছেন। ভগবান যন্ত্রী আর তিনি যন্ত্র—এরূপ মনে করেন। ফল যাই হোক, সৎ ও কল্যাণকর কর্মগুলিকে কর্তব্যকর্ম মনে করে নির্বিকারচিত্তে সম্পাদন করেন। 'আমার এটাই কর্তব্য'—এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়েই তিনি উদ্যমের সঙ্গে কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং কোনও বিঘ্ন বা প্রতিকূল অবস্থায় কাতর না হয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে যান। কর্মের সাফল্যে বা ব্যর্থতায় তিনি নির্বিকার। সিদ্ধিতেও হর্ষ নাই, আবার অসিদ্ধিতেও দুঃখ নাই। এইপ্রকার কর্তাই সাত্ত্বিক কর্তা।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ।।২৭

রাগী (বিষয়ানুরাগী) কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলকামী) লুব্ধঃ (পরধনে লোভী) হিংসাত্মকঃ (পরপীড়ক) অশুচিঃ (শৌচ ও আচারবিহীন) হর্ষ শোক-অন্বিতঃ (হর্ষশোকযুক্ত—অর্থাৎ ইষ্টলাভে আনন্দ ও অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দুঃখযুক্ত) কর্তা (কর্তা অর্থাৎ যে কার্য করে) রাজসঃ (রাজসিক) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়)।।২৭

বিষয়ে আসক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, শৌচাচারবিহীন, সিদ্ধিতে আনন্দিত ও অসিদ্ধিতে শোকান্বিত —এরূপ কর্তা রাজস কর্মকর্তা বলে শাস্ত্রে কথিত হয়।

নিজের ও পরিবারের স্নেহে মোহাচ্ছন্ন, নানা বিষয়ভোগে লালায়িত, পরধন-হরণে যার প্রবৃত্তি, কৃপণ, নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না, শৌচ-আচার-বর্জিত, যে-কোনও কৌশলে কার্যসিদ্ধ হলেই সুখী এবং না হলে দুঃখী—সেই ব্যক্তি বা কর্মকর্তাই রাজস।

রাগী—রাজস কর্তা সর্বদা কামনাবাসনা দ্বারা আকুলচিত্ত এবং ধন, মান, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত—এই আসক্তিই রাজস কর্মীর প্রধান লক্ষণ।

কর্মফলপ্রেপ্সুঃ—যে সর্বদা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করে। আসক্ত হয়ে সকাম স্বার্থযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হয়। যে কর্মে কোনও লাভ বা পুরস্কারের আশা নেই, কোনও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্ম—সেইরূপ কর্মে রাজস কর্মী নিযুক্ত হয় না।

লুব্ধঃ—রাজস কর্তা সর্বদা অপরকে শোষণ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা নিজের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করে, আবার নিজের ধনসম্পত্তি দান করতে পারে না—এইপ্রকারের কর্তা অত্যন্ত স্বার্থপর ও কৃপণ হয়।

হিংসাত্মকঃ—এই শ্রেণির কর্মকর্তা নিজের স্বার্থলাভের জন্য অপরকে কষ্ট দিতে কিংবা ক্ষতি করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয় না। পরপীড়নই তার যেন স্বভাব এবং নানা অসৎ অভিসন্ধি কৌশল তার কর্মের সহায়।

অশুচিঃ—রাজস কর্তার বাহ্যিক ও অন্তর দুদিকই মলিন থাকে। বাহ্যিক শৌচ যেমন থাকে না, তেমনি চিত্ত কামনা দ্বারা সর্বদা অপবিত্র থাকে।

হর্ষশোকান্বিতঃ—নিজের ইচ্ছানুসারে কর্মের ফল লাভ হলে এরূপ কর্তা অত্যন্ত সুখী হয় এবং ফললাভ না হলে নিতান্ত দুঃখবোধ করে। যেসকল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি সে আসক্ত সেগুলোর প্রাপ্তিতে সে আনন্দিত এবং সেগুলোর বিয়োগে সে নিতান্ত দুঃখী, কাতর বা ক্রোধী হয়।

এমন যেসকল কর্তা, তাঁদের রাজসিক কর্তা বলা হয়। তাঁদের অশুদ্ধ মনের ভাবটিই দৈনন্দিন কাজকর্মে ফুটে ওঠে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।। ২৮

অযুক্তঃ (অস্থিরমতি) প্রাকৃতঃ (অসংস্কৃতবুদ্ধি, অবিবেকী) স্তব্ধঃ (গর্বস্ফীত, অনম্র) শঠঃ (বঞ্চক, শঠ) নৈষ্কৃতিকঃ (পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, অপমানকারী) অলসঃ (কর্তব্যকর্মে উদ্যমহীন, অলস) বিষাদী (অবসাদগ্রস্ত) দীর্ঘসূত্রী চ (ও মন্থরস্বভাব বা অলস প্রকৃতি) কর্তা (কর্মকারী) তামসঃ (তামস) উচ্যতে (বলে অভিহিত হয়) ।।২৮

যে অস্থিরমতি, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী, অলস, অবসাদগ্রস্ত ও দীর্ঘসূত্রী, তাকে তামসকর্তা বলা হয়।

যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্ত, কর্তব্যকর্মে অসতর্ক, শাস্ত্রসংস্কার বর্জিত, গুরু-দেবতার সম্মুখে নম্রভাব ধারণে অক্ষম, নিজ মনের ভাব গোপন করে অন্যকে প্রবঞ্চিত করা, স্বার্থলাভের জন্য অন্যের জীবিকা বা বৃত্তি ছিনিয়ে নেওয়া, কর্তব্যকর্মে অলসতা, সর্বদা চিত্তচাঞ্চল্য, সামান্য কর্ম সম্পাদনে ভ্রান্ত চিন্তার দ্বারা চালিত হয়ে সময়ের অপচয়কারী—এরূপ ব্যক্তিকে তামস কর্তা বলা হয়।

অতএব তামস কর্তার লক্ষণগুলি হলো—অযুক্তঃ—বিষয়ে আসক্তিবশত বুদ্ধি ভ্রমাত্মক ও প্রমাদশীল।

প্রাকৃতঃ—গুরু বা শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা বুদ্ধির সংস্কার না হওয়ায় জড়বুদ্ধি এবং সর্বদা হীনকর্ম ও হীনচিন্তায় নিরত।

স্তব্ধঃ—গুরু ও দেবতাদিতে শ্রদ্ধাহীন, অনম্র, গোঁড়ামিযুক্ত ও মতুয়ার বুদ্ধিবিশিষ্ট।

শঠঃ—দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত, লোককে ফাঁকি দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা, মনের ভাব গোপন করে মিথ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।

নৈষ্কৃতিকঃ—নিজের স্বার্থের জন্য অপরের বৃত্তিনাশ বা অপরকে অপমান করতে সর্বদা উৎসুক ও লোকের অনিষ্টসাধনে সর্বদা তৎপর।

অলসঃ—কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্তিহীন, কর্ম না করে আলস্যে দিন কাটানোয় নিপুণ।

বিষাদী—সর্বদা অবসন্নস্বভাব, অসন্তুষ্ট ও অনুতপ্ত থাকা। চিত্ত স্ফূর্তিশূন্য, কোন আনন্দ নেই—নিরানন্দ, প্রতিটি বিষয়ে মন্দ দিক থেকে দেখা—মন্দবুদ্ধি ও নৈরাশ্যবাদী—সংসারে সমস্তই দুঃখের কারণ—এই বিষাদ ভাবনায় ডুবে থাকা।

দীর্ঘসূত্রী—অযথা কর্মে বিলম্বকারী, দৈহিক ও মানসিক জড়স্বভাব, অবশ্য-কর্তব্যকর্মে 'আজ নয় কাল করব' 'কাল নয় পরশু' বলে কাজ ফেলে রাখার স্বভাব।

স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে বলছেন—মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাস্তবিক চারপাশের জীবনের দিকে তাকালে এমন মানুষের সাক্ষাৎ অতি সহজে পাওয়া যায়। সর্বদা বিদ্বেষভাবাপন্ন, অন্যের নিন্দা করা, ভাল কাজেও দোষ দেখা ও বিকৃত ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি বা উন্নতিকে আটকে দেওয়া বর্তমান মানুষের প্রবণতা।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ।।২৯

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ (এবং ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারেই) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) ভেদং (বিভাগ) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্-রূপে) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যা বলা হচ্ছে) শৃণু (শ্রবণ কর) ।।২৯

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি এবং ধৃতিরও গুণানুসারে যে তিনপ্রকার ভেদ হয়, তা পৃথকভাবে সুস্পষ্টরূপে তোমায় বলছি, তা শ্রবণ কর।

ভগবান এখানে বলছেন, বুদ্ধি এবং ধৃতি-কেও তিনভাগে ভাগ করা যায় তিন গুণভেদে। যে বৃত্তির প্রভাবে বস্তু ও বিষয় নিশ্চয়রূপে নির্ধারিত হয় তাকে বুদ্ধি বলা হয়। ধৃতিও বুদ্ধিরই বিশেষ বৃত্তি মহৎ ইচ্ছাশক্তি। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি এবং ধৃতি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি। বিবেকযুক্ত নিশ্চয়-জ্ঞানই প্রকৃত বুদ্ধি এবং যে শক্তিপ্রভাবে কর্মে দৃঢ়রূপে নিবিষ্ট থাকা যায় তার নাম ধৃতি। তাই বিবেকযুক্ত জ্ঞান ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানুষের মহৎ চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। যে বিবেক-জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সমাজে সকলের কল্যাণ ও মঙ্গল হয় তাই একান্ত প্রয়োজন। ভগবান পরিষ্কার করে বলছেন, মানুষের মধ্যে তিন গুণভেদে কী রকম বিবেকজ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ঘটে—পৃথক পৃথক ভাবে তা জানা চাই।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ।।৩০

পার্থ (হে অর্জুন) প্রবৃত্তিং চ (কর্মে প্রবৃত্তি অথবা প্রবৃত্তিমার্গ) নিবৃত্তিং চ (কর্মে নিবৃত্তি অথবা নিবৃত্তিমার্গ) কার্য-অকার্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে) ভয়-অভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মুক্তি) যা (যে বুদ্ধি) বেত্তি (জানে) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বপ্রধান) ।।৩০

হে পার্থ, যে বুদ্ধিদ্বারা কি প্রবৃত্তি, কি নিবৃত্তি, কি কার্য আর কি অকার্য, কিসে ভয় বা কিসে অভয়, কোনটি বন্ধন এবং কোনটি মোক্ষদায়ী—জানতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।

আমাদের অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ যার দ্বারা আমরা নিশ্চিতভাবে কর্তব্য স্থির করতে পারি—সেই অংশের নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দুই প্রকার—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি, তা মনকে ঊর্ধ্বগামী করে। মানুষের চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করে, বৈচিত্রের মধ্যে এক দর্শন করতে সাহায্য করে। অপর বুদ্ধি—অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ মানুষের মনকে নিম্নগামী করে, বিচিত্র নাম-রূপ বিষয়ের দিকে অর্থাৎ সংসারে আসক্ত করে।

আমাদের জীবনে দুটি রাস্তা বা মার্গ—প্রবৃত্তিমার্গ বা কর্মকাণ্ড এবং নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাসধর্ম। প্রবৃত্তিমার্গে মানুষ সংসারের সকাম ও নিত্য কর্তব্যকর্ম করে এবং নিবৃত্তিমার্গে মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করে। প্রবৃত্তিমার্গে সংসারে মৃত্যুর ভয় এবং নিবৃত্তিমার্গে ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অভয় লাভ। প্রবৃত্তিমার্গে ও সকাম কর্মে অজ্ঞানে কর্তৃত্বাভিমানরূপ বন্ধন এবং নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-নাশে মুক্তি। যে বুদ্ধি দ্বারা পরিষ্কার ও নিশ্চিতরূপে এইসকল বিষয় উপলব্ধি করা যায় তাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নির্মল। সাত্ত্বিকী-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্মজীবনে যথার্থ নিত্য-অনিত্য বিচার করতে সমর্থ। জীবনকে সে বিচার দ্বারা সঠিক পথে চালনা করে। কোন কর্ম সৎ ও করণীয় এবং কোন কর্ম অসৎ ও অকরণীয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি তাই নির্ধারণ করে। কোন কর্মে ভয় এবং কোন কর্মে অভয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি নিঃসংশয়রূপে স্থির করতে পারে। সংসারে সকাম কর্মে ডুবে যাওয়াই ভয় এবং ঈশ্বরলাভ বা মোক্ষলাভেই অভয়। জীবনের বন্ধনই বা কি এবং মুক্তিই বা কি, সাত্ত্বিকী বুদ্ধির দ্বারা সেটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রকৃতির অর্থাৎ তিন গুণের অধীন হওয়াই বন্ধন এবং তিন গুণের পারে ত্রিগুণাত্মিকা হওয়াই মুক্তি। কীভাবে প্রকৃতির তিন গুণের অধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় তা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যথার্থরূপে নির্ণয় করতে সমর্থ।

অতএব রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধির গুণের সঙ্গে তুলনা করে, সাত্ত্বিকী বুদ্ধির উর্ধ্বগামী মাধুর্য উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ।।৩১

পার্থ (হে অর্জুন), যয়া (যে বুদ্ধিদ্বারা) ধর্মং হি (শাস্ত্রবিহিত কর্ম) অধর্মম্ চ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম) কার্যং (কর্তব্য) অকার্যম্ এব চ (এবং অকর্তব্যও) অযথাবৎ প্রজানাতি (যথার্থরূপে বা সম্যকভাবে জানতে পারে না) সা (এই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) রাজসী (রাজসিক) ।।৩১

হে পার্থ, যে বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ধর্ম ও অধর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য যথার্থরূপে জানতে পারে না, সেই বুদ্ধি রাজসী বুদ্ধি।

বেদ ও স্মৃতি-শাস্ত্রবিহিত কর্মের নাম ধর্ম এবং তাছাড়া অপর নিষিদ্ধ কর্মের নাম অধর্ম। কার্য বা কর্তব্যকর্ম এবং অকার্য বা অকর্তব্য-কর্ম—তাদের মধ্যে কোনটি করণীয়, কোনটি অকরণীয় তা যথার্থরূপে নির্ণয় করা প্রয়োজন। রাজসিক বুদ্ধিদ্বারা তা সম্ভব নয়। কারণ রাজসিক বুদ্ধি আমাদের চিত্তের কামনার অনুসরণ করে, অহংভাবে, কর্তাভাবে কর্মে নিযুক্ত হয়ে বা চিত্তের সুখকর তাই কর্তব্য বলে স্থির করে। অন্য কোনও সত্য বা আদর্শের অনুসরণ করে না।

রাজসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কোনও বিষয় বা কর্মের ভাল-মন্দ সব দিক বিচার করে দেখতে পারে না, কেবল স্বীয় অভিলাষ ও কামনা পূরণের দিকেই তার দৃষ্টি থাকে। ফলে কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম, কোন কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম অকর্তব্য —তা নির্ণয় না করে নিজের স্বার্থসুখে মগ্ন হয়ে কর্ম করে। সেইসঙ্গে এই ধরনের মানুষ নিজের স্বার্থসুখের জন্য অপর সৎ মানুষকে অপমান করতে, তার ধন ছিনিয়ে নিতে বা তার ক্ষতি করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বিষয়ের সত্য বা কর্তব্য নির্ণয় করতে সক্ষম হলেও কামনা-বাসনার মোহ- বশে বা

কামনার প্রবল তাড়নায় কোনও কর্মকে কর্তব্য বুঝেও তা সম্পাদন করে না, আবার কোনও কর্মকে অকর্তব্য বুঝেও তা অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হয়। এখানে রাজসিক ব্যক্তির অহংবুদ্ধি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষাই তাকে স্বার্থপর হতে বাধ্য করে। নিঃস্বার্থ উদার জীবন-যাপন করতে পারে না, সর্বভূতের হিতসাধন-কর্ম থেকে সে দূরে থাকে। যেহেতু নিজের স্বার্থটিই তার কাছে সবচেয়ে বড় তাই অপরের কল্যাণ কখনও ভাবতে পারে না। অতএব আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং এই ধরনের রাজসিক মানুষ থেকে নিজেদের বুদ্ধিকেও রক্ষা করতে হবে, সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আমাদের নিজেদের বুদ্ধি অহং, কর্তৃত্বও কামনার মোহবশে বিপথে চালিত না হয়। বুদ্ধিকে সর্বদা শুদ্ধ, নির্মল ও আত্মনিষ্ঠ রাখাই কর্তব্য।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ।।৩২

পার্থ (হে অর্জুন), যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং (অধর্মকে) ধর্মম্ ইতি মন্যতে (ধর্ম বলে মনে করে) সর্ব-অর্থান্ চ (ও সকল বিষয়ের অর্থ) বিপরীতান্ (বিপরীতভাবে বোঝে) তমসা (তমোগুণদ্বারা) আবৃতা (আচ্ছন্ন) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) তামসী (তামসিক) ।।৩২

হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয়ে অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে এবং সকল বিষয়ের অর্থ বিপরীত ভাবে বোঝে, তা তমোগুণদ্বারা আবৃতা এবং তাই তামসী বুদ্ধি।

তামসিক বুদ্ধি সর্বদা মোহাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বলে বস্তুমাত্রকেই বিপরীতভাবে দেখে থাকে। অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে, যে কার্য বস্তুত সুখপ্রদ, তা দুঃখদায়ক বলে মনে করে এবং যা দুঃখপ্রদ তা সুখদায়ক বলে মনে করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই মানুষ তত্ত্বজ্ঞ ঋষি, যোগী ও সৎ ব্যক্তিদের হেয় ও অবজ্ঞা করে। তাঁদের বিচারজ্ঞান দূরে সরিয়ে রাখে, পরন্তু বিষয়াসক্ত মহাস্বার্থপর চতুর ব্যক্তিদের মনে করে উচ্চশিক্ষিত, সুসভ্য ও তাদেরকে সমাজের উচ্চপদে নিযুক্ত করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই শাস্ত্রমতে পূজা, প্রার্থনা, যজ্ঞ, তীর্থ, দেবস্থানের নিয়ম বিধান ইত্যাদি সৎকর্মকে কুসংস্কার বলে মনে করে পরিহার করে এবং সেখানে অশাস্ত্রীয় স্বেচ্ছাচারকে মার্জিত সংস্কার বলে মনে করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই সৎকর্ম, সদাচার, ব্যবহার ও আহার ইত্যাদি পরিত্যাগ করে অনার্য, নিষিদ্ধ আচার পালন করাকে লোকে নিজ নিজ পুরুষার্থ মনে করে থাকে।

সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে যা সৎ বলে বিবেচিত হয়, তামসী বুদ্ধি তাকে অসৎ বলে নির্ণয় করে। অর্থাৎ সত্যকে অসত্য এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে গ্রহণ করে। এই বুদ্ধির নিকট যা মহৎ তাই তুচ্ছ মনে হয় এবং যা তুচ্ছ তাই মহৎ মনে করা হয়ে থাকে। সকল কর্মকে তামসিক বুদ্ধিদ্বারা বিচার করে কর্তব্যকে অকর্তব্য বলে মনে করে এবং যা অকর্তব্য তাই কর্তব্য বলে স্থির করে। ফলে তামসিক বুদ্ধিযুক্ত লোকেদের বুদ্ধি নিম্নগামী। ইন্দ্রিয়ের

বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি ও বিচারহীন অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন হয়ে চালিত হয়। ফলে পরম শ্রেয়ঃ সাধনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে বিনষ্ট করতে থাকে এবং অন্ধকারের পথে চলতে থাকে।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩

পার্থ (হে অর্জুন), যোগেন (যোগবলে বা চিত্তর একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (অব্যভিচারিণী) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতিদ্বারা) মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহকে) ধারয়তে (নিয়ন্ত্রিত করা যায়) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিক) ।। ৩৩

হে পার্থ, যে ধৃতির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ অব্যভিচারিণী অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়ে মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী।

আমাদের বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দ্বারা সৎ অসৎ, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করা হয়। যে প্রেরণাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি বা উদ্যমীশক্তি বুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত বিষয়ে একাগ্র হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে অব্যভিচারিণী ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তা-ই ধৃতি। বিচারশক্তি ও উদ্যমীশক্তিকে দৃঢ়রূপে ধারণ করা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাকে সঠিক পথে চালনা করাই ধৃতি। এই ধৃতিও গুণভেদে ত্রিবিধ।

ধৃতি—বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অনুগত। বুদ্ধি যা সত্য বলে নির্ণয় করে ধৃতিও তাই দৃঢ়ভাবে ধরতে চেষ্টা করে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি পরমাত্মাকে নিত্যবস্তু ও একমাত্র জীবনের লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট করে দিলে, ধৃতি চিত্তের সমস্ত বিষয়চিন্তা দূর করে একমাত্র ঈশ্বরচিন্তাকে আশ্রয় করে। তখন ধৃতি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিগুলিকে বাহ্যবিষয় হতে প্রত্যাহার করে ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত করে।

আমাদের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের গতি সর্বদাই বাইরের বিষয়ের দিকে। এগুলি রূপরসাদি ও বাহ্যবিষয়ের চিন্তায় ডুবে থাকে। অতএব মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে গতির মোড় ফিরিয়ে অন্তর্মুখী ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত করাই সাত্ত্বিকী ধৃতির কাজ। ঈশ্বরচিন্তায় মন-প্রাণ নিয়োজিত করতে হলে একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অব্যভিচারিণী ভালবাসা চাই—তখন সাত্ত্বিকী ধৃতিই সাধককে ঈশ্বরচিন্তায় বা মুক্তির পথে স্থিরতা ও দৃঢ়সংকল্প বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে দৃঢ় চেষ্টায় আবদ্ধ রাখে বা সমাহিত রাখে। এইরূপ সাত্ত্বিক সুনিয়ন্ত্রিত ধৃতিশক্তির বিকাশ ঘটানোই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বুদ্ধি এবং ধৃতি এই দুয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বুদ্ধি হলো বিচার করার ক্ষমতা এবং ধৃতি হলো প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা প্রেরণাশক্তি, যা আমাদের এগিয়ে যেতে

উদ্দীপিত করে। বুদ্ধিরই একটা বিশেষ দিক হলো ধৃতি। এই ধৃতি- শক্তিই কর্মে প্রেরণা জোগায়, উদ্দীপিত করে এবং শেষে আত্মজ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, শুদ্ধ অটল ইচ্ছাশক্তিই ভগবান। যাঁর এইরূপ ইচ্ছাশক্তি আছে তিনি দিব্যপুরুষ। এই ধৃতিশক্তি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ এবং মানবজীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনে। সমাজকল্যাণে এইরূপ প্রবল ধৃতিশক্তিরই প্রয়োজন।

এই ধৃতি কেমন হওয়া উচিত—অব্যভিচারী অর্থাৎ নিষ্ঠাযুক্ত যোগ। এরকম নয়, আমি আজ এক যোগে আছি, আগামীকাল তা থেকে সরে আর এক যোগ ধরলাম। অব্যভিচারী অর্থাৎ দৃঢ় যোগ, ব্যভিচার থাকা উচিত নয়, প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা-সহকারে যোগ অভ্যাস করে যাওয়া কর্তব্য, যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হচ্ছি।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪

পার্থ (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতি দ্বারা) (মানব) ধর্ম-কাম-অর্থান্ (ধর্ম,কাম ও অর্থ) ধারয়তে (নিত্যসেবা মুখ্যরূপে গ্রহণ করে) প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমে) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলকামী হয়) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) রাজসী (রাজসিক) ।।৩৪

হে অর্জুন, যে ধৃতিদ্বারা মানব ধর্ম, কাম ও অর্থকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করে এবং আসক্তিবশত ফলের আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ধৃতি রাজসী বলে জানবে।

যে ধৃতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি—এই চতুবর্গ লাভের অনুকূল তাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যে ধৃতি দ্বারা মানুষের প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা কেবলমাত্র কর্মের ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত হয় অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন বিষয়ের অনুসরণে সর্বদা নিযুক্ত থাকে তাকেই রাজসী ধৃতি বলে।

রাজসী ধৃতি মানুষকে মুক্তির জন্য ধর্মপথে না রেখে তাকে স্বর্গাদিরূপ নানা সুখফল লাভের আশায় ধর্মপালনে নিযুক্ত করে, অথবা যজ্ঞাদি কর্ম করে প্রচুর পুণ্যফল লাভের আশায় ধর্মপথে নিযুক্ত করে। বিষয়জনিত সুখের নাম কাম এবং ধনাদি বস্তুর লাভই অর্থ। রাজস ধৃতিযুক্ত ব্যক্তিরা ফললাভের প্রবল আশায় ঐ ত্রিবর্গের সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত মানুষ সারাজীবন চেষ্টা করে থাকে। ঐহিক সুখ অনিত্য এবং দুঃখকর। একমাত্র মোক্ষই মানুষের পরম শ্রেয়ঃবস্তু। সাত্ত্বিকী ধৃতি মানুষকে মোক্ষলাভের চেষ্টাতে নিয়োজিত করে কিন্তু রাজসী ধৃতিদ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম্যবস্তু লাভের নিমিত্ত ইচ্ছাশক্তি প্রবলরূপ ধারণ করে। সুতরাং রাজসী ধৃতি মানুষকে ধর্ম, অর্থ ও কামকেই জীবনের একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তুরূপে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই ত্রিবিধ পুরুষার্থসাধনের নিমিত্ত তাদের মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হয়। এই পথে ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিজের জন্য অনুকূল ফলটি লাভ করতে উদ্গ্রীব। সমাজে বেশির ভাগ মানুষের

এইজাতীয় ধৃতি থাকে। বেশির ভাগ মানুষ নিজের স্বার্থ আগলাতে চায়। কিন্তু আমাদের নিজেদের কল্যাণের সাথে সাথে অন্য সমাজের কল্যাণের চিন্তা ও চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, সেই ধৃতিই রাজসী, যার দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে ফলকামী অর্থাৎ 'আমি চাই, কর্মের ফলটি আমার কাছে আসুক।' তাই এই স্বার্থযুক্ত ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতি থেকে একটু সংগ্রাম করে উচ্চতম স্তরে সাত্ত্বিকী ধৃতিতে উপনীত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ।।৩৫

পার্থ (হে অর্জুন) দুর্মেধাঃ (অবিবেকী বা দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতিদ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) শোকং (শোক) ভয়ং (ভয়) বিষাদং (হতাশা বা অবসাদ) মদম্ এব চ (এবং বিষয়সম্ভোগ গর্ব) ন বিমুঞ্চতি (ত্যাগ করে না) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) তামসী (তামসিক) ।।৩৫

হে পার্থ, যে ধৃতির দ্বারা দুর্বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি স্বপ্ননিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিষয়ভোগের মত্ততা ও আত্মগর্ব ছাড়তে পারে না, সেই ধৃতিই তামসী বলে বিবেচিত হয়।

তামসিক ধৃতি মানুষের কাম্যবস্তু পুরুষার্থ বা পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ কোনটাই লাভ করতে সহায়তা করে না। তামসিক ধৃতিযুক্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছাশক্তি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত চেষ্টার মাধ্যমে হীন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। এদের ইচ্ছাশক্তি জড়ভাবে পড়ে থাকে অথবা নিদ্রায় ডুবে থাকার স্বভাব। তাদের জীবনে কোনও পুরুষার্থলাভের নিমিত্ত চেষ্টা থাকে না, কোনও উচ্চ অভিলাষ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কোনপ্রকার পরিবর্তন বা উন্নতিলাভের প্রয়াস থাকে না। অলসতা, ভীরুতা এবং কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছাই এদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। গতানুগতিকতার অনুসরণ করতে ও স্রোতে গা ঢেলে পড়ে থাকতে এরা ভালবাসে। এরা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মত্ততায় সর্বদা আচ্ছন্ন থাকে। অশাস্ত্রীয়, অবিহিত বিষয়ভোগের প্রতিই এদের চিত্ত উন্মুক্ত থাকে।

হীন ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতাকেই এরা সুখপ্রদ এবং উত্তম বলে মনে করে। এগুলি পরিত্যাগ করতে চায় না। ফলে তাদের কোনও উন্নতি হয় না। মনুষ্যজন্ম লাভ করে তারা পশুর স্তরে পড়ে থাকে। এদের ইচ্ছাশক্তিগুলি দেহ ও ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। তামসিক গুণ থেকে যতরকম ভয়ের জন্ম। সাত্ত্বিক গুণে অভয় বা নির্ভীকতার জন্ম নেয়। তামসিক ব্যক্তিরা সর্বদা আতঙ্কে থাকে। এধরনের মানুষের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পেলে সমাজ সর্বদা ভয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে। একে অপরকে বিশ্বাস করবে না। মানুষের প্রতি মানুষ আস্থা হারাবে। সমাজ সবরকমের আতঙ্কের মেঘে ঢেকে যাবে।

তমোগুণ তখন রজোগুণ ও সত্ত্বগুণকে গ্রাস করবে। তাই আমাদের সবার অন্তরের গুণভেদ জেনে অভ্যাসদ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ বৃদ্ধি পায় এবং সৎ চরিত্র গঠন হয়।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ।।৩৬

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তু (কিন্তু) ইদানীং (এখন) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) সুখং (সুখের বিবরণ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শোন) যত্র (যে সুখে) (মনুষ্য) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসবশতঃ) রমতে (প্রীতিলাভ করে) দুঃখ-অন্তং চ (এবং সকল দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ।।৩৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, এখন আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের বিষয় শোন। যে সুখের দীর্ঘকাল অভ্যাস বা অনুশীলনবশত মানুষ প্রীত ও পরিতৃপ্ত হয় এবং যে সুখ প্রাপ্ত হলে মানুষের সকল দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হয়, সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ বলে অভিহিত হয়।

এবার ভগবান গুণের দৃষ্টিকোণ থেকে সুখের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করছেন। সুখও তিন রকমের—সত্ত্বপ্রধান সুখ, রজোপ্রধান সুখ এবং তমোপ্রধান সুখ। পূর্বে কর্ম ও কর্তার প্রকারভেদ সমস্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এখন সেই কর্ম ও কর্তৃত্বজনিত ফলও তিন প্রকার হয়ে থাকে। কারণ কোনও সুখ গ্রহণ করতে হবে আবার কোনও সুখ পরিত্যাগ করতে হবে। তাই ভগবান অর্জুনকে সুখের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করছেন।

অভ্যাসাৎ রমতে যত্র—যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম-আদির অভ্যাসযোগে অধিকারী যে সুখের অনুভব করে, পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে, তাই পরম সুখ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে ক্ষণিক যে সুখ উৎপন্ন হয়, তা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। সুখের অবসান হলেই দুঃখের আরম্ভ হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ এরূপ সহসা উৎপন্ন হয় না বা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্নজনিত সুখ নয়। কারণ সাত্ত্বিকী সুখের জন্য ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, বাহ্যবিষয় হতে মনকে প্রত্যাহার করার পর অন্তর্মুখী করে আত্মার সমাধি সুখ অনুভব করতে হয়। বিষয়সুখের অবসান হলে আবার দুঃখের উদয় হয় কিন্তু এই সুখের শেষে দুঃখের আশঙ্কা নেই, কেবল অনন্ত সুখের ধারা প্রবাহিত হয়।

দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি—সকল দুঃখের অবসান হয়—অর্থাৎ সকল দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হলে যে—সুখ লাভ হয়, সেই সুখই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই পরম সুখ লাভ করার আগে, আমাদের সুখের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অতএব সাত্ত্বিকী সুখ বা পরম সুখ লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য ও তার জন্য অভ্যাস ও বিভিন্ন বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য সংগ্রাম চাই।

যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ।।৩৭

যৎ তৎ (যা, যে সুখ) অগ্রে (আরম্ভে—অর্থাৎ যে সুখ আরম্ভে) বিষম্ ইব (বিষের মতো অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখকর) পরিণামে (শেষে) অমৃত-উপমম্ (অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (নির্মল আত্মবুদ্ধি হতে জাত) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) প্রোক্তম্ (বলে কথিত হয়) ।।৩৭

যে সুখ আরম্ভে বিষের মতো দুঃখদায়ক, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, যে সুখ আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা হতে জাত—তাই সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়।

সাত্ত্বিক সুখ কীরকম—সাত্ত্বিক সুখ যা শুরুতে দুঃখ দেয়, কিন্তু অন্তে প্রচুর আনন্দ দেয় এবং সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটায়।

অগ্রে বিষম্, পরিণামে অমৃত উপমম্—প্রথমে বিষের মতো কিন্তু শেষে যেন অমৃত। বিনা সংগ্রামে এই সুখ কেউ পায় না। সুতরাং প্রথমে সংগ্রাম, শুরুতে বাধা সামলাতেই হবে। এই সময়টা একটু কষ্টের। কারণ সাত্ত্বিক সুখলাভের সংগ্রামে ইন্দ্রিয় সংযম একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সংযম করা অত্যন্ত দুঃখকর বলে মনে হয়, কারণ সমস্ত বাহ্যিক বিষয়-সুখের ভোগ ত্যাগ করতে হয়। এই বিষয়-ভোগের ত্যাগ প্রথমে বিষের মতো মনে হয় কিন্তু ত্যাগের অভ্যাস অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম বারংবার অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত হলে চিত্তের নির্মলতা ও প্রসন্ন ভাব জন্মে এবং বিষয়-বাসনা দূর হওয়ায় চিত্ত শান্ত হয়। তখন চিত্তের সেই শান্ত ও প্রসন্ন ভাব হতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাই সাত্ত্বিক সুখ।

আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্—সেই সুখের জন্ম আত্মবুদ্ধি থেকে, যা প্রসন্ন এবং শান্ত। সাত্ত্বিক স্তরে মন উঠলে মানুষের জীবনে এই সুখের অনুভূতি হয়। চিত্ত স্বচ্ছ হলে আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তি স্বচ্ছ হয়। এই সাত্ত্বিক সুখ নিষ্কাম কর্ম, ঈশ্বরচিন্তা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি হতে আসে। ঐসব জ্ঞানের সাধনে প্রথমে একটু কষ্ট হবেই, কারণ ঐসব মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু নিত্য অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমে সিদ্ধ হলে পরিণামে পরম আনন্দ ও সুখ লাভ হয়।

আত্মবুদ্ধি ও তার প্রসাদে নিদ্রা, আলস্য ইত্যাদি রজঃ ও তমঃরূপ দোষ দূরীভূত হয়। চিত্তে স্বচ্ছ চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় বুদ্ধি স্বচ্ছতাসহ নির্মল অবস্থিতি লাভ করে, শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তির প্রকাশ ঘটে এবং তখন আত্মবুদ্ধি থেকে অনির্বচনীয় সাত্ত্বিক সুখ অনুভব হয়।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ।।৩৮

বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশত) যৎ তৎ (যে সুখ) অগ্রে (আরম্ভে) অমৃতোপমম্ (অমৃতবৎ) (কিন্তু) পরিণামে (অন্তে) বিষম্ ইব (বিষবৎ অর্থাৎ দুঃখকর বা ক্ষতিকর) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) রাজসম্ (রাজস) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ।। ৩৮ ।।

জগতের রূপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হতে জাত এবং যা প্রথমে অমৃতের মতো, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য হয়, সেই সুখকেই রাজস সুখ বলা হয়।

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়—অর্থাৎ সুস্বর শ্রবণে, সুরূপ দর্শনে, সুমধুর রস আস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল স্পর্শে বা স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গমাদিতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তা রাজস সুখ। এই সুখে ইন্দ্রিয়াদি সংযম করতে হয় না বলে প্রথমে পরম সুখকর ও অমৃতের ন্যায় প্রীতিপ্রদ মনে হয়। কিন্তু এই সুখ ক্ষণিক। কিছুকাল পরেই সুখের অবস্থা দূরীভূত হয়ে প্রতিক্রিয়াজনিত দুঃখের অনুভূতি হতে থাকে। যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিকর ছিল তাই পরে বিষের ন্যায় জ্বালা উৎপন্ন করে। তা ছাড়া পরিণামে এই ইন্দ্রিয়ভোগ মানুষের বল, বীর্য, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন ও উৎসাহের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

রাজসিক ও সাত্ত্বিক সুখের পার্থক্য হলো—রাজসিক সুখ ইন্দ্রিয় ও তার বিষয়ের সংযোগ হতে সহসা উৎপন্ন, আবার অল্প সময়ের মধ্যেই তিরোহিত হয়। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখের উৎপত্তি দীর্ঘকাল যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম ইত্যাদি বেদান্ত-সাধনার অভ্যাসদ্বারা চিত্ত সংযত ও শান্ত হলে ঐ শান্তভাব হতে সাত্ত্বিক সুখের উৎপত্তি হয় ও তা স্থায়ী হয়।

রাজসিক সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, সুখের সঙ্গে দুঃখ লেগেই থাকে, দুঃখের অবসান হয় না। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ নির্মল, তা দ্বারা দুঃখের অবসান হয়। রাজসিক সুখ শুরুতে খুব প্রীতিকর, কিন্তু পরিণামে দুঃখকর, পক্ষান্তরে সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয় সংযম ও বেদান্তের সাধনের দরুন প্রথমে ক্লেশকর হলেও পরিণামে অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিপ্রদ।

বাস্তবিক নিজেদের জীবনে, চরিত্রে বা সমাজের কল্যাণ করতে হলে সংগ্রামের কষ্ট মাথা পেতে নিতে হবে। কষ্ট না করে তো জ্ঞানলাভ করা যায় না। সত্যের অনুসন্ধান করার পথ কণ্টকময়। ভারতবর্ষে তাই মানুষ প্রচণ্ড কষ্ট করে তপস্যা করে আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরলাভ করার চেষ্টা করে। সহজে কিছু জ্ঞান লাভ করতে গেলে তা অসৎ হবে এবং অপরিণতই থেকে যাবে। তার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে না, চিন্তাশক্তিও স্বচ্ছ হবে না। তাই রাজসিক সুখ ভোগ করা সহজ, ক্ষণিক ও দুঃখকর কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়, তা অমৃতোপম, স্থায়ী এবং সুখকর।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ।।৩৯

যৎ চ (এবং যে) সুখং (সুখ) অগ্রে চ (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (পরিণামেও) আত্মনঃ (বুদ্ধির) মোহনং (মোহসৃষ্টিকারী) (এবং যে সুখ) নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদ-উত্থং (অতি-নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হতে জাত) তৎ (সেই সুখ) তামসং (তামস) উদাহৃতম্ (উক্ত হয়)।।৩৯

যে সুখ আরম্ভে বা প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহসৃষ্টিকারী এবং যা অতি-নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হতে জাত, সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয় ।

যে সুখ আত্মজ্ঞান হতে বা বিষয়-ইন্দ্রিয় সংযোগ হতে উৎপন্ন না হয়ে কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হতে উৎপন্ন হয়, সাধকগণের মতে তাই তামস সুখ। এই সুখের আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই মানুষের বিবেকজ্ঞান তিরোহিত হয়, তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, তখন সে অমানুষের মতো জ্ঞানশূন্য হয়ে কুকার্য করতে প্রবৃত্ত হয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোহগ্রস্ত হওয়ায় হৃদয় অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত থাকে। তামসিক সুখের উৎপন্ন হয় নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক জড়ভাব হতে। উৎপন্নকালেই চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে ভ্রমে ও আলস্যে মোহাচ্ছন্ন করে রাখলে তাদের ক্রিয়া বিপথে বা কুপথে চালিত হয় এবং জড়স্বভাবগস্ত হয়।

তামসিক সুখ কতকটা পশুদের ন্যায়। প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়ে থাকে। তাই এই তামসিক সুখ মানুষের জন্য হেয়, ঘৃণ্য ও চিত্তের জড়তা এবং মোহ-শেষে মানুষকে অধঃপাতের দিকে নিয়ে যায়। তামস সুখকে আত্মার মোহকর বলা হয়েছে। এই সুখ ঈশ্বরলাভের বিরোধী। আত্মজ্ঞানের বিরোধী।

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনেও এই তমোগুণের প্রভাবে মানুষ তামসিক সুখ ও ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় ডুবে থাকে। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন সারা ভারতবর্ষ ঘোর তামসিকতায় ডুবে রয়েছে। পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও নানাপ্রকারের লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করেও জাতি মনে করছে 'বেশ আছি'। দেশাচার, কুসংস্কারের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই তামসিকতা জাতিকে ক্রমশ ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ যুব-সমাজকে লক্ষ্য করে তাঁর 'স্বদেশ মন্ত্র'-এ বলছেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না—

নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ।।৪০

পৃথিব্যাং (এ-পৃথিবীতে) দিবি বা (বা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (কিংবা দেবগণের মধ্যে) তৎ (এমন) সত্ত্বং (প্রাণী) ন অস্তি (নাই) যৎ (যা) এভিঃ (এই সকল) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) ত্রিভিঃ গুণৈঃ (তিনগুণ হতে) মুক্তং (মুক্ত) স্যাৎ (হয় বা আছে) ।।৪০।।

এ পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবগণের মধ্যেও এমন প্রাণী বা বস্তু নাই যা প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হতে মুক্ত। (দেবগণও প্রকৃতিজাত বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ ত্রিগুণ হতে মুক্ত নন)।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য হলেই গুণত্রয়ের প্রকাশ শুরু হয়। প্রকৃতি একমাত্র পরমাত্মার অধীন অর্থাৎ পরমাত্মা মায়াধীশ, জীব মায়াধীন। পরমাত্মা ছাড়া সমগ্র জীব-জগৎ প্রকৃতির অধীন। তৃণ হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকলই ত্রিগুণময় মায়ারূপ রজ্জুতে গ্রথিত রয়েছে। তিন গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই জগৎ প্রকাশিত ও লয়প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে ও স্বর্গে সকল লোকে সকল প্রাণী ও বস্তু তিন গুণের ক্রিয়াতে আবদ্ধ। জড় বস্তুতেও তিন গুণ বর্তমান, কিন্তু সেখানে তমোগুণের প্রকাশ বেশি। অতএব বস্তু, কর্ম, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া—যা কিছু মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে আসে সমস্তই এই তিন গুণের ক্রিয়া। মানুষের স্বভাব, বুদ্ধি, ক্রিয়া, গুণ, সুখ—সবই এই তিন গুণের দ্বারাই গঠিত। যতদিন মানুষ এই সংসারে আবদ্ধ থাকে ততদিন সে এই তিন গুণের দ্বারা চালিত হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করে। দেবগণও এই তিন গুণের প্রভাব হতে মুক্ত নন। স্বর্গ ও পৃথিবীতে সর্বত্র তিন গুণের প্রভাব বিস্তৃত রয়েছে এবং সকলেই তিন গুণ দ্বারা চালিত। তিন গুণের পারে গেলে আমরা আমাদের আত্মস্বরূপে পৌঁছাতে পারব। অর্থাৎ এই বিশ্বের যেমন বিকাশ হয়েছে তেমন সঙ্কোচনও একদিন হবে। এক থেকে যেমন বহু হয়েছে তেমনি একদিন এক অবস্থায় ফিরে যাবে। এই হলো মহাবিশ্বের বিবর্তন। বিকাশ বা বিস্তার (Evolution) এবং সঙ্কোচ অর্থাৎ (Involution) বহুত্ব আবার একত্বে ফিরে

যাবে। যা কিছু ব্যক্ত তা অব্যক্ত থেকে এসেছে এবং অব্যক্তেই আবার ফিরে যাবে। তাই ভগবান বলছেন, কীভাবে মানুষের অধ্যাত্মজীবন উচ্চ থেকে অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হবে। কীভাবে ঈশ্বরের পাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতি বা চরম আত্মনিবেদন লাভ করবে যা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য।

চরিত্রবান মানুষই জগতে সুখ, শান্তি ও কল্যাণের নির্মল সৌরভ ছড়িয়ে দিতে পারে। চরিত্রমান মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। এমনকী যিনি তামসিক ব্যক্তি বলে আজ সমাজে সকলের কাছে পরিচিত, তিনিও নিজের চেষ্টায় তামসিক গুণের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন। সেটা সম্ভব নিজের উপর চাই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা—আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্রদ্ধা থাকলেই মানুষ যে-কোনও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে পারে। বেদান্ত শিক্ষা দেয় নিজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নাও এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে নিজেকে গড়ে তোল। অপরের উপর দোষ না চাপিয়ে, নিজের দোষ, অজ্ঞানতা ও দুর্বলতাগুলি ত্যাগ করবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলছেন—'উদ্ধরেদ্ আত্মনা আত্মানম্'—বিবেকযুক্ত মনের সাহায্যে নিজেই নিজেকে উন্নত করে তোল। দরকার শুধু মন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো। তমঃ ও রজ থেকে মোড় ফিরিয়ে সত্ত্বগুণের বিকাশের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটিয়ে তিন গুণের পারে যেতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ত্যাগ ও সেবা—এই দুটিই হলো ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ। এই দুটি আদর্শের ভিতর দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। আমাদের ভিতরে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, শুধু গুণগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিতরকার শক্তিগুলিকে অধ্যাত্মজীবনমুখী করতে হবে এবং ঐরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও চেষ্টার দ্বারা আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারব।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১

পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের) শূদ্রাণাম্ চ (এবং শূদ্রদের) কর্মাণি (কর্মসমূহ) স্বভাব-প্রভবৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিগুণসমূহ-দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হয়েছে)।।৪১

হে পরন্তপ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারেই শাস্ত্রকারগণ পৃথক পৃথক বিভক্ত করেছেন।

এক ঈশ্বর সকল মানুষকে একপ্রকার সৃষ্টি না করে কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ করলেন, এবং কেনই-বা তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মের বিধান করলেন, অর্জুনের সেই সংশয় দূর করছেন। এখানে ভগবানের কোনও দোষ নেই। প্রকৃতির গুণ-প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে

প্রকাশ, তাই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম উৎপন্ন হয়েছে। মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব এই তিন গুণ হতে জাত বা তিন গুণ দ্বারাই গঠিত। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃতিতে এই গুণগুলি সমানভাবে প্রকাশ ঘটে না। এক এক জনের মধ্যে এক বা দুই গুণের প্রকাশ প্রবল হয়। যার মধ্যে যে গুণের প্রকাশ প্রবল তার স্বভাবও সেইরূপ হয়ে থাকে। এই গুণভেদে মানুষের স্বভাবকে চার ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—ব্রাহ্মণস্বভাব, ক্ষত্রিয়স্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব।

ব্রাহ্মণস্বভাব সত্ত্বগুণপ্রধান ও শান্ত অর্থাৎ এখানে রজ ও তমোগুণের প্রাধান্য কম। ক্ষত্রিয়স্বভাবে তমোগুণ ত্যাগ করে সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণই প্রবল হয়। বৈশ্যস্বভাবে সত্ত্বগুণ কম, তমোমিশ্রিত রজোগুণের প্রভাব প্রবল। শূদ্রস্বভাবে রজোমিশ্রিত তমোগুণেরই আধিক্য বেশি।

স্বভাবের ও গুণের প্রকারভেদে মনুষ্যজাতিকে চার বর্ণে বিভক্ত করা হয়। এই বর্ণভেদ ও প্রচলিত জাতিভেদ এক নয়। চার বর্ণের কর্মও আবার তাদের স্বভাবভেদে ও গুণানুসারে নির্দিষ্ট করা হয়। শুধু বাহ্যিক কর্ম নয়, মানসিক ধর্ম, গুণ, ভাব বা অবস্থা যা বাহ্যিক কর্মের উৎপত্তি বা বাহ্যিক কর্মে প্রতিফলিত হয় তাও কর্মের অন্তর্গত। কারণ মানসিক ধর্ম বা ভাবের মধ্য দিয়েই স্বভাবের প্রকাশ হয়। পরে তা ইন্দ্রিয়যোগে বাহ্যিক কর্মে পরিণত হয়।

এই রুচিবৈচিত্রের ভাবটি প্রকাশ করার জন্যই আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে এই শব্দগুলির কোনও যোগ নেই। কাজের ভাবকে আশ্রয় করে প্রাচীনকালে শ্রেণি বিভাগ গড়ে উঠেছিল। যোগ্যতা ও মনোবৃত্তি অনুসারে নিজের নিজের কাজ বেছে নিয়ে একটি শ্রেণির অন্তর্গত হওয়া যায়। মনোবৃত্তি অনুযায়ী কাজকেই তখন ধর্ম বলা হয়। একজনের ধর্ম তাই আর একজনের ধর্ম থেকে আলাদা। এই দিক থেকে মনীষিগণ জীবিকাকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন। যারা শান্ত, নীরব, অন্তর্মুখ, সহানুভূতিশীল, জ্ঞানপিপাসু, অধ্যাপনা, যাজন এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন—তারা ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রজোগুণ প্রবল। কর্ম, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, তিন ধর্ম ও প্রাণিবর্গের রক্ষা, নীতি ও বীরত্বধর্ম প্রবল। বৈশ্য—যারা চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করে, অর্থ উপার্জন করে ও সমাজের কল্যাণে অর্থ সাহায্য করে। শূদ্র বা শ্রমজীবী যারা পরিশ্রম করতে ভালবাসে। তাদের শিক্ষা বা সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি কম, কিন্তু তারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। এই চার শ্রেণির মানুষ পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বর্ণ মানে জীবিকা। স্বভাব ও কাজের ভিত্তিতে সমাজে মানুষের স্থান হতো। কিন্তু পরে জন্মের ভিত্তিতেই সবকিছু নির্ধারিত করে বর্ণের ব্যাখ্যা ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অসম্মান করা হলো। জন্মের ওপর বর্ণকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা বর্ণের অপব্যাখ্যা করলাম। যেদিন থেকে জন্মকেই জীবিকা ও জীবনের একমাত্র মানদণ্ড করা হলো,

সেদিন থেকেই ভারতীয় সমাজের অধঃপতন শুরু হলো এবং কালে সেই অধোগতি জাতিভেদ-প্রথারূপে সমাজে মারাত্মক ব্যাধিরূপে দেখা দিল।

বর্তমান কালে স্বামী বিবেকানন্দ ছুঁতমার্গ ও কুসংস্কার দূর করে সমাজে গুণগত দিক ও মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবিকা নির্বাচন করতে আহ্বান করলেন। যে-জীবিকায় আমাদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ও প্রকাশ হবে, চরিত্র ও যোগ্যতার সঠিক প্রয়োগ হবে, সেই কর্ম ও ধর্ম গ্রহণ করব। নতুন জীবিকা আমি তখনই বেছে নিতে পারি যখন তা আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হবে।

তিন গুণের ভেদে যেমন বর্ণ ও ধর্ম ভেদ হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারভাগে বিভক্ত হয়েছে, সেইরূপ ব্রাহ্মণও আবার সত্ত্বগুণ ও অপর গুণগুলির প্রকাশের তারতম্য অনুযায়ী দশটি শ্রেণিতে বিভক্ত—'দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ।। (অত্রিসংহিতা, ৩৬৪) স্ব স্ব গুণ-ক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল—এই দশ শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে।

যে-ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অধ্যয়নদ্বারা শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণপূর্বক যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা, উপাসনা ও গায়ত্রীজপ, হোম, দেবতাপূজা, অতিথিসৎকার ইত্যাদি সৎভাবে অনুষ্ঠান করে থাকেন তাঁকে 'দেবব্রাহ্মণ' বলা যায়। যে-ব্রাহ্মণ ঐসব গুণসম্পন্ন হয়ে বিশেষত শাক, পত্র, ফল-মূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন, এবং ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকেন, তাঁকে মুনিব্রাহ্মণ বলা যায়। যে-ব্রাহ্মণ দেবব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত ও আসক্তিশূন্য হয়ে বেদ অধ্যয়ন, সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্রের বিচার করেন—তিনি দ্বিজব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ ও রণক্ষেত্রে ধনুর্ধারী হয়ে শত্রুকে আঘাত করেন—তিনি ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ। যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে কৃষিকর্ম, পশুপালন ও ব্যবসাবাণিজ্যে রত থাকেন তিনি বৈশ্যব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণ শ্রমজীবী ও নানা ধরণের দ্রব্য, যেমন—মাংস, সুরা ইত্যাদি বিক্রয় করেন—তিনি শূদ্রব্রাহ্মণ। যে- ব্রাহ্মণ অসৎ জীবন-যাপন করেন, তমঃ বস্তুর ভোগ করেন এবং সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করতে দ্বিধা করেন না—তিনি নিষাদব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না কিন্তু উপবীত ধারণ করে 'আমি ব্রাহ্মণ' বলে গর্ব করেন—তিনি পশুব্রাহ্মণ। যে- ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বহীন, অবৈদিক কর্মানুষ্ঠান করেন—তিনি 'ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ' এবং যে- ব্রাহ্মণ বৈদিক ধর্মবিবর্জিত, নিষ্ঠুর, ক্রিয়াবিহীন—তিনি চণ্ডালব্রাহ্মণ। ঋষি মনু বলেছেন, (মনুসংহিতা,২-৪১) সমাজে প্রকৃত দেবব্রাহ্মণ, মুনিব্রাহ্মণ ও দ্বিজব্রাহ্মণের অভাব হলে অর্থাৎ আপৎকাল উপস্থিত হলে, যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে অব্রাহ্মণের নিকট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট, যোগ্য ক্ষত্রিয়ের অভাবে, যোগ্য বৈশ্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন করবে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ।।৪২

শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম বা মনঃসংযম) দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়-সংযম) তপঃ (তপস্যা) শৌচং (বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচিতা) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা, সহিষ্ণুতা) আর্জবং (সরলতা) জ্ঞানং (শাস্ত্রজ্ঞান) বিজ্ঞানম্ (আত্মতত্ত্ব অনুভূতি) আস্তিক্যম্ এব চ (এবং শাস্ত্র, পরলোক ও ভগবানে বিশ্বাস, আস্তিকবুদ্ধি) স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ব্রহ্মকর্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম) ।।৪২

অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম—শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অস্তিক্যবুদ্ধিরূপ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—এই সব ব্রাহ্মণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বর্ণের স্বভাবজাত কর্ম বা ধর্ম।

শম—অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের বৃত্তির নিগ্রহ। দম—পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তপঃ--কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা। শৌচ—বিবেক-বিচার দিয়ে অন্তকরণের শুদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বারা শরীর ও আনুষঙ্গিক পরিবেশের শুচিতা রক্ষা করা। ক্ষমা—অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়েও যে বৃত্তির দ্বারা মানুষ ক্রোধ নিরোধ করতে পারে। আর্জব--সরলতা, কুটিলস্বভাব ত্যাগ। জ্ঞান—শাস্ত্রজ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ ষড়দর্শন হতে বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থ-ভাব উপলব্ধি করবার নিমিত্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। বিজ্ঞান--আত্মজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের সাধনকৌশল ও জ্ঞানকাণ্ডের তত্ত্ব—ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্ব অনুভব করবার শক্তিই বিজ্ঞান। আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য, এটি নিশ্চিত বিশ্বাস।

এই নববিধ ধর্ম চারবর্ণের মানুষের অনুষ্ঠেয় কারণ সাত্ত্বিক স্বভাব লাভ করতে গেলে এই সাত্ত্বিক ধর্মগুলি পালন অবশ্য করণীয়। এগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম। এগুলি না পালন করলে ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। মিত্র ও শত্রু উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করা, অন্যের নিন্দা না করা, নিষিদ্ধ বস্তু আহার না করা, শৌচ দ্বারা সজ্জন রূপ রক্ষা করা, মহাপুরুষদের উপদেশ অনুসারে কার্য সম্পাদন করা, অতিথি ও ব্রাহ্মণদের অন্নদান এবং সুখ-দুঃখে সমভাব অনুভব করাই সকলের পক্ষে কল্যাণকর। এগুলি ব্রাহ্মণদের নিত্যস্বভাব হওয়া অবশ্যকর্তব্য এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কাছেও এগুলি ধর্মরূপে পালনীয়। ব্রাহ্মণরা এই মহৎ গুণের অধিকারী, ব্রাহ্মণের চরিত্রে স্বাভাবিকভাবে এইসকল গুণ আপনা হতেই পরিস্ফুট হয়ে থাকে কিন্তু অন্যদের সাধনা এবং কর্মদ্বারা অর্জন করতে হয়। অতএব শুধু ব্রাহ্মণের সন্তান হলেই যে কেউ ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হবে এমন কোনও কথা নেই, তার চরিত্রে এইসব মহৎ গুণের প্রকাশ থাকতে হবে, তবেই সে ব্রাহ্মণ বলে সমাজে গণ্য হবে।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।৪৩

শৌর্যং (শৌর্য, পরাক্রম) তেজঃ (বীর্য, তেজ) ধৃতিঃ (ধৈর্য) দাক্ষ্যং (কার্যদক্ষতা) যুদ্ধে চ অপি (এবং যুদ্ধেও) অপলায়নম্ (অপরাঙ্মুখতা) দানম্ (মুক্তহস্তে দান) ঈশ্বরভাবঃ চ (এবং প্রভুত্বের ভাব) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ক্ষাত্রং কর্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম) ।।৪৩

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা ও প্রভুত্বের ভাবে অন্যকে শাসন করার শক্তি—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম বা ধর্ম।

ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্মগুলি এখানে বর্ণনা করা হল—

শৌর্যম্—বিক্রম, সাহস। সত্য, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার্থে অথবা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন হলে অধিকতর বলবান ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া। কাউকে ভয় না করে ন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সাহস।

তেজঃ—অত্যাচার সহ্য না করা, অসৎ ব্যক্তির নিকট অবনতি স্বীকার না করা, পরাধীন থেকে লাঞ্ছনা, অপমান ভোগ না করা—এইগুলি ক্ষাত্রতেজের লক্ষণ।

দাক্ষ্যম্—কার্যদক্ষতা, বিপদে আকুল না হয়ে যথাকর্তব্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষমতা। রাজ্যশাসন, সমাজরক্ষা বা যে-কোনও কর্ম সম্পাদন করতে দক্ষতা ও যথাযথ কৌশল নিরূপণ করবার গুণগুলি আবশ্যক।

যুদ্ধে অপলায়নম্—যুদ্ধ উপস্থিত হলে, শত্রুর ভয়ে ভীত হয়ে বা আহত হয়ে পলায়ন না করা, ন্যায় যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া এবং সেইজন্য প্রয়োজন হলে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া।

দানম্—সংকোচশূন্য হয়ে নিজ অর্থ বা সম্পত্তি অপরকে দান করা। ক্ষত্রিয়রাই প্রকৃত দান করে। দান চিত্তের ত্যাগশীলতার পরিচায়ক। গৃহ, ধন ও ঐশ্বর্যে মমত্ববুদ্ধি পরিহার করবার ক্ষমতা থাকে।

ঈশ্বরভাবঃ—প্রভুত্বপ্রকাশ, দুর্বৃত্তকে শাসন করবার ক্ষমতা। ক্ষত্রিয়রাই সমাজ-রক্ষক তাই তাদের একটা প্রভুভাব থাকে। এই ঈশ্বরভাব না থাকলে দুর্বৃত্তের শাসন ও সমাজরক্ষা হয় না, এজন্য ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট ধর্ম।

এই ধর্মগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত। ক্ষত্রিয়স্বভাবে এইসকল ধর্মের আপনা হতে বিকাশ হয়ে থাকে। ভয় পেয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো যেমন অন্যায় অক্ষত্রিয়োচিত কাজ, সেইরূপ যে-কোনও সৎকাজে সমস্যা ও বাধা আসলে পালিয়ে যাওয়া উচিত নয়—এটা অশোভন।

এইসব শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন করতে হবে। আমাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগাতে হবে এবং প্রতি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের মনে যদি কোনও দুর্বলতা বা অসৎ বাসনার সঞ্চার হয় তা অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে। তবেই আমরা পূর্ণ মানুষ ও সুন্দর সমাজ গড়তে পারব।

আমাদের মধ্যে সব শক্তি নিহিত আছে, শুধু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পালটাতে হবে, তবেই আমরা সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারব। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে গীতার বাণীগুলির মামার্থ উপলব্ধি করতে পারলে তবেই তারা সমাজের চারটি বর্ণের উপযোগিতা হৃদয়ংগম করতে পারবে। তখন তারা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে তাদের চারিত্রিক বিকাশে উৎসাহিত ও সাহায্য করতে পারবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি শব্দ শোনামাত্রই আমাদের মনে বর্তমান সমাজের জাতিবৈষম্যের চিত্রটি ভেসে ওঠে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার বলছেন বর্ণবিভাগ ও জাতিবৈষম্য এক জিনিস নয়। ভগবান মানুষের পৃথক পৃথক চারটি বৈশিষ্ট্য ও কর্মে প্রবণতার কথাই বলছেন। গুণগত প্রবণতার এই বৈচিত্র অবশ্যই থাকবে। সেই গুণ-কর্ম অনুযায়ী ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ করবে। কিন্তু জাতিবৈষম্য দেখিয়ে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি করা সমাজের পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'বিশেষ সুবিধার ব্যাধি যখনই মাথা চাড়া দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ডাঙ্গশ মারো।' ইংল্যাণ্ডে 'বেদান্ত এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ' বিষয়ে বক্তৃতায় বলছেন—বিশেষ সুবিধা কেন? তোমার তো নিজের শক্তি-সামর্থ্য আছে। সেগুলোকে কাজে লাগাও, সেগুলো প্রকাশ কর। কখনও নিজের জন্য বিশেষ সুবিধা চেয়ো না।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ।।৪৪

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) বৈশ্যকর্ম (বৈশ্যের কর্ম) শূদ্রস্য অপি (শূদ্রেরও) পরিচর্যা-আত্মকং (পরিচর্যারূপ, সেবামূলক) কর্ম (কাজ) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ।।৪৪

কৃষিকার্য, গোপালন ও বাণিজ্য—এইগুলি বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম, শূদ্রগণের স্বভাবজাত কর্ম—সেবা, পরিচর্যাত্মক কর্ম।

কৃষি, গোপালন, শিল্পোৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা যাঁর, তিনিই বৈশ্য। ঐজাতীয় কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। এইসব বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম। বৈশ্যস্বভাব রজোগুণ-প্রধান ও তমোমিশ্রিত, ফলে এই জাতীয় কর্ম করা সহজ। বৈশ্য-কর্ম অর্থাৎ ধনোৎপাদন কর্ম, মানববিকাশ ও মানবকল্যাণের উপযোগী। বৈশ্যদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সমাজে।

সবশেষে আসছে শূদ্রদের কথা অর্থাৎ শ্রমজীবীদের কথা। এঁরাই সমাজে কঠিন পরিশ্রম করতে পারেন। তাঁরা সমাজে সেবা ও পরিচর্যা দিয়ে অর্থাৎ শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান—সবকিছুই জোগাড় করেন। শূদ্রস্বভাব তমঃপ্রধান এবং রজোমিশ্রিত। তবে সাধারণভাবে শূদ্র শব্দটি নিন্দার্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে,

আসলে এটাকে অনর্থক বিকৃত করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষেরা সমাজ–ব্যবস্থাকে সচল রাখেন। তাঁদের গুরুত্ব অনেক বেশি।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্মের প্রসঙ্গে শম, দম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারাই সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয় এবং সত্ত্বগুণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি, সাত্ত্বিক বুদ্ধি ও সাত্ত্বিক উদ্যমীশক্তির প্রকাশ ঘটে। সাত্ত্বিক স্বভাবযুক্ত দৃঢ় চরিত্রের কর্মী সমাজের কল্যাণকর্মে প্রয়োজন অনুযায়ী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন ভাবে কর্ম করতে পারে। সমাজে চার বর্ণের মানুষের সমান প্রয়োজন, এক বর্ণ অপর বর্ণের উপর নির্ভরশীল এবং একে অপর থেকে ভাল গুণগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে থাকে। সমাজে চার বর্ণের একত্র থাকা একান্ত আবশ্যক।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভারতবর্ষের কার্যাবলী নিয়মে বলছেন—বৈচিত্র জগতের প্রাণ। এই বৈচিত্ররূপ জাতি কখনও বিনষ্ট হবার নয়। অর্থাৎ বুদ্ধি ও শক্তির তারতম্যে ব্যক্তিবিশেষে কর্মের বিশেষত্ব থাকবেই। যেমন, কেউ সমাজ–শাসনে পারদর্শী, কেউ বা পথের ধুলো পরিস্কারে পারদর্শী। এই বলে সমাজশাসনে পারদর্শী মানুষেরা যে জগতের যাবতীয় সুখভোগে অধিকার থাকবে এবং পথের ধুলো–পরিষ্কারক ব্যক্তিরা অনাহারে মরবে—তবে এটাই সামাজিক অকল্যাণর মূল কারণ। আমাদের দেশে বর্তমানে যত জাতি আছে তদপেক্ষা যদি লক্ষাধিক জাতি বেশি হয়, তাহলেও কল্যাণ বই অকল্যাণ নাই। কারণ যে–দেশে জাতির সংখ্যা যত অধিক সে–দেশে শিল্পাদি ব্যবসায়ের সংখ্যা ততই অধিক। কিন্তু মৃত্যুর ছায়ারূপ ভোগতারতম্যরূপ জাতির বিপক্ষেই সংগ্রাম চলছে। যে জাতি এ সংগ্রামে যত পরাজিত তার দুর্দশা ততই অধিক। এই সংগ্রামে যে জাতি যে পরিমাণে জয়লাভ করছে, সে জাতি সেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে আরোহণ করছে। সমাজে যাকে সমাজনীতি বা Politics বলে, তা কেবল এই ভোগতারতম্যের অধিকার–প্রাপ্ত ও অধিকার–নিরাকৃত জাতিসমূহের সংগ্রামের নাম। এই অধিকার তারতম্যের মহাসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে ভারতবর্ষ গতপ্রাণপ্রায় পতিত হয়েছে। অতএব বাহ্যজাতির সহিত সাম্য স্থাপন অতি দূরের কথা, যতদিন এ ভারত নিজগৃহে সাম্য স্থাপন করতে না পারবে, ততদিন তার পুনর্জ্জীবনীশক্তি লাভের আশা নাই।

অর্থাৎ সার কথা এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ কোনও দোষের নয়, কিন্তু ভোগাধিকার তারতম্যই মহা অনর্থের কারণ হয়ে উঠেছে। অতএব আমাদের উদ্দেশ্য জাতিবিভাগ নষ্ট করা নয়, কিন্তু ভোগাধিকারের সাম্য–সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। আচণ্ডালের যাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিকার–সহায়তা হয়, তার সাধন করাই আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত। তিনটি বিপদ আমাদের সম্মুখে—১) ব্রাহ্মণ–ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত বর্ণ যদি একত্রিত হয়ে পুরাকালে বৌদ্ধধর্মের ন্যায় একটি নূতন ধর্ম সৃষ্টি করে। (ঐ ধর্ম বেদ ও ঈশ্বর অস্বীকার করায় হিন্দু ধর্মের অনেক ক্ষতি হয়েছিল) ২) বাইরের

দেশের ধর্ম যদি এখানে বিস্তারলাভ করে। (ইতিহাস স্বীকার করে—রাজপুত দুই রাজা—জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে যুদ্ধে বহু রাজপুত ধ্বংস হয় এবং তার ফলে মহম্মদ ঘোরী সহজে পৃথ্বীরাজকে পরাজিক করে এবং ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য ও ধর্মের বিস্তার ঘটে) ৩) যদি সমস্ত ধর্মভাব ভারতবর্ষ হতে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব ব্যক্তির বা জাতির যে–বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি নিহিত, তা বিনষ্ট হলে সে জাতিও নষ্ট হয়ে যায়। আর্য-জাতির জীবন ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। জাতির মেরুদণ্ডই হলো ধর্ম। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে আর্যজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

অতএব বর্ণভেদ মূলত গুণানুগত, জাতিভেদ সম্পূর্ণই বংশানুগত। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকলে তাকে অব্রাহ্মণই জ্ঞান করতে হবে এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের মধ্যেও কেউ শম, দম ইত্যাদি সংযমগুণে ভূষিত হলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত সম্মানই লাভ করবেন। মহাভারতে ভৃগু–ভরদ্বাজ–সংবাদে মহর্ষি ভৃগু বর্ণভেদের সম্পর্কে বর্ণনা করে বললেন—কোন কর্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কোন কর্মদ্বারা ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি এবং এইরূপ গুণকর্মানুসারে বর্ণ নির্ণয় করতে হবে, জাতি অনুসারে নয়। 'উমা–মহেশ্বর-সংবাদে' মহাদেব বলছেন—ব্রাহ্মণ–যোনিতে জন্ম, উপনয়ন বা বেদ অধ্যয়ন করাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও পবিত্র কর্মদ্বারা দ্বিজবৎ সেব্য হন, সৎচরিত্রের শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দও বর্তমান যুগে সকল বর্ণের মানুষের বেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও সংযম অভ্যাস করে গায়ত্রী জপের অধিকার এবং পরে সন্ন্যাসের অধিকার দেওয়ার জন্য বেদ, পুরাণ ও স্মৃতি থেকে যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে আগত সকল বর্ণের যুবকদের ব্রহ্মচর্য গ্রহণ, উপনয়ন, গায়ত্রী উপাসনা ও সন্ন্যাসের অধিকার দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-সারদা মঠে আগত সকল বর্ণের নারীদেরও বেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য গ্রহণ ও সন্ন্যাসের অধিকার দিয়েছেন। গৃহীদেরও বেদ, উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বা শ্রীশ্রীচণ্ডী অধ্যয়নের অধিকার দিয়েছেন। প্রয়োজনে ব্রাহ্মণগণও অন্য বর্ণের সুযোগ্য জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। শাস্ত্র যেমন রাজর্ষি জনক, ভীষ্মদেব, ধর্মব্যাধ, পুরাণ–বক্তা সূত—এঁদের উদাহরণ দিয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্তমান কালে সকল গৃহীদের জনক রাজার আদর্শে চার যোগের সমন্বয়ে সংসার কর্মের মধ্যে ঈশ্বরলাভ করতে বলছেন। অতএব গীতা মানুষে–মানুষে বৈষম্যের ঘোর বিরোধী। গীতার উপদেশ—মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে তার বিকাশের পথ দেখায়। যোগ্যতা থাকলে একজন সাফাইওয়ালা, চা–ওয়ালার কর্ম থেকে প্রধানমন্ত্রী পদেও উন্নীত হতে পারেন। জীবিকা যাই হোক, সেইখান থেকেই মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও অন্তরের সত্ত্বগুণের বিকাশ ঘটিয়ে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার চরম অবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ।।৪৫

স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্মণি (বর্ণাশ্রমোচিত কর্মে) অভিরতঃ (নিষ্ঠাবান) নরঃ (মানব) সংসিদ্ধিং (জ্ঞান ও যোগ্যতায় সিদ্ধি) লভতে (লাভ করে) স্বকর্ম-নিরতঃ (স্বকর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তা) শৃণু (শোন) ।।৪৫

নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করে সিদ্ধিলাভ করে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বকর্মে নিষ্ঠাবান মানুষ যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে তা শোন।

মানুষ তার স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্যকরূপে অনুষ্ঠান করলেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে অর্থাৎ পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ লাভ করতে পারে। মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। এই পরমপুরুষার্থ লাভই সিদ্ধি।

সকাম কর্ম বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করলে মানুষ বন্ধনমুক্ত হয় এবং কর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। সাধারণত বেদে পঞ্চ ধর্মের কথা বলেছে—বর্ণধর্ম—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপনয়ন ইত্যাদি বিশেষ ধর্মসকল। আশ্রমধর্ম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আদি অবশ্য পালনীয় বিশেষ ধর্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম—যাঁরা বর্ণ ও আশ্রম উভয়কে আশ্রয় করে থাকেন। গৌণধর্ম—ক্ষত্রিয় ধর্ম, রাজকর্ম ইত্যাদি। নৈমিত্তিক ধর্ম—প্রায়শ্চিত্তরূপ বৈদিক ক্রিয়া-সকলের অনুষ্ঠান। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান করলে সকলেরই পরম কল্যাণ হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধ কার্য করলে নরকাদি গতি হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি ও পরিশেষে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়।

ভগবান বলছেন—স্বধর্মের পালন বা স্বীয় স্বভাবজ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করে ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হয়ে থাকে। তার জন্য সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সত্ত্বগুণে চিত্ত নির্মল ও মনে প্রকৃত শান্তি আসে। তারপর সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করে গুণাতীত অবস্থায় মোক্ষলাভ হয়। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাধন-সাপেক্ষ কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে গুণাতীত অবস্থা লাভ করা সম্ভব।

কাজেই স্বধর্ম অর্থাৎ স্বভাবপ্রসূত কর্মের কৌশল বা উপায় সাত্ত্বিক হলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে কর্মের একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। মানুষ জন্ম গ্রহণ করে একটা বিশিষ্ট স্বভাব নিয়ে, কিন্তু পরবর্তিকালে শিক্ষা, সাধনা ও কর্মের উপায়-কৌশল, পরিবেশ ও উদ্যমের দ্বারা স্বভাব পরিবর্তন করা সম্ভব। জন্মকালে শিশু তার স্বভাব পিতামাতার কাছ থেকে আংশিক পেয়ে থাকে কিন্তু বেশির ভাগ স্বভাব তার পূর্বজন্মের স্বভাব থেকে প্রাপ্ত। এই স্বভাব পরিবর্তনীয় এবং মানুষ

নিজেই নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ক্রমশ তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে। নিম্নতম স্বভাব থেকে উচ্চতম স্বভাব লাভ করতে পারে। মানুষ প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতির গুণই তার স্বভাবকে প্রভাবিত করে। গুণগত স্বভাবের ঊর্ধ্বে আত্মা বিরাজ করছেন। আত্মার শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবকে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব এবং আত্মার শক্তিতেই আত্মাকে লাভ করতে হয়। তাই ভগবান বলছেন, আনন্দের সঙ্গে নিজের নিজের কর্মে নিযুক্ত থেকে, নিজ নিজ কর্মে সুখী হয়ে, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে হবে। যে কর্মেই আমরা নিযুক্ত থাকি না কেন, তার মাধ্যমেই আমরা পূর্ণতা লাভ করতে পারি। নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করলে সিদ্ধির চরম শিখরে অবশ্যই পৌঁছাতে পারব। অতএব নিজ নিজ স্বভাবযুক্ত স্বধর্ম-কর্মের দ্বারাই আমাদের আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।।৪৬

যতঃ (যা হতে) ভূতানাং (প্রাণিসকলের) প্রবৃত্তিঃ (উৎপত্তি বা কর্মপ্রচেষ্টা) যেন (যাঁর দ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) মানবঃ (মানব) স্বকর্মণা (নিজ নিজ কর্মদ্বারা) তম্ (সেই পরমেশ্বরকে) অভ্যর্চ্য (সম্যগ্‌ভাবে অর্চনা করে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) ।।৪৬

যা হতে অর্থাৎ যে অন্তর্যামী পুরুষ হতে প্রাণিগণের উৎপত্তি বা জীবের কর্মপ্রচেষ্টা, এবং যাঁর দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সবকিছু ব্যাপ্ত, তাঁকে মানব নিজ কর্মদ্বারা উপাসনা করে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

'যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং'—যাঁর কাছ থেকে অর্থাৎ যে পরম সত্তা থেকে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছে, 'যেন সর্বম্ ইদং ততম্'—যাঁরা দ্বারা ব্যক্ত জগতের সবকিছুই পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ সেই পরম ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুকণার মধ্যে বর্তমান। ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, অনন্ত এবং অদ্বিতীয়। জগতের ভিতরে, বাইরে, প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যেই সেই ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। ব্রহ্ম আমাদের সবচেয়ে নিকট বস্তু। 'স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য'—তাঁকে অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে নিজের কর্ম দ্বারা অর্চনা এবং স্মরণ-মনন করে উপলব্ধি করা।

ভগবান প্রত্যেক মানুষকে এক পরম আশ্বাসবাণী শোনালেন—হে মানব, তুমি তোমার নিজের কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের সাধনা করে তাঁকে লাভ কর অর্থাৎ তোমার স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে সম্পাদন করলে পরম সিদ্ধিলাভ করা তোমার পক্ষে সহজ হবে। এখানে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ প্রকৃতির অজ্ঞান হতে মুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞানলাভ, অহং-এর ক্ষুদ্র গণ্ডি ভেঙে ভূমা বা ঈশ্বরকে লাভ অর্থাৎ মুক্ত স্বাধীন জীবন লাভ। তবে এখানে সকল বর্ণের কর্মীকে মনে রাখতে হবে—আসক্তি ত্যাগ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে স্বভাবজ সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে সম্পাদন

করলে মুক্তিলাভ সম্ভব। তাই ভগবান বলছেন—যাঁর থেকে ভূতগণের উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি এই জগৎব্যাপী আছেন সেই পরমেশ্বরকে নিজ স্বভাবনিয়ত কর্ম দ্বারা অর্চনা করলেই মানুষ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হবে।

মানুষ যখন অনন্যচিত্ত হয়ে, তার সমস্ত কর্মদ্বারা ভগবানের আরাধনা করে তখন ভগবানের কৃপায় তার চিত্ত শুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের উদয় হতে থাকে এবং রজঃ, তমঃ গুণ নিরস্ত হয়ে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ঘটে। পরে সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করে সে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে মুক্তিলাভ করে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ।।৪৭

বিগুণঃ (দোষযুক্ত হলেও) স্বধর্মঃ (নিজ আশ্রম ও বর্ণবিহিত ধর্ম) সু-অনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরের ধর্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) স্বভাব-নিয়তং (স্বভাবজাত বা স্বাভাবিক গুণানুসারী) কর্ম (কার্য) কুর্বন্ (করে) লোকঃ (লোক) কিল্বিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ।।৪৭

স্বধর্ম দোষযুক্ত হলেও নিজ নিজ ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম করে লোক পাপভাগী হয় না।

আমার নিজের যে ধর্ম (বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম) আছে, তা আমি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছি না, কিন্তু অন্যের ধর্ম ভাল মনে করে যথাযথভাবে পালন করছি। ভগবান বলছেন, এটা ঠিক নয়, কারণ তোমার স্বধর্ম অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। গীতার মতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজ কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করাই তার কর্তব্য। নিজের স্বধর্ম বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল না দেখালেও তা পালন করা অবশ্যই কর্তব্য। এমন হতে পারে যে, কারও স্বাভাবিক কর্ম লোকদৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, হয়তো ঐ কর্মের অনুষ্ঠান অতি ক্লেশকর, হয়তো বৈষয়িক ব্যাপারে তা মোটেই লাভজনক নয়, আরও অন্যান্য কারণে তার সম্যক অনুষ্ঠান সম্ভবপর নয়। এরূপ স্থলে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম শ্রেয়। কারণ যে যে গুণ বা শক্তির তুমি অধিকারী, স্বধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই সেই সেই গুণ বা শক্তির সদ্ব্যবহার এবং সুপ্রয়োগ তুমি করতে পারবে। তার দ্বারা তুমি তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সামাজিক উন্নতি করতে সক্ষম হবে। স্বধর্ম দোষযুক্ত হলেও কিংবা প্রাণিবধাদি দোষযুক্ত হলেও তার অনুষ্ঠানে পাপ হবে না।

নিজের কর্তব্যকর্ম বা ধর্ম ছেড়ে অন্যের কর্ম অনুসরণ করা অনুচিত। নিজের নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমেই আমরা নিজেদের আত্মাকে প্রকাশ করব। তাতে যদি কোনও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি হয় হোক, তবুও আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম ছেড়ে অন্য কোনও ধর্মের পিছু

ছুটব না। 'স্বভাব-নিয়তং কর্ম কুর্বন্'—স্বভাবজাত কর্ম করে, 'ন আপ্নোতি কিল্বিষম্'—কারো পাপ হয় না। অন্যের ধর্ম পালন করা বিষময়। নিজের ভাবে ও ধর্মে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা চাই। অপরের ধর্ম ও কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শক্তির অপপ্রয়োগ ও অপচয় হেতু নিজের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি ব্যাহত হয় ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

আমাদের দৃঢ়ভাবে বুঝতে হবে যে, স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম। যার যা কর্তব্যকর্ম তাই তার স্বধর্ম। অর্জুনের পক্ষে স্বধর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দিষ্ট যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম, এবং পরধর্ম অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি ও কৃষিকর্ম বা বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম পালন করা কখনই উচিত নয়। 'স্বভাবনিয়তং'—অন্তরের প্রবণতা দ্বারা আদিষ্ট হয়ে আমরা যা করি সেটি স্বভাবজাত কর্ম। আমাদের স্বভাব প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা প্রভাবিত। তাই শাস্ত্রে চার বর্ণের কর্ম এই গুণানুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং 'স্বভাবনিয়তং কর্ম' বলতে শাস্ত্রবিহিত চার বর্ণের ধর্মই বুঝায় এবং এই স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক অনুষ্ঠান করলে লোকে পাপভাগী হয় না।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ।।৪৮

কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়! কুন্তীপুত্র) স-দোষম্ অপি (দোষযুক্ত হলেও) সহজং কর্ম (স্বধর্ম, স্বভাবজাত কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করা উচিত নয়) হি (যেহেতু) সর্ব-আরম্ভাঃ (সকল কর্মই) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির মতো) দোষেণ আবৃতাঃ (দোষের দ্বারা আবৃত)।

হে কৌন্তেয়, স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, অগ্নি যেমন (সতত) ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তেমনি সকল কর্মই ত্রিগুণাত্মক বলে দোষযুক্ত।

'সহজং'—যে কর্ম জন্মগত তাই সহজং কর্ম বা স্বাভাবিক কর্ম অর্থাৎ নিজের প্রকৃতি দ্বারা প্রণোদিত বা উৎসাহিত হয়ে যে-কর্ম করা হয়। এই জাতীয় কর্ম 'সদোষম্ অপি' অর্থাৎ দোষযুক্ত হলেও, 'ন ত্যজেৎ'—ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ সব কর্মই কোনও না কোনও দোষের দ্বারা আবৃত। কোনও কাজই দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়—'সর্বারম্ভা হি দোষেণ আবৃতাঃ'। স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কোনও একটা দোষ থাকলেও তাতে ক্ষতি হবে না।

অতএব তুমি তোমার স্বভাব-অনুযায়ী কর্ম করে যাও। তাতে যদি ভুলত্রুটি হয়, 'দোষ' থেকে যায়, তবুও তা তুমি ত্যাগ করো না। কারও পড়াশুনা ভাল লাগে, কারও হাতের কাজ ভাল লাগে—কত রকমের স্বভাব আমাদের। সেই স্বভাব-অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে। সবার এক কাজ ভাল লাগে না। তবে এটা দেখা যায় যে, প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ করার একটা প্রবৃত্তি রয়ে গেছে। এক মুহূর্তও আমরা কেউ কাজ না করে

থাকতে পারি না। মানুষের প্রকৃতিই হলো কাজ করা। প্রকৃতির গুণে মানুষ অবশ হয়ে কাজ করে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তোমার প্রকৃতিই তোমায় কর্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর, আর নাই কর। আমরা শরীর দিয়ে যতটা না কাজ করি, মন দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কর্ম সকলেই করে—তাঁর নামগুণগান করা এও কর্ম, সোঽহংবাদীদের 'আমি সেই' এই চিন্তাও কর্ম—নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার যো নাই।' সেইজন্য কর্ম করেই আমরা কর্মব্যূহ ভেদ করব। কর্মের দ্বারাই আমাদের যত সঞ্চিত কর্ম আছে, যার ফলে আমাদের এই জন্ম হয়েছে, হয়তো আরও জন্ম হবে, তা আমরা খণ্ডন করব। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব। সেইজন্যই কর্মযোগ—অর্থাৎ কর্ম করবার কৌশল। অনাসক্ত হয়ে স্বধর্ম সম্পাদন করার নাম কর্মযোগ।

নির্দোষ কর্ম বলে জগতে কিছুই নেই। এই জগৎ ত্রুটিপূর্ণ, একটি বস্তু আত্মা ছাড়া আর কোনও কিছুই নিখুঁত নয়। ত্রুটিপূর্ণ কর্মের ভিতর দিয়েই আমাদের আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে। অপূর্ণতার মধ্য থেকেই অবিকৃত, বিশুদ্ধ সেই পূর্ণ সত্তাকে আবিষ্কার করতে হবে। এই শরীরের বিনাশ আছে, বিকার আছে, দোষ আছে, কিন্তু এই শরীরের সাহায্যেই আমরা অবিকারী, বিশুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি। সীমার মধ্য দিয়েই আমাদের অসীমে পৌঁছাতে হবে। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এই সংসার কাজলের ঘর। কালি গায়ে লাগবেই লাগবে। কর্মজগতে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হওয়া যায় না। সকলের কাজে কিছু না কিছু দোষ থাকবে। তাই ভগবান বলছেন, কর্ম স্বভাবতই দোষযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ কর্মের মাধ্যমেই, অনিত্য শরীরের সাহায্যেই অনন্ত, শুদ্ধ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়। অনেকে কর্ম পরিত্যাগের উপদেশ দেন, কিন্তু গীতার মতে স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হলেও মানুষ কর্ম ত্যাগ করবে না। কামনাশূন্য হয়ে, আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করলে, এই কর্মই মোক্ষের অনুকূল হবে এবং জ্ঞানলাভের সহায়ক হবে।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ।।৪৯

সর্বত্র (সকল বিষয়ে) অসক্ত-বুদ্ধিঃ (অনাসক্তভাবযুক্ত) জিতাত্মা (সংযতচিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) (ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মফল-ত্যাগদ্বারা) পরমাং (পরম বা শ্রেষ্ঠ) নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিম্ (নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি অর্থাৎ কর্মবন্ধনক্ষয়রূপ অথবা ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিরূপ পরমসিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।।৪৯

যিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত, সংযতচিত্ত, বিগতস্পৃহ—দেহ ও জীবনে নিঃস্পৃহ, তিনি অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-লাভ করেন।

'অসক্তবুদ্ধিঃ'—আসক্তিশূন্য বুদ্ধি অর্থাৎ যিনি সর্ববিষয়ে দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও ধন

ঐশ্বর্য ইত্যাদি বিষয়ে অনাসক্ত। যিনি নিজের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান বিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়ে বিষয়ে দোষদর্শনপূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করে, একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং নিষ্কাম কর্ম করে যাঁর চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হয়েছে, তিনিই সন্ন্যাসী হয়ে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করে থাকেন।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বলতে যে-ব্যক্তির আপনা-আপনি কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ কর্মদ্বারা পুনঃপুন জন্মমৃত্যুর অধীন হয়ে থাকে। কর্মফলের দ্বারা মানুষের দেহধারণ, আবার দেহধারণ হলেই পুনরায় কর্ম, আবার সেই কর্মের ফলে পুনর্জন্ম। এই কর্ম-বন্ধন হতে মুক্তিই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে কর্মত্যাগ অর্থাৎ পূর্ণ আসক্তি ত্যাগ হয়ে যায়। এই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করতে হলে চিত্ত আসক্তিশূন্য করে একমাত্র আত্মাতে স্থাপন করতে হবে। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতেই প্রকৃত শান্তি, কারণ উক্ত ব্যক্তি 'জিতাত্মা'—নিজেকে জয় করেছেন, 'বিগতস্পৃহঃ'—সমস্ত স্পৃহা জয় করেছেন। ভোগ করার আসক্তি ত্যাগ করেছেন। এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি সব কর্ম করেও বোধ করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছেন না। এইরূপ কর্মবন্ধন-মুক্ত হয়ে কাজ করলে সেই কাজ জগতে প্রকৃত মঙ্গল ও শান্তি আনে। তখন কর্ম আধ্যাত্মিক নিপুণতা ও আধ্যাত্মিক কুশলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেটাই প্রকৃত কর্মযোগ। স্বার্থ বা অহং-কেন্দ্রিক বুদ্ধি তাঁর থাকে না, অনন্ত আত্মার শক্তিতে শক্তিমান তাঁর বুদ্ধি অর্থাৎ তখন তাঁর আত্মবুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে। অনাসক্তিতে জগতে প্রকৃত কল্যাণ ও সুখের ভাবনা আমরা ভাবতে পারি। ভগবান এইরূপ মানসিক গঠন ও আত্মবুদ্ধির প্রকাশের কথা বলছেন। তবেই সমাজে সঠিক আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে কর্ম-বেদান্তের সুস্থ দর্শন প্রতিফলিত দেখতে পাব।

শাস্ত্র উপদেশ দেয়—শম, দম, উপরতি (সন্ন্যাস), তিতিক্ষা (ক্লেশসহিষ্ণুতা) ও একাগ্রতা-সহ অন্তঃকরণে আত্মাকে দর্শন করতে হবে, তবেই চৈতন্যস্বরূপ লাভ হবে। তাই সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। শাস্ত্র বলে, একমাত্র আত্মজ্ঞান সাধনের জন্যই বিবিদিষা সন্ন্যাসে বিবেকী পুরুষের অধিকার আছে। সন্ন্যাসীরা কাম্যকর্মের ত্যাগ করবেন। কিন্তু নিত্যকর্ম কামনাশূন্য হয়ে করবেন। লোকশিক্ষার জন্য নিত্যকর্ম বা দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ম করা।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ।।৫০

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপ) ব্রহ্ম আপ্নোতি (পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন) যা (যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরা নিষ্ঠা বা চরম পরিসমাপ্তি) তথা (তা অর্থাৎ সেই জ্ঞাননিষ্ঠাক্রম) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শোন)।।৫০

হে কৌন্তেয়, এইরূপে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হন তা আমার কাছে সংক্ষেপে শ্রবণ কর, সেটাই জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা বা চরম পরিসমাপ্তি।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কী করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সেই কথা ভগবান এখন বলবেন। মানব বর্ণাশ্রম কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করে এবং ঈশ্বরের কৃপায় সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করে ও অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করে থাকে। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং শ্রবণ ও মনন রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ ব্রহ্মের ন্যায় সম, শান্ত, নির্বিকার, অদ্বয়, অনন্ত অবস্থা লাভ করা। এটাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। এটাই ব্রাহ্মী-স্থিতি।

মানুষের যে জ্ঞানের অন্বেষণ শুরু হয় অপরা জ্ঞান দিয়ে, তা শেষ হয় পরা জ্ঞান লাভ করে। ব্রহ্মজ্ঞানই পরা জ্ঞান। বেদান্ত বলেন ব্রহ্মজ্ঞান চরম পরিণতি বা পরাকাষ্ঠা। পরা জ্ঞান, আত্মার জ্ঞান বা একত্বের জ্ঞান। আমরা যে স্বরূপত এক, সেটাকে জানা। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক অনন্ত আত্মাই বিরাজ করছেন এবং সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতা ব্রহ্ম-অনুভূতিতে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন—এই অদ্বয়, অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান কীকরে লাভ করা যায়, সেই কথা আমি তোমাকে বলব। স্বধর্ম-কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, অনাসক্ত হয়ে মানুষ কীভাবে শেষপর্যন্ত ব্রহ্মের সাথে একত্ব অনুভব করে, সেই কথা ভগবান অর্জুনকে বলবেন।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।।৫৩

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা (বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হয়ে) ধৃত্যা (ধৈর্যসহকারে) আত্মানং (মনকে) নিয়ম্য (সংযত করে) শব্দাদীন্ চ (শব্দপ্রভৃতি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (এবং রাগদ্বেষ-পরিত্যাগ করে) বিবিক্তসেবী (নির্জন স্থানবাসী হয়ে) লঘু-আশী (মিতাহারী) যত-বাক্-কায়-মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করে) নিত্যং (নিত্য, সদা) ধ্যানযোগপরঃ (ধ্যানযোগপরায়ণ হয়ে) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য-অবলম্বন করে) অহংকারং বলং (দাম্ভিকতা ও পাশবিক বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (পরিগ্রহ অর্থাৎ দানাদি গ্রহণ) বিমুচ্য (ত্যাগ করে) নির্মমঃ (মমত্ববুদ্ধিহীন বা মমতাবুদ্ধিবিহীন) শান্তঃ (প্রশান্তচিত্ত) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবলাভে) কল্পতে (যোগ্য হন)।।৫১-৫৩

বিশুদ্ধ নির্মল বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, সাত্ত্বিক ধৈর্যদ্বারা বুদ্ধিকে নিশ্চল করে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়মনকে সংযত করে, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ ত্যাগ করে, আসক্তি ও দ্বেষ বর্জনপূর্বক, শুচিভাবে নির্জনস্থানে বাস এবং মিতাহার দ্বারা বাক্য, মন ও শরীর সংযত করে, সর্বদা ধ্যানযোগ-পরায়ণ হয়ে, বিষয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক, অহংকার, বল (পাশবিক বল), দর্প, কাম (দুরভিলাষ), ক্রোধ এবং পরিগ্রহ অর্থাৎ ভোগোপকরণ পরিত্যাগ করে, নির্মম অর্থাৎ দেহাদি ও বিষয়ের প্রতি মমত্ববোধহীন ও প্রশান্তচিত্ত হয়ে যে সাধক জীবন-যাপন করেন তিনি ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।।৫১-৫৩

ব্রহ্মভাব কী প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় এখানে সেই কথা ভগবান বলছেন। আমাদের বুদ্ধির দুই প্রকার গতি—নিম্নগামী বা মলিন এবং ঊর্ধ্বগামী বা বিশুদ্ধ। মন-বুদ্ধি নিম্নগামিনী হলে তাকে অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। বুদ্ধি ঊর্ধ্বগামী হলে তাকে বিশুদ্ধ বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হয়। ধৃতি বলতে বোঝায় নিশ্চিত সংকল্প। দৃঢ় সংকল্প মনের অশান্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে এবং সৎ প্রবৃত্তিগুলিকে নিশ্চিতরূপে দৃঢ়রূপে স্থির করে। অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয় ও মন কামনা-বাসনাময় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তখন আত্মা আমাদের প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। এই মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে সংযত ও বিশুদ্ধ করতে না পারলে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা অসম্ভব।

প্রথমে সাধককে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হতে হবে। তারপর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম এরূপ সিদ্ধান্তবাক্যে বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয় হতে চিত্তকে প্রত্যাহার করে, যিনি বিষয়সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করার যোগ্য।

যিনি লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক পবিত্র নির্জন স্থানে বাস করেন, যিনি দেহধারণোপযোগী পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, যিনি যম, নিয়ম ও আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করেছেন, যিনি সদাই ধ্যানযোগ সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁর চিত্ত আত্মচিন্তনে নিমগ্ন থাকেন, যাঁর চিত্তবৃত্তি বিষয়-ভোগবাসনায় ধাবিত হয় না, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ।

আমি ভাল, উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, আমার সমকক্ষ কেউ নেই ইত্যাদি অহঙ্কার যাঁর নাই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ কর্মের প্রবণতা যিনি পরিত্যাগ করেছেন, ভাল কর্ম করেও যিনি দর্প করেন না, আনন্দে যিনি মত্ত হন না, যাঁর এই লোকে এবং অপর অর্থাৎ স্বর্গলোকে ভোগের কামনা নেই, যিনি কারও প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধ হন না, স্পৃহাশূন্য হয়ে যিনি শরীরমাত্র রক্ষা করবার নিমিত্ত বাহ্যসুখ ভোগ করেন, কোনও দান গ্রহণ করেন না, যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্যাগের জীবন গ্রহণ করেছেন, নির্মম অর্থাৎ দেহ ও বিষয়ে মমত্বহীন এবং অহং বা মমত্ব বুদ্ধির দ্বারা হর্ষ ও বিষাদে যাঁর চিত্তের কোনও বিক্ষেপ হয়

না, ঐরূপ জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করার উপযুক্ত। কর্ম ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই এই দুর্লভ অবস্থাটি লাভ করা যায়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।।৫৪

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত) প্রসন্ন-আত্মা (প্রসন্নচিত্ত) (যোগী) ন শোচতি (শোক করেন না অর্থাৎ কোনও বস্তুনাশে শোকান্বিত হন না) ন কাঙ্ক্ষতি (কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতের প্রতি) সমঃ (সমদর্শী হয়ে) পরাম্ মদ্ভক্তিম্ (আমাতে পরা ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ।।৫৪

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হলে যোগী বা সাধক প্রসন্নচিত্ত হয়ে অনিত্য বস্তুর জন্য শোক করেন না বা অপ্রাপ্ত-বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হন এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

ভগবান বলছেন—যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হন না ও কোনও প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমাতে পরাভক্তি লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ যিনি বেদান্তবাক্য শ্রবণ-মনন ও বিচার দ্বারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-—এই মহাবাক্য-তত্ত্বে নিশ্চয়জ্ঞান লাভ করেছেন, শম ও দম ইত্যাদি সাধন করে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা প্রসন্নাত্মা হয়েছেন, যাঁর দেহাভিমান না থাকায় কোনও প্রকার শোকের উদয় হয় না, যিনি ভোগের জন্য কোনও বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, যাঁর কাছে প্রিয়, অপ্রিয়, নিজের বা অপরের নিগ্রহ, অনুগ্রহ সকল অবস্থায় সমান, যিনি তৃণ হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আত্মদৃষ্টিতে সকল ভূতে সমান বোধ করেন—এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই ভগবানে পরাভক্তি লাভ করে থাকেন। মানুষ শুরুতে ভগবানের আরাধনা করেন গৌণ ভক্তির দ্বারা। কিন্তু কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এর সাধনের পরিণাম পরাভক্তি লাভ।

ভগবান বলছেন, ব্রহ্মভূত সাধকের আত্মা প্রসন্নভাব ধারণ করে আনন্দময় হয়ে যান। তিনি সর্বপ্রকার শোকদুঃখের অতীত হয়ে শান্তভাবে অবস্থান করেন। সকল ভূতে তিনি সমভাবাপন্ন হন। অর্থাৎ সকল জীবে এক আত্মার অবস্থিতি জেনে তিনি সকলকে নিজের মতো দেখেন। এই প্রকারের প্রসন্নচিত্ত, শোকদুঃখরহিত, কামনাহীন, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন ব্রহ্মভূত সাধক আমাতে (পরমেশ্বর বা ঈশ্বরে) পরা-ভক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান বা শুদ্ধাজ্ঞান, শুদ্ধাভক্তি বা ঈশ্বরভক্তিতে পরিণত হয় অর্থাৎ উভয়ই এক।

পূর্বে বলা হয়েছে ব্রাহ্মীস্থিতি, স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা 'ব্রহ্মভূতঃ'—এমন ব্যক্তি যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছেন, 'সমঃ সর্বেষু ভূতেষু'—সকল জীবের সঙ্গে তিনি একাত্মবোধ করেন। সাম্য ও ঐক্যবোধে তিনি প্রতিষ্ঠিত। একত্বের অনুভূতি হলে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়। তখন আমরা একসূত্রে গাঁথা, তখন সকলের সঙ্গে শুদ্ধ প্রেমের

সম্পর্ক হয়। তখন তিনি 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'—ঈশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মাতে তিনি পরাভক্তি লাভ করেন। জ্ঞানী এক আত্মাকে সকলের মধ্যে দেখেন এবং সকলকে আত্মাতে দেখেন-—তখন তাঁর মধ্যে প্রেমই স্ফুরিত হয়। ঈশোপনিষদ্ বলছেন—'ততো ন বিজুগুপ্সতে'—তখন কারও প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না। ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সেই কথাই বলছেন--'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'—তিনি সেই পরম ভক্তি লাভ করেন বা আমাতে নিবদ্ধ। প্রকৃত ভক্ত দেখেন ভগবান সর্বভূতে বিরাজ করছেন। এমন ভক্তের মনে ঘৃণার স্থান নেই—শুধুই প্রেম আর করুণা। তিনি দেখেন ভগবানই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। এই অবস্থায় ভগবান পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেম, অনুভূতি এবং অহেতুকী ভক্তিই পরাভক্তি।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ।।৫৫

(সাধক) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (বিশেষরূপে জানেন) যাবান্ (যে যে রূপে) চ (এবং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপত) যঃ (যে-সচ্চিদানন্দঘন) অস্মি (আমি হই সেইরূপে) ততঃ (তারপর) মাম্ (আমাকে) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) জ্ঞাত্বা (জেনে) তদনন্তরম্ (তৎপর) বিশতে (প্রবেশ করেন—অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হন) ।।৫৫

সাধক সেই পরাভক্তি দ্বারা আমি কে, আমার স্বরূপ কী এবং আমি যে রূপ অর্থাৎ আমার প্রকাশ কী তা যথার্থরূপে জানতে ও বুঝতে পারেন। এইভাবে আমাকে যথার্থরূপে জেনে তিনি তদনন্তর প্রেমভক্তিবলে আমার সঙ্গে যুক্ত হন অর্থাৎ আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপতা-প্রাপ্ত হন।

সাধক পরম জ্ঞান ও পরাভক্তি দ্বারাই ভগবানকে যথার্থরূপে জানতে পারেন। পরমজ্ঞান ও পরাভক্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। ভগবানের স্বরূপ এবং বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সমস্তই জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই জানতে পারেন। জ্ঞানের সাধনে অপরোক্ষানুভূতিতে পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। 'ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি তত্ত্বতঃ'—পরাভক্তি দ্বারা ভক্ত আমার যথার্থ স্বরূপ জানতে পারেন। 'যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ'—আমি কে এবং আমার স্বরূপ কী অর্থাৎ ভগবান এই বিশ্বে কি কি রূপে অভিব্যক্ত হয়েছেন এবং তাঁর স্বরূপটিই বা কী? তিনিই নিত্য এবং তিনিই লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, নিত্য এবং লীলা একই বস্তু। তিনিই সগুণ, আবার তিনিই নির্গুণ। সর্বত্র তিনিই বিরাজ করছেন, তিনিই একমাত্র অনন্ত, শাশ্বত সত্তা। তিনি ছাড়া আর কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই—এই পরাভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকাশ সঠিকভাবে আমরা জানতে পারি।

'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা'—এইভাবে আমাকে যথার্থরূপে জেনে, 'বিশতে তদনন্তরম্'—তখন আমাতে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ তিনি আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

একদিন না একদিন সকলকেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে হবে। তখন আত্মজ্ঞানে ও আত্মানন্দে তিনি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হবেন। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হওয়া—'মদ্ভাবমাগতঃ'। ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃতির গুণরাজ্যের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হন—'বিশতে তদনন্তরম্'।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ।।৫৬

(সেই সাধক) সদা (সর্বদা) সর্বকর্মাণি (সকল কর্ম) কুর্বাণঃ অপি (করেও) মৎ-ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত) মৎ-প্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) শাশ্বতম্ (শাশ্বত, সনাতন, নিত্য) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) পদম্ (স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ।।৫৬

আমাতে আশ্রয় করে অর্থাৎ আমার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে সদা সকল নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসকল অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম-কর্ম করেও সেই ব্রহ্মভূত ভক্ত আমার কৃপায় নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।

ভগবান এখানে স্বধর্ম-কর্মদ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনালব্ধ মোক্ষলাভের উপায় বলছেন। যিনি সর্বদা সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেও আমার শরণাগত হন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়, চিত্তশুদ্ধি হলে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরের নাম করলে যখন রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।

ভগবানকে আশ্রয় করে তাঁর কর্ম সম্পাদন করা উচিত। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও পরিণতি স্বধর্ম কর্তব্য কর্ম যজ্ঞরূপে অর্থাৎ নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করা। সমস্ত কর্ম যজ্ঞরূপে ভগবানকে উৎসর্গ করা। কর্মী নিজেকে অকর্তা মনে করেন অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত কর্ম হচ্ছে, তিনি আত্মা, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, সাক্ষী। কর্মী উপলব্ধি করেন, প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি অতএব সমস্ত কর্ম ভগবানেই অর্পিত হয়, ভগবানই একমাত্র প্রভু। এই নিষ্কাম কর্ম তখন কর্মীকে সংসারে আবদ্ধ করতে পারে না। ভগবানের কৃপায় কর্মী শাশ্বত পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

গীতার মূল সুর হলো—কর্মের মাধ্যমে মানব চরম উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারেন। একমাত্র কর্মই জীবনে অগ্রগতির উপায়। এই শ্লোকে ভগবান জোর দিয়েছেন—ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে কর্ম করলে পরম সত্তার উপলব্ধি হয় এবং 'মৎ প্রসাদাৎ' —ঈশ্বরের অনুগ্রহে কৃপা লাভ সহজে আসে।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ।।৫৭

চেতসা (শুদ্ধচিত্তে, বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সকল কর্ম) ময়ি (আমাতে) সন্ন্যস্য (সমর্পণ করে) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হয়ে) বুদ্ধিযোগম্ (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করে) সততং (সর্বদা) মৎ-চিত্তঃ (অনন্যশরণ হয়ে, মদ্গতচিত্ত) ভব (হও) ।।৫৭

তুমি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে নিত্য-নৈমিত্তিক যাবতীয় কর্ম ফলসমেত আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্বক সতত সর্বাবস্থায় মদ্গতচিত্ত হও।

ভগবান বলছেন, তুমি মৎপরায়ণ হও। আমার উপর নির্ভর করে সব কাজ মনে মনে আমাতে অর্পণ কর। মনে করবে, 'আমি কর্তা' নই, ঈশ্বরের জন্য তাঁর ভৃত্যের মতো কাজ করছি।—এই বুদ্ধিতে সব কাজ করতে হবে। সেটাই হবে অনাসক্ত কাজ। সবই ঈশ্বরের কাজ। কর্মে আমার নিজের কোনও উদ্দেশ্য নাই। কর্ম আমার জন্য করছি না, ঈশ্বরের জন্য করছি। ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করব, ঈশ্বরের উদ্দেশে সব ফল সমর্পণ করব। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না। আমি শুধু কর্মের জন্য কর্ম করব। 'ঈশ্বরার্থম্' কর্ম করা।

লৌকিক বা বৈদিক যে সমস্ত কর্ম তুমি অনুষ্ঠান করবে, বিবেকযুক্ত বুদ্ধি বিচার দ্বারা সেই সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করবে। জগতের সমস্ত আশা-ভরসা পরিত্যাগ করে, কর্মফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করে, ঈশ্বরলাভের জন্য বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করে চিত্তকে সর্বদাই ভগবৎ প্রেমে আপ্লুত রাখবে। 'চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ'—মনে মনে তোমার সব কর্ম আমাতে সমর্পণ করে এবং নিজেকেও আমার কাছে সমর্পণ করবে।' শুধু কর্ম সমর্পণ নয়, ব্যক্তি নিজেকেও সমর্পণ করবে।

'বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য'—বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করে, 'সততং মচ্চিত্তঃ ভব'—সর্বদা আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে বুদ্ধিযোগ লাভ করা যায়। বুদ্ধি যা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। বুদ্ধির পেছনেই আত্মা বিরাজ করছেন। বুদ্ধি আত্মার খুব কাছে। বুদ্ধি যদি আত্মার সঙ্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তা 'বুদ্ধিযোগ'। তাই ভগবান বলছেন, তোমার বুদ্ধিকে আমার সঙ্গে যুক্ত করবে। মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হতে বুদ্ধিকে সরিয়ে আমাতে স্থাপন করবে। তা হলে তুমি তোমার অন্তর্নিহিত দিব্যস্বরূপ আত্মাকে জানতে পারবে। বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করলেই আমরা আমাদের আত্মশক্তিকে বিকাশ করতে পারব। আত্মা স্থির। মন যদি সেই আত্মায় নিবদ্ধ হয়, তাহলে মনও স্থির হবে। ভগবান বলছেন, তোমার মনটি আমাতে স্থির করে রাখ। সেখান থেকে আর যেন সরে না যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন—পশ্চিমের মেয়েরা মাথায় জলভর্তি ঘড়া নিয়ে হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে পথ চলে। মাথায় অত বড় বোঝা, তাতে মন পড়ে রয়েছে, কিন্তু অন্যের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, বাইরে কোনও মুখের বিকৃতি নেই। এটিই অভ্যাস ও কৌশল।

এরপর ভগবান বলছেন, 'মচ্চিত্তঃ'—তুমি মদ্গতচিত্ত হও—মনটি সম্পূর্ণভাবে আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অর্পণ কর। ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগত হয়ে বলবে—হে ভগবান! হে প্রভো! হে শরণাগতরক্ষক! তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষাকর্তা নাই, আমি তোমার শরণাগত, তোমাতে আমার সমস্ত কর্ম ও কর্মফল সমেত আমি নিজেকেও সমর্পণ করছি।

শরণাগতি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ। শরণাগত ভক্তকে শ্রীভগবান সর্বাবস্থায় রক্ষা করেন এবং তিনি তাঁর 'যোগ-ক্ষেম' বহন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শরণাগতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভগবানের প্রতি অনন্যশরণাগতি লাভ হলো পরমপ্রাপ্তি। ভগবানের অশেষ কৃপায় ভক্তের জীবনে অনন্যাশরণাগতি আসে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—তাঁর পাদপদ্মে সব অর্পণ কর, তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা হয় করুন।...শরণাগত ভক্তকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। যে ভক্ত ভগবানের ওপর একান্ত নির্ভর করেন ভগবান সর্বক্ষণ তাঁর হাত ধরে থাকেন—তাঁকে রক্ষা করেন। শরণাগতি বা ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই সাধক প্রকৃত জয় লাভ করে।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ।।৫৮

মৎ-চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হয়ে) মৎ-প্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (দুস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হবে) অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশত) ন শ্রোষ্যসি (আমার কথা না শোন) (তা হলে তুমি) বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশপ্রাপ্ত হবে) ।।৫৮

মদ্গতচিত্ত হলে আমার অনুগ্রহে সংসারে সকল প্রকার দুঃখ ও দুর্গতি হতে উত্তীর্ণ হবে। অর্থাৎ কর্মের শুভ-অশুভ ফল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর যদি তুমি অহঙ্কারে আমার কথা (উপদেশ) না শোন, তা হলে তোমার বিনাশ অনিবার্য অর্থাৎ তুমি পুরুষার্থ লাভ হতে ভ্রষ্ট হবে।

'মচ্চিত্তঃ'—সর্বদা মনটিকে আমার সঙ্গে যুক্ত রাখ। তা করলে 'সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'—সংসারের সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে। দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঈশ্বরের কৃপায় কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। সংসারে কাম, ক্রোধ, লোভ ও নানা বিষয় দ্বারা দুঃখ পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। যে নিজ পৌরুষ ও অহংকারে মত্ত হয়ে কর্ম করতে যায় সে আরও দুঃখে ডুবে যায়। আর যিনি ঈশ্বরের

শরণাগত হয়ে কর্ম করতে যান তাঁর আপনা-আপনি সকল দুঃখ দূর হয়। এই আমিত্ববোধ, কর্তৃত্ববোধই মানুষের জীবনে বিপদ ডেকে আনে। উগ্র আমিত্ববোধই মানুষে মানুষে দূরত্ব রচনা করে, মানুষকে ক্রমশ দুর্বল করে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষাই হলো—আমিত্বকে অতিক্রম করা।

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি নিজেকেই সমস্ত কর্মের কর্তা মনে করছ, তাই তোমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের বিয়োগের আশঙ্কায় তোমার চিত্ত ব্যথিত হয়েছে, গুরুজনবধজনিত পাপের ভয়ে তুমি ভীত হয়েছ, সংসারিক শোকদুঃখ তোমার চিত্তকে অভিভূত করেছে। তুমি এই সকল দুঃখ থেকে মুক্তির কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছ না। এসব দুর্গম, দুরতিক্রম্য বলে মনে হচ্ছে। কারণ তোমার চিত্ত এখনও সংসারে আবদ্ধ রয়েছে, তুমি অহং ও মমত্ববোধ ত্যাগ করতে পারছ না। কিন্তু তুমি যদি আমার শরণ লও, আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর অর্থাৎ সমস্ত হৃদয় আমাতে অর্পণ কর, তবে তুমি এই সমস্ত দুঃখ ও শোক-অশান্তির কারণ অতিক্রম করতে পারবে।

আমি তোমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছি, তোমার কর্তব্য কী তাও নির্দেশ করেছি। এইসকল উপদেশ শুনেও যদি অহংকারবশত আমার নির্দেশ পালন না কর, তবে তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তুমি সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হতে বঞ্চিত হবে, মোক্ষের পথে ভ্রষ্ট হয়ে সংসারে জন্মমৃত্যুর দুঃখে নিমজ্জিত থাকবে। তুমি তোমার সর্বনাশই ডেকে আনবে। আবার ভগবান বলছেন, আমি তোমাকে আদেশ করছি না, কেবল সদুপদেশ দিচ্ছি। কী করবে তা তুমিই ঠিক কর।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ।।৫৯

অহঙ্কারম্ (অহঙ্কার) আশ্রিত্য (আশ্রয় করে) ন যোৎস্য (যুদ্ধ করব না) ইতি (এরূপ) যৎ (যা) মন্যসে (তুমি মনে করছ) তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয় বা সংকল্প) মিথ্যা (নিষ্ফল হবে) প্রকৃতিঃ (তোমার ক্ষাত্রস্বভাব) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করবে)।।৫৯

তুমি অহঙ্কারকে আশ্রয় করে 'যুদ্ধ করব না'—এরূপ যা মনে করছ, তোমার এই সংকল্প মিথ্যা, প্রকৃতিই অর্থাৎ তোমার ক্ষাত্রস্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োজিত করবে।

'যৎ অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য'—যদি তুমি অহংকার আশ্রয় করে, আমার উপদেশ না শোন, এবং এরকম যদি মনে কর যে—'আমি যুদ্ধ করব না'—তাহলে তোমার সেই সংকল্প বৃথা অর্থাৎ তুমি মিথ্যা অভিমান করছ। তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ করাবে। যুদ্ধ করাই তোমার প্রকৃতি, সেই রজোগুণই তোমাকে কর্মে প্রবৃত্ত করবে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন—তোমার প্রকৃতি অতিমাত্রায় রাজসিক-কর্ম প্রবণ। সেই প্রবণতাকে

তুমি যদি জগতের কল্যাণে, জাতির সেবায় কাজে লাগাও, সেটিই হবে তোমার ক্ষাত্র-স্বভাবের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। কিন্তু তুমি যে কাজ করবে না বলছ, অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না—এই সংকল্পটি একেবারেই অর্থহীন। এ মিথ্যা সংকল্প। তোমার অভিমান বা অহংকার সেই প্রকৃতির গতিকে কিছুতেই রোধ করতে পারবে না।

মোহবশত তুমি যদি মনে কর তুমিই তোমার কর্মের কর্তা এবং কর্মসম্পাদনে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং অহংকারবশত যদি স্থির করে থাক যে, তুমি যুদ্ধ করবে না--তাহলে এই অহংকার মিথ্যা। কারণ তুমি স্বাধীন নও, তুমি তোমার প্রকৃতির বা স্বভাবের অধীন। তুমি ক্ষত্রিয়। শৌর্য বা বীর্য ও যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করাই তোমার স্বভাবজ গুণ বা কর্ম। ওই ক্ষত্রিয়-স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করবে। তুমি ইচ্ছা করলেও যুদ্ধ ছাড়তে পারবে না। আমরা সকলেই স্বভাব বা প্রবণতার দাস। তাই প্রবণতা শক্তিকে ভেবেচিন্তে, যুক্তি-সাহায্যে সঠিক দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র! অর্জুন), মোহাৎ (মোহবশত) যৎ (যা) কর্তুং (করতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (নিজের) কর্মণা (নিজ বৃত্তি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়োচিত কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ হয়ে) অবশঃ (অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অর্থাৎ অবশ হয়ে) তৎ অপি (তাও) করিষ্যসি (করবে) ॥৬০

হে কুন্তীপুত্র! মোহবশত তুমি যা করতে ইচ্ছা করছ না, স্বভাবজাত নিজবৃত্তি ক্ষত্রিয়োচিত কর্মপ্রবৃত্তিদ্বারা আবদ্ধ হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশ অবস্থায় তা তোমাকে করতেই হবে।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছেন না। যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে রাজ্যসুখ ভোগ করতে চাইছেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করছেন, স্বধর্ম ত্যাগ করতে চাইছেন বলে। উপদেশ দিচ্ছেন যাতে অর্জুন স্বধর্ম পালন করেন। আসলে ধর্মপথে যাঁরা চলতে শুরু করেন, তাঁদের অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমার বন্ধনের জন্য দায়ী যখন কর্ম, তাহলে আমি কর্মত্যাগ করি না কেন, যাতে নতুন করে বন্ধনে জড়াতে না হয়। এইজন্য আবার ধর্মকে অনেকে আক্রমণ করেন এই বলে যে, ধর্ম মানুষকে কর্মবিমুখ করে তোলে, মানুষকে কাপুরুষ করে তোলে—জীবনসংগ্রাম থেকে তাকে সরে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। কিন্তু গীতা কখনো নেতিবাচক বা কর্মবিমুখ হওয়ার উপদেশ দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, না, কর্ম ত্যাগ করবে কেন? কর্তব্য কর্ম করতে হবে। ঈশ্বরের চিন্তা ও নিত্যকর্মের সাথে সাথে সংসারের কর্ম, বিষয় কর্ম তাও করবে, সংসারযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলছেন, তুমি কাপুরুষের মতো আচরণ

করছ, যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য। এই কর্তব্য তুমি এড়িয়ে যেতে পার না। তুমি যে যুদ্ধ করবে না বলছ, এটা অহঙ্কার থেকে বলছ। তোমার এই সংকল্প মিথ্যা। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি'—তোমার প্রকৃতিই তোমাকে বাধ্য করবে কাজ করতে।

'স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা'—তোমার স্বভাবজাত কর্মের দ্বারা তুমি আবদ্ধ। যুদ্ধ করা তোমার স্বভাব, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। মোহবশত তুমি এখন যুদ্ধ হতে নিবৃত্তি চাইছ। অজ্ঞানতা বশত মনে করছ যে, যুদ্ধ করলে তোমার পাপ ও দুঃখ হবে তাই বলছ, গুরুজনদের হত্যা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও ভাল। তুমি আরও মনে করছ তুমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও তোমার মনের ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি কর্ম করতে পার। এসব তোমার ভ্রম। তুমি তোমার প্রকৃতি বা স্বভাবের অধীন, স্বভাবকে অতিক্রম করবার শক্তি তোমার নাই। তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার ক্ষত্রিয়-ধর্ম ও স্বভাব তোমাকে যুদ্ধে নিয়োজিত করবে।

'করিষ্যসি অবশোঽপি তৎ'—ভগবান অর্জুনকে বলছেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে সে কাজ করতে হবে। তুমি চাও আর নাই চাও, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে ঐ কাজ করতে বাধ্য করবে। স্বভাবের এত জোর যে, তুমি তার দ্বারা অবশ। তাই অসহায়ভাবে কর্ম করার চাইতে, জেনে-বুঝে বিচার করে করাই ভাল। স্বভাবকে সঠিক কর্মে নিয়োগ করতে হবে। স্বভাবধর্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম ভগবানের সৃষ্টি। অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম বা স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া। কিন্তু অর্জুনের মনে যে সংকল্পই উঠুক, তিনি ক্ষত্রিয়প্রকৃতির ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য করতে কখনও সমর্থ হবেন না।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১

অর্জুন (হে অর্জুন) ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী পরমেশ্বর) মায়য়া (মায়াদ্বারা) সর্বভূতানি (দেহধারী সকল প্রাণীকে) যন্ত্র-আরূঢ়ানি (ইব) (যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মতো) ভ্রাময়ন্ (ভ্রামিত করে বা পরিচালিত করে) সর্বভূতানাং (সকল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয় মধ্যে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন বা বিরাজ করেন) ॥৬১

হে অর্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তিদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মতো সকল জীবকে চালিত করছেন।

ঈশ্বর সবার অন্তরে বিরাজ করছেন। সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সকলকে তাঁর মায়াশক্তির সাহায্যে যন্ত্রের মতো ঘোরাচ্ছেন। তিনি চিরকাল রয়েছেন—রাজার গৌরবে তিনি সেখানে বিরাজ করছেন। কিন্তু আমি তা জানি না। বাইরে তাঁকে খুঁজছি, কেউ কেউ

আবার মোটেই খুঁজছে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছেন—এত গুণ বিদ্যাসাগরের, কিন্তু অন্তরে যে সোনা চাপা আছে, সেই সোনার সন্ধান তিনি পাননি। বলছেন—যদি সোনার সন্ধান পেতো, এত বাইরের কাজ যা করছে সে সব কম পড়ে যেতে। শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এ কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান-চিন্তায় মন যেতো। আমাদের সকলের ভিতরে সোনা রয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছেন। অথচ আমরা তা জানি না। তাই আমরা বাইরের দিকে ছুটছি, বাইরের ভোগসুখ নিয়ে মেতে আছি। একটা গানে বলা হচ্ছে 'নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী'—কস্তুরীর গন্ধে পাগল হয়ে হরিণ বনে বনে ছুটে বেড়ায়। সে জানে না যে, তার নাভির মধ্যেই কস্তুরী আছে।

তাই ভগবান বলছেন, তোমার মধ্যে কত বিরাট রত্নভাণ্ডার রয়েছে। নিজেকে তুমি চেন। তুমি নিজেকে দুর্বল, অক্ষম, মনে করছ। অথচ তোমার মধ্যে আমার অনন্ত শক্তি রয়েছে। তুমি আর আমি এক। এই তোমার প্রকৃত পরিচয়। তুমি দুর্বল নও, অক্ষম নও, পাপী নও। তুমি শুদ্ধ, তুমি পবিত্র, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন।

আমার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। জ্ঞানী বলবে, সব 'আমি' অর্থাৎ সব ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। ভক্ত বলবে, সব 'তুমি' অর্থাৎ ঈশ্বর। এই আমাদের প্রকৃত পরিচয়। কত বড় পরিচয় আমাদের! আমরা এই পরিচয়টা ভুলে আছি, তাই এত দুঃখ পাচ্ছি, দুঃখ দিচ্ছিও অন্যকে। আমরা যে দুঃখ পাই জগতে তাই নয়, আমরা দুঃখ সৃষ্টি করি। দুঃখ পাই আমার নিজের সত্য পরিচয়টি ভুলে থাকবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—জীবনের উদ্দেশ্য ঐ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর সেই পরিচয়লাভের যোগ্যতা বা অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সকলেই আমরা ঈশ্বরলাভ করতে পারি বা আমাদের অন্তরে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে পারি।

কিন্তু আমরা মহামায়ার বদ্ধ হয়ে আছি। নিজেদের সৃষ্ট জালে আমরা বদ্ধ হয়ে আছি। চেষ্টা করেও আমরা পালাতে পারছি না। মায়া আমাদের বেঁধে রেখে দিয়েছে। মায়ার দুটি শক্তি—আবরণী শক্তি ও বিক্ষেপী শক্তি। মায়া আমাদের ভিতরে যিনি রয়েছেন সেই অন্তর্যামীকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই আমরা সেই চিরনিত্য অন্তর্যামীকে দেখতে পাচ্ছি না। মায়াতে সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ বোধ হচ্ছে। মায়া হলেন অঘটনঘটনপটীয়সী। ঈশ্বরের কৃপাতেই ঈশ্বরের মায়াশক্তি দ্বার খুলে দেয়। তাই জ্ঞানপথেই হোক, বা ভক্তিপথেই হোক, মায়াকে প্রসন্ন করতে হয়। মহামায়ার দুই শক্তি—বিদ্যা শক্তি ও অবিদ্যা শক্তি। অবিদ্যা শক্তি জীবকে মুগ্ধ করে এবং বিদ্যা শক্তি—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের কৃপায় জীব মায়াকে অতিক্রম করে যায়।

উপনিষদ বলছেন, 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ' (শ্বেতাশ্বতর—৬-১১)—একই ভগবান সর্বভূতে গূঢ় অবস্থায় সর্বব্যাপী হয়ে অবস্থিত। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সকল কর্মের পরিচালক, সর্বভূতের অধিষ্ঠানস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, চেতন-স্বরূপ, নিরুপাধিক ও ত্রিগুণাতীত। ভগবানই জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তিনি জগতের একমাত্র পরিচালক। তাঁর মায়ায় তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ চালিত হচ্ছে। ঈশ্বরের মায়াশক্তির প্রভাবে মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এবং অবোধ মানুষ আরও মনে করে যে, স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবার ক্ষমতা আছে। মায়াশক্তির প্রভাবে মানুষ এরূপ ভ্রমে আবৃত।

ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে মানুষ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হয়ে পৃথিবীতে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বিচরণ করছে। বাজিকরের খেলা যেমন যন্ত্র-পুতুলগুলি অজ্ঞানে অবশ হয়ে বাজিকরের ইচ্ছামত অঙ্গসঞ্চালন করে, সেইরূপ ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে গোপনভাবে অবস্থিত থেকে তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে সকল জীবকে চালিত করছেন। এই মায়াই জীবের প্রকৃতি ও বন্ধন। মানুষ স্বভাবের দাস। স্বভাব প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁর অধীন। ঈশ্বরই প্রভু। তাই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই চালক। কিন্তু আমাদের বা সকল জীবের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমরা মনে করি, আমরা নিজেরাই নিজেদের চালনা করছি, আমরা আমাদের সকল গতি ও কার্যের নিয়ন্তা। এই অহংবোধ ও ভ্রান্ত ধারণার বশে প্রতিটি মানুষ নিজেকে কার্যের কর্তা মনে করে।

তাই শ্রীভগবান বলছেন—হে অর্জুন! তুমি বিশুদ্ধচিত্তে এই গুহ্য রহস্য অবগত হয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে স্বধর্ম কর্মে অগ্রসর হও। মূলতত্ত্বটি হলো, ঈশ্বরের শক্তি আমাদের ভিতর সক্রিয়। আত্মনির্ভর বা ঈশ্বরনির্ভর হওয়া প্রয়োজন, কঠোর পরিশ্রম করে অন্তরের আত্মশক্তি বা ঈশ্বরের শক্তিকে প্রকাশ করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে আত্মনির্ভর হয়ে পুরুষকার বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর জোর দিতে হবে। পরে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হলে শরণাগতি আসবে—'হে ঈশ্বর, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী', তখন উপলব্ধি হবে 'আমি নই, তুমি'। 'হে ঈশ্বর, তুমিই সব'।

গীতার শুরু থেকে শ্রী ভগবান বলছেন—'তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ'—হে অর্জুন, উঠে দাঁড়াও। শত্রুদের জয় করে যশলাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। কিন্তু এখন গীতার শেষে এসে ভগবান বলছেন—'তুমি কিছুই নও, যে ঈশ্বর তোমার ভিতর আছেন তিনিই সব।' আমাদের নিজস্ব কোনও শক্তি ও স্বাধীনতা নেই। আমাদের যে স্বাধীনতা আছে তা অতি সীমিত। সীমার বাইরে গিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। একমাত্র ঈশ্বর, যিনি তাঁর শক্তি দিয়ে জগৎ চালাচ্ছেন, তিনি সেই সীমার বাইরে নিয়ে যেতে পারেন। তাই পুরুষকারের শক্তি, সাহস, চরিত্রবল সবকিছুই শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় এক অপূর্ব

অনুভূতিতে যার নাম—শরণাগতি। অধ্যাত্মজীবনে চরম উপলব্ধি—ঈশ্বর দূরে নয়, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে। তিনিই আমাদের চালনা করছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২

ভারত (হে অর্জুন!) সর্বভাবেন (সর্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁরই) শরণং গচ্ছ (শরণ গ্রহণ কর) তৎপ্রসাদাৎ (তাঁর প্রসাদে বা অনুগ্রহে) পরাং (পরম) শান্তিং (শান্তি) শাশ্বতম্ (নিত্য) স্থানং (ধাম বা পদ) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হবে) ।।৬২

হে ভারত! সর্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁরই শরণাগত হও। তাঁর অনুগ্রহে তুমি পরমা শান্তি ও শাশ্বত আশ্রয় প্রাপ্ত হবে।

সকল জীবজগৎ এক পরমেশ্বরের অধীন, সেইজন্য অহংকার ত্যাগ করে সর্বতোভাবে সর্বান্তঃকরণে সেই পরমেশ্বরের শরণ নেওয়া কর্তব্য। তাঁর কৃপা-প্রসাদে মানব পরা শান্তি ও পরমেশ্বরীয় শাশ্বত আশ্রয় লাভ করবে। ঈশ্বরের মায়াশক্তি দ্বারা জীব পুত্তলিকাবৎ হলেও, ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করলে, তাঁর অনুগ্রহে জীব মুক্তিলাভ করতে সক্ষম। মায়া দ্বারা আবদ্ধ জীব যদি এই মায়া অতিক্রম করতে চায়, সংসার-সমুদ্র হতে উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছা করে, তবে তাকে ভগবানের শরণাপন্ন হতে হবে। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, হৃদয় তাঁর চরণে অর্পণ করে শরণাগত হতে হবে। তাঁকে আমাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করতে হবে। কেননা, তিনিই আশ্রিত ব্যক্তিকে কৃপাপূর্বক মায়ামুক্ত করে দেন। ভগবানই আমাদের সমগ্র সত্তাকে তাঁর জ্ঞান ও প্রেম দ্বারা পূর্ণ করে তাঁর নিকট তুলে নেবেন। আমাদের সমস্ত সংশয়, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত সঙ্কট দূর করে আমাদেরকে পরমশান্তি প্রদান করবেন। আমরা তাঁর শাশ্বত পদ লাভ করব। এটিই হলো হিন্দুধর্মের চরম শিক্ষা—ঈশ্বরের চরণে পূর্ণ আত্মনিবেদন। শাশ্বত পদ অর্থাৎ অদ্বৈত অবস্থা—জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়, অভিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থা নিত্য। পরমাত্মাকে লাভ করা। তাঁর কাছ থেকে আমরা এসেছি, আবার তাঁকেই লাভ করা অর্থাৎ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমাদের স্বরূপ যা, তাই হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের 'পরম ইচ্ছার' কাছে সমর্পণ করা। আমাদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। এটাই হবে প্রকৃত মুক্তি।

অহংকার না গেলে পূর্ণ শরণাগতি আসে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—জীবের অহংকারই মায়া, এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা'—এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নেই। এ সংসার কর্মক্ষেত্র, একহাতে ঈশ্বরের

পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর একহাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন শরণাগত হয়ে দু-হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩

ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হতেও) গুহ্যতরং (গুহ্যতর) জ্ঞানম্ (তত্ত্বজ্ঞান) তে (তোমাকে) ময়া (আমার দ্বারা) আখ্যাতম্ (কথিত হলো) অশেষেণ (নিঃশেষরূপে, সমগ্রভাবে) এতৎ (এ-বিষয়) বিমৃশ্য (পর্যালোচনা করে) যথা (যা) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (তেমনই) কুরু (আচরণ কর) ।।৬৩

আমি তোমার কাছে এই গুহ্য হতেও গুহ্যতর জ্ঞানের কথা গীতাশাস্ত্র দ্বারা উপদেশ করলাম। এ বিষয় তুমি নিঃশেষে বিচারপূর্বক যা ইচ্ছা হয় অর্থাৎ যা শুভ বিবেচনা কর তা-ই কর।

অর্জুন শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও শরণাগত ভক্ত। তাই ভগবান তাঁর প্রিয় ও শরণাগত ভক্তের কাছে অনেক জ্ঞানগর্ভ গুহ্য রহস্য ব্যাখ্যা করছেন। আত্মজ্ঞানই যে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের ফলস্বরূপ—সেকথা ভগবান বারবার করে বলছেন। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মানুষের ব্রহ্মানন্দরূপ নিত্যসুখ লাভ হয়। মানুষ নিষ্কামকর্মযোগে বর্ণাশ্রম-স্বধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যেমন আত্মজ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞানযোগে বেদান্তবাক্য বিচার, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাও আত্মজ্ঞান লাভ করেন। আবার ভক্তিতে নিষ্কামরূপ বর্ণাশ্রম-স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে, ভগবানের চরণে পূর্ণ শরণাগত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

ভগবান বলছেন, আমি যে উপদেশ দিয়েছি তা বিচার করে তুমি নিজেই তোমার কর্মপন্থা নির্ধারণ কর। শাস্ত্র আমাদের এটাই শিক্ষা দেয়—কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। যাতে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, কোনটি সত্য পথ। ভগবান তাই অর্জুনকে বলছেন—তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন—আমি আপনার শিষ্য, আপনি অনুগ্রহ করে আমায় সৎ উপদেশ দিন, যাতে আমি আমার সমস্যা দূর করতে পারি। 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'—আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন। তারপর থেকে গীতার শিক্ষা শুরু হয়েছে। গীতার শেষে এসে ভগবান অর্জুনের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে বলছেন—আমার যা উপদেশ দেওয়ার তা দিয়েছি, এখন তুমি সব দিক বিবেচনা করে যা উচিত মনে কর, তাই কর।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪

সর্বগুহ্যতমম্ (সকল গুহ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গুহ্য) মে (আমার) পরমং (পরম) বচঃ (বাক্য) ভূয়ঃ (পুনর্বার) শৃণু (শোন) (তুমি) মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও) ইতি ততঃ (সেজন্য) তে (তোমার) হিতম্ (হিতকর) (সার কথা) বক্ষ্যামি (বলব) ।।৬৪

আমার সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয়, এইজন্য তোমার যা প্রকৃত কল্যাণকর সেই সারকথা আবার বলছি।

এবার ভগবান বলছেন, হে অর্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতার্থ আমি পুনরায় তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুহ্যকথা বলব। তুমি তা শ্রবণ কর। এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছেন তা শ্রেষ্ঠ কথা, কিন্তু এখন তিনি যা বলবেন তা সর্বশ্রেষ্ঠ। গুহ্যতম অর্থাৎ গভীরতম বা পরম রহস্যজনক আধ্যাত্মিক কথা। এই পরম গুহ্যতত্ত্ব অত্যন্ত হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেয়ঃ বস্তু প্রাপ্তির সুখ নিত্য। তাই এই শ্রেয়ঃ বস্তুর জ্ঞান মানবজীবনের পক্ষে হিতম্ বা কল্যাণকর এবং প্রিয়ম্ বা পরমসুখদায়ক ও দুঃখনাশক। কিন্তু প্রেয়ঃ বস্তু আপাত সুখকর, আকর্ষক, উদ্দীপক, মনোহর কিন্তু অনিত্য। তা মানবজীবনে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। ক্ষণিক সুখ দেয় এবং দুঃখ বেশি বহন করে আনে। ভগবান শ্রেয়ঃ—সেই হিতকর, পরমসুখদায়ক সর্বশ্রেষ্ঠ গুহ্য জ্ঞানের কথা এখন বলবেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ।।৬৫

(তুমি) মন্মনাঃ (আমাতে মৎ-গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (একান্ত আমার ভক্ত) মদ্যাজী (একমাত্র আমারই পূজক) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর, অর্থাৎ আমাকে গুরু বা পূজনীয়রূপে অবনত-মস্তকে গ্রহণ কর) (আমি) তে (তোমার কাছে) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এতে কোনও সংশয় করো না) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ তুমি আমাকে পাবে) (কেন না, তুমি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়, স্নেহাস্পদ) ।।৬৫

তুমি আমাতে সমর্পিত-চিত্ত অর্থাৎ হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও—অর্থাৎ আমাকে পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি—তা হলে তুমি আমাকেই পাবে, কারণ তুমি আমার প্রিয়।

ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছেন—কীরূপে একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁকে পাবেন। কংস বা শিশুপাল এরাও ভগবানকে চিন্তা করছে কিন্তু দ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে। তাই ভগবান অর্জুনকে বললেন, তুমি ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর। 'মন্মনা ভব'—তোমার মনটি আমার সঙ্গে যুক্ত হোক অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মন যুক্ত করতে হবে। 'মদ্ভক্তঃ'—আমার ভক্ত হও অর্থাৎ ঈশ্বরই তোমার একমাত্র প্রেমাস্পদ হোক। 'মদ্যাজী'-

-যা কিছু কর্ম, যাগযজ্ঞ, পূজা করবে—তা আমাকে লক্ষ্য করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে তা অর্পণ কর। 'মাং নমস্কুরু'—আমাকে প্রণাম কর। শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর। 'মাম্ এব এষ্যসি'—তাহলে তুমি আমাকেই পাবে। 'সত্যং তে প্রতিজানে'—আমি তোমার কাছে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করছি।

ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন, নাম-রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন ও বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ।—এই ভক্তিযোগ সহকারে যে ভক্ত ভগবানের আরাধনা করবেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করবেন। মন্মনা—ভগবানে চিত্তবিলয়রূপ অভেদভাব। মদ্ভক্ত—ভগবানে নিষ্ঠাভাব, অর্থাৎ ভালবাসা ভালবাসার জন্য, আর কিছুর জন্যে নয়। মদ্যাজী—নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম কর্তব্যকর্ম ও কর্মফল ভগবানে অর্পণ করা। নমস্কার—কর্মে দোষত্রুটি থাকলেও সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দ্বারাই ভগবানকে খুশি করা। এভাবে যাঁরা ভগবানের সাধনা করেন, তাঁরাই ভগবানের প্রিয় ভক্ত এবং এরূপ শরণাগত ভক্তরাই ভগবানের অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।৬৬

সর্বধর্মান্ (সকল প্রকার ধর্মের ও অধর্মের অনুষ্ঠানকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করে) একং (একমাত্র) মাম্ (আমার অর্থাৎ পরমেশ্বররূপ আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর) অহং (আমি—পরমেশ্বর) ত্বাং (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সর্ব-ধর্ম-অধর্ম-বন্ধন-রূপ সমস্ত পাপ হতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করব) মা শুচঃ (শোক করো না) ।।৬৬

তুমি সকল প্রকার ধর্ম ও অধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ লও অর্থাৎ আমাকেই আশ্রয় কর, আমি তোমাকে ধর্ম-অধর্ম-কর্ম-বন্ধনরূপ সকলপ্রকার পাপ হতে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না।

সমগ্র গীতার অধ্যাত্মবাণীর উপসংহার করছেন ভগবান। ভগবান বলছেন সবকিছু ধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র তুমি একান্তভাবে আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। বর্ণাশ্রম ধর্মে যতপ্রকার ধর্ম-কর্ম আছে, সকল ধর্ম-কর্মের অধিষ্ঠানই একমাত্র ভগবান। অতএব একমাত্র ভগবানকে সর্বধর্মের স্বরূপ বলে জ্ঞান করতে হবে। ভগবানকেই পরমতত্ত্ব জেনে, অনাত্মবিষয়-চিন্তা চিত্ত হতে দূর করে, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবল প্রেমের আবেশে ভগবানকে নিরন্তর চিন্তা করতে হবে।

সর্বধর্ম পরিত্যাগ বলতে যেন আমরা মনে না করি, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা অর্থাৎ অকর্ম করা। কর্ম না করার প্রবণতা যেন মনে না আসে। তা করলে গীতার মূল স্রোত থেকে আমরা সরে যাব। ভগবানের শরণাগত হয়েই সমস্ত ধর্ম ও কর্ম করতে হবে। তাঁর

শরণাগত হওয়া ভিন্ন কোনও ধর্ম-কর্মই যে শ্রেষ্ঠ নয় তা তিনি বুঝিয়েছেন। মানুষের জন্য বিবিধ বর্ণাশ্রম ধর্ম বিহিত আছে—বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ইত্যাদি। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বিধিনিষেধ আছে এবং জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ—প্রভৃতি মার্গ বা পথের নির্দেশ আছে। কোনটি শ্রেয় এবং কোনটি গ্রহণীয় তা স্থির করা কঠিন। বুদ্ধি হয়তো ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে। তাই ভগবান অত্যন্ত সহজভাবে, অধ্যাত্মপথের মর্মবাণীটি বললেন—তুমি সর্বধর্ম ত্যাগ কর অর্থাৎ তুমি সকল বিধিনিষেধ, সকল ধর্ম-অধর্ম, সকল পাপপুণ্য পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আমার হাতে ছেড়ে দাও। তোমার অহংকার, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে আমাকেই তোমার সর্বকর্মের প্রভুরূপে এবং সকল যজ্ঞের ভোক্তারূপে গ্রহণ কর। আমি অন্তর্যামী আত্মারূপে তোমার হৃদয়ে বিরাজ করছি। তুমি আমাকে আশ্রয় করে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর। সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হলে আমার অনন্ত জ্ঞানের আলোকে তোমার চিত্ত আলোকিত হবে। তোমার সকল সংশয় ও মোহ দূর হবে, আমার অনন্ত শক্তিতে তুমি শক্তিমান হবে এবং আমার অনন্ত আনন্দের স্পর্শে তোমার সকল শোক-দুঃখ দূর হয়ে তুমি পরমশান্তি লাভ করবে। তোমার পাপ-ভয়ও দূর হবে। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে উদ্ধার করব, তুমি শাশ্বত মুক্তির অধিকারী হবে।

শ্রীভগবান পরম কৃপাপরবশ হয়ে অর্জুনকে বলছেন—তুমি আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমার প্রিয়। ভগবান শুধু অর্জুনকে উপলক্ষ করে বলছেন না, তিনি সমগ্র বিশ্বমানবের উদ্দেশে এই উপদেশ দিয়েছেন। হে মানব, সমস্ত রকম ধর্মানুষ্ঠান ও প্রচেষ্টা ত্যাগ করে সর্বতোভাবে একমাত্র শ্রীভগবানের শরণ লও। 'সর্বধর্মান্'-—অর্থাৎ সর্বকর্ম, ধর্ম-অধর্ম ত্যাগ করে পরব্রহ্মে আশ্রয় গ্রহণ করো। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও বলছেন—বর্ণাশ্রম ধর্ম, আশ্রমধর্ম, সামান্য ধর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্মত্যাগ ও কর্মপ্রচেষ্টার অন্তে এই শরণাগতি যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক পাখির উদাহরণ দিয়ে শরণাগতি বোঝাচ্ছেন। পাখিটি যেমন সমুদ্রের মাঝে পড়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারদিকে উড়ে উড়ে কোথাও কূল কিনারা (ডাঙা) দেখতে না পেয়ে শেষটায় শ্রান্ত হয়ে, নিশ্চেষ্টভাবে জাহাজের মাস্তুলে বসেছিল—তেমনি মানুষ নানা ধর্মানুষ্ঠান করে যখন শ্রান্ত ও ব্যর্থকাম হয়, তখন নিজের শক্তির উপর নির্ভরতা ও অহং ত্যাগ করে শরণাগতি অবলম্বন করে। তিনি বলছেন—'তাঁর শরণাগত হও—তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কী শক্তি আছে।'

ঈশ্বরের নাম করলে ও শরণাগত হলে পাপী মুক্ত হয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্র বলে, হরিনাম একবার করলে যতটা পাপ ক্ষয় হয়, ততটা পাপ করার ক্ষমতা সবচেয়ে যে পাপী, তারও নেই। মহাপাতক, সেও যদি একবার ভগবানের কথা স্মরণ করে, তাহলে সে আবার তপস্বী হয়ে যায়, সমস্ত পাপ তার ধুয়ে-মুছে যায়। রামপ্রসাদ গাইছেন:

'কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা। অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি'—কালীনাম করেছি, আর তো দেখতে পাচ্ছি না যে আমার মধ্যে কোনও পাপ আছে। কী করে থাকবে? মাথাই নেই তার আবার মাথাব্যথা। যিনি সমস্ত পাপ দূর করে দেন, তাঁর নাম আমি করেছি—পাপ আর থাকবে কী করে? আগুন যেমন এক নিমেষে রাশি রাশি তুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তেমনি ভগবানের নাম করলে পুঞ্জীকৃত পাপ এক মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। দস্যুরাজ রত্নাকর—তিনি ভগবানের নাম করে বাল্মীকি ঋষি হয়ে গেলেন। ভয়ঙ্কর নরঘাতক অঙ্গুলিমালও বুদ্ধদেবের কৃপায় জীবন রূপান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যেন নিজেকে অসহায় মনে করছেন। ভাবছেন, এই যুদ্ধ কি আমার দ্বারা সম্ভব? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—তুমি শুধু আমাকেই ধরে থাক, ধর্ম-অধর্ম ওসব কিছু ভাববার তোমার প্রয়োজন নেই, শুধু আমাকেই স্মরণ কর। 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'—সমস্ত পাপ থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। 'মা শুচঃ'-—শোক করো না, দুঃখ করো না। যে ভগবানকে ধরে থাকে, তার কোনও ভাবনা থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'শরণাগতি'র ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অনন্যাশরণাগতি শুধু সাধনার শেষ কথা নয়, পরমপ্রাপ্তি। ভগবানের বিশেষ কৃপায় ভক্তের জীবনে পূর্ণ শরণাগতি আসে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—তাঁর পাদপদ্মে সব অর্পণ কর, তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা হয় করুন। দু-ধরনের সাধক আছেন। একরকম সাধকের বানরের ছানা-র স্বভাব, আর একরকম সাধকের বিড়ালের ছানা-র স্বভাব। যে সাধক নিজে তপস্যাদির চেষ্টা করে—ভগবানকে ধরতে চান, তাঁর বানরের ছানা-র স্বভাব। যে সাধক সম্পূর্ণ ঈশ্বরের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন তাঁর বিড়ালের ছানা-র স্বভাব। মা তার সব ভার নেন। শরণাগত ভক্তকে ভগবান সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বলছেন, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক, যা করছ তা-ই কর। কিন্তু তুমি আমাকে বকল্মা দাও। এই হচ্ছে 'আমমোক্তারি' বা 'বকল্মা'। গিরিশ ঘোষ তাই করলেন এবং মনে মনে খুশি হলেন এই ভেবে যে, ভগবানের উপর সব ভার ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু পরে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন—বকল্মা দেওয়ার ভিতর যে এত সব ব্যাপার আছে, তা আগে বুঝিনি। জপধ্যান এসব করলে তো দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ করতাম, তাহলেই হয়ে যেত। আর বকল্মা দিয়ে দেখছি সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করছি। তাতেও নিস্তার নেই। প্রতি পদক্ষেপে ভাবতে হচ্ছে, আমি তাঁর উপর সব ভার দিতে পেরেছি তো? এই যে কাজটা করছি, এই যে চিন্তাটা করছি, এমনকী এই যে নিঃশ্বাসটা ফেলছি—সেটাও কি আমি তাঁর উপরে নির্ভর করে করছি, না কি নিজের অহংকারের বশে করছি।

তাই দেখা যায়, গিরিশ ঘোষ নিয়মের বন্ধন পরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তাই ভগবানের চরণে বকল্‌মা দিলেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝতেও পারলেন না, কত বড় বন্ধন তিনি স্বেচ্ছায় গলায় পরে নিলেন। সেটা হচ্ছে ভগবানের ভালবাসার বন্ধন। ভালবাসার বন্ধন সব থেকে বড় বন্ধন।

ভগবানের শরণাগত হওয়া বা ভগবানের চরণে আমমোক্তারি দেওয়ার অর্থ আমার মধ্যে একটুও 'আমি' বোধ যেন না থাকে। একেবারে 'আমি'-শূন্য হতে হবে। তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও শরণাগত হয়ে মহা আনন্দে থাকেন। ঈশ্বরের নামে ও কর্মে আনন্দ, চোখে জল, শরীরে রোমাঞ্চ হবে, তখনই বুঝতে হবে সেই প্রকৃত শরণাগত ভক্ত।

চিরদিন মানুষ একরকম থাকে না। আজ যে খারাপ, কাল সে ভাল হয়ে যেতে পারে, আজ যাকে দেখছি দুর্বল, হীনবীর্য—কালই হয়তো দেখবে সে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এক মুহূর্তে মানুষের জীবনের গতি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, হয়ে যায়ও। ভগবানের নাম আমার মধ্যে যে ঘুমন্ত দেবত্ব আছে, তাকে হয়তো জাগিয়ে দিল, আর সেই মুহূর্ত থেকে আমি রূপান্তরিত হয়ে গেলাম, নতুন মানুষ হয়ে গেলাম।

লালাবাবু পালকি করে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে শুনলেন ধোপার মেয়ে তার বাবাকে বলছে : বাবা, বেলা যে পড়ে এল, 'বাসনায়' আগুন দেবে না? বাসনা হচ্ছে শুকনো কলাপাতা। লালাবাবু ভাবলেন : তাই তো, আমারও তো বেলা শেষ হয়ে গেল, দিন ফুরিয়ে এল, আমি তো এখনও আমার কামনাবাসনায় আগুন দিলাম না? বাস্, পালকি থেকে নেমে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। এরকম হয়ে থাকে। এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। একটা জলস্রোতের মুখে বহুদিন ধরে একটা পাথর চাপা ছিল। কেউ সেই পাথরটা তুলে নিল—জলস্রোত মুক্ত হয়ে চলতে লাগল। এও যেন ঠিক তাই। ভগবানের নামে কে যেন আমার উপর থেকে আবরণটা সরিয়ে নিল, আমার যে 'প্রকৃত আমি' তাঁকে আমি চিনতে পারলাম। আমার জীবনটার মোড় ঘুরে গেল—আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম। আমি অসৎ ছিলাম—সৎ হয়ে গেলাম, নিষ্ঠুর ছিলাম—প্রেমিক হয়ে গেলাম, ছিলাম স্বার্থপর, এখন আমি এমন হয়েছি যে পরের জন্য প্রাণ দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হই না। পরমেশ্বরের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ থেকেই এই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করা যায়। এই শরণাগতি দুর্বলতা থেকে আসে না, আসে প্রচণ্ড শক্তি থেকে। আত্মসমর্পণ পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। সাধনার শেষ মুহূর্তে পূর্ণশক্তির অধিকারী হয়ে তবেই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করে বলতে পারা যায়—প্রভু, আমি নই, তুমি। অধ্যাত্মজীবনের চরম লক্ষ্য অনন্যা শরণাগতি—পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া, মিশে যাওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—'শরণাগত, শরণাগত! নাহং নাহং, তুঁহুঁ তুঁহুঁ! শরণাগতি, শরণাগতি!'

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ।।৬৭

ইদং (এই গীতাতত্ত্ব) অতপস্কায় ন (তপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে) তে (তোমার) কদাচন (কখনও) ন বাচ্যম্ (বলা উচিত নয়) ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকেও নয়) ন চ অশুশ্রূষবে (ঈশ্বরতত্ত্ব, বেদান্তবাক্য-শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও নয়) যঃ (যে) মাং (আমাকে, ভগবান বাসুদেবকে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে, অর্থাৎ মানুষজ্ঞান করে আমার উপরে দোষারোপ করে বা আমাকে শ্রদ্ধা করে না) ন চ (তাকেও নয়, অর্থাৎ তাকেও বলবে না) ।।৬৭

এই গীতাতত্ত্ব তুমি কদাচ স্বধর্মানুষ্ঠানবিহীন, অভক্ত বা ভক্তিহীন ব্যক্তি, বা ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং যে আমাকে মনুষ্যবোধে অবহেলা করে বা নিন্দা করে, তাকেও এ গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দেবে না।

যারা তপস্যাহীন, অসংযত-ইন্দ্রিয়, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, আর গীতার উপদেশ শুনতে অনিচ্ছুক এবং যারা অন্তরস্থ ভগবানকে বিদ্বেষবশত অস্বীকার করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা গীতাশাস্ত্র শুনবার অধিকারী নয়। যারা অনধিকারী তাদের কাছে গীতা-ব্যাখ্যা অনুচিত। কারণ গীতা শুনে, গীতার তত্ত্ব আমাদের জীবনে, কর্মে ও আচরণে প্রতিফলিত করা চাই। যাদের সেই প্রকার সংকল্প, সামর্থ্য ও শ্রদ্ধা নেই তাদের দ্বারা গীতাতত্ত্বের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নয়। যিনি অধিকারী অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক তপস্যা করছেন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, গুরুসেবা ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠাবান, ভগবান বাসুদেবে অভেদবুদ্ধি তিনিই গীতার উপদেশ শ্রবণ ও মনন করে মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বরে অসূয়াশূন্য অর্থাৎ বিদ্বেষ ত্যাগ করে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম। আধ্যাত্মিক জীবনে ইন্দ্রিয়সংযম ও তপস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তপস্যার দ্বারাই সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ হয়। তপস্যার দ্বারাই মানুষ তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। জীবনের সবক্ষেত্রে তপস্যার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তপস্যা বিনা বড় হওয়া যায় না। ফলে যার তপস্যা নেই, হৃদয়ে ভালবাসা নেই ও মনে সেবা-ভাব নেই--সে গীতার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে সক্ষম নয়। একথা অবশ্যই সত্য—ঈশ্বর অমূল্য। উন্নাসিক মানুষ তাদের কদর জানে না। তাই ভগবান ও ভগবানের উপদেশ সম্পর্কে যারা উপহাস করবে—তাদের কাছে গীতা না বলাই ভাল।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮

যঃ (যিনি) ইদং (এই গীতাতত্ত্ব) পরমং (অত্যন্ত) গুহ্যং (গুহ্য) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণ মধ্যে) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করবেন, অর্থাৎ গীতা-মাহাত্ম্য কীর্তন করবেন)

(সঃ) (তিনি) ময়ি (আমাতে) পরাং (পরা) ভক্তিং (ভক্তি) কৃত্বা (আচরণ করে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হবেন) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহ অর্থাৎ এতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই)।

আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে যিনি এই পরম গুহ্য বিষয় আমার ভক্তগণের কাছে ব্যাখ্যা করবেন, তাঁর সকল সংশয় মিটে যাবে এবং শেষে তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করে আমাকেই প্রাপ্ত হবেন—তাতে কোনও সংশয় নেই।

গীতাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা ব্যাখা করেছেন ভগবান—এই জন্য গীতাশাস্ত্র পরম গুহ্য। ভক্তিমান ব্যতীত কারও গীতা বুঝবার বা বোঝাবার সামর্থ্য নেই। একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের ভক্ত হয়েই ভক্তকে গীতাশাস্ত্র শোনাবেন। ভক্তিমান ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তের নিকট গীতা ব্যাখ্যা করবেন। কারণ ভক্তই ভক্তের ভাষা বুঝতে পারেন। যাঁরা প্রেমিক তাঁরাই প্রেমের ভাষা বুঝতে পারেন। যাঁরা প্রকৃত ঈশ্বরের ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরের মহিমা আর একজন ভক্তের নিকট ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বার্থবোধহীন—তাঁরা আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলেন না। তাঁদের ভাল লাগলে তাঁরা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তাই ভগবান বলছেন—হে অর্জুন! যে গভীর সত্য আমি তোমাকে জানালাম, যাঁরা পরম ভক্তির সঙ্গে সেই সত্য ভক্তদের মধ্যে প্রচার করবেন, তাঁরা যে আমাকেই লাভ করবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। সত্যের প্রচার চাই। সত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্ব, গীতাতত্ত্ব—এসবের বিস্তার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়ে গীতার মর্মবাণীই সেখানে প্রচার করেছিলেন। তাই যাঁরা গীতার এই অধ্যাত্মভাব প্রচার করবেন, তাঁরা মহৎ।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ।।৬৯

মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণমধ্যে) তস্মাৎ চ (সশ্রদ্ধ সেই গীতাব্যাখ্যাতা-অপেক্ষা) ভুবি (পৃথিবীতে) কঃ চিৎ (কেউ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন (নেই) তস্মাৎ (সে ভক্ত-অপেক্ষা) অন্যঃ (অন্য কেউ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ চ (এবং প্রিয়তর) ন ভবিতা (হবেন না) ।।৬৯

মানবগণের মধ্যে গীতা-ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার অতি প্রিয়কারী আর কেউ নেই এবং এই পৃথিবীতে সেই গীতা-ব্যাখ্যাতা ভক্ত-অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় আর কেউ হবেন না।

যে বিদ্বান ভক্ত এই মনুষ্যলোকে গীতার কথা ব্যাখ্যা করেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়পাত্র, অন্য কেউ নয়। গীতার এই ভাব গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িক ভাব নয়, যথার্থ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব। তাই প্রকৃত বিদ্বান ভক্ত, যিনি গীতার গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন

তিনিই গীতার কথা প্রচার করবেন। তাতে সমাজে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা হবে। গীতার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব মানুষকে জীবনমুখী, কর্মমুখী ও ধর্মমুখী করবে এবং সমাজে মানুষকে সুখ ও কল্যাণ প্রদান করবে। এই ভাবের মধ্যে কোনও সঙ্কীর্ণ অসৎ ভাব নেই। এই ভাব মানুষের জীবনকে উর্ধ্বে সত্যপথে নিয়ে যায় ও ঈশ্বরমুখী করে, ভূমার সুখে, ব্রহ্মানন্দের আনন্দে পৌঁছে দেয়। তাই ভগবান বলছেন—যিনি এই গীতার শিক্ষা প্রচার করেন, তাঁর মতো প্রিয় এ জগতে আমার আর কেউ নেই। তিনিই জগতে প্রকৃত জ্ঞানের আলো বিস্তার করেন। জগতে তাঁর থেকে অন্য কেউ ভগবানের প্রিয়তর হতে পারে না। এইসব বিদ্বান ভক্ত ভগবানের প্রিয় এবং ভগবান তাঁদের একমাত্র প্রিয়।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ।।৭০

যঃ চ (এবং যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের অর্থাৎ অর্জুন ও ভগবান) ইমম্ (এই) ধর্ম্যং (ধর্মজনক) সংবাদম্ (কথোপকথন) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করবেন) তেন (সেই) জ্ঞান-যজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা) অহম্ (আমি) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হব) ইতি (এরূপ) মে (আমার) মতিঃ (মত) ।।৭০

আর যিনি আমাদের উভয়ের (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের) এই ধর্মীয় কথোপকথনরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন, সেই জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমিই পূজিত হব—একথা নিশ্চয় জানবে।

ভক্তিপূর্বক নিত্য গীতাপাঠের ফল হচ্ছে, সংসারবন্ধন হতে মোক্ষলাভ। গীতাপাঠ ও সেইসঙ্গে নিজ জীবনে সেই গীতা-পাঠ-লব্ধ জ্ঞানকে প্রতিফলিত করতে হবে। 'অধ্যেষ্যতে'—নিয়মিত গীতা অধ্যয়ন করবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অর্থাৎ শিক্ষা লাভ করা এবং শিক্ষা দেওয়া দুটি কাজই একসঙ্গে চলতে পারে। এটি জ্ঞানযজ্ঞ এবং এই জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ভগবান পূজিত হন। ভগবান একথাও বলছেন—কারও নাম উচ্চারণপূর্বক ডাকলে যেমন সেই ডাক শোনামাত্র সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ গীতা অধ্যয়ন অর্থ বুঝেই হোক, বা না বুঝেই হোক, কোনও ব্যক্তি গীতা পাঠ করবামাত্রই ভগবান তাঁর নিকটবর্তী হন এবং ভগবান কৃপা করে তাঁকে চিত্তশুদ্ধিরূপ আশীর্বাদ দান করেন। তখন এই জ্ঞানযজ্ঞের ফলস্বরূপ ব্রহ্মপদলাভ সেই ব্যক্তির অনায়াসসাধ্য হয়ে যায়।

জ্ঞানযজ্ঞ যিনি করবেন তিনি প্রার্থনা করবেন, জ্ঞানের আলো যেন তাঁর বুদ্ধিকে শুদ্ধ করে। জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা থাকা চাই। তাই জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। ভগবান বলছেন—যিনি আমাদের উভয়ের (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের) পবিত্র কথাবার্তা অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারাই আমি পূজিত হব। আমরা সংসারে পঞ্চযজ্ঞের উপাসনা করে থাকি—

দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ। আমাদের সকলের জন্মের পর থেকেই ঋণ থাকে—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ। এই ঋণ আমাদের পঞ্চযজ্ঞের উপাসনা করে পরিশোধ করতে হয়। পিতৃপুরুষের সেবা, পিতা-মাতার সেবা ও সৎভাবে সংসার প্রতিপালন করে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে হয়। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা প্রাচীন ও নবীন ঋষি আর মনীষীদের ঋণ মেটাতে হয়। আমাদের চারপাশে প্রকৃতির সমৃদ্ধি অর্থাৎ গাছপালা, জীবজন্তু, নদ-নদী-জলাধার প্রভৃতি রক্ষা, আর্ত-দরিদ্র মানুষের সেবা ইত্যাদি করে দেবঋণ পরিশোধ করতে হয়।

ভগবান তাই এখানে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলছেন। গীতা অধ্যয়ন করলে জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁকে উপাসনা করা হয়। গীতা অধ্যয়ন এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন ঈশ্বরেরই আরাধনা। কারণ যে ভগবানের কথা মুখে বলে, কিন্তু নিজ-জীবনে পালন করে না—ভগবান তার ভার নেন না। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলছেন—যিনি শ্রদ্ধাবান হয়ে এই ধর্ম জীবনে সাধনা করেন তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। গীতার শিক্ষাই ধর্ম—'ইমং ধর্ম্যং সংবাদম্'—এই ধর্মযুক্ত সংবাদ, কথোপকথন প্রভৃতি পাঠ ও শ্রবণ করেন—তাই ধর্ম। এই ধর্ম মানবজীবনে সামগ্রিক কল্যাণ আনে—দুঃখ দূর করে, সুখ শান্তি আনে। এই ধর্ম বা জ্ঞানযজ্ঞ জীবনকে ঊর্ধ্বমুখী করে।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ।।৭১

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাবান) অনসূয়ঃ চ (এবং অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, অর্থাৎ কেবল শ্রবণদ্বারাই) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ (পাপ মুক্ত হয়ে) পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যকর্মানুষ্ঠানকারীদের) শুভান্ (পুণ্য) লোকান্ (লোকসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ।।৭১

যিনি শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হয়ে এই গীতাশাস্ত্র (অর্থবোধ না হলেও) কেবলমাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও চিরতরে মুক্ত হয়ে (অগ্নিহোত্রাদি) পুণ্যকর্মকারিগণের প্রাপ্য শুভ (পুণ্য) লোকসকল প্রাপ্ত হবেন।

এমনকী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, অসূয়াশূন্য বিদ্বেষমুক্ত হয়ে যদি এই কথোপকথন শুধু শোনেন, যাঁর মধ্যে কোনও নেতিবাচক ভাব নেই, সব পাপ থেকে তিনিও মুক্ত হয়ে যান। 'শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাং'—পুণ্যকর্মকারীদের শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হবেন অর্থাৎ এই জীবনেই তিনি উচ্চতম নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন। যাঁরা গীতার উপদেশ শ্রদ্ধাবান হয়ে শুধু শ্রবণ করবেন তাঁদেরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ভগবান। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ধন্য হবেন। তবে শ্রদ্ধা থাকতেই হবে। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং'—শ্রদ্ধাযুক্ত হলে তবেই জ্ঞানলাভ করা যায়। লৌকিক জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক

জ্ঞান—যে-পথেই যান না কোন শ্রদ্ধা থাকতেই হবে। শ্রোতা শ্রদ্ধাযুক্ত হলে গীতার অর্থ না বুঝতে পারলেও কেবল গীতার শব্দগুলি শ্রবণেই উত্তম ফল অর্থাৎ অধ্যাত্মজীবন লাভ করবেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অর্থবোধপূর্বক গীতা শ্রবণ করবেন, তাঁরাও যে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারবেন, তা-ও নিশ্চিত।

শাস্ত্র বলেন—বিষ্ণু-পাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত গঙ্গা যেমন সকলকেই পবিত্র করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গও সেইরূপ প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা—এই তিনজনকেই পবিত্র করে থাকে। 'অনসূয়শ্চ'—আমাদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব যেন না থাকে। যিনি সন্দেহপ্রবণ তিনি কখনই জ্ঞানের অন্বেষণ করতে পারেন না। আমরা যদি সন্দেহ, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, সবজান্তা প্রভৃতি আত্মতৃপ্তিরূপ ব্যাধি নিয়ে শিক্ষার জগতে প্রবেশ করি তাহলে শিক্ষার দুর্দশা হবে ভয়ঙ্কর ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগও হবে লুপ্ত। তাই আমাদের মধ্যে জ্ঞানলাভের অভীপ্সাকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—জ্ঞান চর্চার অভাবে সঙ্ঘ, সমাজ, জাতি হীনদশা প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান বলছেন—'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে' (৪-৩৮) এই লোকে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ।।৭২

পার্থ (হে অর্জুন) ত্বয়া কচ্চিৎ (তোমাদ্বারা কি) একাগ্রেণ চেতস্য (একাগ্র চিত্তে) এতৎ (এই গীতাতত্ত্ব) শ্রুতম্ (শ্রুত হয়েছে তো?) ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) তে (তোমার) অজ্ঞান-সম্মোহঃ (অজ্ঞানজনিত মোহ) কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ (কি দূরীভূত হয়েছে)? ।।৭২

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্ত হয়ে এই গীতাশাস্ত্র শুনেছ তো? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানোচিত মোহ দূরীভূত হয়েছে তো?

গীতার এই বাণীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সরাসরি প্রশ্ন করছেন—হে পার্থ! এই গীতাশাস্ত্র তুমি একাগ্রচিত্তে শুনেছ কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানোচিত মোহজাল কি বিনষ্ট হয়েছে? যে সব কথা আমি এতক্ষণ তোমার উদ্দেশে বললাম, তা একাগ্রচিত্তে শুনে তোমার অজ্ঞানতাপ্রসূত মোহ বিনষ্ট হয়েছে কি? শ্রীভগবানের উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনের মোহ নাশ করা। অর্জুন করজোড়ে শরণাগত হয়ে একাগ্রচিত্তে ভগবানের কথা সমস্ত শ্রবণ করেছেন। গীতার শাশ্বত বাণী শ্রবণ করে তাঁর অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূর হয়ে তিনি পূর্ণ শান্তি লাভ করেছেন। ভগবান তা জানেন কিন্তু গীতা শ্রবণে কীরূপ ফল লাভ হয়ে থাকে তাই জগৎকে বুঝাবার জন্য তিনি অর্জুনকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করছেন—গীতা শ্রবণে তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূর হয়েছে তো?

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ।।৭৩

অর্জুন (অর্জুন) উবাচ (বললেন)—অচ্যুত (হে কৃষ্ণ) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে, অনুগ্রহে) মোহঃ (অজ্ঞান) নষ্টঃ (নষ্ট হয়েছে) ময়া (আমাকর্তৃক) স্মৃতিঃ (আত্মস্বরূপের স্মৃতি) লব্ধা (লাভ করেছি) গত-সন্দেহঃ (নিঃসংশয় হয়ে) স্থিতঃ অস্মি (আমি স্থিরবুদ্ধি হয়েছি) তব (তোমার) বচনং (উপদেশ, কাজ বা কথামতো) করিষ্যে (করব) ।।৭৩

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার অবিবেক বা অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে, আমি আত্মতত্ত্ববিষয়ক স্মৃতি বা কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান লাভ করেছি। আমার সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে, আমি এখন স্থিরবুদ্ধি ও নিঃসংশয়। আমি তোমার উপদেশমতো কার্য করব অর্থাৎ তোমার আজ্ঞা পালন করব।

অর্জুন বলছেন—'নষ্টো মোহঃ'—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার অজ্ঞানমোহ নষ্ট হয়েছে। 'স্মৃতির্লব্ধা'—আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতিলাভ করেছি, আমার স্মৃতি স্থির হয়েছে। 'ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত'—আপনার কৃপায়, আপনার উপদেশে আমার সমস্ত অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়েছে। 'স্থিতোঽস্মি'—এখন আমি স্থির হয়েছি, অর্থাৎ আমার মন এখন স্থির হয়েছে।

অর্জুন এখন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন। ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এরূপ আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি তিনি লাভ করেছেন। 'গতসন্দেহঃ'—তাঁর মন থেকে সব সন্দেহ চলে গেছে, অর্থাৎ সংশয় দূর হয়েছে। 'করিষ্যে বচনং তব'—আপনি যা করতে বলছেন, আমি তাই করব। আমার মনে অন্য কোনও বিচার নেই, কোনও সংশয় নেই, আমার কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন—জীবন ত্যাগ সত্ত্বেও ভগবৎ আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন করবেন না। যুদ্ধে আত্মীয় বধ আর তাঁর স্বধর্মপালনে প্রতিকূল থাকল না। তাঁর লক্ষ্য, ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, ঈশ্বরের উদ্দেশে ক্ষাত্রধর্ম পালন করা। এই স্বধর্ম প্রতিপালনের জন্য তিনি কোনওপ্রকারেই দোষগ্রস্ত হবেন না।

বাস্তবিক গীতার বাণী শ্রবণে অর্জুন তাঁর কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত হলেন। আমাদের সকলেরই এরূপ জীবনদর্শন প্রয়োজন যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পথ দেখাতে পারে। একটা গভীর চিন্তা, সৎ ভাবনা বা আদর্শ সামনে রেখে, সেই আদর্শের আলোয় আমাদের দৈনন্দিন ছোট ছোট কর্মগুলিকে সম্পাদন করতে হবে। এই দর্শনই যেন আমাদের জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। একটা আদর্শ সামনে রেখে চলতে যদি একটু ত্রুটিবিচ্যুতি হয়-ও, তাতে-ও কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'আদর্শ আছে এমন মানুষ যদি একশোটা ভুল করে, আদর্শহীন মানুষ এক হাজার ভুল করবে।' অতএব একটা

গভীর আধ্যাত্মিক মতাদর্শ, একটি সৎ ও ইতিবাচক দর্শন সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে এবং সেই দর্শনকে যতটা সম্ভব নিখুঁত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রথের সারথি হিসেবে সঙ্গে পেয়েছিলেন, আমরাও মহাভাগ্যবান—উভয়ের কথোপকথনরূপ মহান গীতা-দর্শন পেয়েছি, এই শিক্ষার আলোয় নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারব। এই দর্শনের সাহায্যে মনকে সতেজ ও সৃজনশীল করতে পারব। মনুষ্যত্বের হুঁশ জাগ্রত রাখতে পারব। তবেই হবে গীতা-দর্শনের সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—ম'মান হুঁশ' অর্থাৎ যে তার নিজের চৈতন্য বা শক্তি সম্বন্ধে সচেতন—সে-ই মানুষ। হুঁশ-যুক্ত মানুষ হওয়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ এক অনবদ্য জীবনদর্শন মানবজাতির জন্য উপহার দিয়ে গিয়েছেন। অতএব অল্পবয়স থেকেই এই গীতারূপ জীবনদর্শন অবলম্বন করে জীবনযাপন করার চেষ্টা করতে হবে। এই গীতা-দর্শনই পৃথিবীতে জীবনযাপনের দর্শন। এই দর্শন মানুষের মনের নানা সংশয় দূর করে সঠিক কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে দেবে। মানবজাতিকে অন্ধকারের রাস্তা বা ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকে সাপের সঙ্গে তুলনা করতেন। তিনি বলছেন, একদিন দেখি, একটা ঢোঁড়া সাপে ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়তেও পারছে না—গিলতেও পারছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপে ধরত, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। এ-একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা।...যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে যায়। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।

যিনি সদ্‌গুরু, তিনিই মানুষের মোহান্ধকার দূর করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেইরূপ সদ্‌গুরু। আচার্য শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেইরূপ সদ্‌গুরু। তাঁদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মানুষের জীবনে সংশয় ও অজ্ঞানতা দূর হয়ে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ।।৭৪

সঞ্জয় (সঞ্জয়) উবাচ (বললেন) অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপ) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (এবং অর্জুনের) ইমম্ (এই) রোমহর্ষণম্ (রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতম্ (অদ্ভুত) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করেছি) ।।৭৪

সঞ্জয় বললেন—আমি মহাত্মা বাসুদেব (কৃষ্ণ) এবং অর্জুনের মধ্যে এই প্রকার রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করেছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার শুরুতে আমরা দেখেছি, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের প্রাসাদে উপবিষ্ট। হস্তিনাপুর দিল্লীর কাছেই। একশো মাইল দূরে কুরুক্ষেত্র। সেখানে যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। যুদ্ধক্ষেত্রে কী ঘটছে তা জানার জন্য দৃষ্টিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল। এমন সময় সেখানে ঋষি ব্যাসদেবের আগমন হলো। তিনি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন যাতে হস্তিনাপুরে বসেই তিনি যুদ্ধের দৃশ্যাবলী দেখতে পান এবং ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারেন। সঞ্জয় তাঁর মানসিক শক্তির জোরেই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে গেলেন! গীতা শুরু হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্ন দিয়ে। তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে সঞ্জয়! যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পুত্রদের সঙ্গে পাণ্ডবদের কী হলো?' আর তিনি কোনও প্রশ্ন করেননি। তার উত্তরে সঞ্জয় যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাই পূর্বের সকল অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সঞ্জয় অতি বিদ্বান, চরিত্রবান ও শুদ্ধমতি পুরুষ ছিলেন। তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং মুনির ন্যায় তপস্বী ছিলেন। এখন গীতা-শাস্ত্রের সমাপ্তিতে সঞ্জয় কিছু কথা বলছেন।

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জুনের মধ্যে যে অতীব গূঢ় বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন হয়েছে তা শুনে অনির্বচনীয় তীব্র আনন্দে শিহরণ হচ্ছে, আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ।।৭৫

অহং (আমি) ব্যাস-প্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) (দিব্যশক্তিপ্রভাবে) এতৎ (এই) পরম্ (অত্যন্ত) গুহ্যম্ (গোপনীয়) যোগং (যোগশাস্ত্র) কথয়তঃ (কথক) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হতে) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষরূপে) শ্রুতবান্ (শুনেছি) ।।৭৫

(সঞ্জয় কীভাবে গীতাতত্ত্ব শ্রবণ করলেন তাই বলছেন) ব্যাসদেবের আশীর্বাদে আমি দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রবণলাভ করে (যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থেকেও) সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে এই পরমগুহ্য যোগশাস্ত্র শ্রবণ করেছি।

সঞ্জয় বললেন, আমি ব্যাসদেবের কৃপায় এই অসাধারণ পরম গুহ্য কথাবার্তা শোনার সুযোগ পেয়েছি। তিনি আমাকে দিব্য চক্ষু-কর্ণাদি দিয়েছিলেন। সেই গুণে ভগবান যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কথাও অনায়াসে শ্রবণ করতে পেরেছি। সর্বশাস্ত্রের সার গীতা শ্রবণে সঞ্জয় নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। ভগবান যুদ্ধক্ষেত্রে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন? সঞ্জয় বললেন তিনি 'যোগং' যোগের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই যোগদর্শন গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ধরা রয়েছে। সমগ্র গীতাশাস্ত্রে যোগের অপূর্ব আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি উন্মোচিত হয়েছে। যোগ ব্যাখ্যা করেছেন কে? স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ। 'যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্'—সাক্ষাৎ স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে এই যোগের কথা শুনেছি। তিনি অর্জুনকে এই যোগের বাণী শুনিয়েছিলেন এবং তা শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই যোগের বাণী শ্রবণ করার পর যে আনন্দ-অনুভূতি হয়েছিল সঞ্জয় তা উচ্ছ্বাসভরে প্রকাশ করছেন। সঞ্জয় জগদ্বাসী সকলের উদ্দেশে বলছেন—গীতার বাণী শ্রবণে তাঁর যে আনন্দ-অনুভূতি হয়েছে, সর্বসাধারণও গীতার বাণী শ্রবণ করলে সেই আনন্দ ও অনুভূতি আস্বাদ করতে পারবে।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ।।৭৬

রাজন্ (হে মহারাজ), কেশব-অর্জুনয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যং (পবিত্র) অদ্ভুতম্ (বিস্ময়জনক) সংবাদম্ (কথোপকথন) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করে) মুহুঃ মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি (হৃষ্ট হচ্ছি) ।।৭৬

হে রাজন ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পরম পবিত্র ও অদ্ভুত কথোপকথন পুনঃপুন স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত ও হৃষ্ট হচ্ছি।

গীতাশাস্ত্রের উপদেশ যে-কোন ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করলেই, শ্রোতার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। একথা স্মরণ করে সঞ্জয় বলছেন--আমার না জানি কত জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ও তপস্যা ছিল, যার প্রভাবে এই যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বরেরই মুখে শ্রবণ করলাম। একথা স্মরণ করে আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। এই বিস্ময়কর যোগতত্ত্ব শ্রবণ করে বারবার পুলকিত হচ্ছি—পুনপুন স্মরণ করে ক্ষণে ক্ষণে হৃষ্ট হচ্ছি। এই অদ্ভুত সংবাদ বারবার স্মরণ করে আমার মুহুর্মুহু হর্ষ হচ্ছে।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ।।৭৭

রাজন্ (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র)—হরেঃ (শ্রীহরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অতি-অদ্ভুত) রূপম্ (বিশ্বরূপ বা মনোহর রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে) মে (আমার) মহান্ (মহা অর্থাৎ অতীব) বিস্ময়ঃ (বিস্ময় জেগেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং বারবার) হৃষ্যামি (হর্ষ অনুভব করছি) ।।৭৭

হে রাজন ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীহরির সেই অতি-অদ্ভুত বিশ্বরূপ বা মনোহর রূপ বারবার স্মরণ করে আমার মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি পুনপুন হৃষ্ট ও পুলকিত হচ্ছি।।

সঞ্জয় বললেন, আমি সেই সময় শ্রীহরির অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে অতি অদ্ভুত রূপ দেখেছিলাম অর্থাৎ যে সগুণ বিশ্বরূপ শ্রীভগবান অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন সেই আশ্চর্য রূপ স্মরণ করে আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরছে না। 'বিস্ময়ো মে মহান্'—

আমার মহা বিস্ময় উপস্থিত হচ্ছে। 'হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ'—আমি প্রতি মুহূর্তে আনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছি।

বিখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যখন আমেরিকার মরুভূমিতে বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দেখেছিলেন, তখন গগনচুম্বী লেলিহান অগ্নি শিখা দেখে তিনি গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শনের শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন। 'দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।'—পূর্ব আকাশে যদি একসঙ্গে সহস্র সূর্যের উদয় হয়, তাহলে তার যে সম্মিলিত প্রভা বা দীপ্তি তা মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।' আণবিক বোমার ভয়ঙ্কর লেলিহান অগ্নিশিখা দেখে ওপেনহাইমারের মানসলোকে গীতার বিশ্বরূপের দৃশ্য ভেসে উঠেছিল।

সঞ্জয় এখানে সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বলছেন। সর্বশেষ শ্লোকে তিনি একটি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, গীতার যোগশিক্ষা যদি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি উপলব্ধি করতে পারে এবং তা দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারে, তাহলে একই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদে চৈতন্য জাগ্রত হবে এবং মানবসমাজের পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ।।৭৮

যত্র (যেখানে অর্থাৎ যে পক্ষে) যোগ-ঈশ্বরঃ (সকল যোগের স্রষ্টা যোগিশ্রেষ্ঠ) কৃষ্ণঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্ধরঃ (গাণ্ডীব-ধনুর্ধারী) পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সে-পক্ষে) ধ্রুবা (সর্বনিশ্চিত) শ্রীঃ (রাজ্যশ্রী, লক্ষ্মী) বিজয়ঃ (সম্পূর্ণ জয়প্রাপ্তি) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি) নীতিঃ (ন্যায়) ইতি (এই) মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চয় ধারণা) ।।৭৮

যুদ্ধ-ফলাফলের আশা পোষণ করে সঞ্জয় বলছেন, যে পক্ষে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে গাণ্ডীবধারী পার্থ, সেখানেই অর্থাৎ পাণ্ডবপক্ষেই রাজ্যশ্রী, বিজয়, অভ্যুদয়—উত্তরোত্তর সম্পদবৃদ্ধি ও ন্যায়নীতি বিরাজমান—এই আমার নিঃসংশয় অভিমত।

সঞ্জয় বললেন—হে মহারাজ! যে পাণ্ডব-পক্ষে সর্বসিদ্ধিদাতা ও দুঃখভঞ্জনকর্তা 'নারায়ণ' নামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করছেন, যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী বীরকেশরী 'নর' নামক অর্জুন রয়েছেন, আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি—রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করবেন। অর্জুন কর্মবীর এবং শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয় শান্ত ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞাপূর্ণ, করুণায় ভরপুর এবং মহান আচার্য—তাঁরা যেখানে থাকেন, তা সে পরিবারই হোক, সমাজই হোক অথবা জাতি হোক—সেখানেই শ্রী অর্থাৎ সমৃদ্ধি নেমে আসে। ব্যক্তিজীবনে,

সমাজজীবনে এবং জাতির জীবনে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মিলিত শক্তি ও আদর্শের প্রকাশ ঘটে—তাহলে শ্রী ও সাফল্য অবশ্যই আসবে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। 'শ্রীঃ' অর্থাৎ লক্ষ্মী, সমৃদ্ধি ও 'বিজয়ঃ' অর্থাৎ কর্মে সাফল্য আসবে। গীতার আদর্শ সামনে রেখে কর্ম করলেই সাফল্য আসবে। 'ভূতিঃ'—অর্থাৎ অভ্যুদয়, সর্বত্র কল্যাণ বা উন্নতি হবে। 'ধ্রুবা নীতিঃ'—সমাজে সর্বদা নীতি ও ন্যায়বিচার থাকবে অর্থাৎ নৈতিক চেতনা থাকবে।

যোগের এই শিক্ষা শুরু করতে গিয়ে ভগবান বলেছিলেন, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—এই ধর্মের সামান্য একটু আচরণও আমাদের মহাভয় থেকে রক্ষা করবে। এই ধর্মের সামান্য একটু অনুষ্ঠানও ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে কল্যাণ আনয়ন করবে। গীতার যোগ অনুসরণ করলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সর্বকর্মে সাফল্য, উন্নতমানের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ, উচ্চ আদর্শপূর্ণ জীবন, নৈতিক সচেতনতা সমাজে আসবে। আমাদের সকলের মধ্যে ধর্ম আছে কিন্তু আমাদের চৈতন্য জাগরিত হলে, তবেই আমাদের ধর্মজীবনও জাগরিত হবে এবং আদর্শ, নীতি ও ন্যায়পরায়ণতা সমাজে প্রভাব বিস্তার করবে। তাই গীতার আদর্শ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের শক্তির মহিমা আমাদের সমাজে প্রচার করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও অর্জুনের কর্মশক্তি যুক্ত হলেই দেশ বা জাতির জীবনে ঐশ্বর্য, সম্পদ, সৌভাগ্য, সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

কুরুক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হবার পূর্বে আমরা দেখতে পাই দুর্যোধন ও অর্জুন দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন—'দেখ, আমি তোমাদের প্রচুর সৈন্য দিতে পারি, অথবা আমি নিজেকেও দিতে পারি কিন্তু আমি যুদ্ধ করব না, সারথি মাত্র হতে পারব।' দুর্যোধন বললেন, 'আমি আপনাকে চাই না, আপনার সৈন্যদের চাই অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য চাই।' তিনি শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদের নিয়ে চলে গেলেন। অর্জুন বললেন, 'দেবসেনা আমার চাই না, আমি শুধু আপনাকে চাই। আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না। আপনি কেবল আমার সারথি হন।' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা। অর্জুন বুঝেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞা ও তাঁর কর্মশক্তি যদি যুক্ত হয় তবে এক প্রচণ্ড শক্তি সংযুক্ত হবে এবং তাতে যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত।

তাই আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রজ্ঞা ও কর্ম শক্তিকে একত্রিত করতে হবে তবেই মহত্ত্ব আসবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'এখন কান্নার সময় নয়, এমনকী আনন্দেরও নয়। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে। এখন আর না কেঁদে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও।' সকলকে আহ্বান করে বলছেন—'ওঠ, জাগ, লক্ষ্যে যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছ, থেমো না।' বীরের সাহস নিয়ে জীবনে প্রবেশ করে, সংগ্রাম চালিয়ে গেলে, তবেই মহৎ কিছু লাভ হবে। যাঁরা সংগ্রাম করবেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন, তাঁরাই সেই পরম বস্তু লাভ করবেন, অন্যেরা পাবেন না। যজুর্বেদে বলছেন—'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—যারা এগিয়ে যায়, তারাই শ্রেয়োলাভ করে। যারা এক জায়গায় থেমে থাকে,

তাদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না। তাই এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন। স্বামীজী বলছেন—নিজে তৈরি হও, অন্যকেও তৈরি কর। নিজে মানুষ হও, অন্যদেরও যথার্থ মানুষ হতে সাহায্য কর। এই হলো বেদান্তের মূলভাব এবং বেদান্তদর্শন, স্মৃতি-প্রস্থান শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারও মূলভাব।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সমাপ্ত। হরি ওঁ তৎ সৎ ।।

ভগবান শ্রীবেদব্যাস-বিরচিত লক্ষশ্লোকাত্মক শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে **মোক্ষযোগঃ** নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ সমাপ্ত।

হরি ওঁ তৎ সৎ ।।

সারসংক্ষেপ

সর্বকর্মের ফলমাত্রত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলা হয়। যিনি কর্মফলত্যাগী তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী। দেহধারী জীবমাত্রই যতদিন দেহে বর্তমান রয়েছে ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। কারণ আমাদের যে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগরূপ স্বাভাবিক বৃত্তি, তাও কর্ম। পূজা-অর্চনা, ভগবানের স্মরণ-মনন—তাও কর্ম। স্বধর্ম—তাও কর্ম। অতএব কর্মযোগী বা বর্ণাশ্রমীর পক্ষে কর্মত্যাগ বা স্বধর্ম ত্যাগ গীতার উপদেশ নয়। কর্মফল ত্যাগ করে স্বধর্মের অনুষ্ঠানই শ্রীভগবানের নির্দেশ এবং ঐ উপদেশ চার আশ্রমীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব ফলত্যাগ করে অনাসক্তচিত্তে কর্ম করলে, তাতে বন্ধন হয় না। একেই নৈষ্কর্ম-সিদ্ধি বলে। নৈষ্কর্ম-সিদ্ধি লাভ হলে রাগদ্বেষাদি দূর হয়, তখন যোগী ব্রহ্মভূত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একস্থানে গৃহস্থাশ্রমী ভক্তদের সম্বোধন করে বলেছেন—'ধ্যানজপ এই সব কর্ম, তাঁর নাম গুণ-কীর্তনও কর্ম। আবার দান, যজ্ঞ এসবও কর্ম। ...আর যে কর্মই কর ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কামনাশূন্য হয়ে করতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। ...গীতার সার মানে—হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন কর। গীতার সার—দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয় অর্থাৎ 'ত্যাগী ত্যাগী।'

ঈশ্বরলাভের জন্য মানবজন্ম। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে, একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, আর একহাতে কাজ করবে (অনাসক্তভাবে)। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দু-হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে—তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা করবে। ...জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ

জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দু-খানা তরবারি ঘুরাতেন—একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যত্র বলেছেন, 'জ্ঞান বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপাভিন্ন হবার নয়।... মানুষের কতটুকু শক্তি, সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে?... ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে।

শ্রীভগবানও গীতায় তাঁর অন্তিম উপদেশে বলছেন—মনে মনে সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করে, সর্বদা আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং যথাধিকার স্বধর্ম পালন কর, তাহলেই আমার প্রসাদে মুক্ত হতে পারবে। আমাকে লাভ করতে পারবে। ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষ মায়ামুক্ত হতে পারে না। অহংকারই সেই মায়া। অতএব মানুষ নানা ধর্মের নানা রূপ বিধি-নিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করে, সর্বতোভাবে ভগবানের শরণ নিলে, ভগবান মানুষকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করবেন—ইহা নিশ্চিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—আমি করছি, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। হে ঈশ্বর, তুমি করছ, এইটি জ্ঞান। ঈশ্বরই কর্তা, আর সব অকর্তা। ...জীব যখন বলে 'হে ঈশ্বর, আমি কর্তা নই, তুমিই কর্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' তখনই জীবের সংসার-যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্মক্ষেত্রে আসতে হয় না। ...তবে কর্ম একেবারে ত্যাগ করবার জো নেই। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে—তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর। তাই গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন—অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা কিনা, কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করবে না।'

শ্রীভগবানের কৃপায় ও গীতার উপদেশ শ্রবণে অর্জুনের অন্তর জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অর্জুন প্রজ্ঞারূপ মহামূল্য ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে উপহার পেলেন, যার ফলে তিনি জানতে পারলেন কঠিন সংকটে, জীবনের দুরূহ পরিস্থিতিতে কীভাবে চলতে হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে, মন সংশয়মুক্ত হয়েছে, আমি দ্বিধাশূন্য চিত্তে তোমার আদেশ পালন করব।' একটি কথায় সব উপদেশের উপসংহার করলেন শ্রীভগবান—'হে অর্জুন! তুমি শুধু আমার শরণ নও, আমি তোমাকে সব পাপ হতে মুক্ত করব।' এটাই হলো শরণাগতিযোগ। ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে তুমি কর্ম কর। এতে কোনও দার্শনিক জটিলতা নেই—সরল সোজা কথা।

অতএব অর্জুনের কথা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে গীতা-দর্শন কেমন করে আমাদের মনের সন্দেহ ও সংশয় নিরসন করে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে দেয়। ঐ কর্মপন্থা ঠিক করে দেওয়াই গীতা-দর্শনের কাজ—আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেই পথে আমাদের চলতে হবে। কর্ম আমাদের করতেই হবে। সেই আলো সম্বল করে আমাদের জীবনে যাত্রা শুরু করতে হবে। পথে সন্দেহ এলে এই গীতা-দর্শনের দিকে ফিরে

তাকাতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে—এই জীবনে, এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য গীতা-দর্শন।

গীতা যে কী মহামূল্যবান বস্তু তা শ্রীভগবান নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন—যে ব্যক্তি গীতা ব্যাখ্যা করবে, যে গীতা অধ্যয়ন করবে, তারা গীতা-পাঠরূপ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমারই পূজা করছে জানবে। সেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারাই ভগবান পূজিত হয়ে থাকেন। যে গীতার উপদেশ কেবলমাত্র শ্রবণ করবে (অর্থ বুঝে কিংবা না বুঝে), সে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মকারীদের শুভ-লোকসমূহ প্রাপ্ত হবে—এ নিশ্চিত। গীতা শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব জ্ঞানময় রূপ। ঈশ্বরের কৃপাছাড়া কিছুই হবার জো নাই। শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি নেবার যে ইচ্ছা, তাও ঈশ্বরের কৃপা না হলে সম্ভব নয়।

সবশেষে সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন—যোগের বাণীর শ্রোতা সঞ্জয় সকল মানবজাতির উদ্দেশে বলছেন—গীতার বাণী শ্রবণে তাঁর যে আনন্দানুভূতি হয়েছে, সর্বসাধারণও গীতার বাণী শ্রবণ করলে সেই আনন্দ ও অনুভূতি আস্বাদ করতে পারবে। গীতার যোগ অনুসরণ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত করলে—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সর্ব কর্মে সাফল্য, উন্নতমানের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ, জীবনে উচ্চ আদর্শ, নৈতিক সচেতনতা ও নীতিপরায়ণতা আসবে এবং আমাদের চৈতন্য জাগরিত হবে। সঞ্জয় আরও বলছেন—শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব প্রজ্ঞা ও অর্জুনের বীরোচিত কর্মশক্তিকে একত্রিত করে আমরা যেন আমাদের কর্মজীবনে প্রতিফলিত করে থাকি—তাহলেই সেখানে সমৃদ্ধি, জয়, অভ্যুদয় এবং সুনীতির আশীর্বাদ নেমে আসবেই আসবে।

গীতার দর্শন ও সঞ্জয়ের উক্তির তাৎপর্য আমাদের সকলের অনুধ্যান করা একান্ত কর্তব্য, তবেই আমরা আত্মবিকাশের চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ করে গীতার উপদেশের মাধ্যমে সমগ্র বেদের আধ্যাত্মিক সম্পদ আমাদের সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। এই সত্যই অদ্বৈত বেদান্তের মহৎ তত্ত্ব—এক সত্তা ঈশ্বরই বিশ্বজুড়ে সর্ববস্তুতে বিরাজ করছেন। আমরা সব এক। এক জায়গায় অশান্তি হলে সর্বত্র তার প্রভাব পড়বে। তাই গীতার মর্মবাণী সকলকে শোনাতে হবে তবেই আমাদের মধ্যে ঐক্য, ভালবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ওঁ তৎ সৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।।১
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ।।২
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্।।৩
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্বাচ্যপদাত্মিকা।।৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয় স্বরূপ, গীতা আমার সার সর্বস্ব, গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ। গীতাই আমার পরম স্থান এবং পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু। গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত, গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করে আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি। ১-৩
গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, তাতে সংশয় নাই। অর্ধমাত্রারূপিণী গীতা নিত্যা, পরাৎপরা ও অনির্বচনীয়পদস্বরূপিণী।৪

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ।।৫
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ।।৬
অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ।।৭
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ।।৮
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্ধপাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয় ।।৯
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ।।১০

হে পাণ্ডব! আমি গীতার গুহ্যনামগুলি বলছি—শ্রবণ কর। ঐ সব নাম কীর্তন করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় ।।৫
গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ।। ৬-৭
যে ব্যক্তি প্রত্যহ স্থিরচিত্তে এসব নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্যজ্ঞান-সিদ্ধি ও অন্তে পরমপদপ্রাপ্ত হন ।।৮
গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হলে অর্ধেক পাঠ করবে এবং তাতে গোদানের ফললাভ হবে, তাতে সন্দেহ নেই ।।৯
এবং তৃতীয়াংশ পাঠ করলে সোমযাগের এবং ষষ্ঠাংশ পাঠ করলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয় ।।১০

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ।।১১
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ।।১২
অধ্যায়ার্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং য পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ।।১৩
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ।।১৪
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ।।১৫

যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক-প্রাপ্ত হন এবং তথায় এককল্পকাল নিশ্চয়ই

বাস করে থাকেন ।।১১
যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক-প্রাপ্ত হন এবং তথায় চিরকাল বাস করেন ।।১২
যিনি এক অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক-প্রাপ্ত হয়ে শত মন্বন্তর তথায় বাস করেন ।।১৩

যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক বা অর্ধ শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অযুতবৎসর-কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন ।।১৪
যিনি গীতার এক অধ্যায়ের এক শ্লোকের এক চরণের অর্থস্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ-প্রাপ্ত হন ।।১৫

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ।।১৬
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ।।১৭
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ।।১৮
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ।
যৎ যৎ কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্তিমৎ।
ততৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ।।১৯
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াৎ যান্তি স্বর্গতিম্ ।।২০
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ ।।২১

যিনি মরণকালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন, বা পাঠ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হলেও মুক্তিভাগী হয়ে থাকেন।।১৬ যিনি গীতা পুস্তক নিজের কাছে রেখে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করে থাকেন ।।১৭ মৃত্যুকালে কেউ যদি গীতার এক অধ্যায়ও পাঠ করে, তাহলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং সেই দেহে গীতাভ্যাস করে মানব মুক্তিপদ লাভ করে ।।১৮ মরণকালে ‘গীতা’ এই শব্দ-উচ্চারণ করে কারো মৃত্যু হলেও তাতে সদ্গতি হয়। যে কর্মই অনুষ্ঠান করা হোক, সে সময় গীতাপাঠ করলে সে কর্ম নির্দোষ হয়ে সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয় ।।১৯ শ্রাদ্ধকালে পিতৃলোকের উদ্দেশে গীতা পাঠ করলে, তার নরকস্থ পিতৃগণ সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গে গমন করেন ।।২০ গীতা পাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করে পিতৃলোকে গমন করেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করে থাকেন ।।২১

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ।।২২
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ।।২৩
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ।।২৪
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বসুখাবহম্ ।।২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং সমাপ্তম্

সূত বললেন—যিনি গীতাপাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণোক্ত এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করে থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভোগী হন ।।২২ যিনি গীতা পাঠ করে গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন না তাঁর গীতাপাঠে কোন ফল হয় না। তাঁর পরিশ্রম বৃথা হয় ।।২৩ যিনি এই মাহাত্ম্য-সহিত গীতাপাঠ করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক তা শ্রবণ করেন, তাঁরা উভয়েই পরমগতি প্রাপ্ত হন ।।২৪ অর্থসহিত গীতা শ্রবণ করে যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন জগতে তাঁর পুণ্যফল সর্বসুখাবহ হয়ে থাকে ।।২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

—প্রার্থনা—

সর্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখমাপ্নুয়াৎ ।।

এ জগতে সকলে সুখী হউক, সকলে নিরাময় হউক, সকলেই কল্যাণ দর্শন করুক এবং কেহ যেন দুঃখভোগ না করে।

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাম্, ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ শশ্বদ্ ভজতাদধোক্ষজে, আবেশ্যতাং নৌ মতিরপ্যহৈতুকী ।। (ভাঃ ৫-১৮-৯)

হে ভগবন্! জগতের মঙ্গল হউক, খল ব্যক্তি তার ক্রুরভাব পরিত্যাগ করুক, ভূতগণ পরস্পর মঙ্গল-চিন্তায় নিমগ্ন হউক, মন শান্তিলাভ করুক এবং আমাদের মতিও কামনাবিহীন হয়ে ভগবান শ্রীহরিতে নিবিষ্ট হউক।

স্থিতং সর্বত্র নির্লিপ্তং আত্মরূপং পরাৎপরম্।
নিরীহমবিতর্কাখ্যং তেজোরূপং নমাম্যহম্ ।। (ব্রহ্মঃ বৈঃ পুঃ)

সর্বত্র অবস্থিত অথচ নির্লিপ্ত, আত্মস্বরূপ, পরাৎপর, নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরূপ সেই ভগবানকে আমি বার বার প্রণাম করি।

ধর্মশ্চ বিষ্ণুঃ সকলানি বিষ্ণুঃ, কর্মাণি বিষ্ণুশ্চ স এব ভোক্তা।
কার্য্যঞ্চ বিষ্ণুঃ করণানি বিষ্ণু, স্তস্মান্ন কিঞ্চিদ্ ব্যতিরিক্তমস্তি ।। (বৃঃ নাঃ পুঃ-১৩-১১১)

সমস্ত ধর্মই বিষ্ণু, সমস্ত কর্মই বিষ্ণু, তিনিই কর্মফল-ভোক্তা। কার্যও বিষ্ণু, ইন্দ্রিয়সমূহও বিষ্ণু, তা হতে অতিরিক্ত কিছু এ জগতে আর নেই।

স এব বন্ধঃ স চ বন্ধকর্তা, স এব পাশঃ পশবঃ স এব।
স বেদ সর্বং ন চ তস্য বেত্তা, তমাহুরাদ্যং পুরুষং পুরাণম্ ।। (কূর্মঃ-২-৩১)

তিনিই বন্ধন, তিনিই বন্ধনকর্তা। তিনিই পাশ, তিনিই সমস্ত পশু। তিনি সকলের জ্ঞাতা, অথচ তাঁকে কেউ জানে না। তাঁকেই আদ্য পুরাণ-পুরুষ বলা হয়ে থাকে।

বিষ্ণুর্মাতা পিতা বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ স্বজনবান্ধবাঃ।
যত্র বিষ্ণুং ন পশ্যামি তেন বাসেন কিং মম ।।

বিষ্ণুই মাতা, বিষ্ণুই পিতা, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি প্রভৃতিও বিষ্ণু। যেখানে বিষ্ণু নাই, তা উৎকৃষ্ট স্থান হলেও সেখানে বাস করবার আমার কি প্রয়োজন?

জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে।
জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ।।

জলে, স্থলে ও পর্বতের উপরে সর্বত্রই বিষ্ণু অবস্থান করছেন। প্রকাশিত জীবকুলসমূহ বিষ্ণু এবং এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সাহায্যকারী আকর গ্রন্থ:

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, স্বামী অপূর্বানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, স্বামী বাসুদেবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, নানৃতম্
৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, হরিমন্দির ট্রাস্ট
৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ ও শ্রী নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, নবভারত পাবলিশার্স
৮. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা, শ্রী নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, গৌড়ীয় মিশন, কলকাতা
৯. গীতা-ধ্যান: শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন
১০. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী
১২. তবকথামৃতম্: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স
১৩. উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স

শ্লোক-সূচী

(প্রথম পঙ্ক্তি অনুযায়ী)

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ

চিদ্‌রূপানন্দ

RENE
An initiative by Satyabrata Mukherjee & Sujata Mukherjee
ISBN 978-93-91168-09-4
9 789391 168094